ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত

সম্পাদিত।

অষ্টম খণ্ড।

১৩১৯

ঢাকা,

উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ২॥৵০ দুই টাকা দশ আনা।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক্ সূচী।

[illegible] ও অহল্যা।

Bharat Mahila Press Wari, Dacca.   Three colour blocks by U. Ray & Sons.

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদঃ— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)।

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। } বৈশাখ, ১৩১৯। { ১ম সংখ্যা

নববর্ষে নিবেদন।

সিদ্ধিদাতা প্রভু পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা নূতন বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদই আমাদের সহায় ও সম্বল; আজ প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন তাঁহার করুণার উপর নির্ভর রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি।

ভারতমহিলা অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিল। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিয়া সংসারে নিঃসম্বল আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম। শুধু স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা পরিচালন করা কখনই আমাদের লক্ষ্য ছিল না। প্রধানতঃ দুইটী কার্য্য সম্মুখে রাখিয়া আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। চতুর্থ বৎসরের বৈশাখ সংখ্যায় আমরা আমাদের অন্তরের সেই সংকল্প সর্ব্বপ্রথমে আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম:—

"এদেশের নারীজাতির শক্তিবিকাশের উপায় অবলম্বনে অতিরিক্ত কালবিলম্ব করা হইয়াছে, অচিরে কার্য্যারম্ভ প্রয়োজন। কিন্তু দেশবাসীদিগকে এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগী দেখিতেছি না। নারীজাতি না জাগিলে, নারীদিগের উন্নতি না হইলে দেশের প্রকৃত উদ্ধার যে সম্ভব হইবে না তাহা কাগজে লেখেন এবং মুখে বলেন অনেকেই; কিন্তু তাহার জন্য কাজে কি করা হইতেছে? আমরা "স্বরাজ" ও স্বায়ত্বশাসন যত উচ্চকণ্ঠে

অথবা যত আবেগের সহিত চাই না কেন, যতক্ষণ আমরা তাহার উপযুক্ত না হইব, ভগবান কিছুতেই আমাদিগকে তাহা দিবেন না। এখনও দীর্ঘকাল ধৈর্য্যের সহিত, শান্তভাবে, দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। শুধু উচ্ছ্বাসে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, শুধু উত্তেজনাতে দেশের উদ্ধার হয় না। ভিতরের কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইয়া শুধু বাহিরের কাজে মগ্ন থাকিলে মুক্তির ঘাট নিকট হইবে না।

দেশের উদ্ধারের পক্ষে দুইটী অতি প্রধান বিষয়ে আমরা এখনও দেশবাসীগণকে উদাসীন দেখিতেছি। (১) জনসাধারণের শিক্ষা, (২) নারীজাতির শিক্ষা। জাতীয় উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে হইলে অবিলম্বে এই দুই কষ্টসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।" * * *

"কার্য্যক্ষেত্র বিশাল কিন্তু আমাদের শক্তি অতি সামান্য। দেশবাসীর উদাসীনতা দেখিয়া ইচ্ছা হয়, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য শতগুণ উৎসাহে সম্পন্ন করি। কিন্তু শক্তির অল্পতার কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত ও ভীত হই।"

পঞ্চম বৎসরে আশ্বিন সংখ্যায় "জন্মদিনের নিবেদন" প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম :—

"আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, আজ পুনরায় বলিতেছি, শুধু সাহিত্যসেবা ভারত-মহিলার জীবনের লক্ষ্য নহে। বিশেষ ভাবে এদেশের নারীজাতির হিতসাধন এবং সাধারণ ভাবে দেশের উন্নতিকর বিবিধ কার্য্যে সাহায্য করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পত্রিকা পরিচালনে রত থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর অধিকতর স্পষ্টরূপে আমরা কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনিতে পাইতেছি। পর্ব্বত-প্রমাণ কর্ত্তব্যরাশি আমাদের পুরোভাগে; অল্পশক্তি, অর্থহীন, আমরা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিন্তু ভগবানের মঙ্গল-শক্তিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহার সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই করুণা সম্বল করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত কয়েকটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই কার্য্যগুলি সকলই আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, এমন স্পর্দ্ধা, এমন দুরাশা, আমাদের নাই। এই সকল কার্য্যের মধ্যে যে কাজের যাঁহারা উপযুক্ত, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইব, এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিব এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সাহায্য করিব। ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করিব, তিনি কোন্ উপায়ে কোন্ কার্য্য সাধন করিবেন, আমরা জানি না।"

সংকল্পিত কার্য্যগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দুইটী কার্য্য সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম :—

"**বিধবাশ্রম**—আমাদের দেশের বিধবাদিগের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়। এমন বিধবা অনেক আছেন, যাঁহারা সংসারে নারীর পরম সম্বল পতিকে হারাইয়া শুধু যে মনঃকষ্টের একশেষ ভুগিতেছেন, তাহা নহে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। অনেক সময় এই সকল অসহায়া বিধবা অন্নবস্ত্রের অভাবে অনন্যোপায় হইয়া বিপদে পতিত হন। লেখাপড়া অথবা শিল্পাদি শিক্ষার সুযোগ পাইলে তাঁহারা সসম্মানে নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জ্জন করিতে পারেন; উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করতঃ দেশের পরম উপকার সাধন করিতে পারেন। জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় এবং শিক্ষা লাভের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও উপযুক্ত উপায়াভাবে অনেক বিধবা সুশিক্ষা লাভ করতঃ আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন না। এই সকল বিধবার জন্য নানাস্থানে বিধবাশ্রম স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই ঢাকা নগরীতেও অবিলম্বে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। নির্ম্মলস্বভাবা বিধবাগণ এই আশ্রমে বাস করিবেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যাচর্চ্চা এবং রোগীর শুশ্রূষা ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আত্মোন্নতি সাধন করিবেন। তাঁহাদের জাতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে। বিধবাগণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিবেন। পড়াশোনায় যাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইবে, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া যাইবে।"

"**নিপীড়িত জাতির উন্নতি চেষ্টা**—এদেশের নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) প্রভৃতি কতকগুলি

নিম্ন বর্ণের লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাদের পুরুষদিগের মধ্যেই লেখাপড়ার প্রচলন নাই, স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই। ঘোর অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে এই সকল শ্রেণীর অধিকাংশ নরনারী সমাচ্ছন্ন। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচলিত না হইলে দেশের এক প্রধান অঙ্গ অবশ হইয়া থাকিবে। এই গুরুতর কার্য্যের জন্য অনেক নিঃস্বার্থ সেবকের কঠোর শ্রম এবং বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু দেশের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকিলে কার্য্যারম্ভে অযথা বিলম্ব হইবে। দেশের উন্নতির জন্য এখন অনেক চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিতেছেন। আপাততঃ নমঃশূদ্র-প্রধান দুই তিনটি গ্রাম লইয়া একটি স্থানে শিক্ষা বিস্তারকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেখানে একটি বালিকাবিদ্যালয়, একটি বালকবিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সামান্য রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরিত হইবে এবং বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ ভাবে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করা হইবে।"

মানুষ যত অকিঞ্চনই হউক না, তাহার ইচ্ছা সাধু থাকিলে ভগবান তাহার সহায় হন, অতি আনন্দের সহিত আজ আমরা একথার সাক্ষ্য দিতেছি।

হিন্দু বিধবাদের দ্বারা দেশের কত কাজ হইতে পারে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ অঞ্চলে হিন্দু বিধবাদের জন্য এতদিন এমন একটীও আশ্রম ছিল না যেখানে তাঁহারা সাত্ত্বিক ভাব রক্ষা করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে সেই উপার্জ্জিত শক্তি পরসেবায় ব্যয় করিতে পারেন। ১৩১৬ সনের মাঘ মাসে আমরা দুইটী বিধবা লইয়া আশ্রম স্থাপন করি। কিন্তু স্থানীয় অনাথাশ্রমের কার্য্যভার আমাদের স্কন্ধে থাকায় এই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য কিছুদিন আশ্রমের কার্য্য বন্ধ ছিল। এখন জনৈক শ্রদ্ধেয়া সম্ভ্রান্ত বিধবা হিন্দু মহিলার তত্ত্বাবধানে আশ্রমের কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি চারিটী স্ত্রীলোক এই আশ্রমে বাস করিতেছেন। কয়েকদিন হইল ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্ট্রেস মহোদয়া আশ্রমটী দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া গিয়াছেন। আশা করি, আত্মোন্নতি আকাঙ্ক্ষিণী বহু হিন্দু বিধবা আশ্রমে যোগদান করিবেন। যাহাদের অবস্থা ভাল নহে আশ্রম তাহাদের সকল প্রকার ব্যয় বহন করেন, সমর্থগণকে মাসিক ৭৲ সাত টাকা করিয়া দিতে হয়।

সম্প্রতি এই আশ্রম একটী অতি পুণ্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কাছাড়ে যে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে ঢাকা বিধবাশ্রম তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া বহু লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা নারীশক্তির আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে?

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে "জন্মদিনের নিবেদন" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি যখন প্রস্তুত হইল, তখন আমাদের সোদরোপম জনৈক ধর্ম্মশীল যুবক আমাদের কার্য্যালয়ে বাস করিতেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবনত জাতির উন্নতি সাধনই নিজ জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইলেন। ঢাকা জিলার সাভার থানার অন্তর্গত বেরস নামক একটী অতি অনুন্নত নমঃশূদ্র গ্রামে কেন্দ্র মানোনীত করতঃ আমরা ভগবানের নাম করিয়া তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিলাম। বলিতে আনন্দ হইতেছে, সেই উৎসর্গিতপ্রাণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবকের চেষ্টায় তাঁহার স্কুলটি নিম্ন প্রাইমেরী হইতে উচ্চপ্রাথমিক, তৎপর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পরিণত হইয়া এখন মধ্যইংরেজী স্কুলে উন্নীত হইয়াছে। আমাদের অতি স্নেহাস্পদ আরো দুইটী শিক্ষিত যুবক নানা অসুবিধা সহ্য করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। আর একবৎসর কাল মধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য পুষ্করিণী খনন, উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। ৪।৫ বৎসর মধ্যে বিদ্যালয়টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া ঢাকা অঞ্চলের নমঃশূদ্রদিগের একটী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতেছি।

এই সামান্য সামান্য সূচনা হইতে যে মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের আশা বাড়িয়া গিয়াছে। এই সূচনা হইতেই "অনুন্নত জাতির উন্নতি

বিধায়িনী সমিতি" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক বন্ধু বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমিতির উন্নতি কল্পে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় অনেক শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং দশটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সাহিত্যের হিসাবে ক্ষুদ্র ভারত-মহিলার কি মূল্য আছে, পাঠক পাঠিকাগণের তাহা অবিদিত নাই। আমরা সাহিত্যিক নহি, তবে যে সাহিত্য-সাধনা নরসেবার জননী, আমরা সেই সাহিত্যের সেবক। এই হিসাবে ভারত-মহিলার ক্ষুদ্র জীবন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তজ্জন্য এই নববর্ষের দিনে আমাদের হৃদয় ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতায় অবনত হইতেছে।

আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আজ আমাদের আর একটী নিবেদন আছে। বর্ত্তমান বৎসরে আমরা আমাদের সাহিত্যিক আদর্শের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতেছি। যাঁহাদের জন্য ভারত-মহিলা প্রকাশিত হয় তাঁহাদের অনেকেরই নিকট ইহার প্রবন্ধাদি কঠিন বোধ হয়। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে ভারত-মহিলার প্রবন্ধাদি আমাদের সাধারণ পাঠিকা ভগিনীগণের অধিকতর উপযোগী করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ষ-আবাহন।

এস অয়ি বর্ষ-রাণী ! নবীন প্রভাতে,
কুসুম বাসর হতে উষার আসরে।
নব বধূ সম তুমি এস লয়ে সাথে
তোমার সলাজ হাসি অরুণ অধরে ;
অলক্ত রঞ্জিত তব চরণ দু'খানি
দেখিবে বলিয়া আজ জগত আকুল,
গাহিছে বিহঙ্গ হের তব আগমনী,
সমীর দুয়ারে দেছে তাই এত ফুল ॥
বরণ করিবে বলি উষা গরবিনী
আছে চেয়ে তব পথ পানে, যাইতেছে
বহি যত শুভ অবসর, ওগো রাণি !
অধীরতা বুকে তার তত বাড়িতেছে।
আর এক দূর কোন কুটীর দুয়ারে,
আগ্রহে দাঁড়ায়ে কবি আছে তব তরে।

শ্রীহরিপদ দে।

থেরীগাথা।

থেরীগাথা ভারতের প্রাচীন গৌরবের অতি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নারীজাতির সুশিক্ষা এবং নারীজাতির প্রতি যথার্থ সম্মানের এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের দৃষ্টান্তে কেহ কেহ খনা এবং লীলাবতীর নাম করিয়া থাকেন; তাঁহারা হয়ত জানেন না যে ঐ দুইটিই কল্পিত নাম। খুঁজিয়া পাতিয়া কল্পিত নামের দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকেরা হতাশ হইয়া মনে করিতে পারেন যে এদেশে হয়ত প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীদিগের নাম এবং অন্যান্য দুচারিটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে; কিন্তু পালি নামে খ্যাত প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যে নারী মাহাত্ম্যের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

থেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতশীলা নারীর পদ্য রচনা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতরমণীগণ কর্ত্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধী পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নব সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী মুক্তি কামনায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রমণীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপদেশলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ জন রমণীর রচনা এই থেরীগাথায় পাওয়া যায়।

থেরী শব্দের অর্থ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা। জ্ঞানবৃদ্ধ থের বা জ্ঞানবৃদ্ধা থেরীগণ কেহ বা যৌবনে কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে এবং কেহ বা বার্দ্ধক্যে বুদ্ধদেবের নব ধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। থেরীদিগের জীবনচরিত এবং রচনা দেখিয়াই পাঠকেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের যুগে ভারতসমাজে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল। যাঁহারা স্ব স্ব গৃহে শিক্ষিতা হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর আপনাদের জীবনচরিত এবং ধর্ম্মজ্ঞানের কথা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। নহিলে বহুশত থেরীর মধ্যে কেবল ৭৩ জনের জীবনচরিত এবং রচনা থেরীগাথায় নিবদ্ধ থাকিত না। গাথাগুলির অনুবাদে থেরীর জীবনচরিতের যে আভাস পাইবেন পাঠকেরা তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন সমাজ কতদূর উন্নত এবং স্ত্রী স্বাধীনতার অনুকূল ছিল।

থেরীগাথা বৌদ্ধ বেদ বা ত্রিপিটকের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পিটকের নাম সুত্তপিটক; এই সুত্তপিটকের প্রধান ভাগ কয়েকখানি নিকায় গ্রন্থ লইয়া। ঐ নিকায়গুলির অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্গে ১৫ খানি খুদ্দক নিকায় পাওয়া যায়; থেরীগাথা সেই খুদ্দক নিকায়ের একখানি নিকায়। অপদান নামে যে খুদ্দক নিকায় গ্রন্থখানি প্রচারিত আছে, তাহাতেও থেরীগণের কোন কোন রচনা এবং জীবনচরিত সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অপাদান গ্রন্থখানি যে সময়ে সংগৃহীত বা রচিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেবের নামে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়াছিল। এইজন্য অপদানকার শ্রমণ-শ্রমণীদিগের জীবনের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সে কথাগুলিও ধর্ম্মের ইতিহাসের জন্য উপযোগী। লিপি প্রচলিত থাকিলেও এদেশে সে কালে এবং একালে অনেক গ্রন্থ মুখস্থ রাখিয়া আবৃত্তি করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। থেরীগাথাগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রমণ-শ্রমণীগণ মুখস্থ রাখিয়া আবৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন এবং পরে মৌর্য্যরাজাদিগের সময়ে ঐ গাথাগুলি কেবল মাত্র দীর্ঘতার বিচারে বিভক্ত হইয়া সঙ্গীতকারকদিগের দ্বারা পরে পরে সজ্জিত হইয়াছিল। থের ধর্ম্মপাল থেরীগাথার পরমথ দীপনী নামক একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই টীকার একস্থানে লিখিয়াছেন যে থেরীগণ যে গাথা গাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা "একজ্ঝং-কত্তা," "একনিপাতাদি বসেন সঙ্গীতম্ আরো পয়েংসু।" কাজেই অপদানের অনেক কথা এবং টীকাকারের অনেক ইতিহাস সতর্ক হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে স্থানে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা অনুবাদের সময়ে টীকায় নির্দ্দেশ করিলাম।

থেরীদিগের জীবনচরিত এবং রচনার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে থেরীসঙ্ঘ সৃষ্টির কিঞ্চিৎ ইতিহাস দিতেছি। থেরীগাথার মধ্যে একজন থেরীর নাম মহাপজাপতী গোতমী। পালিভাষায় পজাপতী শব্দ অনেক স্থলে স্ত্রী বা ভার্য্যা অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়; মহাপজাপতী * অর্থ রাজার প্রধানা মহিষী। ভগবান্ বুদ্ধদেবের মাতার মৃত্যুর পর ইনি শুদ্ধোধন দেবের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন, এবং এই অঞ্জনরাজকুমারী মাতৃহীন বুদ্ধদেবকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। যখন মহাপুরুষের পরিবার-বর্গ সকলেই তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন এই পুণ্যময়ী গোতমী দেবীর প্ররোচনায় বুদ্ধদেব স্বতন্ত্র ভাবে ভিক্ষুণী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই বলিতে পারি, যে গোতমী দেবী থেরীসঙ্ঘের জননী ছিলেন। ইঁহার করুণায় ধর্ম্মচর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রচারের পথে রমণীর অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। আশা করি যে, নারীজাতির হিতসঙ্কল্পে একালে যে সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার কোন একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান করুণাময়ী মহাপজাপতী গোতমীর নামাঙ্কিত হইবে।

ইউরোপীয় সমালোচকেরা থেরীদিগের রচনা এবং জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতরমণী যে সুশিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। থেরীগাথা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রীস্ ডেভিডস্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন :—

*** N. B. Mrs. Rhys Davids ভুল অর্থ করিয়াছেন বলিয়া শব্দটীর ব্যাখ্যা দিলাম। দ্বাদশ নিপাতের টীকায় দেখিতে পাইবেন যে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার অর্থে "অন্তনে' প্রজাপতিং অকাসি" লিখিত হইয়াছে।**

It (থেরীগাথা) affords a very instructive picture of the life they (থেরীগণ) led in the valley of the Ganges in the time of Gotama the Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great success, and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight.

(Buddhism, p. 72.)

"গৌতম বুদ্ধের সময় থেরীগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় যেরূপ জীবন যাপন করিতেন, থেরীগাথা হইতে তাহার একটি অতি উপদেশপ্রদ চিত্র পাওয়া যায়। নারীগণকে এত স্বাধীনতাপ্রদান এবং তাহাদিগকে এত উচ্চস্থান দেওয়া বৌদ্ধসংস্কারের নেতাদিগের পক্ষে সাহসের কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে এই কাজটি খুব সফল হইয়াছিল এবং এই মহিলাগণের অনেকে ধর্ম্মবিষয়ক আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, উচ্চমনস্বিতার জন্য তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাবতী হইয়াছিলেন।"

—প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে আবার এই ভারত-গৌরব রমণীগণের জীবনী এবং গাথা গৃহে গৃহে পঠিত এবং আলোচিত হউক।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভুল।

(১)

নিতান্ত অদৃষ্টের ক্রূর চক্রে পড়িয়াই যেন অমন ঢলঢলে সুন্দরী মেয়েটি এক দরিদ্র কেরাণীর ঘরে জন্মিয়াছিল। রূপের সার্টিফিকেট বই আর তো তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি ধনীর হৃদয়ে স্থান পাওয়া যায়?—অসম্ভব! অথচ এই যে ভুবনভরা রূপ—ইহা কি সংসারের নিত্য-কর্কশ কাজের ধূলায় মলিন হইয়া ঝরিয়া পড়িবার জন্য?—বালিকার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না!

অবশেষে অতৃপ্ত ঐশ্বর্য্য-লালসা হৃদয়ে লইয়া সে শিক্ষা-বিভাগের এক সামান্য কর্ম্মচারীর পায়ে আপনার ক্ষুব্ধ প্রেমকে ডালি দিল।

মোটা রকমের সাদাসিধে পোষাক ব্যতীত ভাল কোনোরূপ পোষাকপরিচ্ছদ তাহার ভাগ্যে জুটিত না। তার জন্য সে মনে মনে এমন একটা অসন্তোষ ও অশান্তি অনুভব করিত, যেন সমস্ত সংসারটা দল বাঁধিয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে তাহার নিজের উন্নত অবস্থা হইতে নীচে টানিয়া আনিয়াছে! সে ভাবিত, নারীর ভাগ্যে রূপই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান! সেই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি যে নারীর আছে সে-ই জগতের সকল রকম সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী! এই ধারণার পরেই যখন তাহার নিজ বাস-ভবনের দৈন্য, আসবাবাদির জঘন্যতা ও জীর্ণতা এবং পর্দ্দাদির কদর্য্যতার স্মৃতি তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত তখন সে প্রাণে একটা মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিত।

যখন সে ময়লা কাপড় ঢাকা গোল টেবিলে স্বামীর সম্মুখে আহার করিতে বসিত, এবং তাহার স্বামী ডিসের ঢাকাটি খুলিয়া তৃপ্তিভরে বলিত,—"আ—কী চমৎকার!" তখন বড় মানুষের খানা-ঘরের জমকালো চিত্র তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত!

তাহার গহনা ছিল না—পোষাক ছিল না, কিছুই ছিল না। অথচ সে এই সকল ভিন্ন আর বড় কিছু ভাল-বাসিত না। সে মনে করিত সেই সমস্ত উপভোগ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! প্রীতি দান করিতে, ঈর্ষার পাত্র হইতে, পুরুষ হৃদয়ে বাসনার অনল জ্বালাইতে এবং সকলের কামনার বস্তু হইতেই সে সর্ব্বদা ব্যস্ত!

তাহার একজন বাল্যবন্ধু ছিল—গত জীবনের একজন ধনবতী সহপাঠিকা। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজগৃহে ফিরিবার সময় সে এমন হীনতা অনুভব করিত যে, পুনর্ব্বার আর তাহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা থাকিত না।

তাহার স্বামী একদিন সন্ধ্যাকালে একখানি বড় খাম হাতে গৃহে ফিরিয়া একটু পরিতৃপ্ত গর্ব্বভরে বলিল,—"এই দেখ তোমার একটি জিনিষ।"

ব্যস্ত হইয়া রমণী খামখানি ছিঁড়িল, দেখিল তন্মধ্যে একখানি ছাপানো কার্ড। তাহাতে লেখা ছিল,—

"১৮ই জানুয়ারি, সোমবার সন্ধ্যাকালে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ও তাঁহার স্ত্রী—তাঁহাদের বাড়িতে নোয়াজেল দম্পতির উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছেন।"

স্বামী আশা করিয়াছিল যে, এই কার্ডখানি পাইয়া তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব আনন্দ প্রকাশ করিবে। কিন্তু যুবতী তো কিছুমাত্র আনন্দিত হইল না, বরং ঐ কার্ডখানি অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত টেবিলের উপর ফেলিয়া বলিল,—"এ নিয়ে আমি কি কোরবো?"

তাহার স্বামী একান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—"আমি ভেবেছিলুম, তুমি এ'তে খুব সন্তুষ্ট হবে, তুমি কখনো কোথাও যেতে পাও না, তাতে এমন একটা সুযোগ! অনেক কষ্টে আমাকে এটি যোগাড় করতে হয়েছে। প্রত্যেকেই যেতে চায়, বেছে বেছে বড় বড় কর্ম্মচারী সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হ'য়েচে। কেরাণী এক জনও নিমন্ত্রিত হয় নি।"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত স্ত্রী স্বামীর দিকে চাহিয়া অভিমান ও বেদনাভরা স্বরে বলিল,—"আমার কী আছে, যে তাই পরে' ভদ্র সমাজে যাব!"

এ কথা তার স্বামী একবারও ভাবে নাই। সে একটু যেন দমিয়া গেল ও ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলিল, —"কেন, যে পোষাকটা পরে' তুমি থিয়েটারে যাও, সেটা তো আমার বোধ হয়—মন্দ নয়!"

দুটি বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাহার স্ত্রীর চক্ষু-কোণ হইতে ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল! স্ত্রীর এরূপ ভাব দেখিয়া সে ভীতি-বিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে? কি হ'য়েছে?"

অতি কষ্টে চোখের জল চাপিয়া যুবতী সিক্ত গণ্ড মুছিতে মুছিতে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল,—"কিছুই না, কেবল পোষাক নেই বলেই এ উৎসবে যে'তে পারবো না। যার স্ত্রীর আমার চেয়ে ভাল পোষাক আছে, তোমার এমন কোনো সহকর্ম্মীকে টিকিট খানা দাও গে।"

দারুণ নিরাশা ভরে তার স্বামীর বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টায় বেদনাহত হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া সে বলিল,—

"দেখা যাক্—মথিল্‌ডি;—তোমার মনোমত একটি সাদাসিদে পোষাক তৈরি করা'তে কত খরচ পড়্‌বে?"

যুবতী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—কত টাকা হইলে একটি পোষাক হয়, অথচ তাহার মিতব্যয়ী স্বামীটি টাকার কথা শুনিয়া একেবারে চমকিয়া না উঠেন! কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর বলিল,

"কত খরচ পড়্‌বে তা ঠিক জানিনে, তবে আমার বিশ্বাস, চার শো ফ্র্যাঙ্ক্ পে'লেই আমি করিয়ে নিতে পারবো।"

স্বামীর মুখ খানি হঠাৎ প্রভাতের চাঁদের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ঠিক ঐ পরিমাণ টাকাই বন্দুক কিনিবার জন্য জমাইতেছিল। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল—আগামী গ্রীষ্মকালে সে বন্ধুদের সহিত এক সঙ্গে এক রবিবারে 'নান্‌টেয়ারে' লার্ক পাখী শিকার করিতে যাইবে।

কিন্তু সে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা তাই হবে। তোমাকে আমি চারশো ফ্র্যাঙ্কই দেব। একটি সুন্দর পোষাক কর্‌তে দাও।"

(২)

ক্রমে যতই সেই উৎসবের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই ম্যাডাম নোয়াজেলকে বিষণ্ণ, অপ্রফুল্ল ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত দেখাইতে লাগিল। অথচ তাহার মনের মত পোষাক প্রস্তুত!

একদিন তাহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "মথিল্‌ডি, এই তিন দিন তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন,—কি হয়েছে?"

স্ত্রী উত্তর করিল,—"একখানিও অলঙ্কার নেই, একটিও পাথর নেই—কিছুই পরবার নেই, আমার ভারি কষ্ট হচ্চে, আমাকে নিতান্ত দৈন্য-পীড়িত দেখাবে, আমি সেখানে যাব না।"

—"তুমি তো ফুল পরতে পার, আর তা' এখন

বেশ রীতিসঙ্গতও হবে, দশ ফ্রাঙ্কে দু' তিনটি খুব ভাল গোলাপ পাবে।"

স্ত্রী ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "না, তা' হবে না। ধনবতী মহিলাদের নিকটে নিতান্ত গরীবের মত বেশে যাওয়া বড়ই অপমানজনক,—না, আমি যাব না।"

তাহার স্বামীর মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল; শরীরের রক্ত যেন দ্রুততর বেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল! ক্ষণকাল চিন্তার পর হঠাৎ যেন অন্ধকারের ভিতর আলোক পাইয়া সমুৎসাহে বলিল,—

"তুমি তো ভারি বোকা দেখ্ছি- তোমার বন্ধু ফরেষ্টিয়ের কাছে থেকে কয়েকখানা গহনা চেয়ে আন্‌লেই তো হয়! তার সঙ্গে তোমার যেমন ভাব, তাতে তুমি চাইলেই সে দেবে।"

মথিলৃডি যেন কূল পাইল! বলিল, "ঠিকই তো, এই সহজ উপায়টা একবারও আমার মনে আসেনি।"

পরদিন সে বন্ধুর বাড়ি গিয়া নিজের বিপদের কথা জানাইল। ম্যাডাম ফরেষ্টিয়ে একটি কাচের আলমারির ধারে গিয়া একটি বড় গহনার বাক্স আনিল এবং তাহা খুলিয়া সখীকে বলিল,—"পছন্দ করে নাও ভাই!"

প্রথমে দেখিল সে অনেকগুলি বালা, তারপর এক গাছি মুক্তার মালা, তৎপরে স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরের একটি সুন্দর 'ক্রস'। একখানি বৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নোয়াজেল সেগুলি এক এক করিয়া পরিয়া দেখিতে লাগিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কিছু নেই?"

"হাঁ, আছে বই কি, দেখ না, তোমার কোন্ রকম পছন্দ হবে তাতো আমি জানিনে!"

ম্যাডাম নোয়াজেল একটা কালো সাটিনের বাক্সের ভিতর একছড়া খুব উজ্জল হীরার হার দেখিতে পাইল। একটা দুর্দ্দমনীয় আনন্দ ও আশায় তাহার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে সে উহা তুলিয়া নিজের কণ্ঠে পরিল এবং দর্পণে নিজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আহ্লাদে শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধরাগলায় জিজ্ঞাসা করিল,

"এই—টি—শুধু এই-টি আমায় ধার দিতে পার?"

"নিশ্চয়ই পারি।"

সে তখনি সখীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহাকে চুম্বন করিল। তারপর ঐ হার লইয়া প্রীতি-উচ্ছ্বসিত অন্তরে বাড়ি ফিরিল।

(৩)

উৎসবের দিন ম্যাডাম নোয়াজেল আশাতীত সাফল্য লাভ করিল। সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, কমনীয়া, হাস্যামোদোৎফুল্লা, আনন্দে নিমগ্না! নিমন্ত্রিত সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল,—নাম জিজ্ঞাসা করিল এবং পরিচিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মন্ত্রী-সমিতির সকলেই তাহার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল, এমন কি স্বয়ং মন্ত্রীর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তাহারই উপর পড়িয়াছিল!

দীপ্ত অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া সে নাচিতে লাগিল! নিজ সৌন্দর্য্যের জয়োল্লাসে—নিজ কৃতকার্য্যতার অহঙ্কারোচ্ছ্বাসে—এই সমস্ত স্তুতিবাদ, সুখ্যাতি, এই সব চিত্তবিভ্রমকারী বাসনা, এবং রমণী-হৃদয়ের পক্ষে এই প্রকার মধুর বিজয়-জ্ঞান—এই সমুদয়ের সম্মিলনোৎপন্ন এক প্রকার পূর্ণ সুখের মোহে—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া সে আবেশে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিল!

ভোর চারিটার সময় নৃত্য শেষ হইল। রাত্রি বারটা হইতে তাহার স্বামী আর তিন জন ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত ছিল।

নোয়াজেল তাহার গৃহ হইতে আনীত সামান্য উত্তরীয় শালখানি পত্নীর স্কন্ধের উপর নিক্ষেপ করিল—নাচের পোষাকের উপর পড়িয়া উহার বৈষম্য ফুটিয়া উঠিল! রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়া অপরাপর মহিলাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিল—তাহারা যে বহুমূল্য পশমী বস্ত্রে স্ব স্ব বরবপু আচ্ছাদন করিতেছিল!

স্ত্রীকে ধরিয়া নোয়াজেল বলিল,—"একটু দেরী কর, বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, আমি একখানা গাড়ি ডাকচি।"

কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না—দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে লাগিল। পথে আসিয়া তাহারা এক-

খানিও গাড়ী পাইল না। উচ্চৈঃস্বরে গাড়োয়ানদের ডাকিতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা হতাশ হইয়া 'সীন' নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। তথায় একখানি পুরাতন ভাঙ্গা রাত্রির গাড়ি দেখা গেল। সে প্রকার গাড়ি রাত্রির পূর্ব্বে প্যারী নগরীর চতুর্দ্দিকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন তাহারা দিনের আলোকে নিজেদের দুর্দ্দশা দেখাইতে কুণ্ঠিত! সেই গাড়িতে চড়িয়া অতি কষ্টে তাহারা বাড়ি পৌঁছিল। বিষাদ-ক্লিষ্ট অন্তরে তাহারা বাড়ি প্রবেশ করিল। রমণীর তো কথাই নাই, তার সমস্ত শেষ হইয়াছে!—আর তার স্বামীর?— সে ভাবিল, দশটার সময় তাহাকে আবার কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে।

স্বীয় স্কন্ধ হইতে আবরণ অপসারিত করিয়া আর একবার নিজের রূপ-প্রভা দর্শন-মানসে যুবতী দর্পণ-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার স্বামী পোষাক খুলিতে খুলিতেই বলিয়া উঠিল, "তোমার হ'ল কি?"

—"আমি—আমি ফরেষ্টিয়ের সেই হার গাছি হারিয়ে ফেলিছি।"

—"কি—কেমন করে? অসম্ভব!" নিতান্ত হতবুদ্ধির মত তার স্বামী এই কথা বলিল। তখন উভয়ে মিলিয়া পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে,—পকেট গুলিতে—সমস্ত স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু হার কোথাও পাওয়া গেল না।

স্বামী বলিল,—"তোমার ঠিক মনে আছে যে, নাচের পর হার তোমার গলায় ছিল?"

—"আমি হাতে করে' ধরে পর্য্যন্ত দেখেছিলুম।"

—"কিন্তু—পথে কোথাও পড়লে আমরা নিশ্চয়ই তার শব্দ শুনতে পেতুম। তুমি নিশ্চয়ই গাড়িতে হারিয়েছ।"

—"তুমি তো গাড়ির নম্বরটা লিখে নিয়েছিলে, না?"

—"না, আর তুমি?—তুমিও কি নম্বরটা দেখ নাই?"

—"না,"

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিল। পরে নোয়াজেল বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল,—"আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি, আমি হেঁটে সেই পথে পুনরায় যাবো, দেখি পাই কি না।"

এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল, তাহার স্ত্রী সেই নাচের পোষাকেই বসিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেশ পরিবর্ত্তনের শক্তি তাহার ছিল না—বিস্ময়, লজ্জা, ক্ষোভ ও অনুতাপ এক সময়েই তাহার হৃদয়কে নিপীড়িত করিতে লাগিল। সে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া উদাস মনে বসিয়া রহিল।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় তাহার স্বামী রিক্তহস্তে ক্ষুণ্নমনে বাড়ি ফিরিল। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল, সংবাদ পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, গাড়িওয়ালাদের আড্ডায় আড্ডায় অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু হার আর মিলিল না।

এই আকস্মিক গুরুতর বিপদে যুবতী চিন্তায়, ভয়ে যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও সে উঠিল না—স্নানাহারও করিল না।

রাত্রি দশটার সময় শুষ্ক হতাশহৃদয়ে নোয়াজেল আসিয়া স্ত্রীকে বলিল,—"চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নি, কিন্তু কিছুতেই হারের সন্ধান পাওয়া গেল না। তুমি তোমার বন্ধুকে লিখে দাও যে, 'সেই হারের আঁকড়াটি ভেঙ্গে গেছে, তাই সারাতে দিয়েছি।" দেখি এর মধ্যে যদি কিছু কিনারা করতে পারি।"

স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করিল।

(৪)

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নোয়াজেল-দম্পতিরও হার প্রাপ্তির সকল আশা ভরসা ভাসিয়া গেল। এই সাত দিনে নোয়াজেল অতি অসম্ভব রকম কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, সে স্ত্রীকে বলিল,—

"তোমার বন্ধুর হার গাছি তো ফিরিয়ে দেবার উপায় আমাদেরই করতে হবে।"

হারের কৌটাটিতে যে জহুরির নাম ছিল, পরদিন নোয়াজেল সস্ত্রীক তাহার নিকটে গেল। সে খাতা পত্র সব দেখিয়া বলিল,—হার তো আমি বিক্রী করি নি।"

তৎপরে স্মৃতির সাহায্যে সেইরূপ এক গাছি হার ক্রয় করিবার জন্য নোয়াজেল দম্পতি অনেক জহুরীর

দোকানে ঘুরিল। দুঃখে, কষ্টে, বিরক্তিতে তাহাদের মন ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে এক দোকানে ঠিক সেইরূপ একছড়া হার দেখিতে পাইল। তাহার দাম চাহিল চল্লিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক, ছত্রিশ হাজারের কমে তাহা পাওয়া যাইবে না।

জহুরীকে অনেক মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের জন্য সেই হার গাছি রাখিতে তাহারা অনেক অনুরোধ করিল। দোকানদার সম্মত হইলে তাহার সঙ্গে ঠিক হইল যে তাহারা এই সাত দিনের মধ্যেই হার কিনিয়া লইবে, কিন্তু যদি এই মাসের মধ্যে তাহাদের হারোনো হার গাছি পায়, তাহা হইলে এই নূতন হার দোকানদার ৩৪ হাজার ফ্র্যাঙ্কে কিনিয়া নিবে।

নোয়াজেলের পৈত্রিক সম্পত্তি মাত্র ১৮ হাজার ফ্র্যাঙ্কের ছিল, বাকি ১৮ হাজার ঋণ করিতে হইবে।

এক মহাজনের নিকট এক হাজার, আর একজনের নিকট পাঁচ শত ফ্র্যাঙ্ক, এখানে দশ লুই, সেখানে পাঁচ লুই এমনি করিয়া সে ঋণ করিতে লাগিল। কত জায়গায় হ্যাণ্ড্ নোট্ লিখিয়া দিল, সমস্ত কুসীদজীবী মহাজনদের নিকট হইতেই সে ঋণ গ্রহণ করিল। পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা না ভাবিয়াও ঋণ লইল, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটাই সে বন্ধক দিল! ভাবী দুঃখ, দারিদ্র্য এবং আমরণ শারীরিক ও মানসিক তীব্র যন্ত্রণার বিষয় ভাবিবার অবসর তখন তাহার ছিল না। সে নির্দ্ধারিত দিবসে দোকানদারের হস্তে ছত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিয়া সেই নূতন হীরার হার গাছি লইয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী যখন ঐ হার গাছি বন্ধুকে ফেরত দিতে গেল, তখন ফরেষ্টিয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "আরো আগে তোমার ইহা ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। যদি আমার দরকার হ'ত!"

কিন্তু নোয়াজেল-পত্নী যে আশঙ্কা করিয়াছিল,—ফরেষ্টিয়ে তাহা জানিতে পারিল না, হারের কৌটাটি সে খুলিয়াও দেখিল না। বদল জানিতে পারিলে সে কি মনে করিত!—আর বলিতই বা কি, মনে মনে তাহাকে চোর বলিয়া ধারণা করিত নাকি?

নোয়াজেল-দম্পতি এখন কপর্দ্দকহীন দরিদ্র। দারিদ্র্য-জীবন যে কিরূপ ভারবহ তাহা এখন উহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, কিন্তু কি করিবে—অদৃষ্ট-চক্রের ফেরে পড়িয়া নির্ভয়ে এই দুঃখ দৈন্যের বোঝা বহন করিতে লাগিল। এই অত্যধিক ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে!

তাহারা চাকর দাসী বিদায় করিয়া দিল, বাসা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য একটি ছোট ঘরে বাস করিতে লাগিল। সংসারের যাবতীয় গুরুভার কার্য্য স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিল। রন্ধন-শালার সমস্ত কার্য্য, থালা বাটি প্রভৃতি মাজা, ময়লা কাপড়, জামা, বিছানা প্রভৃতি সাবান দিয়া ধৌত করা, রৌদ্রে শুকানো, তোলা সমস্তই তাহাকে স্বহস্তে করিতে হইত। সে প্রতিদিন প্রাতে অতি কষ্টের সহিত নোংরা জল রাস্তায় নামাইয়া আনিত এবং অতি কষ্টের সহিত জল তুলিত। সামান্য স্ত্রীলোকের মত পরিচ্ছদ পরিয়া চুপ্‌ড়ি হাতে করিয়া বাজারে যাইত এবং ফলওয়ালা, মুদী, মৎস্য ও মাংসবিক্রেতার নিকট দরদস্তুরি লইয়া অপমানিত হইয়াও নিজের এত কষ্টের অর্থ বাঁচাইতে চেষ্টা করিত।

প্রতি মাসেই কিছু কিছু করিয়া তাহাদের ঋণ শোধ হইতে লাগিল।

নোয়াজেল আপিসের পর সন্ধ্যাকালে এক দোকানদারের হিসাব পত্র লিখিত এবং বেশি রাত্রে গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করিয়া নকল করিয়া দিত। এইরূপে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া সে অর্থ উপার্জ্জন করিত।

এই ভাবে তাহাদের জীবনের দশটি বৎসর অতিবাহিত হইল।

এত দিনের কষ্ট ও পরিশ্রমের ফলে আজ তাহারা ঋণমুক্ত হইল।

ম্যাডাম নোয়াজেলকে এখন বৃদ্ধার মতই দেখাইত। সে এখন দীন দরিদ্রের স্ত্রী—তাহার শরীর শক্ত, কঠোর, কেশপাশ রুক্ষ, পরিচ্ছদ যৎসামান্য, অশোভন। কঠিন হস্তে বড়-বড় জলের বাল্‌তি তুলিয়া সে ঘরের মেঝে ধুইতে ধুইতে কত কথাই বলিত। তাহার স্বামী আপিসে গেলে কোনো কোনো দিন বসিয়া বসিয়া একান্ত মনে কত

কথাই ভাবিত—সেই আনন্দোৎফুল্ল রজনী, সেই নৃত্যোৎসব, সেই আদর, সেই সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব, কত কথাই তাহার মনে হইত! ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়-সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিত!

হায়! সে যদি সেই হার গাছি না হারাইত! তাহা হইলে তাহার জীবনের গতি কোন্ দিকে ফিরিত কে জানে? জীবনটা কি পরিবর্ত্তনশীল! কি প্রহেলিকাময়! মরণ বাঁচনে কতটুকু প্রভেদ!

৫

রবিবার, গুরু পরিশ্রমে অবসন্ন হৃদয়কে একটু প্রফুল্ল করিবার মানসে সপ্তাহান্তে ম্যাডাম নোয়াজেল একটি পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছে। ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই হোক্ আর নির্ম্মল বায়ু সেবন অথবা পরিচিত বন্ধু বান্ধব-সন্দর্শন-মানসেই হোক্ তথায় লোক সমাগম নিতান্ত কম হয় নাই। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটি মহিলাকে দেখিয়া ম্যাডাম নোয়াজেলের গতি রুদ্ধ হইল। সে একদৃষ্টে সেই মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ফরেষ্টিয়ে;—এখনো যৌবনোদ্দীপ্ত, এখনো সৌন্দর্য্যোৎফুল্ল, এখনো নয়ন-মন-মুগ্ধকারিণী!

ম্যাডাম নোয়াজেলের হৃদয়-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তাহার বাল্যসখীর সহিত আলাপ করিবে কি? কেন করিবে না?—নিশ্চয়ই করিবে। এখন তো সে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইয়াছে। তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সে কম্পিত বক্ষে সখীর দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সখী ভালো আছ তো?"

ফরেষ্টিয়ে একজন প্রৌঢ়ার মুখে এমন সম্বোধন শুনিয়া বিস্মিত হইল, চিনিতে না পারিয়া ধরা গলায় একটু জড়িতস্বরে বলিল,—

"ম্যাডাম্, আমিতো আপনাকে চিন্‌তে পারচি নে, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।"

—"নিশ্চয়ই না, আমি মথিল্‌ডি নোয়াজেল।"

—"ওঃ—আমার মথিল্‌ডি, তোমার চেহারার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!"

—"হাঁ—তোমার সহিত শেষ দেখার পর হ'তে আমার বড় কষ্টের, বড় দৈন্যের, বড় দুরদৃষ্টের দিন গেছে,—আর সে কষ্ট শুধু তোমারি জন্য।"

—"এঁ! বল কি, আমারি জন্য? কিসে?"

—"তোমার কি মনে আছে যে সেই মন্ত্রী বাড়ির নিমন্ত্রণের দিন আমি তোমার নিকট হ'তে এক ছড়া হার নিয়েছিলুম?"

—"তুমি কি পাগল হয়েছ?—সে হারতো তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

—"ঠিক সেই হারের মতো আর একছড়া হার কিনে দিয়েছিলুম। এই দশ বছর ধ'রে সেই হারের দেনা শোধ করেছি। তুমি সহজেই বুঝতে পার যে আমাদের মত গরীবের পক্ষে উহা কত কষ্টকর! যা হোক্, এখন আমরা সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হয়ে বেশ সুখে আছি।"

—"তুমি কি বল্‌চ? আমার সেই হারের বদলে এক ছড়া হীরের হার কিনে দিয়েছ?"

—"হাঁ, তা বুঝি তুমি ধরতে পারনি? দু ছড়া হারই দেখতে ঠিক এক রকম!"

তাহার অধরে সরল গর্ব্বের আনন্দ-রেখা ভাসিয়া উঠিল।

তখন ফরেষ্টিয়ে অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কম্পিত হৃদয়ে অনুতাপ ও সহানুভূতি মিশ্রিত স্বরে সখীর হাত ধরিয়া বলিল,—

"হায়, মথিল্‌ডি, আমাদের সে হার যে ঝুটো! তার দাম তো পাঁচ শো ফ্রাঙ্কের বেশি নয়।"*

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

গৃহজাত শাক সবজির বাগান।

পুরাকালের ঋষিগণের তপোবন-আশ্রমের বিষয় পাঠ করিতে করিতে আমাদের চক্ষে নয়নাভিরাম, শ্যামল বৃক্ষলতা ও পত্র পুষ্পের মনোরম দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জিতেন্দ্রিয় তাপসগণ ফলমূল আহার করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতেন, সুতরাং ঋষিপত্নীগণ বা তাঁহাদের কুমারী

---

* গীদে মোপাসার ফরাসী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে।

দুহিতাগণ আশ্রম সন্নিহিত পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে নানাপ্রকার ফল, মূল, পুষ্প প্রভৃতি বৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়া, প্রত্যহ জল সেচন প্রভৃতি কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন, এবং তাঁহারা ঐ কার্য্যে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। বস্তুতঃ সেই সকল স্বহস্তরোপিত বৃক্ষরাজির প্রতি তাঁহাদের সন্তানতুল্য স্নেহ যত্ন প্রদর্শিত হইত।

শকুন্তলা পতিগৃহে গমন কালে, স্বীয় যত্নে বর্দ্ধিত বৃক্ষ লতাদির বিরহ বেদনা স্মরণ করিয়া আকুল হইয়াছিলেন; রমণীর কোমল হৃদয়ে, সুকোমল পত্র, পুষ্প, বৃক্ষলতার প্রতি এবংবিধ অনুরাগ অতীব সুদৃশ্য। এই সমস্ত পত্র পুষ্প, বৃক্ষলতা যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ, তেমনি গার্হস্থ্য জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে শাকসব্জি নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য। যদিও এই সকল আমরা ক্রয় করিতে পাই, তথাপি গৃহস্থের গৃহে এ সমস্ত বৃক্ষ লতা রোপণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহান্তে 'হাট' ছাড়া শাকসব্জি বা কোন ও তরকারী পাওয়া যায় না। হয় তো অসময়ে কোনও অতিথি অভ্যাগত গৃহে উপস্থিত হইলে বিপদে পড়িতে হয়। সেই সময় গৃহজাত শাক সব্জির উপকারিতা সম্যক অনুভব করা যায়। তাহা ছাড়া সকল স্থানে সব জিনিস কিনিতেও পাওয়া যায় না, অতএব গৃহস্থের বাটীসংলগ্ন ভূমিখণ্ড পরিষ্কৃত করিয়া উপাদেয় শাক, সব্জি, ফল পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করা উচিত। কার্য্যব্যপদেশে যাঁহারা প্রবাসে অস্থায়ী ভাবে দিন যাপন করেন, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশে, স্বগ্রামে নিজবাটীতে প্রত্যেক গৃহীরই ঐরূপ সুবিধা থাকা সম্ভব। অতীতের আদর্শ অনুকরণ করিয়া (যাহার যতটুকু স্থান আছে) প্রত্যেক বঙ্গমহিলারই এই প্রয়োজনীয় অথচ আনন্দদায়ক কার্য্যে মনোযোগী হওয়া উচিত।

নিজ হস্তে বীজ রোপণ করিয়া, স্বহস্তে সযত্নে জল সেচন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া কালে যখন সেই বৃক্ষ ফলবান হয়, তখন যে কি আনন্দ অনুভূত হয় তাহা অবর্ণনীয়। সেই দ্রব্য পাঁচ জনকে দেখাইয়া, খাওয়াইয়া, নিজে উপভোগ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়। ধনীর পক্ষে, গৃহস্থের পক্ষে ইহা আনন্দের বিষয়, নির্ধনের পক্ষে বিশেষ লাভজনক। এতদ্ব্যতীত ঐই উপলক্ষে বাটীর পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ড পরিষ্কৃত ও সার্থক হয়। অনেকের বাটীতে এমন স্থান আছে, কিন্তু গৃহস্থের দৃষ্টি না থাকায় আবর্জ্জনাময় জঙ্গল হইয়া সাপের বাসভূমিতে পরিণত হইয়া থাকে। পুরুষেরা বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, যদি সেই সব স্থান অন্তঃপুর সীমায় হয় তাহা হইলে সুগৃহিণী তাহা পরিষ্কার করাইয়া শাকসব্জি; ফল পুষ্পের মনোরম বাগান প্রস্তুত করিতে পারেন, অথবা কুমারী কন্যাদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া করাইতে পারেন। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহা একটী বিশেষ শিক্ষারূপে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে আর অধিক লেখা বাহুল্য। এক্ষণে কোন্ শাকসব্জি কোন্ সময় রোপণ ও বর্দ্ধিত করা যায় তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যে জমিতে বাগান করিতে হইবে, তাহার মাটী উর্ব্বরা কিনা। সাধারণতঃ জমি তিন প্রকার—বেলে মাটী, আঁঠাল মাটী ও পাথুরে মাটী। এক এক ফল শস্যের জন্য এক এক রকম মাটী প্রস্তুত করিতে হয়। যাহা দ্বারা মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হয় তাহাকে "সার" বলে। সার নানা প্রকার। জমিতে পচা গোবর ও খৈল দিয়া এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়, লতা পাতা পচিয়াও উত্তম সার হয়। কফি আলু প্রভৃতি বিলাতি তরকারীতে মানুষ ও পশু পক্ষীর মল দ্বারা সার প্রস্তুত করিবার নিয়ম আছে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে তাহা সম্ভব হয় না। স্থানান্তরে ইহার জন্য ভিন্ন রকম সারের বিষয় লিখিত হইল। এই সকল ব্যতীত পলিমাটীর জমিও উত্তম। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়া যায়, অনেক গৃহস্থের বাটীতেও জল উঠে; জমিতে জল উঠিবার পর জল নামিয়া গেলে দুধের সরের মত এক প্রকার মাটীর সর পড়ে, বর্ষাকালের জলে যে মাটী ও অন্যান্য পদার্থ ধুইয়া আসে ঐ সর খানিতে তাই থাকে। ঐ সর যে জমিতে পড়ে তাহাকে পলিমাটী বলে।

পলিমাটীর ভূমিতে আর কিছু সার দিতে হয় না। কারণ বন্যার জলের সঙ্গে মাটী, লবণ, গন্ধক, চুণ ইত্যাদি উদ্ভিদের অনেক খাদ্য ধুইয়া আসে।

দ্বিতীয়তঃ বাতাস, রৌদ্র ও জল এই তিন পদার্থ গাছের জীবন, ঐ তিন বস্তু যেন নিরাপদে ভোগ করিতে পায় এরূপ স্থলে বৃক্ষ রোপণ কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ শাক-সব্‌জি বৎসরে দুইবার জন্মে—বর্ষাতে ও চৈত্রে। বর্ষা-কালে যে শাকসবজির বাগান করিতে হইবে সেখানে বর্ষার জল যেন না দাঁড়ায়-অর্থাৎ বদ্ধ হইয়া না থাকে।

কোন্ মাসে কোন্ শাক-সব্জির বীজ রোপিতে হয় তাহা ধারাবাহিক রূপে নীচে লিখিত হইল। পচা গোবরের সার দ্বারা জমি প্রস্তুত করাইয়া কোদালি দ্বারা সামান্য মাটী আল্‌গা করিয়া নিম্নলিখিত বীজ রোপণ করা যাইতে পারে।

বৈশাখ—এই মাসে ২।১ দিন বৃষ্টি হওয়ার পর, লাউ, কুমড়া, শসা, বরবটী, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, আদা, আম-আদা প্রভৃতি সবজীর বীজ রোপিত হয়। কুমড়া—বর্ষাতি, বড় ও ছোট জাতীয়,—মাচা করিয়া দিলেই ভাল হয়, ভুঁয়েও হয়। অল্পস্থানে অবলম্বন অর্থাৎ মাচা করিয়া দিলেই তাহার উপর প্রয়োজন মত লতা বিস্তার করিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বৈশাখ মাসে একবার লাউয়ের বীজ রোপিত হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থলে জল নামিয়া গেলে ভাদ্র মাসে পলিমাটী পাইয়া লাউ বীজ রোপণ করে, চারা বাহির হওয়ার পর গাছের গোড়ায় পচা গোবরের সার দিয়া রাখিলে ভাল হয়, সম্মুখে নালা কাটিয়া জল দেওয়া উচিত, যেন গোড়ায় স্থিত সার ধুইয়া না যায়। গাছে পোকা ধরিলে, বাসি ছাই, বাসি হুঁকার জল উপকারী।

ঝিঙ্গা—ভুঁয়ে ও পালা। ভুঁয়ে ঝিঙ্গার লতা মাটীতেই বিস্তৃত হয়। পালার লতা বড় হইলে অবলম্বন বা মাচা আবশ্যক।

চিচিঙ্গা—ঝিঙ্গা জাতীয় সবজী, লতা বাড়িলে মাচা করিয়া দিবে।

কাঁকুর—বড় ও ছোট জাতীয়। ঐরূপ মাচা দরকার।

ঢ্যাঁড়স—লম্বা লম্বা গাছ হইবে, এক সারি করিয়া বীজ রোপণ করিলে ভাল হয়।

শসা—ভুঁয়ে ও পালা। দোঁয়াশ মৃত্তিকাতেই প্রশস্ত, পলিতেও ভাল হয়।

শাঁকআলু—মাটীর নীচে আলু হইবে, ভুঁয়ে লতা বিস্তৃত হয়। ইহার পাতা শাক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বরবটী—লতা বৃক্ষ, লম্বা ও লাল, দানা দুই প্রকার।

আদা, আমআদা—মাটীর নীচে হইবে, দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়।

মানকচু, মুখীকচু—পুরাতন কচু তুলিলে তাহার শিকড় হইতে চারা বাহির হয়। সেই চারা রোপিতে হয়। মুখী কাটাইয়াও রোপণ চলে। কচুর শাকও উপাদেয় ব্যঞ্জন। এতদ্ব্যতীত পুঁই শাক, নটেশাক, এই মাসে বুনিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে প্রায় কোন বীজ রোপণ করিতে হয় না, তবে অনাবৃষ্টি বা কোন কারণ বশতঃ যদি উক্ত বীজ সকল বৈশাখ মাসে রোপিত না হয়, তবে জ্যৈষ্ঠের প্রথমে রোপণ করা যাইতে পারে। সজিনার ডাল এই মাসে রোপণ করিতে হয়, ইহার শাক, ফুল ও খাঁড়া উত্তম সবজী। বৈশাখের রোপিত বীজে এই মাসে চারা বাহির হয়। এস্থলে জল সেচন প্রণালী সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক, বীজ রোপণ করিবার পরে যদি বৃষ্টি না হয়, প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা জল ছিটাইয়া বীজ-রোপিত মাটী ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। মাটী শক্ত হইয়া যেন চারা উঠিবার বাধা না হয় অথবা চারা উঠিলে যেন রৌদ্রতপ্ত হইয়া মরিয়া না যায়। জল গোড়ায় সজোরে ঢালা উচিত নয়, কচি চারার গোড়া নড়িয়া যাইতে পারে। পয়োনালী করিতে পারিলে ভাল, নতুবা টিন বা মাটীর হাঁড়ির তলা শতচ্ছিদ্র ঝাঁঝারি করিয়া তাহার দ্বারা জল দিলে সুবিধা হয়।

আষাঢ়—এই মাসে সীমের বীজ রোপিত হয়। ইহাও তিন চারি জাতীয়, সাদা সাধারণ, সাদা মাখন সীম, সবুজ, বাঘনখা, হাতিকাণ। ইহাও লতা বৃক্ষ, বড় হইলে মাচা দেওয়া দরকার।

শ্রাবণ—এই মাসে বৈশাখের রোপিত বৃক্ষ ফলবান হয়, গৃহস্থের শাক সব্‌জির বাগানে, শসা, ঝিঙ্গা, কুমড়া প্রভৃতি ঝুলিয়া নয়নানন্দদায়ক হয়। এই মাসের শেষে লঙ্কা, বেগুন ও টমাটো বা বিলাতি বেগুনের চারা করিতে হয়। প্রথমতঃ মাটীপূর্ণ একটী মাটীর টবে ইহাদের বীজ রোপণ করিয়া রাত্রে শিশিরে ও দিনে ছায়ায় রাখিলে ভাল হয়, অল্প অল্প জলে টবটী ভিজাইয়া রাখা উচিত। চারা বাহির হইলে ভাদ্র মাসে চারাগুলি গোড়ার মাটী সহিত তুলিয়া সার দেওয়া ভূমিতে আধ হাত খনন করিয়া ঐ চারা গোবরের জলে ডুবাইয়া রোপণ করিতে হইবে। যেন বড় হইয়া একটীর গায় আর একটী লাগিতে না পারে এমন দূরে রোপণ করা উচিত। ৮।১০ দিন পর গোড়ায় মাটী খুঁড়িয়া দিলে বৃক্ষ সকল সতেজ ও সুফলবান হয়।

লঙ্কা—সূর্য্যমুখী, পাটনাই, বাম্বলা, কামরাঙ্গা, কৃষ্ণচূড়া ধানী।

বেগুন—আউসে, আমুনে, কুলি, সিঙ্গে বিলাতি বেগুন বা টমাটো। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমোদবালা সেন।

রাণী সাধনা।

আসাম প্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। উত্তরে গিরিরাজ হিমাচল অভ্রভেদী মস্তক সমুন্নত করিয়া অবস্থিত। মধ্যদেশে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়-শ্রেণী। উভয়ের মধ্যে নদরাজ ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া পরশুরাম-কুণ্ড স্পর্শ করিয়া সাগর উদ্দেশে ধাবমান। তাহার উভয় পার্শ্বে আম্র, পনস, তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি ফল মূল ও শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত আসাম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা-পুষ্প পরিশোভিত প্রাকৃতিক উদ্যান সেই উপত্যকা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে যে সকল নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দৃষ্টি গোচর হয় তাহা দেখিলে ভূগোলে উল্লিখিত আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেরি, সাবানা, শিল্বা প্রভৃতি জঙ্গলের কথা মনে পড়ে। ঐ সকল জঙ্গল আবার হস্তী ও নানাজাতীয় ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জীবে পরিপূর্ণ। নানাজাতীয় বিহঙ্গে সতত কানন প্রদেশ মুখরিত। এইসব দেখিয়া মনে হয় প্রকৃতি দেবী যেন আপনার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য লইয়া এ প্রদেশে বিরাজিতা। এখানে দেবস্থানের অভাব নাই,—কামাখ্যা, পরশুরাম-কুণ্ড, হয়গ্রীবমাধব, বশিষ্ঠ, উমানন্দ, চণ্ডিকা প্রভৃতি শত শত দেবালয় এদেশে অবস্থিত। প্রত্যেক পাহাড়, প্রত্যেক শিলাখণ্ড দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রাচীন-কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। এদেশে বীর-কীর্ত্তির অভাব নাই,—নরকাসুর, ভগদত্ত, বাণ, ভীষ্মক, ঘটোৎকচ, হিড়িম্ব প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের বীরত্ব কীর্ত্তি এবং গদাপানি, চন্দ্রকান্ত সিংহ জঙ্গল বলহু প্রভৃতি আহোম-রাজগণের ও মণিরাম দেওয়ান প্রভৃতি ব্যক্তিগণের বীরত্ব-কীর্ত্তিতে আসাম ইতিহাস পরিপূর্ণ। ভূগর্ভ হইতে কতশত তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন রাজগণের দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। প্রাকৃতিক নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও শিলাখণ্ডগুলি ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ তপস্যা করিয়া এ প্রদেশ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ এখান হইতে রুক্মিণীকে ও স্বীয় পৌত্র অনিরুদ্ধের জন্য বাণদুহিতা ঊষাকে গ্রহণ করিয়া ধন্য করিয়াছেন; সকল দিকে ইহা যেমন প্রসিদ্ধি লাভ, করিয়াছে রমণীর সতীত্ব গৌরবেও ইহা সেইরূপ গৌরবান্বিত। রাণী জয়মতীর কথা বোধ হয় সকলেই জানেন; আজ আমরা আর একজন সতীর বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। এই সাধ্বীর নাম সাধনা,—ইনি আসামের প্রসিদ্ধ চুটিয়া রাজ বংশোদ্ভুত।

এখানে চুটিয়া রাজ বংশের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সুবর্ণশ্রী লক্ষীমপুর জিলার একটী সুপ্রসিদ্ধ নদী। পূর্ব্বে ইহার সৈকতে ও বালিতে সুবর্ণ পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম সুবর্ণশ্রী হয়। উক্ত নদীর উভয় তীরে চুটিয়া জাতি বাস করিত। ইহারা আসামের আদিম অধিবাসী। সুবর্ণশ্রীর তীরবর্ত্তী স্বর্ণগুড়ী নামক

একটী গ্রামে একটি বৃহৎ ছুটিয়া পরিবার বাস করিত। বীরবল উক্ত পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। উক্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল বলিয়া সর্ব্বদাই পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত। কিন্তু চিরকাল সমান যায় না। একদিন বীরবল স্বপ্নাদেশে আদিষ্ট হইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানা ঢাল, একখানা তরবারি এবং একটী সুবর্ণ মার্জ্জার প্রাপ্ত হন। সেইদিন হইতে উক্ত পরিবারের মধ্যে সুখ-শান্তির আবির্ভাব হয়। বীরবল এই সম্পত্তি কুবের দত্ত বলিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতেন। পত্নী রূপবতীর গর্ভে বীরবলের সুলক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বীরবল তাহার নাম গৌরনারায়ণ রাখেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরনারায়ণের বুদ্ধি, কৌশল, বীরত্ব ও সাহস পরিবর্দ্ধিত হইলে ছুটিয়াগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। গৌরনারায়ণ ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ জনপদসমূহ স্ববশে আনয়ন করিয়া আহোম রাজের বিরুদ্ধে আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি "রত্নধ্বজ পাল" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া ১২২৩ খৃঃ অঃ ছুটিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইনিই ছুটিয়া বংশের প্রথম রাজা ও ছুটিয়া রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা। ইনি কমতাপুরাধিপতি নীলধ্বজকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়ধ্বজের জন্য তৎকন্যা গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর নামক এক রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার গৃহে কনিষ্ঠপুত্রকে শিক্ষার্থে রাখিয়া দেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া একটী নূতন নগর নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, যে তাঁহার সেই কনিষ্ঠ পুত্রটী ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। গৌড়েশ্বর রত্নধ্বজ সযত্নে শব ছুটিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। রত্ন-ধ্বজ পাল মৃতপুত্রের শব পাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন এবং সেই নূতন নগরীতে মৃত শবটীকে গোর দিয়া তাহার নাম "পাল-শ-দিয়া" রাখিলেন। সেই "পাল-শ-দিয়া"নাম হইতে বর্ত্তমান "শদিয়া" বা "সদিয়া" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রত্নধ্বজ পালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিজয়ধ্বজ পাল ১৩০৩ খৃঃ অব্দে ছুটিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পরে ক্রমান্বয়ে উক্ত বংশের বিক্রমধ্বজ পাল, গরুড়ধ্বজ পাল, শঙ্খধ্বজ পাল, ময়ূরধ্বজ পাল, জয়ধ্বজ পাল এবং কর্ম্মধ্বজ পাল ছুটিয়া সিংহাসনাসীন হইয়া নিরাপদে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কর্ম্মধ্বজের পর তৎপুত্র ধর্ম্মধ্বজ পাল সিংহাসন আরোহণ করেন। ইঁনি ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন; প্রথমে ইঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না; সেই জন্যই মহিষী লীলাবতী সহ অনেক দেবদেবীর পূজা আরাধনা করেন, এবং অনেক সময় সৎকার্য্যে যাপন করেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর বৃদ্ধ বয়সে লীলাবতী একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন। অনেক সাধনার ধন বলিয়া কন্যার নাম হয় সাধনা।

সাধনা রাজসুখে দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার রূপলাবণ্যে রাজপুরী আলোকিত করিয়া তুলিল। রাজা পুত্রবৎপালিতা কন্যার শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে সাধনা যৌবনে পদার্পণ করিলেন; রাজা তাঁহার বিবাহ লইয়া মহা ভাবনায় পতিত হইলেন। তাঁহার সাধ, এই বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পাত্রে সাধনা-রত্ন সমর্পণ করিয়া তাহারই উপর এই দুর্ব্বহ রাজ্য-ভার অর্পণ করতঃ অবশিষ্ট কাল ভগবৎ সেবায় কর্ত্তন করিবেন; কিন্তু উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়, তাহার কোন কূল কিনারা করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপুত্র, মন্ত্রী-পুত্র, সেনাপতি-পুত্র এবং দেশস্থ ভদ্রসন্তানগণ সাধনার রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা কাহাকেও নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিলেন না। একদিন তিনি একাকী নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই "পাল-শ-দিয়া" গোরস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিতে পাইলেন যে একটী কাষ্ঠ-মার্জ্জার (কাঠবিড়াল?) সেই গোরস্থানের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে; রাজা স্বয়ং তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ স্থির করিলেন, যে ব্যক্তি একটী শরদ্বারা এই

কাষ্ঠ মার্জ্জারকে বিদ্ধ করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞাত জাতি-ধর্ম্ম বা নীচ জাতীয় হইলেও স্বয়ম্বর স্থলে সাধনা রত্ন লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করতঃ সেই কাষ্ঠ মার্জ্জার রক্ষার্থে লোক নিযুক্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন রাজ সভায় বসিয়া মন্ত্রিগণ সহ সাধনার স্বয়ম্বরের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং দিন ধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দিকে সে কথা রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। স্বয়ম্বর স্থান প্রস্তুত হইল।

আজ রাজপুরীতে মহা ধূমধাম। পুরী নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছে। অনেক রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানগণ সেই স্বয়ম্বরে উপস্থিত। সকলেই সাধনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছেন যে এই মহারত্ন না জানি কার ভাগ্যে লাভ হয়? একে একে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের রাজগণের ন্যায় মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। দ্রুপদের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজ পাল নৈরাশ্য বেদনা অনুরোধ করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। রাজমন্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, রাজা হউক প্রজা হউক, যে কেহ এই কাষ্ঠমার্জ্জার বিদ্ধ করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিকে জাতি ধর্ম্ম বিচার না করিয়া সাধনা সমর্পণ করা যাইবে। অবশেষে দর্শকমণ্ডলীর একপার্শ্ব হইতে নিতাই নামক একটী গোরক্ষক তাহার প্রিয়তম বন্ধু নালিয়ার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নিজের শিকারী ধনুখানা হাতে করিয়া অগ্রসর হইল। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল এবং রাজাদিগের রোষকষায়িত দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। নিতাইর সাহস হইল না—সে পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু রাজমন্ত্রীর উৎসাহে আবার উৎসাহিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া শর নিক্ষেপ করিল,—ভগবানের ইচ্ছায় কাষ্ঠমার্জ্জার বিদ্ধ হইয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী মাথা হেট করিলেন। অন্তঃপুরে একটী বিষাদের রেখা পতিত হইল, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজ স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অটল রহিলেন। অবশেষে সালঙ্কৃতা সুশিক্ষিতা ও উজ্জ্বলকান্তিশালিনী সাধনা পিতৃসত্য রক্ষার্থ পুষ্পমাল্য হস্তে মরাল গমনে নিতাইর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে নিষেধ বাক্য উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রলোভন দেখান হইল; কিন্তু সাধনা কিছুতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রৌপদীর ন্যায় পিতৃ-সম্মান রক্ষার্থ নিতাইর মস্তকে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সকলে ধর্ম্মধ্বজের বীরত্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মধ্বজ পাল মহা সমারোহে বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সেই সভা সমক্ষে স্বীয় রাজমুকুট ও কুবেরদত্ত সম্পত্তি নিতাইকে সমর্পণ করিলেন এবং নীতিপাল নাম দিয়া রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়াদিলেন যে, অদ্য হইতে আমার জামাতা নীতিপাল ছুটিয়া রাজ্যের রাজা, আমি অবশিষ্ট কাল দেব সেবায় যাপন করিব। এই বলিয়া নীতিপালকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতঃ রাজ্য শাসনের দুর্ব্বহ ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং প্রজাবর্গের মন বিষাদক্লিষ্ট করিয়া রাজমহিষী সহ ধর্ম্মধ্বজ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নীতিপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিলেন। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে তাঁহার সেই পূর্ব্ব সঙ্গীদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী কত বুঝাইলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির মত হইল। রাজ্যে নানা প্রকার অন্যায় আচরণ আচরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বসাধারণ নীতিপালের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। আবার তিনি কুচক্রী সঙ্গীদিগের কথা শুনিয়া রাজকার্য্যোপলক্ষে একদল যুদ্ধ-বেশী সৈন্য প্রধান সেনাপতির অধীনে অন্যান্য স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন; তাহারা রাজধানী সদিয়া হইতে যাত্রা করিয়া আহোম রাজ্যের অভিমুখে উপস্থিত হইল। সেইস্থানে জনৈক আহোম রাজখোয়ার (বিভাগীয় শাসনকর্ত্তার) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আহোম রাজের বিনানুমতিতে যুদ্ধবেশে পররাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করায় উক্ত রাজখোয়ার সঙ্গে নীতিপালের লোকদিগের যুদ্ধ ঘটে (১৫০০ খৃঃ অঃ)। সেই যুদ্ধে ছুটিয়া সেনাপতি পরাস্ত ও বন্দী হইয়া আহোম রাজধানীতে

প্রেরিত হন। তৎকালে স্বর্গদেব চুহুংমুং আহোম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংবাদে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি কঞ্চেঙ্গকে তিনি সসৈন্যে ছুটিয়া রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি সন্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়, তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাধনা রাণী এবং কুবের দত্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া সন্ধি করিবে। কঞ্চেঙ্গ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ছুটিয়া রাজ্য আক্রমণ করতঃ সদিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। নীতিপাল অনন্যোপায় হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কঞ্চেঙ্গ আলাউদ্দিনের ন্যায় বলিয়া বসিলেন যে, যদি রাণী সাধনা এবং কুবেরদত্ত সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদত্ত হয় তবে তিনি সন্ধি করিতে সম্মত আছেন। জীবন থাকিতে কে এই কথা সহ্য করিতে পারে? নীতিপাল মহারাণা ভীম সিংহের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সপরিবারে চন্দনগিরি দুর্গে আশ্রয় লইলেন। আবার যুদ্ধ বাজনা বাজিয়া উঠিল, ছুটিয়া আহোমে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর কঞ্চেঙ্গ জয় লাভ করিলেন; নীতিপাল ধরাশায়ী হইলেন। অবশেষে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রাণপণে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সাধনা রাণী ও কুবেরদত্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। সাধনা শত্রুহস্তে পতিতা হইলেন। এই সময় তাঁহার মনের বল ভিন্ন আপনার বলিবার কেহই ছিল না। সাধনা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর কঞ্চেঙ্গ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে রমণীর সতীত্ব মহামূল্য রত্ন বিবেচনা করিয়া তিনি রাজ্য ও পতিশোকে জর্জ্জরিত নশ্বর দেহের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সতীত্ব রক্ষার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কঞ্চেঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেই পুণ্যশীলা নারীকে ধরিতে তাঁহার ন্যায় নরপিশাচ সমর্থ হইল না; সাধনা কুবেরদত্ত পিতৃসম্পত্তি বুকে বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া জাতির স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

শ্রীআনন্দরাম চৌধুরী।

রাজা।*

এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ নাটক বাঙ্গালায় আর নাই। কেবল সাহিত্যের হিসাবে ইহার বিচার করিলে চলিবে না। ধর্ম্মান্বেষী সাধকের পক্ষে ইহা অমৃত তুল্য। বিভিন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট সাধক বিভিন্ন পন্থায় কিরূপ বিচিত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারেন কবি জীবন্ত ভাবে তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এইরূপ নাটক সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ইহার সমালোচনা করা বর্ত্তমান সময়ে কঠিন, তথাপি আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

রাজার মূল আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধ পুরাণ জাতক হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই গল্পটী এই ঃ—কান্যকুব্জে মাহেন্দ্রক নামে এক ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তাঁর একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। এক রাজকুমারের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হয়। রাজকুমার খুব কুৎসিত ছিলেন, কুমারকে দেখিয়া রাজকন্যার যদি অশ্রদ্ধা হয় এই ভয়ে অপর একজন সুন্দর পুরুষকে কুমার সাজাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়, মাটীর নীচে একটী অন্ধকার ঘর তৈয়ার করিয়া রাণীকে সেখানে রাখা হয়, এই অন্ধকার ঘরেই রাজার সহিত রাণী সুদর্শনার মিলন হইত। রাণী তাঁহার প্রিয় স্বামীর রূপ দর্শন করিতে ব্যাকুল হইলেন। শাশুড়ীর নিকট স্বামীকে দেখাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পাছে কুরূপ দেখিয়া তাঁহার মনে খেদ হয় এই ভয়ে শাশুড়ী রাজার এক রূপবান বৈমাত্রেয় ভাইকে রাজা সাজাইয়া সুদর্শনাকে দেখান। বৈমাত্রেয় ভাই সিংহাসনে বসিলেন, রাজা স্বয়ং তাঁহার ছত্রধর হইয়া পশ্চাতে দাড়াইলেন। রাণী কৃত্রিম রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া খুব খুসী হইলেন, কিন্তু ঐ কুৎসিত ছত্রধরকে দেখিয়া বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মোটা ঠোঁট, বিশাল ভুড়ি, বিকট মাথা, কুচ্ কুচে কাল রং দেখিয়া রাণীর বড়ই ঘৃণা হইল।

আর একদিন উদ্যানে বেড়াইবার সময় কুরূপ রাজাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া তিনি কৃত্রিম রাজাকে

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটক। মূল্য আট আনা।

বলিলেন, "হে স্বামি! তুমি ত বেশ সুন্দর, কিন্তু এই বিকট চেহারার ভৃত্যটাকে রাখিয়াছ কেন?"

এমন সময়ে উদ্যানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। রাজার অশেষ চেষ্টায় সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। প্রজাদের মুখে রাজার প্রশংসা আর ধরে না, তাহাদের কাছে রাণী রাজার চেহারার বর্ণনা শুনিতে পাইলেন। সকলেই বলিল, রাজা পরম প্রজা হিতৈষী কিন্তু তাঁহার চেহারা বড় বিকট। রাণী বুঝিতে পারিলেন সেই কুৎসিৎ ছত্রধারীই তাঁহার স্বামী। ইহা অবগত হইয়া সুদর্শনা মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। সুদর্শনা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। পার্শ্ববর্ত্তী সাত রাজা সুদর্শনাকে বিবাহ করিতে উপস্থিত হইল। সুদর্শনার পিতা কাহাকেও কন্যাদান করিলেন না। তখন সাত রাজা মিলিয়া কান্যকুব্জের রাজাকে আক্রমণ করিল। রাণীর স্বামী মাঝে মাঝে বাতায়নের ধারে বীণা বাজাইয়া সুদর্শনার মন গলাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া সাত রাজাকে পরাজিত করিলেন। তখন সুদর্শনা প্রসন্ন হইলেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিবার কালে জলের উপর নিজের ছায়া দেখিয়া স্বীয় কদর্য্যতায় ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র তাঁহাকে রূপ দান করেন।

এই গল্পটী অবলম্বন করিয়াই কবি রাজা লিখিয়াছেন। অবশ্য এই গল্পের সব দিকে যে মিল আছে তাহা নহে। এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশে যে উন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

বসন্ত উৎসব খুব বড় উৎসব। তাহাতে বিচিত্র রকমের লোকের সমাবেশ হইয়াছে। বাউল, দেশী, বিদেশী, পথিক সকলেই রাস্তায় উৎসব করিতে বাহির হইয়াছে। বিদেশী যারা এদেশী ধরণ ধারণে তাহাদের খাপ খাইতেছে না। এ খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি তাদের খেয়ে দেয়ে সুখ নেই। দিনরাত গা খিন্ খিন্ করছে। আর দেশী যারা তারাও কিছু বুঝিতেছে, কিছু বা বুঝিতে পারিতেছে না। তাদের রাজা লোকের সামনে বাহির হন না। তাই কেউ মনে করে সবটাই ফাঁকি। কেহ কেহ বলিল যে 'আসলে হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই।' আবার অনেকে বিদ্রোহের ভাবে রাজাকে অস্বীকার করিয়াও বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে উৎসব কিন্তু আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা রাজাকে স্বীকার করিতেছে আর যাহারা করিতেছে না, সকলেই এ উৎসবে বাহির হইয়াছে। রাজার বাগানে বসন্ত আসিয়াছে। চারিদিকে বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। এই উৎসবের মাঝ খানে যাহারা রাজাকে খোলা চোখে দেখিতে চায় তাদের ফাঁকি দিতে অনেকে কৃত্রিম রাজা সাজিয়া বাহির হইয়াছে। তাহারা নিজেদেরই আসল রাজা বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের এই ফাঁকি বেশীক্ষণ টিকিল না; কারণ লোকে মনে করিয়াছিল, রাজার কাছে প্রার্থনা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারিলেই মেকি রাজাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়। উৎসবের মাঝখানে এই গোলমাল চলিতেছে। অথচ ইহার মধ্যেই আনন্দ রহিয়াছে।

সকলেই এ উৎসবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। যে রাজার বাগানে উৎসব করিতে আসিয়াছে, তাহাকে মানিতেছে না। অথচ প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছে।

ইহার মধ্যে ঠাকুরদাই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই উৎসবের ভিতরকার রহস্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর আনন্দের যোগ রহিয়াছে অথচ তিনি সকলেরই অতীত। বাউলের দলে তিনি বাউল, আবার বালকের সঙ্গে তিনি বালকেরই মত সরল চিত্তে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

ছোট বড় বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্রতার মধ্যে তিনি সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়াও সম্পূর্ণ বিযুক্ত। সংসার ক্ষেত্রের আনন্দোৎসবের সকলের মাঝখানে থাকিয়া তিনি সবের মধ্যেই সব হইয়া রহিয়াছেন—অথচ তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। কি করিয়া এরূপ হইল? কারণ যাঁহাকে সকলেই সংশয় করিতেছে তাঁহাকে তিনি লাভ করিয়াছেন। তাই বিরোধ তাঁর কাছে ঠেকিতেছে না। সকল বিভিন্নতার মধ্যেও একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখ্‌বার দৃষ্টি তিনি লাভ

করিয়াছেন। তাই তাঁহার আনন্দ কোথাও বাধা পাইতেছে না। তাঁহার কাছে ঝরা ফুলেরও সঙ্গীত আছে। তিনি গান করিতেছেন—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে!
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌চে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।

তিনি জানেন যে সব সুরই ঠিক্‌ এক তানে মিলিবে। কোথাও তাঁর অধৈর্য্য নাই। নাগরিকেরা অধীর হইয়া যখন বল্‌তে লাগ্‌ল যে "আমরা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াব আমাদের রাজা নেই", ঠাকুর্দ্দা তখন হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাদের রাজা ত কারো কাণে ধরে বলচেন্‌ না 'আমি আছি।' তিনি বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই ত তোমাদেরই জন্য।" আমরা সর্ব্বদা মনে করি যে আমরা আছি, তিনি ত তার কোনও প্রতিবাদ করেন না। ঠাকুর্দ্দা জানেন যে এসব কথায় বিশেষ আসে যায় না, তাই তাঁকে এসব বিষয় আঘাত করিতেছে না। রাজার সঙ্গে তার অন্তরের যোগ রহিয়াছে বলিয়াই তিনি বাহিরে অবাধে মিলিতে পারিতেছেন। ঠাকুর্দ্দা সেই লোক—যিনি রাজাকে অন্তরে বাহিরে দুইদিক থেকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইয়াছেন। উৎসবের সজন কোলাহলের মধ্যেও পেয়েছেন, আবার নিভৃতে একলা অন্তরের অন্তরতম স্থানেও পাইয়াছেন। তিনি অন্তরে বাহিরে তাঁকে লাভ করিয়াছেন। ঠাকুর্দ্দাই গ্রন্থের মূল সুর। সর্ব্বাঙ্গহীন সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভের যে রূপ তাহার আদর্শ ঠাকুর্দ্দার চরিত্রে সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজাকে যে তিনি অন্তরে পাইয়াছেন তার পরিচয় কোথায়? বসিয়া বসিয়া মাথা খুড়িলে নয়। ভিতরে প্রেমের দ্বারা ভগবানের সহিত যেমনি যুক্ত হইতেছেন তেমনি তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সব বিচিত্র বিরুদ্ধতার মধ্যে তাঁর অখণ্ডরূপ দেখেন বলিয়া তিনি সকলের সঙ্গেই মিলিতে পারেন। ঠাকুর্দ্দার মত পূর্ণরূপের আদর্শ না থাকিলে সংসার পথে চলিবার প্রণালীটা সুস্পষ্ট দেখান যায় না। কোথাও বাধা নাই। মুক্তির একটী পূর্ণ সাধনা ঠাকুর্দ্দার চরিত্রে; কবি সেইটী দেখাইয়াছেন। বসন্তের মত বাইরে অতুল আনন্দের উচ্ছ্বাস অথচ—

"অন্তরে তার বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে নাইরে না।" মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়া গান জুড়িয়া নৃত্য করেন, 'তাইরে নাইরে নাইরে না।' যখন সব ফুরাইয়া যায়, শুকাইয়া যায়, তখন আমরা হা হুতাশ করি, কিন্তু ঠাকুর্দ্দা তখন রিক্ত হস্তে তালি দিয়া গান, "তাইরে নাইরে নাইরে না।" তাঁর কাছে কিছু শূন্য নহে। সুখ দুঃখ উভয়েই তাঁর সঙ্গীতকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। হাসি কান্না, ভাল মন্দ, জন্ম মৃত্যু এসব তাঁরই নৃত্যের তাল, সঙ্গীতের ছন্দ।

"হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ডালে;
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ।"

সব বৈপরীত্য ঠাকুর্দ্দার নিকট সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। মুক্তি ও বন্ধন, জন্ম ও মৃত্যু তাঁর সেই আনন্দের সঙ্গীতকেই বাজাইয়া তুলিতেছে। তিনি সেই আনন্দের পশ্চাতে নৃত্য করিয়া ছুটিতেছেন। ঠাকুর্দ্দার এই নৃত্য বৈরাগ্যের নৃত্য নহে। মিলন ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে এ নৃত্য অনির্ব্বচনীয় হইয়াছে। এইরূপ একটী চরিত্রের মিশ্রণে কবি আমাদের সাহিত্যকে অতুল সম্পদে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ মানব জীবনের চরম পরিণতির মূর্ত্তিকে, এমন সাহিত্য রসে, এমন বর্ণে, এমন সুরে এমন গানে অঙ্কিত করিতে জগতে আর কোনও কবি পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

কালীমোহন ঘোষ।

সাজঙ্গী।

উপন্যাস।

(১)

তিন দিন পরে আজ শীতের কুয়াসা-জাল ছিন্ন করিয়া সূর্য্যদেব উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিলেন, প্রচণ্ড শীতের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ছেলে মেয়েরা মহানন্দে বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয় দিনের রুদ্ধ গৃহদ্বার আজ মুক্ত দেখিয়া খোকাটী পর্য্যন্ত হাসিয়া কুটি কুটি। দরিদ্রা বালিকা দুটি মলিন বস্ত্রে দেহ অঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া আমাদের অশ্বথ তলায় পাতা কুড়াইতে আসিল। কয়দিন বৃষ্টির জন্য বুঝি আসিতে পারে নাই, তাই আজ বৃষ্টি ধরিতেই দুটী বোন তাহাদের ভাঙ্গা ঝুড়ি দুইটী দুলাইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে একবার চ্যুতফল কুলগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বড় বোন ছোটটীকে কি উপদেশ দিল জানি না, তারপর দুজনেই গোটা কতক কাচা কাচা কুল পাড়িয়া ও কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে অশ্বথ তলার দিকে চলিয়া গেল। আমরা তাহাদের গোপন-চেষ্টা দেখিয়া আর আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের সশঙ্ক করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইলাম না।

মধ্যাহ্ন আহারের পরে রৌদ্রে মাদুর পাতিয়া এক রাশ সেলাই লইয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় মৃণাল আসিয়া হাতের সেলাইটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "রক্ষা কর, আজ আর বাড়ী ভাল লাগছে না। এমন সুন্দর দিন বেড়াবার উপযুক্ত, এখন খানিক ঘুরে আসা যাক।" একটু আধটু আপত্তি করিয়া শেষটা হার মানিয়া উঠিলাম। আমরা কয়জন মাত্র, একটী দাইকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বলাবাহুল্য যে দিকটায় আমাদের বাড়ী সেদিকে লোক-বসতি অত্যন্তই কম, নাই বলিলেই হয়। আমাদের বাড়ীর একদিকে একটী ইংরেজ-পরিবার বাস করিত, অন্য-ধারে একখানা বাংলা বাড়ী ভাড়াটিয়ার দুর্লভ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রাস্তার ওপারে আমগাছের অন্তরাল দিয়া লালকুঠীর ছাদ ও প্রাচীরাংশ দেখা যাইত, তাহা ভিন্ন সেই আমবাগানের একধারে একঘর গোয়ালা এবং অন্য ধারে উদ্যানপালক বাস করিত; সেই জন্যই আমাদের এদিকটার আরও সুবিধা হইয়াছিল। মা বলিলেন, "চল আজ সাজঙ্গীতে বেড়িয়ে আসি।" মৃণাল খুসী হইয়া রাযর্দিল, সে সাজঙ্গী দেখে নাই।

আমাদের অশ্বথ তলা হইতে আরম্ভ করিয়া একটু ঢালু রাস্তা রান্না ঘরের পাশ দিয়া রেল লাইনের তলা পর্য্যন্ত আসিয়া সমতল হইয়াছিল। তাই পথটী সাধারণ্যে সাজঙ্গী সড়ক নামে কথিত ছিল। আমাদের বাংলা হইতে দেখিলে এটাকে ঠিক একটা নদীর শুষ্ক গর্ভ বলিয়া মনে হইত। আর বস্তুতঃও ইহা তাহাই। শুনিয়াছি রেল লাইন বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটা বড় দীর্ঘিকা ছিল, এখনও তাহারি নামে এস্থানটার নাম হইয়াছে, "তেওয়ারি তলাও।" এখন সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার শেষ চিহ্ন এই সাজঙ্গী। পথের দুইধারে রেল লাইনের নীচেই দুইটি পুষ্করিণী, বর্ষায় তাহারা বারিপূর্ণ হইয়া নব যৌবনশ্রী ধারণ করে। কিন্তু এখন তাহাদের কঙ্কর-মৃত্তিকাময় বক্ষ জলহীন হইয়া রুগ্না বৃদ্ধার মত দেখাইতেছিল। সেই অবশিষ্ট কর্দ্দমাক্ত জলটুকুতে ধোপারা কাপড়গুলাকে মাটি-মাখা করিতেছে। আমাদের বাংলাখানি সেই তেওয়ারি-তলাও এর একটী পাড়ের উপর অবস্থিত হওয়াতে রাস্তা হইতে অনেকখানি উচ্চ। আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই গাছপালার মধ্যে চিত্রিতবৎ আমাদের বাড়িখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। ছেলেরা কেহ কেহ আমাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, দাইয়ের কোলে খোকা বাবু একটা কাশীর চিত্রিত ঝুমঝুমি দুই হস্তে মুখে পুরিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তাঁহার দুখানি হাত ও মুখখানি লালাসিক্ত —তাহাতে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চক চক করিতেছিল।

সাজঙ্গীর রাস্তা বড় নির্জ্জন। দুইধারে ঘন বিন্যস্ত আম বাগান। কচ্চিৎ আম্র-কানন মধ্যে লুক্কায়িত-প্রায় কোন কোন মুসলমান ধনীর অট্টালিকা, কোথাও দু একখানা মুচি বা কসাইএর কুটীরে চামড়া শুকাইতেছে; সদ্য-কর্ত্তিত ছাগ শিশুর রক্ত ভূমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমরা স্তব্ধ প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময়ী শোভা উপভোগ

না করিয়াই তাড়াতাড়ি এসব স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলাম। একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তাহার তিন দিকে বৃক্ষকাণ্ডের দ্বারা বেশ যেন ঘরের মত ঘেরা হইয়াছিল। মধ্যে তিন চারিজনের বসিবার মত স্থান। সেকালের রাজপুত্রেরা চারি বন্ধুতে বুঝি এই রকমেই বৃক্ষকোটরে আশ্রয় লইয়াছিল। আমরা একটু বসিয়া লইলাম। তারপর আর লোক-বসতির চিহ্ন নাই, কেবল আম ও তাল বন, তেঁতুল গাছের সারি। কুল গাছে পাকা কুল ধরিয়াছে, পাখীগুলার আনন্দ-কলরবের সীমা নাই। জনহীন বনমধ্যে বনফুলে কত বর্ণেরই প্রজাপতি ঘুরিতেছিল। সেই সব দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক ভাবে যাইতেছি, সহসা মীনা বলিয়া উঠিল, "ওখানে কি পুকুর আছে নাকি? জল দেখা যাচ্ছে না!" আমরা চাহিয়া দেখিলাম—হাঁ ওইতো সাজঙ্গী। "ধেৎ! একটা পুকুর দেখতে এতদুর আসা।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি আশা করছিলে? আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের তৈরি করা আলাউদ্দিনের বাড়ী!" সে একটু লজ্জার সহিত বলিল,—"না হোক, তা বলে শুধুই একটা পুকুর?......আচ্ছা এতদুর যখন এসেছ তখন আর একটুও না হয় চল, পুকুর হলেও এ নেহাৎ তোমাদের খিড়কির ডোবা নয়!"

(২)

সাজঙ্গী বাস্তবিকই সামান্য সাধারণ পুষ্করিণী নয়। এমন সুন্দর পরিপূর্ণসলিল সুবৃহৎ জলাশয় প্রায় চোখে পড়ে না, এক তীরে দাড়াইয়া অন্য তীরের গাছ পালা অস্পষ্ট দেখায়। তাহার চারিদিকে বহু কালের প্রাচীন বট অশ্বথ তাল তেঁতুল ও আধুনিক কালের আম জাম বৃক্ষের শ্রেণী তাহার নীল অচঞ্চল সলিল রাশিকে তেমনি নীল অনন্ত আকাশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তীরে তৃণ শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে পীত ও গোলাপি বর্ণের এক প্রকার বন্য পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃষ্টির জলে তাহার শ্যামলতা চিকণতা প্রাপ্ত হইয়া অতি নয়নরঞ্জন হইয়াছিল। তখনও দুর্ব্বাশীর্ষে মুক্তা-বিন্দুর মত বারিবিন্দু শোভা পাইতেছিল, কোথাও বা কল্যাণময়ী প্রকৃতির আনন্দাশ্রুরাশির মত রবিরশ্মিচূর্ণিত মাণিক খণ্ডের মত পাতায় জমা জল ঝরিতেছে। সেই পত্রচ্যুত বিন্দুগুলি আবার ঘাসের মধ্যে পড়িয়া দীপ্ত সূর্য্যালোকে হীরকচূর্ণের মত ঝকমকিয়া উঠিতেছিল। যেন জননী প্রকৃতি আজ তাঁহার কয়দিনকার জড়তা পরিত্যাগ করিয়া একা এই নির্জ্জনে নিভৃতে বসিয়া তাঁহার শোভন বরাঙ্গ বসনে ভূষিত করিয়া তাহার সবুজ পাড়টিকে হীরক, মুক্তা ও রেশম পশমের ফুলের দ্বারা খচিত করিয়া দিয়াছেন। ধূলিধৌত নিম্বশাখায় ফুল ধরিয়াছে। শিমুল ফুলের রাঙ্গা মুখগুলি অশ্রু-সজলা, রক্ত-বসনা নব বধূর মতন নম্রমুখী। ফুলে ফুলে প্রজাপতি ঘুরিতেছে, গাছে গাছে অনেক রকম পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে।

মৃণাল মুগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর জায়গা, মন যেন কেড়ে নেয়!" হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি! তবে শ্রমটা ব্যর্থ গেল না?" "না এ তোমার আলাদিনের বাড়ীর চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, আচ্ছা টীলা কুঠির মত ও বাড়িটা কি?" ও পারে উচ্চ ভূমির উপরে পীর সাহেবের আস্তানা দেখা যাইতেছিল, সবুজ গাছ পালার মধ্য দিয়া অল্পই দেখা যায়। মীনা বলিল, "চল না দেখে আসি।" আমরা যাইতে যাইতে পথে এক পাগড়ীওয়ালা বলিষ্ঠদেহ মুসলমান সঙ্গী লাভ করিলাম, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ি ফল বেচিতে যায়। মস্তবড় সেলাম দিয়া সে সাগ্রহে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের আপ্যায়িত করিতে আপনিই প্রস্তুত হইল। আমরা আপত্তি করিলেও সে নিজের কর্ত্তব্য ভুলিল না। বলিল, সঙ্গে কেহ নাই, সে নিমক খাইয়াছে, এমন করিয়া একা ছাড়িয়া দিতে পারিবে না। অগ্যতা তাহার অযাচিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতেই হইল। পথে সে তাহাদের সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং তাহারো উর্দ্ধতন দু একজনের সবিশেষ সংবাদ প্রদান করিল। এখন সংসারে সে. তাহার জরু (স্ত্রী) এবং একটি মাত্র কন্যা। কন্যার জন্য পীরসাহেবের নিকট মানত করিয়াছিল যে সে প্রত্যহ তাঁহার মন্দিরের চারিধার পরিস্কার করিয়া দিবে, তাই সে আজও প্রতিজ্ঞাপালন করিতে আসিয়াছিল। দারুণ শীতে তাহার মেয়েটি একটি কুর্ত্তা পায় না, মাইজি যদি দয়া করিয়া তাঁহার খোকাবাবুর

কাটা ফুটা একটা তাহাকে দান করেন তবেই সে এই প্রচণ্ড শীতে রক্ষা পায়। মার বোধ হয় সেই ঝুমঝুমি ভরা লালাসিক্ত কোমল মুখখানি মনে পড়িয়া গিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমার বাড়িতে যেও।" সে কৃতজ্ঞ ভাবে মস্তক নত করিয়া ললাটে হস্ত স্পর্শ করিল। কথায় কথায় সে বলিল, "মাইজি বুঝি ফকির দেখতে এসেছেন ?" আমাদের প্রশ্নে পুনশ্চ কহিল, "সিপাই বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে একজন বড় ভারি হিন্দু সন্ন্যাসী থাকিতেন, একদিন হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে যান, আবার এতদিন পরে কোথা হতে ফিরে এসেছেন ; নানী বলে ইনি তিনিই, এখনও ঠিক সেই রকম আছেন, কিন্তু তখন হিন্দুর কাপড় পরতেন এখন ইনি ফকিরের মতন পোষাক করেন, বড় তাজ্জব কথা !" একজন মানুষ পঞ্চাশ ষাট বৎসর একই অবস্থায় আছে, আর সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি মার অত্যন্ত ভক্তি, তিনি বলিলেন, "চল, কি রকম সন্ন্যাসী দেখেই আসা যাক।" মৃণাল বলিল, "ওমা, মুসলমান যে !" মা বলিলেন, "হলোই বা, সন্ন্যাসীর আবার হিন্দু মুসলমান কি ? যিনি সাধু তিনি সাধু, তাঁর জাত ধর্ম্ম কি ?"

সাজঙ্গীর তীরে পাহাড়ের এক পার্শ্বে একটি পুষ্পিত নিম্ব বৃক্ষের তলায় একখানি পরিষ্কার পাথরের উপর কম্বল বিছাইয়া সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বৃদ্ধ, আবক্ষ লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু, মস্তকে রৌপ্য-শুভ্র কেশ, দেহ অত্যন্ত জীর্ণ, মুখে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসন্নতা যেন পাশাপাশি আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পরিধানে মুসলমান ফকিরের ন্যায় একটি আলখাল্লা মাত্র, তাঁহার মস্তকে জটাভার নাই, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু নাই, অঙ্গে ভস্ম মাখান নাই, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা মনে হইল, এ মুসলমান সাধু না হিন্দু ব্রহ্মচারী ! মনের সামান্য দ্বিধাটুকু ঘুচিয়া গেল, ধীরে ধীরে একধারে উপবেশন করিলাম।

সন্ন্যাসী একমনে একখানি কীটদষ্ট জীর্ণ, হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন, অল্পক্ষণ পরেই পুঁথি বন্ধ করিয়া হাস্যপ্রফুল্ল মুখ আমাদের প্রতি ফিরাইয়া স্নেহপূর্ণ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ মাতা ?" তাঁহার উচ্চারণ বেশ বিশুদ্ধ হিন্দী। ফলওয়ালা ঠিকই বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই ইনি সেই হিন্দু সন্ন্যাসী'। মা বলিলেন, "আমরা আপনাকে ও পীর সাহেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "বৎসে, তোমরা হিন্দু রমণী হইয়া কি জন্য মুসলমানের পীরের আস্তানা ও মুসলমান ফকির দেখিতে আসিয়াছ ?" আমরা একটু লজ্জিত হইলাম, মা বলিলেন, "উচ্চের আসন উচ্চে, যিনি সাধু তাঁহার সর্ব্বত্রই সম্মান, মুসলমানের আল্লা আমাদেরই হরিনারায়ণ। তাঁদের মহাত্মারা আমাদেরও পূজ্য। সম্রাট আকবর কি কোন হিন্দুর কাছে কম ভক্তি পেতেন ? আপনাদের মতন সাধুর কাছে কখনই ধর্ম্মের জন্য বাধা পড়ে না, সেগুলি সমাজের জিনিষ, আত্মার নয় !" সন্ন্যাসীর মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিভাসিত হইল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রকৃত হিন্দুর মত কথা বলিয়াছ মাতা ! তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৃষ্ট, খৃষ্ট, মহম্মদ কেহই অগ্রাহ্য নহেন, সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা। ইঁহাদের উপদেশ-বাণী তাঁহারই মহান বার্ত্তা। সমস্তই অমৃতময়, ইঁহাদের কেহইই ত্যজ্য নহেন, এবং মূলে সমস্তই এক।"

তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন জ্ঞানী হিন্দুর মত কথা বলেন, আপনি কি মুসলমান ?" ফকির একটু খানি হাসিলেন, ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসির সহিত কহিলেন, "জননী, ধর্ম্মের আমি কি জানি ? আমার জ্ঞান ও ভক্তি অত্যন্ত অল্প ও সঙ্কীর্ণ। আমি এতদিনের সাধনায়ও কিছুই বুঝিলাম না, বাসনার দাস ! আজ আবার ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়াছি, এই স্থানের মমতা ত্যাগ করিতে পারি নাই, এই স্থানে আজ আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কই মা, মনের রুদ্ধ তরঙ্গ তো মিলায় নাই ? আজ তাহাদের চাঞ্চল্য অনুভব না করিয়া পারিতেছি না তো ? মূঢ় আমি জ্ঞানী !"

সন্ন্যাসীর মুখের প্রসন্নভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি কিছুক্ষণ সাজঙ্গীর সেই নীল জলরাশির পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার রহস্যপূর্ণ কাহিনী জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহলী মন কয়টি লুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল ; মা বলিলেন

"আপনার কাহিনী আমাদের বড় শুনিতে ইচ্ছা হয়, কিসে আপনার এই উন্নতির পথ মুক্ত হইল ?" সন্ন্যাসী চমকিয়া মুখ ফিরাইলেন, তৎপর সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ তুমিও ঠিক তাই মনে কর! সে একজন—বড় আদরের সে একজন ছিল ! সে-ই তার ভালবাসার অমূল্য ঋণ শোধ করে দিয়ে গেছে ! আঃ সে আর আমায় কি দিতে পারতো? বড় আদরের ছিল, তাই বড় শান্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে, এমন প্রতিদান কে দিতে পারে মা !" সন্ন্যাসীর প্রসন্ন মুখ হাস্যমধুর শান্তি ভরা হইয়া উঠিল, "ভগবান মানুষকে সোণার মত দুঃখের আগুণে দগ্ধ করে খাঁটি করে নেন, তাই সেই আমার দুঃখকাহিনীর ফলে আজ আমি এত সুখী ! আর মুক্তকণ্ঠে বলছি, এমন সুবিমল শান্তির মূল্যে আমি জন্ম জন্মান্তর তেমন মহামহা দুঃখও উপভোগ করতে প্রস্তুত আছি। শুনিতে চাহিতেছ, তবে শুন বৎসে, এ বুড়াটাও একদিন তোমাদের একটা গল্প শুনাইয়া দিতেছে. আচ্ছা তবে প্রথমে একটা গল্প বলি।"

(৩)

বহু দিবস গত হইল, এই সাজঙ্গী-তীরে এই পীরের পাহাড়ের নিকট ঐ আম গাছগুলার তলায় একখানি পর্ণকুটীরে একজন সাধু পুরুষ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন নাই, কর্ম্মসূত্র তাঁহাকে ইহাতে বাধ্য করিয়াছিল, সেই কর্ম্মসূত্র যাহাকে নিমিত্ত করিয়া আসিয়াছিল সে একটি ক্ষুদ্র অনাথ শিশু। শুনিয়াছি, সে দুর্ভাগ্য শিশু অত্যন্ত শিশুকালে তাঁহার চক্ষে পতিত হয় এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করুণাবশে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার এক দরিদ্রা শিষ্যার নিকটে প্রথমে পালনার্থ প্রদান করেন। তারপর কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইলে নিজেই সেই ভাগ্যহীনকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সে তখন আর শিশু ছিল না, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক। সে তাহার পালয়িত্রীকেই নিজের জননী বলিয়া জানিত। সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার শিক্ষা দীক্ষার সংবাদ লইয়া যাইতেন, তাঁহারাই অনাথ বালকের পিতা মাতা, আত্মীয় শিক্ষক, সকলের স্নেহ, সকলের, আদর সকলের কর্ত্তব্য দিয়া তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। হয়ত তাহাতে যোগীর সাধনার বিঘ্নও হইয়াছিল, হয়ত পুণ্যবতী রমণী পরমার্থ চিন্তার মধ্যেও নশ্বর চিন্তায় মোহিত হইয়া পড়িতেন। যাহা হউক, এমনি করিয়া সে যখন অষ্টাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এমন সময় সহসা একদিন সে মাতৃহীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবের আশ্রিত হইয়া পড়িল। মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অনুরোধে গুরুদেব তাঁহাকে দর্শন দান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আসিয়াই সহসা তিনি আর ফিরিতে পারিলেন না, বালক সহসা কঠিন পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে তিনি এই খানেই তাহাদের কুটীরে তাহার আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত থাকিতে সম্মত হইলেন। তারপর রোগমুক্ত হইয়া সে আত্মস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে দুই বৎসরাধিককাল গুরুদেবের সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিল। এ দুই বৎসর সে যে অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে কাটাইয়াছিল তাহার সীমা হয় না। কিন্তু কুক্ষণে সে আবার মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিল। মা অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন মধ্যে মধ্যে আসিয়া সে তাঁহার সাধের শান্তি কুটীরখানি দেখিয়া যায়, চিরদিনের মায়া কাটাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীও নির্জন সাধনার উপযোগী বলিয়া তাহার সহিত অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। বড় আনন্দে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বাল্যসঙ্গিনী দেলেনার সহিত ক্রীড়া করিয়া যুবক দিন কাটাইতে লাগিল। দেলেনা কে বলিব ? সেও এক বড় ঘরের মেয়ে, এখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তাহার অনাথিনী পিতামহী ও মাতা একমাত্র কন্যাটিকে লইয়া অদূরবর্ত্তী দরিদ্র পল্লীতে গোপনে বাস করিতেছিলেন। যুবকের মাতা তাহাদের বড় যত্ন করিতেন, তাহারা নিজেদের কোন অভাবই জানিত না।

বুঝিতে পারিতেছ না মা ! পরমহংস আনন্দ স্বামীর স্নেহ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান বালকই এই মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমি। দেলেনাদের দুর্ভাগ্যের কথাও আমি মার মুখে শুনিয়াছি। সে কথা বলিতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হয়। সেও আর একটি দুঃখ-কাহিনী। আরম্ভ

করিয়াছিই যখন, তখন বলি, শুনো। সে সময় আইন কানুনের এতদূর আঁটা আঁটি হয় নাই, নাথনগরের সুজাতআলি খাঁ একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন, তাঁহার ধন সম্পত্তি কীর্ত্তি কলাপ ও দয়া দাক্ষিণ্য সমস্তই অপর্য্যাপ্ত ছিল। দেশে বিদেশে সম্মান শ্রদ্ধার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সুজাতআলিখাঁর এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তিনি কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই জ্যেষ্ঠ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির লোক। বাল্যকাল হইতেই মহম্মদ মিতভাষী এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্ট, সে ভ্রাতার এত অধিক অনুগত যে লোকে তাহার সবটাকেই কাপট্য বলিয়া সন্দেহ করিত। করুক, কিন্তু তাহার ভ্রাতা সে সম্বন্ধে এতটুকু মাত্র সন্দিহান ছিলেন না। হঠাৎ একদিন ধার্ম্মিক মহম্মদ জেদ ধরিল সে মক্কা যাইবে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনেক আপত্তি করিলেন, সকলেই বুঝাইল। ভ্রাতৃজায়া এবং মহম্মদের বালিকা পত্নী পর্য্যন্ত অনুনয় করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই অনাসক্ত চিত্ত টলিল না। মহম্মদ বলিল, সংসারে তাহার স্পৃহা নাই, বদ্ধ গৃহ তাহার নিকট ভীষণ কারাগার, তাহার চিত্ত মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সুদূর প্রবাসে উড়িয়া গিয়াছে। তাহার শৃঙ্খল কাটিয়া না দিলে সে এখানে বাঁচিবে না। অগত্যাই স্নেহময় ভ্রাতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অনেক উপরোধে অনুরোধে মহম্মদ দুই দিন মাত্র আর তাহার আত্মীয় বর্গের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে সম্মত হইল। এই দুই দিন সে তাহার পবিত্রতা হানির ভয়ে গৃহে বাস না করিয়া উদ্যানের একপ্রান্তে নিভৃতে বাস করিল। সুজাতআলি আবার কাতর হইয়া বলিলেন, "তুই এই বয়সে সংসার ছাড়িয়া চলিলি ভাই, আর আমি কোন্ সুখে এ সংসারের মায়ায় বদ্ধ থাকিব? আমায় বরং অবসর দে, তুই আমার স্থানে বসিয়া আমার কার্য্য গ্রহণ কর, এবং আমার মেহেরকে প্রালন কর।" মেহের সুজাতআলির একমাত্র শিশু সন্তান। কিন্তু নবীন ফকির বিনীত ভাবে কহিল, "না দাদা, আমায় স্বর্গের সোপান হইতে সংসার-নরকের মধ্যে টানিবেন না, আপনি ধার্ম্মিক, লোকপ্রিয়, আপনা হইতে জগৎ কত উপকৃত হইবে, আমি হয়ত ঠিক পথে চলিতে পারিব না, হয়ত ঐশ্বর্য্য ভোগে বিপথগামী হইয়া যাইব, আমায় পাপ হইতে রক্ষা করুন।" সকলেই মুগ্ধ হইল। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা অন্য-প্রকার। এতো চেষ্টা সত্বেও মহম্মদের মক্কা গমন হইল না। যে রাত্রি প্রভাতে সে মক্কা যাত্রা করিবে সেই রাত্রে অকস্মাৎ সুজাতআলি ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুই ভ্রাতায় একত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শেষে গভীর রাত্রে মহম্মদ বিদায় লইলে ভৃত্য অল্প পরেই তাহার প্রভুর পীড়ার সংবাদ দিয়া তাহাকে তাহার উদ্যানগৃহ হইতে তাহার উপাসনা ভঙ্গ করিয়া আবার ডাকিয়া আনিল। এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! মহম্মদ শিহরিয়া উঠিল, "হা আল্লা! এমনি করিয়া তুমি কি আমায় মায়ায় ডুবাইতে চাহিলে?" তৎক্ষণাৎ বড় বড় হাকিম ও ডাক্তার আসিল, সকলেই বলিল, আর সময় নাই। বাড়িতে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল, কিন্তু সেই সর্ব্বত্যাগী ফকির আজ যেমন উন্মাদের মত অধীর হইয়া লুটাইয়া পড়িল, যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন আর কেহ নয়। একবার স্তিমিত চক্ষে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পানে চাহিয়া মহানুভব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীণকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "ভাই ক্ষমা করিলাম, আল্লা খোদা তোমায় ক্ষমা করুন।" কিন্তু সে কথা মহম্মদের উচ্চ ক্রন্দনের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হাকিম ও ডাক্তারগণও নাকি গোপনে নবীন যোগীর সহিত বড় গম্ভীর মুখে কি বলাবলি করিয়াছিলেন, কিন্তু যাত্রাকালে তাঁহাদের মুখেতো কোন প্রকার অসন্তোষ বা গাম্ভীর্য্যের ছায়া দেখা যায় নাই! আর যে ভৃত্যটী লোহার সিন্দুকটার ডালাখানা তোলা রহিয়াছে দেখিয়া প্রলুব্ধ চিত্তে তাহার মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিতে গিয়াছিল সে তাহা শূন্যগর্ভ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল, "সে দিনকার অত মোহর আজই ছোট সাহেব কি করিলেন?" কিন্তু যাক্ সে সব কথা। সুজাতআলি খাঁর সহসা মৃত্যু যে দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডেরই অপরাধ সে বিষয় সাধারণ্যে শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ধার্ম্মিক মহম্মদ সকলকার অনুরোধে মক্কা গমন স্থগিত রাখিলেন। তারপর

বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল।

—তারপর যে কি হইল তাহা ঠিক বলিতে পারি না, বড় লোকের অন্তঃপুরের ঘটনা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তবে এই রকম গুজব, সুজাত আলির বিধবা পত্নী বেশি দিন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করেন নাই, শীঘ্রই সর্ব্বদুঃখহর মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে স্নেহ-অঙ্কে স্থান দান করিল। অবশ্য মন্দ লোক গোপনে অনেক কথা রটনা করিল। তা করুক, তাহাদের স্বভাবই এই। আবার কিছু দিন পরে সকলে শুনিল, সুজাত আলির একমাত্র বংশধর, মহম্মদের প্রাণাধিক ভ্রাতুস্পুত্র মেহের কঠিন পীড়াগ্রস্ত। মসজিদে দান ধ্যান হইতে লাগিল এবং প্রতিদিন বড় বড় হেকিমের পাল্কি আসিতে লাগিল. স্বয়ং মহম্মদ অনাহারে অনিদ্রায় শিশুর সুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই শিশু তাহার ক্ষুদ্র জীবনাঙ্কের প্রথমেই পটক্ষেপন করিয়া তাহার পিতামাতার কোলে চলিয়া গেল। বালকের মাতামহ বহুদুর হইতে আসিয়া দেখিলেন কি ? না সেই এতোটুকু দেহ সহস্র লোকের হাহাকারের মধ্যে তাহার স্নেহময় পিতৃব্য মহম্মদ আলির অজস্র অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহার পিতামাতার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হইতেছে। অশ্রুজলে ভাসিয়া সেই পথেই তিনি ফিরিয়া গেলেন। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, লোকে আড়ালে অনেক কথাই বলাবলি করিত, কিন্তু সম্মুখে কেহ কিছুই বলিতে সাহসী হইত না। কেবল পুরাতন প্রধান কর্ম্মচারী সাদুল্লার্খা একদিন নূতন প্রভুকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাহার মুখের উপরেই 'পাপের অর্থ' বলিয়া নিজের বেতন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসে। মহম্মদ ক্রুদ্ধ হইল না, মৃদু হাসিয়া সে বলিল, আল্লা তোমার সুমতি দিউন, আমিতো পাপী—নইলে খোদা আমায় তাঁহার চরণে গ্রহণ করেন না, সংসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন কি ? শুনিয়া শঙ্কিত পারিষদবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া ভাবিল, সাক্ষাৎ মহম্মদ ! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মানব-দেহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

খাদ্য ও পাক যন্ত্র।

জীবন ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে খাদ্যের প্রয়োজন। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার কিয়ৎকাল পরই তাহাকে আহারের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করা হয়, কারণ তাহা না হইলে সে বাঁচিতে পারে না। আমরা পরিণত বয়সেও দিনে দুই তিনবার ভোজন করিয়া থাকি।

আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত যন্ত্রের ক্রিয়া সকল সময়ই চলিতেছে ; এমন কি, বসিয়া থাকিলে বা নিদ্রাতেও যন্ত্রের বিশ্রাম নাই। কিন্তু চলা ফেরা, উঠা বসা, ইত্যাদি সামান্য পরিশ্রমে আমরা বিশেষ ক্লান্তি বোধ করি না বলিয়া আমরা মনে করি যে আমাদের শারীরিক যন্ত্রের কোন ক্রিয়া হইতেছে না। ইহা আমাদের ভ্রান্তি। ঐ ক্রিয়ার দরুণ আমাদের শরীর সকল সময়েই কিছু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই ক্ষয়ের জন্যই আমরা অল্পাধিক ক্লান্ত হই। এমন কি পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্য দ্বারাও শরীরের ক্ষয়কার্য্য সাধিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কিছুকাল বসিয়া পড়াশুনা করিলে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়, কতক্ষণ ফুটবল খেলার পর কিছু আহার না করিয়া অন্য কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের শরীর কিছু না কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবন ধারণ করিতে হইলে এই ক্ষতি পূরণ করা দরকার এবং এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইলেই খাদ্যের প্রয়োজন।

আমরা যাহা খাই তাহাই রক্ত মাংস মজ্জাতে পরিণত হয়। মানব দেহ রক্ত মাংস মজ্জা ইত্যাদির সমষ্টি মাত্র। এই খাদ্য দ্বারাই ইহা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি তাহাদের পরিপাকের উপর শরীরের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমরা যাহা খাই তাহার সার পদার্থ দ্বারাই শরীর গঠিত হয়। ইক্ষু পেষিয়া যেমন তাহার রসভাগ গ্রহণ করিয়া নীরস ইক্ষু দণ্ড ফেলিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ আমাদের শরীরও খাদ্য

হইতে সারভাগ গ্রহণ করিয়া অসার ভাগ মলমূত্রাদি রূপে ত্যাগ করে।

খাদ্য দ্রব্য (The Food)।

আমাদের খাদ্যে কার্ব্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen), নাইট্রোজেন ও লবণজাত দ্রব্য (Salts) ইত্যাদি প্রধান উপকরণ। আমরা যে সকল বস্তু আহার করিয়া থাকি তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই উপরিলিখিত জিনিষগুলির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন বস্তুমধ্যে কোনটার পরিমাণ অধিক আর কোনটার পরিমাণ কম। সেই অনুসারে আমাদের খাদ্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জান্তব খাদ্য। ইহাতে আমাদের শরীরের মাংস প্রস্তুত করিবার উপকরণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিজ্জ খাদ্য। চাউল, ডাল, গম, তরকারী, চিনি, সরিষা ইত্যাদির তৈল ও অন্যান্য বস্তু এই শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। তৃতীয়তঃ খনিজ পদার্থ (Mineral food)। জল ও লবণ জাতীয় পদার্থই (salts) এই শ্রেণী মধ্যে প্রধান।

দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করা উচিত যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ইত্যাদি জিনিষ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন একটী বস্তুতে সমস্তগুলি উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই আমাদের খাদ্যের জন্য ভাত, ডাল, মাছ, লবণ, চিনি ইত্যাদি নানা প্রকার বস্তুর ব্যবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুগ্ধের মধ্যে সমস্ত পদার্থই উপযুক্ত পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। মানুষ একমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আর প্রকৃত পক্ষে মানব শৈশবে দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছু ভক্ষণ করে না। অথচ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়।

দন্ত (The Teeth)।

আমাদের দেহে অনেকগুলি যন্ত্র আছে এবং তাহাদের অনেকেই পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাহা সর্ব্বপ্রথমে মুখগহ্বরে স্থাপন করি। দন্ত আমাদের একটী অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। খাদ্য দ্রব্য পেষিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করাই ইহার প্রধান কাজ। আমাদের মুখ হইতে এক প্রকার জলবৎ লালা নির্গত হয়। খাদ্য ভাল রূপে চর্ব্বিত না হইলে লালার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত না হইলে কিছু মাত্র রূপান্তরিত না হইয়া পাকাশয়ে (stomach) প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় তথায় প্রবেশ করিলে ইহাদিগকে পরিপাক করিতে পাকাশয়ের অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার ফলে পাকাশয় দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং এই ভাবে অনেক দিন চলিলে শারীরিক যন্ত্রগুলি এমনি দুর্ব্বল হয় যে তাহাদের আর পরিপাক করিবার বিশেষ শক্তি থাকে না। তখনই অজীর্ণ উদরাময় রোগ আসিয়া দেহে অধিকার স্থাপন করে। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করাই অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, যে আমাদের প্রত্যেকটী গ্রাস অন্ততঃ ৪০ বার চর্ব্বণ করা উচিত। এ কথাটী বিশেষ ভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। ভগবান প্রয়োজন বুঝিয়াই আমাদের এত শক্ত দাঁত দিয়াছেন, আমরা কেন ইহার সৎব্যবহার করিব না ?

উত্তমরূপে চর্ব্বণের আর একটী গুণ এই যে ইহা আমাদিগকে অতি-ভোজন করিতে দেয় না। অপরিমিত ভোজন অত্যন্ত খারাপ, কারণ তাহাতে আমাদের শারীরিক যন্ত্রগুলিকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পাচকরস তৈয়ার করিতে হয়। ইহার ফলে তাহারা শীঘ্রই জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে ও আমাদের শক্তি লোপ পাইতে থাকে। পরিশেষে রোগাক্রান্ত হইয়া অপরিণত বয়সে মানব-লীলা সম্বরণ করিতে হয়। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য অধিকক্ষণ চর্ব্বণ করিলে আমাদের শরীর ধারণের নিমিত্ত যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা চর্ব্বণের পরই আমাদের দাঁত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আমাদের যতদুর শক্তি দরকার ভগবান আমাদিগকে ততটুকু শক্তি প্রদান করিয়াছেন। চর্ব্বণ করিতে করিতে যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখনই খাওয়া বন্ধ করা উচিত।

আমাদের দেশের লোকেরা চর্ব্বণ না করিয়া খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলা অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে ইহাতে কত অনিষ্ট হইতে পারে। এমনও দেখা গিয়াছে যে খাইতে অধিক সময় ক্ষেপণ করিলে, পিতামাতা তাহাদের সন্তানকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়।

শিশু জন্ম গ্রহণ করিবার ছয় সাত মাস পর হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা দুধে দাঁত (Milk teeth) বলিয়া থাকি। দুধে দাঁত দুই পাটীতে দশ দশটি করিয়া কুড়িটি উঠিয়া থাকে।

কিন্তু এসব দাঁতের মূল নাই। চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ই এগুলি পড়িয়া যায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে ২৮টী স্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে। তৎপর কুড়ি বাইশ বৎসর বয়সের সময় আরও চারিটী দাঁত উঠিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ আক্কেল দাঁত (Wisdom teeth) বলিয়া থাকে। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে যাহার ঐ চারিটী দাঁত দেখা দিয়াছে তাহার বুদ্ধি অবশ্য অনেকটা পরিপক্ক হইয়াছে।

দাঁত দেখিতে অস্থি নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ডেণ্টাইন (Dentine) নামক এক প্রকার নরম পদার্থ দ্বারা উহা নির্ম্মিত। ডেণ্টাইন অতি সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা এনামেল (Enamel) নামক একপ্রকার শক্ত শুভ্র পদার্থ দ্বারা আবৃত। ইহাতে রক্তের কোন স্থলী নাই। সেইজন্যই আমরা চিবাইতে ক্লেশ পাই না। দাঁতের নিম্ন দেশে একটী গর্ত্ত আছে। ইহাকে Tooth pulp বলা হয়। ইহাতে রক্তস্থলী ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে।

আমাদের দুই পাটীতে চারি প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর দাঁত আছে। দুই পাটীতে মধ্যস্থলে চারিটী করিয়া আটটী দাঁত আছে। ইহারা খাদ্যদ্রব্য কাঁচের মত কাটিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে আমরা কর্ত্তনদন্ত (The biters) বলিতে পারি। প্রত্যেক পাটীতে কর্ত্তনদন্তের দুই দিকে দুইটী শ্বদন্ত (the dog teeth) আছে। তৎপর দুই দিকে প্রত্যেক পাটীতে দুইটী করিয়া চর্ব্বণদন্ত (The chewers) বর্ত্তমান। সর্ব্বশেষে দুইদিকে তিনটি করিয়া ৬টী পেষণ দন্ত (The grinders) আছে। ইহা দ্বারা আমরা কঠিন পদার্থ চর্ব্বণ করিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

ভুপালের বেগমের মক্কাভ্রমণ।

ভুপালের সুশিক্ষিতা শাসনকর্ত্রী নবাব সুলতান জেহান বেগম সাহেবা তাঁহার মক্কাভ্রমণ সম্বন্ধে ৩৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি চমৎকার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

অবতরণিকায় বেগম সাহেবা দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা নানা শ্রেণীর লোকের সংসর্গে আসাতে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। মক্কাতীর্থ দর্শনে মুসলমানদিগের অশেষ পুণ্য অর্জ্জিত হয়।

মূল পুস্তক দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রথমে আরব দেশের ভৌগলিক বিবরণ এবং মক্কার পবিত্রতার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বাবধি মক্কাসরিফের পবিত্র কাবা মন্দির বিদ্যমান ছিল। আদমের সময় হইতে মহাপুরুষ মহম্মদের সময় এবং তৎপরবর্ত্তী কালেরও ইতিহাস এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ১০৪০ হিজিরা অব্দে তুরস্কের সুলতান মুরাদের রাজত্বকালে বর্ত্তমান কাবা মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুধু কাবার বিখ্যাত পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর-খচিত অংশটুকুতে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

এখন প্রতি বৎসর একবার করিয়া "কিস্বত" নামক আবরণ-বস্ত্রে কাবা মন্দির আচ্ছাদিত করা হয়। এই আবরণ-বস্ত্রের বন্ধনরজ্জুতে মুসলমান ধর্ম্মের বিখ্যাত মন্ত্র "কলমা" জরির দ্বারা খচিত থাকে। পূর্ব্বে বৎসরে দুই তিন বার কাবা মন্দির আচ্ছাদিত হইত। স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া ইয়েমেন প্রদেশের রাজা প্রথম একখানি আবরণ-বস্ত্র দান করেন। তৎপর মিশরের সুলতানগণ ও ইয়েমেনের রাজাগণ প্রতি বৎসর পুণ্যলাভের আশায় এই আবরণ বস্ত্র দান করিয়া থাকেন।

তুরস্কের সুলতান সোলেমান খাঁর সময় হইতে রাজ-কোষ হইতেই এই আবরণ-বস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহিত

হইতেছে। পরে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া আরও কয়েকটী গ্রাম এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের জন্য দান করা হইয়াছে। এই সকল গ্রামের আয় শুধু এই আবরণ-বস্ত্রের জন্যই ব্যয়িত হয়।

পবিত্র কাবা মন্দিরে প্রবেশের সময় যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কাবা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা মঞ্জুর করেন এবং ২৬০ জন উচ্চ কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের অধীনস্থ বহু কর্ম্মচারীর ব্যয়ভার বহন করেন।

তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে বেগম সাহেবা রাজ্য শাসনের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ের জন্য তিনি যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শাসন-ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সিংহাসনারোহণের আড়াই বৎসর পরেই বেগম সাহেবা তীর্থযাত্রা করেন সুতরাং রাজ্য শাসনের ক্রটিতে প্রজা-সাধারণের অপ্রীতি ও ক্ষতি সম্ভাবনায় সঙ্কুচিত হইয়া তিনি দুইখানি ঘোষণাপত্র 'প্রচার দ্বারা প্রজাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহাতে লিখিত ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কর্ম্মচারীদের ভ্রান্তিবশতঃ যদি কাহারও ন্যায্য স্বত্বের ক্ষতি হয় বা কোন মোকদ্দমার অবিচার হয় তবে প্রজাগণ যেন তাঁহাকে ক্ষমা করে।

তীর্থভ্রমণে তাঁহার যে সময় লাগিবে বলিয়া তিনি ঘোষণাপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন কার্য্যতঃও তদধিক সময় লাগে নাই। ১৯০৩ খৃঃ অব্দের ৩০শে অক্টোবর বেগম সাহেবা তীর্থযাত্রা করেন, ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্ত্রীলোক হইলেও বীরের ন্যায় তিনি আত্মীয়বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বিপজ্জনক তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ দুই পুত্র গিয়াছিলেন। শরীররক্ষী সৈনিক ও তিন শত অনুচর লইয়া তিনি বোম্বাই বন্দরে জাহাজে আরোহণ করেন। ১৯০৩ খৃঃ অব্দের ৭ই নবেম্বর তিনি এডেনে পৌছেন, ১২ই নবেম্বর জেড্ডা ও বুসেদের মধ্যবর্ত্তী পথে তাঁহার জাহাজ নোঙ্গর করে। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিধান অনুসারে এখানে তাঁহার জাহাজ এক সপ্তাহ কাল আটক থাকে। ২১শে নবেম্বর রমজান মাসের প্রথম দিবসে তাঁহারা ইয়াম্বু বন্দরে উপনীত হন। তিনি তীরে পদার্পণ করিলে তাঁহার সম্মানার্থ তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের আদেশে একুশবার তোপধ্বনি হয় ও তুরস্ক সৈন্য অস্ত্র প্রদর্শন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন।

স্থলপথে তাঁহার রক্ষার জন্য বিপজ্জনক স্থানসমূহে তুরস্ক রক্ষিবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। রাস্তার তিন অংশ অল্পায়াসেই অতিক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু চতুর্থাংশে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল। তুরস্ক রক্ষিবর্গ সত্বেও করবারাস নামক দস্যুজাতীয় লোকদিগকে তাহাদের আক্রমণ হইতে মুক্তির জন্য চারিসহস্র টাকা দিতে হইয়াছিল। সপ্তম দিবসে বেগম সদলে মদিনায় উপস্থিত হন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করেন।

বেদুইন দস্যুগণ পথে অতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল। একদিন শোনা গেল, বেলুচিস্থানের একজন সামন্ত বেদুইনগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, তাঁহার পাঁচজন অনুচর আহত হইয়াছে। বেগমের শিবিরস্থ লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কাবার "কিস্বত"-বাহী তুরস্ক সৈন্য দলের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহারা কিছুদিন পথে বিলম্ব করিলেন। আড়াই মাস মদিনায় অপেক্ষা করিয়া "কিস্বত"-বাহী সৈন্যদলের সহিত তিনি মক্কা যাত্রা করিলেন।

বৃহৎ সৈন্যদল এবং কামান সত্বেও বেদুইনগণ অল্প জ্বালাতন করে নাই। ভারতবর্ষ হইতে ঐশ্বর্য্যশালিনী এক বেগম মক্কা যাইতেছেন, আর তাহারা কিছুই লুণ্ঠন করিতে পাইল না, তাহাদের এ দুঃখ নিতান্তই অসহনীয় হইল। ছোট ছোট পাহাড়ে লুকাইয়া থাকিয়া তাহারা বেগমের শিবিকা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু বেগম তাঁহার চিহ্নিত শিবিকায় না যাইয়া পুনঃ পুনঃ শিবিকা পরিবর্ত্তন করিতেন। ইহাতে বেদুইনগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। একবার রীতিমতই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত তুরস্ক সৈন্যের সহিত বেদুইনগণের যুদ্ধ চলিল, অবশেষে কামান আসিয়া

উপস্থিত হইলে বেদুইনগণ পলায়ন করিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বেগম মক্কা প্রবেশ করেন।

সরিফ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগকে জালাতন করিয়াছিল। হজ সমাপন করিয়া যখন বেগম সদলে জেড্ডা যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন তখন সরিফ পোনর হাজার টাকা অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসিল।

১৯০৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ বেগম সাহেবা স্বদেশ যাত্রা করিলেন এবং ১২ দিন সমুদ্র যাত্রার পর বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিলেন।

পথ্য ও পরিচর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কয়েকটী সাধারণ নিয়ম।

১। নির্দ্ধারিত সময়ে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে চিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী নিয়মে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা, এবং মনোযোগের সহিত রোগীর লক্ষণ ও উপদ্রবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, চিকিৎসকের নিকট যথাযথ ভাবে বলা শুশ্রূষা কারীর প্রধান কর্ত্তব্য।

২। এই সকল বিষয়ে শুধু স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রদানের সময় এবং যখন যে অবস্থা হয় তাহা লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা চিকিৎসকের উপস্থিতি সময়ে অতীব প্রয়োজনীয় কথাও ভুল হইয়া যাইতে পারে।

৩। রোগীর মল, মূত্র, কফ, থুথু ও বমি ইত্যাদি পরিষ্কার পাত্রে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়া চিকিৎসককে দেখান আবশ্যক।

৪। রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসক আসিলে অতঃপর রোগীকে কি ভাবে রাখিতে হইবে, কোন সময় কোন ঔষধ ও পথ্য কি ভাবে প্রদান করিতে হইবে, কি ভাবে পরিচর্য্যা করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে, এবং সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে। কার্য্যকালে ঐরূপ পথ্য ও পরিচর্য্যাদ্বারা কোনরূপ অসুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাইতে হইবে, এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিবে।

৫। রোগীর সঙ্গে সর্ব্বদা নম্র ব্যবহার করিবে, মিষ্ট ভাষায় কথা বলিবে, রোগীর বিরক্তিজনক কথা বলা, রোগীর প্রতি রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ, রোগীকে অনাবশ্যক প্রশ্ন করা, বা অন্যকে ঐরূপ প্রশ্ন করিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী যাহাতে আরামে থাকিতে পারে সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত।

৬। রোগীর নিকট, কোনরূপ নিরাশা ব্যঞ্জক কথা বা ভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বদা আশ্বস্ত রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর প্রলাপে কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করা অসঙ্গত।

৭। রোগীর গৃহে অনেক লোক থাকা অন্যায়। পরিচর্য্যার জন্য যে দু'একজন লোক থাকা আবশ্যক তদতিরিক্ত অন্য লোককে রোগীর গৃহে বসিতে না দেওয়াই ভাল। রোগীর আত্মীয় স্বজন যাঁহারা রোগী দেখিতে আসেন, তাঁহাদের অনেককে একবারে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে না দিয়া ক্রমে ক্রমে দু'একজন করিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়া, তৎক্ষণাৎ অন্য অন্য ঘরে নিয়া বসান আবশ্যক।

৮। রোগীর রোগের অবস্থা, চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে সমালোচনা, কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ের গল্প গুজব রোগীর ঘরে কি রোগীর জ্ঞাতসারে করা কর্ত্তব্য নহে। উপর্য্যুক্ত স্বতন্ত্র বসিবার ঘরেই সেই সমস্ত করা উচিত।

৯। চিকিৎসকের ও রোগীর নিকটে রোগীকে আশ্বস্ত করা ভিন্ন অন্য কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নহে।

১০। যে সকল আত্মীয় স্বজন রোগী দেখিতে গেলে ক্রন্দন বা দীর্ঘনিশ্বাস সম্বরণ করিতে পারিবেন না তাঁহাদের রোগীর নিকট না যাওয়াই ভাল, অন্ততঃ রোগী যাহাতে তাঁহার ক্রন্দন বা ব্যস্ততা লক্ষ্য করিতে না পারে এমন সতর্ক ভাবে রোগী দেখা কর্ত্তব্য।

রোগীর গৃহ।

১১। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার,

শুষ্ক, যে ঘরে অনায়াসে নির্ম্মল বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে, সেই ঘরেই রোগীকে রাখা কর্ত্তব্য।

১২। এক বাড়ীতে একাধিক রোগী থাকিলে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরে রাখা উচিত।

১৩। ঘরে অনেক জিনিষ পত্র থাকিলে তাহা যথা সম্ভব স্থানান্তরিত করিয়া বায়ু চলাচলের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।

১৪। সাধারণতঃ শুষ্কদিনে ঘরের দরজা জানালা ইত্যাদি খুলিয়া রাখাই কর্ত্তব্য, ঠাণ্ডাদিনে ও রাত্রিতে ঐ সকল বন্ধ রাখা উচিত।

১৫। বৃষ্টি কিংবা হিমের দরুণ ঘর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হইলে ধূমবিহীন অগ্নি রাখিয়া গৃহের উষ্ণতা রক্ষা করা উচিত।

১৬। আগুন রাখিতে হইলে রোগীর বিছানা হইতে দূরে (যাহাতে রোগীর গায়ে বিশেষতঃ মাথায় তাপ না লাগে এমন স্থলে) রাখা উচিত।

১৭। ঘর সর্ব্বদা ঝাটদিয়া ও ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

১৮। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় ধূপ ধূনা দেওয়া ভাল, তৎসময় সম্ভব হইলে রোগীকে গৃহান্তরে রাখা এবং ঔষধের শিশি সরাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১৯। রোগীর গৃহে কেরোসিনের আলো না রাখিয়া তৈলের প্রদীপ কিংবা চর্ব্বিবাতি রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর চ'খে মুখে যাহাতে আলো না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

২০। ঠিক দরজার সাম্নে অর্থাৎ যেখানে আসিয়া রোগীর গায়ে বাহিরের বাতাসের ঝাঁপ্টা লাগিতে পারে এমন স্থলে রোগীর শয্যা করা অন্যায়, গৃহের এক ধারে শয্যা করাই ভাল।

২১। যে স্থানে রোগীর গায়ে রৌদ্র কিংবা রৌদ্রের তাপ আসিয়া লাগিতে পারে তেমন স্থলে শয্যা রচনা করা উচিত নহে।

২২। বিছানা চৌকির উপর করাই ভাল, তবে যে [illegible] রোগে বিছানা হইতে পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তৎস্থলে শুষ্ক মেজেতেই যথাসম্ভব পুরু ও নরম বিছানা করা কর্ত্তব্য।

২৩। রোগীর পরিধান বস্ত্র, বিছানার চাদর, বালিসের ওয়ার প্রভৃতি রোজ রোজ সাবান জলে ধুইয়া পরিষ্কার করা এবং তোষক বালিস ইত্যাদি রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

২৪। রোগীর মল, মূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদি বিছানায় পড়িলে তৎক্ষণাৎ বিছানা বদলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২৫। ওলাউঠা, জ্বর বিকার, কিংবা অন্য কোন রোগে দুর্ব্বলীভূত রোগীকে কখনও উঠিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার।

বর্ষারম্ভ.

কি জানি কি লোলজিহ্ব,—
লুকায়িত ও কবলে,
তবু তুই আয়!
হরষ বিষাদ অশ্রু
যাহা আছে—থাক, যেন
গড়াইয়া যায়—
জীবন স্রোতের পরে!
ভিক্ষা এই দেব! মোরে
রেখ অচঞ্চল।
স্থির দুটী আঁখিতারা
তোমাতে হউক হারা,
দিও প্রাণে বল।
ও হাতের দান যাহা
আমি যেন নত শিরে
বহিবারে পারি,
কুমতি না হয় হেন,
বিদ্রোহী না হই যেন
এই ভিক্ষা করি।

সরলা দত্ত।

চিত্র পরিচয়।

কিরাত ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ কাহিনী মহাভারতে বর্ণিত আছে। অর্জ্জুন কর্ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রলাভের নিমিত্ত মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে দেবতাগণ ভীত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অর্জ্জুন যে মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার তেজে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আপনি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করুন।" মহাদেব তাহাতে সম্মত হইয়া কিরাতরূপ ধারণ করিলেন। একটা দানব শূকর সাজিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য ছুটিল, কিরাতরূপী মহাদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া শূকরের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। অর্জ্জুনও ততক্ষণ গাণ্ডীবে শর যোজনা করিয়া শূকরকে বধ করিতে প্রস্তুত। কিরাত অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে লক্ষ্য স্থির করিয়াছি, তুমি শূকরের উপর তীর নিক্ষেপ করিও না।" অর্জ্জুন সামান্য ব্যাধের কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি শরক্ষেপ করিলেন, কিরাতও তীর ছুড়িল। এই বিষয় লইয়া দুইজনে তর্ক বাঁধিয়া গেল। তর্ক শেষে যুদ্ধে পরিণত হইল। কিন্তু অর্জ্জুন যত বাণক্ষেপ করেন কিরাত সকলই গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। এইরূপে অর্জ্জুনের সকল অস্ত্র ফুরাইয়া গেল এবং তাঁহার গাণ্ডীবও কিরাত কাড়িয়া লইল। তখন বাহু যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতেও হারিয়া গেলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অর্জ্জুন মাটীর শিব গড়িয়া ফুল দিয়া মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। ফুল গিয়া পড়িল কিরাতের পায়ের উপর। অর্জ্জুন তখন বুঝিতে পারিলেন, এই কিরাতই শিব। তিনি মহাদেবের নিকট তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে পাশুপাত নামক মহা অস্ত্র দান করিলেন।

রাজা।

ওগো আমার রাজা!
ওগো চিরদিনের সোহাগ আমার,
চির দুখের সাজা!

দুখে যখন তোমায় স্মরি,
সুখে পরাণ যায় যে ভরি,
সুখের মাঝে তোমায় বরি
দুখের স্বপন তাজা
ওগো আমার রাজা।

রাজার আমার আগমনে,
কি সুর জাগে আমার মনে,
বলে আমায় একই ক্ষণে
ছয় রাগিনী বাজা
সে যে আমার রাজা।

আমার রাজার সবই ভালো,
মিলেছে তায় আঁধার আলো,
ঘরের আমার যত কালো
সেই আলোতে সাজা
সে যে আলোর রাজা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সেবাসদন।

পাশ্চাত্য প্রদেশে Little Sisters of the Poor (গরিবের ছোট ছোট ভগিনী) নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। রুগ্ন এবং স্থবিরের সেবাই এই প্রতিষ্ঠানের ব্রত। আজ চারি বৎসর হইতে চলিল, ভারতেও ইহার অনুকরণে সেবা-সদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুশিক্ষিত ভারত রমণীগণ কর্তৃক এই কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতে এই প্রথম। জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবা ও সাহায্য করিয়া সেবাসদন মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়া এক অপূর্ব্বত্বের পরিচয় দিয়াছে। ইহার কার্য্যবিধিও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। রোগী ও বৃদ্ধের সেবার জন্য সুব্যবস্থা আছে অথচ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশ্বাস ও জাতিগত বিশেষত্বে এতটুকু হস্তক্ষেপ করা হয় না। তাহাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা রাখিয়া

এই সেবা-সদন যে ভাবে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছে তাহা একান্ত গৌরবজনক।

১৯০৮ সালের ১১ই জুলাই বোম্বাই প্রদেশে সেবা-সদনের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বার সম্মুখে One at core, if not in creed" (বেদনায় এক, জাতিতে নাই হইল) লেখা আছে। সেবা-সদনের দ্বারা কিরূপ কাজ হইতেছে তাহা ইহার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলেই সহজে বুঝা যায়। ১৯১০ সালের ৩০শে জুন তারিখে সদনের যে বর্ষ শেষ হইয়াছে সেই বর্ষে সেবা-সদন-চিকিৎসালয় হইতে নারী ও বালকে মিলিয়া সর্ব্ব সমেত ৬২৩৬ জন রোগীকে সাহায্য করা হয়। উক্ত সংখ্যার মধ্যে হিন্দু ২৫৪২ জন, মুসলমান ২২৮, পার্শি ৩৩৩৬, এবং খৃষ্টান ১৩০। এতদ্ভিন্ন চক্ষু চিকিৎসালয় বিভাগে ৯২ জন হিন্দু, ৬০ জন পার্শি, ১৭ জন মুসলমান, ৪২ জন খৃষ্টান, সর্ব্ব সমেত এই ১৭১ জন, এবং Jacob Circle Chawl Dispensary তে—৭৫৪ জন রোগী চিকিৎসার সুব্যবস্থা পাইয়াছে।

বোম্বায়ের দেখাদেখি অপরাপর প্রদেশেও এইরূপ সেবা-সদনের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সেবা-সদনের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদির মুদ্রণ কার্য্য বোম্বায়ের দুই জন উন্নতহৃদয়া সুশিক্ষিতা বিধবা রমণী দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, ইহা কম আনন্দের বিষয় নয়।

(এডুকেশন গেজেট)।

হাইতোলা।

ভাল করিয়া হাই তুলিলে সমস্ত শরীরের উপকার হয়। বিশ্রামের আবশ্যক হইলে আমরা হাই তুলিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন যে ঘুম পাইলে হাই উঠে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ক্লান্তি হইলে হাই উঠে।

হাই আসিলে, ভাল করিয়া হাই তোলা উচিত। অভদ্রতা মনে করিয়া চাপিয়া থাকা অন্যায়। অন্ততঃ মুখে হাত চাপা দিয়াও হাই তোলা কর্ত্তব্য। হাই তুলিবার সময়, যতদূর পারা যায় শরীর বিস্তৃত করা ভাল। এইরূপ করিলে মাংসপেশী সকল বিস্তৃত হইয়া বিশ্রাম পায়। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

কাছাড়ে দুর্ভিক্ষ।

কাছাড় জিলার অন্তর্গত হাইলাকান্দি সবডিবিসনের দক্ষিণাংশে কুকী ও তিপ্রা জাতীয় কৃষিজীবিগণের বাস। ইহাদের নিজস্ব ভূমি নাই, জঙ্গল কাটিয়া জুম নামক কৃষি-উৎপন্ন শস্য দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অভাব অল্প, আয়ও সামান্য। জুম ব্যতীত ইহাদের অর্থাগমের অন্য ব্যবস্থা নাই; উর্ব্বর ভূখণ্ডে, প্রচুর বৃষ্টিপাতে জুমেরও প্রায়ই অপ্রতুলতা হয় না। কিন্তু ইঁদুরে গত জুম-শস্য নষ্ট করিয়া ফেলায় এই নিরীহ কৃষিজীবিগণ দারুণ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়াছে। নূতন জুম কৃষি আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে তাহা হইতে শস্য পাওয়া যাইবে না। পাঁচ ছয় মাস কাল ইহাদিগকে অন্ন দিয়া রক্ষা করিবার ভার দেশের সদাশয় নরনারীর উপর পতিত হইয়াছে। ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম এই বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন। কিছু অর্থ ও পুরাতন বস্ত্রসহ বিধবাশ্রম হাইলাকান্দিতে একজন লোক প্রেরণ করিয়াছেন। সাধারণের নিকট আমাদের এই সরল-প্রকৃতি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রতিবেশিগণের জন্য আমরা সকাতরে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। পাঁচ ছয় মাস কাল ইহা-দিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অন্ততঃ আট দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। সকলে কিছু কিছু করিয়া সাহায্য করিলে অনায়াসেই এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে। পুরাতন বস্ত্রাদিও সাদরে গৃহীত হইবে। নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বয়ের কোন এক জনের নামে সাহায্য পাঠাইলেই হইবে।

শ্রীসরযূবালা দত্ত
সম্পাদিকা, ভারত-মহিলা, ঢাকা।
শ্রীনির্ম্মলা দাস
তত্ত্বাবধায়িকা, বিধবাশ্রম, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বার্ষিক মূল্য [illegible] আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।]

বর্ত্তমান গবর্ণর পত্নী লেডি কারমাইকেল

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ– স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch —and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। | ২য় সংখ্যা।

মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়।

[পূর্ব্ববঙ্গের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস কুমারী গ্যারেট (Miss M. E. A. Garret) মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত স্ত্রীশিক্ষা-কমিটীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল]।

শুধু নারীদিগের জন্যই বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যক আছে,—আমি এই অর্থেই মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় কথাটীর ব্যবহার করিতেছি। জ্ঞানের এমন অনেকগুলি বিভাগ আছে যাহা স্ত্রী কিংবা পুরুষ উভয়েরই সমভাবে শিক্ষণীয় ; কিন্তু এমন কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয় আছে যাহা শুধু প্রত্যেক পত্নী ও প্রত্যেক মাতারই শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদিন মাতা হইতে কন্যা পরম্পরা এই সকল বিষয় মুখে মুখে ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ; বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সকল বিষয়ে প্রচুর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে ; এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্য তাহা করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কবি বলিয়াছেন, "The hand that rocks the cradle rules the world."—যে হাত দোলনা দোলায় তাহাই জগৎ শাসন করে। অন্যত্র ঃ—

The woman's cause is man's they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

মর্ম্মানুবাদ ঃ—স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্ত্রী বা পুরুষজাতীয় কোন্ বৈজ্ঞানিক বা কোন্ দার্শনিক, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া নারীর বিশেষত্ব, তাহার বিবিধ কর্ত্তব্য, তাহার শারীর-বিধান, তাহার মানসিক ও শারীরিক বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি আপন জীবনের বিশেষ অধিতব্য বিষয় করিয়া লইয়াছেন ?

যাঁহারা নারীজীবনকেই অধ্যয়নের বিশেষ বিষয় করিয়া লইয়াছেন, মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ লোকদের দ্বারাই গঠিত হওয়া আবশ্যক। বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। (১) নারী জীবনের বিশেষত্ব, (২) সমগ্র জাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য, (৩) অবসর সময় যাহার সাহায্যে আনন্দে কাটিতে পারে এরূপ বিষয়ে সমুচিত জ্ঞানলাভ করা, (৪) স্বামী পুত্র ও ভ্রাতার জীবনের কার্য্যে তাহারা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারে এরূপ মানসিক শক্তি অর্জ্জন।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এখন সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। স্ত্রীজাতির বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম নারীজীবন গঠন করা ও উপর্য্যুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি—আমার প্রস্তাবিত মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোন্‌টীর প্রতি কিরূপ মনোযোগ দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করাই কঠিন।

(১) সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ বিষয়—যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি,—যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিতব্য বিষয় হওয়া উচিত, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

(৩) হাতে কলমে শিক্ষা করিবার উপযোগী বিষয় যথা—শুশ্রূষা, রন্ধন প্রভৃতি—যাহাতে বিজ্ঞানের হাতে কলমে প্রয়োগ আবশ্যক।

কিন্তু আমার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয় কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। রন্ধন, সূচীকর্ম্ম, বস্ত্র ধৌত করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রী উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে সার্টিফিকেট প্রদান করিবার প্রথা ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণ গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধায়িকা (matrons, house-keepers) ও এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

লণ্ডনের কিংস্ কলেজ (King's College) এবং চেলটেনহামের মহিলা-কলেজের (Ladys' College) সহিত এখন গার্হস্থ্য বিজ্ঞানশ্রেণী সংসৃষ্ট হইয়াছে। রন্ধন, বস্ত্রধৌত করা, পোষাক প্রস্তুত করা—প্রভৃতি বিষয়ে উপাধি প্রদান বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও উপাধি দেওয়া স্থির হয় নাই।

আমার প্রস্তাব এই—গার্হস্থ্যবিজ্ঞান মহিলা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের একটা অংশ মাত্র হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে না। আমার মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সহিত যোগ করা আবশ্যক।

(১) শিশু-চরিত্র অধ্যয়ন ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-প্রণালীতে জ্ঞান লাভ করা।

(২) শুশ্রূষা। এতৎসঙ্গে শারীর-বিজ্ঞান ও শরীর-তত্ত্ব এবং কিঞ্চিৎ চিকিৎসা-বিদ্যাও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৩) স্বাস্থ্যতত্ত্ব। এই সঙ্গে সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি সমূহের লক্ষণাদি ও বায়ু চলাচলের বিধি প্রভৃতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৪) রন্ধন। এই বিষয়টী পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসায়ন বিদ্যা ও রোগীর পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৫) সূচীকর্ম্ম। সাধারণ শেলাই ও সখের শেলাই, কাপড় কাটা, শেলাইয়ের কলের ব্যবহার, জরির কাজ, লেইস্ প্রস্তুত করা। সৌন্দর্য্যজ্ঞান বৃদ্ধি, গৃহ ও পরিপার্শ্ব

সজ্জিত করিবার দিকেও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বাগান প্রস্তুত করা। কিঞ্চিৎ উদ্ভিদবিদ্যা।

(৭) গো-তত্ত্ব ও গৃহপালিত অন্যান্য পশুপক্ষীর যত্ন ও বৃদ্ধি বিষয়ে শিক্ষা দান।

উপরিলিখিত ৭টী বিষয় এক একটী বালিকার বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নারীজীবনের পক্ষে শুধু এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভই যথেষ্ট নহে। গৃহকর্ম্মে দক্ষতা অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের ক্ষমতা অর্জ্জন করাই নারীর শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না।

প্রত্যেক নারীর জীবনেই অবসর সময় থাকা উচিত। এই অবসর সময় অধ্যয়নে যাপন করা উচিত। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং গার্হস্থ্য বিদ্যা শিক্ষাতেই যে সকল বালিকার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে তাহারা স্বামী ও সন্তানের শারীরিক সেবা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। উচ্চ-বিদ্যালয়ের অধিক আর শিক্ষালাভ না করিলে তাহাদের মানসিক জীবনের স্রোতের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ ভাষা ও সাহিত্য অথবা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আজকাল মহিলাদের কলেজে ও পুরুষদের কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোনই পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুরুষদের জন্য পুরুষদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। আমি কখনই বলি না যে, বি. এ, এম. এ, এম. ডি, প্রভৃতি পরীক্ষা কোন স্ত্রীলোকের পক্ষেই উপযোগী নহে। অনেকের পক্ষেই এগুলি উপযোগী হইতে পারে, বিশেষতঃ যাহারা বিষয় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাহে তাহাদের পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু আমার ধারণা, যাহারা ভবিষ্যতে জাতির জননী-পদ লাভ করিবে তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী উপযোগী নহে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহিলাদিগের জন্যই আমি গবর্ণমেণ্টের চিন্তা ও আর্থিক সাহায্যের দাবী করিতেছি। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই সংসারে অধিক, এবং জাতির পক্ষে ইহারাই অধিক মূল্যবান। ইহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, উপাধিপ্রাপ্ত মহিলাগণ গার্হস্থ্যজীবনের পক্ষে সর্ব্বত্র অনুকূল নহেন। তাঁহাদের পক্ষে গৃহ অনেক সময়ই বিচিত্রতাবর্জ্জিত। শান্ত গার্হস্থ্য জীবন যেন অনেক সময়ই তাহাদের জীবনের সহিত খাপ খায় না।

পক্ষান্তরে যে সকল মহিলা গার্হস্থ্যবিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতা মহিলাদের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন না। আমার উদ্দেশ্য এই যে, জনসাধারণ যাহাতে নারীজীবনের বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার সর্ব্বপ্রধান উপায়, আমার প্রস্তাবিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাহারা অধ্যয়ন করিবে তাহাদিগকে উপাধি দেওয়া। আমার আশঙ্কা এই যে, এখন যদি এদিকে মনোযোগ না দেওয়া যায় তবে শুধু নারীগণ নহে, ভবিষ্যতে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেহ যেন আমাকে ভুল বুঝেন না। মহিলাগণ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পুরুষদের সহিত সমান শিক্ষা লাভ করিবেন না, আমি তাহা বলি-তেছি না। নারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ডাক্তার, ব্যবহারজীবী, শিক্ষয়িত্রীর কাজ সর্ব্বদাই করিবেন। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। আমি ইঁহাদের কথা আলোচনা করিতেছি না, ভবিষ্যতে যাহারা জাতির জননী হইবে, তাহাদের জন্য আমি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রার্থনা করিতেছি।

পুরোহিত।

অনেক কাঁদাকাটার পর যখন গ্রাম্য এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত কৃপাতে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন আমার বয়স, বলিতে লজ্জা করে, অষ্টাদশ বৎসর। বাড়ীর এবং পিতার একমাত্র বংশধর বলিয়া বাড়ীতে আদরটা কিছু বেশী রকমেরই ছিল। বাড়ী বলিতে, আমি, আমার মা ও আমার পিতা, এই তিন জন মাত্র। পিতা গ্রামের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। কুলীন

বংশে জন্ম, তা'তে আবার আমার তিন পুরুষ ক্রমে এই গ্রামেরই পুরোহিত হইয়া আসিতেছেন, সেই জন্য পিতার কার্য্যে কিঞ্চিৎ অমনোযোগিতা থাকিলেও গ্রামের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপটা তিনি প্রায় একচেটে করিয়া লইয়াছিলেন। মনোহরপুর গ্রামটী বেশ বড়, আর বেশ দুই একঘর বড় বনেদী বংশের লোক আছে। তাতে'ই আমাদের অবস্থাটাও বেশ ভালই ছিল। পয়সার জোর থাকাতেই হউক কিংবা বয়সের আধিক্য বশতঃ দাড়ী গোঁফের অতিরিক্ত বিকাশ হওয়াতেই হউক, ক্লাসে আমারই প্রতাপ সর্ব্বাধিক ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে অনেক অল্প বয়সের ছেলে পড়িত, তাহারা আমাকে দেখিলেই ভয়ে কেঁচো হইয়া যাইত এবং মুখে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে আমার যে কোন আজ্ঞা দিবার আগেই তাহারা সে কাজ হাঁসিল করিতে প্রস্তুত।

বাবুয়ানিটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়ই করিতাম। এখানে অতিরিক্ত অর্থ পাড়াগাঁয়ের অতিরিক্ত। সহরে সেইরূপ কোনপ্রকার বাবুয়ানি দেখাইলে হয়ত লোকেরা আমাকে অজ পাড়াগেঁয়ে নামে অভিহিত করিত। আমি একটা লাল কাপড়ের (শালু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) সার্টের উপর গ্রাম্য দরজীর প্রস্তুত কলার আঁটিয়া এবং পুরোহিত বংশধরের মার্কাস্বরূপ প্রায় আধ হাত চওড়া লালপেড়ে কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইতাম। তখন গ্রামের 'ছিদাম' মুদি কিম্বা 'পরাণ' নাপিত পার্শ্ববর্ত্তী কাহারও গা ঠেলিয়া বলিত—'রাম মুখুয্যের ছেলেটা কি রকম বাবু হয়েছে দেখলে!' কথাটা যেন আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই, এই ভাব দেখাইয়া মনে মনে একটা রামপ্রসাদী সুর অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া চলিয়া যাইতাম।

কিছুদিন আমার সময় বেশ নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তারপর হঠাৎ পিতার একটা শক্ত রকম ব্যাধি হইল। তিনি নিজে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন ভাবিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, তুমি যা লিখে শিখেছ তাই ঢের হয়েছে, এখন আমাদের পৈত্রিক ব্যবসায়ে মনোযোগ দাও, যেন পরের জন্য আয় ভাবতে না হয়।' আমিও ত তাই চাই! প্রতিদিন নবীন মাষ্টারকে ক্লাসে অপমান করা, এবং রাস্তাতে তাঁর খাওয়ানর ভয় দেখান, আর আমাবু অপেক্ষা অর্দ্ধবয়স্ক ছেলেদের গাট্টা মেরে কাঁচা আম পাড়তে শেখান, ইত্যাদি রকমের কার্য্যগুলো যেন নিতান্তই এক ঘেয়ে হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একটা বিপরীত পরিবর্ত্তন, মন্দ কি! পিতার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। তারপর দিন 'ব্লকম্যানের' ভূগোল ছেড়ে দিয়ে একেবারে পিতার অত্যন্ত যত্নে রক্ষিত—'নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি' মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই বয়সে মুখস্থ বিদ্যাটা যে খুব অনায়াসলভ্য নয় তাহা বোধ হয় সহৃদয় পাঠকপাঠিকাবর্গ বুঝিতে পারেন। অনেক কষ্টে দুইটী শ্লোক মুখস্থ হইল। পিতা বলিলেন, 'উহাতেই কাজ চলিবে।' তা'র পরদিন হইতেই একেবারে ব্রাহ্মণ! পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে, গলায়, বুকে, চন্দনের ছাপ, নগ্ন-পদ। প্রত্যেক বাটীতে কোন প্রকারে পনর মিনিটকাল ক্রমান্বয়ে দুইটী শ্লোকই আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া পড়িতাম। পুরস্ত্রীরা বলিতেন, 'হাজার হ'ক ইংরেজী স্কুলে পড়েছে ত, কেমন তাড়াতাড়ি শ্লোকগুলি পড়লে দেখেছ!'

এদিকে পিতার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন পিতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; মাতাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। বাকী রহিলাম কেবল আমি। গ্রামে তখন বসন্ত মহামারী আসিয়াছিল। আমার পুরোহিত-গিরিটাও সঙ্গে সঙ্গে বেশ জমিয়া উঠিল। আজ এ বাড়ীতে 'শান্তি' কাল ও বাড়ীতে 'প্রায়শ্চিত্ত', তার উপর ত 'বারমাসে তের পার্ব্বণ আছেই। অর্থ যথেষ্টই উপার্জ্জন করিতেছিলাম, কিন্তু যৌবনে অনেকগুলি কু-অভ্যাস ও কু-সঙ্গী জুটিয়াছিল, তাই টাকাগুলি স্রোতের মতন বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন কি দিন দিন দেনাটাও কিছু অতিরিক্ত রকমে বাড়িতেছিল।

মনোহরপুরের জমীদার নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি লইয়া বিষম গোল বাধে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ বিধবা স্ত্রী শৈবালিনী ও একটি পুত্রকে

রাখিয়া দুই বৎসর হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কনিষ্ঠ রমেন্দ্র জীবিত আছেন। রমেন্দ্র অল্পদিন হইল এক জমিদার-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। শৈবালিনী আমার সহিত কথা কহিতেন, এবং প্রায়ই বিষয় সম্পত্তির দুই একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইত। আমি তাঁহাদের পুরোহিত ছিলাম। শৈবালিনীর আমার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। আমি যাহা উচিত বলিতাম তাহাই পালন করিতেন। শৈবালিনীর পুত্র জীবিত থাকাতে রমেন্দ্রের বিষয়ে ভাগ কম হইবে, ইহা জানিতাম। গ্রামে চারিধারেই অসুখ করিতেছে; শৈবালিনীর পুত্রেরও তিন চারি দিন হইতে অল্প জ্বর হইয়াছে। শৈবালিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের সেবাতে বসিয়া আছেন। একদিন সকালে রমেন্দ্র আমার বাটীতে আসিয়াই আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমি কখনই রমেন্দ্রের নিকট হইতে এতটা ভক্তি আশা করি নাই। তা'ই কিছু হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। রমেন্দ্র ভূমি হইতে উঠিয়া আমাকে একটী কাগজের মোড়ক দিয়া কহিল, "ঠাকুর মহাশয়, বড় বৌএর ছেলেটীর আজ কয়দিন ধরিয়া জ্বর হইতেছে, ডাক্তারী ঔষধে কিছুই ফল হইতেছে না, স্বপ্নে এই ঔষধ পাইয়াছি, কিন্তু বড় বৌ আমাদের দেওয়া ঔষধ ছেলেকে কিছুতেই খাওয়াইবেন না, আপনার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, আপনি আজ এই ঔষধটা তাঁকে দিবেন, চোখের সামনে ছেলেটা মরবে, এ ত আর দেখতে পার্ব্ব না।" রমেন্দ্রের চোখ ছল ছল করিতেছিল. আমি ভাবিলাম, 'হইবারইত কথা, হাজার হ'ক ভাইপো ত!' তারপর রমেন্দ্র আমার পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া আমার হাতে একশত খানি গুণিয়া দিল। রমেন্দ্র বলিতে লাগিল, "ছেলেটা বাঁচবে, হাজারটা টাকা বইত নয়!" টাকাটা দেখিয়া মনে আমার ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেনার কথা এবং নূতন নোটগুলি দেখিয়া সহাস্য বদনে সন্দেহটাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিলাম এবং রমেন্দ্রের উপদেশ মত কার্য্য করিব বলিয়া সম্মতি দিলাম।

তাড়াতাড়ি আহার সম্পন্ন করিয়া শৈবালিনীর কাছে ছুটিলাম। ঘরে আর কেহই ছিল না, শৈবালিনী তাঁহার জ্বরে জ্ঞানশূন্য পুত্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। চোখে জল নাই, কেমন একটা ভাব, যা' দেখলেই মনে একটা আশু বিপদের আশঙ্কা উদয় হয়। আমি মোড়কটী আমার ভিতর হইতে বাহির করিয়া বলিলাম, "কাল স্বপনে এই ঔষধ পাইয়াছি, ছেলেকে খাওয়াও, তা'হলেই আরোগ্য হইবে।" শৈবালিনীর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, তিনি তখনই ছেলেকে মোড়কটী খাওয়াইলেন। আমার উপর এই অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া আমার মনে আবার সেই খারাপ সন্দেহটা দেখা দিল, কিন্তু তখনই সেই ছাপমারা কড় কড়ে কাগজখণ্ডগুলি মনে করিয়া সন্দেহটা দূর করিয়া দিলাম। ঔষধটা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীতে ঢুকিতে যাইব এমন সময়ে একটা পেঁচা এক গাছে একটা ভীতিসূচক বিকট শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল।

ভোর রাত্রে একটা সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিলাম যে জমীদার বাটীর দিক হইতে একটা করুণ ক্রন্দনের স্রোত ভাসিয়া আসিতেছে। চোখ হইতে তখনও ঘুম ভাল যায় নাই, এমন সময় বাহিরে "ঠাকুর ম'শায়" এই আহ্বান শুনিলাম। বাহির হইয়া দেখি যে, জমীদার বাড়ীর দরোয়ান 'তেওয়ারী' দাঁড়িয়ে আছে। আমি যাইতেই বলিল, "বড় মাইজির লেড়কাকা বেমার জ্যাস্তি হ্যায়, আভি মর জায় গা, ডাক্তার বাবু আওর ছোটা বাবু আপকো বোলাতা হ্যায়।" আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। গিয়া দেখি, ঘরে ডাক্তার দণ্ডায়মান, শৈবালিনী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন ও রমেন্দ্র ছেলের পার্শ্বে বসিয়া আছে। আমি যাইতেই ডাক্তার বলিল, "অসুখটা হঠাৎ বাড়িয়া এই পাঁচ মিনিট আগেই মারা গেল।" সে একবার তাড়াতাড়ি রমেন্দ্রের দিকে চাহিল। ডাক্তার সার্টিফিকেটে লিখিল, "অত্যন্ত জ্বর হওয়াতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হয়ে মারা গেছে।" তা'তে আমাকে ও রমেন্দ্রকে সাক্ষী ঠিক কল্লে। আমি, ডাক্তার ও রমেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইলাম। রমেন্দ্র খামে করে কি একটা তাড়া

তাড়ি ডাক্তারের হাতে দিয়ে বল্লে, 'এই এক হাজার, দাহ হইবার পর আরও এক হাজার।' ডাক্তার চুপি চুপি বলিল, "বিষটায় খুব জোর ছিল।" আমি তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছিলাম, আমাকে উহারা দেখে নাই। আমি আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরিলাম; ঘটনাটা সবই বুঝিতে পারিলাম। তখনও শৈবালিনীর কান্নার সুর সমস্ত পাড়াটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে ষ্টেশনে চলিলাম। পথে অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয় কোথায় যাচ্ছেন? আমার যে কাল প্রত্যূষেই ব্রত আছে," ইত্যাদি। সকলকেই তা'দের তৃপ্তিজনক উত্তর দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পৌরহিত্য ও মনোহরপুর ত্যাগ করিয়া অনেক তীর্থ ও অনেক পুণ্যস্থানে ঘুরিলাম, কিন্তু অন্তর আর ভারশূন্য করিতে পারিলাম না। আহারে, বিহারে, শয়নে সকল সময়ই শৈবালিনীর সেই হৃদয়ভেদী কান্না যেন কাণে লাগিয়াই আছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীনির্ম্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাপানের গৃহধর্ম্মনীতি।

অনেকে মনে করেন যে বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতারই অনুকরণের ফল। একথা সম্পূর্ণ সত্য হইতেই পারে না। জাপান তাহার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বিশেষত্বকে বর্জ্জন করিতে পারে নাই। জাপানী সভ্যতার মূল ভিত্তি তাহার গার্হস্থ্য জীবনে! "জাপান ম্যাগাজিন" পত্রিকায় জিরো শিমোডা নামক এক লেখক তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিতেছি।

তিনি বলেন যে বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতা পিতৃ-রাজভক্তিরই বিকাশের ফল। স্মরণাতীত কাল হইতে রাজ-পরিবারের সঙ্গে প্রজাসাধারণের অপত্যবৎ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। জাপানীদের মধ্যে অনেক বিদেশী রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, অনেক বিদেশীয় জাতি সম্পূর্ণ রূপে জাপানী জাতির অন্তর্ভূত হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও রাজাপ্রজার স্নেহপ্রীতিমূলক মধুর সম্বন্ধ কিছুমাত্রও শিথিল না হইয়া বরং আরও নিবিড় হইয়াছে। সমগ্র জাতি যেন একটী বৃহৎ পরিবার, আর সম্রাট তাহার গোষ্ঠীপতি। সম্রাট যে বৃহৎ জাতি-পরিবারের পিতা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন পরিবার নিজকে তাহারই অংশ বলিয়া মনে করে।

জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মূলসূত্র পিতৃভক্তি ও রাজভক্তি এবং এই দুইটীই পরস্পর-নির্ভরশীল। সে দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, "পিতৃভক্ত পুত্রই রাজভক্ত প্রজা হয়।" জাপানে যখন সামন্ত শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন লোকে সামন্তদের প্রতিই রাজভক্তি প্রদর্শন করিত। তাহারা সম্রাটকে এত পবিত্র জ্ঞান করিত যে তাঁহার নিকট অগ্রসর না হইয়া রাজপ্রতিনিধির সম্মুখেই অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত।

বিপ্লবের পর সম্রাট স্বয়ং যখন রাজ্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই মধ্যবর্ত্তীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রজাসাধারণের অন্তরের ভক্তিধারা সিংহাসনের প্রতি ধাবিত হইল। এই রাজভক্তিকে আন্তরিক ও শক্তিশালী করিবার জন্যই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির আদর্শ বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা জাপানীদের মনে ক্রমাগত বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই দুইটী নীতি হইতে এই দেশের জাতীয় জীবনে যে সুফল প্রসূত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত জাপানের ইতিহাসে পর্য্যাপ্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি নারীজাতিও এই সার্ব্বজনীন নীতির অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

জাপানে সন্তান স্বভাবতঃই পিতামাতাকে ভক্তি করে এবং পরিবারের সুখ শান্তির জন্য তাহাকে অনেক ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়। পিতামাতাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করেন। সন্তানকে বিনা বাক্যব্যয়ে পিতামাতার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হয়। সন্তানগণ উপার্জ্জনক্ষম হইলে বৃদ্ধ পিতা সংসারের গোলমাল হইতে অবসর লইয়া খেলায়, নির্দোষ আমোদ

প্রমোদে, উদ্যান নির্ম্মাণে, চায়ের নিমন্ত্রণে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

কোনও জাপানীর রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির অভাব থাকিলে তাহাকে সকলে মানবসমাজে বাস করিবার অযোগ্য বলিয়া মনে করে। অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও পিতৃভক্তিহীন পুত্র সমাজে সম্মানলাভ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতে পুত্র সহজেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, জাপানে সেইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বিদেশীর নিকট ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক মনে হয় যে, পুত্রবধূগণও বিবাহের পর হইতেই শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তির চক্ষে দেখে এবং সন্তানের ন্যায় তাহাদের আজ্ঞাবহ হয়। জাপানের কোনও সতী রমণী এই নীতি অবহেলা করে না। বিবাহের সময় অনেকে পিতামাতাকে এই উপদেশ দেন, "তুমি এই পরিবারে আমাদিগকে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে স্বামীগৃহে গিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকেও সেইরূপ করিবে, তাঁহাদিগকে পিতামাতার ন্যায় জ্ঞান করিও। ইহার অন্যথা হইলে আমাদের নাম কলঙ্কিত হইবে।"

একটী জাপানী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে জাপানী রমণী বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় গুণরাশিতে ভূষিত হইয়াও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা না করিলে প্রকৃত পত্নী হইতে পারে না। স্বামী যদি জানিতে পারে যে স্ত্রী তাহার পিতামাতার কথার অবাধ্য তাহা হইলে শুধু এই কারণেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। জাপানী ভাষায় স্বামী শব্দের স্থানে যে দুইটী অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকৃত অর্থ "দিব্য পুরুষ।" স্ত্রীও স্বামীকে বাস্তবিকই স্বর্গ হইতে আগত পবিত্র পুরুষ জ্ঞানে সম্মান করে। সতী স্ত্রী স্বামীর কল্যাণার্থে তাহার সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত, উৎসর্গ করিবে, ইহাই আদর্শ। তাহারা কেবল যে কর্ত্তব্যবোধে এই ত্যাগস্বীকার করে, তাহা নহে। এই ত্যাগকে তাহারা ক্ষতি বলিয়াও মনে করে না। পতির জন্য আত্মোৎসর্গেই তাহাদের আনন্দ। পুত্রকন্যাকে তাহারা বাল্যকাল হইতেই এই আদর্শে দীক্ষিত করে। জাপানের বিধবা নারী পরলোকগত স্বামীর শেষ চিহ্ন স্বরূপ সন্তানগুলিকে কি প্রেম ও ত্যাগের সহিতই না পালন করে ও শিক্ষা দেয়!

পুরুষগণও রমণীদের এই ত্যাগের সমাদর জানে। জাপানী নারী পরিবারে স্ত্রী রূপে প্রেম পায়, জননী রূপে সন্তানের নিকট অপরিমেয় সম্মান ও ভক্তি লাভ করে। তাহারা সুখ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। জাপানী রমণীগণ স্বভাবতঃই বড় নম্র। কিন্তু আবশ্যক হইলে সাহস ও বীর্য্য প্রদর্শনেও ইহারা সমর্থ। জাপানে অনেক বীরাঙ্গনার কাহিনী প্রচারিত আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পার্টান রমণীদের কথা মনে পড়ে। নানা বিষয়ে চিত্তের যোগ থাকিলেও তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ। গৃহকর্ম্মই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জাপানীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বড় ভালবাসে। তাই স্ত্রীলোকদের উপর বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখা ও জিনিষপত্র সুসজ্জিত করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বাসগৃহে কোথাও একটু ধূলা পর্য্যন্ত জমিতে পারে না। প্রত্যেক গৃহে পূজার বেদী আছে। সেই বেদীর সম্মুখে, জাপানীরা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রেতাত্মার তর্পণ করে। প্রত্যেক পরিবারের আবার দেবতা আছে। তাহার কাছে তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। দেবীর সম্মুখে তাহারা প্রার্থনা করে। স্ত্রীকে এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জাপানী রমণীগণ এই বেদী ও মন্দিরের পাশে তাহার অবশিষ্ট শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে।

জাপানের পুনরুত্থানের পরে ইহার অনেক প্রাচীন মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় সভ্যতার মূলসূত্র এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে জ্ঞানচর্চ্চা অপেক্ষা নৈতিক উৎকর্ষ সাধনই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। নারীদিগের মন সমাজ অপেক্ষা গৃহেই বেশী আবদ্ধ ছিল। গত কয়েক বৎসরে প্রাচীন মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে জগতের জ্ঞানচর্চ্চা ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি জাপানী রমণীদের চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইতেছে।

তাহারা ক্রমেই বুঝিতেছে যে, গৃহে পরিবারের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এই পরিবর্ত্তন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাবরাশির তরঙ্গ জাপানের মহিলাকুলের চিত্তেও আঘাত করিতেছে। তাহারা স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ভাবিতেছে। জীবনসংগ্রামে তাড়িত হইয়া বহু নারী গার্হস্থ্য জীবনের শান্তিপূর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কলকারখানা ও আফিসে চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ম্ম সংগ্রাম জাপানের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যতকে অনেকটা নিয়মিত করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগতে যে সকল সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, জাপান তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে। সে একদিকে পাশ্চাত্য সমস্যাগুলিকে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত পর্য্যালোচনা করিতেছে, অন্যদিকে জাতীয় সভ্যতার মূলসূত্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইতেছে। জগতের সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবনকে উন্নত করিবার জন্য জাপানীরা যত্নশীল হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার শত প্রতিঘাতে যে পরিবর্ত্তনই করুক না কেন, জাপানের গার্হস্থ্য জীবন পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা যতই বিক্ষুব্ধ হউক না কেন, জাপানী সভ্যতার মূলসূত্র রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির সেই উন্নত আদর্শ চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

মিলন।

(রূপক)

১

একটী 'পাখী-ডাকা, ছায়াঢাকা' ছোট্ট গাঁয়ে ছিল তাহাদের বাস।—একজন কবি, একজন গায়ক,—দুটী বন্ধু।

কবির কল্পনায় ছন্দের বাঁধনে বাঁধা পড়িত যত বিশ্বের চিরন্তন রহস্য, তাহারই ঝঙ্কার আবার গায়কের কোমল কণ্ঠে সুরপ্রবাহে লীলায় লীলায় তরঙ্গিয়া উঠিত!

গ্রামপ্রান্তে নদীতীরে শীতল বটচ্ছায়ে, কোমল শষ্প শয্যায় তাহাদের অলস মধ্যাহ্ন কাটিয়া যাইত। পদতল চুম্বন করিয়া তরঙ্গভঙ্গে পূর্ণাঙ্গী তটিনী বহিয়া যাইত। মুক্ত বায়ুর মৃদুগুঞ্জন, তট-ভূমির তরুমর্ম্মর, স্রোতস্বিনীর কলসঙ্গীত,—সকল মিশিয়া অপরূপ ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত—গায়ক তন্ময় হইয়া সুর মিলাইত! কবির কল্পনা-চক্ষে ভাসিয়া উঠিত মানসী প্রতিমার অপরূপ ছবি!

পরপারে সুদূর বনান্তরালে নীরব আকাশকে রোমাঞ্চিত করিয়া পাখী ডাকিত—'বউ কথা কও।'—কবির কল্পনাস্পর্শে ছন্দে ছন্দে জাগিয়া উঠিত যুগযুগান্তের যত বিরহীর মর্ম্মব্যথা,—যত বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট প্রণয়ীর মৌন-কাতরতা,—যত নিরাশ প্রেমের ব্যর্থ মিনতি! কবির তৃপ্তি হইত যখন বন্ধুর কণ্ঠস্বর ললিত ঝঙ্কারে সে ব্যথাটুকু দিগ্ দিগন্তে বহিয়া লইয়া যাইত। গায়কও গাহিতে গাহিতে ভাবসৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া পড়িত।

এমনি করিয়া একের দ্বারা অপরের অভাবের পূরণ হইত,—এইরূপেই শান্তি ও পূর্ণতার বেষ্টনে তাহাদের পল্লীজীবন স্নিগ্ধ ও রমণীয় হইয়া উঠিত।

২

অকস্মাৎ একদিন মূর্ত্তিমান দুর্ঘটনার মত রাজদূত আসিয়া বলিল—'ওগো তোমরা নিমন্ত্রিত।'—উপায় তো নাই!

রাজধানীর সহস্র দৃষ্টির সমক্ষে পল্লীবাসী বন্ধুযুগল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উভয়ের সম্মিলিত গুণচয় নিত্য রাজসভাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল,—গৃহে গৃহে শোনা যাইতে লাগিল শুধুই রাগিণীর ক্ষীণ অনুরণন—শুধুই কবিতার দীন অনুকরণ!

৩

এমন সময় উভয় বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়াইল এক অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যময়ী দীপ্তিময়ী নারী,—সে রাজ-কন্যা। উষার স্বর্ণলেখার মত দীপ্তিবিসারী অরুণিমা চক্ষু ঝলসিয়া দিল, গরবদৃষ্টি জানাইয়া দিল—'হে মুগ্ধ!

হে পূজার্থি! আনো তোমার পূজার উপচার।'—বন্ধুদ্বয়ের বক্ষদেশে রক্তধারা নাচিয়া উঠিল। কবি ভাবিল —'একি গো!—আজ এ 'কি সুর বাজে আমার প্রাণে!' গায়ক ভাবিয়া পাইল না আজ সে কি গান গাহিবে!

৪

নিভৃত কক্ষে শ্লোকের পর শ্লোকে কবির লিপি বাড়িয়া চলিল—

'কে গো কে? কাহার এ কিরণচ্ছটা দিগন্ত আলোকময় করিয়া তুলিল? তরু-পত্রান্তরালে আলস-সুপ্তা বালারুণরশ্মিবাহিনী এ কোন্ দিব্যাঙ্গনা? আলস-লুলিত অলকরাশে তড়িৎহাসিবৎ রত্নরাজি ঝলকিয়া উঠিতেছে, স্বর্ণাঙ্কিত অসম্বৃত চেলাঞ্চলনিঃসৃত রক্তমদ্যুতি দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, কোমল পদযুগে অলক্তকলেখাচুম্বিত স্বর্ণনূপুর রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে —অরুণ-কিরণ ঝলকিতা, 'ফুলগন্ধ পুলকিতা'-কে এ বালা? থাকো তুমি বহুউর্দ্ধে তোমার পূর্ণতায়, তোমার সম্পদে বিভূষিতা, দীনভক্তের অর্ঘ্যরাজি চরণ তলায় পুঞ্জিত হইতে থাকুক।'

—এমনি করিয়া ছন্দের অনাহত গতিতে কবির মর্ম্মকথা বাজিতে লাগিল।

কিন্তু কোথায় সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর যাহার মিলনেই অমন ছন্দের সার্থকতা?

অম্বরচুম্বিপ্রাসাদশিখরাসীনা অস্তারুণ-রশ্মিস্নাতা গৌরবদৃপ্তা রাজবালার করে লিপি পৌঁছিল।

—'ওগো, না—না! এ যে বড় হীন অর্ঘ্য,—ভিখারীর দান! আমি চাহি সেই সুরঝঙ্কারের কোমল মূর্চ্ছনা যাহা রাজসভার বাতাসকে তরঙ্গায়িত করিয়া মর্ম্মতটে লুটিয়া লুটিয়া পড়িত।—থাকো কবি তোমার ভাবসম্পদ লইয়া, তুচ্ছ শব্দস্তূপের উপর আপন নিষ্ফল আসন রচনা করিতে থাকো।

৫

প্রাসাদতলবাহিনী তটিনীর মুক্ত বক্ষ হইতে একটী করুণ রাগিণী বাতাসের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাসাদশীর্ষে উঠিতে লাগিল—

'তুমি এস, ওগো তুমি এস! আমার 'হৃদয়রক্ত রঞ্জিতচরণা', জন্মজন্মান্ত-বাঞ্ছিতা,—এস আমার ঊষর মর্ম্মতল জলসিঞ্চিত করিতে,—এস আমার বিরহবিধুর রজনী মিলনমধুর করিতে।'—এমনি কত চিরপুরাতন আকাঙ্ক্ষার কথা।

কিন্তু কোথায় সেই মধুর ছন্দনর্ত্তন যাহা অমন সুরপ্রবাহকে লীলায়িত করে?

সঙ্গীতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি রাজকন্যার চরণদুটী ঘিরিয়া ঘিরিয়া ক্ষীণকল্লোলে ভক্তের আহ্বানের মত বাজিতে লাগিল—ওগো এস, ওগো এস।—গৈরিক-অম্বরা সান্ধ্যপ্রকৃতি সম্ভ্রমে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

—'এযে আকাঙ্ক্ষীর যাচ্‌না!—ভিক্ষুকের মিনতি! —আর তো নাই সেই স্নিগ্ধবাণী যাহা আমার অন্তরের ঊর্ম্মিবিক্ষোভ প্রশমিত করিয়া দিত!—কোথায় সেই চিত্রলেখা যাহা আমার মর্ম্মপটে মুদ্রিত হইয়া রহিত?'

—শূন্য প্রাসাদশিখরে উতলা বাতাস করুণ তানটুকু লইয়া বৃথাই হা হা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৬

প্রেম কল্পনার মদির আবেশ টুটিয়া দিয়া কবির নিকট অকস্মাৎ একদিন সংবাদ আসিল—তাহার নীরস রচনা-কৌশল বিরাট রাজসভার উপযোগী নহে! —গায়কের নিকট সংবাদ পৌঁছিল—তাহার কণ্ঠস্বর আর রাজসভাকে মোহিত করিবার মত মাধুর্য্য রাখে না!

—অনাদর ও উপেক্ষার মধ্যে উভয়ের মনে পড়িল অতীতের সেই মুক্ত আনন্দ, সেই বিপুল তৃপ্তি, সেই পরিপূর্ণ শান্তি!—দুইটী পিপাসিত বিরহী অন্তর মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল।

সেই মাধবী নিশায় জ্যোৎস্নাপ্লুত তটভূমির পাদদেশে তরল রজতরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে। নিথর জ্যোৎস্না সাগরকে বীচিচঞ্চল করিয়া পরপারের কৃষ্ণরেখা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে এক মধুর মিলন-গীতি,—নৈশ পাপিয়ার কণ্ঠে কাঁপিয়া উঠিতেছে তাহারই ঝঙ্কার,—কল্লোলিনীর কলগানে বাজিয়া উঠিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনি!

—জনহীন তটভূমে সুধাবর্ষী রজত-নির্ঝরের নিম্নে

মিলনের আনন্দ বন্ধুদ্বয়ের বেদনাতুর অন্তর নিরাময় করিয়া দিল।

আবার তেমনি কবির ছন্দপাশে প্রকৃতির মর্ম্মকথা বাঁধা পড়িতে লাগিল।—আবার তাহা তেমনি করিয়া গায়কের আবেগসংক্ষুব্ধ কণ্ঠ-স্বরে উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে লাগিল।

নিখিল আকাশ শতনেত্রে নীরবে চাহিয়া রহিল।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

গৃহজাত শাকসবজির বাগান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাদ্র। পূর্ব্ববঙ্গে এই মাসেও পলিমাটীতে লাউ-বীজ রোপণ করা হয়। প্রণালী ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, বৈশাখ মাসের ফসলে দ্রষ্টব্য। এই মাসে কপি, শালগম, গাজরের বীজ বুনিতে হয়। এই সকল বিলাতি বীজের সার প্রস্তুত করা একটা আড়ম্বর বিশেষ। কাঠকয়লার গুঁড়া ৵০, এবং পুরাতন পাতার সার চূর্ণ ।০, দোঁয়াস মাটী ॥৵০ একত্রে মিশাইয়া চালুনীতে ছাঁকিয়া, প্রাতে কোন একটা ঝাঝরি অর্থাৎ তলা ছেঁদা পাত্রে জল দিয়া রাখিতে হইবে। এরূপ জল দিবে যেন, সমস্ত মাটী অর্থাৎ ঐ মিশ্রিত সার ভিজিয়া, বৈকালে বেশ ঝরঝরে হইবে। এদিকে জল রৌদ্রতপ্ত করিয়া বীজগুলি ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া, পরে ছাঁকিয়া লইয়া, ছাই মাখাইয়া শুকাইতে হবে। বৈকালে গামলার সারমাটী গুঁড়াইয়া সমান করিয়া পাত্‌লা ভাবে বীজ ছড়াইয়া, হাত দিয়া একটু একটু চাপিয়া দিতে হইবে। এবং সারারাত শিশিরে রাখিতে হইবে। পরদিন, সাদা বালি মিশ্রিত করিয়া ঐ সার মাটী দ্বারা বীজগুলি অল্প অল্প ঢাকিয়া দিতে হইবে। চারা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত, দিনে ছায়ায় ও রাত্রে বাহিরে রাখিতে হয়, কিন্তু দেখিতে হইবে গাম্‌লায় যেন কোন প্রকারে বৃষ্টি না লাগে। চারা বাহির হইলে ক্রমে ক্রমে রৌদ্র সহ্য করাইতে হইবে। প্রতিদিন খড়ের গোছার দ্বারা জল দিয়া ঐ গাম্‌লার মাটী ভিজাইয়া দিতে হইবে, পলিমাটী না পাইলে ইহার জন্য পচা গোবর ও খৈল দ্বারা মাটী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আশ্বিন মাসে ঐরূপ প্রস্তুত জমিতে দেড় হাত অন্তর কপির চারা রোপণ করিতে হইবে। চারিদিন অন্তর উত্তম রূপে জমি জলে ভিজাইয়া ও কোদালি দ্বারা খুঁড়িয়া দিতে হইবে। পাতা ধরিলে পচা ও পাকা পাতা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

কপি—সাধরণতঃ কপি তিন প্রকার—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি। ইহাদের মধ্যে আবার নানা জাতীয় ফুল, বাঁধা ও ওল কপি আছে, তাহাদের ইংরাজি নাম "অটাম্ জায়েণ্ট ভিয়েসা, অক্স হার্টলার্ড, আরলিয়েণ্ট গ্রীস প্রভৃতি। এস্থলে লিখিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। ফুল ৮ রকম, বাঁধা ২০ রকম, ওল ও ৪।৫ রকম।

শালগম—পাটনাই, ওলন্দাজি, লালবড়মাথা, জরদ, বরফবৎসাদা ও গোল এই কয় প্রকার। ইহার সারে একটু নুন মিলাইয়া দিলে ভাল হয়। ইহার বীজ অতি পাতলা, হাওয়ায় উড়িয়া যায়, যখন বাতাস না থাকে তখন রোপণ করা কর্ত্তব্য। মাছিতে ইহার বড় ক্ষতি করে, সে জন্য ইহার নীচে কাঠের ছাই দেওয়া উচিত। ছয়টী পাতা বাহির হইলে ইহাও আশ্বিন মাসে তুলিয়া লইয়া সার দেওয়া জমিতে ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপণ করা উচিত।

গাজর—পুষ্টিকর সব্জি। পাটনাই বিলাতি নানা প্রকার আছে।

আশ্বিন—এই মাসে উপরি লিখিত কপি, শালগম ও গাজরের বীজ রোপণ করিতে হইবে। ঐ জমিতেই পালং, টক পালং, বিট, রোপণ করা যায়। ঐরূপ সার সংযুক্ত কিছু বালি মিশ্রিত জমিতে আলু ও মূলা রোপণ করিতে হয়, ইহা বেলে মাটীতে ভাল হয়। নিয়মিত মাটী পাট করিয়া বসাইলে ৫।৭ সের ওজনেরও মূলা দেখা যায়। ভাল বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

মূলা—জোনপুরে। আউসে, শীতের, বিলাতি ডেভেনের।

আলু—নৈনিতালী, বিলাতি। আলু আধ হাত অন্তর সারি সারি পুঁতিতে হয়। পুঁতিবার দিন প্রত্যেক আলুর উপর জলের ছিটা দিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ

বিস্তৃত জমিতেই রোপণ করা হয়, তবে বাগানে যদি কাহারও সখ ও স্থান থাকে কিছু পরিমাণে রোপণ করিয়া দেখা যায়। স্থান থাকিলে এই মাসে বাগানের কোন স্থানে বুট, সরিষা, খেঁসারি ও ধনিয়া কিছু কিছু বুনিয়া দেওয়া উচিত, কারণ উহাদের শাক বড় সুস্বাদু, ধনিয়ার পাতা ব্যঞ্জনে দিলে খুব মুখরোচক সুগন্ধ হয়।

কার্ত্তিক—এই মাসে উচ্ছে, করলার বীজ বুনিতে হয়। জলা জমিতে ইহা হয় না। উচ্ছে বারমাসও হয়। এই মাসে মটর বা কলাইসুঁটী রোপণ হয়। মটর কয়েক জাতীয়—সাদা, ওলন্দাজি, বিলাতী মটর বা পিজ্। পিঁয়াজ এই মাসে রোপণ করিবে, মাটীর নীচে এক হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে। ছোট ও বড় দুই জাতীয়।

অগ্রহায়ণ—সোলা কচু, গিমীকুম্‌ড়া এই মাসে রোপণ করা হয়। সোলা কচু বর্ষার যেখানে এক বা দেড় ফুট জল দাঁড়ায় সেখানে ভাল হয়। মুখী কাটাইয়া লাগাইলে ভাল হয়। এই মাসেও মূলা, শালগম, গাজর রোপণ করা চলে। পটলের চারা এই মাসে করিতে হয়, ইহার বীজে গাছ হয় না, দুই ইঞ্চি শিকড় সমেত একটী গাঁইটের, দুই পাশ এক ইঞ্চি করিয়া ডাল সমেত কাটিয়া কোন একটী পাত্রে গোবরের সারযুক্ত জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কেবল শিকড় ভিজে, এরূপ জলে ১৮ ঘণ্টা ভিজিবে, পরে গাঁইট সমেত ডালটি রোপণ করিতে হইবে। পটল শীতল স্থানে ভাল হয়। পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায় পানের বোরের মধ্যে মধ্যে পটল রোপণ করে।

পৌষ ও মাঘ—এই মাসে পুনরায় লাউ, কুম্‌ড়া, ঝিঙ্গা, শশা প্রভৃতি রোপিত হয়, এগুলি চৈত্র মাসে ফলে সুতরাং ইহাদিগকে 'চৈতে' ফসল বলে। আলু এই মাসে একবার তোলা যায়।

ফাল্গুন ও চৈত্র—এই দুই মাসে পৌষের রোপিত সব্‌জি বৃক্ষ ফলবান্ হয়। এইরূপে বারমাসই শাক্-সব্‌জির বীজ রোপণ করিয়া সুদৃশ্য সুখকর বাগান প্রতি অন্তঃপুরে প্রস্তুত করা সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য। যাঁহার যতটুকু স্থান আছে তাহার সদ্ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। শাক্-সব্‌জির বাগানের বিষয় লেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সুতরাং এস্থলে ফলের বৃক্ষের বিষয় লেখা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন কোন ফল হইতেও উত্তম তরকারি হয় এই জন্য তাহারও উল্লেখ করা গেল। গৃহস্থের ভূমি থাকিলে ফলের বাগান করাও কর্ত্তব্য।

পেঁপে, কলা, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, লেবুগাছ হইতে যেমন সুমিষ্ট ফল হয়, আবার মুখরোচক ব্যঞ্জনও প্রস্তুত হয়। ইহা উভয় পক্ষেই প্রয়োজনীয়। এই সকল বৃক্ষ সাধারণতঃ বীজ ও আঁটী হইতে হয়। তদ্ভিন্ন আর এক প্রকারে ফলের বৃক্ষ রোপণ করা হয় তাহাকে 'কলম' বলে। কোনও গাছের একটী ছোট ডাল কোনও স্থানে চাঁছিয়া মাটী, গোবর ও চিংড়ির খোলা প্রভৃতির সার তথায় দিন কতক বাঁধিয়া রাখিলে, সেই স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন সেই ডালটী কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিলেই তাহাকে কলমের চারা বলে। কলমের গাছ শীঘ্র বড় হয় ও ফলবান্ হয়। আম, জাম, লিচু, লেবু প্রভৃতির কলম করা যায়। কলার ঝাড় হয়। পুরাতন গাছের গোড়া হইতে আপনি নূতন চারা বাহির হয়, সেই চারা অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। কাঁচাকলা, থোড় মোচা উত্তম সব্‌জি। নারিকেলও অনেক ব্যঞ্জনের স্বাদ বৃদ্ধি কারক। আধ হাত শীতল মৃত্তিকা কাদা করিয়া একটী গাছপাকা নারিকেল বোঁটার ধার উপরে রাখিয়া রোপণ করিবার নিয়ম। এই সকল সুমিষ্ট ফলের ও স্বাস্থ্যকর সব্‌জির বাগান করা দরকার। পেঁপে সুমিষ্ট ফল, কাঁচা পেঁপে উপাদেয় তরকারি। গরীব ও বিধবাগণ এই সকল বাগান করিয়া বেশ দুপয়সা আয় করিতে পারেন।

ফুলের মধ্যে বকফুল, মোরগফুল হইতে সব্‌জি হয়। আমাদের হিন্দুগৃহে প্রতিদিন দেবকার্য্যে পুষ্পেরও যথেষ্ট প্রয়োজন। গোলাপ, বেলী, চামেলি, জবা, অপরাজিতা, সেফালিকা প্রভৃতি সুদৃশ্য, সুগন্ধ পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিলে গৃহের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ফল, ফুল, শাক্-সবজির বাগান অন্তঃপুরে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বঙ্গগৃহিণী, গৃহাশ্রমের গৌরব বৃদ্ধি ও পরোপকার সাধন করিতে পারেন।

শ্রীপ্রমোদবালা সেন।

সাজঙ্গী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মহম্মদআলি সন্ন্যাস ত্যাগ করিল না, সে তেমনি কম্বলাসনে বসিয়া এক বস্ত্রে সর্ব্বদা আল্লার নাম লইতে লইতে বিষয় কার্য্য দেখিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে সাদুল্লা খাঁর এক বস্তা আসরফি চুরীর অপরাধ সে ক্ষমা করিতে পারিল না। ভৃত্য সঙ্গে ছিল সে স্বচক্ষে সুজাদালীর মৃত্যুর রাত্রে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে চাবি খুলিয়া মোহরের বস্তা বাহির করিতে দেখিয়াছে। মহম্মদ নিজেই প্রধান সাক্ষী। সাদুল্লা ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কঠিন দণ্ডগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জমিদারের ক্ষতিপূরণার্থ কাড়িয়া লওয়া হইল। তখন এসকল বিষয়ে জমীদারই বিচারক ছিলেন। অপমানে সাদুল্লার জননী, বধূ ও ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে লইয়া সহর ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ জানিল না। বলিতে হইবে কি মা! এই দেলেনাই সেই দুর্ভাগ্য প্রভুভক্ত নির্ব্বাসিত সাদুল্লার অনাথিনী কন্যা। অবশ্য একথা মা ভিন্ন অন্য কোন লোকে জানিত না। মা এই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাদের উপর বেশি যত্ন দেখাইতেন এবং সাদুল্লার গর্ব্বিতা জননীর যথেষ্ট আপত্তি সত্বেও ছলে ছুতায় তাহাদের সাহায্য করিতে ছাড়িতেন না। দেলেনা প্রতিদিন এইখানে খেলা করিতে আসিত, মার কাছে বসিয়া তাহার বড় বড় কালো চোক দুটি মেলিয়া তাঁহার মুখের রূপ-কথা ও আমার পাঠ শুনিত। সকল সময়ই প্রায় সে তাহাদের কুটীর হইতে আমাদের ঘরে পলাইয়া আসিত। তাহার নানী সেজন্য কতদিন তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন, তথাপি সে শুনিত না। মাও কখনো তাহাকে মুসলমান কন্যা বলিয়া ঘৃণা করিতেন না, বলিতেন সর্ব্বভূতে নারায়ণ অধিষ্ঠান করিতেছেন মুসলমান বলিয়া উহাকে তিনি কি ত্যাগ করিয়াছেন? তবে সমাজে যে সকল আহারাদি ঘটিত বাধা আছে আমার তাহাতে কি? দেলেনাতো আর আমার হবিষ্য রাঁধিয়া দিতেছে না! ঘরে দ্বারে বেড়াইতে দোষ কি? ব্রহ্মচারিণী সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, তাঁহার নিকট আমি ও দেলেনা সমানই। মাত্র পূজা ও আহারকালে দেলেনাকে অস্পৃশ্য দেখিতাম। তারপর মাতৃহারা হইয়া দেশত্যাগী হইলাম, দেলেনার কথা আর ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। গুরুদেবের মুখে বৈরাগ্য-সন্ন্যাস শুনিয়া শুনিয়া নারী-বিদ্বেষ-চিত্তে স্বীয় অধিকার একটু একটু করিয়া বিস্তৃত করিবার চেষ্টা ছিল, এমন সময় সহসা একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এর চেয়েও কিছুপরে আমি ওইখানে (ফকির অঙ্গুলীদ্বারা সাজঙ্গীর পশ্চিমতীর দেখাইয়া বলিলেন) বসিয়াছিলাম, সাজঙ্গীর নীলজলে অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি ও গোলাপী আভাযুক্ত শুভ্রমেঘখণ্ডের ছায়া ভাসিয়া যাইতেছিল, চারিদিকের গাছপালা ঝিলমিলে রৌদ্রে হাস্য প্রফুল্ল, সে জল লইতে আসিল। সে দিন তাহার পরিধানে একখানি সিউলীফুলে ছোপান সাড়ি ছিল, চুলগুলি বাঁধা হয় নাই ভুজঙ্গ-শিশুর মত তাহারা সেই পদ্মফুলের মত মুখখানির আশে পাশে ফণা তুলিয়া নাচিতেছিল, সে আমার পাশ দিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত শরীরে বস্ত্রপ্রান্ত একটু গুটাইয়া জলে নামিল, আমি প্রথমটা তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই, কারণ আমার মন তখন একটা কঠিন বৈয়াকরণিক সূত্রের প্রতি নিবিষ্ট ছিল তাছাড়া অনেক দিনের অদর্শন অবস্থায় দেলেনার আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং আমার মন হইতেও সে যেন কতকটা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। অন্যমনস্কভাবে জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছিলাম, সহসা কিসের একটা শব্দে চমক ভাঙ্গিল, চকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, যে জল লইতে আসিয়াছিল, সে আমারি হস্তচ্যুত কিংশুক গুচ্ছটি ধরিতে গিয়া তাহার মাটির কলসীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ফুলটা তাহার হাতে কিন্তু সেটা তখন বোধ হয় তাহার মন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কারণ সে সেই ভাঙ্গা কলসীটার দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া পড়িয়াছিল। এ দৃশ্যে আমার ভারি হাসি পাইল, আজি আমি ভগবান্ শঙ্করের মোহ মুদ্গর মুখস্থ করিয়াছি, "মায়া ময়মিদমখিলং—হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।" এইতো কথা,

আর নির্ব্বোধ বালিকা একটা তুচ্ছ মাটীর কলসীর জন্য ক্রন্দনোম্মুখ! হায়রে মায়াময় জগতের অন্ধ মায়া! ভাল করিয়া চাহিতেই চকিতের মধ্যে সে মুখখানা মনো দর্পণে বিম্বিত হইয়া উঠিল। ও হরি! এ যে দেলেনা! হাসিয়া বলিলাম, "কি দিল্! কলসীটার জন্য ভারি দুঃখ হচ্ছেনা?" দেলেনা তাহার বিষণ্ণ চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া সবেগে ভৎর্সনার স্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আর নানী যখন বক্‌বে তখন!" তখন তাঁকে বলো নশ্বর জগতে কিছুই স্থায়ী নয়, তা কলসীটাই বা চিরকাল থাকবে কেন? দিল্, একটা শ্লোক শিখ্‌বে; "মূঢ় জহীহি ধনাগম"—দেলেনা তাহার কুঞ্চিতকেশদামবেষ্টিত ক্ষুদ্র মস্তকটি সবেগে নাড়িয়া অধীরভাবে বাধা দিল "ঠাকুর! এখন তোমার শ্লোক রেখে দাও, আমার বকুনি খেয়ে প্রাণ যাবে, তোমার কি? নানী ঐ কথা শুনলে আর রক্ষা থাকবে না। এই লক্ষ্মীছাড়া ফুলটাই তো যত অনর্থের মূল! এই বলিয়া সে সক্রোধে ফুলটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ফুলটা আমার গায়ে আসিয়া পড়িল, হাসিয়া কুড়াইয়া লইয়া তাহার রাগ দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া আবার কহিলাম "আরে ছ্যাঃ। দিল্, একটা কলসীর জন্য কান্না! তোমার কখনই মুক্তি হবে না। আচ্ছা দাঁড়াও আমার কলসীটা তোমায় এনে দিচ্ছি।" কলসীর শোকে না কাঁদিলেও আমার বিদ্রূপে দেলেনা লজ্জা পাইয়াছিল, আমার শেষের কথাটা শুনিয়া নতমুখ তুলিয়া আমার পানে চাহিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা কেন নেবো? আমি দ্রুতপদে আমার কুটীর হইতে মৃৎকলস আনয়ন করিয়া জল ভরিয়া বলিলাম, "তাতে ক্ষতিটা কি? দেলেনা একটু সরিয়া গেল, বলিল "না তোমার বাবা বকবেন, আমি নেব না।" আমি হাসিলাম, "গুরুদেব আমায় বকেন না তোমারই নানী বকবেন তুমি নাও।" অনেক পীড়া-পীড়িতে অগত্যা সে শেষকালে জল লইয়া বাড়ী গেল, সেদিন সন্ন্যাসীর অনুদ্বিগ্নচিত্তে প্রথম উদ্বেগ কম্পন অনুভব করিলাম, সেই দিন জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন, আজও সেদিন স্পষ্ট মনে পড়ে।

গভীর আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম। জিনিস ত সেই তুচ্ছ মাটীর কলসী, বিষয় তো ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণ, তবে তাহার মধ্য হইতে এত আনন্দ এত আত্মপ্রসাদানুভব হয় কেন? আজ দেলেনাকে অনেকদিনের পর নূতন অবস্থায় দেখিয়াছি। নূতন ভাবেত দেখিতে পাই নাই। তথাপি বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারি কথা মন জাগিতে চাহিতেছে কেন? দূর হউক্, জটিল সূত্র ক্রমাগত আর ভাল লাগে না। গুরুদেব বলিলেন, "বৎস, আজ জল পাই নাই, জল লইয়া আইস, তখন চমক ভাঙ্গিল। উত্তর না করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভু সস্নেহে কহিলেন, "ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ক্ষতি কি এসো আজ আমরা সরোবর হইতেই পদপ্রক্ষালন করিয়া আসি।" অপরাধীর মত বলিয়া ফেলিলাম "না প্রভু আমি তাহা অপরকে দিয়াছি।" স্নেহ প্রফুল্লমুখে সন্ন্যাসী আমার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "উত্তম করিয়াছ।" পরদিন দেলেনা আসিয়া আমার কুটীর দ্বারে দাঁড়াইল, পুস্তক রাখিয়া বাহিরে আসিলে সে ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে বলিল, "নানী তোমায় ডেকেছেন।" আমি বিস্মিত হইলাম। "আমাকে? কেন? তুমি বুঝি কলসীর কথা বলেছ?" বসন্তের মলয়ের মত মধুর হাসি হাসিয়া সে বলিল, "বাঃ তা বলবোনা ত কি চোরের মতন তোমার জিনিষ নেব নাকি?" মনে মনে তাহাকে প্রশংসা করিলাম, বলিলাম, "আচ্ছা।" সেদিন তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া রুক্ষ-ভাষিণী বৃদ্ধার নিকট হইতে একটুখানি কোমলতা আদায় করিয়া আসিলাম; সেটা এমনি দুর্ল্লভ জিনিষ যে দেলেনা সবিস্ময়ে জানাইল তাহার জীবনে সে কখনো তাহার নানীকে এত বিনীত হইতে দেখে নাই।

(৪)

আমরা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলাম। সন্ন্যাসীর কাহিনী সত্য সত্যই আমাদের কর্ণে কাহিনীর মত শুনাইতেছিল, সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত্ত নীরব হইলেন। শীতল বাতাসে নিমগাছের শাখা হইতে কতকগুলা ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া আমাদের মাথায় পড়িতে লাগিল। এক ঝাঁক পাখী গাছের মধ্যে, কিচমিচ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম, তারপর?" সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন, "তারপর! আঃ, তারপর কি বলিব মা, সে অধঃপতন কাহিনী ফকিরেরও অকথ্য, কেমন করিয়া বলিব মা, জ্ঞানাবতার পরম পণ্ডিত প্রবর আনন্দ স্বামীর শিষ্য হতভাগ্য যুবক এক মুসলমান কুমারীর প্রেমে তাহার আজীবনের শিক্ষা, দীক্ষা সব বিসর্জ্জন দিল, সর্প শিশুর মত সে অকৃতজ্ঞ প্রতিপালকের হৃদয়ে তীব্র দংশন করিয়া তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করিল। আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম, তীব্র হলাহল পানে আমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে আর রক্ষা নাই। যেদিন এ হৃদয়-রহস্য নিজের নিকটে প্রথম উদ্ঘাটিত হইল, তাহার অনেক পূর্ব্বেই বোধ হয় তাহা অন্যের দৃষ্টিগম্য হইয়াছিল। কারণ, দেলেনার নানী কয়দিন ডাকিয়া পাঠাইয়া অবশেষে নিজেই সেদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে কথা প্রমাণ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা একেবারেই কঠিন মুখে বলিয়া গেলেন "দেলেনার বংশাবলী সমস্তই তুমি জান আমিও জানি, তুমি সর্ব্বাংশে তাহার উপযুক্ত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, দেলেনাকে তুমি কবে বিবাহ করিতেছ?" আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিবাহ! আমি বিবাহ করিব? সমস্ত বিবেক বুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কার, ব্রহ্মচর্য্য আজীবনের অতুল স্নেহরাশি সেই সব বিসর্জ্জন দিয়া! মনে মনে কাতর হইয়া ভূতভয়গ্রস্ত বালক পশ্চাতের কল্পিত ছায়ামূর্ত্তি হইতে যেমন করিয়া সবলে চক্ষু ফিরাইয়া রাখে তেমনি করিয়া অন্তরস্থ অলোকসামান্যসৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তির পানে না চাহিয়া জোর করিয়া মনের মধ্যে একটা অংশকে চাপিয়া ধরিলাম। গুরুদেব! গুরুদেব! রক্ষা কর, তোমার স্নেহঅঙ্ক হইতে আমায় বুঝি টানিয়া লয়! আমার পিতা, আমার প্রভু, আমায় ধরিয়া রাখ।" মুহূর্ত্তে সেই স্নেহহাস্যমণ্ডিত গম্ভীর মুখচ্ছবি হৃদয়ে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিল, সে আলোকের কাছে কোথায় রহিল বাসনাময় প্রেম, কোথায় রহিল সুন্দরী দেলেনা। বৃদ্ধা আমায় অনেকক্ষণ নিরুত্তর দেখিয়া বিরক্তির স্বরে আবার প্রশ্ন করিল, "তোমার ইচ্ছাটা কি? তোমার পালয়িত্রী মা তোমায় বোধ হয় এ বিবাহের কথা অনেক বারই বলিয়াছিলেন? তিনি আমাকেও ইহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিব না, লোকে বড় নিন্দা করিতেছে।" সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলাম, "অসম্ভব! মা আমায় তামাসাচ্ছলে সে কথা বলিতেন, বাস্তবিক তিনি হিন্দু হইয়া মুসলমান কন্যা গ্রহণ করিতে বলেন নাই, এবং বিবাহ করিতেও উপদেশ দেন নাই। আমি কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী সন্ন্যাসী, দেলেনা আমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, আমায় ক্ষমা করুন।" রমণী বিদ্যুতাহতের মত বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল। যেন সে আমার নিকট হইতে এমন উত্তর পাইবে ইহা স্বপ্নেও বিশ্বাস করে নাই। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে যেন কতকটা, আত্মসম্বরণ করিতে করিতে স্তম্ভিত স্বরে ধীরভাবে কহিল, "তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, তুমি নিজের সম্বন্ধেই আজও অজ্ঞ কিন্তু সব কথা এখন ত বলিবার নয়, আমি মিথ্যাবাদিনী নহি, তোমার মার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কিছুতেই ভুলিব না। কিন্তু খাঁ সাহেব! বুঝিয়া দেখ ইহাতে তোমার অধর্ম্ম হইবে না, বরং তোমার সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিও তুমি দেলানার জন্যই সৃষ্ট, দেখ তোমাদের ভাগ্য আজীবনই সমান পথে আরম্ভ হইয়াছে।" আমি সবেগে বাধা দিলাম, "আশ্চর্য্য! দেলেনা সম্ভ্রান্ত মুসলমান কন্যা, আর আমি অনাথ হিন্দুকুমার, তাহাতে সন্ন্যাসী; সংসারে দেলেনার উপযুক্ত পাত্রের অভাব হইবে না, আমায় ছাড়িয়া দিন।" বৃদ্ধার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে আশ্চর্য্য আত্মদমন করিয়া লইল, কেবল মাত্র কঠিন স্বরে কহিল "ভাল, কিন্তু আজ হইতে তুমি আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিও না তোমার নিজের ক্ষতি নিজেই করিলে।"

আমি নত মস্তকে সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম, আজ এই সামান্য ঘটনাতেই আমার নিজের উপর অনন্ত বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম, আমার হৃদয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে এইবার যথেষ্ট সবল হইয়াছে, আজ আমি আত্মজয়ের অসাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, ধন্য আমার গুরুর উপদেশ! আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া মনে মনে নিজকে ধন্যবাদ দিলাম।

মহা মহা জ্ঞানীগণ যে পথে অচঞ্চল থাকিতে পারেন নাই আপনাকে সেই পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিলাম। বাহিরে জ্যোৎস্না জাল পাতিয়া শুক্লা চতুর্দ্দশীর পূর্ণচন্দ্র উঠিতে ছিল, দ্বারে দাঁড়াইতেই জলের ধার হইতে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। চিনিলাম, সে কণ্ঠ দেলেনার; ভাবিলাম আর কেন? এইতো অবসর। জীবনের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় ফলাফল সবইতো এইবারেই নির্ভর করিতেছে, এই মুহূর্ত্তে দূরে চলিয়া যাই। কিন্তু দেলেনার অপূর্ব্ব গীতধ্বনির করুণ সুরটুকুর বুঝি কোন গুপ্তসম্মোহিনী শক্তি ছিল; সাপেরা বুঝি বংশীর ঐ শক্তিতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, হরিণগুলা বুঝি ঐ মায়ামন্ত্রে প্রাণ হারাইতে ছুটিয়া যায়? ভাবিলাম একবার শেষ বিদায় লইয়া আসা উচিত, সেতো আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে, "আর কিসের ভয়? কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব,—এই শেষ।" নিকটে গেলাম, জলের উপর তাহার মেহেদি রঞ্জিত রাঙ্গা পা দুখানি ছড়াইয়া দিয়া শুভ্রাম্বরা বীণাপাণির ন্যায় মুক্তকুন্তলা দেলেনা তটভূমে ঘাসের উপর বসিয়া আছে। তাহার গলার জুঁই এর গোড়ে তাহার হাতে সুগ্রথিত পদ্মমালা, সে আপন মনেই সেই পদ্ম মালা-গাছা ঘুরাইয়া অন্য মনে চাহিয়া সঙ্গীতের ওই একটি চরণই ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে ছিল,—"চৌঢ়ন্ন দিশি দিশি পেখন না ভেলো পিয়াস লাগরহি রে।"

আমার মনে হইল বুঝি হরকোপানলে ভস্ম মদনের বিরহে রতি একা এই নির্জ্জন বনভূমে বিরহ বেদনা ছড়াইয়া দিতেছে, ধীরে ধীরে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিল, কেমন করিয়া কখন কি ঘটিল জানি না, এক মুহূর্ত্তে সব ভুলিলাম, প্রতিদিনকার মতনই অসঙ্কোচে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দুই করে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিলাম। দেলেনা হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "ইঃ আমি যেন বুঝতে পারিনি? সচ্চিদানন্দ স্বামী।" আমার নাম সচ্চিদানন্দই বটে, "স্বামী" পদটা সেইই জুড়িয়া দিয়াছিল, আমার সংজ্ঞা হইল, সচকিতে তাহার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম, হায় আত্মাভিমানী মূঢ়!

সে আমার দিকে ঈষৎ মস্তক ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন কেমন করিতে লাগিল, আর আবেগ রুদ্ধ করিতে পারিলাম না, এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম "দিলু,আজ তোমার কাছে জন্মের মতন বিদায় লইতে আসিয়াছি, আর এ পৃথিবীতে তোমায় আমায় দেখা হইবেনা। দেলে না বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া আমার পানে ফিরিল, ভয়ব্যাকুল-দৃষ্টিতে বিঁধিতে উদ্যত ব্যাধের পানে হরিণী যেমন করিয়া চাহিয়া দেখে তেমনি করিয়া সে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সেখানে সে বুঝি একবিন্দুও তামাসার চিহ্ন খুঁজিয়া পাইল না, তাই এবার অস্ফুট-জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কেন? আমি অবিচলিত কণ্ঠে কহিলাম তোমার নানী আমায় তোমার সহিত— বাধা দিয়া সে আশ্বস্তভাবে বলিয়া উঠিল মিশিতে বারণ করেছেন তো? আঃ—সে কতক্ষণের জন্য, নানী তোমায় বড্ড ভালবাসেন। "আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ বেদনা পাইলাম কিন্তু তখনও বিবেক বুদ্ধিহারা হই নাই, তাই পাষাণের মত বিশ্বস্ত হৃদয়ার সরল বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, "জানি দেলেনা তিনি আমায় ভালবাসেন, সেইজন্যই ধর্ম্ম ও জাতিতে পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি তোমায় আমাকে দিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিতেছ ইহা একবারেই অসম্ভব। আমার সব কথা শেষ না হইতেই দেলেনা ধীরে ধীরে মাটীতে বসিয়া পড়িল, ইচ্ছায় নয়—বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতে আবার সেই জলের ধারে ঘাসের উপরেই বসিয়া পড়িল, নতমুখে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলের উপর চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না, অথবা কথা কহিতে পারিল না, বলাই সঙ্গত হয়। সেই হতাশাঙ্কিত ম্লান মুখ আমার হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিয়া উঠিল, কে যেন তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, "পাষণ্ড! এতো বিশ্বাসের এই পুরস্কার দিতেছিস্, এ পাপে কোন্ দেবতা তোকে ক্ষমা করিতে পারিবেন?" সহসা মুখ তুলিয়া চাপা গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া দেলেনা প্রশ্ন করিল "কেন!" সেই ক্ষুদ্র কেন? যে কতো ভাবেই ভরা ছিল তাহা অন্ধও বোধ হয় দেখিতে পাইত—শিথিলভাবে ভগ্নস্বরে কহিলাম—"আমি চির কুমার সন্ন্যাসী।"

দেলেনা আবার নত দৃষ্টি তুলিল দ্রুত স্বরে কহিল, বুঝিতে পারিলাম তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল তথাপি অনেক কষ্টে বলিল "তুমি সন্ন্যাসী নহ—শিষ্য মাত্র," মনের বল হারাইতে ছিলাম তাহা নিজের কাছেই অপ্রকাশ্য ছিল না, সমস্ত ন্যায় যুক্তি দূরে সরিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে চারিদিক হাতড়াইয়া যাহা মিলিল তাহাই গ্রহণ করিলাম, বলিলাম "তথাপি আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান কন্যা।"

আবার সে চোক নিচু করিয়া জলের দিকে চাহিল, আমি যেন অপরাধীর মত জড়িতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একবার দেলেনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম সে মুখ গভীর ভাবপূর্ণ আসন্ন ঝটিকাপূর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ গম্ভীর, সাজঙ্গীর বক্ষে চাহিলাম মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল জল মধ্যে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা জলরাশিকে ঈষৎ সঞ্চালিত করিতেছিল, আর সেই চন্দ্র ছায়া কম্পিত শীতল জলে দেলেনার পদ্মহস্তচ্যুত সাধের পদ্ম মালা ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, অসহ্য আবেগে পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিলাম "মায়াবিনি! মায়াবিনি! তুই আমায় ডুবাবি, তারপর সামলাইয়া লইলাম "আজ বাড়ী যাও দেলেনা, আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, তখন আমার ভবিষ্যৎ স্থির করিয়া বলিব, আজ বিদায়।" দেলেনা নীরবে তাহার কৃষ্ণোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় মেলিয়া একবার মাত্র আমার পানে চাহিল, সে দৃষ্টি কতোভাব কতোভাষা বহন করিয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিবার নয়, শুধু বুঝিবার। হায় মানুষের আত্মাভিমান, এরি এত গর্ব্ব! যে গর্ব্ব একখানি সুন্দর মুখ মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারে! আর ধন্য তুমি রমণী! গভীর ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিলাম, মনে পড়িল এই সে দিন পুস্তকে পাঠ করিয়া তদ্গদ্ হইয়াছিলাম" কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা, কাশৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী, ত্যজং সুখং কিং? রমণী প্রসঙ্গ! দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী, সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা? স্ত্রী। হা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য! হায় গুরুদেব! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

পথ্য ও পরিচর্য্যা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(পূর্ব্বে প্রকাশিতের পর)।

২৬। রোগীর কফ, থুথু ইত্যাদি যেখানে সেখানে না ফেলিয়া কোন একটী পাত্রে ধরিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২৭। রুগ্ন দেহ নিঃসৃত মল, মূত্র, কফ ইত্যাদিতে অধিকাংশ স্থলে বিষাক্ত কীটাণু বা উদ্ভিজ্জাণু (ব্যাকটিরিয়া ব্যাসিলি) সকল বর্ত্তমান থাকে সুতরাং ঐ সকল যেখানে সেখানে না ফেলিয়া একটী গর্ত্তে ফেলিয়া তাহাতে মাটী চাপা দেওয়া উচিত।

২৮। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি পুষ্করিণীর জলে না ধুইয়া জল উঠাইয়া উপরে ধোয়া কর্ত্তব্য।

২৯। রোগীর মলমূত্রাদি নিক্ষেপান্তর কিংবা রোগীর শরীর স্পর্শের পর ও প্রত্যেক বার ঔষধ ও পথ্য প্রদানের পূর্ব্বে সাবান-জল দ্বারা শুশ্রূষাকারীর হাত ধুইয়া লওয়া উচিত।

৩০। প্রায়শঃ সকল রোগেই রোগীর বুক ও পেটের উপর কাপড় নিতান্ত আবশ্যক হয়।

৩১। প্রায় কোন রোগেই পিপাসার সময় রোগীকে জল না দেওয়ার ব্যবস্থা—কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই; সুতরাং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে গরম কিংবা শীতল জল একবারে বেশী না দিয়া বার বার অল্প অল্প করিয়া দেওয়া উচিত।

৩২। ব্যবস্থিত পথ্যও তেমনি একবারে বহুপরিমাণে না দিয়া বারংবার অল্প অল্প করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩৩। বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত রাত্রি ১১টার পর হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত কোন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৩৪। রোগীর অন্নপথ্য ব্যবস্থা হইলেও প্রথম দিন পেট ভরিয়া খাইতে না দিয়া সামান্যই দেওয়া আবশ্যক।

৩৫। রোগীকে বাতাস করা আবশ্যক হইলে তালপাতার পাখা কিংবা নিমপাতা দিয়া বাতাস করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩৬। মাথার উপর হইতে নিম্নদিকে আস্তে আস্তে বাতাস করা উচিত। প্রায় কোন রোগেই, রোগী ইচ্ছা করিলে, বাতাস করিতে বাধা নাই।

৩৭। রোগীর গা'টিপা আবশ্যক হইলে রোগী সহ্য করিতে পারে মত অনতি জোরে অনুলোম ভাবে অর্থাৎ যে অঙ্গ টিপিতে হইবে তাহার উপরদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নাভিমুখে টিপিতে হইবে।

৩৮। শরীর মর্দ্দন আবশ্যক হইলে প্রত্যেক মাংসপেশীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ভাঁজে ভাঁজে মর্দ্দন করা উচিত। সন্ধিস্থানে জোরে টিপা বা মর্দ্দন করা অবিধেয়।

৩৯। খিচুনীর সময় আক্ষিপ্ত অঙ্গ জোরে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করা নিতান্ত বিপজ্জনক, সেই সময় পেশী ও সন্ধির ভাঁজে ভাঁজে নাতি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ খিচুনীতে বাধা না দিয়া যাহাতে খিচুনীর দরুণ রোগীর কোন অংশের কোনরূপ ক্ষতি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধরিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

ঔষধ রক্ষা ও ঔষধ সেবন।

৪০। পরিষ্কার স্থানে যেখানে কোন প্রকার ধূলা, বালি, ধূম ও কোন প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি না থাকে এমন স্থানে ঔষধ রাখা কর্ত্তব্য। এলোপ্যাথিক এবং কবিরাজী ঔষধেও অন্য জিনিষের উগ্র গন্ধ মিশ্রিত হইলে ঔষধের গুণের ব্যত্যয় ঘটে।

৪১। এক ঔষধের উপর অন্য ঔষধ রাখা উচিত নহে, প্রত্যেক ঔষধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে রাখা উচিত।

৪২। অনেক ঔষধেই বিষাক্ত জিনিষ থাকে, সুতরাং যাহাতে ঔষধের শিশি কোন ছেলেপিলের হাতে না পড়িতে পারে এমন ভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাখিতে হইবে।

৪৩। অনেকের বিশ্বাস যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোন অনিষ্টকারী জিনিষ নাই, সুতরাং তাহা যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা যায়, কিন্তু একথা ঠিক নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অযথা রূপে ও অতিরিক্ত ভাবে সেবন করিলে প্রত্যক্ষভাবে তৎক্ষণাৎ জীবন নষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট করে। সুতরাং ঔষধ মাত্রই অতি সতর্কতার সহিত বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।

৪৪। প্রত্যেক বার ঔষধ সেবন করাইবার সময় স্থিরচিত্তে ঔষধগুলি ভালরূপে দেখিয়া নিয়মাবলী পাঠ করিয়া গ্লাস ধুইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে ঔষধ খাওয়াইবে।

৪৫। যে সময়ে কোন চাঞ্চল্য বা অন্যমনস্কতা থাকে সেই সময় কিংবা কোন ঔষধ নষ্ট বা অপরিষ্কার থাকিলে অথবা ঔষধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেই ঔষধ কখনও সেবন করাইবে না।

৪৬। সন্দেহ স্থলে কিছুকাল বিলম্ব করিয়া ঔষধ খাওয়াইলে কোন অনিষ্ট হয় না কিন্তু অযথা ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে।

৪৭। শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ শিশির কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে।

৪৮। ঔষধ ঢালিবার সময় নির্দ্দিষ্ট মাত্রা হইতে অতিরিক্ত ঔষধ পড়িয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঔষধ খাওয়াইবে। কোন ঔষধে জল মিশান আবশ্যক হইলে সেই জল উত্তম ও পরিস্রুত কিনা তাহা দেখিয়া লইবে।

৪৯। কবিরাজী ঔষধের অনুপানের দ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া লইবে, তাহাতে যেন কোনরূপ ধূলা বালি, পোকার বাসা, ঘুণের গুঁড়া ও শুষ্ক লতা পাতা ইত্যাদি না থাকে।

৫০। প্রত্যেক বার ঔষধ সেবনের পর ঔষধ খাওয়াইবার গ্লাস বা পাত্র উত্তমরূপে ধুইয়া আবৃত স্থানে রাখিয়া দিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার।

আকাশের প্রণয়িযুগল।

(জাপানী উৎসব-কথা)

অনন্ত নীল প্রান্তর—ছায়াহীন, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সমাকুল, শীতল আলোকস্পর্শময় ও নীরব; মধ্যে তরল

রজত ধারাবৎ শুভ্র অনন্ত বিস্তৃত ছায়ানদী, ফেনপুঞ্জ বারি-তরঙ্গ বিধূনিত হইয়া ধূম্রবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার পূর্ব্ব উপকূলে সৈকত সিকতায় দাঁড়াইয়া একটী নক্ষত্রবাসিনী তরুণী সারাবৎসরের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত হৃদয়ের সজীব প্রেমভার লইয়া নির্নিমেষ নেত্রে পশ্চিম উপকূলের প্রেমাস্পদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সারাবৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র তাহাদের মিলনের এইক্ষণিক অবসর। তরুণীর মুখে উৎকণ্ঠা ও আবেগ দুই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ আবেগের সঙ্গে বিষাদ ও বিশেষতা মিশিয়া রহিয়াছে। ছায়ানদীর দীর্ঘ বিস্তার ও প্রচণ্ড ঊর্ম্মি আস্ফালন যদি প্রিয়তমের আগমনের বাধা জন্মায়! —এই উৎকণ্ঠা।

কখনো ঊর্ম্মির চূড়াগ্রভাগে, কখনো ঊর্ম্মিমধ্যগত অতল গহ্বরে—একখানি ক্ষুদ্র তরণী পশ্চিম উপকূল হইতে নাচিয়া নাচিয়া অগ্রসর হইতেছিল; তরুণীর দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ তরুণীর প্রেমাস্পদ হিকোবোশি সেই ক্ষুদ্র দাঁড় দিয়া সজোরে তরণী চালনা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে তরণীখানিকে গ্রাস করিবার জন্য বিফল চেষ্টা করিতেছিল। হিকোবোশির সে দিকে দৃষ্টি ছিল না; কতক্ষণে প্রণয়িনী তনাবতার কাছে পৌঁছিবে! —সজোরে, আরো জোরে সে ক্রমাগত তরণী চালনা করিতেছিল। দাঁড়ের বারম্বার ক্ষেপণে উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু শিশিরের মত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া হিকোবোশির তরণী ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল। এখনও কতদূর! প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট এক যুগের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। ওই ত তানাবতা, নদী উপকূলে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হিকোবোশির হাত হইতে ক্রমাগত জোরে তরণীর দাঁড় ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তবু পথ ফুরায় না! হাত অবশ হইয়া গিয়াছে, তবু কোথা হইতে বল আসিয়া সজোরে তরণী চালনা করিতেছে! আর কতক্ষণ! তানাবতা এই আমি আসিয়াছি,—তোমার শুভ্র হাতের উষ্ণ অঙ্গুলিগুলি আমি দেখিতেছি, গলায় তোমার মোতির মালার মিলনসূত্র খানি আমার চক্ষে পড়িতেছে, তোমার নীল চক্ষের তলে আর্দ্র-পক্ষ পাতা যে মৃদু কাঁপিতেছে তাহাও দেখিতেছি, ভয় নাই তানাবতা,—ভয় নাই, আমি আসিয়াছি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হিকো-বোশি তরুণীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিল না. হিকোবোশি লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিল।

দু'জন দু'জনকে গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিল।

"তানাবতা!"

"হিকোবোশি!"

নদী উপকূল অজস্র আনন্দ অশ্রুতে সিক্ত হইতে লাগিল। দুই জনের কণ্ঠ হইতে দুজনের প্রেমপূর্ণ স্বর উত্থিত হইল

"প্রিয়তম!"

"জীবন সর্ব্বস্ব!"

দিগন্তের প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইল—"মিলনের শেষ মুহূর্ত্ত অতীত প্রায়, বিদায় লও, বিচ্ছিন্ন হও।"

দুইজন, নিদ্রিতের শয্যাপার্শ্বে বজ্রপাতের শব্দ-চকিতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল। দুই জনের দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। নিরাশহৃদয় দুইজনে পরস্পরের আঁখির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। হায়! প্রণয়ে বিধাতার এই নিদারুণ অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নয়।

শিথিল হস্ত আপনিই সরিয়া আসিল।

বেদনাপ্লুত কণ্ঠে হিকোবোশি বলিল,—

বিদায়, প্রিয়তমে!

দুই জনে চোখে চোখে কি ভাষা প্রকাশ করিল তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন!

হিকোবোশি তরণীতে উঠিয়া দাঁড়ে হাত দিল, তাহার শিথিল হস্ত নড়িল না।

তরঙ্গে তরণী ভাসাইয়া চলিল—দূর হ'তে সুদূরে চলিল।

তরুণী নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উষার তারার মত অস্ত গেল—কখন? কেহ লক্ষ্য করিল না বিমর্ষতার আঁধারে কখন মিশিয়া গেল।

(২)

বৎসরান্তে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হিকোবোশি ও

তানাবতায় এ মিলন সংঘটিত হয়। কেন এই অসীম বিচ্ছেদের মধ্যে এই ক্ষণিক মিলন এবং মিলনের মধ্যে এই দারুণ অভিশাপ? প্রণয়ের মধ্যে এই অনন্ত বিচ্ছেদ-নদী প্রবাহিত!

তানাবতা বিধাতার কন্যা, স্বর্গীয় রাজ্যের সুবিমল জ্যোৎস্না দিয়া তাহার দেহ গঠিত। তানাবতা পিতৃভক্ত ও অনুক্ষণ পিতৃসেবা-পরায়ণা ও বৃদ্ধ পিতার একমাত্র আশ্রয় যষ্টি; তানাবতা নিশিদিন পিতার সেবা বই কিছুই জানে না—পিতার সেবায় তাহার হৃদয়ের সন্তোষ, সমগ্র প্রেম, সমস্ত যত্ন উছলিয়া পড়ে। বিশ্বজগতের যত প্রিয় সকলই পিতার পূজা নৈবেদ্যে অর্পণ করে।

দিনে দিনে তানাবতার মনেপ্রাণে নবীন যৌবন উপলিয়া উঠিতে লাগিল। একদিন তানাবতা পিতার কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ একটী নবীন যুবাকে দেখিতে পাইল। তাহার অঙ্গের লাবণ্য দেখিয়া তানাবতা আকৃষ্ট হইল। তাহার হৃদয়ে এক দারুণ অভাবের সৃষ্টি হইল; বিশ্বজগতের সমস্ত দিয়াও তাহা পূর্ণ হয় না। তানাবতার হৃদয় যেন ছারখার হইতে লাগিল। বিশ্বস্রষ্টা অভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে অভাব পূর্ণ করিলেন।

মুগ্ধা তানাবতার সহিত তদনুধ্যায়ী সেই নবীন যুবক হিকোবশির মিলন সংঘটিত করিয়া দিলেন।

দুইজনের হৃদয়-তৃষ্ণা পরস্পরকে পাইয়া মিটিল। কিন্তু দুইজনই দুজনের প্রতি এত মত্ত ও অনুরক্ত হইল যে তানাবতা পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিল, হিকোবোশি স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া অনুক্ষণ প্রণয়িনী সঙ্গে যাপন করিতে লাগিল।

বিধাতা দেখিলেন, তিনি স্বীয় সৃষ্ট কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে এমন বিদ্রোহ খাড়া করিয়াছেন যে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, সকলেই স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া আত্মসুখে তৃপ্ত হইতে চায়। তখন তিনি আর এক সৃষ্টি করিয়া অতৃপ্তির এক অনন্তধারা প্রবাহিত করিলেন এবং সমস্ত তৃপ্তির মাঝখানে আপনার অখণ্ড অতৃপ্ত ধারা বিস্তৃত করিলেন।

সেই অবধি তানাবতা এবং হিকোবোশিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে নির্ব্বাসিত হইল। বিধাতার আদেশে দুইজন বৎসরান্তে কেবল মাত্র একদিন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মিলিত হইতে পারে।

সেই অতৃপ্তির ধারাই মনুষ্য জীবনে সহস্র অপূর্ণতার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। তানাবতা ও হিকোবোশি এই দুইজনই আকাশের প্রণয়িযুগল।

তাহাদের দীর্ঘশ্বাস ও প্রেমের অতৃপ্তি মনুষ্য জীবনেরই রূপক চিত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

রন্ধন, আহার এবং গৃহস্থালী।

(১)

আমাদের দেশের রমণীদের দৈনিক কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রধানতঃ আহার্য্য প্রস্তুতের জন্যই ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবার পরেই, তাঁহাদের ভাবনা উপস্থিত হয়, ছেলেরা কি খাইবে? মাছ, তরকারী যেরূপ দুর্ম্মূল্য তাহাতে কর্ত্তার সম্মুখেই বা কি রাঁধিয়া দিবেন? এইরূপ চিন্তায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অস্থির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতে উঠিয়া প্রাতর্ভোজনের আয়োজন, তারপর মাধ্যাহ্নিক আহারের বন্দোবস্ত, তৎপর বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বশেষে রাত্রির ভোজন প্রস্তুত করিয়া তবে একটু নিশ্চিন্ত হন। বালকেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাদিগকে শাসন করিবার সময়ও ঐ কথা, "লেখা পড়া শিখিলি না কি করিয়া খাইবি?" বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেও একটা আপত্তি, লেখা পড়া শিখিলে তাহাদের রন্ধনাদি ভালরূপে শেখা হইবে না। স্বামী, পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করানই নারীজীবনের প্রধান লক্ষ্য, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন, এবং আশৈশব এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া থাকেন।

সেইরূপ পুরুষেরাও মনে করিয়া থাকেন, উদরান্নের

জন্যই অর্থোপার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জনের জন্যই শিক্ষা, কোনরূপে নিজের এবং পরিবারের অন্ন বস্ত্র যোগাইতে পারিলেই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। পরিবারকে দুই একখানি অলঙ্কার দিতে পারিলে তো কথাই নাই, এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারিলে তো মানব জন্মের পূর্ণ সার্থকতাই হইল। বস্তুতঃ যে ভাবে আমরা অধুনা জীবন যাপন করিতেছি, তাহার একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনরূপে শরীর রক্ষা করাই যেন আমাদের জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে।

যে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন এবং আত্মার উন্নতির উপর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে, তৎপ্রতি আমরা নিতান্তই উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। এই ঔদাসীন্য বশতঃই আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে আহার্য্য প্রস্তুত করাতেই, নারীজীবনের সার্থকতা, ইহা ছাড়া নারীর তেমন আর কোন কর্ত্তব্য নাই। তাই ছেলের বয়স পঞ্চদশ পার হইতে না হইতেই মাতা আবদার আরম্ভ করেন, "বুড়ো বয়সে আর সয় না, এখন ছেলের বিবাহ দেই, ঘরে বউ আসুক, ঘরকন্নার কাজ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।" বাহাত্তর বৎসরে বিপত্নীক বুড়োও ঐ ধূয়া তুলিয়া বলেন, "খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট, পরে কি আর তেমন যত্ন করিতে পারে? তাই একটা বিবাহ করিব ভাবিতেছি।" নারীশক্তি সম্বন্ধে এরূপ সংকীর্ণ ধারণা কতদূর ন্যায়সঙ্গত আজ আমরা তাহার বিচার করিব না, যে রন্ধন নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, শিক্ষার অভাবে সে কর্ত্তব্য পালন করাও যে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, অদ্য আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চন্দ্র, সূর্য্য, এবং নক্ষত্র প্রভৃতি আমাদের সর্ব্বদাই নয়নগোচর হইতেছে অথচ অজ্ঞ লোকেরা তাহাদের প্রকৃতি এবং পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু মনে করে সকলই জানে, সেইরূপ রন্ধনাদি সম্বন্ধে আমরা না জানিয়াই মনে করি, সব জানি। আমরা মনে করি, খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু করাই রন্ধন-নৈপুণ্যের পরিচয় এবং কোনরূপে প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করাই আহারের সার্থকতা। ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণাগুণ, উহাদের সহিত মানবশরীরের সম্বন্ধ, ভোজ্য কিরূপে রন্ধিত হইলে উহা সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর হয়, কয় জনে রন্ধনের সময় একথা ভাবিয়া থাকেন?

প্রত্যহই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই পূরণের জন্যই আহার। শিশুদের শরীরের ক্ষতি পূরণ এবং গঠন উভয়ের জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন আহার দিতে হয়। আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে কোনও ক্লেশ না হয়, এজন্য দয়াময় পরমেশ্বর নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য আহার্য্য দ্রব্যগুলি সুস্বাদ বোধ হইবার জন্য রসনার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে প্রাণীগণ আহার করিবার সময় তাহারা কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে মনে করে না, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ এবং তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা অনেক কাজেই মুখ্য অপেক্ষা গৌণের প্রাধান্য দিয়া থাকি। ভোজন ব্যাপারেও তাহাই। রসনার তৃপ্তিই আমাদের আহারের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি, শরীর রক্ষা যে উহার প্রধান উদ্দেশ্য ইহা ভুলিয়া যাই।

গৃহসজ্জার উপকরণ প্রভৃতির দ্বারা ঘর সাজাইবার সময়, উহাদের উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য এবং শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি সকলের উপরই দৃষ্টি রাখিতে হয়, কোনটীকেই বাদ দিলে চলে না। বাসগৃহ যদি আমরা শুধু ছবি দিয়াই সাজাই, ঘরে বসিবার বা শুইবার কোন বন্দোবস্ত না করি, তবে শুধু ছবি দেখিলে চলে না। আবার যদি নড়া চড়ার পথ বন্ধ করিয়া শুধু টেবিল চেয়ার দ্বারাই ঘর বোঝাই করি তাহা হইলে অসুবিধার একশেষ হয়। আবার কোন্ কোঠায় কোন্ জিনিষটী রাখিলে মানায় তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছবিগুলি মেজের উপর ছড়াইয়া রাখিয়া চেয়ার গুলি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে কেহই বুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। সর্ব্বোপরি গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে সকল সজ্জাই বৃথা হয়। সেইরূপ আমাদের খাদ্য শুধু রসনার তৃপ্তিকর হইলে

চলিবে না, শরীররূপ গৃহাভ্যন্তরে পাঠাইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, উহা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উপযোগী কিনা। ভোজ্যদ্রব্য যে খুব স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক তাহা এসম্বন্ধে ভগবানের ব্যবস্থা দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রথমতঃ খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইলে নাসিকা তাহাকে গ্রহণ করিতে চায় না, তার পর ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত, কণ্ঠনালী প্রভৃতি প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রেরই একটা প্রধান কার্য্য কোনও খারাপ জিনিষকে উদরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া। সুতরাং ছাই ভস্ম একটা কিছু উদরে প্রবেশ করাইলে কেবল আহারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় তাহা নহে, বিপদও আছে। শরীর রক্ষার জন্যই আহারের প্রয়োজন, কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য নহে, এই কথাটী না বোঝাতে নারীগণ জীবনের অধিকাংশ সময় রন্ধনশালাতে ব্যয় করিয়াও দুষ্পাচ্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আপনার জনের ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুস্বাদু জিনিষ মাত্রই সুখাদ্য নহে। যাহা সহজে পরিপাক হয়, এবং শরীরের যে সকল অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা পূরণ করিবার পক্ষে উপযোগী তাহাকেই সুখাদ্য বলে, একথা জানা থাকিলে, এবং এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য তাহা বুঝিলে, যে সময় আমরা রন্ধনশালাতে ব্যয় করি, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে আমরা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া বিষয়ান্তরে আমাদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিতে পারি।

ভোজন ব্যাপারে, অর্থ, সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ ক্ষতি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের নিমন্ত্রণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ উৎসবেরই প্রধান অঙ্গ 'ভোজ'। কোন উৎসবে সকলে মিলিয়া আহার এবং আমোদ আহ্লাদ করা খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাবে আমাদের দেশে বড় বড় ভোজ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তাহাতে মনে হয়, কন্যাপণ প্রভৃতি কুপ্রথার ন্যায় এই প্রথাও উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। কারণ বড় ভোজ ব্যাপারে নিমন্ত্রণকর্ত্তার অর্থনাশ, মানসিক উদ্বেগ, নিমন্ত্রিতদের অসময়ে গুরুভোজন জনিত স্বাস্থ্যনাশ এবং বাড়ীর মেয়েদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ব্যতীত আর বিশেষ কোনই লাভ নাই। ভোজ-দাতার প্রধান ইচ্ছা থাকে, কিরূপে তিনি ভোজ্য দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। ভোজের বিরাটত্বপ্রযুক্ত তাঁহার ইচ্ছা থাকা সত্বেও উপযুক্ত সময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া উঠে না। যাঁহাদের প্রতি আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুতের ভার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা সকল সময় তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একদিকে রাশি রাশি পাঁঠা খাসী হত হইতেছে, আর কেহ কেহ পান চিবাইতে চিবাইতে মাংস প্রস্তুত করিতেছেন, কত লোম, কত মাটী এবং ধূলিকণা তাহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। যেখানে মসলা বাটা হয়, তরকারী কাটা হয়, সর্ব্বত্রই ঐরূপ অবস্থা। সমস্ত গৃহব্যাপী গোলমাল চীৎকার, হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক থাকেন, এক শ্রেণীর লোক বাড়ী হইতে একবার বেশ করিয়া আহার করিয়া আইসেন, ইঁহারা অসময়ে গুরুতর ভোজন করিয়া অস্বস্তি বোধ করেন। আর যাঁহারা আহার না করিয়া আসেন, তাঁহাদেরও পিত্ত প্রকুপ্ত হইয়া অসুখ হয়। তারপর, নিমন্ত্রণকর্ত্তা ভোজ্য তালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু করিবার জন্য যেরূপ যত্ন করেন, স্থানের সংকীর্ণতা প্রভৃতি নানা কারণে ভোজন-স্থানের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের নির্ম্মলতা প্রভৃতির প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। উঠানে বা সেইরূপ কোন জায়গায় একটা সামিয়ানা টানাইয়া একশত লোক বসাইয়া দেওয়া গেল, সকলের সম্মুখেই এক জোড়া কলার পাত, এবং একটী মাটির গ্লাস। কলার পাতাখানি হয়ত ছেঁড়া, এবং মাটীর গ্লাসটী কোন্ জলে ভরা তাহা ঠিক নাই। ঘর্ম্মাক্তকলেবর পরি-বেশকগণ কোমরে গামছা বাঁধিয়া পরিবেশন করিতেছেন। এই বৈঠক উঠিয়া গেলে গোবর জল এবং ঝাঁটা দিয়া সেইস্থান পরিষ্কার করিয়া সেই স্যাঁতসেঁতে যায়গায় আর এক দল বসাইয়া দেওয়া গেল।

ইহার ফল এই হয় যে ভোজনের পর যে একটা তৃপ্তি লাভ করিবার কথা নিমন্ত্রণ খাইয়া কেহই তাহা বড় লাভ করিতে পারেন না, বরং বিরাট ভোজের

পর অনেকে অসুস্থ হইয়াছেন, এমন কি কেহ কেহ মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন, এমন কথাও শোনা যায়। বড় বড় ভোজের এইপ্রকার অসুবিধার কথা নিমন্ত্রণ কর্ত্তা এবং নিমন্ত্রিত উভয়েই বোঝেন অথচ দেশাচার রক্ষার জন্য এক পক্ষ অকারণ অর্থব্যয় এবং অপর পক্ষ শারীরিক অসুস্থতা সহ্য করেন। নিমন্ত্রণ প্রথা যে উঠাইয়া দিতে হইবে তাহা নহে, ভোজ্য দ্রব্যের কেবল পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে উহা সুপাচ্য, পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ, সংখ্যায় বেশ পরিমিত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভোজদাতা অল্পব্যয়ে, অল্পপরিশ্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন। অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা হইলে এক নিমন্ত্রণের ব্যয়ে চারিটী নিমন্ত্রণ দিতে পারেন।

যাহাহউক এ সকল কথার সহিত আমাদের পাঠিকা ভগিনীদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; যে রন্ধন কার্য্যকে তাঁহারা জীবনের এক মাত্র ব্রত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ এবং যত্ন সত্বেও তাহা স্বাস্থ্যোপযোগী হয় না, অনেক সময় তাহারা পণ্ডশ্রম করেন, এখন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। খাদ্যদ্রব্য সুখাদ্য এবং সুপাচ্য করিবার জন্যই রন্ধনের প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীর রক্ষা করাই আহারের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রন্ধন করা কর্ত্তব্য। কেবল রসনার তৃপ্তি সাধন করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে। একথা ভালরূপে জানা থাকিলে, ঘৃত, মশলা প্রভৃতি দ্রব্যের বাহুল্য দ্বারা খাদ্য দ্রব্যকে গুরুপাক করিবার ইচ্ছা হইবার কোন কারণ নাই, এবং তাহা হইলে আমাদের রন্ধনশালার কাজও অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে

এমন এক দিন ছিল যখন, মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না, অপক্ক দ্রব্য এবং বনের ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। ক্রমশঃ সভ্যতার সঙ্গে অগ্নির ব্যবহার এবং রন্ধনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া রন্ধন এবং আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া কেবল আহার্য্য প্রস্তুত করিতেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে, এরূপ নহে। সুপ্রসিদ্ধ "পাক-প্রণালী" নামক গ্রন্থরচয়িতা শ্রীযুত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "নিত্য ভোজনের দ্রব্য সহজ অর্থাৎ লঘুপাক হওয়া উচিত। নিত্য খাদ্য গুরুপাক হইলে নানা প্রকার পীড়া হইতে পারে। রাত্রিতে গুরুতর আহার করিলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যাঁহাদের পরিপাক-শক্তি তত প্রবল নহে, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম এবং খাদ্য প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারই ধর্ম্মানুমোদিত। এজন্য প্রাণিহিংসা জনিত খাদ্য ইহাদের পক্ষে তত শ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত নহে। অনিত্য দেহ রক্ষার জন্য রাক্ষসবৎ পশু হনন হিন্দুজাতির নিকট অতি ঘৃণিত। তজ্জন্য ঐরূপ খাদ্য এদেশে তত প্রচলিত নহে।" অতএব 'পাক-প্রণালী'তে পাঁচ সের ঘি, এক সের কিসমিস প্রভৃতি দিয়া পলান্ন রাঁধিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ থাকিলেও তাহা যে নিত্য ভোজন বা ক্ষীণপরিপাকশক্তি ব্যক্তিদের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা স্বয়ং পাকপ্রণালীর গ্রন্থকার মহাশয়ই বলিয়া দিতেছেন। আর আজকাল ইংরাজদের দেখাদেখি দেশে একটা ধূয়া উঠিয়াছে, মাংস না খাইলে শরীর বলবান্ হয় না, কিন্তু মাংসাশী বাঙ্গালী যে নিরামিষ ভোজী পশ্চিমাঞ্চলের লোক অপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে উন্নত একথা কেহই স্বীকার করিবেন না। আমাদের দেশের বিধবাগণ নিরামিষ আহার ও এক বেলা মাত্র আহার করিয়াই বেশ সুস্থ ও সবল থাকেন। বস্তুতঃ গুরুভোজনই আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগের মূল কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমান্ দেবরগণ পাকপ্রণালী হাতে করিয়া বৌদিদিদিগকে রন্ধন শিখাইবার জন্য যত সময় ব্যয় করেন, সেই সময়টা তাঁহাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে অনেক লাভ হয়।

তৈল, বাদাম, পেস্তা, ঘৃত প্রভৃতির প্রত্যেকটী পরিপাক হইতে প্রায় চারি ঘণ্টা সময় লাগে, সুতরাং ইহাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত পলান্ন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য যে কতদূর গুরুপাক তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল দ্রব্য যে খুব পুষ্টিকর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুষ্টিকর শব্দের অর্থ এই যে, উহা পরিপাক

হইয়া আমাদের শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পূরণ করিবে, সুতরাং পরিপাক না হইলে তাহা কিরূপে পুষ্টিকর হইবে? টাইটানিক জাহাজ যখন জলমগ্ন হয়, তখন ক্ষুদ্র বোটগুলিই যাত্রীদের নিকট অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, কারণ উহারাই তখন তাহাদের জীবনরক্ষার হেতু হইয়াছিল। সেইরূপ হজম করিতে না পারিলে ঘি, ছানা প্রভৃতি অপেক্ষা মশুর ডালই অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। আমরা খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু করিবার জন্য গুরুপাক করিয়া ফেলি, এবং গুরুপাক খাদ্য প্রস্তুত করিতে যাই বলিয়াই, আমাদের সময়ের অধিকাংশ ভাগই রন্ধন শালায় কাটাইয়াও অপরিপাক জনিত নানাবিধ রোগ-সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়ি। খুব বড় পরিবারেও স্বাস্থ্যের অনুকূল খাদ্য প্রস্তুত করিতে সমস্ত দিনে চারি ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয়িত হয় না। এসম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ সবিস্তার আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নটি অতিশয় দুরূহ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা রকম চিন্তা করিয়াছেন। সেই সকল চিন্তা শাস্ত্রে ও ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। উহা পাঠ করিলে মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয় এবং ধর্ম্মকে এক রহস্যময় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। অথচ ধর্ম্ম আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ধর্ম্ম ভিন্ন কি আমাদের চলে, না সমাজের উন্নতি হয়? সুতরাং অন্ততঃ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তজ্জন্য ধর্ম্মের কতকগুলি সহজ কথা লইয়াই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মনু বলিয়াছেন:—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

অর্থ—ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, চৌর্য্যাভাব, শৌচ, ইন্দ্রিয় জয়, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্ম কি? এই বিষয়ে ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে। যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দ্বিজাতিরা সর্ব্বদা নারায়ণে রত থাকিয়া যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়, আপনি দয়া করিয়া উক্ত ধর্ম্ম আমাকে বর্ণন করুন।" নারদ কহিলেন—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষা শমোদমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবং॥
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহো পরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনং॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতং।
তেম্বাত্ম দেবতা-বুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণং॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥"

অর্থ—সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, জপ, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী ব্যক্তিদিগের সেবা, ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মনুষ্যদিগের নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান; যাহার যেরূপ প্রাপ্য তদনুসারে তাহাদিগকে আহার দান, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান ও দেবতাবোধ এবং মহতের গতি-স্বরূপ ঈশ্বরের নাম, গুণ ও কর্ম্ম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ এই ত্রিংশটি মনুষ্য মাত্রেরই পরম ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত আছে। এরূপ ত্রিংশৎ-লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা সর্ব্বাত্মার সন্তোষ হয়।

মহাত্মা যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণ বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা কি?" যীশু বলিলেন, "তোমাদের পিতা পরমেশ্বরকে সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন ও

সমস্ত শক্তির সহিত প্রীতি কর।" শিষ্যগণ বলিলেন, "আরও সার কথা আছে কিনা?" যীশু বলিলেন—"তোমার প্রতিবেশীকে তুমি আপনার ন্যায় প্রেম কর।"

বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, "নামে রুচি ও জীবে দয়া—ইহাই ধর্ম্ম।" বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিম চন্দ্র বলিয়াছেন—"শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্ব" এবং "যেমন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।"

এই সকল উক্তির সার মর্ম্ম গ্রহণ করিলে এবং ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মজীবনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, কয়েকটি সহজ শব্দের দ্বারা ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) ধর্ম্ম নৈতিক উন্নতি, (২) ধর্ম্ম পরোপকার, (৩) ধর্ম্ম ঈশ্বরকে লাভ করা। মনে করুন, একজন লোক হৃদয়কে সুনির্ম্মল ও চরিত্রকে উন্নত করিয়া নৈতিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন; এবং পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া দুঃখী, পাপী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির নয়নজল মুছাইয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সাধনের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিতে কাহারও কি আপত্তি আছে? আপত্তি যদি না থাকে, তবে ত ঐ তিনটি লক্ষণের দ্বারাই ধর্ম্মকে মোটামুটি বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বাগ্রে মনুর উক্তিতে যে কয়েকটি কথা প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের নৈতিক ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধৈর্য্য, ক্ষমা, অন্তরের পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণগুলি ধার্ম্মিকদিগের নৈতিক গুণ। এই গুণগুলি মানুষের মধ্যে না থাকিলে তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না; কিন্তু শুধুই এই গুণগুলি থাকিলেও মানুষকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিতে পারি না। এই গুণগুলি ত একজন নাস্তিকের মধ্যেও থাকিতে পারে; নাস্তিক কি ধার্ম্মিক?

মনুর উক্তির পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে উৎকৃষ্ট বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের প্রায় সকল ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যপরায়ণতা, শুদ্ধতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, প্রসন্নতা প্রভৃতি বাক্যগুলি দ্বারা ধর্ম্মের নৈতিক লক্ষণ বিবৃত করা হইয়াছে। দয়া, দান, সেবা প্রভৃতি বাক্যগুলির দ্বারা ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ পরোপকারের ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। তপস্যা, জপ, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা ধর্ম্মের তৃতীয় লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, তপস্যা, জপ, সাধুদিগের বাক্যশ্রবণ, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, মহিমা স্মরণ, এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ এবং আপনাকে ঈশ্বরের দাস ও সখা বলিয়া অনুভব করা—কেবল ভগবানকে লাভ করিবার জন্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের পর বাইবেল গ্রন্থ হইতে মহাত্মা যীশুর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এ স্থানে যীশুর আর একটী বাক্য প্রকাশ করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন—যাহাদের নির্ম্মল চিত্ত তাহারা ধন্য, স্বর্গ-রাজ্যে তাহাদেরই অধিকার। তাহা হইলে দেখিতেছি, মহাত্মা যীশু নৈতিক উন্নতি, পরোপকার ও পরমেশ্বরকে লাভ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ, চিত্তকে নির্ম্মল করার অর্থই নৈতিক উন্নতি। প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় প্রেম করিতে হইলেই পরোপকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন সমস্ত হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি করার উদ্দেশ্যই তাঁহাকে লাভ করা।

বৈষ্ণবদিগের জীবে দয়া ও নামে রুচি এই দুইটি কথার মধ্যে ধর্ম্মের দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। জীবে দয়ার অর্থই পরোপকার এবং নামে রুচির উদ্দেশ্যই অনুরাগের সহিত ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া।

তৎপরে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি। উহা চিন্তা করিয়া দেখিলে ধর্ম্মের তিনটি লক্ষণ ব্যতীত আরও কয়েকটি লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শরীরের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, সুকুমার মনোবৃত্তিগুলির উন্নতিকেও ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতিই যে ধর্ম্মের লক্ষ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঈশ্বর আমাদের পূর্ণতা লাভের শক্তি অন্তরে

মহামতি ষ্টেড।

প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অপূর্ণ অবস্থায় এই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বিকশিত করিয়া ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিব এবং জীবনের পূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইব। এই জন্যই মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও সেই রকম পূর্ণ হও। কিন্তু মানব জীবনের যে কিছু কথা, তাহাকেই ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করিতে হইলে, সে আলোচনার আর শেষ কোথায়? কাজেই আমরা ধর্ম্মের তিনটি লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ধর্ম্মের এই তিনটি ভাব কিরূপে অন্তরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, কিরূপে চিত্ত সুনির্ম্মল, হৃদয় পরদুঃখে বিগলিত ও করুণায় আর্দ্র এবং অন্তর ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হইবে, তাহাই চিন্তা করা প্রয়োজন। নচেৎ ধর্ম্ম ব্যাপারটা যে কি, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। সর্ব্বাগ্রে নৈতিক উন্নতির উপায় কি, তৎসম্বন্ধেই চিন্তা করা যাউক। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সেবাপরায়ণা জাহাঁনারা বেগম।

যে সকল মহিলা অতুল বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবদুর্ল্লভ অতুলনীয় সুখৈশ্বর্য্যে লালিতা পালিতা হন, তাঁহারা স্বভাবতঃই বিলাসবিমুগ্ধ, আত্মপরায়ণ, শ্রমবিমুখ, আলস্যাতুর, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা দাসী রাশি পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান না করিলে, শয়ন বা বিশ্রামকালে দুগ্ধ-ফেননিভ কুসুমসদৃশ কোমল কমনীয় শয্যায় আরাম না করিলে, দুর্ম্মূল্য রত্নাভরণে সুসজ্জিত না হইলে, হুকুমের অপেক্ষায় শত শত জনকে ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান না দেখিলে, বার মাস সমভাবে অনন্য-সাধারণ চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় পানাহার না করিলে, তাহাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা; তবে আর তাঁহারা মহা সৌভাগ্যশীল নরসিংহের দুহিতা নন, বনিতা নন।

জগতের এই মোহমূলক মহামন্ত্রে প্রায় সকলেই দীক্ষিতা, সকলেই গৌরবান্বিতা। কিন্তু অপরিসীম ধন ঐশ্বর্য্য, অতুলনীয় সুখ সচ্ছলতা, অভাবনীয় মানসম্ভ্রম, অসংখ্য রত্নালঙ্কার, অনুপমেয় রাজপ্রাসাদ, অগণিত আজ্ঞাবহ দাসী, বহুমূল্য আভরণ, অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক, আতর প্রক্ষিত কুসুম-শয্যা, গোলাপের স্নানাগার—পৃথিবীর মানব কেন, স্বর্গের অপ্সরীগণের স্পৃহনীয়—এই সকলই তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া জাহাঁনারা বেগম স্ব-ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পাদসাহ ত বহু উচ্চের কথা, সামান্য রাজা জমিদারের গৃহেও যাহা অসম্ভব, বিশাল ভারতের ঈশ্বর সম্রাট শাহ জাহাঁনের বিদুষী কন্যা, শাহজাদী জাহাঁনারা তাহাই করিয়া মরজগতে মহান্ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহার সেবা করিতে শত শত দাসী করযোড়ে সম্মুখে উপস্থিত থাকিত; যাঁহার জীবনে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও পরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, তিনি কারাগারের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া পিতৃসেবায় নিরত হইয়া কি অলৌকিক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রমণীকুলের বরেণ্য হন নাই?

সম্রাট্ শাহ্ জাহাঁন স্নেহ বাৎসল্যে বিভূষিত ছিলেন। তদীয় মহিষী সম্রাজ্ঞী মোমতাজ মহল অকালে কাল-কবলিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহার কয়টি শিশু কুমার ও কুমারীকে লালন পালন করিয়াছিলেন। বেগম মোমতাজ মহলের ভালবাসায় তাঁহার নিকট সম্রাট্ শাহ-জাহাঁন আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং শাহ্ জাদা শাহ্ জাদীদিগকে তিনি মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং অপত্যস্নেহে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন।

পাদশাহ্ শাহজাহাঁন জাহাঁনারাকে শুধু বিদ্যাশিক্ষা দিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার রাজনীতি শিক্ষারও তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাহাঁনারা রাজনীতিতেও পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জাহাঁনারা বেগম রাজকার্য্যে সর্ব্বদাই পিতার সাহায্য করিতেন। তিনি যেমন বিদুষী ছিলেন, তেমনই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট্ শাহ্ জাহাঁন এই বুদ্ধিমতী কন্যার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ

করিতেন না। বাস্তবিক জাহাঁনারা দয়াধর্ম্ম পরিপূর্ণ রাজনীতি-বিশারদ উচ্চহৃদয় মহিলা ছিলেন।

বেগম জাহাঁনারার পিতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। রাজবংশীয় শাহ্‌জাদীর স্বেচ্ছায় কারাগারের ক্লেশ বরণ করা এবং পিতার দুঃখে এরূপ সমদুঃখিনী হওয়া, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমাজেও দুর্ল্লভ। এমন ভক্তিশীলা রমণী নারীকুলের গৌরববর্দ্ধিনী। রাজনীতি ও পিতৃভক্তিতে জাহাঁনারার গৌরব স্বর্ণ সোহাগার ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল করিয়াছে।

"সম্রাট্ শাহজাহাঁন সাত বৎসর কাল অবরুদ্ধ থাকিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময় জাহাঁনারা তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া সকল কষ্ট দূরীভূত করিতেন, এবং কায়মনপ্রাণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। বড়ই কষ্টের সময়, বড়ই দুর্দ্দশার সময়, কারারুদ্ধ শাহজাহাঁনকে জাহাঁনারা মাতৃস্নেহে যত্ন করিতেন; তাঁহার দুঃখক্লিষ্ট বেদনাব্যথিত প্রাণে জাহাঁনারা স্নেহসিক্ত ধাত্রীর ন্যায় ভক্তিপ্লুত প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। জাহাঁনারা সম্রাট্ শাহজাহাঁনের অন্ধের যষ্টি ছিলেন, আঁধারের আলো ছিলেন, এবং মরুহৃদয়ের অমৃত প্রস্রবণস্বরূপিণী ছিলেন। এহেন পিতৃগতপ্রাণ কন্যার যত্নেই তিনি দীর্ঘকাল কারা-ক্লেশ সহ্য করিয়াও জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই পুণ্যশীলা বেগমের গৌরবকাহিনী বর্ণন করিয়া স্বীয় ইতি-হাসের কলেবর সুসজ্জিত ও গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

"শাহজাহানের বন্দীদশায় তদীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহাঁনারাই তাঁহার জীবনের আলোকস্বরূপিণী ছিলেন। ভক্তিমতী কন্যার প্রীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল। বার্ণিয়ার জাহাঁনারাকে অনিন্দ্য সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাহ্‌জাহান তাঁহাকে আদর করিয়া "পাদশাহ বেগম" উপাধি প্রদান করেন। কি গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণা, সকল বিষয়েই শাহজাহান তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। জাহাঁনারাও পিতার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। আওরঙ্গজীবের চক্রান্তে শাহ্‌জাহান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে, তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিস্নিগ্ধ সেবা-শুশ্রূষায় শাহ্‌জাহানের কারাক্লেশ যে বহু পরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

"জাহাঁনারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। জাহাঁনারার শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। * * * তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! * * * তাঁহার (জাহাঁনারার) একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্যস্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত মর্ম্মর-ফলকে তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে ঃ—

বহু মূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীনা আত্মা জাহাঁনারা
সম্রাট্ কন্যার।" †

মৌলভী শেখ আব্দুল জব্বার।

মহামতি ষ্টেড্।

টিটানিকের নিমজ্জনে যে সকল অমূল্য রত্ন সাগরগর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, মহামতি ষ্টেডের দেহ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সচরাচর এমন পুরুষরত্ন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। সত্য সত্যই তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবী রত্নহারা হইয়াছে। আমরা তাঁহার অমূল্য জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

"উইলিয়াম্ ষ্টেড্ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ষ্টেডের পিতা একজন অতি দরিদ্র উদারপ্রাণ ধর্ম্মযাজক ছিলেন। পিতার প্রভাব পুত্রের জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য গ্রাম্য বিদ্যালয়েই ষ্টেডের শিক্ষালাভ হয় এবং মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বিদ্যালয়ের

---

* মোগল বংশ।

† ৺ নবীনচন্দ্র সেন।

সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এক সওদাগরের অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। মনুষ্যের প্রতিভা কোন কালেই অবরুদ্ধ রহিতে পারে না। বিদ্যালয় ছাড়িলেও তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি হয় নাই। অবসর পাইলেই তিনি কঠোর অধ্যয়নে নিরত রহিতেন। এই সময়ে ষ্টেডের লিখিত কয়েকখানি পত্র বিলাতের কোন সংবাদপত্র-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ষ্টেডকে তাঁহার পত্রিকার লেখকরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময় ষ্টেডের বয়স আঠার বৎসর মাত্র। কিছুকাল পরিচালন করিবার পরেই ইংলণ্ডের সংবাদপত্র মহলে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময়ে ইংলণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জন মর্লীর সম্পাদকতায় বিখ্যাত "পেল্‌মেল্‌ গেজেট" প্রকাশিত হয়। ষ্টেড অল্পদিন পরেই এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন এবং অনতিকাল পরেই মর্লী পার্লামেণ্ট সভায় সভ্যরূপে প্রবেশ করায় ষ্টেড এই পত্রিকার সম্পাদক রূপে বৃত হন। এই পদে নিযুক্ত হইয়া ষ্টেড্ যাহা সত্য ও ন্যায় বুঝিতেন, নির্ভীক প্রাণে তাহাই প্রচার করি-

টিটানিক জাহাজ।
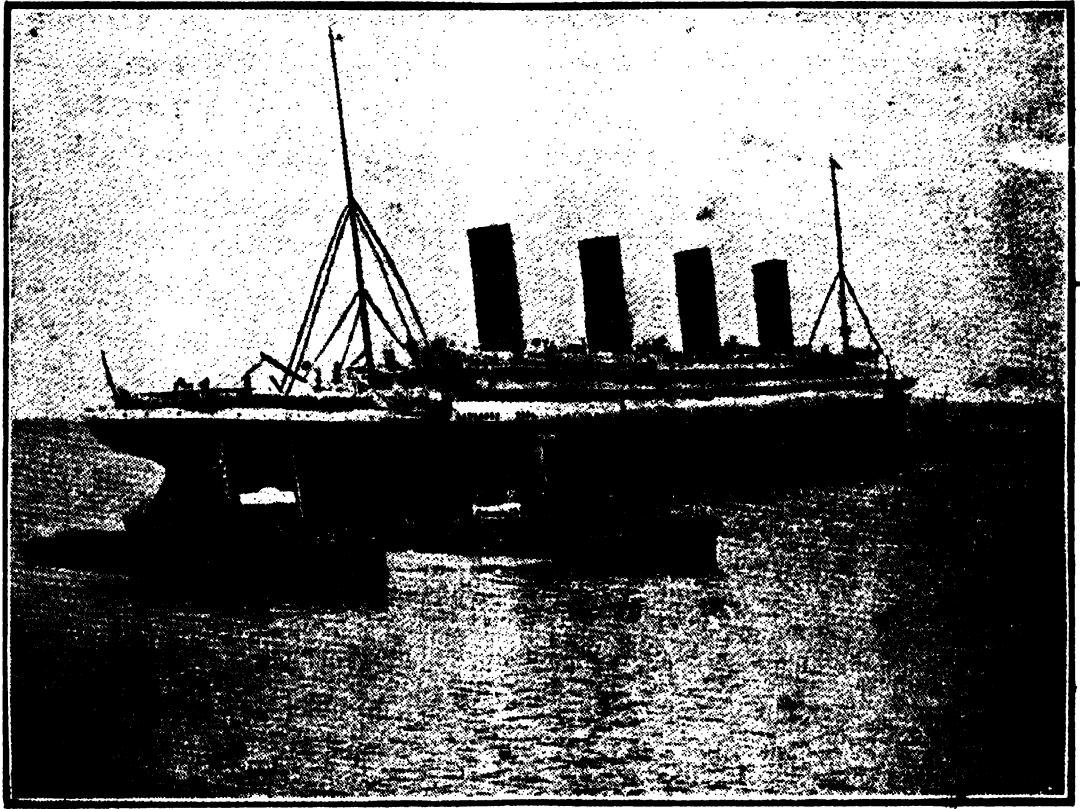
অল্পদিবসের মধ্যেই নিজগুণে ষ্টেড্ এই পত্রিকার সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

একুশ বৎসর বয়সেই এই মহাপুরুষের সম্পাদক জীবনের প্রারম্ভ। অতি যোগ্যতার সহিত এই পত্রিকা তেন। লোকমত বা জনপ্রিয়তার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

অচিরেই তাঁহার নাম দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের লোকে বুঝিতে পারিল, দেশে এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। মহামতি

গ্ল্যাড্ষ্টোন, মনস্বী কার্লাইল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হন। কতিপয় বৎসর "পেল্‌মেল্" গেজেটের সম্পাদকত্ব করিয়া ষ্টেড্ স্বয়ং একখানি দৈনিকপত্রিকা বাহির করেন, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ অর্থাভাব বশতঃ এই পত্রিকা বেশীদিন চলিতে পারে নাই। অতঃপর তাঁহারই উদ্যোগে "টিট্‌বিট্‌স" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে এই পত্রিকা-পরিচালকদিগের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি এই পত্রিকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেডের বিশ্ববিখ্যাত "রিভিউ অব্ রিভিউজ" পত্র প্রকাশিত হইয়া মাসিকপত্র-জগতে এক যুগান্তরের সৃষ্টি করে।

"রিভিউ অব্ রিভিউজ" পত্রিকা ষ্টেডের এক প্রধান কীর্ত্তি। এই পত্রিকায় সমগ্র সভ্য জগতের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রের মর্ম্ম, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক তথ্য, পৃথিবীর যাবতীয় সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্ত, সমালোচনা, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। তাঁহার সংবাদপত্র পরিচালনা প্রণালী ইউরোপে "New Journalism" বলিয়া পরিচিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক উহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইল। ষ্টেডের নাম ঘরে ঘরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর মধ্যেই এই পত্রিকার আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান্ সংস্করণ বাহির হইল।

উক্ত মাসিক পত্র বাহির হইবার কিছুকাল পরেই মহাপ্রাণ ষ্টেড্ সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হন। এই সময়ে লণ্ডনের অসংখ্য পাপপ্রলোভনের হস্ত হইতে অসহায়া, অল্পবয়স্কা ইংরাজ কুমারীকুলকে রক্ষা করিবার জন্য ষ্টেডের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি লণ্ডনের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঐ সকল পাপ কাহিনীর ধারাবাহিক বিবরণ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে বহুলোক ষ্টেডের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পত্রিকা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ষ্টেড উহাতে ভীত বা নিরাশ হইবার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি অদম্য উৎসাহে বিপন্ন ও পতিতের উদ্ধার কল্পে আপনার সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেন। এই রূপে তিনি সমুদয় ইংলণ্ডে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

কিন্তু শীঘ্রই ষ্টেডকে এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। লণ্ডনের এক দরিদ্র পল্লীর পাপপথ-প্রয়াসী কোন পিতামাতার হস্ত হইতে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এক কন্যাকে অপহরণ করিয়া গোপন রাখার অপরাধে তাঁহার নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয়। নাবালিকা কন্যাকে পিতামাতার নিকট হইতে অপসৃত করিবার অপরাধে আইনানুসারে তাঁহার প্রতি দুইমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আইনের নিকট দণ্ডিত হইলেও নীতির দিক হইতে ষ্টেড্ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন। কিন্তু সংস্কারার্থ তাঁহার জলন্ত আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এক বিশেষ বিধি প্রণয়ন করা হয়।

ষ্টেডের চরিত্রে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা একাধারে বিরাজ করিত। পৃথিবীর যেখানে অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার সেইখানেই ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ষ্টেড্ অগ্রসর হইতেন। বুয়র যুদ্ধের প্রতিবাদ ষ্টেডের স্বার্থত্যাগের এক জলন্ত উদাহরণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অন্যতম গৌরব প্রতিষ্ঠাতা ও বুয়র যুদ্ধের প্রধান নায়ক বিখ্যাত সিসিল রোড্‌স্ ষ্টেডের অলৌকিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার এক উইলে দেড়-কোটি টাকা মূল্যের এক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে ষ্টেডের প্রতিবাদ দেখিয়া সিসিল তাঁহাকে জানাইলেন, যে ইহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহার সেই সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু ষ্টেড অম্লান চিত্তে এই মহাপ্রলোভন উপেক্ষা করিয়া আপনার ব্রতে অটল রহিলেন।

ভারতবর্ষের প্রতিও ষ্টেডের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ভারতের আড়ম্বর-বিহীন সভ্যতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতা ষ্টেডের উচ্চ প্রাণকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার গৃহে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন। ষ্টেডের মৃত্যুতে ভারতবাসী এক বিশেষ মিত্র হারাইয়াছেন। হেগ নগরের "শান্তি সভা"

ষ্টেডের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ষ্টেডের মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ কেহই বলিতে পারে নাই। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে "ধর্ম্ম ও জনসঙ্ঘের" অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ষ্টেড ইংলণ্ড হইতে টিটানিক জাহাজে আমেরিকায় যাইতেছিলেন।" কিন্তু যাত্রা শেষ হইল না, অকালে রত্নাকর এই পুরুষরত্নকে গ্রাস করিল।

কাছাড় দুর্ভিক্ষ।

ঢাকার বিধবাশ্রম, কাছাড়—হাইলাকান্দির দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। বিধবাশ্রম শুধু সংবাদপত্রে আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহারা হাইলাকান্দিতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি মহাশয় সেখানে যাইয়া জানিতে পারিলেন, সত্যই সেখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বহু লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত না হইলেও এই অন্নকষ্ট ৪।৫ মাস কাল স্থায়ী হইবে। অভাবক্লিষ্ট লোক অধিকাংশই পার্ব্বত্য জাতীয়, সরকার বাহাদুর ব্যতীত আর তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাহারা যে এই বিশাল ভারতভুমির সন্তান, দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণ যে তাহাদের ভাইভগিনী, দেশবাসীর নিকট যে তাহাদের একটুকু দাবী আছে সে জ্ঞান তাহাদের নাই। কিন্তু হায়! কাতরকণ্ঠে স্থানীয় উপবিভাগের তৎকালীন কর্ম্মচারীর নিকট পুনঃ পুনঃ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেও তিনি তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। বিধবাশ্রমের প্রতিনিধি মহাশয় এই সংবাদ লইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। আসামের গদিতে এখন ন্যায়বান, সদাশয় সার আর্চডেল আর্ল মহোদয় সমারূঢ়। বিধবাশ্রমের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে হাইলাকান্দির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। প্রজারঞ্জক চিফ কমিশনার বাহাদুর আমাদের পত্র পাইয়াই কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনার মহোদয়কে অবিলম্বে হাইলাকান্দি যাইয়া দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার হস্তে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া আমাদিগকে সেই সংবাদ জানাইলেন। আমাদিগকে আরো জানান হইল যে, যত অর্থের আবশ্যক হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রদান করিবেন। বিধবাশ্রমের পক্ষ হইতে আর সাহায্য সংগ্রহ আবশ্যক কি না জানিবার জন্য, কিছুদিন পর, চিফকমিশনার বাহাদুরের প্রধান সেক্রেটরী মহোদয়ের নিকট, ডিপুটী কমিশনারের তদন্তের ফলাফল জানিতে চাহিয়া আমরা এক টেলিগ্রাম করি। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন।

I am directed to acknowledge the receipt of your telegram of the 2nd inst, asking to be informed, of the amount of money that, it is estimeted, will be required for the relief of sufferers from the scarcity that exists in the Hailakandi Subdivision. You ask for the information in order to come to a decision as to whether private charity is necessary.

2. In reply I am to say that, as recommended by the Deputy Commissioner, a sum of Rs 3,000/- has been placed at his disposal for present requirements, on the clear understanding that any further sums that the result of local enquiries may show to be needed will be provided by Government. The Chief Commissioner trusts that the dispensers of private charity will not feel themselves in any way precluded from relieving cases of distress that may come to their notice by the fact that the local authorities are taking action, or from giving as private charity money over and above what the Local Administration can legitimately give.

পত্রের মর্ম্ম এই যে, ডিপুটী কমিশনার সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে, অভাবক্লিষ্ট লোকদিগের বর্ত্তমান

প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার হস্তে তিন হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে, এবং তাঁহাকে একথা পরিষ্কার জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে অনুসন্ধানে যদি জানা যায় যে আরো অর্থের আবশ্যক হইবে তবে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাও দেওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছেন বলিয়া জনসাধারণের সাহায্য করিতে কোন বাধা নাই। আইন-সঙ্গতরূপে গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে পারেন জনসাধারণ তদুপরি অবশ্য সাহায্য করিতে পারেন।

ইতিমধ্যে বিধবাশ্রমের সেবাব্রতধারিণী তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীমতী নির্ম্মলা দাস ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পাঁচ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ পরদুঃখকাতরতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বঙ্গনারী সমাজে নিতান্তই দুর্লভ। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের দেশে এরূপ মহীয়সী নারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। বিধবাশ্রমের একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি পুনরায় দুর্ভিক্ষ স্থলে গিয়াছেন।

ভারত-মহিলা।

হে কল্যাণি! মহাশক্তি অংশস্বরূপিণি!
মহারুদ্রাণীরূপে আজি কর উদ্বোধন!
নীতিধর্ম্ম-কর্ম্ম-হীন বৃথা অভিমানী
পঙ্কবদ্ধ ভারতের—দুর্ভাগ্য জীবন!

কাম-পুতিগন্ধময় বিলোল বাসনা,—
নেহারে "অবলা" "বামা" "প্রেম-বিলাসিনী"
সদা চিত্তে অপ্রসাদ অতৃপ্ত কামনা,
—প্রসাধনরূপে সৃষ্ট জগতে কামিনী!

যাহারি শোণিত বহে বীর ধমনীতে,
মহর্ষির ধ্যান সিদ্ধ যার কৃপাবলে,
যার তেজে ব্রহ্মশক্তি প্রণম্য জগতে,
সে শক্তি, সে তেজোগর্ব্ব ভর বক্ষঃস্থলে!

কুলকুণ্ডলিনি! আজি জাগো মা কল্যাণি!
পুতপুণ্য তপোবন হো'ক এ জগত,
ঘু'চে যাক্ অশান্তির বিকট চাহনি;
স্বার্থ দ্বন্দ্ব অহঙ্কার হো'ক অপগত!

অতীতের পুণ্য স্মৃতি আন বর্ত্তমানে,
ভুলে যা'ক নরনারী বৃথা অভিমান;
কর শুভ শঙ্খধ্বনি,—প্রেমের বরণে
আপনা বিসর্জ্জি কর জগত কল্যাণ!

আবার জাগিবে হেন ঘুম ঘোর হতে,—
পুণ্যগীতে মুখরিত হবে সমীরণ;
আবার "নিবৃত্তি শিক্ষা" আসিবে ভারতে—
মরুভূমে স্রোতস্বতী—বহিবে তখন!
গায়িবে যমুনা গঙ্গা পবিত্র সলিলা—
"ভারত করছে ধন্য ভারত-মহিলা"।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

লেডি কারমাইকেলের অভিনন্দন।

শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণের পত্নী গত মঙ্গলবার তাঁহার দার্জিলিংস্থিত বাস-ভবনে আমাদিগের গবর্ণরপত্নী লেডী কারমাইকেল মহোদয়াকে সাদর অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে রাজা বাহাদুরের প্রাসাদে বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাণী, দীঘাপাতিয়ার রাণী, মিসেস্ মহলানবীশ, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, মিসেস্ এন, সি, সেন, মিসেস্ পি, মুখার্জ্জি, মিসেস্ বি, বি, সরকার, মিসেস্ এম, এন, মিত্র, মিসেস্ দত্ত, মিসেস্ এস, বানার্জ্জি, মিসেস্ গুপ্ত, এবং মিসেস্ এস, সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সমবেত বঙ্গীয় মহিলারা এতদুপলক্ষে লেডী কারমাইকেল

মহোদয়াকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" ও "নেপালে বঙ্গনারী" রচয়িত্রী, ভারত-মহিলার লেখিকা শ্রীমতী হেমলতা সরকার অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে লেডী কারমাইকেল বলিয়াছেন,—"আপনাদিগের এই অভিনন্দন এবং সাদর অভ্যর্থনার জন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গদেশে আগমন করিবার পরে ইহাই আমার প্রথম অভ্যর্থনা। আমি আশাকরি, আপনারা, আমাকে, এইরূপ ভাবে আপনাদিগকে জানিবার সুযোগ প্রদান করিবেন, যাহাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্ব লাভ করিতে পারি। আমার মনে হয়, আপনাদিগের শুভ ইচ্ছা ও সহানুভূতি আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা বঙ্গীয় রমণীগণকে ভালরূপে জানিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ সাহায্য করিবেন। আমি অল্পদিন হয় ভারতে আসিলেও মান্দ্রাজ-মহিলাগণকে আমি বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়াছি এবং আমার বোধ হয় তাঁহারাও আমাকে তাঁহাদের বন্ধুর ন্যায় দেখিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে আমি এত শীঘ্র সকলকে বুঝিয়া উঠিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতাম না। আমি আশাকরি এখানেও আপনারা আমার সহিত তদ্রূপ বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন। আপনাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে শীঘ্রই আমি সকল অবস্থা অবগত হইবার সুযোগ পাইব। অদ্য এখানে আপনাদিগের এই সম্মিলন দ্বারা বুঝিতেছি যে আমার সেই আশা পূর্ণ হইবে।"

আমাদের গবর্ণরপত্নী অতি সদাশয়া মহিলা বলিয়া মান্দ্রাজে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি, কার্য্য ও ব্যবহারে তিনি বঙ্গবাসীরও শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষা।

একখানি ইংরাজী পত্রিকায় মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংকলন করিয়া দিলাম।

স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীচমরাজেন্দ্র উদীয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় মহীশূরে স্ত্রীশিক্ষার বিধিমত চেষ্টা আরম্ভ হয়। মহারাণী-কলেজ হইতে কতিপয় উচ্চবংশীয় মহিলা উপাধি লাভ করিয়া এখন সেই কলেজেই শিক্ষকতা করিতেছেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক মহিলা উপাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাণী-কলেজের সংসৃষ্ট "মহিলা নরমাল বিদ্যালয়ে" শিক্ষালাভ করিয়া বহুসংখ্যক মহিলা এখন মহীশূর রাজ্যের নানাস্থানে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বৎসরের পর বৎসর ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল উপাধিপ্রাপ্তা উচ্চশিক্ষিতা মহিলা, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সকলেই গোঁড়া হিন্দুপরিবারের মেয়ে।

পরিণত-বয়স্কা মহিলারাও এই কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রীদিগকে উৎসাহিতা করিবার জন্য অনেক বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কলেজের সংশ্রবে একটী বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক বিধবা গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছেন। প্রতি বৎসরই কয়েকটী বিধবা মাতৃভাষা ও সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন।

এই কলেজে অঙ্কন, চিত্রবিদ্যা, সূচীকর্ম্ম ও গীতবাদ্য এবং রন্ধনাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়।

নারীর মহত্ত্ব।

টিটানিক জাহাজ ভঙ্গের বিবরণ সকলেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। তুষার-শৈলের সংঘর্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জাহাজখানি দেড় হাজার যাত্রীসহ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। এই শোকাবহ ঘটনার মধ্যে মঙ্গলময়ের কি শুভ ইচ্ছা নিহিত আছে, অল্পবুদ্ধি মানুষ আমরা তাহার কি বুঝিব? এই ভীষণ ব্যাপারে অনেকে অনেক প্রকার মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা নিম্নে কয়েকটী নারীর অপূর্ব্ব মহত্ত্বের বিবরণ সংকলন করিয়া দিলাম।

কুমারী ইভান্স টিটানিকের একজন যাত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার তিন মামী শ্রীমতি কর্ণেল, শ্রীমতী আপেণ্টন ও শ্রীমতী ব্রাউনের সহিত আমেরিকা যাইতেছিলেন। কুমারী ইভান্সের বয়স ৩১, বেশ ঐশ্বর্য্যশালিনী, দেশভ্রমণ করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন

করিয়াছেন। শ্রীমতী কর্ণেল ও শ্রীমতী আপেন্টন এক নৌকায়, শ্রীমতী ব্রাউন ও কুমারী ইভান্স অন্য এক নৌকায় উঠিলেন। যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই শেষ নৌকা ছিল। কিন্তু নৌকায় অতিরিক্ত লোক থাকাতে তাহা জলে ডুবিবার সম্ভাবনা হইল। তখন নাবিকেরা বলিল, "একজনকে নৌকা হইতে নামিতে হইবে।" যিনি নামিবেন, তাঁহার আর জীবন রক্ষা হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। কুমারী ইভান্স তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মামী বলিলেন, "না, মা, তুমি থাক, আমি জাহাজে ফিরিয়া যাই।" তিনি ইভান্সকে বলপূর্ব্বক নৌকায় রাখিয়া জাহাজে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইভান্স বলিলেন, "না মামী, আমিই নৌকা হইতে নামিয়া যাইব। তুমি নৌকায় থাক। বাড়ীতে তোমার পুত্রকন্যা আছে। আমার কেহ নাই।" এই বলিয়া ইভান্স এক লম্ফে নৌকা হইতে জাহাজের উপর উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই টিটানিক জলমগ্ন হইল। কুমারী ইভান্স সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুমারী মেরী ইয়ং যখন এক নৌকায় আরোহণ করেন তখন জাহাজ জলমগ্ন হয়. সে নৌকায় ১৬ জন আরোহী ছিল। ইয়ং দেখিলেন জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে বহুলোক সমূদ্রে ভাসিতেছে। তিনি আরও ১৪।১৫ জনকে নৌকায় উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। নাবিকেরা বলিল, "এই নৌকায় ২৭ জনের বেশী ধরিবে না, যদি বেশী লোক উঠে, নৌকা ডুবিয়া যাইবে।" ইয়ং তেজের সহিত বলিলেন "যা হইবার হউক, আরও লোক লইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে সমুদ্রগর্ভ হইতে অনেক লোককে নৌকায় তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।

ঢাকা বিধবাশ্রম।

নিবেদন।

আমাদের দেশের বিধবাদিগের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়। এমন বিধবা অনেক আছেন, যাঁহারা সংসারে নারীর পরম সম্বল পতিকে হারাইয়া শুধু যে মনঃকষ্টের একশেষ ভুগিতেছেন, তাহা নহে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। শিক্ষার সুযোগ পাইলে তাঁহারা সসম্মানে নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জ্জন করিতে পারেন। উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করতঃ দেশের পরম উপকার সাধন করিতে পারেন। জীবিকানির্ব্বাহের উপায় এবং শিক্ষালাভের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও উপযুক্ত উপায়াভাবে অনেক বিধবা সুশিক্ষালাভ করতঃ আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন না। এই সকল বিধবার জন্য ঢাকা নগরীতে ১৯১১ সনের জুন মাসে একটি হিন্দুবিধবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। নির্ম্মলস্বভাবা বিধবাগণের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিদ্যাচর্চ্চা এবং রোগীর শুশ্রূষা-শিক্ষা ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আত্মোন্নতি সাধন করিবেন। তাঁহাদের জাতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের পবিত্রত অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিহিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিধবাগণ সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষাই শিক্ষা করিবেন। পড়াশুনায় যাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইবে, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত এবং ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এপর্য্যন্ত পাঁচটী স্ত্রীলোক আশ্রমে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের আবশ্যক, নানাস্থান হইতে বিধবাগণ আশ্রয়প্রার্থিনী হইতেছেন, সুতরাং ব্যয়ভারও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইবে। দেশের দানশীল নরনারীর সাহায্য ব্যতীত এইরূপ কার্য্যে সফলতা লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য আমরা নিতান্ত বিনীত ভাবে দেশের সদাশয় নরনারীর নিকট এই বিধবাশ্রমের জন্য অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন, এই নিবেদন। ইতি

শ্রীনির্ম্মলা দাস

উয়ারী, ঢাকা। তত্ত্বাবধায়িকা, বিধবাশ্রম।

[illegible] ভাগ। আষাঢ়, ১৩১৯। ৩য় সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযুবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বার্ষিক মূল্য ২॥৶০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।]

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ– স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারীঅনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৯। | ৩য় সংখ্যা।

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো।

পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখেন সংসারে অনেকে। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন কত গ্রন্থ, কত পত্রিকা প্রসব করিতেছে, কত নরনারী তাহা পাঠ করিতেছে। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণ কি উপকার লাভ করেন, সংসারের তাহাতে বিশেষ কি উপকার হয়, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয়, অধিকাংশ পুস্তক প্রবন্ধ দ্বারা পাঠকপাঠিকার তেমন কোন উপকারই হয় না। রামায়ণ মহাভারত কত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও মানুষ তাহা পড়িয়া কত উপকার লাভ করিতেছে! বাইবেল, কোরাণ জগতের কত নরনারীকে প্রতিদিন নবজীবন দান করিতেছে। কিন্তু এখন কত সুন্দররূপে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই শত শত পুস্তক প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে কয় জনের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়, সমাজের কোন্ দুর্নীতি দূর হয়? দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য কয় জনের চিত্ত ব্যাকুল হয়?

লেখকলেখিকার জীবন যদি নির্ম্মল হয়, কোন বিশেষ বিষয় তাহারা গভীর ভাবে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা লিপিবদ্ধ করেন তবেই সেই লেখা পাঠকপাঠিকার প্রাণ স্পর্শ করে, তদ্দারা সংসারে পাপের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়, মানুষের অন্তরে সাধু ইচ্ছা. আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো এই শ্রেণীয় লেখিকা ছিলেন,

তাই তাঁহার রচিত বিখ্যাত পুস্তক টমকাকার কুটীর এক সময়ে আমেরিকা দেশে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল। আমেরিকার ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা দূর করিবার অনুকূলে এই পুস্তক প্রধান যন্ত্র হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি এমন পুস্তক লিখিতে পারেন তাঁহার ভিতরের জীবন নিশ্চয়ই অতি মূল্যবান। জীবন সুগঠিত ও পবিত্র না হইলে লেখকের লেখা কখনই এমন শক্তিশালী হইতে পারে না। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীমতী ষ্টো'র পিতার নাম ডাক্তার লাইমেন বীচার। তিনি একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ডাক্তার বীচারের ত্রয়োদশটী সন্তান ছিল। তের ভাই-ভগিনীর মধ্যে হ্যারিয়েট ষ্টো মধ্যমা ছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন, আমেরিকার কনেক্টিকাট প্রদেশে, লিচফিল্ড সহরে ষ্টো জন্মগ্রহণ করেন। এই সুবৃহৎ পরিবারে যত সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমেরিকার আর কোন পরিবারে তত সাহিত্যিক জন্মে নাই।

সংসারে সকলই কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। শ্রীমতী ষ্টো'র জীবনও নানা প্রকার প্রভাবের দ্বারা গঠিত। এই সকল প্রভাবের আলোচনা দ্বারা জননীগণ সন্তানের জীবন গঠনে বিশেষ সাহায্য পাইবেন, তাই একে একে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

ষ্টোর জীবন গঠনে দরিদ্রতা বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু ডাক্তার লাইমেনের সময়ে তাঁহাদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। তখন অল্প আয়ে সুবৃহৎ পরিবার প্রতিপালন প্রায় সকল ধর্ম্মাচার্য্যকেই করিতে হইত। সাদাসিদে কাপড়চোপড়, কোন প্রকারে দেহধারণ করিবার উপযোগী খাদ্য ও যৎসামান্য তৈজসপত্রের সাহায্যে তাঁহারা দিন যাপন করিতেন। শীতপ্রধান সভ্যদেশে ভদ্র গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে কার্পেট বিছান থাকে, কিন্তু ডাক্তার লাইমেনের কার্পেট কিনিবার মত অর্থ ছিল না। তাঁহার পত্নী ঘরের মেজের সূতার কাপড় বিছাইয়া তাহাতে তৈলচিত্র আঁকিয়া লইতেন, তাহাতেই কার্পেটের অভাব নিবারণ হইত। তিনি চিত্রবিদ্যায় অতি সুদক্ষ ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাঁহার চিত্রশিল্পনিপুণতার পরিচায়ক।

একদিন ডাক্তার লইমেনের অধীনস্থ একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ঐরূপ তৈলচিত্রাঙ্কিত কার্পেট দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। লাইমেন বলিলেন, "আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।" পুরোহিত উত্তর করিলেন, "ইহার উপর পা না ফেলিয়া কি করিয়া ঘরে ঢুকিব?" পুরোহিতের চক্ষে সাধারণ কার্পেট—সচরাচর ভদ্র গৃহে যাহা বিছান থাকে—তাহা অপেক্ষা উহা এতই উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, যে উহার উপর পদক্ষেপ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। একজন ধর্ম্মযাজকের গৃহে এমন সুন্দর বস্তু ব্যবহৃত হওয়া তিনি আপত্তিজনকই মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি কি মনে করেন, এসকল ভোগবিলাসের দ্রব্য ও স্বর্গ—দুই-ই লাভ করা সম্ভব?" অমন সুন্দর কার্পেট ও স্বর্গ এই দুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদার্থের একত্র স্থান হওয়া তিনি অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন।

শক্তিশালিনী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা হ্যারিয়েটের পক্ষে ধন সম্পদ অপেক্ষা এই দরিদ্রতাই অধিকতর কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। এই কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকার তাঁহার জীবনে যাহা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ছিল তাহার বিকাশ সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। অল্প বয়সেই তিনি গৃহকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। অর্থ থাকিলেই গৃহে ভৃত্য থাকিত, ভৃত্য থাকিলেই কতকটা অকর্ম্মণ্যতার প্রশ্রয় দিত। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আহা, আজ অপরাহ্নকালটী যদি তোমার সঙ্গে কাটাইতে পারিতাম তবে কি আমোদই হইত। কিন্তু জর্জ্জের (তাঁহার ভাই) মোজাগুলি আজ রিফু না করিলেই নয়, কাজেই ২।৪টী কথায় চিঠিখানি শেষ করিয়া আমাকে রিফুকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হইতেছে।" গৃহকর্ম্মের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে ভাইয়ের মোজা রিফু করিতে হয় না। আর এরূপ সুবন্দোবস্ত না থাকিলে সে গৃহে আদর্শ রমণী জন্মে না।

হ্যারিয়েটের জন্মের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ডাক্তার লাইমেনের বৃত্তিতে পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। এজন্য হ্যারিয়েটের মাতা একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কিছু আয় বাড়াইয়া লইলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা, অঙ্কন, চিত্রবিদ্যা, জরির কাজ ও উচ্চ-ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। ভৃত্যশূন্য সুবৃহৎ পরিবারের গৃহিণীর সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি এই কার্য্যের জন্য সময় করিয়া লইতেন।

কিন্তু এই দরিদ্রতা হ্যারিয়েট বা গৃহের অপর কাহারো পক্ষে ক্ষতির কারণ হয় নাই। ইহা পরিবারস্থ সকলেরই শক্তিবিকাশের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। বিশেষতঃ হ্যারিয়েটের ন্যায় তেজস্বিনী, কৌতুকময়ী, মাঠে ময়দানে ভ্রমণশীলা বালিকার পক্ষে বাধ্য হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করা অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। বাল্যের এই দারিদ্র্যক্লেশ তাঁহার পরিণত জীবনকে সবলতর, মহত্তর ও সুন্দরতর করিয়াছিল।

দরিদ্রতার প্রভাবের পরই তাঁহার মাতার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মানবজীবনে মাতৃপ্রভাবের ন্যায় আর কোন প্রভাবই মূল্যবান নহে। শ্রীমতী ষ্টো এবিষয়ে এরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"আমাদের মার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স তিন বৎসরের কিছু বেশী, সুতরাং তাঁহার কথা আমার অল্পই মনে আছে। কিন্তু যাহাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তাহারা সকলেই তাঁহাকে এমন ভালবাসিত ও গভীর শ্রদ্ধা করিত যে আমার শৈশব কালে তাঁহার সম্বন্ধে কোন না কোন কথা সর্ব্বদাই আলোচিত হইত এবং তাঁহার জীবনের একটা না একটা ঘটনা প্রায়ই কর্ণগোচর হইত।"

ডাক্তার লাইমেন তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন ঃ—

"অতি অল্প স্ত্রীলোকই ধর্ম্মজীবনে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহার বিশ্বাস সুদৃঢ় ও তাঁহার প্রার্থনা হৃদয়দ্রবকারী ছিল। তাঁহার সন্তানগণ সকলেই ধর্ম্মযাজকের কার্য্য গ্রহণ করিবে, ইহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং প্রার্থনা করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হইয়াছে, তাঁহার পুত্রেরা সকলেই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।"

পরিবারে মাতার এরূপ প্রভাবের সহিত আর কিছুরই তুলনা হয় না, ইহা স্বর্গীয় পদার্থ। ঈশ্বর স্বয়ং এরূপ পরিবারের ভার গ্রহণ করেন। হ্যারিয়েটের জননীর মৃত্যুর এক বৎসর পর তাঁহার বিমাতার আগমন হয়। সপত্নীর শূন্য স্থান আশ্চর্য্যরূপে তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। দর্শন মাত্রেই তিনি প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। কয়েক বৎসর পর হ্যারিয়েট তাঁহার বিমাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কোন বিমাতা ইহা অপেক্ষা সুমিষ্টতর ব্যবহার করিতে পারেন না।" ইনি একজন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ যাজকের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষা তাঁহার জীবনকে অতি সুন্দর করিয়া গড়িয়াছিল।

জর্জ্জ হার্ব্বাট লিখিয়াছিলেন, একজন ভাল মা একশত শিক্ষকের সমান। বীচার পরিবারে এই কথাটীর সত্যতা অতি পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। শ্রীমতী ষ্টো তাঁহার জননী সম্বন্ধে দুইটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শৈশবে এক রবিবারে ষ্টো ও তাঁহার ভাই বোনেরা নাচিতে নাচিতে তাহাদের ঘর হইতে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। জননী বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি জাননা, আজ রবিবার—পবিত্র দিন, এই দিনকে তোমরা চিরকাল পবিত্র রাখিবে।" তিনি এমন ভাবে কথা কয়টী বলিয়াছিলেন, যে ষ্টো জীবনে কখনো তাহা ভুলেন নাই। আর একবার একদিন জননী বাহিরে গিয়াছিলেন, বালক-বালিকারা ঘরে একটা পুঁটুলিতে পেঁয়াজের ন্যায় কতকগুলি জিনিস পাইয়া তর্ক করিতে লাগিল, ওগুলি পেঁয়াজ—না আর কিছু। একজন বলিল পেঁয়াজ, অন্য একজন সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখনই একটী মুখে দিয়া দেখা হইল, সত্যই পেঁয়াজ কিনা। তখন সকলেই টপাটপ মুখে ফেলিতে লাগিল। শেষটী যখন মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তখন জননী গৃহে প্রবেশ করিয়া সন্তানদের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দুর

দেশ হইতে কতকগুলি অতি সুন্দর ফুলের মূল আনাইয়াছিলেন। ছেলেমেয়েরা পেঁয়াজ মনে করিয়া তাহাই খাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি একটুও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, ধীরভাবে বসিয়া বলিলেন, "বাছারা, তোমাদের আচরণে আমার মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়াছে। এগুলি পেঁয়াজ নয়, সুন্দর সুন্দর ফুলের মূল। যদি তোমরা না খাইতে তবে গ্রীষ্মকালে অতি সুন্দর সুন্দর লাল ও পীত ফুলে আমাদের বাগান অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিত।" শ্রীমতী ষ্টৌ লিখিয়াছেন "মার কথা শুনিয়া আমাদের মন যে কি বিষণ্ণ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।" তাঁহার শাসন প্রেমের শাসন ছিল।

শ্রীমতী ষ্টৌ'র জীবনের তৃতীয় প্রভাব ছিল, তাঁহাদের পরিবারের সাহিত্য চর্চ্চা। স্বভাবতঃই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ছিল, সাহিত্যিক আব হাওয়ার মধ্যে পড়িয়া তাহার চমৎকার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "হ্যারিয়েট পড়াশোনায় খুব ভাল মেয়ে। ইতিমধ্যেই সে বেশ উন্নতি করিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। ভবিষ্যতে সে খুব উন্নতি করিতে পারিবে।" শ্রেণীতে ষ্টৌ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিলেন। অন্যদের পড়া শুনিয়া শুনিয়া তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের পরিবারে জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য বিষয়ের আলোচনা হইত না, সুতরাং পারিবারিক কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিতেন। তখনকার দিনে এখনকার মত পুস্তকের সংখ্যা অধিক ছিল না। পিতা কোন পুস্তক কিনিয়া আনিলে প্রথমে তাহা একজনে পাঠ করিত, সকলে শুনিত। তারপরে পরিবারস্থ সকলে নিজেরা নিজেরা যতবার ইচ্ছা তাহা পাঠ করিতে পারিত। ষ্টৌর মন জ্ঞানের জন্য সর্ব্বদাই পিপাসু থাকিত। একখানা পুস্তক পড়িয়া আর একখানা পড়িবার জন্য তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইতেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার এক দাদা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "হ্যারিয়েট যাহা পায় তাই পড়ে, আর খুব পরিশ্রম করিয়া বুনন ও শেলাই করে।" আট বৎসরের বালিকার পক্ষে ইহা অতি ব্যবস্থা ছিল, সন্দেহ নাই।

তাঁহার বয়স যখন ছয় কি সাত বৎসর মাত্র তখনই ষ্টৌ'র অসাধারণ পাঠানুরাগ দেখা গিয়াছিল। একটা ভাঙ্গা বাক্সে অনেক খাতাপত্র ও অনাবশ্যক পুস্তক ছিল। তিনি তাহার প্রত্যেক খাতা ও পুস্তক বাহির করিয়া দেখিলেন। তন্মধ্যে একখানা আরব্য উপন্যাস পাইয়া অতি মনোযোগপূর্ব্বক পড়িতে লাগিলেন। এই পুস্তক পাইয়া তাঁহার যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তিনি মুগ্ধ চিত্তে পুনঃ পুনঃ এই পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন।

আরো কিছু বয়স বাড়িলে তিনি পিতার পুস্তকালয়ের পুস্তক পড়িবার অধিকার পাইলেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "পিতার পুস্তকালয়টী বাড়ীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও পবিত্র স্থান ছিল। সেই গৃহের ভিত্তি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত পরিচিত পুস্তকাবলী দ্বারা পূর্ণ ছিল, তাহা দেখিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিতাম। পিতা চেয়ারে বসিয়া লিখিতেন, আমি নীরবে এক কোণে বসিয়া পড়িতাম। পিতা তাঁহার পুস্তকালয়ের সবগুলি বই বুঝিতে পারেন, একথা মনে করিয়া আমি বিস্ময় ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতাম।"

অতি অল্প বয়সেই তিনি রচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিজের কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করা বালকবালিকাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দশ বৎসর বয়সে তিনি সুন্দর রচনা লিখিতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের আর কোন ছাত্র তাঁহার ন্যায় সুন্দর রচনা লিখিতে পারিত না। এই সময়ে তিনি লিচফিল্ড একাডেমিতে শিক্ষালাভ করিতেন। একজন সুদক্ষ শিক্ষক প্রবন্ধ রচনায় তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন বার বৎসর তখন তাঁহাদের স্কুলের বাৎসরিক সভায় দুইটী রচনা পঠিত হইবে, স্থির হয়। ছাত্রদিগের সকলের রচনা হইতে বাছিয়া এই দুইটী রচনা মনোনীত হইয়াছিল। "প্রকৃতির সাহায্যে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করা যায় কি না" ইহাই ছিল তাঁহার রচনার

বিষয়। বার বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা কি করিয়া এইরূপ গুরুতর কঠিন বিষয়ে রচনা লিখিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পারিবারিক আলোচনায় এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহার সাহায্যেই তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলেন। সহরের প্রধান প্রধান সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পাশেই ষ্টো'র পিতা বসিয়াছিলেন। প্রবন্ধ শুনিতে শুনিতেই আনন্দে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে এমন সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছে?" উত্তর হইল, "আপনার কন্যা!" সে সময়ে পিতা ও কন্যার আনন্দ অনুভব করিবার বিষয়—ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

প্রবন্ধটী সম্পূর্ণই হ্যারিয়েটের রচনা। বিষয় নির্ব্বাচনও তাঁহার নিজের। সভায় পঠিত হইবার পূর্ব্বে পিতামাতা কেহই প্রবন্ধের কথা কিছু জানিতেন না। প্রবন্ধ শুনিয়া ডাক্তার লাইমেন বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি নিজেও বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার কন্যার মধ্যে এত শক্তি লুক্কায়িত ছিল। পঁচিশ বৎসরের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে, তাঁহার বার বৎসরের কন্যা এমন সুন্দর ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে! তাঁহার পারিবারিক শিক্ষাদান প্রণালী এমন আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়াছে দেখিয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কেথেরিন বীচার ১৮২৪ খৃঃ অব্দে একটি উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একজন সুশিক্ষিত যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই জাহাজ-ডুবিতে সেই যুবকের মৃত্যু হইলে কেথেরিন চিরবৈধব্য পালনের সংকল্প করিয়া নারীজাতির উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একবার একটী অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া একখানি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। একজন জার্ম্মান দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য আমেরিকা—যে সেখানকার একজন স্ত্রীলোক এমন প্রবন্ধ রচনা করিতে পারে! কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার সার্থক!"

আটটী ছাত্রী লইয়া কেথেরিন বিদ্যালয় আরম্ভ করেন, বৎসরান্তে ছাত্রীসংখ্যা একশত হয়। স্থানাভাবে অনেক ছাত্রী ফিরাইয়া দিতে হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ষ্টো এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, এবং অল্পদিন মধ্যেই শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার দিদিকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ষ্টো ধর্ম্মজীবন লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন ঃ—

গ্রীষ্মাবকাশে আমি লিচফিল্ডে বাড়ীতে গিয়াছিলাম। রবিবারে পর্ব্বদিন ছিল। ধর্ম্মানুরাগী পাড়াপড়সী সকলে পর্ব্বে যোগ দিয়া ধর্ম্মানুরাগ তৃপ্ত করিবে, কিন্তু প্রাণে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা না থাকায় আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, এই চিন্তা আমাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সকলেই প্রাণে ঈশ্বরের জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিতেছে, আমিই শুধু তাহাতে বঞ্চিত! আমি আমার পাপ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অতৃপ্ত চিত্তে গির্জ্জায় প্রবেশ করিলাম। পিতা যখন উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। মানবাত্মার জন্য ঈশ্বর কেমন ব্যাকুল, আত্মার কল্যাণের জন্য তিনি বন্ধুরূপে মানুষকে কত সাহায্য করেন, আমাদের দোষ ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার সময় তিনি আমাদিগকে কেমন সাহায্য করেন, আমাদের শোক দুঃখে তাঁহার কত সহানুভূতি ইহাই উপদেশের বিষয় ছিল। আমি বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। হায়, এরূপ একজন বন্ধুর আমার কতই প্রয়োজন! হঠাৎ আমার অন্তরে আলোক প্রকাশিত হইল। আমি পরিষ্কার অনুভব করিলাম, প্রয়োজন হইলে আমার পাপের অনুভূতি তিনিই আমার অন্তরে জাগাইয়া দিতে পারেন। আমি জীবনের সকল বিষয়ের জন্যই তাঁহার উপর নির্ভর করিব। আনন্দে আমার হৃদয় প্লাবিত হইল, আমি যখন মন্দির হইতে বাহির হইলাম তখন বোধ হইল সমগ্র প্রকৃতি যেন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছে, মাধুর্য্যের এক সুন্দর অনুরঞ্জনে সমস্ত

পৃথিবী যেন অনুরঞ্জিত। পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পাঠাগারে বসিলে আমি নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বাবা, আজ প্রভু পরমেশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তিনি আমায় গ্রহণ করিয়াছেন।" আমার কথা শুনিয়া পিতার অন্তরে যে আনন্দের উদয় হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাই নাকি! আজ তবে স্বর্গরাজ্যের উদ্যানে নূতন কুসুম প্রস্ফুটিত হইল।" তিনি আমাকে বুকে টানিয়া লইলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর উষ্ণ অশ্রুধারা আমার মাথায় পতিত হইতে লাগিল

সেই সময় হইতে হ্যারিয়েটের জীবন সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য দেখিতে পাইল। ধর্ম্মের অনুভূতি জীবনের উচ্চতর কার্য্য দেখাইয়া দিল। ডাক্তার লাইমেন অনুরুদ্ধ হইয়া লেন নামক স্থানের ধর্ম্মবিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। হ্যারিয়েট এবং তাঁহার ভগ্নী এখানে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর দু এক খানা পুস্তকও লিখিলেন। তিনি আরো পুস্তক লিখিতেন, কিন্তু পিতার ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক— কেলভিন্, ই, ষ্টো নামক জনৈক ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার সদ্‌গুণ রাশিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন। হ্যারিয়েট অধ্যাপকের সুন্দর জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

(ক্রমশঃ)

"বানরী।"

আজ শনিবার; প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, রাত্রির আর অধিক বিলম্ব নাই। আজ রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে এই সপ্তাহেরও শেষ হইবে—কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবিবার। অদ্য সপ্তাহের মাহিয়ানা পাইবার দিন। শ্রমজীবীদের আনন্দ কোলাহলে এবং চীৎকার-ধ্বনিতে রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে মদের দোকানের দরজা খোলা এবং বন্ধ করিবার শব্দ আসিয়া মিশিয়াছে। শ্রমজীবীদল প্যারী সহরের উপনগরীর ঢালু রাস্তা বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। তাহারই মাঝখানে একটি ছায়াকৃতি স্ত্রীলোক, ভীত ত্রস্ত গতিতে জনস্রোত ঠেলিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীলোকটির দেহে একখানা গরম পাতলা চাদর, তাহার শতস্থান গ্রন্থিবদ্ধ; একখানা শতচ্ছিদ্র মস্তকাবরণ হইতে তাহার মুখখানাকে কতই কাতর ও ব্যগ্র দেখাইতেছিল! সে কোথায় যাইতেছে? এত ব্যস্তই বা কেন? তাহার দ্রুতগতি এবং ব্যগ্র দৃষ্টির মধ্যে এই কয়টি কথা স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে—"এক-বারটি যদি সেইস্থানে, ঠিক সময়ে গিয়া পৌঁছিতে পারি!" তাহার পাশ দিয়া যে কেহ যাইতেছিল সেই একবার মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইতেছিল, পরমুহূর্ত্তেই ঘৃণায় মুখ সঙ্কুচিত করিয়া নিজেদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছিল। শ্রমজীবীদের সকলেই তাহার পরিচিত এবং এতদূর পরিচিত যে তাহারা সকলে তাহার একটি অদ্ভুত নামকরণও করিয়াছে। তাহার কদাকার চেহারা ও কুৎসিত পোষাকের জন্য সকলেই তাহাকে "বানরী" বলিয়া ডাকে। আজও তাহারা যাইতে যাইতে বলাবলি করিতেছিল, "দেখ, একবার ভেলেন্টিনের বানরীটাকে দেখ; বোধ হয় সে তার স্বামী মহাশয়কে ধরে আনতে যাচ্ছে।" তাহার উপর এইরূপ আরও কতই বিদ্রূপবাণ বর্ষণ হইতেছিল। কিন্তু তাহার সেদিকে কান দিবার অবসর ছিল না। কাহারো কথায় কোনপ্রকার প্রত্যুত্তর না করিয়া সে কেবলি ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথ ছুটিতে ছুটিতে তাহার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

এইবার সে তাহার গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জায়গাটা প্যারী সহরের একটি উপনগর—কল-কারখানাতে একেবারে পরিপূর্ণ। বড় বড় কারখানা-গুলি সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই একটা কারখানার ভিতর হইতে তখনও ক্ষীণ হস্ হস্ শব্দ শোনা যাইতে-ছিল। কাল রবিবার, সেই জন্য অদ্য একটু সকাল

সকালই কারখানার কাজ বন্ধ হইয়াছে—সপ্তাহের মাহিয়ানা লইয়া সকলেই সহরে নামিয়া আসিয়াছে। একটা বড় কারখানার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তখনো একটা আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। এই-টাই কারখানার খাজাঞ্চীর ঘর। সে সেই আলোটির দিকে আরো দ্রুত ছুটিয়া চলিল, কিন্তু নিকটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আলোটি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আহা, বেচারীর অনেকটা দেরী হইয়া গিয়াছে—সপ্তাহের মাহিয়ানা পকেটে ফেলিয়া সকলেই নীচে নামিয়া গিয়াছে, এখন সে কি করিবে? তাহাকে কোথায় সে খুঁজিয়া বেড়াইবে? এ সপ্তাহের মাহিয়ানা বাঁচাইবার আর উপায় নাই- এক নিমিষে সপ্তাহের উপার্জ্জন সুরাপানে উড়াইয়া দিবে। কিন্তু গৃহে তাহার অর্থের কত প্রয়োজন! ছোট ছোট ছেলে মেয়ে-গুলির পায়ে দিবার মত এক জোড়া মোজাও নাই; রুটিওয়ালাকে এই সপ্তাহের রুটির দামও চুকাইয়া দেওয়া হয় নাই; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—সে সেই স্থানেই পথের উপর বসিয়া পড়িল।

সহরের মদের দোকানগুলির আজ কী জাঁক! সাজ-সজ্জায় এবং বৈদ্যুতিক আলোতে দোকানগুলিকে ইন্দ্র-পুরীর ন্যায় দেখাইতেছিল, শূন্য কারখানাগুলির শ্রমজীবী-গণ আজ সকলেই সপ্তাহের মাহিয়ানায় পকেট পূর্ণ করিয়া এইস্থানে আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাঁহাদের গল্প গুজব গানে চীৎকারে দোকান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে টেবিলের উপর কত বিচিত্র আকারের বোতল সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহাদের ভিতরে কত বিচিত্র বর্ণের মদ—কোথাও লাল, কোথাও গোলাপী, কোথাও পীতাভ। বোতলের পর বোতল নিঃশেষিত হইতেছে, তাহাদের ছিপি খোলার শব্দ, গ্লাস ঝন্ ঝন্, বোতল রাখার শব্দ, ক্রেতা বিক্রেতার পকেটের পয়সার শব্দ—সকল একত্র মিলিত হইয়া ঘরগুলিকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের ভিতরকার এই গোলমালে ও উত্তাপে লোকগুলি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে তাহাদের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণ কত কষ্টে দিন কাটাইতেছে, এই হাড়-ভাঙ্গা শীতে ঘর উত্তপ্ত রাখিবার জন্য এক টুকরা কয়লাও নাই, এই মত্ত লোকগুলি আজ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে।

দোকানের নীচু জানালার ফাকা দিয়া জনশূন্য রাস্তায় কে এই স্ত্রীলোকটি কম্পিত পদে ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? বেচারী 'বানরী'; বেড়াও, ঘুরে বেড়াও! সে এক দোকান হইতে অন্য দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল, কখনো জানালার কাচের ভিতর দিয়া, কখনো বা জানালা একটু ফাঁক করিয়া সে তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি ফেলিয়া উন্মত্ত-প্রায় লোকগুলিকে দেখিয়া দেখিয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ সে একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল-তাহার সমস্ত দেহ যেন কাঁপিয়া উঠিল।

এই যে তাহার ভেলেন্টিন দাঁড়াইয়া আছে—তাহার চোখের একেবারে সম্মুখেই। তাহার সুন্দর গর্ব্বিত সুদীর্ঘ দেহ একটা প্রকাণ্ড সাদা জোব্বায় আবৃত, দীর্ঘ কুঞ্চিত চুল ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় সে গল্প করিতেছিল, সকলের দৃষ্টি তাহারই মুখের দিকে; শ্রমজীবী মহলে বক্তা বলিয়া তাহার যথেষ্ট খ্যাতিও আছে। এদিকে বেচারী 'বানরী' বাহিরের শীতে দাঁড়াইয়া কম্পিত দেহে তাহার এই গল্পে রত কুপথগামী স্বামীকে দেখিতেছিল।

ভেলেন্টিনের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—সে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিতেছিল এবং নূতন নূতন গল্পে তাহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়া দিতেছিল। বেচারী 'বানরীর' কাতর দৃষ্টি তাহার নিকট কিরূপে পৌঁছিবে? ঘরের ভিতর ঢুকিয়া স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; তাহার এই কুৎসিত চেহারা এবং কদাকার পোষাক লইয়া এই মত্ত লোকদের সম্মুখে কিরূপে উপস্থিত হইবে? ইহাতে তাহার স্বামী মহাশয় যে অত্যন্ত অপমান বোধ করিবেন!

হায় সে যদি রূপবতী হইত! সে যে দেখিতে অত্যন্ত কুশ্রী! কিন্তু একদিন সেও রূপবতীই ছিল—দশবৎসর পূর্ব্বে তাহার এই দেহেই কী লাবণ্য ছিল! তখন তাহারা প্রথম পরস্পরের সহিত পরিচিত হয়। প্রতিদিন প্রাতে কর্ম্মে যাইবার সময় সে তাহাকে দেখিতে পাইত। বেচারী

'বানরী' তখনো গরীব ছিল বটে কিন্তু তাহার পোষাক তখন এরূপ কুশ্রী এবং কদাকার ছিল না। বহুমূল্যের রেশমী পোষাক তাহার ছিল না বটে কিন্তু তাহার সামান্য পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল এবং প্রকৃতি দেবীর স্বহস্তনির্ম্মিত সুকোমল অলঙ্কার বিচিত্র বর্ণের পুষ্প মধ্যে মধ্যে তাহার অঙ্গে শোভা পাইত। তাহাদের এই প্রাত্যহিক দৃষ্টি বিনিময় অবশেষে প্রেমে পরিণত হইল, কিন্তু তখনই বিবাহিত হইতে পারিল না। তাহাদের কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ ভেলেন্টিনের পকেটে তখন তেমন পয়সা জমা হয় নাই। অবশেষে কন্যার পিতা অগ্রসর হইয়া তাহাদের অনেক সাহায্য করিল

বিবাহের পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দোকান হইতে ধার করিয়া আনা হইল, নগরের উপকণ্ঠে একটি ঘর ভাড়া করা হইল; এইরূপে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা একদিন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। অনেকদূর রাস্তা হাটিয়া নগরের বাহিরে একটি গির্জ্জায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গির্জ্জায় পুরোহিতের নিকট তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য তাহাদের অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল—নব পরিণীত ধনী দম্পতিগণ একে একে বাহিরে গেলে তবে তাহাদের ডাক পড়িল। সে স্থান হইতে বিবাহের একখানা সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া নগরের উপকণ্ঠে অপরিষ্কার, অন্ধকারপূর্ণ ঘরে আসিয়া তাহারা নূতন সংসার পাতিয়া বসিল। এই স্থানটা শ্রমজীবীদের একটা পাড়া—তাহাদের কুটীর-সংলগ্ন ঘরে আরো অনেক শ্রমজীবী তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বাস করিতেছিল। ঘরগুলি কী নোংরা! পরস্পরি ঝগড়া কলহে সেই স্থানটাকে একটি মেছোর হাট ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। সেই সকল মাতাল অসৎচরিত্র লোকদিগের সহিত বাস করিয়া সেও সুরাপানে দীক্ষিত হইল। সে দিন হইতে বেচারী 'বানরীর' দুঃখ আরম্ভ হইল। তখন তাহাদের ২।৩টি সন্তানও হইয়াছে, স্বামী তাহার সামান্য উপার্জ্জন মদে উড়াইত, কাজেই সন্তানগুলি পালনের ভার এখন সম্পূর্ণ তাহার উপর আসিয়া পড়িল। অনাহারে, তাহার উপর কঠিন পরিশ্রমে তাহার দেহের পূর্ব্ব লাবণ্য লোপ পাইল—সামান্য পরিচ্ছদ ছিন্ন এবং মলিন হইয়া এইরূপ কদাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেই হইতে বেচারী সকলের নিকট 'বানরী' নামে অভিহিত হইল।

সেই ছায়ামূর্ত্তিটি তখনো জানালার পাশ দিয়া এদিক ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পায়ের মৃদু শব্দ ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিতেছিল না। সে একবার কাশিয়া উঠিল, কারণ বাহিরে তখন খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল—আজ সন্ধ্যা হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে? দুই তিন বার দরজায় সে মৃদু করাঘাতও করিয়াছে কিন্তু দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার গৃহের কথা মনে হইল—সন্তানগুলি এখনো উপোস আছে, এই হাড়ভাঙ্গা শীতে পায়ে দিবার মত এক জোড়াও মোজা নাই! এই কথা মনে হওয়াতে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; সমস্ত ভয় মন হইতে দূর করিয়া দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের গল্পের স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সকলে সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো ভেলেন্টিন, দেখ দেখ তোমার 'বানরী' তোমাকে ধরে নিতে এসেছে।" সত্য সত্যই ঘরের তীব্র আলোকে তাহাকে অত্যন্ত কুশ্রী দেখাইতেছিল। গাউনের একটা ধার ছিঁড়িয়া পশ্চাৎদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, রুক্ষচুলগুলি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া আরো কুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে; মুখখানা কি পাংশু বর্ণ! সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া কতকটা ভয়ে কতকটা শীতে কাঁপিতেছিল। এই মূর্ত্তি দেখিয়াই ভেলেন্টিন দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিল। কী এতদূর সাহস? এতগুলি লোকের সম্মুখে তাহার

এত বড় অপমান? দাঁড়াও, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য; আজ দেখ্‌তে পাবে! কি ভীষণ মূর্ত্তি তার! মুষ্টি বাগাইয়া চৌকি ছাড়িয়া সে লাফাইয়া আসিল। বেচারী 'বানরী' দৌড়িয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। সেও পশ্চাৎ ছুটিয়া দোকান হইতে লাফাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল, আর কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই রাস্তার মোড়ে তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। চারিদিক অন্ধকার, পথে একজনও লোক নাই; হায় বেচারী 'বানরী'!

কিন্তু না! একবার দলছাড়া হইলে এই বীরপুরুষদের স্বভাব তেমন আর উগ্র থাকে না। রাস্তার মোড়ে দুজনে মুখামুখী হইতেই তাহার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। নিমেষ মধ্যে তাহার বীরত্ব কোথায় অন্তর্ধান করিল। এখন সে কত নম্র কত বিনয়ী---কৃত অপরাধের জন্য তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছে; অনুতপ্ত হৃদয়ে কতবার বানরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইবার বেচারী বানরীও তাহার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের বাহুতে আবদ্ধ হইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। আজ 'বানরীরই' সম্পূর্ণ জয়!

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

মদনপুর দরগা।

ময়মনসিংহ জেলাস্থ নেত্রকোণা মহকুমার ৫ মাইল দক্ষিণে সল্লতোয়া সাইডুলি নদীর তীরে মদনপুর গ্রাম অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সাহ-সুলতান রুমী নামক জনৈক তুরস্ক দেশীয় মহাপুরুষ ৩৯ জন দরবেশ অনুচর সহ এই গ্রামে উপনীত হন। তখন মদনপুর মদন কোচ নামক জনৈক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। মদন কোচ অসীম পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর ভগ্নস্তূপ এবং বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মদনহাল দীর্ঘিকা এখনও তাঁহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মদনপুরে মদন কোচ একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু সাহসুলতানের আগমনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিল বুঝিয়া এবং তাহাদের পারিবারিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া তিনি একটু ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ইহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। পরিশেষে ঐ মহাপুরুষকে নিজ বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। মহাপুরুষ সাদরে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহসুলতান দলবল সহ মদনের গৃহে ভোজন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এদিকে মহাপুরুষের খাদ্য এক প্রকার বিষাক্ত লতার বিষ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হইল। সাহসুলতান অকাতরে তাহা উদরস্থ করিলেন, তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না। ইহা দেখিয়া মদন কোচ বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অতি সত্বর আপন ধন রত্ন লইয়া অন্তর্ধান করিলেন।

সাহসুলতান যখন মদনপুরে স্বীয় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সৈয়দ সাহা স্বরূপ, মিয়া কবান, কাজিয়া, করম খাঁ, মনুমহাতে, সেক তাতার পানিয়া সত্তর, রূপসমল্লিক, সিদ্দিক, মুল্লামহম্মদ প্রভৃতি যে ৩৯ জন দরবেশ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই মহাত্মার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের বংশধরগণ খাদিমি ফকির নামে পরিচিত থাকিয়া দরগার আয় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মিয়া করানের বংশধরগণ দরগার অন্দর মহালের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আর ১২ জন দরবেশের বংশধরগণ খোশবাদী ফকির নামে পরিচিত হইয়া মদনপুরে নিষ্কর ভূমির আয়ের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। অবশিষ্ট ১৭ জন দার পরিগ্রহ না করায় তাঁহাদের বংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সাহ সুলতান মদনপুরে আসিলে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিয়া যায়। তিনি ৫৪৫ অব্দে ১০ই রবিযান আউলে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। মদনপুরেই তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়। তাঁহার আত্মীয় পরিজনের সমাধিও তাহার চতুর্দ্দিকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর যথারীতি ইষ্টক নির্ম্মিত স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সমাধির চারিদিকে বহু বিস্তৃত স্থান

উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা আছে, ইহাই অন্দর মহাল। ইহার সদর দরজা দক্ষিণদিকে অবস্থিত; তাহারই সম্মুখে বহু বিস্তৃত স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে, ইহাই বাহির মহাল। বাহির মহাল হইতে অন্দরে যাইবার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত পথ, তাহার চারিদিকে নানাবিধ ফল বৃক্ষে শোভিত।

অন্দর মহালে যাইতে হইলে স্নান করতঃ আর্দ্রবস্ত্রে যাইতে হয়। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বহুলোক দরগায় সমবেত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ টাকা পয়সা, দুগ্ধ কলা, গো, মেষ ছাগ প্রভৃতি দান করিয়া থাকে। ইহাতে বৎসর প্রায় চারি হাজার টাকা পরিমাণ আয় হইয়া থাকে। এখানে কোন অতিথি আসিয়া অভুক্ত যাইতে পারে না, ইহাই সুলতান সাহেবের আদেশ।

মদনপুর সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—

"The village contains two large mosques one of which is known by the name of "Shah Rumir Masjid." The story runs that a member of the royal family of Constantinople wandered to this village during an attack of madness, but eventually recovered his health and sudjugated and converted to Mahamedanism the neighbouring tract of Country. A mosque tomb to his memory exists on the west side of the village."

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আর্য্য-নারী।

স্থবিরা রোহিণী।

ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ মোক্ষমার্গ আবিষ্কার করিয়া শুধু নিজে মোক্ষলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যে মুক্তিজনিত পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলেন সে আনন্দ আপামর আচণ্ডাল সর্ব্বসাধারণকে বিলাইতে বিলাইতে তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল ভারতের নানাস্থানে বিচরণ করিয়া এমন এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাহাকে আশ্রয় করিয়া সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র লোক শান্তিসুখে জীবন-নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে এবং ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী মতে আরো আড়াই হাজার বৎসর শান্তি-সুখে উপভোগ করিতে করিতে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে। জরাব্যাধি মরণাদি দুঃখক্লিষ্ট প্রাণীগণের প্রতি অপার করুণা বশতঃ তিনি এমনই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে ভগবানের কৃপা কেবল পুরুষ জাতির উপর নিবদ্ধ ছিল না। অবলা জাতির প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট করুণা ছিল। কেবল পুরুষগণকে যে তিনি অমৃত লাভের অধিকারী করিয়া-ছিলেন এমন নহে। অবলা জাতিকেও অমৃত দানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল ভারত-মহিলা নির্ব্বাণামৃত পানের আশায় তুচ্ছ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষুণী সংঘের আশ্রয় লইয়া সর্ব্ব পাপ ক্ষয় করতঃ বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং নিজে নির্ব্বাণামৃত পান করিয়া আরও বহু জনকে তাহা পান করাইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণ আমরা সূত্রপিটকে দেখিতে পাই। ইঁহারা স্থবিরা নামে কথিতা হন। স্থবির শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে স্থবিরা। সাধারণতঃ স্থবির অর্থ বৃদ্ধ। কিন্তু কেবল বয়সে স্থবির বা বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধদেব স্থবির বলিতেন না।

বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন, পলিত কেশে শির শুভ্রবর্ণ ধারণ করিলেই কেহ স্থবির পদবাচ্য হয় না। সে ব্যক্তি বয়সে পরিপক্ক এবং বৃথা জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়াছে। সে স্থবির পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু যিনি চতুরার্য্য সত্য ও নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম সম্যক জ্ঞাত আছেন, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রী আদি ভাবনায় রত থাকেন, ভিক্ষুগণের জন্য ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শীল (চরিত্র বিশুদ্ধির নিয়ম) সমূহ প্রতিপালন ও ইন্দ্রিয় দমন করিয়া পাপ-মলহীন হইয়াছেন এবং যিনি পাণ্ডিত্য গুণেও বিভূষিত তিনিই স্থবির (থের) পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত।

সাধারণতঃ উপসম্পদা (দীক্ষা) গ্রহণের দিবস হইতে ১০ বৎসর পূর্ণ হইলে যে কোন ভিক্ষু স্থবির নামে কথিত হইতেন। দশটী বৎসর শীল সমূহ প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিলে যে কোন ব্যক্তি উক্ত গুণ সমূহের অধিকারী হইতে পারিতেন। সুতরাং প্রাচীন স্থবিরগণ বয়স ও গুণ উভয় প্রকারে স্থবির হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে গুণে স্থবির অতি অল্প দেখা যায়। উপসম্পদা (দীক্ষা) গ্রহণের পর কেবল ১০ বৎসর পূর্ণ হইলেই—গুণ থাকুক আর না থাকুক, লিখিতে পড়িতে জানুক আর না জানুক, শাস্ত্রজ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, সংযম দমাদি স্থবির-গুণের অধিকারী হউক আর না হউক—অনেক ভিক্ষু স্থবির পদবী লাভ করিয়া সংসারে অজ্ঞলোকদিগকে ভুলাইয়া বাহবা পাইবার ও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়ায়। বস্তুতঃ ইহাতে ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট হয়, স্থবিরের উপর লোকের ঘৃণার সঞ্চার হয়। লোকের শ্রদ্ধাভক্তি হারাইয়া শেষে এইরূপ স্থবিরকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূতা রোহিণী বয়স ও গুণ উভয় প্রকারে স্থবিরা ছিলেন। অপদান (অবদান) নামক পালি গ্রন্থে রোহিণীর জীবনী সংক্ষেপে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান গৌতম বুদ্ধের অবির্ভাবের একনবতি কল্প পূর্ব্বে বন্ধুমতী নামক নগরে বিপস্সী নামক এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলে রোহিণী অন্য কোন দানীয় বস্তুর অভাবে ভক্তি পূর্ব্বক পিষ্টক মাত্র দান করিল। এই সুকৃত কর্ম্মের পুণ্যফলে ও স্বীয় প্রার্থনানুসারে সে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিল। ক্রমে ৩৬ জন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ও ৫০ জন রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষী হইয়া সে বিপুল সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল। স্বর্গ ও পৃথিবীতে সে যখন যাহা ইচ্ছা করিত তখনই তাহা প্রাপ্ত হইত।

ভগবান বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের সময়ে সে বৈশালী নগরের কোন মহাধনশালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জ্ঞাতিগণ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল রোহিণী। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ সে ভিক্ষুগণের প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী ছিল এবং তাঁহাদের নিকট গিয়া সে বুদ্ধপ্রচারিত অমৃতধর্ম্ম শুনিতে বড় ভালবাসিত। ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে ক্রমে সংসারের প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিল এবং সে আগার (গৃহ) পরিত্যাগ করতঃ অনাগারিকত্ব অবলম্বন করিয়া ভিক্ষুণী সাজিল। ভিক্ষুত্ব গ্রহণের পর একমুহূর্ত্তও সে বৃথা ব্যয় করে নাই। অতি উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে ধ্যান-সমাধির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সে অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইল।

অর্হত্ব প্রাপ্তির পর একদিন সেই পিঠা দানের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "একনব্বই কল্পের পূর্ব্বে আমি ভগবান বিপস্সী বুদ্ধকে যে পিঠা দান করিয়াছিলাম তাহার ফলে এই সুদীর্ঘকাল আমি দুর্গতি কাহাকে বলে জানি নাই। আহা, বুদ্ধকে পিষ্টক দানের কি মহাফল! এখন আমার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, আমার পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়াছে, এখন আমি বন্ধনমুক্ত হস্তিনীর ন্যায় বিমুক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছি।"

ভিক্ষুসংঘের প্রতি ও বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশের প্রতি রোহিণীর প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল শ্রদ্ধা দর্শনে একদিন তাঁহার পিতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রোহিণীও যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করেন।

মোক্ষলাভের পর একদা নিজের অতীত কর্ম্ম প্রত্যবেক্ষণ করিতে করিতে তিনি পিতার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তরে কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করিয়া উদান (প্রীতি) গাথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা সে সকল গাথার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

সে সময় রোহিণী সর্ব্বদা ভিক্ষু বা শ্রমণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া সময় কাটাইতেন। একদিন রোহিণী শুইয়া আছেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে জাগাইতেছেন। তিনি পিতার ডাকে চোক মেলিয়া সমণ (শ্রমণ) বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ বলিলেন—

হে দুহিতে! শ্রমণ বলিয়া তুই আমাকে চোক মেলিয়া দেখিলি এবং শ্রমণ বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলি।

সর্ব্বদা তুই শ্রমণগণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকিস। বল, তুই শ্রমণী হইবি না কি ?

বিপুল অন্ন ও পানীয় তুই শ্রমণগণকে দান করিয়া থাকিস্। তাই, হে রোহিণী ! তোকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রমণগণ কি কারণে তোর প্রিয় ?

তারপর ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের নিন্দা করিয়া বলিল,

আলস্য পরায়ণতা বশতঃ শ্রমণগণ কোন কর্ম্মই করিতে চায় না। কেবল পরদত্ত দ্রব্য ভোগ করিয়া জীবনযাপন করে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে তাহারা খুব পটু এবং ভাল দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিতে তাহারা লালায়িত, এই সকল দোষ সত্ত্বেও তাহারা তোর প্রিয় কেন ?

রোহিণী বলিলেন, হে তাত, বহুদিন পরে আপনি আমাকে শ্রমণগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (তাই) আপনাকে তাহাদের শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার বিষয় বলিব।

শ্রমণগণ অলস নহেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিতেই ভালবাসেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মেরই কারক। তাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই কারণে শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

লোভ, দ্বেষ ও মোহ এই তিন রিপু সকল পাপের হেতু। শ্রমণগণ এই পাপের মূলত্রয় বিনাশ এবং সর্ব্বদা শুচি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহাদের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। এই কারণে শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

ইহাদের কায়িক বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শুচি। এই কারণে শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

ইঁহারা শঙ্খ বা মুক্তার ন্যায় বিমল। অভ্যন্তরে ও বাহিরে ইঁহারা শুদ্ধ এবং নানা কুশল ধর্ম্মে পূর্ণ। এই কারণে শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

ইঁহারা (বহুশাস্ত্রজ্ঞ) ধর্ম্মজ্ঞ, আর্য্য, ধর্ম্মজীবী এবং যাহাতে লোকের অর্থ ও ধর্ম্ম উভয়ই লাভ হয় সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

ইঁহারা সংসারের যাবতীয় প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে সমুদয় পাপ বর্জ্জন করেন এবং যাহা কিছু বলেন প্রজ্ঞার সহিতই বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত তৃষ্ণাহীন বলিয়া ঔদ্ধত্য রহিত সুতরাং অচঞ্চল। তাঁহারা দুঃখের অন্ত জানেন অর্থাৎ দুঃখের ধ্বংস সাধন করিয়া দুঃখমুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহারা যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান সেই গ্রামের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি থাকে না, অনাসক্তভাবেই তাঁহারা চলিয়া যান।

শ্রমণগণ কোনও দ্রব্য কলসী, চাটি (মৃৎপাত্র বিশেষ) অথবা অন্য কোন ভাজনে সংগৃহীত করিয়া রাখেন না। তাঁহাদের সংগ্রহ শেষ হইয়াছে।

তাঁহারা হীরক, সুবর্ণ রৌপ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। কেবল মাত্র বর্ত্তমানে যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করিয়া থাকেন।

নানা দেশের নানা কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াও তাঁহারা পরস্পর প্রিয়ভাবে অবস্থান করেন। এই কারণে শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

শ্রমণগণের গুণ বর্ণনা শুনিয়া রোহিণীর পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রোহিণীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন ঃ—

হে রোহিণী ! আমাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি আমার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘের প্রতি তোমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে।

তোমা হইতে অনুত্তর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র জানিতে পাইলাম। এই শ্রমণগণ আমার দক্ষিণাও গ্রহণ করুন। এই পুণ্যক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞ মহাফলদায়ক হইবে।

পিতার কথা শুনিয়া রোহিণী পিতাকে উপদেশ দিয়া পুনঃ বলিলেন ঃ—

যদি দুঃখকে আপনি ভয় করেন, যদি দুঃখ আপনার অপ্রিয় হয় তবে (দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য) বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং আর্য্য সংঘের শরণ গ্রহণ করুন। আর বুদ্ধের উপদিষ্ট শীলসমূহ প্রতিপালন করুন। ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।

রোহিণীর উপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—

আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং আর্য্য সংঘের শরণ এবং বুদ্ধের উপদিষ্ট শীলসমূহ গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে আমার মঙ্গল হউক।

এইরূপে ধর্ম্মশীলা কন্যার উপদেশে পিতার পরিত্রাণের পথ মুক্ত হইল।

শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

স্যাজঙ্গী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধীরে ধীরে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। অতীতের শত কথা ধীরে ধীরে চিত্তপটে আবির্ভূত হইতে লাগিল। অতীতের বিশাল যবনিকা উত্তোলন করিয়া বাল্যকাল হইতে আজিকার ঘটনা পর্য্যন্ত সব দৃশ্যপটগুলার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম. সেই সবই একখানা সূত্র লইয়া যেন কোন একটা জীবন নাট্য অভিনয়োদ্দেশ্যে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আমি মূর্খ, অন্ধ! অজ্ঞ পিচ্ছিল পথে চোখ মুদিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া-আসিয়াছি। হায় এতদূর হইতে বুঝি আর কেহ ফিরিতে পারে না! গুরুদেব! গুরুদেব! দেখে যাও, তোমার স্নেহের সচির আজ একি অভাবনীয় অধঃপতন! সে বুঝি আজ একটা বিধর্ম্মী বালিকার মোহে তাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গের সোপানচ্যুত হইয়া নরকের দ্বারে পতিত হয়! হায় লুব্ধমন. কেমন করিয়া আমি তোকে টানিয়া রাখিব? কে জানে এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড তুল্য ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য জানিয়া বুঝিয়াও কেন অনন্ত কালের মুক্তির পথে কণ্টক রোপণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে?

কিন্তু সত্যই কি ইহা মানুষের অধঃপতনেরই কারণ! ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, কর্ম্মযোগই প্রধান যোগ, মনুর মতেও গৃহস্থাশ্রম প্রধান আশ্রম। পুরাকালে ঋষিগণও তো অবিবাহিত থাকিতেন না। যদি যথাযথ রূপে পালন করা যায় তবে ইহাই কঠোর সাধনাপূর্ণ প্রধান যোগ। একদিন কোথায় পড়িয়াছিলাম "ব্রতিনাং বীতরাগানাং দৃশ্যন্তে দিবি দেবতা; মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যাবৈ তত্রদেশে চ দৃশ্যতে।" বিবাহে পাপ কি! কিন্তু দেলেনা যে মুসলমাম ধর্ম্মাবলম্বিনী! কেমন করিয়া আমি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি? গুরুদেব তো এ অবৈধ বিবাহে সম্মতি দিবেন না। কিন্তু বাস্তবিকই কি মা সাদুন্নাথাঁর মাতার নিকট এ বিবাহ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন! আমায় তিনি সর্ব্বদাই যে বলিতেন, "সচ্চিৎ, তুমি দিলকে বিবাহ করে সংসারী হও; ও মুসলমানের মেয়ে তাহাতে কি! তুমিও যে হিন্দুর ছেলে তার প্রমাণ কি?" একি শুধু সরল তামাসা? না ঘোর রহস্যপূর্ণ সঙ্কেত? সত্য কি তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্ত রূপগুণবতী দেলেনাতে এমনি পক্ষপাতশূন্য ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল? তবে আমি মাতৃআজ্ঞা বলিয়াও তো তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি! কিন্তু গুরুদেব! তিনি তো কিছুতেই এই অবৈধ বিবাহে সম্মত হইবেন না!

সহসা বাহিরে গম্ভীর স্বর শুনা গেল। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গুরুদেব আসিতেছেন, তাঁহার ভাব-গভীর স্তোত্র সমস্ত বনভূমি পূর্ণ করিয়া ভগবৎ প্রেরণার ন্যায় আমার হৃদয়ে আশা পুলকের কম্পিত তালে বহিয়া গেল। যাই হোক একটা সত্য, একটা মুক্তি হাতের যে কাছা-কাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গুরুদেব আসিতেছেন, হৃদয়ের তন্ত্রের প্রত্যেক তার সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। "অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যঃ ত্বমাদি দেবঃ পুরুষ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিদানম্, বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধামং ত্বয়া ৩৩ং বিশ্ব অনন্তরূপঃ, বায়ুর্য্যমোগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ"—গুরুদেব কুটীরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন. "বৎস সচ্চিদানন্দ!" অপরাধী বালক বিচারক পিতার সম্মুখে যেমন করিয়া অগ্রসর হইয়া যায় তেমনি করিয়া নিকটে গেলাম, গুরুদেব পদ প্রক্ষালন করিয়া প্রদীপের সম্মুখে বিস্তৃত ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে বসিতে বসিতে মৃদু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন বৎস! এসো, এই খানে বসো।" আমার হৃদয় তন্ত্রীতে আবার একটা দ্রুত কম্পন অনুভব করিলাম, কেমন করিয়া এই গভীর লজ্জার ও একান্ত ঘৃণার কথা তাঁহাকে জানাইব?

এই ঘৃণার কথা লজ্জার কথা কেমন করিয়া গুরুকে বলিব! বিশ্বাসঘাতক আমি এমন করিয়া যে তাঁহার অপরিশোধ্য স্নেহঋণ শোধিতেছি, একি বলিবার? কিন্তু আমায় নীরব দেখিয়া গুরুদেব নিজেই কহিলেন, "সচ্চিৎ, বুঝিয়াছি, তোমার চিত্ত সামান্য বিচলিত হয় নাই, কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে সমস্ত কথা আমার নিকটে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।" তিনি সস্নেহে আমার লজ্জানত

মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, তখন অবনত শিরে একবারও চোখ না তুলিয়া দণ্ডিত অপরাধীর দোষ স্বীকারের ন্যায় রুদ্ধপ্রায় স্বরে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট বলিলাম। বলিতে বলিতে নিজের স্বরে নিজেই যে কতবার চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, গভীর লজ্জায় নতমস্তক মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, আবার তাহাকে সচেষ্টায় উত্তোলন করিয়া স্মরণ করিয়া লইতে ছিলাম। কিন্তু সমস্ত বলা শেষ হইয়া গেলে এক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতার পরে ধীর মধুর কণ্ঠে স্নেহময় গুরুদেব আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "বৎস সচ্চিদানন্দ! লজ্জিত হইও না, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমি কি করিতে পারি! ভাগ্য যে পথে লইয়া যাইতে চাহে অসহায় ভাবে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই। কর্ম্মফল তোমায় সংসারের পথে টানিতেছে, সেই পথে যাওয়াই শ্রেয়। সেও পরিত্যাজ্য পথ নহে, সুনন্দা আমাকেও বহু পূর্ব্বে এবিষয়ে কিছু বলিয়া গিয়াছিল, সে দুর্ভাগ্য সুজাদালীর পুত্র ও সাদুল্লা খাঁর পরিবারের জন্য নিতান্তই বিষাদিত ছিল, তাহাদের উপকার করিতে সে মনে মনে বড়ই ইচ্ছুক ছিল কিন্তু মানুষের ইচ্ছা এবং তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বত্র এক পথে যায় না, তাই সেখানে আমরা বলিতে বাধ্য,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" কথাগুলার মধ্যে যেন গভীর রহস্যের একটা গূঢ় আভাষ ব্যক্ত হইতে চাহিতেছিল। চকিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম, সে মুখে উদারতা ও প্রসন্নতা গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রশান্ত মুখে সন্ন্যাসী পুনশ্চ কহিলেন, "বৎস! কাল প্রভাতেই আমার এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাবধান, যে পথে চলিয়াছ সে পথ কণ্টকময়, সঙ্কট বহুল, সাবধানে পথ চলিও; কর্ত্তব্য, ক্ষমা ও ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যের আলোকে তমঃ অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে।"

এই স্নেহ প্রসারিত বিশাল বক্ষ, এই অমৃতময় উপদেশ বাণী, এই অমানুষিক কথা, একি পরিত্যাগের জিনিষ! কাঁদিয়া বলিলাম, "প্রভো! অন্ধ হইয়াছি, চক্ষু ফুটাইয়া দিন! কেমন করিয়া তাহার চিন্তা ভুলিব, শিখাইয়া দিন। আমি বুঝি পাগল হইলাম!" গুরুদেব সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। অ-বিকল স্বরে বলিলেন, "স্থির হও বৎস! সাদুল্লা খাঁর অনাথা কন্যা দেলেনাকে গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন কর। বৎস, এ পথে অনেক কাজ, তাহাদের বাদ দিয়া চলিবার তো আর উপায় নাই; এখন তাহাদের পালন করিতেই হইবে। সুনন্দা যে মোড়কটি সাদুল্লার মাতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, যদি তুমি দেলেনাকে বিবাহ কর তাহা হইলে বিবাহের পর তোমাকে তাহা দিতে বলিয়া গিয়াছে! তাহা পাইলেই তাহার মধ্যে তোমার কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবে। সেই পথে ধৈর্য্য ক্ষমা ও সত্যের সাহায্যে সরল ভাবে চলিয়া যাইও, সময়ে যথাস্থানেই পৌঁছিবে। যাও, আহার করিয়া আইস, আমার আজ ক্ষুধা নাই।" আরো অনেক কথা বলিবার ছিল, অনেক কথা শুনিবার ছিল, কিন্তু গুরুদেবের অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পরিলাম না; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করা অসম্ভব হইল। মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "প্রভো—দেলেনা ম্লেচ্ছকন্যা, আমি হিন্দুসন্তান" বাধা দিয়া সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, সে হাসি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত একবার চমকিয়াই মিলাইয়া গেল। স্মিত মুখে কহিলেন, "তোমার সমাজ কে? ভয় কাহাকে? সচ্চিদানন্দ! বিবাহের পর সব কথা জানিও। সুনন্দার অনুরোধ, বিবাহ না করিলে যে পথে চলিয়াছ সে পথ হইতে যেন কেহ তোমায় পথান্তরে না লইয়া যায়। মৃতের অনুরোধ অবশ্য পালনীয়, যাও বৎস, যাও।"

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমায় স্নেহপূর্ণ উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া গুরুদেব আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন, আমি তাঁহার সহিত অনেক দুর পর্য্যন্ত গেলাম! বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই, কাঁদিয়া পায়ে পড়িয়া কহিলাম, "অকৃতজ্ঞ সন্তানকে ত্যাগ করিবেন না, আমি কেমন করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া থাকিব! দেলেনা কি এ অভাব দুর করিতে সমর্থ! গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহসূচক হাস্য করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, "আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।"

মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত দেহে আমি আমার সেই

আশৈশবের স্নেহনীড়ে—গুরুদেবের পরিত্যক্ত কুটীরে প্রবেশ করিলাম। যে গৃহপ্রান্তে আমার অভাববোধহীন অনাবিল শান্তিপূর্ণ জীবনের সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বৎসর সচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে, সেই চিরপরিচিত কুটীর আজ যেন আমার চক্ষে এক মুহূর্ত্তে শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইয়া গেল। ওই ভূমে বিস্তৃত ব্যাঘ্রাজিন, ওই ধর্ম্ম পুস্তক কয়খানি, ওই ক্ষুদ্র দীপাধার—ও সমস্তই যেন স্নেহময়ের স্নেহপূর্ণ সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। তাহারা একসঙ্গে যেন তীব্রস্বরে আমায় তিরস্কার করিয়া উঠিল, "অকৃতজ্ঞ! মূঢ়, সেই জগতে দুর্ল্লভ রত্ন স্বেচ্ছায় আপনি হারাইলি, আমাদেরও বঞ্চিত করিলি! অন্ধ! কাঞ্চন মূল্যে কাঁচ কিনিয়া গলায় পরিতে চাস! তোর ঘৃণা করে না! সেই দীর্ঘ দিনের শত স্মৃতিপূর্ণ নির্জ্জন গৃহে আমি আর হৃদয়াবেগ রুদ্ধ রাখিতে পারিলাম না। উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া ডাকিলাম, "কোথায় গুরুদেব! কোথায় তুমি ! আমায় মায়াবিনীর মায়ায় অসহায় ভাবে পরিত্যাগ করিয়া কেন তুমি চলে গেলে, প্রভু! কেন আমায় লাঞ্ছনার দ্বারা, কঠোর দণ্ড দ্বারা এ অধঃপতন হইতে ফিরাইলে না!"

সহসা আমার দৃষ্টি মুক্ত দ্বার দিয়া সাজঙ্গীর তীরে পতিত হইল, মুহূর্ত্তে মনের গতি ফিরিয়া অন্য পথে দাঁড়াইল। মন্ত্র সম্মোহিতের ন্যায় মুহূর্ত্তে সেই দিকে আকৃষ্ট হইলাম। দেখিলাম, জনশূন্য ঘাটে দেলেনা একাকী বাসন মাজিতেছে, তাহার শিথিল কবরী বেড়িয়া এক গাছি শুষ্কপ্রায় জুঁইফুলের মালা ঘেরা, সুগোল হাত দুখানিতে কালো কালো কাঁচের চুড়ি বাহু সঞ্চালনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে টুন্ টুন্ বাজিয়া উঠিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত মাত্র কে যেন কাণের কাছে নত হইয়া গুরুদেবের সেই ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করাইয়া দিল। গুরুদেব রাত্রে বলিয়াছিলেন, "দেলেনার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায়। সাবধান বৎস! অমঙ্গলে মঙ্গলের সূচনা খুঁজিও, অমঙ্গলে আত্মহারা হইও না।" তবে কি সে আমারি জন্য চির দুঃখিনী হইতে পারে! দ্বিগুণ আগ্রহে আমার হৃদয় তাহার পানে ছুটিয়া গেল, আমি তাহাকে অসুখী হইতে দিব না!

সবে মাত্র সম্মুখের জমীটা পার হইয়া আসিয়াছি, এমন সময় সহসা সেই আম বাগানের মধ্য হইতে একজন অশ্বারোহী বাহির হইয়া আসিলেন। ঘোড়াটা খুব ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঘামে, তাহার পাংশুবর্ণ রং যে কখনো অমল শ্বেত ছিল, তাহা বুঝিবার যো নাই। তাহার মুখ দিয়া ফেন বাহির হইতেছিল, আরোহীও বড় কম-শ্রান্ত হয়েন নাই। তিনি এই বড় তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি আসিয়াই আমায় দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মানুষ আছে! আল্লার দোহাই, একটু জল আনিয়া দাও! আঃ, এই যে পুকুর!" এই বলিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া সোৎসুকে সাজঙ্গীর প্রতি ফিরিয়া দেখিলেন। এই সময় দেলেনাও তাঁহার আগমনে সকৌতুকে মুখ ফিরাইয়া আমাদের দিকে একবার মাত্র ফিরিয়াছিল, তারপরই অপরিচিত লোক দেখিয়া সে জড়সড় হইয়া শশব্যস্তে কাপড়ে মাথা মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু তথাপি সেই শ্রান্ত স্বেদবিগলিত দেহ আগন্তুকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি সকল পরিশ্রম যেন সেই মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইয়া গিয়া অবগুণ্ঠনবতী কার্য্যপরায়ণা বালিকার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমার সে দৃষ্টি কেমন যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, অপ্রসন্নচিত্তে জলের ধারে আসিয়া দেলেনার নিকট হইতে সদ্য ধৌত একটি জলপাত্র ভরিয়া আনিয়া আগন্তুকের সম্মুখে ধরিয়া কহিলাম, "আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি, বিশ্রামের আবশ্যক হয় আমার কুটীরে আসুন।" আগন্তুক চমকিয়া আমার পানে ফিরিলেন, ফিরিতেই যেন ভূতাহতের ন্যায় তাঁহার মুখ সহসা নীল হইয়া গেল। সাতঙ্কে আমার পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে আত্মগত বলিয়া ফেলিলেন, "একি! এযে সেই মূর্ত্তি! একি এতদিন পরে কবর হইতে উঠিয়া আসিল!" আমিও তেমনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিলাম, পাংশু ওষ্ঠ অননুভূত যন্ত্রণায় কম্পিত হইতেছিল। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে অপরিচিত ব্যক্তি আমায় দেখিতেছিল। ব্যাপার কি? বিস্ময় ও কৌতূহলে আমি বিরক্তি ভুলিয়া গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আগন্তুক আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। একটু লজ্জিত হইয়া সস্মিত স্বরে কহিলেন, "মাপ করিবেন, আমার একটি মৃত আত্মীয়ের সহিত আপনার শারীরিক সাদৃশ্য দেখিয়া

চিত্ত দমন করিতে পারি নাই। জলপাত্র গ্রহণ ও পানান্তে প্রত্যর্পণ করিয়া, সুপরিচ্ছদধারী প্রৌঢ় আগন্তুক তাঁহার লালসা-প্রোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় মুদিত কমলবৎ ব্রীড়াবতী কুমারীর উপর স্থাপন করিয়া আমায় প্রশ্ন করিল,"তোমার কাছে উপকৃত হইলাম, আমি নাথনগরের মহম্মদ আলীখাঁ। কাফের হইলেও তোমার কোন উপকার করিতে আমি অনিচ্ছুক হইব না; যদিও আমার মত ধার্ম্মিক মুসলমানের তাহা উচিত নয়, তথাপি সে পাপ আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার নাম?" আমি নাম বলিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন না, কারণ তাঁহার দৃষ্টি ও মন অন্যত্র নিযুক্ত ছিল। একটু পরে চকিত হইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "অঁ্যা, কি বলিলে?" গভীর ঘৃণার সহিত উত্তর দিলাম। মহম্মদ আলী আবার তাহার বিলাস অলস দৃষ্টি সেই অপাপ বিদ্ধা পবিত্রা কুমারীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও-মেয়েটি বোধ হইতেছে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিনী? মেয়েটি কুমারী না বিবাহিতা? উহাদের বাড়ী কোথায় বলিতে পার?"

অদম্য ক্রোধে রোষকষায়িত নেত্রে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া সকোপে কহিলাম, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ে অপরিচিত পুরুষের প্রয়োজন কি?"

আগন্তুক হাসিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, কিন্তু চলিয়া গেলেন না, ছুতা ধরিয়া ঘোড়ার লাগামটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। দেলেনা অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া বোধ হয় ভাবিয়াছিল, এতক্ষণ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাই সে একেবারে অবগুণ্ঠন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আমার দিকে ফিরিয়া একবার ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সহসা তাহার চোখে অশ্বারোহীর কুটিল দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল, তখনি দন্তে জিহ্বা কাটিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সে বসিয়া পড়িল। এবার আরোহী অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন, শিক্ষিত অশ্ব আরোহী লইয়া মুহূর্ত্তে উড়িয়া চলিয়া গেল, আমার বুকের বোঝা নামিয়া গেল। নাথনগরের মহম্মদআলী একজন সাধারণ লোক নহেন। মনে মনে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিলাম, ইনিই লোকসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া আদৃত। ধন্য সমাজ, তুমি কি একেবারেই অন্ধ! যার কাছে যে ভীষণ কাহিনী শুনিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া আপনা আপনি সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, ভ্রাতৃঘাতী, নারী ও শিশু হত্যাকারী, প্রভুভক্ত ভৃত্যের সর্ব্বনাশকারী পাপিষ্ঠ! মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলাম, আমার দেলেনার প্রতি কলুষদৃষ্টি!

দেলেনার কাছে নামিয়া আসিলাম, দেলেনা উঠিয়া তৈজসগুলা পূর্ণ ধৌত করিয়া কাপড় কাচিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "মাগো, কি ভয়ানক চাহনি! দেখলে ভয় করে! মাগো, যেন বাঘের মত চোখ!" তারপর নিজের কাজ সারিয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া উঠিয়া চলিল, আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। আমি কুণ্ঠিতভাবে কাছে আসিয়া বলিলাম,"দেলেনা, তোমারি জিত!"

দেলেনা মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "না কাজ নাই, আমার জন্য তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিও না, তোমার মা বলিতেন, নিজের ধর্ম্ম পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তা সে ভালই হোক মন্দই হোক।"

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, আমার যা জ্ঞান নাই তাহা এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অশিক্ষিতা বালিকার তাহা আছে! আমার চিত্ত দ্বিধাশূন্য ভাবে তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিল, বলিলাম, "দিল! দিল! এখন আর আমায় ত্যাগ করিও না, আমি তোমাকেই চাই, তিনিও অনুমতি দিয়েছেন।" নীরবে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া সে ধীরে ধীরে গৃহপথে চলিয়া গেল, আমিও আমার শূন্য কুটীরে প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মহারাণী সুভদ্রাঙ্গী।

(অশোক-জননী।)

১

দীন দ্বিজে কহিল জ্যোতিষী
"সুলক্ষণা কন্যা এই তব;
সত্য কহি, হইবে মহিষী,
পুত্র তার পালিবে এ ভব!"

আশাতীত পুলক-স্বপন!
কি আবেগে সজল-নয়ন!
ভাবে বিপ্র আপনার মনে
'যদি মোর মোহিনী সুতায়,
ভূপ কভু হেরে শুভক্ষণে
পূর্ণ হবে সব বাসনার!'

২

একদিন রাজ-অন্তঃপুরে
রাণীগণ বিস্ময়ে নেহারে,
বিশ্ব-শোভা কমলা আপনি
আসিলা কি সবে ছলিবারে?
হেরে যদি রাজা বিন্দুসার
প্রিয় তাঁর কে রহিবে আর!
শশী যবে গগনে বিকাশে
তারকা কি মোহে কারো মন.
নিরখিলে সুধা-পারাবার
শিশিরে কে করে আকিঞ্চন!
মহিষীরা যুক্তি করে সবে
অপমান স'বে না নীরবে!
হীনতম ক্ষৌর-কাজে তাই
রাখে তারে হয়ে প্রেম-ভীতা-
রূপসীর রূপের ঈর্ষ্যায়
পঙ্কজিনী পঙ্কে আবরিতা!

৩

মহারাজ বিন্দুসার-চিতে
দিল দেখা অজ্ঞাতে বেদনা.—
জগতের সকল সুষমা
নিল কেন অ-কূলে চেতনা!
নাহি জানে সে সুতা দ্বিজের
চায় সাথী হতে হৃদয়ের!
তবু সাধ সে 'নরসুন্দরী'
করে দিক তাঁহারে সুন্দর,
অন্তরে বাহিরে অনিবার
জ্বালি আলো চির-স্নিগ্ধতর!

মনে হয়ে কোন্ জনমের
সে যেন গো নিধি সাধনের!
তা'রি তরে আছে এ জীবন
এ সাম্রাজ্য পূজা-অর্ঘ্য তার,-
সে বিনে যে সকলি বিফল
সুখময়ী বসুধা আঁধার!
নৃপ রহে আন্-মনা তাই
জাগে প্রাণে সে নাই সে নাই!
লুকাবার ঢাকিবার তরে
মহিষীরা করি আয়োজন.
জ্বেলে দিল আরো বেশী যেন
ভস্মে ঢাকা দীপ্ত হুতাশন!

৪

বুকে লয়ে আকুল পিপাসা
মৌন প্রেম প্রগাঢ় নিবিড়,—
মুখে নাহি ফুটে কভু ভাষা
কাটে কাল বিষাদে গভীর!
উভয় উভয়ে ভালবাসে
জানাতে পারে না অনায়াসে!
একে দৈন্য—সুযোগ-অভাব—
অপরের কাল-কুলাচার,—
দু'জনার মাঝখানে হায়,
রচি রহে দূরতা অপার!
প্রেমদেব অলক্ষ্যে বসিয়া
হাসে শুধু উতলা করিয়া!
একদিন বিভলা প্রকৃতি
সে হাসিতে মিলাইয়া সুর,
ঋতুনাথে করিতে আরতি
মাতায়ে তুলিল রাজ-পুর!
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলরাশি হাসে
মত্ত অলি মদির-উচ্ছ্বাসে!
পিক-বধূ বাজাইল বীণা
মুকুলিত রসাল-শাখায়,
মলয় বহিল মৃদুতর
কত সাধ জাগায়ে হিয়ায়!

মহিষীর চরণ পরশি'
রক্তাশোক উঠিল উলসি'!
মহারাজ মালঞ্চ-বীথিকা
ভ্রমে একা উদাস বিধুর,—
বুঝিবা তখন ধীরে ধীরে
নেমে আসে গোধুলি মধুর!
সহসা হেরিলা সবিস্ময়ে
সম্মুখে কি সরোজ নিলয়ে!
মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যাসতী কিবা
বসি একা অশোকের মূলে,
বিনা-সূত্রে গাঁথিছে মালিকা
আঁচল ভরায়ে বন-ফুলে!
একি এ যে বাঞ্ছিতা রূপসী!
অন্তরের নিভৃত প্রেয়সী!
অগ্রসরি ধীর-মৃদু-পায়
থমকি দাঁড়াল নরবর,—
চাতকিনী আঁখি তুলে চায়
বিরাজে সমুখে জলধর!
চারি চোকে ঘটিল মিলন!
ঘুচে গেল সকল বাঁধন!
সুরচিত অশোকের মালা
রাজ-গলে দিল মুগ্ধা বালা!
জ্যোতিষীর বচন সফল
সুভদ্রাঙ্গী প্যাটরাণী আজ,—
সারা বিশ্বে জাগে জয়-ধ্বনি
পুলকিত অমর সমাজ!
উথলে সহসা দৈব-বাণী
"ধন্য রাজা! ধন্য মহারাণী!
জন্মিবেন সম্রাট অশোক
তোমাদের রাজর্ষি কুমার,
করিবারে ত্রিলোক-পাবক
ত্রিরত্নের মহিমা প্রচার!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

জীবাণু বা বেক্‌টিরিয়া।

বেক্‌টিরিয়ার বাসস্থান।

বেক্‌টিরিয়া একপ্রকার অতিক্ষুদ্র জীবাণু; ইহা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। এক একটী জীবাণুকে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিলে মাত্র একটী কলায়ের ডাইলের মত আকৃতি বিশিষ্ট হয়। অথচ এই ক্ষুদ্র প্রাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। ভূপৃষ্ঠ ইহাদের আবাস স্থান, বিশেষতঃ যে স্থান জলাভূমি বা যাহাতে লতাপাতা পচিয়া থাকে, তথায় এই প্রাণী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জল ইহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং যাবতীয় জলজ পদার্থেও ইহারা সর্ব্বদাই বাস করে। বায়ুতেও ইহারা বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ যে স্থানে প্রভুত লোক সমাগম হয়, তথায় এই প্রাণী অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রত্যেক পচা জিনিষেই ইহাদের অবস্থান আছে,—গোময়স্তূপ, মৃত প্রাণীর শরীর, পচা গাছ, এবং যে কোন প্রকার ময়লা জিনিষ ইহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ, কারণ এই সকল পদার্থই এই প্রাণীর অতি পুষ্টিকর খাদ্য। প্রাণীগণের মুখ, পাকস্থলী, মুত্রাশয়, শরীরের উপরিভাগ, পরিচ্ছদ, নখের ভিতর, চুল, মলমূত্র প্রভৃতি যাবতীয় ছিদ্র এবং আবৃত স্থান ও পরিত্যক্ত জিনিষ ইহাদের আবাস স্থান। মোটকথা, যে কোন স্থানে ময়লা সঞ্চিত থাকে, সেখানেই এই প্রাণীগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক স্থানে ইহাদের বিস্তৃতি অতি কম, কিন্তু জল পাইলেই ইহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়।

এইরূপ সতত বর্ত্তমান জীবাণুদ্বারা যে প্রকৃতির কোন না কোন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রাণী সততই আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। এক দিকে এই জীবাণুদ্বারা যেমন আমাদের প্রভুত উপকার সাধিত হইতেছে, অন্যদিকে এই ক্ষুদ্র কীটই আবার রোগের বীজস্বরূপ অলক্ষিতে শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে, দুগ্ধ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ইহাদের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিষয়

আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

বেক্‌টিরিয়ার আকৃতি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বেক্‌টিরিয়া অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইলেও অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহাদের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বেক্‌টিরিয়া আকৃতি অনুসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি বলের মত গোল, কতকগুলি লাঠির ন্যায় লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট, অবশিষ্টগুলি স্প্রিংএর মত বক্র। ছোট বড় আকৃতিভেদে ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে আবার অনেক অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। কোন কোন জাতীয় বেক্‌টিরিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে; নিজ শরীর হইতে বহির্গত একপ্রকার চুলের ন্যায় পদার্থ দ্বারা ইহারা গমনাগমন করিয়া থাকে। এই চুল আবার বিভিন্ন জাতীয় কীটাণুতে বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। কোন বেক্‌টিরিয়ার একদিকে মাত্র একটী চুল, কাহারও দুই দিকে দুইটী, কাহারও প্রত্যেক দিকে একগুচ্ছ করিয়া, আবার কোন কোন প্রাণীর সর্ব্বশরীরই এই প্রকার চুলের দ্বারা আবৃত। তরল পদার্থে এই চুলগুলি কাঁপিতে থাকে এবং ঐ কম্পন দ্বারা ইহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়।

বেক্‌টিরিয়ার বংশবৃদ্ধি।

এই ক্ষুদ্র জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি কার্য্য অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পাদিত হয়। একটী কীট বড় হইতে হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, এবং প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া নূতন জীবাণুর উৎপত্তি হয়। এই নূতন জীবাণুগুলি আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভক্ত হইয়া নূতনতর বংশধরগণের সৃষ্টি করে। বেক্‌টিরিয়ার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। কোন কোন জীবাণু আধ ঘণ্টায় একবার বিভক্ত হইয়া যায়; এই হারে গণনা করিয়া অনায়াসেই ইহাদের বংশধরগণের সংখ্যা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জীবাণু প্রতিদিন ১,৬৫,০০,০০০, এবং দুই দিনে ২,৮১৫,০০,০০০,০০০ জীবাণু উৎপাদন করিতে পারে। এই ২৮১৫০০০০০০০০ কীটাণুর ওজন প্রায় আধ সের মাত্র। প্রতি ঘন ইঞ্চি তরল পদার্থে কোটী কোটী কীটাণু বর্ত্তমান থাকে; একবার জন্মিতে আরম্ভ করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্য শেষ না হয় ততক্ষণ জীবাণু উক্ত হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের অবিরত বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থে ইহারা বাস করে এতগুলি প্রাণী দ্বারা ভক্ষিত হইয়া তাহা অতি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়, অথবা নিজের পরিত্যক্ত একপ্রকার মলমূত্রের দ্বারা ইহারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে; তখন আর ইহাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকে না। বেক্‌টিরিয়ার এত ক্ষিপ্র বংশবৃদ্ধির কারণ এই যে, ইহাদিগকে খাদ্যের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অধিকাংশ গাছই নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিয়া লয়, প্রত্যেক জন্তুই নিজ খাদ্যের অন্বেষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বেক্‌টিরিয়া বসিয়া বসিয়া বৃক্ষ বা প্রাণীর পরিত্যক্ত দেহ বা বস্তু বিশেষ আহার করে, তাই খাদ্য পাইলেই ইহাদের বংশবৃদ্ধির আর কোন ব্যাঘাত থাকে না।

বেক্‌টিরিয়া প্রাণী কি উদ্ভিদ?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বেক্‌টিরিয়া প্রাণী কি উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত? এক হিসাবে বলিতে গেলে ইহাদিগকে জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়, কারণ এই প্রাণী নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারে এবং মিশ্র পদার্থ আহার করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা উদ্ভিদ জাতীয়। ইহাদের আকৃতি, বৃদ্ধির প্রকার ভেদ, ইত্যাদি সম্পূর্ণই উদ্ভিদের ন্যায়। একপ্রকার নীচজাতীয় চারাগাছের সঙ্গে ইহাদের আকৃতিগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে; বেক্‌টিরিয়াতে শুধু উদ্ভিদের সবুজ বর্ণের জলীয় পদার্থ বর্ত্তমান নাই; এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতগণ বেক্‌টিরিয়াকে উদ্ভিদ শ্রেণীতেই ধরিয়া লইয়াছেন। এজন্য বেক্‌টিরিয়াকে জীবাণু না বলিয়া উদ্ভিদণু বলাই উচিত, কিন্তু জীবাণু নামই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা এই নামই ব্যবহার করিলাম।

শ্রমশিল্পে বেক্‌টিরিয়ার সাহায্য।

বেক্‌টিরিয়ার প্রকৃতি এই যে তাহারা যে বস্তু আহার করে, তাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করে।

কখনও ইহারা মিশ্র পদার্থকে অপেক্ষাকৃত সরল মূল পদার্থ সমুহে পৃথক করিয়া দেয়, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ দ্বারা মিশ্র বস্তু উৎপাদন করে। এই জন্য শিল্প রাজ্যে এই কীটাণুর দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। শণ, পাট প্রভৃতি দ্রব্য এক এক জাতীয় বৃক্ষের আঁশ। এই আঁশগুলি কাণ্ডের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে শুষ্ক আঁঠার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। আঁশগুলিকে পৃথক করিয়া লইতে হইলে, এই আঁঠা নরম করিতে হয়। এই জন্য সাধারণত পাট, শণ প্রভৃতি ১৪।১৫ দিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তাহাতে ছালে বেক্‌টিরিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহারা খাইয়া আঁঠাকে ভিন্ন পদার্থে পরিণত করিয়া নরম করিয়া দেয়। তখন স্বল্পায়াসে আঁশ পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নারিকেলের ছোবরা ছয় মাস কি এক বৎসর জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; পরে নরম হইলে পাটের মত ধুইয়া লওয়া যাইতে পারে। স্পঞ্জ এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের অস্থিপঞ্জর। ইহার ভিতরকার ছিদ্রগুলি একপ্রকার অপেক্ষাকৃত কোমল পদার্থের দ্বারা আবৃত থাকে। রৌদ্রে শুকাইতে দিলে, তাহাতে বেকটিরিয়ার উৎপত্তি হয় এবং ঐ কোমল মিশ্র পদার্থ শীঘ্র ইহাদের দ্বারা পৃথক পৃথক মূল স্তরে বিভক্ত হইয়া নরম হইয়া উঠে। তখন ধুইলেই বিক্রীর উপযুক্ত স্পঞ্জ পাওয়া যায়। এইরূপে বেক্‌টিরিয়ার প্রভাবে সিরকা লেবুর আরক, দুধের আরক, নীল, তামাক, আফিম প্রভৃতি স্বল্পায়াসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে শিল্প রাজ্যে ক্রমে ক্রমে এই প্রাণীর উপকারিতা উপলব্ধি হইতেছে; এই কীটাণু না থাকিলে অনেক কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইত।

দুগ্ধে বেক্‌টিরিয়ার কার্য্য।

গোয়ালাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এই ক্ষুদ্র কীটের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। এই কীটের দ্বারা তাহাদের যে প্রকার অপকার এবং উপকার সাধিত হইতেছে এমন আর কাহারও নহে। দুগ্ধ ইহাদের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু মাখন, পনির, ছানা প্রভৃতি উৎপাদন করিতে ইহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বেক্‌টিরিয়ার দ্বারা দুধ প্রথমতঃ অম্ল হয়; এত শীঘ্র ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে এপর্য্যন্ত অম্লত্বই দুধের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুধ স্বভাবতঃ মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট। দোহন কালেই তাহাতে প্রচুর বেক্‌টিরিয়া প্রবেশ করে, তাহারা দুধে অবস্থিত চিনিকে দুধের আরকে পরিবর্ত্তিত করে এবং এই আরকই দুধকে অম্লস্বাদ প্রদান করিয়া থাকে। যদি কোন উপায়ে দুধে বেক্‌টিরিয়ার প্রবেশ এবং তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি রহিত করা যাইতে পারে, তবে দুধ চিরকালই মিষ্ট থাকিবে। বেক্‌টিরিয়া দ্বারা দুধে আরো অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কখন কখন দুধ অম্ল না হইয়াও ঘোলা হইয়া উঠে, কখন কখন ইহা কটু বা সাবানের মত স্বাদ বিশিষ্ট হয়, কখন বা আঁঠাল হইতে আরম্ভ করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এমন ঘন হয় যে টানিয়া লম্বা করা যায়। কোন কোন সময় দুগ্ধ আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ ধারণ করে, কখন বা লাল এবং ক্বচিৎ পীতাভ হয়। এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে দুধে অনেক প্রকার কীটাণু প্রবেশ করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কীটদ্বারা এই সকল বিভিন্নপ্রকার পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হয়। ভাল রাখিতে হইলে যাহাতে দুধে অধিক কীটাণু প্রবেশ না করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

দুগ্ধে বেক্‌টিরিয়ার উৎপত্তি কিরূপে হয় এখন তাহাই আলোচনা করা যাক।

সুস্থ গাভীর দুগ্ধ বাঁট হইতে বাহির হইবার সময় বেক্‌টিরিয়াশূন্য থাকে। কিন্তু দোহন কালেই ইহাতে এত কীটাণু প্রবেশ করে যে দোহন শেষে প্রতি ঘন ইঞ্চিতে প্রায় দশলক্ষ কীটাণু দেখা যায়। অতএব এই কীটাণু নিশ্চয়ই বাহির হইতে প্রবেশ করিয়াছে। বহির্দ্দেশে ইহাদের উৎপত্তিস্থান অনেক। প্রতিবার দোহনাবশেষে বাঁটের দুগ্ধনালীতে কিছু না কিছু দুগ্ধ নিশ্চিতই সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত দুগ্ধে বাহির হইতে কীটাণু প্রবেশ করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া শীঘ্রই প্রচুর বর্দ্ধিত হয়। পরবর্ত্তী দোহনকালে প্রথম

নির্গত দুগ্ধসঙ্গে এই পরমাণুগুলি দোহন পাত্রে প্রবেশ করে; তথায় অতি শীঘ্র ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। গাভীর শরীরে প্রচুর বেকটিরিয়া বাস করে। শরীরস্থিত প্রতি লোম, প্রতি ধূলিকণা, প্রতি শুষ্ক গোময় বিন্দু লক্ষ লক্ষ কীটাণুর অবস্থিতি স্থান। গাভী লেজ নাড়িয়া বা গা ঝাড়িয়া এই সব ময়লা হইতে অসংখ্য কীটাণু দোহনপাত্রে নিক্ষেপ করে। তারপর দোহনপাত্রেও শত শত কীটাণু পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে; কারণ যতই পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলা যাউক না কেন দোহনপাত্রে পূর্ব্বসঞ্চিত কতক বেকটিরিয়া লাগিয়া থাকিবেই। আবার দোহনকারী সাধারণতঃ অপরিষ্কার হাত ও ময়লাযুক্ত কাপড়াদি লইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহার শরীরও বেকটিরিয়ার উৎপত্তি স্থান। অপরিষ্কার গোয়ালের বাতাসেও এই কীটাণু প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করে। এই সকল নানা-স্থান হইতে দুধে বেকটিরিয়া প্রবেশ করে। দুধ ভাল রাখিতে হইলে এই সকল অনিষ্টকারী কারণগুলির প্রতিকার করিতে হইবে। এজন্য সতর্কতার প্রয়োজন। গাভীকে ঘোড়ার ন্যায় যত্ন করিতে হইবে, গোয়াল ঘর, দোহন পাত্র, দোহনকারীর বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। দুগ্ধে অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ অধিক উত্তাপ কীটাণুর বংশ বৃদ্ধির সহায় হয়। যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে, দুধ কখনও ঘোলা বা আঁঠাল আঁঠাল হইবে না, অপিচ ইহার মিষ্টতা অনেক দিন বজায় থাকিবে। কিন্তু যতপ্রকার সতর্কতাই অবলম্বন করা যাউক না কেন, বেকটিরিয়ার হাত হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। তবে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে যত্ন নিলে অনিষ্টকারী কীটাণু হইতে মুক্তি পাওয়া যায়; ইহা সত্বেও যাহা দুধে বর্ত্তমান থাকে তাহাদ্বারা বিশেষ অপকার হয় না।

মাখন। দুগ্ধে বর্ত্তমান অধিকাংশ কীটাণু সর খাইয়া অবস্থান করে। মাখন তোলার জন্য এই সর সংগ্রহ করা হয়। ব্যবসায়ীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া-ছেন যে সর মন্থন না করিয়া দুই একদিন রাখিয়া পচাইলে, তাহা হইতে স্বল্পায়াসে অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু ও অধিক মাখন পাওয়া যায়। সরে যে বেকটিরিয়া থাকে তাহা উক্ত দুই একদিন সময় পাইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সর খাইয়া সরের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কতকগুলি কীটাণু দুধের আরক প্রস্তুত করে, কতকগুলি চর্ব্বির উপর, আর কতকগুলি এলবুমেনের উপর কাজ করে। ফলে সর অম্ল ও ঘোলা হয় এবং তাহাতে এক অপূর্ব্ব সুস্বাদ ও সুগন্ধ জন্মে। তখন মন্থন করিলে স্বল্পায়াসে প্রচুর মাখন পাওয়া যায়। মাখনের যে বিশেষ সুগন্ধ ও সুস্বাদ আছে, তাহা এই পচা সরের উপর নির্ভর করে। সর না পচাইলে তাহা হইতে কখনও উক্ত স্বাদ বিশিষ্ট সুগন্ধি মাখন পাওয়া যাইতে পারে না।

পনির। ইহা প্রস্তুত করিতে ব্যবসায়ীগণ সম্পূর্ণ-রূপে বেকটিরিয়ার উপর নির্ভর করে। সদ্য প্রস্তুত পনিরের স্বাদ একেবারেই প্রীতিপ্রদ নহে। পনির প্রস্তুত করিয়া প্রায় একমাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়, এই অবসরে তাহাতে বেক্‌টিরিয়া জন্মে, এই বেক্‌টিরিয়াই ইহাকে মিষ্ট স্বাদ প্রদান করে। কখন কখন রক্ষিত পনির সুস্বাদু হওয়া দূরে থাকুক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কখন কখন শত চেষ্টা সত্বেও সর হইতে ভাল মাখন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, দুধে পূর্ব্বেই দুষ্ট কীটাণু প্রবেশ করিয়াছিল। এই দুষ্ট কীটাণু সাধারণতঃ ময়লা হইতে জন্মে। পূর্ব্বে কথিতরূপ সত-র্কতা অবলম্বন করিলে ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কাজেই যে উদ্দেশ্যেই কেন দুধ সংগ্রহ করা না যাউক সর্ব্বদাই গাভীর দোহনপাত্র ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা উচিত। নতুবা সময় সময় সব পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

সাধারণতঃ আমরা কথায় বলি, "ছেলেকে মানুষ করিতে হইবে।" ইহার অর্থ এই যে, সন্তান জন্মিয়াই

সৎগুণের অধিকারী হয় না, তাহার মনোবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন না হইলে পশুতে ও শিশুতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। যাঁহারা ভাল সার্কাস দেখিয়াছেন, তাঁহারা বনের পশু কিরূপ পোষ মানে, মানবের ইঙ্গিতে ভয়ে ভয়ে কিরূপ বুদ্ধিমান জীবের ন্যায় চলিতে পারে, প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়া দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছেন। যেরূপ অনিচ্ছাসত্বে পশুকে কার্য্য করিতে হয়, সন্তানকেও তেমনি শাসন দ্বারা বশীভূত করা হয়। "বেত্র সংযত করিলে সন্তান খারাপ হইয়া যাইবে," পূর্ব্বকার এই কঠোর নীতির পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা কমিয়া গেলেও, উহা একেবারে বর্জ্জনীয় নহে, পরন্তু বহু স্থলে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানবের যেরূপ কতকগুলি অধিকার আছে, শিশুকে তেমনি দুষ্টামি করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শিশুর অপরাধের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যাইবে যে দণ্ডবিধি আইনের বহু ধারামতে সে অভিযুক্ত হইতে পারে। তাহার প্রত্যেক কার্য্য সমালোচনা না করিলেও গুরুতর অপরাধ কোন প্রকারে উপেক্ষিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশের পিতামাতা সন্তান শাসন বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন। সন্তান আপনা আপনি ভাল হইবে, শুধু অজ্ঞানতার দরুণ অন্যায়াচরণ করে, এরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ শাসনের উপকারিতা বা আবশ্যকতা অনুভব করেন না।

যে বালকের আস্ফালনে ও বিক্রমে সমস্ত প্রতিবেশী সন্ত্রস্ত হইত, তাহাকে উত্তরকালে অতি নিরাহ ও প্রশান্ত হইতে দেখা গিয়াছে, অপর পক্ষে সৎগুণালঙ্কৃত সাধু পিতার সন্তান শাসিত হইয়াও হীন চরিত্রের পরিচয় দিয়াছে। শাসনের অভাবে যে কত ছেলে নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা কে গণনা করিবে? আর শাসনাভাবে যে সৎপিতার পুত্র জঘন্যতর হইত না ইহাই কে প্রমাণ করিবে?

কতকগুলি বৃক্ষের বীজ শক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও সহজে গজাইয়া উঠে, মানবীয় সাহায্যের অভাবে অঙ্কুরিত হইতে পারে। কিন্তু ভূমি চ.ষ না হইলে বহু স্থলেই উপ্ত বীজ নষ্ট হইয়া যায়। সন্তান যখন ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ নহে, স্বতঃই যখন সে অপরের উপর নির্ভর করিতে চায়, তখন ত কিছুতেই তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা বিধেয় নহে।

কোন কোন বালক অল্প বয়সে উচ্চ শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্ববিধ কার্য্যে অপর সকল খেলার সাথীর উপর নেতৃত্ব করিতে প্রয়াসী হয়। এরূপ বালককে বাল্যে শাসন করা গুরুতর ব্যাপার। সে স্বভাবদত্ত শক্তি লইয়া যে বিশাল ভূমিতে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে, অপর সাধারণ বালককে তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া উচিত নহে।

সন্তান পাঁচ বৎসরের ভিতরে যাহা শিক্ষা করে অবশিষ্ট সারা জীবনে উহার অর্দ্ধেকও শিখিতে পারে না। এই সময়ে জনকজননীর কতটা সতর্ক হওয়া উচিত, উহা সহজেই বোঝা যায়। হায়, পিতামাতার শিক্ষার অভাবে ও তাচ্ছিল্যে কত গুণবান পুত্র কুসংসর্গে মিশিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে! পিতামাতার কত সময় বৃথা হয়! তাহারা যদি অবসর কালে সন্তানশিক্ষা সংক্রান্ত ২।১খানা পুস্তক পাঠ করেন, তবে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। "ওরে, তোকে একটা মাষ্টার রাখিয়া দিব," এবম্বিধ অসম্মানসূচক বাক্যে যাহারা সন্তানশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, তাহারা শিক্ষার দায়িত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন।

প্রচুর অর্থ রাখিয়া যাইতে পারিলেই সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যের সমাধা হয় এরূপ ধারণা এদেশের পিতামাতার হৃদয়ে বদ্ধমূল। আহা, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে একদিনে গচ্ছিত অর্থ সন্তান উড়াইয়া দিতে পারে। যে অর্থের কদাচ বিনাশ নাই, যাহা চিরস্থায়ী সুখের একমাত্র উপায়, যাহা প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে পারে, যাহা সাংসারিক উন্নতির অদ্বিতীয় সোপান, সন্তানকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়া যাহারা স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা সঞ্চয় করিতে দেখিলে কৃতকৃতার্থ হয়, তাহাদের ভুল কে সংশোধন করিবে?

বাধ্যতা।

পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা শিশু সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব

নিরূপণ করিয়াছেন। জন্মিবার এক সপ্তাহ পরে শিশুর স্মৃতির উদয় হয়। তিন সপ্তাহ পরে ভয় ও বিস্ময় দেখা যায়। ১২ সপ্তাহকাল পরে হিংসা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। ১৪ সপ্তাহ পরে বুদ্ধি ও প্রেম; অহঙ্কার ও প্রতিহিংসা ৮ মাসের সময়; ঘৃণা ও দুঃখ ১০ মাসের সময়, লজ্জা ও অনুতাপ ১ বৎসর ৩ মাস কালে দৃষ্ট হয়।

সন্তান যখন ক্রন্দন করে সেই সময় হইতে তাহার শিক্ষার সূত্রপাত হয়। শিশুর কান্না বন্ধ করা ও উহাকে ইচ্ছা মতে ঘুমপাড়ান নবীনা জননীর প্রধান সমস্যা। কত সময় রোরুদ্যমান ছেলেকে কোলে করিবার জন্য পিতাকে গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিতে হয়। শিশু যখন খুব কাঁদে, তখন সাধারণতঃ মায়ের প্রাণে বড় কষ্ট হয়। একজন ইংরাজ মহিলা একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে সন্তানকে খুব রোদন করিতে দেখিয়া মাতা তাহাকে শান্ত করিতে উদ্যত হওয়ায় বালকের পিতা তাঁহাকে বাধা দিলেন। পাছে কেঁদে কেঁদে ছেলের ফিট্ হয়, এই ভয়ে পিতামাতা সন্তানের অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন প্রকার ভয় পাইয়া কাঁদিলে, শিশুর পীড়ার আশঙ্কা করা যাইতে পারে, অন্যথা বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। কেঁদে কেঁদে শিশুটী শেষে শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এরূপ দৃশ্যে আমাদের দেশীয় পিতামাতার কোমল প্রাণে খুব ব্যথা লাগিতে পারে, কিন্তু শাসনের ফলে যে ভবিষ্যতের কত অসুবিধা ও কষ্ট দূর হইল, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে! মাতার মন শক্ত হইলে এরূপ শাসন অতি শৈশবে অবলম্বন করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দরিদ্র পিতামাতার সন্তান খুব আবদার করিতে পারে না, যেহেতু তাহার বহু আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে।

শিশুর ক্রীড়ার রাজ্য ও আমাদের সংসারের মাঝখানে একটি পর্দ্দা টানিয়া লইতে হইবে। যে সকল উদার পিতামাতা সন্তানের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী করিবার আকাঙ্ক্ষায় নানাবিধ সাংসারিক সমস্যা অবোধ সন্তানের নিকট উপস্থিত করেন, তাঁহারা উহার ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। আমাদের গৃহে ছেলেপিলের বিশেষ কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। অলক্ষিত ভাবে অতি শৈশব হইতে শিশু গুরুজনের কথাবার্ত্তায় যোগদান করিতে আরম্ভ করে। এরূপ অনধিকার চর্চ্চা দণ্ডদাতা পিতামাতা অবশ্যই বন্ধ করিবেন অন্যথা সন্তান ক্রমশঃ অবাধ্য হইয়া উঠিবে। অল্পবয়স্ক বালক যে পাকা কথা বলে ইহাতে তোমার পরিবারে হাসির ফোয়ারা উত্থিত হইতে পারে কিন্তু জানিও যে পশ্চাতে অশ্রুনীর হাসির স্থান অধিকার করিতে পারে। অন্যান্য দেশে শিশুদিগের বাসের জন্য বিশেষ ঘরের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সেস্থানে সকলে প্রবেশ করিতে পারে না ও শিশুরা ইচ্ছা করিলেই গৃহের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় না। আমাদের দেশে কোন কোন পিতা পূর্ব্বোক্ত সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলেও দারিদ্র্য নিবন্ধন সন্তানের শিক্ষা ও বাসের জন্য পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ নহেন।

অল্প বয়সে সন্তান সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার ইচ্ছাধীন থাকিবে। বুদ্ধির ক্রমোন্মেষের সহিত শাসন-রজ্জু শ্লথ করিতে হইবে। দ্বাদশবর্ষের অধিক হইলে সন্তানকে প্রহার দ্বারা বাধ্য করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। অভিভাবককে কখন কখন ছেলের অনুরোধের উপর বলিতে হয়, "না, হবে না" ইত্যাদি। কেন হবে না, হইলে কি দোষ, ও বিষয় আদবেই বিবেচনা করেন না। বারংবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া বালক ন্যায় ও অন্যায় শুধু পিতার খামখেয়ালি বলিয়া মনে করে। বয়স্ক হইলে সন্তান পিতার কথায় মোটে কাণ দেয় না বরং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান যদি বুঝিতে পারে যে ন্যায় ও প্রেমের ভিত্তির উপর পিতৃশাসন প্রতিষ্ঠিত তবে উহার তীব্রতা কখনও অনুভব করিবে না। পিতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিচয় পায় বলিয়াই সন্তান বাধ্য হয়। যে পিতা ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহার সমগ্র শক্তি সন্তানের উপর প্রয়োগ করিতে চাহেন, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, যেহেতু একটি অন্যায়ের প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অপর অন্যায়ের অভিনয় করেন। মনের দৃঢ়তামূলক আদেশ সুস্পষ্ট ও অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইলে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। তুমি যখন ছেলেকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিবে, তোমার কথা দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইয়াও সহৃদয়তা পূর্ণ হইতে পারে।

সন্তানকে হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বে আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি সম্বন্ধে পিতামাতা ও শিক্ষককে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। তাহাকে বাধ্য করিতে উদ্যত হইয়া যদি অভিভাবক বুঝিতে পারেন যে আজ্ঞাটি ন্যায়সঙ্গত নহে, তবে অন্যায়াদেশ প্রত্যাহার করা বিধেয়। প্রথম আদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় আদেশ প্রদান করিবে না। অতিরিক্ত শাসনে সুফল ফলে না।

তোমার শাসনপ্রণালী যদি কখন কঠোর ও কখন শিথিল হয় তবে উহা কিছুমাত্র কার্য্যকারী হইবে না। একদিন যে অপরাধের জন্য সন্তানকে গুরুতর প্রহার করিয়াছিলে, পুনরায় যদি সে সেই একই অপরাধ করে, তুমি কি নীরব থাকিবে? তোমার স্বাস্থ্য খারাপ, চিত্ত ম্লান থাকিতে পারে, তজ্জন্য তুমি কি শাসনদণ্ড উত্তোলন করিবে না? তুমি যদি এরূপ যদৃচ্ছভাবে নিজে চলিতে থাক, কোন প্রণালীর অধীন হইতে ইচ্ছুক না হও, সন্তানকে কখনও নিয়মাধীন করিতে পারিবে না। কোন সময়ে জনৈক পিতা সন্তানকে আদেশ পালনে অনিচ্ছুক দেখিয়া তীব্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি ইচ্ছামত চলিতে চাও? আমার কথার কি বাধ্য হইবে না?" ইহাতে বালক লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি পিতার বাধ্য হইব, আচ্ছা বাবা, তুমি কি কাহারও আদেশ প্রতিপালন কর না?" ধার্ম্মিক পিতা বলিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। যে সমাজে এরূপ পিতার সংখ্যা অধিক, উহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত।

কামনা!

সে দিন কোথায় হায়!
যাহা যায় তাহা যায়,
ফিরিয়া আসেনা হায়!

তেমনি কানন ফুল ফলে ভরা,
গগনে জাগিছে চন্দ্রমা তারা,
নদী-নির্ঝরে নির্ম্মল ধারা
মিশিছে সাগর-গায়।

গুঞ্জনরত ফুল বনে অলি
লুটিছে অমিয়, পবন আকুলি
সুপ্ত বিরহ জাগায় কেবলি,
নিমেষে কোথায় ধায়
ফিরে সে আসেনা হায়!

ছলনার জাল করিয়া ছিন্ন
ফুটিবে কবে সে দিব্য লাবণ্য,—
রবেনা বিরহ ভাবনা অন্য,
বিকাব তাঁহারি পায়
সম্বলহীন দীন আত্মার
যা কিছু যা কিছু হায়!

শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

"টিনের ঘর।"

এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দিবাভাগে টিনের ঘরের অধিকতর উত্তপ্ত বায়ুময় স্থানে অবস্থান হেতু আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বায়ু উত্তপ্ত হইলেই তরল হয় এবং উহার আয়তন বৃদ্ধি পায়, সুতরাং প্রতি নিশ্বাসে ফুসফুসেও অল্প পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডলের উপরিস্থ বায়ু অত্যধিক তরল এজন্য চাপশক্তির স্বল্পতা প্রযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য চলে না বলিয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়।

"ধূলিকণা।"

অনেক স্থলেই বায়ুতে অল্পাধিক পরিমাণ ধূলিকণা বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ এই সমস্ত ধূলি অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্ধকারময় গৃহের দেয়ালের গাত্রস্থ কোনও ছিদ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে বড় ধূলিকণাসমূহ অণুবীক্ষণ

যন্ত্র ব্যতীত কোন উপায়েই দৃষ্ট হয় না। যেখামকার বায়ুতে যত অধিক ধূলিকণা সে স্থানের বায়ু তত অধিক দূষিত।

"বায়ুতে বিচরণশীল কীটাণু।"

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় বায়ুতে সর্ব্বদা বহু জাতীয় কীটাণু বিদ্যমান আছে। দুধ হইতে দধির উৎপত্তি, খাদ্য দ্রব্যাদির পচন, ক্ষত স্থানে পচলা পড়া, মৃত প্রাণিসমূহের গলিত হওয়া, রঞ্জন কার্য্যে রংকে পরিস্ফুট করা ইত্যাদি বহু কার্য্য কেবল এই সমস্ত কীটাণু কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুতে সর্ব্বদা কি পরিমাণ কীটাণু বিদ্যমান থাকিলে সর্ব্বস্থানেই নিরন্তর এই প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। সুখের বিষয় এই সমস্ত কীটাণুর অতি অল্প ভাগই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। অথচ বায়ুতে যে কয় প্রকার রোগাৎপাদক কীটাণু (Bacteria) বিদ্যমান আছে, তাহাদের ধ্বংসকারী প্রভাবও বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে বহু পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে, তাহাদের এই সমস্ত কীটাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কোন কোন রোগোৎপাদক কীটাণু আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও শক্তিতে দুর্জ্জয়; তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। টিউবারসেল ব্যাসিলাস্ (Tubarsule Bacillus) নামক এক প্রকার কীটাণু হইতেই যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যক্ষ্মা যে কি মারাত্মক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাহা অনেকেই সবিশেষ অবগত আছেন।

এই সমস্ত কীটাণু ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়াই বায়ুতে বিচরণ করিতে থাকে। যে বায়ুতে ধূলিকণা অধিক, সে বায়ুতে এই সমস্ত কীটাণুও অধিক থাকে। দূষিত বায়ু ঈদৃশ কীটাণু পরিপোষণের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। দূষিত বায়ু উপভোগ হেতু এই প্রকার কোন কীটাণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনই তন্নিবারণের প্রধান উপায়। সমরপোত মধ্যস্থ দুর্জ্জয় সৈনিকগণ যেমন শত্রুর অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রভাবে অরিকুল নির্ম্মূল করিয়া থাকে, তদ্রূপ অসংখ্য রণতরী সদৃশ রক্তের লোহিতকণিকা গুলিতে অবস্থিত "হিমোগ্লোবিন" রূপ দুর্নিবার সেনাকুল অক্সিজেন আগ্নেয়াস্ত্র প্রভাবে দেহপ্রবিষ্ট কীটাণুর ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত না উহা ধ্বংস হয় সে পর্য্যন্ত উহার উপর অবিরাম আক্রমণ করিতে থাকে। সুতরাং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা রক্তের লোহিতকণিকাগুলিকে অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া রাখাই দেহপ্রবিষ্ট রোগোৎপাদক কীটাণু সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়।

গৃহ ও অঙ্গনাদি ঝাঁট দেওয়ার দরুণ বহু ধূলিকণা ইত্যাদি উত্থিত হইয়া বাটীস্থ বায়ুকে দূষিত করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত বাড়ীঘর ঝাঁট দেওয়ায় পূর্ব্বে তৎসমুদয় বেশ জলসিক্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অথবা অতি প্রত্যূষে কিংবা সন্ধ্যাবেলায় যখন ধূলি আর্দ্র থাকে তখন ঝাঁট দেওয়া উচিত।

"ওজন (Ogone)।"

স্থান এবং অবস্থা বিশেষে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া উহা কতকটা ঘনীভূত আকারে অবস্থিতি করে। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে, সমুদ্র বক্ষে এবং পর্ব্বতোপরিস্থিত বায়ুতে এই ওজন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বায়ু মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিত হইলেও তত্রস্থ বায়ুতে ওজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বজ্রপাত হেতু কদাচিৎ কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা জীবজগতের প্রভূত মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে। ঘূর্ণিবায়ু (Cyclone) ওজন বহন করিয়া থাকে বলিয়া তদ্দ্বারাও বায়ু শোধিত হইয়া থাকে। সে সমুদয় স্থানের বায়ুতে কোনরূপ কীটাণু কি দূষিত গ্যাস বিদ্যমান থাকিতে পারে না; যেহেতু ওজন সংস্পর্শে তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে ঐরূপ স্থান সবিশেষ স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ। সমুদ্র-বায়ুতে ধূলিকণা থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত উহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সমুদ্রোপকূলের এবং নদীতীরস্থ সমীরণও সবিশেষ হিতকর।

"ভ্রমণ।"

যাঁহারা প্রতিদিন বায়ুসেবনার্থ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় ভ্রমণে বহির্গত হন, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ কোন বিস্তীর্ণ খোলা স্থানে ভ্রমণ করাই অধিকতর প্রশস্ত। ঐরূপ স্থানে প্রতিদিবস প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্যকরণীয় বলিয়া মনে করা উচিত।

এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ প্রত্যুষে উঠিয়াই পুস্তক পাঠে রত হয়। তাহারা প্রাতর্ভ্রমণটা মূল্যবান্ সময়ের অপচয় বলিয়াই মনে করে। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। প্রভাতকালীন শিশিরস্নাত সুশীতল নির্ম্মল সমীরণ সেবনে মস্তিষ্ক শীতল হয়, সুতরাং তন্নিবন্ধন যে কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি পায়, তাহাতে অল্প সময়ে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদনে সামর্থ্য সঞ্চয় করে। দিবারাত্র "গাধার খাটুনি" খাটিয়াও যাহা অনেক সময় সমাধা করা যায় না এই উপায়ে তাহা অল্প সময়ে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে গৃহে বসিয়া কোন কঠিন আঁকের সমাধান হইতেছে না, অথবা কোন কঠিন স্থান বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু কিছুক্ষণ বাহিরে মুক্ত বায়ুতে ঘুরিয়া আসিলে স্বল্প সময়ের মধ্যে আঁকটীর উত্তমরূপ সমাধান হইয়া থাকে এবং কঠিন স্থানটী বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। বাহিরের সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হওয়াই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা নহে, বাহিরে মস্তিষ্ক অধিকতর পরিমাণ অক্সিজেন প্রাপ্ত হওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক তন্তসমূহ অনেকটা দ্রুত ভাবে পুনর্নির্ম্মিত হইয়া মস্তিষ্ককে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন করিয়া থাকে।

উপন্যাস-জগতের ভাস্কর স্বরূপ সুধীগণাগ্রগণ্য মহামতি ডিকেন্স (Dickens) প্রতিদিন ষোড়শ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতেন। ইহাতে যে কেবল তাঁহার স্বাস্থ্য-লাভ ঘটিয়াছিল তাহা নহে, এতদ্দ্বারা তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভা বহুগুণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। সেই মহাত্মা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে এই পরিভ্রমণ সময়েই তাঁহার উপন্যাসাবলীর অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা প্রায় সমস্তই মনোমধ্যে স্ফুরিত হইয়াছিল।

অর্দ্ধবসুন্ধরার অধীশ্বরী মহামহিমান্বিতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার ন্যায় কর্ম্মবহুল জীবন পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেরই ছিল। তাঁহার অসাধারণ কার্য্য-তৎপরতায় বিস্মিত হইয়া একদিন মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোনও বলিয়াছিলেন, "আমি এক সময়ে যথেচ্ছাচারী সাতটী সম্রাটকে চালাইতে পারি, কিন্তু একটী রমণীকে চালাইতে সময় সময় আমার পক্ষে অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়!" লোকোত্তরগুণসম্পন্ন ঈদৃশী মহারাণী বায়ু-সেবনার্থ প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন; সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে কখনও তাঁহার এই কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিতে পারিত না। অনেক সময়ে তিনি বাগান বাটীতে বাহিরে মুক্তাকাশে আফিসাদি করিতেন।

যতক্ষণ সম্ভবপর হয় ছাত্রগণের অধ্যয়নাদি বাহিরে মুক্ত বায়ুতে করাই সর্ব্বপ্রকারে উত্তম। যত অধিক-কাল তাহারা বিশুদ্ধ বায়ুতে অবস্থান করিবে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মস্তিষ্কও ততই শক্তিশালী হইবে।

"হাওয়া পরিবর্ত্তন।"

যে সমস্ত রোগপীড়িত ব্যক্তি একস্থানে থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি পালন করা সত্ত্বেও এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নশীল হইয়াও স্বাস্থ্যলাভে বিফলমনোরথ হন, তাঁহারা কিছুকালের জন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন করিলে অনেক সময়ে উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। মাঝে মাঝে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সুস্থ অসুস্থ সকলের পক্ষেই বিশেষ হিতকর। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে (change) কেবল যে দেওঘর, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, ওয়ালটেয়ার ইত্যাদি স্থানে বাস করাই বুঝাইতেছে তাহা নহে। (অবশ্য ঐ সমস্ত স্থানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।) অন্য যে কোনও স্থানে ভিন্ন আবহাওয়ায় থাকিলেও উপকার দর্শে। মোট কথা পরিবর্ত্তনটাই হিতকর, অবশ্য তজ্জন্য কোন খারাপ স্থানে নহে। ধনৈশ্বর্য্যশালী পাশ্চাত্য দেশবাসী বহু ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া থাকেন। তত্রত্য অনেক ধনী ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে বাসোপযোগী বহু

বাড়ী আছে। আমাদের দেশেও ইদানীং কোনও কোনও ধনী ব্যক্তি ঐরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রপীড়িত এদেশের জনসঙ্ঘের পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে। তবে সম্ভবপর হইলে তাঁহাদের পক্ষে দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাইয়া মাঝে মাঝে থাকা ভাল। অসুস্থ ব্যক্তির ঘর পরিবর্ত্তনেও অনেক সময়ে সুফল ফলে।

(হিতবাদী)

বালুর বাঁধ।

(১)

সন্ধ্যাবেলা মেসের নীচের বারান্দায় সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গমনোন্মুখে পাঁচ ছয় জন ছাত্র একটা অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে জ্ঞানরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "ওহে বিপিন, আদিনাথ আর সুধাংশু ছাদে গেছে"

বিপিনকুমার আলোচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়া সোৎসুক হইয়া কহিল "গেছে নাকি" ?

গগনেন্দ্র মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিল "দেখ ওদের আজ একটা কি গোপনীয় কথা হবে"

শশীভূষণ তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুই কি করে জানলি ?"

গগনেন্দ্র কহিল "আমি আদিনাথকে বল্‌তে শুনেছি।"

মুহূর্ত্তের ভিতর সমবেত সকলের মনোযোগ ছাদের উপরে আলাপে নিমগ্ন বন্ধুদ্বয়ের গোপনকাহিনীর প্রতি নিবিড়রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোপনতর রূপে একটা পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। ছাদের উপরে যেখানে এই নিম্নতলের লক্ষ্যীভূত পাত্রদ্বয় বিশ্রব্ধ আলাপে মগ্ন ছিল, সেখানে প্রবল একটা হাসির শব্দ অকস্মাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আদিনাথ তাহার কথার মাঝখানে থামিয়া বলিল "ওরা অত হাস্‌ছে যে ?"

"হাসুক না ক্ষতি কি তাতে, তোমার তাতে থামবার দরকার নেই মোটেই"

মিনিট কয়েক পরে নীচের দল জুতা ছাড়িয়া নিঃশব্দপদ সঞ্চারে দোতালার ছাদে গিয়া উঠিল। কপাট বন্ধ ছিল, জ্ঞানরঞ্জন ধীর হস্তে তাহা ঠেলিয়া বলিল "কপাট বন্ধ কোরেছে"

গগনেন্দ্র ওষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণপূর্ব্বক তাহাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে নিষেধ করিয়া কপাটে কাণ সংযুক্ত করিয়া দাঁড়াইল। দেখাদেখি আরো তিন চারিটি কর্ণ কপাটের গাত্রে সংলগ্ন হইল।

মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া অনবহিত দুই বন্ধু মৃদু কণ্ঠে কথা কহিতেছিল সুধাংশু বলিতেছিল "মহাজনরা যদিও সম্মুখে অগ্রসর হ'বার কথাটা বারংবার বলেছেন, তবু উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে তোমার পিছনে হঠে যাওয়ার পরামর্শই আমি দিচ্ছি"

আদিনাথ কহিল, "দেখ, জীবনের সব সময়গুলো এক রকম কাটে না। নিজের জোরেই যে সব সময় চলা যায়, এ রকম যদি মনে কর তবে সেটা ভয়ানক ভুল। অনেক সময় পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে পড়তে হয়, আর তখন পৃথিবীর সমস্ত নীতিবাক্যগুলো অর্থহীন শব্দপুঞ্জের মত কাণের কাছে কোলাহল করে বটে কিন্তু মনের কাছে তার প্রতিধ্বনি মাত্রও পৌঁছায় না।

সুধাংশু হাসিয়া বলিল "ধাক্কাটা তুমি একটু প্রবল রূপেই পেয়েছ দেখ্‌ছি"

আদিনাথ বলিল "জান তুমি ঐ গানটা ?"

সুধাংশু কহিল "কোন্ গানটা ?"

"ঐ যে, "হৃদয় আমার গোপন করে আর ত লো সই রাখ্‌তে নারি"

সুধাংশু মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "জানি বৈকি, ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠেছে থর থর থর কাঁপছে বারি !" দেখ আদিনাথ, আমি ঠিক্ বল্‌ছি ভদ্র লোক যখন গানটা লিখেছিল তখন নিশ্চয়ই—বাধা দিয়া আদিনাথ কহিল "গাও গানটা, একবার শুন্‌ব"

কপাটে একবার একটু শব্দ হইল, আদিনাথ নড়িয়া চড়িয়া বাম হাত খানা সুধাংশুর কাঁধের উপর দিয়া মেলিয়া দিয়া বলিল "গাওনা, চুপ করে রইলে কেন ?"

"গান হবে এখন পরে, দাঁড়াও না ; কথাটা শুনে নি আগে"

দরজার ওপিঠে গগনেন্দ্র জ্ঞানরঞ্জনের কাণে কাণে কহিল "ওরে এ যে লাভ্ কেস্ রে"। জ্ঞানরঞ্জন তাহাকে থামাইয়া বলিল "চুপ্, কথা কইলে এখন সব মাটি হবে"

সুধাংশু কহিল "শোনাও দেখি এখন নামটি ?"

"নাম আশা"

দরজার ওপিঠে তখন অসহিষ্ণুতার তাপ বাড়িয়া উঠিতেছিল! অকস্মাৎ নীরবতা দীর্ণ করিয়া সকলে কোরাসে গান ধরিল "শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার শুনেছি শুনেছি আহা"

লজ্জারক্তিম মুখচ্ছবি আদিনাথ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সুধাংশু তাহার হাত ধরিয়া বলিল "ঘাবড়িয়ো না, ভয় নেই। না হয় শুনেছে, তাতে কি ?"

ব্যঙ্গ-ভয়-ভীত আদিনাথ কহিল "তাতে কি বই কি, ওরা আমাকে আর আস্ত রাখ্‌বে না"

সশব্দে দরজার উপর মুষ্ট্যাঘাত প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানরঞ্জন ও গগনেন্দ্র কহিল "দরজা খোল হে আদিনাথ, আমরা একটু তোমার আশার পুলক দেখে যাই"

আদিনাথ একটুখানি ভীরু গোছের লোক ছিল। অবশ্য এ কথায় এমন কিছু বোঝায় না যে সে ভূতের ভয় করিত অথবা রাত্রিতে একলা ঘরে থাকিতে পারিত না। লোকের মতামতের ভয়টা তাহার অত্যন্ত বেশী ছিল, এবং বিদ্রূপ সে মোটেই সহ্য করিতে পারিত না।"

দরজা খোলা না পাইয়া ভিতর দিক হইতে তাড়নার বেগ বাড়িতে লাগিল, সুধাংশু তখন গত্যন্তর না দেখিয়া কপাট খুলিয়া দিল। শশীভূষণ বলিল, "দুয়োর বন্ধ করার মানে কি হে ? আমরা কি তোমার আশা নিরাশা করে দেব ?"

গগনেন্দ্র বলিল "তোমার ভরা গাঙ্গের ঝড়ের হাওয়া তোমার আশা তরণীকে আদিরসের স্রোতে বইয়ে একেবারে এই—নম্বর মেসের দরজায় পৌঁছে দিক্, এই আমরা মানস করি"

বিপিন কুমার কহিল, "আঃ, কি মিষ্টি নাম, আশা ! নাম বল্‌তেও প্রাণে আশা মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে !"

সুধাংশু কহিল "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিচ্ছ কিন্তু তোমরা"

দু তিন জন এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "কেন ? কেন ?"

"বাঃ ! আশা—সে যে আমার !"

গগনেন্দ্র কহিল, "তোমার ? বল্‌ছ কি হে।"

"ঠিক্‌ই বল্‌ছি, সে আমার বাক্‌দত্তা বধূ"

"তোমার বাক্‌দত্তা বধূ ?"

"তা নয় ত কি তোমার ?"

বিপিনকুমার কহিল, "মজা মন্দ নয়, একজন হৃদয় গোপন করে রাখ্‌তে পারছেন না, আর আরেক জনের ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠে গেছে, আসল নায়ক কে ?"

সুধাংশু কহিল "ঐ ত ! চুরি করে কথা শুন্‌লে ঐ রকমই শোনা যায়। হচ্ছিল আমার কথা, তোমরা ধর্‌ছ আদিনাথকে কিন্তু আমি আমার বাক্‌দত্তা বধূ কাউকে দিচ্ছিনে" সুধাংশু কতটা সত্য বলিতেছে এবং তাহা কতটা গ্রহণযোগ্য তাহার একটা রফা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত সকলে একবার দৃষ্টি বিনিময় করিল।

শশীভূষণ সিগারেট ফুঁকিতেছিল, ঠেলাঠেলিতে তাহা পড়িয়া যাওয়ায় সে আদিনাথের পকেট হইতে তাহা পূরাইয়া লইবার জন্য যত্নবান হইল, এবং তাহার ফলে উক্ত কাগজ, পেন্সিল, চুরুট, দেশালাই, চাবি প্রভৃতির গহন হইতে লাল ভেলভেটের একটা কেস্ হস্তগত করিয়া ফেলিল। আদিনাথ বাধা দিবার পূর্ব্বে কেস্ খুলিয়া শশীভূষণ তদন্তর্গত ব্রোচ বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিল।"

বহু প্রকার অব্যয়, হাস্য ও প্রশ্নে ছাদ মুখরিত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্র বলিল "বাসর ঘরে বধূকে এই ব্রোচ বুঝি উপহার দেওয়া হবে।"

সুধাংশু তাহাদের কাড়াকাড়িতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কহিল "আহা হা অমন কাড়াকাড়ি করো না, সত্যি উপহার দেব যে" "বিয়ে কবে, বিয়ে কবে" বলিয়া এক সঙ্গে সকলে তখন কোলাহল করিয়া উঠিল, সুধাংশু যথা সম্ভব মুখ মলিন করিয়া সনিশ্বাসে কহিল, "এখনো চার মাস বাকি !"

আদিনাথ কাহারও কথায় কোনও রূপ যোগদান না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গগনেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "না হে জ্ঞান, আদি ভারী চটেছে"

আদিনাথ তাহার কথা শুনিবামাত্র কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া গেল, এবং তাহাকে 'পাকড়াও' করিয়া য়্যাপলজি চাহিবার জন্য সকলে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

(২)

সেদিন ইষ্টার ডে। একটা দোকানে সুধাংশু ও আদিনাথ কতগুলি প্যাথিফোন পরীক্ষা করিতেছিল, আদিনাথ বলিল "একটা পছন্দ কর দেখি"

সুধাংশু কয়েকখানা গানের প্লেট দেখিয়া একটা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "না হে আদি, এ সব হবে টবে না।"

আদিনাথ প্যাথিফোনের উপরকার শিল্পকর্ম্ম অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে বলিল "কি হবে না?"

সুধাংশু কহিল "আমরা বাঙ্গালীর ছেলে আমাদের ইষ্টার ডে ফে দিয়ে কি হবে?"

অসহিষ্ণু আদিনাথ কহিল, "রেখে দাও তোমার ওসব কথা"

"তুমি চিরকালই এই রকম বাতিকগ্রস্ত, তা আমি জানি"

আদিনাথ হাসিল, বলিল "দেখ, তোমরা বেজায় ভাব-কৃপণ, তোমাদের সব নিক্তিতে ওজন করা! যদি তার একটু বেশী হয় তা হলেই তোমরা অস্থির হয়ে পড়, আর মনে কর যে গেল সব জাহান্নামে গেল, কম পড়ার চেয়ে ভাঁড়ারে বেশী সঞ্চয় ভাল"

অনেক পরীক্ষা, আলোচনা, তর্ক ও বিতর্কের পর প্যাথিফোন ত কেনা হইল, রাস্তায় আসিয়া আদিনাথ বলিল "তোমায় একটা কাজ কর্ত্তে হবে সুধাংশু।"

সুধাংশু বলিল "কি?"

"ভোলাদের ওখান থেকে অর্গানটা নিয়ে এস গিয়ে"

"ভোলাদের বাড়ী থেকে অর্গান আন্‌তে যেতে হবে? সে যে ভয়ানক দূরে!"

"তা ছাড়া কোথায় পাব?"

"কেন, তোমার প্রতিবেশিনীর কাছে" বলিয়া সুধাংশু হাসিতে লাগিল।

আদিনাথ বলিল "সে যে ভাগ্যের দরকার"

"তোমার মাসীমার সঙ্গে তাঁদের ত খুব আলাপ আছে, তাঁর মধ্যস্থতায় আনাও না"

"মাসীমা বাড়ী গেছেন যে, কাল তাঁর আসবার কথা" "তা হ'লে নেহাৎ-ই তোমার দুরদৃষ্ট। সেদিনকার ব্রোচটা শেষে কি হল?"

মাসীমাকে দেখাতে এনে সে সেটা ফেলে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম এই সুযোগে পরিচয় করে নেব এবং হয়ত মাধবী কঙ্কণের মত—

মাথা নাড়িয়া সুধাংশু বলিল "যথাস্থানে পরিচয় দিব" হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া আদিনাথ বলিল "ঠিক্ তাই আশা কোরেছিলুম, কিন্তু মাসীমা সব গোল করে দিলেন! তারপর দিন যেই আমি গেছি মাসীমা বল্লেন যে রমেশ বাবুর মেয়ে তাঁহার ঘরে ব্রোচ ফেলে গিয়েছিলেন এবং সেটি আমি ছাড়া আর কেহই আত্মসাৎ করেনি। কি আর করি তখন, বের করে দিয়ে বল্লুম যে সেটা দিয়ে আমার সেফ্‌টিপিনের কাজ চল্‌ছিল, অতঃপর আমার ভারী অসুবিধা হবে।"

সুধাংশু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেজায় হতাশ হয়েছ ত তুমি তাহলে। B. H. (ব্রোকন হার্ট) উপাধিটা তোমায় আর দুদিন পরে দেব ভাবছিলাম, কিন্তু সেটা তোমার এখনই পাওনা হয়েছে।"

আদিনাথ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "তুমি কিন্তু আমায় সেদিন খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিলে! তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্ককে শত সহস্র ধন্যবাদ, এবং তোমায় লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ"

কিছুদূর আসিয়া উৎসাহমত্ত আদিনাথ অনিচ্ছুক সুধাংশু বেচারাকে জোর করিয়া পুর্ব্বোক্ত ভোলাদের বাড়ী অর্গান আনিতে পাঠাইল, এবং নিজে আরো দু চারিটা দোকান ঘুরিয়া অন্যান্য জিনিস কিনিয়া মেসে ফিরিয়া আসিল।

এখন, যদি শুধুই বলা যায় যে আদিনাথ মেসে ফিরিয়া আসিল, তাহা হইলে সেদিন মেসে মহোৎসবে যে ব্যাপারসমূহ চলিতেছিল তাহার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়। প্রথমতঃ বাড়ীটা আগাগোড়া নূতন চুণকাম করা হইয়াছিল। বর্ষার অবিরল জল-

ধারাপাতবিবর্ণ শৈবাল-মলিন দেয়ালগুলি শুভ্র অনুরঞ্জনে চারিদিক্‌কার ধূম-বিবর্ণ বাড়ীগুলির ভিতর শোভনত্বের দিব্য স্বাতন্ত্র্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ বাড়ীখানি পুষ্পমাল্য ভূষিত করা হইয়াছিল. গাঁদা ফুলের মালা ও দেবদারুর পল্লব বারান্দার রেলিংএর মাথায় ও প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে রোপিত কদলীবৃক্ষে জড়িত হইয়া একটি মধুর আনন্দোৎসবকে ব্যক্ত করিতেছিল।

আদিনাথ হাস্যমুখে ঘরে ঢুকিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আদিনাথের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আদিনাথ মনে মনে দৈবকে সহস্র গালি দিয়া বগলের নীচে চাপা সিরাপ ও গোলাপ জলের বোতলগুলি লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল, তাহার সমস্ত কৌতুক ও হাস্যরসের প্রস্রবণ তাহার ডবল প্লেট সার্টের নীচে মুহূর্ত্তে জমাট বাঁধিয়া গেল।

তারক বাবু মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন "চল, ঘরের ভিতর চল"

ধৃত অভিযুক্ত আসামীর মত ভয়কম্পিত আদিনাথ অকস্মাৎ এবং অসময়ে উপস্থিত পিতার অনুসরণ করিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্রোধ-গর্জ্জিত স্বরে তারক বাবু কহিলেন "মেসে থেকে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি?"

আদিনাথ বগল হইতে নীরবে বোতলগুলি সেলফের উপর রাখিয়া দিয়া সার্টের প্লেটের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারক বাবু কহিলেন "সেই সকাল বেলা আমি এসেছি, পুরো সাতটি ঘণ্টা আমি এখানে বসে আছি, তোর সঙ্গে দেখাই নেই! অথচ পরীক্ষা তোর সাম্‌নের মাসে! এসব কি হুজ্জুৎ করে বেড়াচ্ছিস্?

আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে আদিনাথ বলিল "আমি একটু কাজে বেরিয়ে ছিলুম"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে তারক বাবু বলিলেন "কি কাজটা শুনি"

আদিনাথ নীরবে তাহার "পাম্প"সু'র অগ্রভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

তারক বাবু আরম্ভ করিলেন, "টাকা সব জলে ভেসে আসে কি না তাই সব এমনি ওড়ান হচ্ছে! গাধা! আহাম্মক! নবাব বাদশা হয়ে জন্মেছেন্ যেন উনি! দেদার খরচ করা হচ্ছে এখানে বসে বসে, আর বাবুগিরি করা হচ্ছে! ব্যাপার কি এখানে আজ জিজ্ঞাসা করি?"

আদিনাথ নিরুত্তর।

জ্বলিয়া উঠিয়া তারক বাবু কহিতে লাগিলেন "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি টাকা রোজগার করি বুঝি তোর এসব বদ্‌খেয়ালের খরচ জোগাতে! সাম্‌নের ঘরের ঐ ছোক্‌রা বল্লে যে তোর কে এক ফ্রেণ্ড জুটেছে, তার বার্থডে উপলক্ষ্যে তুই কর্‌ছিস্ এ সব? নবাব সেরেজ-দুল্লা আর কি! বন্ধুর জন্মদিনে ভোজ দেওয়া হচ্ছে; বাপের বয়সে যা শুনি নি কোনো দিন! কে তোর সে ফ্রেণ্ড?"

আদিনাথ বলিল "এখানকারই একটি ছেলে"

"কি নাম তার?"

"সুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী"

বিকৃত মুখে ক্রোধ কম্পিত কলেবর তারক বাবু কহিলেন, "সুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী! আমি আর চিনি নে যেন সেই সুধো ছোঁড়া! বদমায়েশ পাজি হতভাগা এখানে এসে জুটেছে"

আদিনাথ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু কহিল না, তারক বাবু বসিয়া বসিয়া নীরবে ফুলিতে লাগিলেন।

সুধাংশুর পিতার সহিত তারক বাবুর দারুণ শত্রুতা ছিল ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছিল বাহিরে তাহা অপ্রকাশ থাকা সত্ত্বেও ইহা সকলেই জানিত যে তারক বাবু "সেক্রেটরিয়েটে" যে উচ্চ পদটি পাইয়াছিলেন, তাহা সুধাংশুর পিতা ৺ শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রাপ্তব্যের উপর কারসাজি করিয়া। ঘটনাটা বহুদিনের, মৃতের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা লোপ পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তারক বাবু মৃত শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র সুধাংশু কুমার চক্রবর্ত্তীর উপর এক প্রকার জাতক্রোধ হইয়া ছিলেন। সুদূর অতীতে আর্থিক সচ্ছলতার লোভে মুগ্ধ হইয়া সহযোগীর বিশ্বাস ও নির্ভরের সুযোগ অবলম্বন করিয়া তিনি যে

লোকবিগর্হিত কার্য্যটি করিয়াছিলেন, মৃত পিতার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ এই শুভদর্শন তরুণ যুবকের বুদ্ধি-ব্যঞ্জক শান্ত মুখচ্ছবি তাহার কণ্টকময় গোপনস্মৃতিকে হঠাৎ যেন একটা নাড়া দিয়া আমূল জাগাইয়া তুলিত, তিনি অকস্মাৎ একটা বিভীষিকা বোধ করিতেন।

ছেলেকে সুধাংশুর সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য তারক বাবু যথেষ্ট চেষ্টিত ছিলেন এবং যাহাতে সে সুযোগ না ঘটে তজ্জন্য বিলক্ষণ সজাগও ছিলেন। কিন্তু কলেজের বেঞ্চে আদিনাথ ও সুধাংশু যখন পাশাপাশি উপবেশন করিল তখন পশ্চাতের প্রবল বিরুদ্ধাচরণের ভিতর হইতে উভয়ের হৃদয় উভয়ের প্রতি ধাবিত হইল এবং তাহাদের পিতৃবৈরের দাহ তাহাদের বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ ধারার ভিতর নিমগ্ন হইয়া গেল! যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই উভয়ের ভিতর সখ্য প্রবল হইয়া উঠিল, এবং লৌকিকতা ও সভ্যতার বাহ্যিক বিধানের ক্রম ততই কমিয়া আসিতে লাগিল, আদিনাথ তাহার নিজের ঘরে তালা লাগাইয়া সুধাংশুর ঘরে খাট পাতিল। এবং কাপড় চোপড় জিনিস পত্র অদল বদল হইয়া উভয়ের মধ্যে একাকার হইয়া গেল! আদিনাথ সঙ্গতিপন্ন পিতার পুত্র, সে জিনিস কিনিত একটু শোভনত্বের দিকে নজর রাখিয়া, সুধাংশু নিঃসম্বল বিধবার সন্তান, সে জিনিস কিনিত শুধু স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ করিয়া। কিন্তু মেসে আসিয়া যখন তাহার ব্যবহার আরম্ভ হইত, তখন আদিনাথ পরিত সুধাংশুর মোটা ধুতি, ফরিদপুরী ছিটের কোট, আর সুধাংশু পরিত তাহার ঢাকাই ফরাসডাঙ্গার ধুতি আর রেশমী চাদর, দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে চাহিয়া অসীম কৌতুক ও আনন্দ রসে মগ্ন হইয়া যাইত।

তারক বাবুর প্রশ্নে আদিনাথ কোনও উত্তর দিতে পারিল না, সে জানিত তাহার কঠোরস্বভাব পিতা কিছুতেই তাহার এরূপ অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। তারক বাবু রক্তচক্ষু করিয়া কহিলেন, "দেখ্ আদি, তোকে আবার আমি-সাবধান করে দিচ্ছি, ঐ সুধো ছোঁড়াটার সঙ্গে তুই মিশ্‌তে পার্‌বি নে, যদি মিশিস্ তবে তোকে আমার বাড়ী ছাড়্‌তে হবে। আছিস্ এক মেসে, ভদ্রতা রেখে চল্‌বি অত ফ্রেণ্ড-সিপের কি দরকার, আর এসব কি! গায়ের রক্ত জল করে আমি টাকা রোজগার কর্‌ছি, গুণধর পুত্র হয়েছো কি না তাই দুহাতে ওড়াচ্ছ। এবার থেকে তোর টাকা আমি কম করে পাঠাব, দেখি ত তুই কি করে এত নবাবীয়ানা করিস্। আর শোন, ফের্ যদি আমি এসব দেখি বা শুনি, তবে ভাল হবে না আমি বলে দিলুম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

প্রকাশ।

উষার লাজারুণ দরশ লাগি'
শেফালিদল পড়ে টুটি'!
বঁধুর আঁখিপাতে বধূর হিয়া
নিমেষ মাঝে ওঠে ফুটি'!
কোকিল গাহে যবে কানন-ছায়,
কাহার কথা জাগে প্রাণে!
আঘাত লাগে যবে মরম মাঝে,
মধুর বেজে ওঠে গানে।
ফাগুন যামিনীর নিশ্বাস বায়
ধরার হিয়াখানি জাগে,
শ্রাবণ নিশিদিন বরিষে জল
চাতক তবু জল মাগে!
নয়ন চাহে যবে সঁপিতে প্রাণ,
সরমে আসে চোখে নামি'!
কঠিন বাজে যবে বেদনা হায়,
কাঁদন ধীরে যায় থামি'!
এমনি অকারণ হাজার রূপে
কাহার ছবি ওঠে ভাসি';
মানুষ মরে যত কারণ খুজি'!
কারণ সরে যায় হাসি'!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেসন।

প্রথম বিভাগ।

১। বেকার গ্রেস—লরেটো হাউস। ২। নলিনী-বালা বসু—আলেক্‌জেণ্ড্রা গার্লস স্কুল, ময়মনসিং। ৩। সুজাতা বসু—ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। ৪। নিশাময়ী বিশ্বাস—ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুল। ৫। সীতা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন স্কুল। ৬। ইন্দুমতী দত্ত—প্রাইভেট। ৭। দ্বিজবালা বাপানিয়া— গার্ডনার মেমেরিয়াল স্কুল। ৮। ইন্দুপ্রকৃতি ঘোষ—আলেকজাণ্ড্রা হাইস্কুল, ময়মনসিং। ৯। যোগিনী ঘোষ ঐ। ১০। নীরপ্রভা গুপ্ত—প্রাইভেট। ১১। সুধাপ্রভা গুপ্ত—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ১২। তটিনী গুপ্ত—বেথুন স্কুল। ১৩। প্রমীলা হাল্দরা—ডাইওসিসন।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। ললিতা মিশ্র—এল্, এম্, এস্, বালিকা বিদ্যালয়। ২। সরোজাক্ষী মল্লিক—গার্ডনার মেমোরিয়াল স্কুল। ৩। লীলাবতী মণ্ডল—ঐ। ৪। কিরণবালা সেন—ইডেন হাই স্কুল, ঢাকা।

তৃতীয় বিভাগ।

১। লেনা বারাক্—এল, এম্, এস্, স্কুল। ২। কমলা দাস—প্রাইভেট। ৩। প্রতিভা গুহ—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা।

আই, এস, সি।

প্রথম বিভাগ।

১। নলিনী সরকার—সিটি কলেজ। ২। সুরীতি মিত্র—সিটি কলেজ।

আই এ।

প্রথম বিভাগ।

১। কর্ণেলিয়া সেসিল—প্রাইভেট। ২। কন্সটেন্স ব্রাউন—ঐ। ৩। বিদ্যাবতী মিত্র—বেথুন কলেজ। ৪। শান্তা চট্টোপাধ্যায়—ঐ। ৫। কিরণবালা চাটার্জ্জি—ডাওসিসন কলেজ। ৬। ডেসি বসু—প্রাইভেট। ৭। লিলিত্রন ডোভেরিয়া—ঐ। ৮। হেনরিএটা অবলা সরকার—ডাইওসিসন কলেজ। ৯। নীহার সরকার—বেথুন কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। ইন্দুপ্রভা বিশ্বাস—বেথুন কলেজ। ২। প্রিয়তমা চট্টোপাধ্যায়—ডাইওসিসন কলেজ। ৩। সুপ্রভা দাস—বেথুন কলেজ। ৪। তিলোত্তমা দে—ঐ। ৫। ফ্যানি কন—প্রাইভেট। ৬। জুলিয়া গোমস্—ঐ ৭। লাভ্‌ডে গারটুড কনকলতা -ডাইওসিসন কলেজ। ৮। মোহিতবালা মজুমদার—বেথুন কলেজ। ৯। শোভা মুখোপাধ্যায়—ঐ। ১০। নিকোলাস ডোরা—প্রাইভেট। ১১। কুসুম কুমারী সরকার—বেথুন কলেজ।

বি, এ পরীক্ষার ফল।

ইংরাজী অনার।

প্রথম বিভাগ।

ডরথিয়া, ই, লুইস—প্রাইভেট। সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ। হি, কে, মারগারেট—প্রাইভেট। লুসি, নাইট—প্রাইভেট।

পাশ কোর্স।

প্রীতিবালা ঘোষাল—বেথুন কলেজ। নির্ম্মলা রায়—বেথুন কলেজ। সুশীলা সেন—বেথুন কলেজ। বি এ পরীক্ষায় ছয় জন ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

কুমারী যামিনী সেন বিখ্যাত বঙ্গীয় সাহিত্যিক ৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা। ইনি সম্প্রতি গ্লাসগো রয়্যাল ফ্যাকল্টি অব্ ফিজিসিয়ান্ এণ্ড সার্জ্জেনর ফেলো হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এ পদ এদেশীয় কোন স্ত্রীলোকেই প্রাপ্ত হন নাই। ইনি নেপালের মহারাণীর মহিলা ডাক্তার ছিলেন।

অষ্টম ভাগ। শ্রাবণ, ১৩১৯। ৪র্থ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযুবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুরমা—রমণীর রমণীয় অঙ্গরাগ।

ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে—বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে—আত্মগরিমার জয়ডঙ্কা বাজান নহে—সত্য সত্যই "সুরমা" রমণীর রমণীয় অঙ্গরাগ। "সুরমার" ঢলঢলে—লাবণ্যময় রূপ দেখিলেই আগে মন ভোলে। তারপর মাথায় মাখিলে, শত যুথিকার সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠে। গৃহপ্রকোষ্ঠ চিরবসন্তে পূর্ণ হয়। "সুরমা" মাথায় মাখিয়া, কেশ-মার্জ্জনা ও কবরীরচনা করিলে, তাহা অতি সুন্দর হয়। নিত্য, একটু সুরমা মাখাইয়া ছেলেদের গা হাত-পা মুছাইয়া দিলে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি যেন ক্ষুদ্র দেব দূতের মত পবিত্রমূর্ত্তি হয়। "সুরমায়"—প্রফুল্লতা আনে, শান্তি আনে! আর কত বলিব? বিশ্বাস না হয়, সামন্য ব্যয়ে, অল্প দামের এক শিশি "সুরমা" কিনিয়া ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা, ডাক মাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা।

কলেরার সময় আসিয়াছে।

গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। এই গ্রীষ্ম যতই প্রচণ্ড হইবে, মফঃস্বলের খাল বিল পুষ্করিণী ততই শুকাইতে থাকিবে। পঙ্কিল জল পানে, দূষিত জল ব্যবহারে, লোকে কলেরায় আক্রান্ত হয়। ইহার ন্যায় সাংঘাতিক ব্যাধি আর নাই। বিশেষতঃ এসিয়াটিক কলেরা অতি সাংঘাতিক। ডাক্তার না আসিতে আসিতে রোগ হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠে। আমাদের বহুযত্নে প্রস্তুত "ক্যাম্ফরিন" কলেরার একমাত্র প্রতিকারক। কলেরার প্রথম অবস্থায় দুই এক ফোটা পড়িলে রোগ আর বাড়িতে পারে না,—ক্রমশঃ নিবারণ হইয়া যায়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আট আনা। ডাক-মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

সৌরভ-সার।

বকুল।—আমাদের বকুলের সৌরভ টাটকা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর।
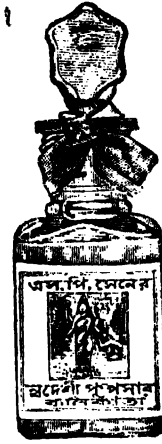
রজনী-গন্ধা।—রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ-কোমল। এই কোমলতাই রজনী-গন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী।——সাবিত্রী সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

খস্‌খস্‌।—প্রখর গ্রীষ্মের দিনে খস্‌খসের মত এমন আরাম-প্রদ এসেন্স আর নাই।

গন্ধরাজ।——সত্যসত্যই ইহা রাজভোগ্য সৌরভসার।

রেণুকা।—আমাদের 'রেণুকা' বিলাতী কাশ্মীরী-বোকে অপেক্ষা উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছে।

কাশ্মীর-কুসুম।—কুঙ্কুম বা জাফরান ইহার মূল উপাদান, আর অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতিউপহারের জন্য একত্র তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের লেভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸০ বার আনা, ডাক-মাশুল ।৵০ সাত আনা। অডিকলোন এক শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। আমাদের অটো-ডি-রোজ, অটো অব্‌ নিরোলী, অটো অব্‌ মতিয়া ও অটো অব্‌ খস্‌খস্‌ অতি উপাদেয় পদার্থ। এক শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক অব্‌ রোজ্‌।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলই ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী, ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

যবদ্বীপে প্রাপ্ত মহাদেবের মূর্ত্তি।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৯। | ৪র্থ সংখ্যা।

ধর্ম্ম কি ?

১। নৈতিক উন্নতি।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই প্রথমতঃ নৈতিক উন্নতি প্রয়োজন। অন্তরের অপবিত্রতা, ক্ষুদ্রতা, কপটতা, অহঙ্কার ও হিংসা দ্বেষ দুরীকৃত না হইলে উচ্চতর ধর্ম্মলাভ করা অসম্ভব। যে মলিন চিত্ত নিকৃষ্ট ভাবসমূহে পরিপূর্ণ, সে চিত্তে পবিত্র ধর্ম্ম এবং পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর কিরূপে বিরাজিত থাকিবেন ? এই জন্য সকল শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মার্থীদিগকে হৃদয় নির্ম্মল ও চিত্ত শুদ্ধ রাখিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ বলিয়াছেন ঃ—

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ
না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ—যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করিতেছেন—"পিতামহ, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কি কি পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করে ?" প্রশ্নোত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের মুলচ্ছেদ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। * *

হে মহারাজ, রজোগুণ প্রভাবে মোহ এবং তমোগুণ প্রভাবেই ক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই বিনাশহীন হ্রাসশূন্য সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন।"

যথার্থই যাঁহারা অন্তরের নিকৃষ্ট ভাব দূর করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই ধর্ম্মলাভের অধিকারী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের "জীবনবেদ" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বাগ্রে তিনি নিষ্পাপ হইবার জন্যই সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"কিসে পাপ যায়, প্রথম এই একই চেষ্টা ছিল; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হয় এই ভাবই ছিল। * * কখনও বৈরাগ্য, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম, একটি একটি করিয়া সাধন করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথম ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়।"

কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম ও পাপ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল রাখা অতিশয় কঠিন কার্য্য। যাঁহারা সংকল্প গ্রহণ করিয়া দৃঢ়চিত্তে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা রক্তাক্ত চরণে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই রকম ক্লেশ সহ্য করিয়া করিয়া ধর্ম্মকে লাভ করিতে না হইলে বুঝিবা ধর্ম্ম অত্যন্ত গৌরবের সামগ্রী হইত না। তবে সৌভাগ্যবশতঃ যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ধার্ম্মিক পিতা, ধর্ম্মশীলা জননীর উৎকৃষ্ট শিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, যাঁহারা চরিত্রবান সঙ্গীদের সংসর্গে চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিকূল প্রবৃত্তির সঙ্গে অধিক সংগ্রাম করিতে হয় না; তাঁহাদের অন্তর পবিত্র রাখিবার জন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করাও নিষ্প্রোয়জন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ লোকই পিতৃমাতৃপ্রকৃতি হইতে রজোগুণ ও তমোগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের জন্য অন্তরে ধর্ম্মবিরোধী ভাব সকল প্রবেশ করিতে থাকে। অবশেষে অধিক বয়সে যখন চৈতন্য হয়, যখন ধর্ম্মলাভ করিবার স্পৃহা বলবতী হয়, তখন অভ্যস্ত পাপ সকলের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু মুক্তিলাভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইলেও উহা অসম্ভব নয়। অসম্ভব হইলে কিরূপে শত শত দুর্নীতি-পরায়ণ মানুষ সচ্চরিত্র হইয়া ধর্ম্মলাভ করিত? চেষ্টা ও সাধনের অসাধ্য কিছুই নাই। এ বিষয়ে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা। যে মানুষ ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া ঈশ্বরের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেই মানুষই আবার ঈশ্বরের করুণায় সংগ্রাম ও সাধন করিয়া মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ সোপানে এবং ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার এবং নৈতিক উন্নতি লাভ করিবার প্রকৃত উপায় কি?

প্রথম উপায় আত্মচিন্তা এবং দুর্নীতি ও পাপের দ্বারা জীবনের ও জনসমাজের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা। আমরা নির্জ্জনে বসিয়া আত্মচিন্তা করিলেই নিজের কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন হই, উহাতে পাপ-বোধও তীব্র হইয়া উঠে; এবং নিজে কি প্রকৃতির লোক, তাহাও উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। কথাগুলি একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। আমরা অনেক সময় কেমন এক জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। শত শত অন্যায় কার্য্য করিতেছি, অথচ সে বিষয়ে চৈতন্য নাই, সে বিষয়ে তীব্র অনুভব শক্তি নাই। মানুষ দিনের পর দিন একটির পর আর একটি করিয়া যতই অন্যায় করিতে থাকে, ততই তাহার সম্মোহ উপস্থিত হয়; সে যে কি ভয়ানক কার্য্য করিতেছে, সে বিষয়ে আর খেয়ালই থাকে না। কিন্তু যে দিন সে নির্জ্জনে বসিয়া আত্মচিন্তা করে, সে দিন ঈশ্বরের করুণায় এক নূতন দৃষ্টি লাভ করে। সেই দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে আপনার মনের সকল দিক দেখিতে পায়; দেখিয়াই ভয়ে বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহার মনে পড়ে, একদিন সে নিকৃষ্ট সুখের বশবর্ত্তী হইয়া পাপের পথে একখানি মাত্র পা বাড়াইয়াছিল! কিন্তু একি! আজ সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? জীবনের চতুর্দ্দিকে এ কি জঘন্যতা! একি নীচতা! একি স্বার্থপরতা! একি নারকীয় ভাব!

উক্তরূপ আত্মচিন্তার দ্বারা যখনই জীবনের পাপ ও দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই সেই পাপ ও দুর্নীতির মূর্ত্তি যে কি ভীষণ, তদ্দ্বারা স্বীয় জীবনের ও জনসমাজের যে কি অকল্যাণ হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে। আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, আমাদের মহামূল্য জীবন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণার দান। এই জীবনের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মহাভাব সকল অপরিস্ফুট অবস্থায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের হিরণ্ময় আলোকের দ্বারা ঐ সকল ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিলে, এই জীবনের দ্বারা জগতে মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করা যায়। পৃথিবীর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ জীবনের অলৌকিক শক্তির দ্বারা প্রতিদিন মানুষের সুখ শান্তি বর্দ্ধিত করিতেছেন, প্রতিদিন মনুষ্যত্বের নব নব আদর্শ প্রকাশ করিয়া নরনারীদিগকে মহৎজীবনের পথে লইয়া যাইতেছেন ; এই সকল কার্য্যের গৌরবে জননী ধরিত্রী মহিমাময়ী হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু হায়, পাপ ও দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ প্রতিদিন নিকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের অপরিস্ফুট ভাব সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ; প্রতিদিন আপনাকে হীন ও মলিন করিয়া লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। বস্তুতঃ পাপ ও দুর্নীতির দ্বারা মানবের স্বর্গীয় প্রকৃতি কিরূপ বিকৃত হইয়া যায়, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মাতৃস্বরূপিনী যে নারী স্নেহ করুণায় মূর্ত্তিমতী দেবী হইয়া গৃহে গৃহে হৃদয়ের অমৃত দান করিতেছেন, সেই নারীই পাপের শক্তিতে রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং মানুষের তপ্তশোণিত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। এ সকল কথা স্মরণ করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষগণ কিছুতেই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন না।

এইরূপ কথিত আছে যে, মহাত্মা নানক ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে এক কলঙ্কিনী নারী তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। নানক সেই রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সৌন্দর্য্যময়ী নারীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রমণী নানকের নিকট অশ্রুবিসর্জ্জনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। নানক কহিলেন—"হে নারী, আমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, আর তুমি কলঙ্ককালিমায় সেই সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছ? আমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার হৃদয়পাত্র অমৃতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, আর তুমি সেই অমৃত ঢালিয়া ফেলিয়া পাপের তীব্র হলাহলে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছ। আমি এই কথা চিন্তা করিয়া মনে বড় ব্যথা পাইতেছি আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি।"

নানকের কথা শুনিয়া নারীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল, কলঙ্কিনী পাপ জীবনের পরিবর্ত্তে পুণ্যজীবন লাভ করিল। যথার্থই ধার্ম্মিক লোকেরা মানুষের পাপ দেখিয়া অন্তরে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। পাপ এমনই ভয়ানক! এই পাপের জন্য কত মানুষ ঘৃণা লজ্জাশূন্য হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিতেছে, তাহা কে বলিবে?

পাপ ও দুর্নীতির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যে শুধু আপনার দুঃখই আপনি ডাকিয়া আনে, তাহা নয়। কত দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন যুবকের দুর্ভাগ্য পিতা ও দুঃখিনী জননী নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন এবং হৃদয়ের রক্তে রাঙা জবা দেবতার চরণে অর্পণ করিয়া সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। কত চরিত্রহীন পুরুষের দুর্ভাগিনী পত্নী মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেবতার নিকট মৃত্যুকামনা করিতেছেন। অধার্ম্মিক লোকের কর্ম্মফলের এই খানেই শেষ নহে। সন্তান সন্ততিকেও পিতার দুষ্কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মানুষের পাপ কার্য্য সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? তাঁহারা বলিতেছেন—যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীর শরীরের বিষ যেমন সন্তানদিগের রক্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও রুগ্ন করে, তেমনি চরিত্রহীন পিতার মনের পাপ সন্তানের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকেও ধর্ম্মবিহীন করিয়া তোলে। মানুষ আপনার কৃত পাপ হইতে বরং সহজে রক্ষা পায়; কিন্তু পিতৃমাতৃপ্রকৃতি হইতে যে দূষিত ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইতে সহজে রক্ষা পাওয়া যায় না।

তৎপরে দুর্নীতিপরায়ণ দুর্ম্মতিগ্রস্ত অধার্ম্মিক লোকের দ্বারা জনসমাজের কি অনিষ্ট হয়, তাহাও চিন্তা করা

আবশ্যক। সংসারে দারিদ্র্য ও রোগ শোকের দুঃখ ত আছেই; আবার ধর্ম্মবিহীন লোকেরা প্রতিদিন সহস্র প্রকারে দুঃখ ডাকিয়া আনিতেছে। তাহাদের দুষ্কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। কত ধূর্ত্ত অধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিয়া সরলচিত্ত লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে; কত স্বার্থপর প্রতারক ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে; কত সবল ব্যক্তি দুর্ব্বল ও অসহায়ের প্রতি নির্দ্দয় ভাবে অত্যাচার করিতেছে। তদ্ভিন্ন একজন চরিত্রহীন ও ধর্ম্মবিহীন লোকের সংসর্গে পঞ্চাশজন লোক খারাপ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং দুর্নীতিপরায়ণ ও ধর্ম্মবিহীন লোকের দুষ্কর্ম্ম, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ, স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা জগতের দুঃখ যে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

মানুষ এই রকম সূক্ষ্ম ভাবে যদি দুর্নীতি ও পাপের বিচার করে এবং দুর্নীতি ও পাপের দ্বারা সংসারের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে কিছুতেই হাসিয়া খেলিয়া অথবা বুক ফুলাইয়া পাপের পথে বিচরণ করিতে সাহসী হয় না। শুধু তাহাই নহে। মানুষ যখন উক্ত প্রকার চিন্তার দ্বারা দুর্নীতি ও পাপকে অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে করে, এবং সেই দুর্নীতি ও পাপ আপনারই জীবনের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করে, তখনই তাঁহার অন্তরে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। অনুতাপের জ্বালা যে কি ভীষণ, তাহা কে বর্ণনা করিবে? অথচ এই অনুতাপ ভিন্ন পাপ ও দুর্নীতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবারও আর কোন উপায় নাই। মানুষ এই অনুতাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই আপনাকে সংশোধন করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে এবং আত্মশাসনে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন অনুতাপের উদয় না হয়, ততদিন মানুষ কেবলই আপনাকে আশ্রয় দেয়। নিজের মন শত প্রকারের অপরাধ করিতেছে, তথাপি মনের উপর কোন শাসন নাই—শুধুই কোমল ব্যবহার! অথচ অন্য লোককে ঐ সকল অপরাধ করিতে দেখিলেই তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়; সে অত্যন্ত কঠোর হইয়া অপরাধীদিগের প্রতি শাসন আরম্ভ করে! তাহার পর যে দিন নিজের অপরাধের জন্য অনুতাপ হয়, সেদিন আর অন্যের দোষ দেখিবার সুযোগ থাকে না; আপনিই কপটতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাব্যবহার ও অপকর্ম্মের দ্বারা আপনাকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া আপনার প্রতি কঠোর শাসন আরম্ভ করে। এই ভাবে কিছুদিন আপনাকে শাসন করিতে পারিলেই দোষ ত্রুটি চলিয়া যায়, হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসে। কিন্তু যে ভীরু আপনার মধ্যে সহস্র দোষ নিরীক্ষণ করিয়াও আপনাকে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার ধর্ম্মলাভ এক প্রকার অসম্ভব।

এই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত অনুতাপ ও আত্মশাসনের ব্যবস্থা আছে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। প্রাচীন কালের খ্রীষ্টানগণ অতিশয় নির্ম্মম ভাবে আপনার প্রতি আপনি শাসন করিতেন। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন—

"তোমার হস্ত কিংবা চরণ যদি ধর্ম্মের বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। দুই হস্ত দুই চরণ লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা ভাল। তোমার চক্ষু যদি ধর্ম্মের বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও। দুই চক্ষু লইয়া নরকে প্রবেশ করার চেয়ে অন্ধ হইয়া জীবনে প্রবেশ করাই ভাল।"

বাইবেলের এই কঠোর উপদেশ শ্রবণ করিয়াই খ্রীষ্টীয় সাধকগণ নির্দ্দয় ভাবে আত্মশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন সাধকের হস্ত যখনই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে চাহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেই সাধক সেই অপবিত্র হস্ত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছেন। মহাত্মা মার্টিন লুথার প্রথম জীবনে আপনার সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াও কঠোর ভাবে আত্মশাসন করিয়াছেন। আমাদের দেশের সাধক বিল্বমঙ্গল পাপদৃষ্টির জন্য নিজের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। আত্মশাসন করিতে গিয়া অন্যায় ভাবে আপনাকে যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়! কিন্তু ক্রোধ ও উত্তেজনা বিহীন হইয়া ধীরে ধীরে আপনাকে

শাসন করিতেই হইবে। মানুষের পায়ে যখন কাটা বিঁধে তখন টুক্ করিয়া বিঁধিয়া যায়; অবশেষে অনেক কাটা ছেড়া করিয়া উহা বাহির করিতে হয়। সেইরূপ মানুষ হাসিয়া খেলিয়া অতি সহজ ভাবেই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হয়; তাহার পর সেই অন্যায় কার্য্য হইতে মুক্তি লাভ করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দুর্নীতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর একটি উপায় আছে। যাঁহারা আত্মশাসনে সমর্থ, অথবা যে সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মশাসনে সমর্থ নহে; এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই কাতর ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে; এবং বলিতে হইবে—

"জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে,
কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুন গো আমার এই মরম বেদনা
আমারেও কর মার্জ্জনা।"

ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতেই অন্তরে তাঁহার শক্তি প্রকাশিত হয়। এবং ঐশী শক্তির সাহায্যেই হৃদয়ে তেজ ও বল লাভ করা যায় এবং দুর্নীতির হস্ত হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ধার্ম্মিক-দিগের জীবনের একটি পরীক্ষিত সত্য। ঈশ্বর শূন্য পদার্থ নহেন; তিনিই মহাশক্তি। মানুষ অপরাধের জন্য অনুতাপ করিয়া সরল চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, যথার্থই ঐশী শক্তির নব ভাবে ও নব তেজে হৃদয়কে পূর্ণ করে; তখনই ধর্ম্মলাভার্থী দোষ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বালুর বাঁধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

সন্ধ্যার পর তারক বাবু আদিনাথের মাসীর বাসায় ফিরিয়া গেলেন। মেস্ তখন খালি, সকলেই একটা না একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, গগনেন্দ্র শুধু বাসায় ছিল, তারক বাবু চলিয়া গেলে সে আসিয়া নিস্তব্ধ আদিনাথের কাছে বসিয়া কহিল, "কি হয়েছে? উনি অত চটে মটে গেলেন যে?"

আদিনাথ কিছু উত্তর দিল না, অন্ধকার মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গগনেন্দ্র তাহাদের গ্রামের ছেলে ছিল সুতরাং তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু কিছু জানিত। সে বলিল "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ভদ্র লোকের আর আস্‌বার দিন ছিল না, আজকে ছাড়া!"

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে গগনেন্দ্র কহিল, "যদি কুল রাখ্‌তে হয় তবে শ্যামকে ছাড়। উপায় নেই আর!"

ছেলেবেলা হইতে আদিনাথ তারক বাবুকে অত্যন্ত ভয় করিত, কখনও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা পর্য্যন্ত কহে নাই। সুতরাং আঘাত পাইয়া যখন তাহার সমস্ত চিত্ত শিলাপহত ক্রুদ্ধ জলধারার মত গর্জ্জিতেছিল, তখনও তাহার আজীবনের নির্ব্বিচার বশ্যতার স্বভাব আমূল কম্পিত হইলেও বিচ্যুত হইল না। যে সমস্যা তাহার সমাধান করিতেই হইবে, এবং যাহা করিতে তাহার একেবারেই শক্তি নাই, তাহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অপ্রতিবিধেয় ভাবে বিতাড়িত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় মন তিক্ততায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

গগনেন্দ্র গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার বাবা যখন সুধাংশুর উপর এত চটা, তখন তার সঙ্গে ফ্রেণ্ডসিপ রাখ্‌তে পারবে বলে আমার মনে হয় না।"

আদিনাথের হৃদয়ে গভীরতা ছিল না, যদিও এরূপ বলা যায় না, কিন্তু আদিনাথ অত্যন্ত সহজ-কোপন প্রকৃতি ছিল এবং রাগিলে বিবেচনাপূর্ব্বক কথা সে খুব

কমই কহিত, কমই মনে করিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে তারক বাবু ও সুধাংশু উভয়ের উপরেই তাহার রাগ হইতে লাগিল. এবং তাহার অন্তরের তিক্ততায় একটা আকস্মিক বিমুখতা অনুভব করিয়া সে কহিল, "যাক্ গে, নেই বা রইল, তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই! আমি আর এ রকম সহ্য কর্ত্তে পারি না।"

ঘরের ভিতর একদিকে একটা ছোট টেবিল. তাহার উপর বিশৃঙ্খল এক রাশ খাতা ও বই; তাহার মাঝখানে অর্দ্ধ সমাহিত একটা টাইম্‌পিস্ অসম দুই বাহু দ্বারা কালের পরিমাণ করিতে করিতে ষষ্ঠ ঘটিকার বিজ্ঞাপন প্রদান করিল। গগনেন্দ্র বলিল, "৬টা ত বাজ্‌ল, সত্যব্রতকে আস্‌তে বলেছো—কখন?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া আদিনাথ বলিল, "৭টায়।"

"তা হইলে ত তাদের আসার সময় হোল প্রায়।"

আদিনাথ সহসা তাহার প্রস্তরবৎ নিস্পন্দতা ত্যাগ করিয়া কহিল. "দেখ গগন, তোমার একটা কাজ কর্ত্তে হবে।"

"কি?"

"আমি চল্লুম মাসীমার ওখানে।"

"তারপর?"

"তুমি আমার হয়ে সব করে ফেল। সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বে যখন, তখন বোলো যে মাসীমার অসুখ হওয়াতে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। এ সব কোন কথা বোল টোলো না। সুধাংশু জানে না, কেন আজ এসব করা হচ্ছে, তাকে আমি বলেছিলুম আজ ইষ্টার ডে। ব্যশ্ তাই থাক্, আর কিছু জানিয়ে দরকার নেই।"

"আর কেউ যদি বলে?"

"মানা করে দিয়ো।"

"আরে এ কি চাপা থাক্‌বে, এক্ দিক্ দিয়ে বেড়িয়ে পড়বেই!" আদিনাথ তাহার উত্তর দিল না।

তখন সন্ধ্যা অপগত হইয়াছিল, গলিতে অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতেছিল। দূরে একটা লাইট পোষ্টের ক্ষীণ আলো ছায়ান্ধকার পথের পার্শ্বে মুমূর্ষুর হাসির মত বেদনাতুর দেখাইতেছিল। মেসের একটু পরেই ৺ গোবিন্দজীউর আখড়া, কাঁশর ঘণ্টা ও করতালের সম্মিলিত প্রবল শব্দে সেখানে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। আদিনাথ উঠিয়া নিঃশব্দে তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

কাপড় পরিয়া আদিনাথ তাহার কয়েকখানা বই বাছিয়া লইতে লাগিল। টেবিলের উপর পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও কাব্য সাহিত্য পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এক রাশ বই, আদিনাথ সুধাংশুর সহিত মিলিত হইয়া তাহা কিনিয়াছিল। বই'র ভিতর একটীতেও কোনও নির্দ্দিষ্ট নাম নাই, যেখানা সুধাংশুর তাহাতে আদিনাথের নাম লেখা, যেখানা আদিনাথের. তাহাতে সুধাংশুর নাম লেখা। কোনও কোনও পুস্তকে উভয়ের নাম মনোগ্রামের মত করিয়া লিখিত। আদিনাথ তাড়াতাড়িতে কিছু ঠাহর না পাইয়া বলিল."দেখত ভাই গগন. আমার বই কোন্‌টা. খান কতক নিতে হচ্ছে, পরশু সাপ্তাহিক আছে।"

গগনেন্দ্র যে ক'খানা চিনিত, তাহা বাছিয়া দিল, আদিনাথ তাহা তাহার সাইকেলে বাঁধিয়া বলিল, "এতেই হবে।"

"ক'দিনের জন্য যাচ্ছ?"

অন্ধকার মুখে আদিনাথ বলিল, "বল্‌তে পারি নে কিছু।"

একটু খানি ভাবিয়া গগনেন্দ্র বলিল, "ঝুঁকির উপরে চোলো না কিন্তু, একটু সম্‌ঝো মনে মনে। হঠাৎ এরকম অদর্শন হলে সুধাংশু কি মনে কর্ব্বে?"

গগনেন্দ্রের কথা শেষ না হইতেই বাহিরে জুতার আওয়াজ হইল, আদিনাথ কপাট খুলিয়া ঘাসের উপরে লাফাইয়া পড়িল।

সুধাংশু ঘরে ঢুকিয়া গগনেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "ওহে গগন, আদিনাথ আসে নি?"

গগনেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ এসেছিল।"

"অতীত কাল?"

গগনেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "তার মাসীর হঠাৎ কি অসুখ হইয়াছে তাই তাকে ডেকে নিয়ে গেছে।"

"বটে? তাহ'লে এদিকে কি হবে?"

খানিকটা ক্ষোভে খানিকটা বিরক্তিতে সুধাংশু সামনের বিছানায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই অন্যান্য সকলে আসিয়া পড়িল। জ্ঞানরঞ্জন সুধাংশুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "যাই বল না কেন ভাই, তোমার মত এরকম "অনার" কেউ পায় নি।"

বিস্মিত সুধাংশু বলিল " কিসের "অনার ?"

"বাঃ! তুমি জান না ?"

"না! কি ?"

"এ সব যে তোমার জন্য করা হচ্ছে।"

"আমার জন্য ?"

"বিশ্বাস হয় না নাকি ?"

"আরে বাঃ! সে যে আমায় বলেছে আজ তার "ইষ্টারডে" হচ্ছে।"

"সে তোমায় একটু আকস্মিকরূপে বিস্মিত করে দেবার আয়োজনে ছিল।"

"আচ্ছা পাগল ত !"

ধরণীমোহন বলিল, "আমাদের হোষ্ট্ মহাশয় কোথায় ?"

গগনেন্দ্র তাহার পাঠ পুনরাবৃত্তি করিল।

বিনয়কুমার বলিল, "ধেৎ! আজকার পার্টিটাই মাটি তা হলে !"

বিপিনকুমার তাহা শুনিয়া বলিল, "আদিনাথের মাসীর ব্যারাম কে বলেছে ?"

গগনেন্দ্র সাহস করিয়া বলিল, "আমি বল্‌ছি।"

বিপিনকুমার প্রবল অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিল, তা হ'তেই পারে না! আমাদের বাড়ী থেকে আজ সব ওদের বাড়ী গিয়েছিল, আদিনাথের মাসী এখনো বাড়ীতে। আজ তাঁদের আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু আসেন নি।"

শশীভূষণ "বাঃ! এত বেশ মজা ? তোমায় কে বলেছে হে গগন, আদির মাসীর ব্যারাম ?"

থতমত খাইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় গগনেন্দ্র বলিল, "কে একটা লোক চিনিনে তাকে।"

বাহিরে তখন অর্গান্ লইয়া সত্যব্রত উপস্থিত, তাহার ডাক শুনিবা মাত্র সকলে আদিনাথের কথা ভুলিয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুধাংশু গগনেন্দ্রের কাছে আসিয়া কহিল, "তুমি মনে কোরো না গগন, যে এই মাত্র তুমি যা বল্লে তাতে আমি বিশ্বাস করেছি; তুমি যে সত্য কথা বল নি, তোমার মুখ দেখেই তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আদির মাসীর ব্যারামের কথা কে তোমাকে বলেছে ?"

গগনেন্দ্র বিপন্ন হইয়া বলিল, "আদিনাথ নিজে।"

"কেন ?"

গগনেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। সুধাংশু কহিল, "আদি আমাকে একথা বল্‌তে বলেছিল ?" গগনেন্দ্র কোনও উত্তর দিল না।

আদিনাথ তাহাকে এড়াইবার জন্য অপরকে মিথ্যা কহিতে শিখাইয়া গিয়াছে ? সুধাংশু মনের ভিতর একটা ভয়ানক ঝাকি খাইল ও সহসা তাহার মুখের আনন্দ-জ্যোতি নিভিয়া গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গগনেন্দ্র একটা কঠিন ক্ষোভের পীড়নে নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুধাংশু গগনেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে রাস্তায় চল গগন, এখানে শোনা হবে না। আদিনাথ তোমায় আমাকে ভাঁড়াতে বলে গেছে ?"

টেবিলের উপর একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার নিঃশেষিত তৈল সলিতাগুলি সব একসঙ্গে দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার রক্তপীত উজ্জ্বল আলোকে সুধাংশুর বেদনান্ধকার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্র নীরবে উঠিয়া তাহার সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

(৪)

কৃষ্ণা একাদশী রাত্রি। নক্ষত্র-খচিত আকাশ নীচের গাঢ় অন্ধকারের উপর স্থির হইয়া আছে। পাশের বাড়ীগুলির খোলা জানালা দিয়া মৃৎপ্রদীপের বিশীর্ণ আলো পথের ধারের গাছের মাথার উপর পড়িয়াছে। দুদিকে সব কপাট বন্ধ, ঘরের ভিতর হইতে হাসির শব্দ, গানের শব্দ, পড়ার শব্দ শোনা যাইতেছে। অন্ধকারে কিছু দুর পর্য্যন্ত নীরবে গিয়া সুধাংশু অবশেষে কহিল, "গগন, আমি আশা করি তুমি পরিষ্কার করে কথাটা আমায় বল্‌বে।"

গগনেন্দ্র অধিকতর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। আর সকলে যেরকম সুধাংশু যদি সেই রকম হইত তবে তাহাকে কথাটা বলা কিছুমাত্র মুস্কিল হইত না, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বিপাক্ বশতঃ সুধাংশুর স্বভাব আর সকলের চেয়ে একটু বিভিন্ন প্রকার ছিল। সে ছিল অত্যন্ত কোমল—নারীর মত স্নেহপরায়ণ। আঘাত দিবার মত ও সহিবার মত কাঠিন্য তাহার ছিল না। কিন্তু নৈতিক হিসাবে তাহার একটা প্রবল দার্ঢ্য ছিল এবং কবির মত ভাব ও চিত্তসৌন্দর্য্যের প্রতি সে একান্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল। আপনার বিশ্বস্ত প্রকৃতির গুণে সে সকলকে অকুণ্ঠিত ভাবে বিশ্বাস করিত এবং সে সম্বন্ধে কোনও ক্রটী সে অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিত।

সুধাংশুর প্রশ্নে গগন বিষয়টাকে কোনও রূপে লঘু করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য হাসিয়া বলিল, "তুমিও যেমন পাগল! আদি কি বলেছে না বলেছে তার জন্য এত"—অসহিষ্ণু হইয়া সুধাংশু বলিল, "দেখ, ওসব কিছু হবে টবে না, যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি তার উত্তর দেও। আদির আমাকে ভাঁড়াবার কি দরকার ছিল সেটা আমি জান্‌তে চাই।"

আদিনাথের সঙ্গে সুধাংশুর বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হউক না কেন, আদিনাথ তারক বাবুর সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাকে এ পর্য্যন্ত বলে নাই, সুতরাং গগনেন্দ্র তাহা বলিবার জন্য আহুত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত বিপদাপন্ন মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সুধাংশু ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহাকে বাধ্য হইয়া সে গোপন ইতিহাস ব্যক্ত করিতে হইল।

সুধাংশু শুধু নীরবে শুনিল, কিছু কহিল না। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না, মনের ভিতর একটা প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। খানিক ক্ষণ পরে সুধাংশু বলিল, "এ ত গেল তার বাপের কথা, আদি কি উত্তর দিলে?"

"উত্তর সে কিছু দেয় নি।"

"কিছুই দেয় নি?"

"না।"

"তোমায় তা'হলে কিছু বলেছে!"

আদিনাথ যে কিছু বলে নাই, যেন এ অপরাধটা গগনেন্দ্রের নিজের, গগনেন্দ্র এরূপ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না, আমায় কিছু বলে নি।"

সুধাংশু যদি আর কেহ হইত, তাহা হইলে গগনেন্দ্র কল্পনার বলে সমস্ত বিঘ্ন ও সঙ্কট পার হইয়া বিষয়টাকে দিব্য মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু সুধাংশুর কাছে মিথ্যা কহিবার সাহস তাহার আদৌ সমুপস্থিত হইল না, সুতরাং "অপ্রিয় সত্য" প্রকাশ করিয়া নীরবে সে আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রাস্তায় পাইচারি করিতে লাগিল। রাস্তার মাঝখান দিয়া তাহারা হাটিতেছিল, সদ্য পতিত ঝামার খণ্ডগুলি তাহাদের চটির নীচে প্রতি পদক্ষেপে শব্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সুধাংশু হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আদি আমার সম্বন্ধে কোনও কথাই বলে নি? পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে?"

ইতস্ততঃ করিয়া গগনেন্দ্র কহিল, "জানই ত আদি কেমন সহজে চটে যায়, রাগের মাথায় সে বল্‌ছিল যে সে আর এরকম পারে না।"

সুধাংশুর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর অগাধ নিরাশার নীচে ক্ষীণ আশার যে শিখাটি জ্বলিতেছিল, তাহা সহসা নিভিয়া গেল, একটা কঠিন বেদনা তাহার বুকের ভিতরকার স্নায়ুগুলি আঘাত করিয়া বহিয়া গেল।

গগনেন্দ্র ডাকিল, "সুধাংশু!"

সুধাংশু কোনও উত্তর দিল না।

গগনেন্দ্র বলিল, "ছি এত অভিমানী তুমি! সামান্য একটা তুচ্ছ কথা, তাকে এমন গুরুতর করে নিচ্ছ?"

"তুচ্ছ হ'তে পার্‌ত যদি আদি এসে আমাকে সমস্ত কথা খুলে বলে যেত! আমার সঙ্গে যদি সে মুখোমুখী ঝগড়া করেও যেত তাহ'লেও আমি কিছু মনে কর্‌তুম না।"

"তা এখন কি করে বল, মানুষের দুর্ব্বলতা আছে ত! তার বাবা তাকে যেমন সব শ্লেষোক্তি কর্‌ছিলেন্, তখন, তাতে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল।"

সুধাংশু কোনও উত্তর দিল না। আখড়ায় আরতির বাদ্য থামিয়া গেল, সাম্‌নের বাড়ীর যে জানালাটি দিয়া বাতির আলো তাহাদের মাথায় আসিয়া পড়িতেছিল, তাহা সহসা অন্ধকার হইয়া গেল, একটা ঊর্দ্ধলাঙ্গুল কুকুর কোথায় তাড়া খাইয়া তাহাদের পায়ের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল। সুধাংশুর হৃদয় মন শুধু আদিনাথের উচ্চারিত বিমুখতার একটি বাণীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ক্রমাগত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

(৫)

পনরো দিন পরে আদিনাথ যখন তাহার মাসীর বাড়ী হইতে মেসে ফিরিয়া আসিল, তখন সে অতি সন্তর্পণে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল যে সুধাংশু হয় ত পর মুহূর্ত্তে লাফাইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া কর্ণদ্বয়ের শোচনীয় অবস্থা করিবে, অথবা তাহার পৃষ্ঠদেশকে অসম্ভব মাত্রায় বিপন্ন করিয়া তুলিবে। রাত্রি তখন ৮টা কিম্বা ৯টা, ছেলেরা সকলেই আপন আপন পাঠ আরম্ভ করিয়াছে, গুঞ্জিত মধুচক্রের মত সমস্ত বাড়ীখানি তাহাদের মৃদু উচ্চারিত কণ্ঠস্বরে শব্দিত হইতেছে। আদিনাথ অন্ধকারে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিল। তাহার পাশের ঘরে ধরণীমোহন ও আরো কয়েকটি ছেলে অলস ভাবে বসিয়া চা পান করিতেছিল, দেশালাইর শব্দ শুনিয়া ধরণীমোহন বলিয়া উঠিল, "কেরে ও ঘরে ?" আদিনাথের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, "আমি।"

"চোর" বলিয়া ধরণীমোহন আদিনাথের ঘরে আসিয়া তাহার গ্রীবা ধরিল। সুধাংশু মনে করিয়া আদিনাথ প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া গেল, কিন্তু যখন দেখিল আক্রমণকারী সুধাংশু নহে ধরণীমোহন, তখন সে হাসিয়া ধাক্কা দিয়া বলিল, "য়্যাড্‌ভেঞ্চার এত সস্তা হয় নারে !"

ধরণীমোহন আদিনাথের চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। আদিনাথ কোট খুলিতে খুলিতে বলিল, "তারপর, খবর কি ?"

"খবর কি ? তুমি নিজেই ত একটা মস্ত খবর। এই পনরো দিন কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলে হে ?"

"মাসীমার ভারী অসুখ করেছিল।"

"মাসীমার অসুখ ত ফাঁকি, তোমার মাসীমা ত তখন এ মুল্লুকেও ছিলেন না। আসল কথাটা কি হয়েছিল শুনি। এত খরচ টরচ করে, ধূম ধাম করে, তার পর সব ফক্কিকার !"

"বাঃ, বাড়ী গিয়েছিলুম যে। হঠাৎ যেতে হোল তাই বলে যেতে পারি নি। সুধাংশু কোথায় ?"

বিদ্যুতের মত আদিনাথের মনে মেসে ঢুকিবার সময় রেলিং এর উপর নত একটি মূর্ত্তির ছায়া জাগিয়া উঠিল, আদিনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখে এস না ধরণী, এখানে আছে কিনা ?"

ধরণীমোহন উঠিয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে পর আদিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় সে ?"

"সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে আছে।"

আদিনাথ হৃদয়ের ভিতর একটা চঞ্চলতা অনুভব করিতে লাগিল, বলিল, "শুয়ে পড়েছে যে ?"

"বল্লে, মাথা ধরেছে।"

আদিনাথ কিছু না বলিয়া বিছানা পাতিয়া তাহাতে শয়ন করিল, ধরণীমোহন বলিল, "আজ যে বড় এখানে বন্দোবস্ত ? দুয়োরাণীর কাছে গেলে না ?"

হাসিয়া আদিনাথ বলিল, "দুয়োরাণীর সঙ্গে ঝগড়া করেছি যে !"

ধরণীমোহন বলিল, "বাপ্‌রে ! দুয়োরাণীর সঙ্গে ঝগড়া ?"

আদিনাথ হাসিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর আদিনাথ ও ধরণীমোহন যখন এইরূপ কৌতুক রস উপভোগ করিতেছিল, তখন বাহিরে অন্ধকার দরজার ওপিঠ হইতে দুইটি ব্যগ্র নেত্র আদিনাথকে একান্ত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ধরণী মোহনের কথায় যখন আদিনাথ সশব্দে হাসিতে লাগিল, তখন তাহাদের সেই হাসির শব্দের সঙ্গে, তাহাদের পিছন হইতে একটা রুদ্ধ বেদনাপূর্ণ নিশ্বাস মিলিত হইল, ও সঙ্গে অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা গেল। ধরণীমোহন বলিয়া উঠিল, "কে ওখানে ?"

আদিনাথ বলিল, "ভূত।"

(৬)

পরের দিন সকাল বেলা সুধাংশু তাহার ঘরে আদিনাথের যে সব জিনিস্ পত্র ছিল, সব খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার ট্রাঙ্কে ভরিতে লাগিল। কাপড়, বই, দোয়াত, কলম, বাইকের অয়েল ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট, শেভিং কেস্, অর্দ্ধ ব্যবহৃত সাবান, আয়না চিরুণী, গোটা কয়েক ব্রণ্ডোর শিশি—একে একে সব ট্রাঙ্কের ভিতর গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি জিনিস সে অতি সন্তর্পণে রাখিতেছিল, যেন বাক্সের লৌহময় তলাটা তাহারই ব্যথিত হৃদয়ের কতকটা অংশ, হঠাৎ যেন তাহা নাড়া পাইয়া মানুষের কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে. হাতে করিয়া সে জিনিসগুলি সেখানে রাখিতেছিল, তাহার প্রত্যেকটি যেন একটি সচেতন বস্তু, তাহাদের প্রত্যেকটি তাহার বেদনা-স্পন্দিত হৃদয়ের কাছে যেন এক একটী কাহিনী পাঠ করিতেছিল, মায়ামন্ত্রের মত তাহা তাহার হৃদয়ের কাছে পুনর্জাগ্রত করিয়া দিতেছিল—আনন্দময় মধুর অতীত দিবসগুলি. শাখাচ্যুত পুষ্পের মত যাহা তাহার জীবন-তরু হইতে চিরদিনের মত স্খলিত হইয়া গিয়াছে,—যাহা সে আর কখনও ফিরিয়া পাইবে না।

সুধাংশু তাহার নিজের চিন্তায় বিভোর ছিল, এমন সময় ধরণীমোহন আসিয়া কহিল, "আদিনাথ তার বাক্সটা নিয়ে যেতে বলেছে।"

সুধাংশুর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল. কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সে বলিল, "সত্যি বলেছে?"

"হ্যাঁ। তোমরা না কি ঝগড়া কোরেছো?"

সুধাংশু সম্মতি সূচক শিরশ্চালনা করিল।

"তারপর?"

"একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টায় আছি।"

"বটে? তা এই রকমের অভিজ্ঞতাটা বিশেষ প্রীতিকর হয় না কিন্তু।"

সুধাংশু তখন তাহাকে দুঃখের সারবত্তা বুঝাইয়া দিল, ধরণীমোহন হাসিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিল।

ট্রাঙ্কের ডালা খোলাই ছিল, ধরণীমোহন তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এই যে সব ঠিক্ ঠাক্ করে রেখেছো দেখ্‌ছি।"

"কাজেই, আমাকে বাদ দিলে দিন চলে যাবে, কিন্তু এগুলি বাদ দিলে চল্‌বে না।"

ধরণীমোহন বাক্সের ভিতরটা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "হয়েছে না?"

"হ্যাঁ হয়েছে।"

"নিয়ে যাই তা হ'লে?"

"যাও।"

ধরণীমোহন বাক্স উঠাইয়া লইয়া গেল, সুধাংশু নীরবে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা একটা শূন্যতা তাহার মনে ছাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে নির্ব্বাপিত দীপ-শিখার মত নিরানন্দ যে দিন গুলি আসিতেছে, তাহার অন্ধকার স্মৃতি তাহার হৃদয়কে নিপীড়ন করিতে লাগিল।

ট্রাঙ্ক আদিনাথের কাছে পঁহুছাইয়া দিয়া ধরণীমোহন কহিল, "তোমার কুলীর কাজ করে দিলুম, পয়সা দাও এখন।"

আদিনাথ পকেট হাতড়াইয়া একটা পয়সা বাহির করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যাঙ্গুষ্ঠের ভিতরে রাখিয়া ধরণীমোহনের সম্মুখে ধরিল, ধরণীমোহন বলিল, "গ্রেজুয়েট্ কুলীর ভাড়া এক পয়সা? তোমার মূল্যজ্ঞান নেই হে আদিনাথ!"

আদিনাথ তখন বুকের পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল "এইবার?"

শ্যেণ পক্ষীবৎ ধরণীমোহন তৎক্ষণাৎ আদিনাথের উপর পড়িয়া রৌপ্যচক্রটি হস্তগত করিল, এবং আদিনাথের কিছু কিছু বিবেচনা শক্তি আছে, মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়া সেই চতুঃষষ্ঠি তাম্রচক্রধারী রজতখণ্ডের দ্বারা কোন্ কোন্ উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, এবং কাহাকে কাহাকে তাহার অংশ দেওয়া যাইতে পারে ইত্যাকার বহু গবেষণায় নিযুক্ত হইল। আদিনাথ উঠিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল। সেই ভাষাহীন, প্রাণহীন, মূক, অচেতন জিনিসগুলি সহসা যেন শতকণ্ঠে তাহার কাছে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত অন্তর

প্লাবিত করিয়া একটা প্রবল অভিমানের বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল.—এমন কি অপরাধ করিয়াছে সে যাহার জন্য সুধাংশু তাহার সকল চিহ্ন বর্জ্জন করিতেছে! আদিনাথ ধরণীমোহনকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল।

(৭)

মেসে সকলেই জানিল, আদিনাথের সঙ্গে সুধাংশুর একটা মর্ম্মান্তিক কলহ হইয়া গিয়াছে. কিন্তু কলহটা কি লইয়া তাহা সুধাংশুর নিকট হইতে কেহই বাহির করিতে পারিল না। গগনেন্দ্র ইহার ভিতর তৃতীয় পক্ষ ছিল. কাজেই. সকলে তাহাকে আক্রমণ করিল এবং গগনেন্দ্রের বলিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা সব বলিতে হইল।

বাহিরের প্রমাণ দিয়া মানুষের মনকে বিচার করিতে গেলে সত্য সব সময় পাওয়া যায় না। সুধংশুর সহিত এরূপ অভাবনীয় রূপে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ায় আদিনাথ যে মনঃপীড়া ভোগ করিতেছিল না, এরূপ নহে. কিন্তু আদিনাথের বাহ্যিক আচরণে তাহার কোনও চিহ্ন প্রকাশ পাইত না। সে হাসিত, গল্প করিত. ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান অধিকার করিয়া সমস্ত বাড়ীখানাকে তাহার জয়োৎফুল্ল হাস্যে ধ্বনিত করিয়া তুলিত. যেমন করিয়া সুধাংশুর সঙ্গে সাহিত্য ও কাব্যালোচনা করিত. সংবাদপত্র পাঠ করিত, নব প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা করিত, অন্য সমপাঠীদের সঙ্গেও তদ্রূপ করিত. সুধাংশু তখন পাশের ঘরে খোলা বইএর কাছে শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া থাকিত, তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া আদিনাথের প্রত্যেক বাক্য তৃষিতের মত পান করিত, বেদনা ও আনন্দের আঘাতে তখন তাহার বক্ষের স্নায়ুগুলি রাগিণী ভরা তারের মত কাঁপিয়া উঠিত। অতিরিক্ত রূপে সে স্নেহপরায়ণ ছিল, সুতরাং এই বিচ্ছেদের বিদারণ রেখা তাহার অন্তরের গভীরতম স্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছিল, সে খানিকটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হাস্য কৌতুক কতকটা কমিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রথম যৌবনের আনন্দময় উচ্ছ্বাসের বেগ শিলারুদ্ধ নির্ঝরের মত খানিকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। আসিতে যাইতে দুইজনে যখন সাম্‌নাসাম্‌নি হইয়া পড়িত, তখন আদিনাথ নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত, সুধাংশুর তখন সমস্ত দেহে একটা আকস্মিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত, সে অবশ হইয়া পড়িত, তাহার মুখ তখন সহসা বিবর্ণ হইয়া যাইত। আদিনাথ মনে করিত. সুধাংশু তাহাকে উপেক্ষা দেখাইতেছে, এবং সুধাংশু মনে করিত আদিনাথ তাহাকে উপেক্ষা দেখাইতেছে,ফলে উভয়ের ললাটেই দিন দিন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল।

গ্রীষ্মের বন্ধের পরে আসিয়া আদিনাথ এবার অন্য মেসে গেল। সুধাংশু বাড়ী হইতে বহু কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল যে সে এবার আদিনাথের সঙ্গে আপনি গিয়া কথা কহিবে. কিন্তু আসিয়া যখন শুনিল যে আদিনাথ অন্য মেসে গিয়াছে, তখন সে অসুখের ভান করিয়া নিজের ঘরে গিয়া নির্জ্জনবাসের বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

শ্রাবণ মাস। আকাশে সে দিন তারকার চিহ্ন মাত্র নাই. কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ মেঘের অন্তরালে কখন সমুদিত হইয়া কখন আবার অস্তে নামিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা অনুভব করে নাই। অন্ধকার চারিদিকে অত্যন্ত নিবিড়, বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। ঘরের ভিতর বাতি জ্বলিতেছিল, গগনেন্দ্র ও ধরণীমোহন খাটের উপর বসিয়া কথা কহিতেছিল, এমন সময় আদিনাথ সেখানে দেখা দিল। "আরে কে ও, আদিনাথ যে!" বলিয়া ধরণীমোহন উঠিয়া আদিনাথকে টানিয়া বসাইল। আদিনাথ বসিয়া বলিল, "সুধাংশু কোথা?"

গগনেন্দ্র বলিল, "দেখা কর্ব্বে নাকি তার সঙ্গে?"

"না, দেখা কর্ব্ব না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি!"

"সে বেরিয়ে গেছে।"

ধরণীমোহন মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমরা খালি রেস্‌ই চালাবে নাকি? হার জিত একটা কিছু হবে টবে না?"

আদিনাথ হাসিতে লাগিল। গগনেন্দ্র বলিল, "কিন্তু কি পাগল তুমি! বাড়ী ছাড়লে তার জন্য একেবারে!

"বাড়ী না ছেড়ে আর করি কি !"

"কেন, সুধাংশু তোমার কি অসুবিধা করেছিল ?"

"বাঃ ! মার্ক কর নি শেষের দিন গুলো তোমরা ?"

"মার্ক করব না কেন ! কতকগুলো বিষয় আছে যা মার্ক করতে হয় না। তা নিজেই মার্কড্ হয়ে উঠে।"

"বেশ্। তা হলে আবার ওকথা বল্‌ছ কেন ?"

বাহিরে তখন একটা দরজায় শব্দ হইল, ধরণীমোহন বলিল, "কে এল ?"

গগনেন্দ্র বলিল, "এল ? না, বাতাস ছেড়েছে।"

আদিনাথ তাহাদের কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিল, "আমি বাড়ী না ছেড়ে করি কি বল ত ! সুধাংশু যে আমার কাছে আস্ত বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় এক বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। আমায় দেখ্‌লে সে চমকায়, যেন আমি ভূত কিম্বা প্রেত !"

সুধাংশু বেড়াইয়া আসিয়া তখন নিজের ঘরে যাইতেছিল হঠাৎ গগনেন্দ্রের ঘরে আদিনাথের গল্প শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সুধাংশু যে খালি স্নেহপরায়ণই ছিল, এমন নয়, সে একটু খানি নীতিপরায়ণও ছিল। গোপনে অন্যের কথা শোনাকে সে ঘৃণা করিত, কিন্তু তাহার সম্মুখে রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে আদিনাথের কণ্ঠ, সে সেখানে না দাঁড়াইয়া পারিল না। আদিনাথ ঠিক্ সেই সময়েই সুধাংশুর নামে অভিযোগ প্রকাশ করিতেছিল, সুধাংশু আরো কপাট্ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

কথা চলিতেই ছিল, সুধাংশু তাহার সমস্তটাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, শেষটা সে এইমাত্র বুঝিল যে তাহার নীতিপরায়ণতা লইয়া ঘরের ভিতর একটা তর্ক চলিতেছে। সুধাংশু কখনও মিথ্যা কহিত না এরূপ যদিও বলা যায় না, কিন্তু মিথ্যা কথন সম্বন্ধে তাহার একটা ভয়ানক কুণ্ঠা ছিল, এবং তাহা লইয়াই সমালোচনা হইতেছিল। সুধাংশু তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

গগনেন্দ্র বলিতেছিল, "বাজি রাখ আমার সঙ্গে, সুধাংশু কখ্‌নো মিথ্যা কথা বলে না।"

ধরণীমোহন বলিল, "এ বিষয়ে বাজি আমিও রাখ্‌তে পারি।"

গগনেন্দ্র বলিল, "আমরা নিজের মন দিয়ে অন্যকে বিচার করি কি না—"

আদিনাথ বাধা দিয়া বলিল, নিজের মন দিয়ে যে আমরা বিচার করে থাকি, তার একটা মানে আছে। আর তাতে ভূয়োদর্শনের ফলও খানিকটা জড়ান থাকে। মানুষ মোটের উপর সমধর্ম্মী কি না ?

ধরণীমোহন টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "এইয়ো, আমরা এখানে ফিলসফিকাল্ স্পিচ্ শুনিতে আসি নি।"

আদিনাথ বলিল, "না, না, ফিলসফি না ; আমরা মিথ্যা বলি বলেই যে সুধাংশুর মিথ্যা বলাটা মেনে নিচ্ছি তা নয়, তবে আমাদের মত রাশি রাশি মিথ্যা সে বলে না, সে বলে ক্বচিৎ ; এই টুকুই হচ্ছে তার অনন্য-সাধারণতা।"

এমন সময় গগনেন্দ্র হঠাৎ জল খাইবার জন্য বাহির হইল, ঘরের ভিতরকার রুদ্ধ আলোকস্রোত, খোলা দরজায় সুধাংশুর উপর গিয়া পড়িল। আদিনাথ সম্মুখে ছিল, সে সুধাংশুকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাইল, ধরণীমোহন একটু অন্তরালে ছিল, সে সুধাংশুর খানিকটা মাত্র দেখিতে পাইল, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে গগন ?"

ঢোক গিলিয়া গগনেন্দ্র বলিল, "সুধাংশু।"

ঘরের ভিতর তিন জনেই প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল, গগনেন্দ্র কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, এবং আদিনাথ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির প্রোজ্জ্বল স্থির নেত্রের কাছে মাথা নীচু করিয়া রহিল। ধরণীমোহন সাহস করিয়া কহিল, "এস না সুধাংশু ঘরের ভিতর, বাইরে অমনতর দাঁড়িয়ে রইলে যে !"

সুধাংশু কিছু কহিল না, চুপ্ করিয়া রহিল। আদিনাথের কাছে যে সে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকেও খর্ব্ব করিয়াছিল, যেখান হইতে কেহ তাহাকে নামাইতে পারে নাই, সেখান হইতে যে সে তাহার জন্য আপনি নামিয়া দাঁড়াইয়াছে——আজ যে সেই তাহার প্রধান

অভিযোক্তা, একথা মনে করিয়া তাহার সমগ্র হৃদয় মন একটা প্রচণ্ড আঘাতের বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। ধরণীমোহনের কথায় কোনও উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল; গগনেন্দ্র তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ডাকিল, "সুধাংশু শোন, একটা কথা শোন!"

"এখন নয় গগন," বলিয়া সুধাংশু তাহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বর্ষার মাতৃত্ব।

ঢালো আরো ঢালো বারিধার,
তৃপ্ত কর স্নিগ্ধ কর পিপাসিত বিশ্বে অনিবার।
বহে যায় সিক্ত বায়ু মর্ম্মরিত তমাল-শাখায়,
অশোকের শুষ্ক শাখা ফুলে ফুলে মুঞ্জরিয়া যায়!
রৌদ্রতপ্ত ধরাবুকে ঝরে ধারা ঝরে অবিরল;
পিয়াসী দয়েল শ্যামা গাহি ওঠে বরষা-মঙ্গল,
মুখরিত নীপচ্ছায়।

এস তবে লো করুণাময়ি!
আজি যে জননীরূপে প্রাণে মোর দেখা দিলে অয়ি!
—জননীর স্নেহরাশি—এমনি সে বহে চিরদিন,
এমনি সে মরুপ্রাণে ঝরে সদা বিরাম-বিহীন।
তারি পুণ্য ধারাপাতে দলে দলে ফুটি ওঠে প্রাণ,
শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্লেশ, গ্লানি, তারি মাঝে লভে অবসান।

—আজি তাই বরষার অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি পাশে,
আমার পিয়াসী হিয়া ধীরে ধীরে নত হয়ে আসে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

রন্ধন, আহার এবং গৃহস্থালী।

গতবারে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা সাধারণতঃ রন্ধনের জন্য যে সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টতর খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তম খাদ্য বলিতে স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য বুঝিতে হইবে। পুর-মহিলাদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাঁহাদের রন্ধনগৃহে অবস্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহা দ্বারা যেন কেহ এমন না বোঝেন যে রমণীদিগকে আমি রন্ধনশালা হইতে একেবারেই বিদায় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতেছি। সুস্থদেহ রমণী স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন এবং অভ্যাগতদের আহার্য্য প্রস্তুতের ভার পাচক ব্রাহ্মণের প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি-বেন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। আমি ইহাই বলিতে চাই যে নারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা শুধু রন্ধন-গৃহে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না।

সন্তান পালন, শিশুদের শরীর সুস্থ রাখিবার উপায়, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা রমণীদিগের একান্তই আবশ্যক। এসকল বিষয়ে যাঁহারা পূর্ব্বে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত উহা শিক্ষা করিতে হইবে। শিশুদিগকে কুখাদ্য প্রভৃতি প্রদানের ন্যায়, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান সম্বন্ধেও প্রায়শঃ আমরা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়া থাকি। শিশুচরিত্রে অনভিজ্ঞ, অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের হস্তেই সচরাচর শিশুদের শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার বলে প্রকৃতিরাজ্য হইতে জ্ঞানরাজি সংগ্রহ করিয়া কোমল শিশু হৃদয়ের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায়, ইঁহাদের অনেকেরই তাহা নাই! দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিশুদের শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করা তাঁহাদের সময়ের অপব্যবহার বা শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করেন। রমণীগণ শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। যতদিন তাহা সম্ভব না হইবে তত দিন জননীগণকে এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত রমণী স্বামী পুত্রের জন্য অকাতরে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ সন্তানের জন্য শিক্ষালাভে যত্নবতী হইবেন, ইহা কি একান্তই দুরাশা?

এতদ্ভিন্ন স্বামীকে পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি দিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা উচিত। গৃহ প্রাঙ্গণে শাক সবজীর বাগান করিলে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং সাংসারিক ব্যয়ের তালিকা অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। তাছাড়া আফিসের কর্ম্মভারক্লিষ্ট স্বামীকে বাজার খরচ, ধোপার হিসাব প্রভৃতি রাখা হইতে মুক্তি দিলে, আফিসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরও তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার আনন্দ লাভ করা যায়। রন্ধন করিয়াই সময় পাই না এ ওজর করিয়া কোন রমণীই এই সকল কর্ত্তব্য হইতে দূরে থাকিতে পারেন না।

আমার মনে হইতেছে, অনেকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে খুব বড় বড় কথা, পরকে উপদেশ দেওয়া এমনই সোজা বটে।" তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপরে যাহা লেখা হইল আমি স্বয়ং তাহা যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া থাকি। বাল্য-বিবাহ রহিত হইলে বঙ্গনারী শিক্ষালাভের অনেকটা সময় পান সত্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ দ্বারাই বাল্য বিবাহ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, সুতরাং বিবাহিত জীবনেই আমাদিগকে শিক্ষালাভের দ্বারা জীবনের উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইতে হইবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, কোন প্রতিকূল অবস্থাই সাধু ইচ্ছার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।

সময়ের মূল্য বুঝিলে, এবং মূল্যবান সময় বৃথা ব্যয়িত হইতে দিব না, এরূপ সংকল্প থাকিলে আমাদের কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই সময়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না। সময় সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যখনই আমি কাহারও সহিত আমাদের নারী জীবনের উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি,তখনই বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি—"আর বোন্ ছেলেপিলের সংসার—ওদের খাওয়ান পরান, এখন কি আর কোন কথা ভাববার সময় আছে? তোমাদের কাঁচা বয়স, যা হয় একটা তোমরাই কর।" আবার যাঁহাদের কাঁচা বয়স তাঁহারা তো নারীরূপিণী জড়পিণ্ড বিশেষ, চালাইলে চলেন, না চালাইলে থামিয়া থাকেন, থামিয়াই থাকেন। রাঁধা বাড়ী, এবং পরিবেশন প্রভৃতি কার্য্যেই তাঁহাদের প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত্রির কতক ভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে। দৈনিক আহার্য্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন প্রভৃতির জন্য প্রত্যহ চারিঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু আমি অনেককেই এজন্য আট নয় ঘণ্টা ব্যয় করিতে দেখিয়া থাকি।

শৃঙ্খলার অভাবই সময়ের এইরূপ অপব্যবহারের একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হয় না, তাহাতে অনেক সময়ে অসুবিধার একশেষ হয়। রান্না করিতে গিয়াছেন, উনুনে কড়াই চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, শিশিতে তেল নাই, তখন তাড়াতাড়ি সাত বৎসরের মেয়েকে বলা হইল, "মা, যা তো হাঁড়ি থেকে এক শিশি তেল শিগ্গির ক'রে ভ'রে নিয়ে আয়।" মেয়ে দৌড়িয়া গেল, আর আসে না। "ও হতভাগি! ও পোড়ার মুখি! শিগ্গির আয়, হতভাগা মেয়ের তেল ভরবার যোগ্যতাটুকু হলোনা—পারেন কেবল খেতে।" এদিগে মেয়ে তেল ফেলিয়া, শিশি ভাঙ্গিয়া প্রহারের ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মা আসিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন; চড়,গাল টিপিয়া দেওয়া প্রভৃতি জননীসুলভ প্রহার এবং গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। নিজে যে ভুল করিয়াছেন তজ্জন্য নিরাপরাধ শিশুকে শাস্তি দিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই যে কেবল সময়ের মূল্য বোঝে না, এমন নহে পুরুষদের মধ্যেও অনেকে সময়ের মূল্য বোঝেন না। ইংরেজ এরূপ জড়তার ধার ধারেন না, তাই যাঁহারা আফিসে কাজ করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই কার্য্যস্থলে ঠিক সময়ে যাইতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকেই প্রাতঃসময়টা বৃথা গল্পগুজবে কাটাইয়া আহারের সময় কোনওরূপে নাকে মুখে

গুজিয়া আহার কার্য্য সম্পাদন করেন, আর "আমার জামাটা কোথায় গেলরে? আ মলো চিরুণীখানা খুজে পাচ্ছিনা" প্রভৃতি রবে বাড়ীর সকলকে অস্থির করিয়া তোলেন। যাহাহউক এইরূপে কর্ত্তাকে বিদায় করিয়াই যে পাচিকা বধূ রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবেন তাহা নহে, যাঁহাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই তাঁহাদের লইয়া আরও বিপদ। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, এবং সকল বিষয়েই একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত, এ জ্ঞান অনেকেরই নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে যদি এক সঙ্গে আহার করিতে বসেন, তবে সে দৃশ্য দেখিতেও অতি সুন্দর সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিবার পক্ষে, তাহা অতি উত্তম অবসর, পাচিকার পক্ষেও তাহা খুব সুবিধাজনক। কিন্তু এরূপ সুশৃঙ্খল এবং নিয়মপরতন্ত্রতা অধিকাংশ পরিবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌ দিদি রান্না করিয়া ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছেন, ঠাকুরপোর খোঁজ খবর নাই, অনেকক্ষণ পরে তিনি আসিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্নানই হয় নাই। যাহাহউক তাঁহাকে কোনওরূপে খাওয়াইয়া দিবার পর, আবার শিশুদের পালা উপস্থিত হইল। এইরূপে যাঁহার রন্ধনের পালা থাকে তিনি প্রায় বেলা দুইটার আগে মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যাপার শেষ করিয়া রন্ধনগৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন না। এবং যে রমণী পরিবারবর্গের এবম্বিধ খেয়ালের অনুবর্ত্তিণী হইতে কোনওরূপ ক্লেশ অনুভব করেন না, তিনিই আদর্শ কুলবধূরূপে বাচ্য হন। ইহার অর্থ এই যে নারীশক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা এত ক্ষুদ্র যে, রন্ধন ভিন্ন স্ত্রীজাতি যেন আর কোন কাজেরই উপযুক্ত নহেন।

জিনিষ পত্র যথাস্থানে শৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়া না রাখাতে অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং অনেক জিনিষ একেবারেই হারাইয়া যায়। অনেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র যত্নের সহিত রাখিয়া দেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় রাখিয়াছেন তাহা মনে থাকে না। এই জন্য রন্ধন সামগ্রী, শেলাইয়ের উপাদান, পুস্তক, কাপড় প্রভৃতি সকল জিনিষই প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ স্থানে রাখিয়া দিবার অভ্যাস করিবেন। প্রয়োজন মত উঠাইয়া লইয়া আবার কাজ শেষ হইলেই পুনরায় উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন। কিন্তু একজনে এরূপ করিলে কোন লাভ নাই, পরিবারস্থ সকলেরই এরূপ একটা সংকল্প থাকা আবশ্যক যে তাঁহারা যেখানকার জিনিষ সেইখানে রাখিবেন। বালকবালিকারা পড়িবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য যায়গায় বই লইয়া বসিল, তারপর কোন তামাসা দেখিবার জন্য বা কেহ ডাকিলে সেই খানেই রাখিয়া চলিয়া গেল, জনক জননী কদাচ এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় দিবেন না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পিতামাতা সন্তানদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন তাঁহারা স্বয়ং তদনুসারে চলিলে মৌখিক উপদেশ বেশী না দিলেও ক্ষতি হয় না, কিন্তু নিজেরা অন্যরূপ আচরণ করিলে সহস্র উপদেশ বা শাসনেও কোন ফল হয় না। গৃহসজ্জার উপকরণগুলির যেটা যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা শুধু সেই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করা উচিত। চব্বিশ ঘণ্টা শয্যাপাতা থাকিবে, আর সময় নাই অসময় নাই তাহার উপর শুইয়া পড়ার অভ্যাস ভাল নহে। ইহাতে বিছানা শীঘ্র শীঘ্র ময়লা হয়, এবং শ্রীভ্রষ্ট হয়। আফিসের কাজে রাশি রাশি কাগজ নাড়া চাড়া করিতে হয়, ঐ সকল কাগজ যদি ইতস্ততঃ থাকে, একজন কর্ম্মচারী যদি একখানি কাগজ হাতে করিয়া তাঁহার বন্ধুর সহিত স্থানান্তরে গল্প করিতে করিতে সেই খানেই তাহা ফেলিয়া আসেন, তবে তাঁহাকে কত মুস্কিলে পড়িতে হয়। আপন বাসগৃহকেও একখানি আফিস গৃহ মনে করিতে হইবে। এখানেও শিশুদের বোর্ডিং হাউস, বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। গৃহিনীকে এই আফিসের বড় কর্ত্রী বলা যাইতে পারে, গৃহের সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খলার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তাঁহার এমন শক্তি থাকা আবশ্যক যে তিনি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন। তিনি সকল বিষয়ে পরিবারে সকলের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।

তিনি স্বয়ং খুব বিনীতা, মিষ্টভাষিণী এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী হইবেন। শিক্ষা এবং সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকিবে, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করিবেন, যদি তিনি এই সকল গুণ বিশিষ্ট হন তবে সকলেরই হৃদয়ের উপর তাঁহার এমন একটী প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, যে কেহই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইবে না; অথচ প্রত্যেকেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত দেখিবেন। কিন্তু এরূপ আদর্শ গৃহিণী শুধু উপদেশ শুনিয়াই হওয়া যায় না, ইহার জন্য আশৈশব শিক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং বালিকাদিগকে শিশুকাল হইতেই এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিণী এবং সুজননী হইতে পারে।

আজ কাল অর্থাভাবের অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মাসিক দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারাও বলেন অভাব এবং অসচ্ছলতার মধ্যে আছেন; পঞ্চাশ ষাট টাকা বেতন ভোগী চাকুরীজীবীদের অবস্থা তাহা হইলে কত শোচনীয়! অবশ্য জিনিষ পত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ অভাব অনটন ভোগ করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আহার বিহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা অনাবশ্যক বাহ্যিক আড়ম্বরের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের এই বিলাসিতার ভাবকেই বর্ত্তমান অর্থকষ্টের একটা প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিরূপে অল্প আয়ে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালান যাইতে পারে আমরা ক্রমশঃ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

মিলন।

(১)

রতনগড়ে আজ উৎসবের ধূম লাগিয়াছে। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল। পুষ্পমাল্যে ও সুদৃশ্য তোরণে রাজপথ পরিশোভিত, আলোক মালায় সুসজ্জিত।

শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া আজ এই উৎসব। মোগল সেনাকে রতনগড়ের সৈন্যগণ অতুল বিক্রমে পরাজিত করিয়াছে, তাই এই উৎসব। সৈন্যদের মধ্যে অমরসিংহ অতুলনীয় সাহস ও কৌশল দেখাইয়াছেন। তাই পুরস্কার স্বরূপ রতনগড়ের রাণা তাঁহাকে সম্মানিত করিবেন। তাই চারিদিক হইতে রাণা, মহারাণাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁদের সাজ সজ্জায়, স্বর্ণখচিত পোষাকের ঔজ্জ্বল্যে রত্নখচিত তরবারির দীপ্তিতে দরবারগৃহ ঝলমল করিতেছে।

এই জাঁক জমকের মধ্যে অমরসিংহ একটি শুভ্র পরিচ্ছদ পরিয়া দরবারগৃহের এক কোণে বসিয়া আছেন। তাঁহার শ্বেত উষ্ণীষে একটি হীরক শোভা পাইতেছে। দরবারগৃহের এক পার্শ্বে রতনগড়ের রাণী, তাঁহার কন্যা মীরা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বসিয়া আছেন। তাঁহারা অমরসিংহের বিনয়নম্র মুখের সলজ্জ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিলেন, এই তরুণ যুবক কেমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাকে পরাজিত করিল! সন্তানস্নেহে তাঁহাদের মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রতনগড়ের রাণা আসন পরিগ্রহ করিয়া অমরসিংহকে আহ্বান করিলেন। সহস্র চক্ষু অমরসিংহের দিকে ফিরিল। সকলের প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার প্রশান্ত ললাট একটু রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তিনি নত মস্তকে রাণার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাণা বলিলেন, "অমরসিংহ, তুমি মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যে সাহস ও যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছ তাহা জানিয়া আমি অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, জন্মভূমির সেবায় তোমার জীবন যেন ধন্য হয়।" রাণা অমরসিংহের হস্তে একখানি রত্নখচিত তরবারি উপহার দিলেন। সভাস্থ সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

তরবারি হাতে লইয়া অমরসিংহ এক বার পার্শ্বে চাহিলেন। দেখিলেন দুটী কালো আয়ত চোখ তাঁহারই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া! তিনি চাহিবামাত্র

বালিকার মুখখানি লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল, চোখ দুটি নত হইয়া পড়িল। সেই ক্ষণিকের একটি মধুর দৃষ্টিতে অমরসিংহের নিকট এতদিন যাহা সমস্যাপূর্ণ ছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। আজ যশোলাভ করিতে আসিয়া তিনি একটি তরুণ হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া গেলেন। আনন্দে, গৌরবে তাঁহার বুক যেন ফুলিয়া উঠিল। আজ যে সম্মান লাভ করিলেন এ আনন্দ, এ গৌরব, সে জন্য নহে—আর একজন যে তাঁহার গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়াছেন ইহাই তাঁহার যশের সার্থকতা আনিয়া দিল।

দরবারের পর হইতে রাণা অমরসিংহকে সর্ব্বদা নিকটে ডাকাইয়া রাজ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার পরামর্শ করিতেন। একদিন বিশ্বস্ত গুপ্তচর আসিয়া জানাইল, যে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মোগল সেনা বিপুল আয়োজন করিতেছে। কখন যে রতনগড় আক্রমণ করিবে তার ঠিক নাই। তাই রাণা অমরসিংহকে সেনাপতির নীচের পদ প্রদান করিয়া সৈন্য দিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত রাখিতে আদেশ দিলেন। রাজ্যমধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। রাণা মহা চিন্তিত, এবার বুঝি আর রাজ্য রক্ষা হইবে না। এই পাঁচ হাজার মাত্র সৈন্য মোগলের সেই বিপুল সেনার সম্মুখীন হইবে কিরূপে? সেনাপতি এবং অমরসিংহের যুদ্ধকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া রাণা সংগ্রামের আয়োজনে রত হইলেন।

এই সময় টুকুর মধ্যে অমরসিংহ মীরাকে অনেকবার রাণার প্রাসাদে দেখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তাঁহাকে কতবার দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনো দিন একটী কথা বলেন নাই, কিংবা তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই। তিনি সামান্য সেনা—মীরা রাজকন্যা, রাজরাণী হইবার যোগ্যা। অমরসিংহ তাঁহার দিকে চাহিবেন,—এত কি তাঁহার ধৃষ্টতা!

অন্তর যখন ব্যাকুল হইয়া মীরার চরণে লুটাইবার জন্য কাঁদিয়া ফিরিত, তখন অমরসিংহ রুদ্ধ বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া বলিতেন, "ওরে মন, তোর এ কি দুরাশা! তোর সাহস দেখে আমি কম্পিত হই।"

তথাপি মন মানিত না, সে সেই আকুল দুরাশা লইয়াই বাঞ্ছিতের আশা পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে আশা নিরাশার খবর রাখে নাই।

তারপর কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে অমরসিংহ তাঁহার মানসপ্রতিমার হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন। সেদিন হইতে তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তিনি সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারী, আর তাঁহার জীবনের আলোক—রাজার কন্যা! সেদিন হইতে সকল সঙ্কোচ সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেল। মীরা যেন কত আপনার, যেন কত দিনের পরিচিত বলিয়া মনে হইল। অনন্ত কাল হইতে যুগে যুগে মীরা যেন তাঁহারই!

একদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীরা শুনিল, গতরাত্রের মধ্যেই কুড়ি হাজার মোগল সেনা রতনগড় বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। বিপদ আসিবে আসিবে করিয়াই যত চিন্তা. বিপদ সম্মুখে আসিলে যত ভয়, যত চিন্তা সব চলিয়া যায়। বিধাতা তখন সাহসে প্রাণ পূর্ণ করিয়া দেন। রাণারও তাহাই হইল। তিনি উৎসাহে পূর্ণ হইয়া সৈন্যদিগকে দেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখে উদ্বেগের চিহ্ন-মাত্র নাই, প্রশান্ত ললাটে চিন্তার রেখা মাত্র পড়ে নাই! সারাদিন অশ্বারোহণে তিনি নগরবাসী ও সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরিলেন। এবার সকলে মরণ পণ করিয়া বসিয়াছে। এবার হয় জীবন না হয় মৃত্যু!

প্রতিদিন বিপুল বিক্রমে রাজপুত সৈন্য মোগল সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগল সেনা কয়েক-বার পরাস্ত হইয়াও নড়িল না। রতনগড়ের ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে বিচ্ছেদ বেদনা। আজ যে নয়নের আনন্দদায়ক হইয়া আছে, কাল সে নাই। আজ যে বীর জন্মভূমি রক্ষার জন্য উৎসাহ-দীপ্ত বদনে সগর্ব্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে, কাল তাহার রক্তাক্ত দেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া! সে উৎসবময়ী রতনগড় আর নাই, সেখানে করাল কাল বিভীষিকা বিস্তার করিয়া আসিয়া দাঁড়াই-য়াছে। আর পারা যায় না, মান রক্ষা বুঝি আর হয় না। মোগল সেনা এইবার নগরে প্রবেশ করিল বুঝি! রাণা, সেনাপতি, অমরসিংহও বাছা বাছা সৈন্য লইয়া আজ শেষ যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আত্মসমর্পণ

অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল! আজ তাঁহারা হয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিবেন। বিদায় কাল উপস্থিত। রাণা মীরার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "মা. যদি আজ না ফিরি, যদি জন্মভূমির জন্য আজ প্রাণ দিতে হয়, যদি এই শেষ দেখা হয়, তবে তোমায় বলিতেছি যে তোমার ধাত্রীর সহিত হরিদ্বারে আমার গুরু স্বামী যোগানন্দের আশ্রমে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়ো।" তারপর রাণীর দিকে ফিরিলেন। রাণী বলিলেন, "যাও রণক্ষেত্রে, স্বাধীনতা লইয়া ফিরিয়ো নতুবা এখানেই তোমার সহিত সে লোকে যাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিব।" আর বলা হইল না। সেই বীরাঙ্গনার চক্ষুও অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল।

রাণা অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। পশ্চাতে সেনাপতি, তারপর অমরসিংহ। মীরা বাতায়নে দাঁড়াইয়া দেখিলেন। অমরসিংহের প্রতিভোজ্জ্বল নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত! তেজ ও সাহসে দীপ্ত মুখখানি আজ উৎসাহে ভরা!

মীরার বাতায়নের নীচ দিয়া যাইবার সময় অমরসিংহ একবার উপর দিকে চাহিলেন। সেই নিমেষের দৃষ্টিতে দেখিলেন মীরার ছলছল আয়ত নয়নদ্বয়—আর তার মধ্যে নিহিত সে কি হৃদয় ভরা প্রেম! প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ইহলোকে আর তো দেখা হইবে না—আজ শেষ দিন! তৎক্ষণাৎ অশ্বকে কশাঘাত করিয়া তিনি ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

দিবসের শেষ সূর্য্যরশ্মির সহিত সংবাদ আসিল. রাণা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর আশ্রয় লইয়াছেন; রাজপুত সৈন্য পরাজিত। রাণার দেহ মোগল সেনার হাতে পড়ে নাই। রাত্রিকালে অমরসিংহ ও কয়েকটি সৈন্য তাঁহার দেহ বহন করিয়া প্রাসাদে আনিলেন।

রাণী রক্তবস্ত্রে শোভিত ও সিন্দুর চন্দনে ভূষিত হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধাত্রীর হাতে মীরাকে অর্পণ করিয়া চিতায় উঠিলেন। মাতাপিতার চিতার পার্শ্বে মীরা আবার অমরসিংহকে দেখিলেন। বেদনায়, নিরাশায়, আবেগে, আকুলতায় ক্ষুদ্র হৃদয় স্থির থাকিতে পারিল না। মীরা ধাত্রীর কোলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

* * * * * *

তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মীরা সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিয়া সন্ন্যাসীর শিক্ষায় হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছেন। আশ্রমের তাপসদিগের সহিত মিলিত হইয়া যখন তিনি ধর্ম্মালোচনায় নিবিষ্ট হইয়া যাইতেন তখন তাঁহার পবিত্র মুখের স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া স্বামী যোগানন্দ তৃপ্ত অন্তরে ভাবিতেন. তাঁহার আশ্রম স্থাপন সার্থক হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার উপর এই সব তাপিত নরনারীর প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন।

প্রকৃতির সেই রম্যনিকেতনে থাকিয়া মীরা প্রকৃতিকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। আশ্রমের গাছপালা, ফুল পাখী সব তাঁহার কত প্রিয়! কিন্তু মাঝে মাঝে কাহার কথা মনে পড়িয়া অন্তর হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিত, কেহ তাহার সন্ধান পাইত না। বাতাসে সে নিশ্বাস মিলাইয়া যাইত।

একদিন অপরাহ্নে মীরা ফুল গাছে জল দিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমরসিংহ। সরমে, পুলকে, বেদনায় মীরার দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। এত কাছে এত নিকটে অমরসিংহকে তিনি কখনো দেখেন নাই। চারিদিক তখন নীরব, নিস্তব্ধ. সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়াছে—পাখীরা কুলায় চলিয়াছে, আশ্রমের গাভীগুলি গলার ঘণ্টায় টিং টিং শব্দ তুলিয়া ঘরে ফিরিতেছে। অদূরে নদীর কলধ্বনি শুনা যাইতেছে।

অমরসিংহ মীরার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, "মীরা, আর আমাকে দূরে রেখো না। আমরা দুজনে মিলিয়া জগতের কাজ করি, এসো।"

মীরার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা পড়িয়া অমরসিংহের হাত ভিজাইয়া দিল। মুখে একটিও কথা সরিল না!

অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভা ঝরিয়া এই দুইটি মিলনাকাঙ্ক্ষী আত্মাকে মহিমা-মণ্ডিত করিয়া তুলিল!

শ্রীমতী——(বি, এ)।

৺ বৈরামজী মালবারি।

গত ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার সিমলা সহরে বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও সমাজসংস্কারক বৈরামজি মালবারি মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে মালবারি মহাশয়ের ন্যায় সমাজসংস্কারক এদেশে আর নাই। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সুসন্তান হারাইল, ভারতনারী এক পরম সুহৃদ হারাইলেন। বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের উদারচেতা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মালবারির বিয়োগে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। গত আষাঢ় মাসের "সোপান" পত্রিকা হইতে আমরা ইঁহার জীবনী সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কৃতকার্য্যতা লাভের পথ নিতান্ত দুর্গম ও দুরারোহ, উহাতে পদে পদে পদস্খলন হয়। কেহই কোনও দিন হঠাৎ উহার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। কোন্ বালক বর্ণমালা পরিচয়ের পরদিনই বিদ্যাসাগর হইয়াছে? কোন্ সৈন্য সৈনিকবেশ ধারণের পরদিনই অমর, কর্ণ বা উদয় সিংহের মত বীর হইয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে? পরিশ্রম, উদ্যম ও অধ্যবসায়, এই তিনের সাহায্য না লইয়া এই বীরভোগ্য পৃথিবীতে কেহই কোন দিন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই।

*　　*　　*

ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভাবে কিরূপে মানব সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে তাহা বৈরামজী মালবারি নামক সম্ভ্রান্ত পারসীর জীবনবৃত্তান্তে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তাঁহার জীবন সকলেরই অনুকরণীয়।

খ্রীষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বরদার গাইকোয়ারের অধীনে কুড়ি টাকা বেতনের একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার নিঃসহায়া পরমুখাপেক্ষিণী জননী পুত্রের রক্ষাভার ন্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয়বার স্বামী পরিগ্রহণ করেন। তৎপর বালক সুরাটের এক ক্ষুদ্র পাঠশালায় প্রেরিত হইল। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পঁচিশের ঊর্দ্ধ ছিল না। গুরু মহাশয় বালকদিগকে পার্সি ধর্ম্মসংক্রান্ত কবিতা পাঠ করাইতেন। ঐ কবিতা-বলী প্রাচীন পার্সি ভাষায় লিখিত। গুরু মহাশয় ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের কেহই উহার অর্থ জানিত না। যে বালক আবৃত্তিকালে সামান্য ভুল করিত শিক্ষক মহাশয়ের হস্তস্থিত সুদীর্ঘ নিষ্ঠুর বেত্রদণ্ড উপর্য্যুপরি তাহার পৃষ্ঠদেশে পতিত হইত। ঐ দৃশ্য দেখিয়া অধিকক্ষণ অনার্দ্রনয়নে অবস্থান করা দুঃসাধ্য ছিল। তিনি কবিতা পড়াইতে পড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ছাত্রদ্বারা সুতা কর্ত্তন কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতেন। ইহাই অবৈতনিক ছাত্রদিগের বেতন। বৈরামের ভাগ্যে এই স্কুলই ছিল। এই ভাবে এই স্কুলে দুই বৎসর অবস্থানের পর গুজরাটী ভাষা শিক্ষার্থ তিনি অন্য আর এক স্কুলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এই শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেতন গ্রহণ করিতেন না। তবে কখনও কখনও ছাত্রগণ মুষ্টিমেয় তণ্ডুল এবং পূজার ফুল চয়ন করিয়া দিত। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। যাহারা ইহা প্রদান করিতেও অক্ষম ছিল তাহারা তাঁহার গৃহকর্ম্ম করিয়া দিত। কেহ রন্ধন করিত, কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত, আবার কেহবা সম্মার্জ্জনী সংযোগে গৃহ পরিষ্কার করিত।

বিদ্যালয়গৃহ নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল। প্রত্যেক বালকই মেজেয় আসন পাতিয়া নাতিপ্রশস্ত চতুষ্কোণ কাষ্ঠফলকে একখণ্ড ক্ষুদ্র যষ্টি সংযোগ করিয়া বর্ণবিন্যাস শিখিত।

বৈরাম অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়া সুরাট নগরস্থ অন্য এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। তত্রত্য শিক্ষক মহাশয় হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ও মূর্ত্তির ভীষণতা নিবন্ধন "ছাত্র-কালান্তক" নামে অভিহিত হইতেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভ্রম প্রমাদের জন্যও তিনি বেত্রাঘাতের ত্রুটি করিতেন না। কোনও বালকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবার সময় তাহার সকরুণ বিলাপধ্বনি অস্পষ্ট করিবার মানসে অন্যান্য বালকগণকে পার্সি ভাষায় লিখিত স্তবমালা তারস্বরে আবৃত্তি করিবার জন্য আদেশ দিতেন। তরুণবয়স্ক বৈরাম প্রথমে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন। যথাসাধ্য চেষ্টা

সত্ত্বেও সেই নির্দ্দয়-হৃদয়ের সন্তোষ বিধান করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তাঁহার স্নেহশীলা জননীই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিলেন। বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি জননীর ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার জননী সমুদয় বিষয় অবগত ছিলেন, তাই অধ্যবসায়ী হইবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহসূচক বাক্যে উত্তেজিত করিতেন। তিনি পুত্রকে ধর্ম্মভীরু, সত্যবাদী ও পরিশ্রমী করিবার অভিপ্রায়ে যথোচিত শিক্ষা দান করিতেন।

গুরু মহাশয় অত্যন্ত নির্দ্দয়-প্রকৃতির লোক হইলেও পার্সি ভাষায় তাঁহার অগাধ বিদ্যা ছিল। বৈরাম "সাহনামা" ও অন্যান্য পার্সি কাব্যগ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী ও অধ্যয়নানুরাগী ছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিকুলের গাথা অধ্যয়নে অতিশয় উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। উহাতে যে সমুদয় রাজা মহারাজা ও বীরপুরুষের জীবন-চরিত ও কার্য্যাবলী বর্ণিত থাকিত তাঁহার নিজেকেও কল্পনা নেত্রে সেই শ্রেণী ভুক্ত করিয়া সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতেন।

তিনি দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার স্নেহশীলা জননী মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন। বৈরাম মাতৃশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন বন্ধুবান্ধবশূন্য ও পিতৃমাতৃহীন বালক। তাঁহার পালক পিতা অভাবের তাড়নায় তাঁহাকে সাহায্য দানে বঞ্চিত করিলে, সেই তরুণ-বয়স্ক বালক স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। দ্বাদশ বালক প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াইয়া যৎসামান্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেন।

এই সময়ে একজন সহৃদয় খৃষ্টধর্ম্মযাজক তাঁহার দারিদ্র্য ও শ্রমশীলতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অবৈতনিক ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। তিনি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া ইংরেজী পুস্তকাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। তৎসাময়িক ছাত্রবন্ধুদিগের মধ্যে বৈরামজী অপেক্ষা কঠোর পরিশ্রমী আর কেহই ছিল না। তরুণ-বয়স্ক পার্সি যুবক মিশন বিদ্যালয়ের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক কলেজে প্রবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষায় বোম্বাই যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উপার্জ্জন হইতে সামান্য কিছু সঞ্চিত হইত। এদিকে তাঁহার সেই উদারচরিত ধর্ম্মযাজক বন্ধুও তাঁহাকে আবশ্যকমত আর্থিক সাহায্য করিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। এক ব্যয়কুণ্ঠ কুসীদজীবী বালকের বিদ্যানুরাগদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার হস্তে বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! দুঃখিত হইও না, তোমার সততা-ব্যঞ্জক প্রশান্ত মুখচ্ছবিই অর্থের জামিন।" বলা বাহুল্য, ভগবানের কৃপায় স্বীয় দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, তিনি তাহার কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়াছিলেন।

তিনি অনতিবিলম্বেই বোম্বাই নগরীতে কুড়ি টাকা বেতনে এক শিক্ষকতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন এবং ষাট টাকার পদে উন্নীত হইলেন। তিনি এখন ধনবান্। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি গৃহশিক্ষকতা কার্য্য করিয়া মাসে একশত পঞ্চাশ টাকা উপায় করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া লর্ড টেনিসন্ (Lord Tennyson) প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ইংরেজ কবিদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। এই খানেই মালবারির সুখজীবনের প্রভাত আরম্ভ। তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত পুস্তকাবলী ধনাগমের পক্ষে অনুকূল হইল। তৎকৃত Gujrat and the Gujraties নামক গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তিনি Indian Spectator নামক বার্ত্তাবহ পরিচালন করিতেন।

গৌরবের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াও মালবারি পার্থিব সম্পদের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। দয়ার সাগর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় এই পার্সি যুবকও তাঁহার সমগ্র জীবন এবং লেখনী ভারতীয় নিরাশ্রয়া বিধবাবালাদের কল্যাণে উৎসর্গ করিলেন। তিনি যুক্তিতর্ক প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশ বাসীদের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহ প্রচলন রহিত করেন।

তাঁহার যত্নে বোম্বাই সহরে "সেবাসদন" নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ এই আশ্রমে যোগদান করিয়া রোগশোকপীড়িত নর নারীর সেবা করিতেছেন। তাঁহারই যত্নে হিমালয় পর্ব্বতোপরি ধরমপুর নামক স্থানে আমাদের পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের নামে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শত শত রোগী এই আশ্রমে বাস করিয়া সাংঘাতিক যক্ষ্মাব্যাধি হইতে রক্ষা পাইতেছে। অন্তরে সদাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ থাকিলে— আজ যাহারা নগণ্য ও অসহায়— তাহাদের দ্বারাও জগতের কত মহৎ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে!"

বন্দী।

(১)

আমি আছি চুপে চুপে,
সকলেরই "পর" রূপে,
তুমি এসে কোথা হ'তে দেবতার বেশে,
এ বিদ্রোহী চিত্তে মম
দয়া স্নেহ সুধা সম,
সহসা ঢালিয়া দিলে, বারি মরু দেশে!

(২)

আমি ক্ষুদ্র তাহে স্বার্থ
করিয়াছে অপদার্থ,
কি আছে তোমাতে তাহা দেখি নাই চেয়ে,
সে উপেক্ষা অবহেলা
তুমি ভেবে "ছেলে খেলা"
অনা'সে আকুল প্রাণে কাছে এলে ধেয়ে!

(৩)

তুমি যে গো মহনীয়,
জগতের লোভনীয়,
সৌভাগ্য সম্পদ সাধি লুটিছে চরণে,
কোথা ছিনু আমি দীন,
উপেক্ষিত চির দিন,
আমারে খুঁজিয়া এত দিলে বা কেমনে?

(৪)

এই অযাচিত স্নেহে,
তোমারি মঙ্গল গেহে,
বন্দী আমি! বন্দী আমি জীবন মরণে,
বুঝিয়াছি বিশ্বময়,
কেবলি "মানুষ" নয়,
দেবতাও আছে হেথা অধম তারণে।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের

জীবন চরিত। *

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী লিখিবার উদ্যম এই প্রথম। গ্রন্থকার কোনও পুস্তক হইতে এই জীবনীর উপকরণ প্রাপ্ত হন নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি গ্রন্থকারের ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ গ্রন্থের পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা ইনি আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। এমন লোকই জীবনী লিখিবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তা' বলিয়া গ্রন্থকারের ভক্তি অন্ধ ভক্তি নহে। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের কালো দিকটাকে ঢাকিতে তিনি একটুও চেষ্টা করেন নাই।

আর একটি কারণে এ পুস্তকখানিকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি। দেশে একটি ভাল হাওয়া আসিয়াছে;

---

* পারস্যভাষাবিৎ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ লিখিত সমালোচনা। বেঙ্গল ন্যাশনেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। লোটাস লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা।

আমরা আমাদের সমসাময়িকদেরও শ্রদ্ধা দিতে শিখিয়াছি। কেবল প্রাচীনদের লইয়া গৌরব করা রক্ষণশীল দেশের লক্ষণ। তেমনি আবার সাহিত্যে বা দেশের সেবায় যাঁহারা নেতৃস্থানীয় বা সর্ব্বজনপূজ্য, শুধু তাঁহাদেরই সম্মান দেওয়া ও ছোটদের উপেক্ষা করা,—ইহাও নির্জ্জীব দেশের লক্ষণ। বাঙ্গলা দেশ সজীব হইয়া বুঝিয়াছে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের সামান্যতম সেবাও করিয়াছেন, অথবা বিমল অনুরাগের সহিত দেশের সাহিত্যকে একটুকও অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আমাদের পূজ্য; তাহারও জীবনের ইতিহাস সযত্নে রক্ষা করা, তাঁহাকে বিস্মৃতি হইতে বাঁচাইয়া রাখা, আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলার প্রথম শ্রেণীর কবি না হইলেও বাঙ্গালীর উপর তাঁহার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়। এক সময় তাঁহার কবিতা খুবই প্রচলিত ছিল। তাঁহার 'অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল' এই সুমধুর সঙ্গীত ললিত রাগিণীতে কত গৃহে প্রত্যুষে গীত হইয়া গৃহীর ও গৃহের শিশুদিগের হৃদয়ে বিমল ভগবদ্ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়াছে। বালকবয়সে চপলতা, হঠকারিতা, উদ্যমহীনতা প্রকাশ করিয়া কতবার আমরা অভিভাবকের নিকট হইতে মৃদু ভর্ৎসনার সহিত 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি,' 'কমল তুলিতে যদি করহ,' 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ' প্রভৃতি উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। কতবার বিদ্যালয়ে সহপাঠীদিগের সহিত প্রণয়স্থাপন করিতে গিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া অনুযোগ সূত্রে 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?' এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। যাঁহার উক্তি বাঙ্গালীর প্রতিদিনের কথাবার্ত্তার মধ্যে, গোপন প্রণয়-লিপির মধ্যে, গুরুজনের উপদেশ ও ভর্ৎসনার মধ্যে এমন করিয়া ব্যঞ্জনে লবণের মত প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি যে অমর হইবার উপযুক্ত তাহাতে সংশয় কি?

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস ঘটনাবহুল নহে; যে দুএকটি সামান্য পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার কবিতা রচনারও বিশেষ কিছু নিকট সম্পর্ক নাই। চরিত আখ্যানের পক্ষে এগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক। গ্রন্থকার লিপি কৌশলে এ বাধা অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ঘটনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবটি আমাদের সম্মুখে বেশ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকখানিতে আমরা এমন একটি সরল, তেজস্বী নিঃস্পৃহ জীবনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যাহাকে সকল দোষ সত্ত্বেও গভীর শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে 'আমার আর অধিক অর্থের প্রয়োজন নাই' বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করা, কুটুম্ববাড়ী হইতে দুইবার একই উপহার লইব না বলিয়া গুড় ফিরাইয়া দেওয়া, খেয়ারীর দেখা না পাইয়া খেয়াপারের পয়সা নৌকার গলুইয়ের উপর রাখিয়া যাওয়া,—এই সকল তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়া কি সুন্দর চরিত্র ফুটিয়া বাহির হইতেছে! বস্তুতঃ পুস্তকখানি পড়িয়া গ্রন্থকারকে এই জন্য ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয় যে তিনি এমন একজন সাধাসিধে বাঙ্গালীকে চিনাইয়া দিলেন যাঁহাকে বাঙ্গলার বালক বৃদ্ধ যুবা কেহই ভাল না বাসিয়া পারিবে না, অথচ যিনি এতদিন লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহার কবিতা পড়ি বা না পড়ি, তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া চিরদিন শ্রদ্ধা অর্পণ করিব। প্রাদেশিক জন্মভূমি, বনজঙ্গলে ঘেরা বাড়ী, গ্রাম্য বেশ ভূষা, মোটা কাপড়, সাদাসিদে চাল এ সকল কিছু না ছাড়িয়াও মানুষ যে মনন-শক্তিতে বড় হইতে পারে সমালোচ্য গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে পাঠক তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। তাঁহার জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এমন অনেক রহিয়াছে যাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইলে বালক ও যুবকদিগের সম্মুখে চরিত্রের মহৎ আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারিবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বীয় 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন (॥৶০ পৃঃ) "বহুদিন পূর্ব্বে আমার ইচ্ছা ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর নাম দিব "বাঙ্গালার হাফিজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।" পরে দেখিলাম, তিনি সাদী ও অন্যান্য কবির যেরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু তাঁহাকে হাফিজ বলা চলে না।' আমরাও দেখি-

য়াছি, কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক কবিতায় হাফিজেরই নাম আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সে সকলে হাফিজের প্রভাব অপেক্ষা সাদীরই প্রভাব অধিক। গ্রন্থকার (৬৮—৭৯ পৃষ্ঠায়) যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে। এ দেশের 'হিতোপদেশের' মত সংসার পথে চলিবার উপদেশ সাদী অনেক রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভাবশতঃকে সাদীর সেই সকল উপদেশের ভাবই অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। যে কবিতাগুলির ভাব কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব, তাহারও অধিকাংশে সাদীরই ছাপ লাগিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

কি কারণ, দীন, তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ক্লান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
মনে ভেবে বিষম বিরহ-রিপু ভয়,
হাফেজ বিমুখ কেন করিতে প্রণয়?

এ কবিতাটি যে কৃষ্ণচন্দ্রের হাফিজ পাঠের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারও প্রথম ছয় পংক্তির মধ্যে হাফিজের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল কাঁটা ও কমলের (হাফিজের উক্তিতে গোলাপের) উপমাটি লইয়া। নতুবা ভাব সম্পূর্ণরূপে সাদীর। সাংসারিক কৃতকার্য্যতার বা সুখলাভের পথ বলিয়া দেওয়া হাফিজের বিশেষত্ব নয়, সাদীরই বিশেষত্ব। হাফিজ গোলাপে কণ্টকের উপমা প্রেমিকের জীবনের যাতনার তুলনা দিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়াছেন; সংসারে সুখের মূল্য যে দুঃখ, তাহার তুলনা দিবার জন্য ব্যবহার করেন নাই। শেষ দুই পংক্তির ভাব ও ভাষা দুইই হাফিজের মত।

বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র হাফিজকে জীবনে যত রাখিয়াছিলেন, কবিতায় তত রাখেন নাই। সাদীর অনুপ্রাণনে পূর্ণ হইয়া যখন তিনি লেখনী চালনা করিতেন তখনও যে তিনি কবিতার শেষে হাফিজেরই নাম ব্যবহার করিতেন, ইহা তাঁহার হাফিজের সহিত একান্ত একাত্মভাবের পরিচয়। তাঁহার জীবন যেন হাফিজময় হইয়া গিয়াছিল, তাই উত্তমপুরুষের পরিবর্ত্তে হাফিজের নাম ব্যবহার করাও স্বাভাবিক হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, কৃষ্ণচন্দ্রের ভাব সাদীর, কিন্তু স্বভাব হাফিজের।

হাফিজকে যে কৃষ্ণচন্দ্র জীবনে রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরলতা, নিঃস্পৃহতা, নির্জ্জনতায় অনুরাগ, এ সকল হাফিজের স্বভাবেও ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবেও ছিল। প্রেমিকের জীবনের সংগ্রাম, উচ্ছ্বাস, বেদনা উভয়ের কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ের জীবনে ভাবের তন্ময়তা ও মত্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। হাফিজ বলিয়াছেন, 'আমি সুরাপায়ী, আমি ক্ষিপ্ত, আমি দুরাচার, আমি নয়নভঙ্গীর খেলা করি। কিন্তু এ নগরে (অর্থাৎ প্রেমিকদিগের রাজ্যে) আমার মতন নয় এমন লোকই বা কোথায়?" শত শত কবিতায় তিনি আপনাকে সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, তিনি অতি পবিত্র-চরিত্র ও বিশুদ্ধাচার ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার এ সকল উক্তি রূপক মাত্র। রূপক হইলেও অনেকে তাঁহার কবিতাগুলিকে লৌকিক অর্থে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ছয় শত গজলের মধ্যে যেটী শব্দঝঙ্কারে ও ভাবের তন্ময়তায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সেই 'তাজঃ ব-তাজঃ নও ব-নও' এক সময়ে ইউফ্রেটিসের তীর হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, শুদ্ধাত্মা সুফী ফকীরদিগের ধর্ম্মোৎসবে ও রাজপ্রাসাদের সুরা-উৎসবে সমভাবে গীত হইয়াছে।

বোধ হয় প্রাচ্যভূমিতে মানুষের স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে সে শুধু ভাব লইয়াই সন্তুষ্ট হয় না, ভাবের বাহ্যপ্রকাশটিও যথেষ্ট মাত্রায় না হইলে অন্তরে অতৃপ্তি অনুভব করে, এবং সে অপূর্ণতা পূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়। যতক্ষণ না স্নায়ুমণ্ডলী চরম উত্তেজিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, ততক্ষণ অবিরাম নৃত্য, লম্ফ,

গান, দুদিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া লাটিমের মত ঘোরা, এসকল উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষ ঐ অতৃপ্তি দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। প্রেমিকের বাহ্য লক্ষণ যে উন্মাদ, তাহা সুরাপানে এ সকল অপেক্ষাও সহজে লাভ করা যাইবে বলিয়া কত সাধু ব্যক্তি সুরাপান অভ্যাস করিয়াছেন। এই পথে চলিতে চলিতে শেষে তাঁহারা প্রেমসুরাপানে ও সত্যকার সুরাপানে, প্রেমের মত্ততায় ও সুরার মত্ততায় আর ভেদ করিতে পারিতেন না! অনেক হাফিজ-ভক্ত এইরূপে সুরাপান অভ্যাস করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সুরাপান অভ্যাসের কারণও (অন্ততঃ আংশিকরূপে) এই ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। এবিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমরা এক মত।

'সূফী কবিদিগের স্বভাবসুলভ জিদ ও প্রতিহিংসার ভাবও তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছিল,' গ্রন্থকারের এই উক্তির সঙ্গে কিন্তু আমরা সায় দিতে পারিলাম না। দুই কবির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরস্পরকে দু একটি খোঁচা দেওয়া,—ইহা শুধু সূফী কবিদিগেরই বিশেষত্ব ছিল না, পারস্য-দেশীয় অন্যান্য কবিরও ছিল। শুধু পারস্যদেশের কথা বলি কেন, আমাদের কালিদাসেরও ছিল; পাঠক 'দিঙনাগানাং পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্' স্মরণ করুন। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত 'প্রতিহিংসার ভাব' সূফী কবিদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত বলিয়া তো মনে হয় না। গ্রন্থকার কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের যে দুটি ঘটনা তাঁহার প্রতিহিংসা-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে দুটিও তাঁহার মস্তিষ্কবিকার জনিত আকস্মিক ধৈর্য্যচ্যুতিরই দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে বৈরভাব পোষণ না করিলে তাহাকে প্রতিহিংসার ভাব বলা যায় না।

যাহা হউক, এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কেহই গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার সংগৃহীত উপকরণগুলি যতদূর সম্ভব নিপুণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন ও কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের উপর যতদিক হইতে আলোকপাত করা সম্ভব, তাহার একটিও উপেক্ষা করেন নাই। গ্রন্থের ভাষা লালিত্য ও গাম্ভীর্য্য উভয়গুণে অলঙ্কৃত। স্থানে স্থানে গ্রন্থকার যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তক খানি বাঙ্গালার জীবনীসাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার উপযুক্ত।

ফরাসী শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিতে গিয়া কয়েক স্থানে একটু একটু ভুল হইয়াছে, সেগুলি পুনঃমুদ্রণকালে সংশোধিত হইলে ভাল হয়। ৩১ পৃষ্ঠায় সাদীকে হাফিজের 'পিতৃব্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; পিতৃব্য না হইয়া 'মাতুল' হইবে।

সৈয়েদা নফ্‌সিয়া।

তাপসদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তির সমাধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থল;—পুরুষের মধ্যে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী (রাঃ) এবং রমণীর মধ্যে হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়া।

সৈয়েদা নফ্‌সিয়া হিজরী ১৩৪ অব্দে পবিত্র মদিনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি প্রথম কোরান শরীফ শিক্ষা করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সহিত জ্ঞান-লিপ্সাও বলবতী হইয়া উঠে, অচিরে তিনি বিশাল হাদীস সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হাদীস সমুহ কেবল পাঠ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন নাই, প্রত্যেকটি হাদীস কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। একটি হাদীসও তিনি কণ্ঠস্থ করিতে বাকি রাখেন নাই। মোসলেম রমণী সমাজে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় না।

বাগ্দাদের খলিফা আবু জাফর মন্সুর হিজরী ১৫০ অব্দে হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পিতা মহাত্মা হাসানকে মদিনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। হাসান হজরত আলীর বংশধর ছিলেন।

এই বৎসর প্রসিদ্ধ ইমাম জাফর সাদেকের পুত্র ইস্‌হাক মোতমানের সহিত ১৬ বৎসর বয়সে সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইস্‌হাক মোতমান হজরতের বংশাবতংশ এবং বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি সৈয়েদা নফ্‌সিয়াকে মক্কা শরীফে লইয়া যান।

হিজরী ১৫৬ অব্দে আরব দেশে রাজনৈতিক গগনে কাল ছায়ার রেখাপাত হয়। তাহার ফলে বাদীদের খলিফাগণ হজরত আলীর বংশাবলীর বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন। এই মনোমালিন্যের শেষ পরিণাম অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পিতা বৃদ্ধ হাসান সমস্ত ধন-সম্পত্তি সহ কারারুদ্ধ হন!

কিন্তু দুই বৎসর গত হইলে হাসানের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। ১৫৮ অব্দে খলিফা মন্‌সুর কাল-কবলিত হইলে, তদীয় পুত্র মেহ্‌দী সিংহাসনারোহণ করিলেন। খলিফা মেহ্‌দী হাসান্‌কে তাঁহার ধন সম্পত্তি সহ মুক্তি প্রদান করিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব পদে বরণ করিয়া পিতৃকৃত অন্যায়াচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। হাসান অতীব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। বিদ্যা-বুদ্ধি ও সততায় তিনি তৎকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি দশ বৎসর খলিফা মেহ্‌দীর মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৮ সালে খলিফা মেহ্‌দী হজ্জ করিতে যাত্রা করিলে, বৃদ্ধ হাসানও তাঁহার সহিত হজ্জ করিতে গমন করেন; কিন্তু পথিমধ্যে হাজর নামক স্থানে ৮৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পিতৃহীনা হইয়া সৈয়েদা নফ্‌সিয়া স্বামীসহ মিশরে গমন করেন। তিনি সেই স্থানেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়া মিশরে পদার্পণ করিতেই তাঁহার গুণগ্রামের বিষয় গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অধিকন্তু তিনি শেষ পয়গম্বরের বংশীয় বলিয়াও সমস্ত মিশর তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িল। মিশরের শাসনকর্ত্তা মহাত্মা ইস্‌হাক মোতমানের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিলেন। এতদ্ব্যতীত দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও খলিফা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা সহসা অতুল সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেও আপনাদের দীনবেশ পরিত্যাগ করেন নাই। ধন দ্বারা তাঁহারা দরিদ্র, ভিখারী, অনাথ এবং বিধবা নারীদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের এই সময়ের দয়া-দাক্ষিণ্যে সহর হাস্য-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইমাম শাফি যতদিন মিশরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি সৈয়েদার সমীপে উপস্থিত হইয়া হাদীস শ্রবণ করিতেন। ইমাম শাফি তৎকালে অদ্বিতীয় বিদ্বান্‌ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, অথচ তিনিও সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন।

হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার উপর ইমাম শাফির এতই ভক্তি ছিল যে, ২০৪ অব্দে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, তখন বলিয়াছিলেন,—"আমার মৃত্যু হইলে সহরের শাসনকর্ত্তা যেন আমার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং প্রথমে দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়া যেন আমার জানাজা * পড়েন। ইহাতে সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার জ্বলন্ত গৌরব প্রকাশ পাইতেছে।

হিজরী ২০৮ সালের রমজান মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে এই রমণী-কুল-রাজ্ঞী স্বর্গারোহণ করেন। তদীয় স্বামী ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পবিত্র দেহ মদিনায় লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করেন। কিন্তু মিশরবাসীগণ নিবেদন করিল,"মহাত্মন্‌, আপনি আমাদিগকে খোদার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" অতঃপর মিশরের দারাবুস্‌ সারা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

মিশরের ফাতেমা, আব্বাসীয়া এবং চরকাসী প্রভৃতি বংশীয় নরপতিগণ সৈয়েদার সমাধির সন্নিকটে সমাধিস্থ হওয়া অভয় ও পরিত্রাণের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বহু খলিফা ও আমীরের দেহ হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পার্শ্বেই সমাধিস্থ হইয়াছে। সংসারবিরাগী সাধু সাধক প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সর্ব্বদাই তদীয় সমাধি পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন।

৬২৫ অব্দে খলিফা মালেক আশরফ ইঁহার সমাধির সহিত একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তুত করতঃ তথায় একটি অবৈতনিক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান।

---

* অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে জানাজা বলে। মৃত্যু হইলে, এইরূপেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই সমাধি ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ৭৩৫ সালে মালেক নাসের উত্তমরূপে এই সমাধি সৌধের সংস্কার সাধন করেন এবং তাহার সহিত একটি বারান্দা (অলিন্দ) সংযোগ করিয়া দেন।

৭৭৩ অব্দে সায়েফুদ্দিন কাইতাব মিশরের সিংহাসনারোহণ করিয়া দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার জন্মোৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এই মহোৎসবে মুসলমান সমাজের সকলই, এমন কি বহুদূর দেশ হইতে বহু লোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। খলিফার পক্ষ হইতে সকলকেই উত্তমরূপে আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হইয়াছিল।

নারীশ্রেষ্ঠা সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার সমাধি স্থানের বহু অলৌকিক ক্রিয়ার কথাও জনসমাজে প্রকাশিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব।

৯২৬ অব্দে মহিরদ্দিন নামক জনৈক বণিকের সাত বৎসর বয়স্ক একটি বালক ক্রীড়া করিতে করিতে গৃহ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে গিয়া পড়ে। সেই বালকের মস্তকে এরাক দেশীয় একটি বহুমূল্য জরীর টুপী ছিল। বালক ক্রীড়ামোদে বিভোর হইয়া ক্রমে ক্রমে আরও দূরে গমন করে এবং এক পটাস বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে যাইয়া উপনীত হয়। লোভী পটাসবিক্রেতা জরীর টুপী হস্তগত করিবার লালসায়, তাহার হাবসী গোলাম সহ সেই বণিক-নন্দনকে ছলে-কৌশলে ভুলাইয়া সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার সমাধির নিকটে লইয়া যায় এবং তথায় এক সঙ্কীর্ণ স্থানে বালককে ছুরিকাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া টুপী লইয়া পলায়ন করে।

এদিকে বণিক সন্তানকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিল। কিন্তু যখন চারিদিকে অন্বেষণ করিয়াও বালকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বণিকের মনে ভয় হইল—বুঝি টুপীর লোভে কোন দুষ্ট লোক বালককে হত্যা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বণিক সহরের বিশেষ বিশেষ দোকানদারদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমার একমাত্র শিশু সন্তান হারাইয়া গিয়াছে। তাহার মাথায় জরীর টুপী ছিল। আজ কেহ তোমাদিগের নিকট জরীর টুপী বিক্রয় করিতে আসিলে, তখনই আমাকে সংবাদ দিবে।"

সন্ধ্যাকালে সেই ব্যক্তি জরীর টুপী বিক্রয় করিতে এক দোকানে উপস্থিত হইল। উহার মূল্য একশত টাকা স্থির করিয়া দোকানদার বলিল, "আমি তোমাকে কখনও দেখি নাই, সুতরাং চিনিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ ইহা অপহৃত দ্রব্য কি না, তাহাই বা কি করিয়া জানিব? অতএব তুমি নগরে কোন পরিচিত লোকের দ্বারা তোমার কথার প্রমাণ দাও।" বিক্রেতা তখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দোকানদার তাহার এই ভাব দর্শনে সন্দেহযুক্ত হইয়া সত্বর এই সংবাদ পুত্রহারা বণিকের নিকট প্রেরণ করিল। বণিক দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রের টুপী দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল। তখন শান্তিরক্ষক চোরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পীড়নের ফলে, বালককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সে স্বীকার করিল।

অবশেষে চোর সহ হত্যাভূমিতে গমন করতঃ সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, বালক তখনও জীবিত আছে। বণিক পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, বালককে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে ফিরিল, অল্প কয়েকদিনের চিকিৎসাতেই বালক আরোগ্যলাভ করিল।

বালক স্বীয় মুখে প্রকাশ করিল,—"আমাকে ছুরি মারিয়া ফেলিয়া গেলে, এক সাদা কাপড় পরা রমণী আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; আর আমার শরীরের রক্ত ও ধূলিবালি পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "বাছা, তুই কোন চিন্তা করিস্‌নে, সন্ধ্যাকালে তোকে তোর মার নিকট পাঠাইয়া দিব।" আমি তাঁহার স্নেহমাখা মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

(কোহিনুর)

পথ্য ও পরিচর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্মারকলিপি বা নোটলিখিবার প্রণালী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে কঠিন রোগে শুশ্রূষাকারী রোগীর অবস্থা লিখিয়া রাখিয়া চিকিৎসককে জানাইলে ভাল হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নোট রাখা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ খাতা বাঁধিয়া নিম্নলিখিত রূপে রোগীর অবস্থা লিখিয়া রাখা যায় এবং প্রয়োজন হইলে শিরোনামের (হেডিংএর) কোঠাগুলির আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া লইলেই চলে। যথা—

শ্রীমতী নিরূপমার জ্বরের অবস্থার নোট্।

তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

সময়	নাড়ী	তাপ	বাহ্যি	প্রস্রাব	বমি	অন্যরূপ স্রাব	বেদনা	আক্ষেপ খেচুনী	ফিট	শ্বাস প্রশ্বাস	ঔষধ	পথ্য	পানীয়	মন্তব্য।
পূর্ব্বাহ্ন ৬টা	মোটা	১০৩			পিত্ত		মাথা ব্যথা			দ্রুত	আরক ১দাগ	জল সাগু	গরম জল	—
৯টা	চিকণ	১০১·২	তরল হল্‌দে	লাল			অল্প			সহজ	চূর্ণ ১ পুরিয়া			
১০টা	মৃদু	৯৯				জলবৎ ঘর্ম্ম	নাই			সহজ	চূর্ণ ১ পুরিয়া	দুধ সাগু	গরম জল	মাথা ধুইয়ে দেওয়া গেল
৩টা	„	৯৬				প্রচুর ঘর্ম্ম		মূর্চ্ছা		কষ্টকর				চিকিৎসক ডাকা আবশ্যক
৬টা	ঐ	৯৮	অপেক্ষাকৃত শক্ত	পূর্ব্বাপেক্ষা সাদা	নাই	নাই		নাই		সহজ	বড়ি ১টী	দুধ সাগু	গরম জল	
৯টায়	মোটা	১০০						খেচুনী	অজ্ঞান	সহজ				

লক্ষণ-জ্ঞান।

শুশ্রূষাকার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করিতে হইলে, নাড়ী, তাপ, শ্বাস, প্রশ্বাস ও মলমূত্র, বমি ইত্যাদি রোগীর লক্ষণাদি সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব নিম্নে আমরা সেই সকল বিষয়ে এস্থলে মোটামুটি কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিব।

নাড়ী।

১। রোগীর হস্তের (মণিবন্ধ) কব্জীর উপর

অঙ্গুলি স্থাপন করিলে যে স্পন্দন অনুভূত হয় তাহারই নাম নাড়ীর স্পন্দন। স্বাভাবিক অবস্থায় এক মিনিটে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী ১৪০ বার, ২ হইতে ৫ বৎসরের শিশুর নাড়ী ১০০ বার, ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে ৯০ বার, ১৬ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ৭৫ বার, এবং তদূর্দ্ধ বয়সে, নাড়ী ৭০ বার স্পন্দিত হয়। ইহা অপেক্ষা ৮।১০ বার বেশী বা কম স্পন্দনেও কোন আশঙ্কার কথা নাই, কিন্তু ১৫।২০ বার বেশী বা কম হইলে রোগ বলিয়া জানিবে।

২। নাড়ীর গতি অতি দ্রুত বা অতি ধীর হইলে আশঙ্কাজনক।

৩। নাড়ীর স্পন্দন অনুভব না হইলে,—কিংবা অতি সামান্য মাত্র অনুভব হইলে, অথবা (ক্ষণ বিলুপ্ত) কখনও পাওয়া গেলে ও কখন পাওয়া না গেলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানান আবশ্যক। বয়স্কদিগের নাড়ী মিনিটে ১৫০ বার স্পন্দিত হইলে মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক।

শ্বাস প্রশ্বাস।

১। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পেটের উপরের মাংসপেশীগুলি নড়িয়া থাকে সুতরাং পেটের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গণনা করাই সহজ ও সুবিধাজনক।

২। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ১৮ বার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হইয়া থাকে।

৩। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ও ধীরগতিতে হইলে শুভ লক্ষণ, সামান্য দ্রুত হইলেও কোন আশঙ্কার কথা নাই।

৪। শ্বাসপ্রশ্বাস অতি দ্রুত টানিয়া ফেলা কিংবা ঠেকিয়া ঠেকিয়া আসা দুর্লক্ষণ।

৫। অতি শীতল শ্বাসপ্রশ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ।

তাপ।

১। থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদটী ৯৫ ডিগ্রিতে নামাইয়া লইয়া রোগীর বগলে দিয়া ৫ মিনিট কাল রাখিতে হয়। আজকাল, এক মিনিট ও অর্দ্ধমিনিট রাখিবার থার্ম্মোমিটারও বাহির হইয়াছে। বগল ব্যতীত মুখের ভিতর বা গুহ্যদ্বারের ভিতর ও তাপ পরীক্ষা করা হয়।

২। সাধারণ সুস্থ মানুষের শরীরের তাপ বগলে ৯৮° ৪ ডিগ্রি, মুখে ও গুহ্য দ্বারে ৯৯° ৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

৩। যুবকগণ হইতে বালকদিগের স্বাভাবিক তাপ কিছু বেশী, বেশী বয়স্ক দিগের তাপ কিছু কম। নিদ্রা ও বিশ্রাম কালে তাপ ১ ডিগ্রি কম হয়।

৪। স্বাভাবিক অপেক্ষা ২॥ আড়াই ডিগ্রি তাপ বৃদ্ধি হওয়ার চেয়ে ১ ডিগ্রি তাপ কমিলে বেশী ভয়ের কারণ।

৫। তাপ ৯৭ ডিগ্রীর নীচে নামিলে ও ১০০ ডিগ্রীর উপরে উঠিলে কোন রূপ রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৬। তাপ ১০৬, ১০৭ ডিগ্রি হইলে রোগ সাংঘাতিক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ১০৮ বা ১১০ ডিগ্রি তাপ হইলে শীঘ্র মৃত্যু বুঝা যায়।

৭। গাত্র-তাপ হঠাৎ বেশী কমিয়া যাওয়া আশঙ্কা জনক।

নাড়ী, তাপ ও শ্বাস প্রশ্বাসের পরস্পর সম্বন্ধ।

১। শরীরের তাপ ১ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২ বার বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। ইহার বিশেষ ব্যতিক্রমে হওয়া মন্দ লক্ষণ।

মুখ মণ্ডল।

১। বক্ষঃস্থলের পীড়ায় যন্ত্রণা ভোগের সময় রোগীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ না পাইয়া প্রসন্ন দেখা গেলে তাহা শুভ লক্ষণ নহে।

২। ওলাউঠা, রক্তস্রাব ইত্যাদি পীড়ায় রোগীর চোক মুখ বসিয়া যাওয়া ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ ধারণ করা মন্দ লক্ষণ।

৩। নাসিকার বরফ বৎ শীতলতা অশুভ লক্ষণ।

জিহ্বা।

১। জিহ্বা নিতান্ত শুষ্ক, খস্ খসে, রক্তবর্ণ, বেগুণে ও ফেঁকাশে হইলে অশুভ এবং পরিষ্কার ও সহজ হইলে শুভ লক্ষণ।

ঘর্ম্ম।

১। জ্বর ত্যাগের পর কিংবা অন্যান্য রোগে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়াও অন্যান্য উপসর্গ হ্রাস না হইলে মন্দ লক্ষণ।

বক্ষঃস্থল।

১। বক্ষঃস্থলের বাঁম ভাগে বাম স্তনের নিম্ন দেশে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। সেই স্থানে হঠাৎ কোনরূপ বেদনা বা দপদপানি হইলে চিকিৎসককে শীঘ্র জানান আবশ্যক।

২। বক্ষঃস্থল হইতে কাশের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে কিংবা রক্ত বমন হইলে চিকিৎসক ডাকা আবশ্যক।

উদর।

১। উদরের ঊর্দ্ধাংশে দক্ষিণ দিকে যকৃতের স্থান। ঐ স্থানে কঠিন বেদনা হইলে বা ফোলা দেখা গেলে আশঙ্কার বিষয়।

২। দুর্ব্বলকারী রোগে পেট কাঁপিলে সতর্ক হওয়া উচিত।

মল।

১। চাল ধোয়া জলের মত মল, চালকুমড়া পচার মত, কিংবা সিদ্ধ সাগুদানার মত মল ওলাউঠা বা সাংঘাতিক উদরাময় জ্ঞাপক।

২। কাল বা কৃষ্ণাভ মল যকৃতের পীড়ার পরিচায়ক।

৩। অতিরিক্ত বিশুদ্ধ টাট্‌কা রক্ত বা মলিন রক্তযুক্ত মল আশঙ্কাজনক।

মূত্র।

১। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টায় প্রায় দেড় সের মূত্র নির্গত হয়। ইহা হইতে অতিরিক্ত হইলে বা কমিয়া গেলে রোগ বুঝায়।

২। মূত্র হরিদ্রা বর্ণ হইলে যকৃতের পীড়া বুঝায়।

৩। মূত্র দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইলে কৃমি দোষ অনুমিত হয়।

৪। মূত্রে পিপিলিকায় ধরিলে চিনি থাকা ও বহুমূত্র রোগ অনুমিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার।

সাজঙ্গী।

(৬)

কর্ম্মফল বলিয়া একটা কথা চিরদিনই মানব সমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে. কিন্তু এমন হাতে হাতে কর্ম্মফল ভোগ বোধ হয় আর কখনও আর কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই। আমার প্রতি জানি না ভগবানের দয়া কেন অসীম ছিল, তাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। যেদিন যথা নিয়মানুসারে শাস্ত্রানুযায়ী বিধান পূর্ব্বক দেলেনাকে আমি আমার বিবাহিতা পত্নী-রূপে, আমার চিরজীবনের একমাত্র সঙ্গিনী স্বরূপে গ্রহণ করিলাম সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, সেই সুখরাত্রির অবসান আর এক ভীমা রজনীর গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া হইবে। দেলেনার লজ্জাকুণ্ঠিত মুখ সাগ্রহে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে যখন বলিয়াছিলাম,—"দিল্! আমার লক্ষ্যহীন জীবনের ধ্রুবতারা, আমরা দুজনে মিলিয়া আমার গৃহীত পথ ধরিয়া চলিব, পথে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্লান্তির ও অবসাদের দুঃখ দুর হইয়া যাইবে। কে বলে আমি তোমায় পাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছি? আজ নিজের মধ্যে আমি সম্পূর্ণতা অনুভব করিতেছি।" তখন কল্পনাও করি নাই যে কোনো অদৃশ্য স্থলে বসিয়া আমার ও দেলেনার সম্মিলিত অদৃষ্ট আমার মূঢ়তা দেখিয়া নিদারুণ তীক্ষ্ণ হাসি হাসিতেছিল। সে হৃদয়ভেদী, মর্ম্মঘাতী হাসির রেখা চোখে পড়িলে হয়তো আমার মুখের কথা মুখেই আবদ্ধ হইয়া যাইত,আর দেলেনার নবউৎসাহদীপ্ত তরুণ মুখের প্রেম-কোমল মৃদু-হাসির ছটাটুকু সুগভীর ভীতি-অন্ধকারে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া পড়িত। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা ততদূর কঠিন হইতে পারেন নাই। মিলনের প্রথম রজনী তাহার অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দ লইয়া আমাদের ঘেরিয়া রহিল।

পরদিন বাহিরে মৃত্তিকালিপ্ত অঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র দেলেনার নানী আসিয়া নিকটে বসিলেন। ভাবে বোধ হইল, কিছু বলিবার আছে। আমারও কিছু কথা ছিল, তাঁহার প্রদর্শিত চেটাই খানায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু কি বলিবেন?"

বৃদ্ধা মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন, তারপর চিন্তাযুক্ত ভাবে আত্মগত কহিলেন, "কোনটা আগে বলি? আচ্ছা, তুমি সেপাই বিদ্রোহের কথা কিছু শুনেছ?" আমি মস্তক আন্দোলন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলাম। পরে বলিলাম, "এ উদ্যমের ফল কি হইবে জানি না, আরায় মস্ত লড়াই হইয়া গিয়াছে শুনিতেছি।" বৃদ্ধা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ওসব কথা আমাদের আলোচ্য নহে, খোদা দিন দুনিয়ার মালিক, তাঁর যদি মনে থাকে তা'হলেই আবার আমাদের বাদসাহ জাদা'রা তাঁদের নিজের সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু খাঁ সাহেব, তোমার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি উদ্ধার করবার এই একমাত্র সুযোগ। এ সুযোগ এবার হারালে আর জীবনে কখনও দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না। কর্ণগড়ের সেপাইরাও ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে। শুনেছি ওরাও আজকালের মধ্যে বিদ্রোহী হবে। এই অবসর, তাদের দিয়ে তোমার শত্রু নিপাত করাও। পিতৃহন্তাকে, তোমার মাতৃঘাতী, তোমার সর্ব্বস্বাপহারীকে দণ্ড দাও।"

সমুদয় শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার আর ধৈর্য্য রহিল না, ঘোর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "আমার পিতৃহন্তা! আমার মাতৃঘাতী! আমার সর্ব্বস্বাপহারী! আমি,—আমি কে?" বৃদ্ধার ক্ষীণচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—"খাঁসাহেব তুমি জান না তুমি কে? বনবাসী হিন্দু সন্ন্যাসী সেজে তুমি মনের আনন্দে বেড়াও! জান না ত ইহা আমাকে কত খানি আঘাত করতে থাকে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলেই চুপ করে থাকি, কিন্তু বুকের মধ্যে আমার কি যে আঘাত বাজে, তুমি কি বুঝিবে এখন! প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আজ সব কথা বলি শোন। এই সব কাগজ পত্র পড়িলে জানিতে পারিবে, তুমি কে। এই পুটুলিতে কয়খানি গহনা ও কাপড় আছে, সেই-গুলিও লেখার প্রমাণ, আর সব চেয়ে মস্ত প্রমাণ তোমার চেহারা। সেপাইদের মধ্যে আমার একজন দেওর আছে, সেই তোমার কার্য্যোদ্ধারের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছে। আজ হয়তো সে এখনি আসবে, [illegible] এর মধ্যে কাগজগুলো পড়ে নিজেকে প্রস্তত করে নাওগে। দেখ, তোমার পালিকা মা'র হাতের লেখা বোধ হয় তোমার অবিশ্বাস্য নয়?"

সবিস্ময়ে সসম্মানে কাগজের তাড়া মস্তকে স্পর্শ করাইয়া কহিলাম, "না, ইহা আমার দেববাক্য —ওকি?"

একটা উচ্চ চীৎকারের শব্দে দুজনেই চমকাইয়া উঠিলাম। নারীকণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দন শব্দ ক্রমশঃ নিকটতর ও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দেলেনার পিতা-মহী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:—

"দিল,—দিল, আমার দিল কোথায়? দেখ, শীঘ্র দেখ, দিল কোথায়?"

অজানা বিপদাশঙ্কায় চিরনিশ্চিন্ত চিত্ত সহসা যেন কেমন অবসন্ন হইয়া আসিল। রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম দেলেনার মা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন। অনেক কষ্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, ক্রন্দনের কারণ আমারি দেলেনা। প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইল কি?

না, প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় নাই, এখনও অনেক বাকি আছে।

দেলেনার পিতামহীর নিকট শুনিলাম, কাল অনেক রাত্রে দুইজন বরকন্দাজ সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক—সে মহম্মদ আলির দাসী—তাঁহাদের কুটীরে আইসে এবং খাঁ সাহেবের দেলেনাকে প্রার্থনা করে। দাসী বলে, অপুত্রক মহম্মদ পুত্রাশায় বহু রমণীর স্বামী হইয়াও অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি দেলেনাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তিনি স্বয়ং একদিন সাঙ্গঙ্গীতীরে তাঁহাকে দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অদৃষ্ট ভাল। সাদুল্লাখাঁর স্ত্রী ও মা তাহার বিবাহ সংবাদ দিলে দাসী চলিয়া যায় এবং ঘণ্টা তিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলে, খাঁসাহেব বলিলেন, "কাফেরের সহিত মোস্‌লেম ধর্ম্মাবলম্বিনী পবিত্র কুমারীর বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। এই রাত্রেই তিনি তাঁহাকে নিজের হাবেলীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, আপনারাও চলুন, সেখানে বিবাহ হইবে এবং এই পত্নীকেই তিনি তাঁহার গৃহের কর্ত্রী করিবেন।" তাঁহারা এই কথা শুনিয়া গর্ব্বিতা বৃদ্ধা দাসী ও দাসীর

প্রভুর উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ কটুভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। দাসী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া গেল। বুঝি আজ রাত্রি পোহাইতেই তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। প্রতিদিনকার মতই অত্যন্ত প্রত্যুষে সাদুল্লাখাঁর স্ত্রী স্নান করিতে ও দেলেনা গৃহকার্য্যের প্রয়োজনে জনহীন বনভূমি দিয়া সাজঙ্গী তীরে যাইবা মাত্র আমবাগানের ভিতর হইতে একদল বরকন্দাজ বাহির হইয়া তাহাকে ধরিয়া সমভিব্যাহারী পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অভাগিনী জননীর আর্ত্ত হাহাকারে প্রকৃতির চিত্ত হয় তো গলিয়া দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শরীরধারী মানবের হয় নাই। সকল কথা শুনিলাম। হত্যা অপরাধে অপরাধী প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিলে প্রথম মুহূর্ত্ত যেমন থমকিয়া থাকিয়া পরমুহূর্ত্তে কৃতকর্ম্মের অখণ্ডনীয় ফলভোগ করিতে প্রস্তুত হয় তেমনি বিশ্ববিচারকের অখণ্ডনীয় বিচার-ফল অনুভব করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুতই ছিলাম, কিন্তু বিধানদাতা কি বিধান দিলেন, তাহা ভুল কি নির্ভুল তাহা বিচার করিবার শক্তিও তখন শরীর মনে ছিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আবাহন।

আমার হৃদয়ের চিরনির্ভর
এস হে তুমি এস হে,
শত বেদনার মাঝারের ধন,
এস হে তুমি এসহে!
এস হে তুমি মোর চিত'পরি,
আঁধারে আলোকে সমুখে রহি,
এস হে তুমি মোর দুঃখহারি,
এসহে তুমি এসহে!
করিয়া চেতন মৃত জীবনে
এস হে তুমি এস হে,
দিয়ে নব বল, দিয়ে নব প্রেম
এসহে তুমি এস হে;
এস হে এস মোর হৃদিরাজ
হানিয়া হিয়ায় কঠিন বাজ,
সকল আশা মিটায়ে মোর;—
এস হে তুমি এস হে!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

রংপুরে নারী সমিতি।

গত ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় রংপুরের মাজিষ্ট্রেট মিঃ কে. সি দের পত্নী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দে মহাশয়ার অক্লান্ত উদ্যোগে, মন্থনার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার সাহায্যে তদীয় রংপুরস্থ বাসভবনে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের পত্নী শ্রীযুক্তা মিসেস্ এফ, জে মোনাহান মহোদয়াকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রমহিলাগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রংপুরে এই প্রকারের সম্মিলন অভিনব হইলেও স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার-পত্নীগণ ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রায় তিন শতাধিক ভদ্রমহিলা এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ইউরোপীয় মহিলাগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে মন্থনার সুরম্য অট্টালিকার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পত্র, পুষ্প ও পতাকাদি দ্বারা অতি মনোহর ভাবে সজ্জিত ও বাটীর চতুষ্পার্শ্ব দশ ফুট উচ্চ বস্ত্রাবরণে সুন্দররূপে আবৃত করা হইয়াছিল।

নির্দ্ধারিত সময়ে কমিশনারপত্নী মহাশয়ার শকট তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দে প্রমুখ সমবেত ভদ্রমহিলাগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যান। অতঃপর শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া, শ্রীমতী মোনাহান মহোদয়া ও আগন্তুক ভদ্রমহিলাগণকে অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহার লিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করার জন্য মিসেস্ দে মহাশয়াকে

অনুরোধ করেন। তদনুসারে উক্ত অভিনন্দনপত্র, মিসেস্ দে মহাশয়া পাঠ করার পর এবম্বিধ মহিলা সম্মিলনের অশেষ উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

অতঃপর স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী মজুমদার মহাশয়া দেওয়ানবাড়ী মহিলা-সমিতির পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন কবিতা পাঠ করিয়া মিসেস্ মোনাহান মহোদয়াকে প্রদান করেন।

অনন্তর মিসেস্ মোনাহান মহোদয়া ইংরাজী ভাষায় সমবেত ভদ্রমহিলাগণের উপস্থিতিতে অশেষ আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাদিগের এই কষ্ট স্বীকার হেতু যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয় লাভের সুযোগে তিনি যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন ও তিনি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোয়েশনের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা বর্ণনা করেন। রংপুরে যে মহিলা-সমিতি ইতিপূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করতঃ উদ্যোগীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তিনি উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণকে ঐরূপ সমিতি যাহাতে আরও গঠিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইতে অনুরোধ করেন। ইহার পর মিসেস্ দে সরল বাংলা ভাষায় ঐ বক্তৃতার মর্ম্ম বিবৃত করেন।

অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ সম্মিলনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করেন এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে মিসেস্ মোনাহানের যত্ন ও গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে রাজসাহী বিভাগের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা শ্রীমতী মিস্ সিং মহাশয়া জলপাইগুড়ি ও বগুড়ার অন্তঃপুর শিক্ষা-সমিতির অনুরূপ সমিতি রংপুরে প্রতিষ্ঠা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। এই সমিতির কল্যাণে অন্তঃপুরের মহিলাবৃন্দ সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিয়াও যে সপ্তাহে ২।১ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া অনায়াসে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

তৎপর সকলে গৃহপ্রাঙ্গণে অবতরণ করিলে মিসেস্ দে মহাশয়া সমবেত ভদ্রমহিলাগণকে মিসেস্ মোনাহানের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়ায় মিসেস্ মোনাহান্ মহোদয়া সাতিশয় অমায়িকতা ও শিষ্টাচার সহকারে প্রত্যেক মহিলার সহিত আলাপ পরিচয়াদিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তৎপর জলযোগান্তে সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে মহিলাগণ সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সম্মিলন উপলক্ষে দানশীলা শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার অমায়িকতা, স্ত্রী জাতির উন্নতি বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা ও আনুকূল্য, এবং বিদুষী মিসেস্ দে মহাশয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিসেস্ দে মহাশয়া রংপুর আগমন অবধি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় ভদ্র মহিলাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়াদি দ্বারা রংপুরের মহিলা সমাজে এক নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছেন। রংপুরবাসী জনসাধারণ এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। (সঞ্জীবনী)

ভারতে মহিলা চিকিৎসক।

ডাক্তার এলিজাবেথ শ্লোন চেসার এম, বি, ডেলী ক্রনিকেল পত্রে ভারতবর্ষে হাজার হাজার মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে পুরুষদিগের চিকিৎসার সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের তাহাতে বিশেষ সুবিধা নাই, এজন্য অতি অল্প স্ত্রীলোকই তথায় যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র যে সকল চিকিৎসালয় আছে, তাহাতেও অধিকাংশ পুরুষ চিকিৎসক কার্য্য করিয়া থাকেন, এজন্য অনেক ভদ্র মহিলা তথায় যাইতে পারেন না। ইঁহাদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

অষ্টম ভাগ। আষাঢ়, ১৩১৯। ৫ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বার্ষিক মূল্য ২৸৵৹ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য।৹ আনা।]

জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কথনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। ভাদ্র, ১৩১৯। ৫ম সংখ্যা।

ভারতী।

এক প্রবল ঝটিকা যখন হিন্দু ধর্ম্মের অস্থি মজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আর এক নূতন সাম্যবাদ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতেছিল,—যে ঝটিকায় প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম তৃণবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল ;—সেই সময়ের কিঞ্চিৎ ইতিহাস না লিখিলে, আমাদের এই আখ্যায়িকার গৌরবদীপ্ত জীবন-কাহিনী পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন না।

মহাত্মা খৃষ্টের জন্মের ৫৫৭ বৎসর পূর্ব্বে, গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন কপিলবাস্তর রাজা ছিলেন। এই কপিলবাস্ত মিথিলার উত্তর পশ্চিমাংশে হিমালয় প্রদেশের এক অংশে অবস্থিত।

গৌতম রাজ-কুমার হইলেও জীবনে কখন ভোগ-বিলাস এবং আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হন নাই। তিনি যেমন অতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন, তেমনি তাঁহার বুদ্ধিও অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন। পৃথিবীর লোক আধিব্যাধি পূর্ণ, তাহারা শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন।

অবশেষে গৌতম মানবজাতিকে শোক, জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিবার জন্য গোপনে এক নিশীথে নিবিড় বনে চলিয়া গেলেন। ঊনত্রিশ বৎসরের নবীন যুবা স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিজন, রাজ্য ধন সকলই ফেলিয়া

একাদিক্রমে ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন।

গৌতম সিদ্ধমনোরথ হইয়া প্রচার করিলেন,—"সকলেই সর্ব্বদা আত্ম-সংযম করিবে, কখনও মিথ্যা ব্যবহার করিবে না, পরের দ্রব্যে লোভ করিবে না, কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবে না, এবং ভোগ-বিলাস ও আমোদে রত হইবে না।"

—"মনুষ্য এই নিয়ম পালন করিলে, তাহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, সংসারে তাহাদের কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিবে না।"

এই মহাবাণী প্রচার করিয়া গৌতম "বুদ্ধ" নামে অভিহিত হইলেন, এবং তাঁহার এই অভিনব ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইল।

এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ, নেপাল, চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়িল। বুদ্ধদেব আশী বৎসর বয়সে উদরাময় রোগে পরলোক প্রাপ্ত হন।

বঙ্গের পুরাতন রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে আনুমানিক ৭৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজপুত বংশীয় গোপাল বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পালবংশীয় প্রথম রাজা এই গোপাল।

রাজা গোপাল কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সিংহাসনে উপবেশন করেন। ধর্ম্মপাল বঙ্গদেশের বহুস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবপাল পালবংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দেবপাল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। দেবপাল শিক্ষিত ও শাসন কার্য্যে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন।

পাল বংশীয় নরপতিরা প্রায় ৩০০ তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজাদিগের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। হিন্দুরা ক্রিয়াকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল।

বুদ্ধের নূতন সাম্যবাদ-ধর্ম্মে যখন দলে দলে লোক ঝাঁপ দিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন হিন্দুধর্ম্মকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। বুদ্ধের উদার সরল ধর্ম্মের মোহন বংশীর মধুর স্বরে ভুলিয়া লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার ধর্ম্মের পশ্চাতে ধাবিত হইল, হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল।

এই সময় শঙ্করাচার্য্য নামক জনৈক নিষ্কাম সাধু পুরুষ শিষ্যসহ সিন্ধুকূল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছিলেন। তখন এক পণ্ডিতা রমণীও তাঁহার এই কার্য্যে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রমণী মণ্ডন মিশ্রের সহধর্ম্মিণী, ভারতী দেবী। ভারতী বাঙ্গালার আদর্শ-পণ্ডিত ও আদর্শ-নারী।

পূর্ব্বে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ হইত। মজাও হইত বেশ; যিনি যুদ্ধে হারিতেন, তিনি জেতার দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন।

একদা শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের শাস্ত্র লইয়া তর্কযুদ্ধ হয়। তাঁহারাও উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। শঙ্করাচার্য্য পণ করিলেন যে, তিনি তর্কে পরাজিত হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম ছাড়িয়া মণ্ডন মিশ্রের আজ্ঞাবহ শিষ্য হইবেন, এবং মণ্ডন মিশ্র বাজি ধরিলেন যে, যদি তিনি হারেন তবে তিনিও সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আজীবন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

উভয়েই মহাপণ্ডিত; উভয়েই অসাধারণ তার্কিক, অতএব এই তর্কযুদ্ধ সামান্য হইবে না। এই যুদ্ধের ফলাফলের বিচারক হইবেন কে? মহাপণ্ডিতের উপর পণ্ডিত কোথায়?

কিন্তু বিচারকের জন্য দূরদেশেও যাইতে হইল না, কষ্টভোগও করিতে হইল না; মণ্ডন মিশ্রের উপযুক্ত ভার্য্যা ভারতীর প্রতিই এই গৌরবময় সম্মানপূর্ণ বিচার-ভার অর্পিত হইল। এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতী মহাবিদ্যাবতী ছিলেন।

জয় পরাজয়ের প্রতিজ্ঞা, বিচারক প্রভৃতি সব স্থির হইলে, তর্ক আরম্ভ হইল; ভারতী জয়মাল্য হাতে লইয়া উভয় পণ্ডিতের তর্ক শুনিতে লাগিলেন। ভারতী

যে গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধীর ভাবে পণ্ডিত দ্বয়ের তর্কের নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন। এই তর্কে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী বিজড়িত; স্বামী পরাজিত হইলে তাঁহারও অপমান ও লজ্জার বিষয়, কিন্তু যশঃ ও গৌরবের লিপ্সায় বা ভালবাসার টানে তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলেন না। তিনি পক্ষপাতহীন হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্রীর হাতেই বিচারভার অর্পিত হইয়াছিল। ভারতী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীই পরাজিত হইলেন, তিনি তখন অবিচলিত চিত্তে পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য জয়গর্ব্বে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

তখন ভারতী বলিলেন,—"পণ্ডিতবর, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধ, আমি এখনও অপরাজিত, সুতরাং আমার স্বামী এখনও অর্দ্ধেক অপরাজিত। এখন আমার সহিত তর্ক করুন, যদি আমাকে পরাজিত করিতে পারেন, তবেই আপনি যথার্থ জয়ী হইবেন।"

ভারতীর এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্যে বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলেন।

কিন্তু ভারতী জিদ্ ধরিলেন, তিনি তর্ক করিবেনই। অবশেষে তর্ক চলিতে লাগিল। প্রথম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ভারতী, উত্তর দিতে লাগিলেন শঙ্করাচার্য্য। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রীয় জটিল সমস্যার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, ভারতী সুন্দরভাবে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে দিবা রজনী সপ্তাহ ধরিয়া তর্ক চলিল। ভারতীর পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আপন মনে বলিলেন,—এই বয়সে কত পণ্ডিতের সঙ্গেই তর্ক করিয়াছি, শাস্ত্রীয় কত কূট তর্কই মীমাংসা করিয়াছি, কিন্তু এমন তার্কিক আর ত কোথাও কখন দেখি নাই!

এক তর্ক শেষ হইতেই ভারতী, অন্য তর্ক আরম্ভ করেন, পরন্তু শঙ্করাচার্য্যকে কোন তর্কেই পরাজয় স্বীকার করাইতে পারেন না। সর্ব্বশেষে চতুরা ভারতী দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"এবিষয়ে আমি অভিজ্ঞ নই, আমি সংস্যার-বিরাগী।" ভারতীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি জয়ী হইয়া পরমানন্দিত হইলেন।

কিন্তু মণ্ডনমিশ্র ভারতীর ছলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না। সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পতিপরায়ণা ভারতী আর কি করিবেন? তিনিও স্বামীর অনুসরণ করিলেন। মণ্ডণমিশ্রের সহিত বিদ্যাবতী ভারতীকে লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার রূপ যে কঠিন কার্য্যে শঙ্করাচার্য্য ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীর ন্যায় মহাপণ্ডিত রমণীরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতীকে না পাইলে তাঁহার বহু কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐকান্তিক যত্নে শঙ্করাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য ভারতীর জন্য শৃঙ্গেরী নামক স্থানে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতীর শেষ জীবন সেই মন্দিরে অতিবাহিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য যতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিশ্চয়ই ভারতীর প্রাপ্য।

মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা।

বালুর বাঁধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা পার হইয়া সুধাংশু ও আদিনাথ উদ্যোগী হইয়া একটা সভা স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা সেখানে বক্তৃতা দিত, প্রবন্ধ পাঠ করিত, মাঝে মাঝে সেখানে মহোৎসাহে ভোজনোৎসবও চলিত। সুধাংশু ও আদিনাথের মধ্যে যখন মনান্তর ঘটিল, তখন সভা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও ভাঙ্গিয়া গেল না। সুধাংশু যেদিন প্রেসিডেণ্ট থাকিত সেদিন আদিনাথ অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িত,

সুধাংশু ঘরে ঢুকিয়া উৎসুক নেত্রে একবার আদিনাথের চিরদিনের অধিকৃত অগ্রবর্ত্তী চেয়ারটির দিকে চাহিত, পরক্ষণেই তাহার মুখে সুস্পষ্ট ভাবান্তরের ছায়া ফুটিয়া উঠিত। তাহার একান্ত কাছে অচেতন সেই কাষ্ঠাসনটি—যাহা এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে,—লইয়া তাহাদের মধ্যে কত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই না চলিয়াছে! আদিনাথ তাহা ছাড়িতে চাহে না বলিয়াই প্রত্যেকেই তাহা জোর করিয়া অধিকারের জন্য যত্নবান ছিল, কিন্তু আদিনাথ বাহুবলে এপর্য্যন্ত তাহার অধিকারিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহার সেই এতদিনের ও এত আদরের বিজয়লব্ধ ধন, এরূপ দারুণ অবহেলায় পরিত্যক্ত দেখিয়া সুধাংশু সহসা বুকের ভিতর একটা ঝাঁকি অনুভব করিত, তাহার কণ্ঠস্বর তখন অস্পষ্ট হইয়া যাইত।

আদিনাথ যেদিন প্রেসিডেণ্ট থাকিত, সেদিন সুধাংশু বসিত একেবারে পিছনের বেঞ্চে। বক্তৃতা দিবার সময় আদিনাথের কোনও কিছুর দিকে চাওয়া অথবা লক্ষ্য করা অভ্যাস ছিল না, সে তাহার অভ্যস্ত অভিনিবেশের একাগ্র তন্ময়তা সহকারে বক্তৃতা দিয়া যাইত, সুধাংশু পিছনে বসিয়া গোপনে তাহা কাগজে উঠাইয়া লইত।

সেদিন সুধাংশুর বক্তৃতার পালা। সুধাংশু বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচন করিল, "মর্টালিটি অব ম্যান", অর্থাৎ "মনুষ্যের ক্ষণধ্বংসিত্ব।" ছেলেরা আপত্তি জানাইয়া বলিল যে এত বেশী দর্শন-শাস্ত্র সমালোচনা করিলে তাহাদের ব্যবহারিক শাস্ত্র সমুদয় অকালে কালকবলিত হইবে। বিশেষতঃ তাহাদের এ সাহিত্য চর্চ্চা—সুধাংশু এইখানে অধীর হইয়া দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের কতটা নিগূঢ় যোগ আছে এবং সে যোগ কতটা গভীর ও সূক্ষ্ম সোৎসাহে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার শ্রোতৃবর্গ সে উৎসাহকে বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না, চারিদিক হইতে হাস্য, কোলাহল ও চীৎকার তাহাকে উদ্যমেই নিরস্ত করিয়া দিল। কিন্তু সুধাংশু হটিবার লোক নয়, সে তাহার নির্ব্বাচিত বিষয় কিছুতেই ছাড়িল না।

যথা সময়ে সভা আরম্ভ হইল, আদিনাথ এড়াইয়া যাইবার বহু চেষ্টা সত্বেও অপর সকলের বিদ্রূপের ভয়ে তাহা পারিল না। কিন্তু তাহার মনের ভিতরকার কুণ্ঠাটা সেদিনকার রাত্রির ঘটনার স্মৃতিতে তীক্ষ্মমুখ হইয়া তাহাকে ক্রমাগত বিদ্ধ করিতে লাগিল, কোনও মতে নাক মুখ ঢাকিয়া সে একদিকে বসিয়া পড়িল।

সুধাংশু সেদিন প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়াছিল, পড়িবার প্রারম্ভে সে একবার সাগ্রহ নেত্রে উপবিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; সহসা তাহার মুখ তখন রঞ্জিত হইয়া উঠিল, ও একটা দুর্দ্দমনীয় চঞ্চলতায় তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল; গলা পরিষ্কার করিয়া সে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। দার্শনিক তত্ত্ব যে প্রবন্ধে খুব বেশী পরিমাণে ছিল অথবা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত কোনও একটা বিষয় প্রতিপাদিত অথবা খণ্ডন করা যে সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নয়; মানুষের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি অবনতির ভিতর দিয়া বেগ-ব্যাকুল নির্ঝরের মত সহজ সবল গতিতে সে ভাব-প্রবাহ তাহার বেদনামথিত হৃদয়ের আকুলতার সহিত মিশিয়া বহিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছিল, মানুষ—অমৃতের যে অধিকারী, অমরত্বের যে সাধক,—স্নেহে, প্রেমে, আশায়, অভিলাষে, তাহার এ চঞ্চলতা কেন? বাত্যাঘূর্ণিত পত্রপুঞ্জের মত কেন তাহার হৃদয় মন নিত্য অস্থিরতার আবর্ত্তে পাক খাইয়া মরিতেছে! কোথায় সে অমৃত রস, যাহার সে অধিকারী! তাহার চিত্ত-সমুদ্রের কোন্ অতল পঙ্ক-শয্যায় সে সুধাভাণ্ড নিহিত হইয়া রহিয়াছে! সে কেবলই তাহা খুঁজিতেছে, পাইতে চাহিতেছে, কিন্তু যখনই তাহা তাহার হাতের কাছে আসিতেছে, তখন সে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার আকিঞ্চনের ধনকে আপন হাতে বিনষ্ট করিতেছে! সে তৃপ্ত হইতে চায়, কিন্তু তৃপ্তি যখন তাহার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দেয়, তাহার আনন্দকে সে আপনার পায়ের নীচে দলিত করে; এমন কি প্রেম———।

সুধাংশুর গলা এইখানে ভারী হইয়া আসিল, গলা পরিষ্কার করিয়া সে আবার আরম্ভ করিল, "এমন কি,

প্রেম যখন আসিয়া তাহাকে বলে, 'আমাকে লও, আমি তোমার জীবনকে জয়যুক্ত করিয়া দিব, তোমাকে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব.' তখন তাহাকেও সে অবমাননা করিয়া ফিরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।"

সুধাংশু পড়িয়া যাইতে লাগিল, মিনতির মত তাহার স্বর প্রত্যেকের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল. ক্রন্দনের মত বেদনা ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে লাগিল, হতাশার মত বারংবার ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল. প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতর তাহার প্রতিস্পন্দন জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুধাংশু একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে চাহিল, লাইনের শেষ দিকে চসমার কাচের ভিতর হইতে দুইটি চক্ষু যেন তাহারই দিকে স্থির হইয়া আছে,—সহসা সে এরূপ অনুভব করিল, তাহার মুখ তখন একটা গূঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার কণ্ঠস্বর স্পন্দিত হৃদয়ের আঘাত-বেগে বেপমান হইয়া গেল।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে সেদিন ছেলেরা বাড়ী ফাটাইয়া সুধাংশুর নামে "থ্রি চিয়ার্স্" দিল, কতক আসিয়া সুধাংশুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পঠিত প্রবন্ধের প্রশংসা করিতে লাগিল। পিছনে যাহারা ছিল তাহারা বলিল, "এস, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক্' করে বাড়ী যাওয়া যাক্।"

কথাটা যে শুধু তাহারা খেয়ালের বশেই বলিয়াছিল তাহা নয়, সুধাংশু ও আদিনাথের ভিতরকার মালিন্যের বাঁধ কতকটা ভাঙ্গা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

একে একে সকলে সুধাংশুর কাছে আসিয়া তাহার কর পীড়ন করিল, আদিনাথ তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিয়া কহিল, "আমি পালাই হে ধরণী!"

ধরণীমোহন সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "খবরদার! পালাতে পারবে না। তা যদি কর, তবে আমি মুখের উপর তোমায় বল্‌ছি, তুমি কাপুরুষ, তোমার কোনও সাহস নেই।" অপ্রতিভ হইয়া আদিনাথ বলিল, "আরে না, না, ক্ষেপো না, পালাই বল্লেই পালালুম নাকি!" "এখানে আমরা হচ্ছি সভার মেম্বার আর সুধাংশু হচ্ছে সভাপতি, এখানে তোমার ব্যক্তিগত কোনও ভাব তুমি দেখতে পার না। ঐ যে ওদের হয়ে গেছে, তুমিই শুধু অবশিষ্ট আছ, যাও এবার!"

বেচারা আদিনাথ দেখিল. তাহার আর মুক্তির পথ নাই, তখন সে সুধাংশুর কাছে গিয়া হ্যাণ্ডসেকের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল, পিছন হইতে হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে ছেলেরা তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল।

(৯)

রাত্রি তখন এগারটা, সুধাংশু বই বন্ধ করিয়া টেবিলের কাছে বসিয়াছিল। ছেলেরা যে সভাতে তাহাকে হস্তদান করিতে আদিনাথকে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না। সে মনে করিয়াছিল, আদিনাথ নিজেই তাহা করিয়াছে। সেই আনন্দের ধারা তাহার অন্তরে তাই পুলকসঞ্চার করিতেছিল। স্বপ্নের মত তাহার সেই জন্মোৎসবের কথা মনে পড়িতেছিল। তাহার পর ছয়টি মাস চলিয়া গিয়াছে! এই ছয় মাস ধরিয়া প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সে আশামুগ্ধ প্রাণে আদিনাথের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়াছে। রাত্রিতে যখন সে শয়ন করিয়াছে, তখনও সে তাহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শোয় নাই, পাছে আদিনাথ আসিয়া ফিরিয়া যায়! বাতি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারের ভিতর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া সে জাগিয়া রহিয়াছে, পাশের ঘর হইতে যদি কেহ হঠাৎ কোনও কিছুর জন্য বাহির হইয়াছে, তাহার পায়ের শব্দে অমনি তাহার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পর রাত্রির অগাধ নীরবতার ভিতর সেই লুপ্ত পদশব্দ ধ্যান করিয়া সে শুধু প্রতীক্ষা করিয়াছে,—প্রতীক্ষা করিয়াছে, তাহার বক্ষের সমস্ত স্নায়ু একটা অধীর বেগের পীড়নে বেদনিয়া বেদনিয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষে ঘুম আসে নাই!

সভা ভঙ্গের পর গগনেন্দ্র ও ধরণীমোহন আদিনাথকে ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাদের মেসে লইয়া আসিয়াছিল. সুধাংশুর পাশের ঘরেই তাহারা গল্প করিতেছিল, তাহাদের কণ্ঠস্বর পুরু দেয়ালের ও-পিঠ হইতে সুধাংশু একটু একটু শুনিতে পাইতেছিল।

কথা বলিতে বলিতে গগনেন্দ্র ও ধরণীমোহন উঠিয়া বাহিরে আসিল ও জনান্তিকে উপস্থিত সকলের মধ্যে

গোপনে একটা প্রস্তাব হইয়া গেল, আদিনাথ তাহার কিছু জানিতে পারিল না।

গগনেন্দ্র বলিল, "আদিনাথ, চল আজ "ডায়মণ্ডে" মেবার পতন দেখে আসি।"

আদিনাথ বলিল, "এই এগারোটার পরে ?"

জ্ঞানরঞ্জন বলিল, "তাতে কি !"

আদিনাথ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি পাগল তোমরা ? অর্দ্ধেক প্লে হয়ে গেছে ; এখন বাবুদের ঝোঁক চাপ্‌ল প্লে দেখ্‌তে যেতে, কি লাভ হবে ওতে ?"

ধরণীমোহন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "যথেষ্ট লাভ হবে ওতে, তুমি এখন যাবে কি না বল !"

"না, আমি যাবো না।"

গগনেন্দ্র তাহার সার্টের কলার ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিল, "যাবে না বই কি ! ওঠ !"

"বাঃ, এ ত বেশ জুলুম !" বলিয়া আদিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সকলে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আদিনাথ জুতা পরিতে পরিতে বলিল, "না হে, আমায় ছেড়ে দাও, আমার গলায় ব্যথা হয়েছে, ঠাণ্ডা সহ্য হবে না।"

ধরণীমোহন বলিল, 'তোমার "মাফ্‌লারটা' নিয়ে নেও।"

"সেটা আমার কাছে নাই।"

"কার কাছে ?"

অসতর্কতা বশতঃ আদিনাথ বলিয়া ফেলিল, "সুধাংশুর কাছে।" আশুতোষ বলিল, "সুধাংশু বাবুর কাছে ? তা হ'লে আর কি, নিয়ে আসুন গিয়ে।"

আদিনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ধরণীমোহন ও গগনেন্দ্র তাহাদের ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল। ধরণীমোহন বলিল, "বসে রইলে যে ? যাও না, নিয়ে এস সেটা।"

বিপন্ন আদিনাথ গগনেন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া কহিল, "আমি সার্টের বোতাম লাগাচ্ছি ; গগন, তুমি এনে দাও না !"

"আমি আমার নিজের কাজে ব্যাপৃত আছি," বলিয়া গগনেন্দ্র তাহার সবুট চরণ উত্তোলন করিয়া দেখাইল।

আশুতোষ বলিল, "উঠুন আদিনাথ বাবু, উঠুন, রাত হচ্ছে, মাফ্‌লার নিয়ে আসুন আপনার।"

আদিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "নেই বা গেলে আজ ! এখন গিয়ে আর কি দেখ্‌বে ! যাবেই যদি, তবে এতক্ষণ কি কর্‌ছিলে ? একটু আগে ঠিক্ করলেই ত হোত ; এখন সব চল্লেন যবনিকা পতন দেখ্‌তে।"

"যাও, যাও, আর বক্‌তে হবে না ; মাফ্‌লার আনো আগে" বলিয়া ধরণীমোহন অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাহাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

সুধাংশু তখন বাতি নিভাইয়া শুইয়াছে। একটা মূঢ় প্রতীক্ষা তখনও তাহার বুকের ভিতর জাগিতেছিল, তাই সে কপাট বন্ধ করে নাই। আদিনাথ ধাক্কা দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। অন্ধকারের ভিতর গায়ের "র‍্যাপার্" ফেলিয়া দিয়া সুধাংশু বিছানায় উঠিয়া বসিল।

আদিনাথ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সুধাংশু ঘুমিয়েছ নাকি ?"

অস্পষ্ট স্বরে সুধাংশু বলিল, "না।"

আমার মাফ্‌লারটা তোমার কাছে রয়েছে, দাও ত। আমার ভারী ঠাণ্ডা লেগেছে।"

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে একটা উত্তপ্ত উত্তেজনা সুধাংশুকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল, সুধাংশু তাহার সর্ব্বদেহে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে যাহারা সুধাংশুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, গগনেন্দ্র হাঁকিয়া বলিল, "চট্ করে এসহে আদিনাথ, আমরা চল্লুম।"

সুধাংশু বুঝিল, তাহারা প্রমোদ নিশি যাপন করিতে বাহির হইতেছে, সে নীরবে শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

আদিনাথ পকেট হাতড়াইয়া বলিল, "বাতি জাল্‌ব ?"

সুধাংশু বলিল, "না, এই যে পেয়েছি।" সুধাংশু মাফ্লার বাহির করিয়া আদিনাথের হাতে দিল,আদিনাথ তাহা লইয়া চলিয়া গেল। সুধাংশু নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার পায়ের শব্দ শুনিতে লাগিল। বারান্দা, সিঁড়ি নীচের ঘর ছাড়াইয়া তাহা ক্রমে রাস্তায় পঁহুছিল, বাহিরের কপাটে তখন একবার ঝঞ্জনা বাজিয়া উঠিল, তাহার পর, বাহিরে ঝামা ফেলা রাস্তার উপর একবার প্রবলরূপে শব্দিত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

অন্ধকারে, চেয়ারের বাহু ধরিয়া সুধাংশু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর নিঃশব্দে একবার বাহিরে আসিল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের উপর তখন পঞ্চমীর ক্ষীণ শশীকলা উদিত হইতেছিল, চারিদিক্কার গাঢ় মসী বর্ণের উপর নির্ম্মেঘ নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে, ক্ষীয়মান চন্দ্র অতিরিক্ত মাত্রায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল একটু দূরে একটা নূতন তৈরি বাড়ী, তাহার শুভ্র দেয়াল গাছপালার মাথার উপর দিয়া শুভ্রতর দেখাইতেছিল, সাম্‌নে উপরের রেলিংএর সমান একটা আতা গাছ, জ্যোৎস্নায় তাহার চিক্কণ মসৃণ পাতাগুলি ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছিল।

সুধাংশু নীরবে নীচে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। বাতাসে তাহার পিছনে কদম গাছের শাখাগুলি শন্ শন্ করিয়া উঠিল, ও কতকগুলি কদম্বকেশর ঝরিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল, গলির মোড় দিয়া কে চলিয়া গেল সুধাংশু তাহার পায়ের শব্দে উন্মুখ হইয়া গলা বাড়াইয়া সেই দিকে চাহিল, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আদিনাথ এই বুঝি ফিরিয়া আসে! দূরে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল, রুদ্ধদ্বার বাড়ী হইতে একটি শিশুর ক্রন্দনের স্বর শোনা গেল, সুধাংশু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইল, তাহার নাম ধরিয়া ঐ তাহাকে কে ডাকিতেছে না? উৎকর্ণ হইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির গভীর স্তব্ধতার বিরামের তান তাহার কর্ণে বিদ্ধ হইতে লাগিল।

(১০)

থিয়েটার দেখিয়া সকলে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি ২টা। পথে আসিতে আসিতে সকলে পরামর্শ ঠিক্ করিয়া আসিয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক, আদিনাথকে সুধাংশুর সঙ্গে শুইতে দিতে হইবে। সুতরাং সার্ট খুলিয়া আদিনাথ যখন গগনেন্দ্রের চৌকিতে শুইয়া পড়িল, তখন গগনেন্দ্র তাহার কর্ণাকর্ষণ করিয়া বলিল, হেইয়ো, এখানে ট্রেস্‌পাস্ চল্‌বে না।"

আদিনাথ কাণ ছাড়াইয়া নিয়া গগনেন্দ্রের হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও, যাও, গণ্ডগোল করো না।"

"বিলক্ষণ! আমার জায়গা তুমি দখল কর্‌ছো যে! আমি যাব কোথা?"

আদিনাথ বিছানার এক প্রান্তে সরিয়া গিয়া বলিল, "শোও না, এই ত জায়গা আছে।" "না না, ও হবে না। আমি কারো সঙ্গে শুতে পারি না।"

"বেশ অতিথিসৎকার ত তোমাদের! আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তারপর অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা।"

ধরণীমোহন বলিল, "সুধাংশুর সঙ্গে তোমার যায়গা দেওয়া হয়েছে, সেখানে শোও গিয়ে। আমরা তোমার মত বর্ব্বর নই, বুঝ্‌লে?"

আদিনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সুধাংশুর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুধাংশুর সঙ্গে। যাও সেখানে" বলিয়া গগনেন্দ্র র‍্যাপার-মণ্ডিত-চক্ষুকর্ণ আদিনাথকে অকস্মাৎ প্রবল ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া আদিনাথ গগনেন্দ্রের পৃষ্ঠে এক কীল বসাইয়া দিয়া বলিল, "র‍্যাস্কেল্!"

গগনেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

আদিনাথ তখন আর কাহারও শয্যা অধিকার করিতে গেল, কিন্তু কেহই তাহাকে আমল দিল না। নিরুপায় আদিনাথ তখন বারান্দায় গিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপর এক কক্ষ হইতে জ্ঞানরঞ্জন ও আশুতোষ আদিনাথকে দেখিতেছিল, তাহাকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জ্ঞানরঞ্জন বলিল, "দেখেছ ওর কাণ্ড? চল আমরা একটু খোঁচা দিয়ে আসি, নইলে ও ওখানেই রাত কাটাবে।"

জ্ঞানরঞ্জন কপাট খুলিয়া বাহিরে গেল, এবং আদিনাথকে দেখিয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "কে-ও আদিনাথ বাবু না ?"

অপ্রতিভ আদিনাথ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ,আমি।"

"আপনার না গলায় ব্যথা হয়েছে ? এখানে ঠাণ্ডায়, দাঁড়িয়ে করছেন কি ?"

গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদিনাথ বলিল, "না কিছু কর্‌ছি না. এই একটু দাঁড়িয়ে আছি।"

"চমৎকার ! কাব্যরসটা ঘরের ভিতর বসে উপভোগ করাটাই শ্রেয়স্কর, বুঝলেন ? নইলে আবার ব্যাধিভোগ কর্‌তে হবে ?"

আদিনাথ হাসিল।

আশুতোষ বলিল যান মশায়, শুয়ে পড়ুন গিয়ে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে আর কষ্ট পাবেন না। শেষে হয়ত বল্‌বেন যে আমরা থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে আপনাকে ভোগালুম।"

বিদ্রূপ-ভয়-ভীত আদিনাথ তখন গত্যন্তর না দেখিয়া সুধাংশুর ঘরে ফিরিয়া গেল। আশুতোষ ও জ্ঞানরঞ্জন হাসিতে হাসিতে নিজেদের ঘরে গিয়া কপাট দিল !

আদিনাথ যখন শুইতে গেল, তখন সুধাংশু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিছানার মাঝখানে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া সে ঘুমাইতেছিল। আদিনাথ পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালিল, কিন্তু বাতি জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ঘর যখন আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন সে একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বাতিটা কমাইয়া দিয়া সে একবার সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিল ! রাত্রির শেষ যাম, সুপ্তি ও শীতলতা চারিদিকে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও শব্দমাত্র নাই, আদিনাথ নীরবে বসিয়া গত কাহিনী সব ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতরকার রুদ্ধ উত্তাপ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার নিজের অপরাধের উপলব্ধি তাহার মনে প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। আদিনাথ তাহার বুকের ভিতর একটা আকুল চঞ্চলতা, একটা প্রসারণ-শীল বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, তাহাদের পুরাতন প্রীতি প্রবাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যে শুষ্ক বালুচর জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়ের কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল, মায়াস্বপ্নের মত তাহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

আদিনাথের স্বভাবটা একটু বেশী রকম খোলামেলা ছিল, তাহার যাহা মনে হইত তাহা সে অতি সহজেই বলিয়া ফেলিত। বহুবার সে ইহার জন্য অনুশোচনা করিয়াছে, কিন্তু তবু ইহা ছাড়াইতে পারে নাই। সুধাংশু সম্বন্ধে যাহা কিছু সে বলিয়াছে, তাহা একটা আকস্মিক অনুভূতির উৎক্ষেপ মাত্র, তাহা তাহার খাঁটি ভাব নয়, কিন্তু সুধাংশু তাহাতে কিরূপ আহত হইয়াছিল তাহা তাহার বুঝিতে বাকি ছিল না, সে নীরবে আপনার হৃদয়হীন কৌতুকের কথা ভাবিয়া আপনাকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিল।

সে দিন সমিতিতে সুধাংশু যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল, তাহা টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, আদিনাথ তাহা দেখিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। সেদিন সমিতির ভিতর সকলের পিছনে বসিয়া আত্মগোপন করিবার বিষম উদ্বেগে সে সব কথা শুনিতে পায় নাই, এবং যাহা শুনিয়াছিল তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। সুধাংশু যে এ প্রবন্ধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিল এবং ইহার কাব্যরসাভিষিক্ত বাক্যগুলি যে তাহার আপন হৃদয়ের বেদনারসে আপ্লুত হইয়া নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা এই জ্যোতিষ্কোজ্জ্বল শুব্ধ নিশা তাহার কাছে সহসা প্রকাশ করিয়া দিল !

বাতিতে আর তেল ছিল না, সলিতাগুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে নিভিয়া গেল। আদিনাথ উঠিয়া সুধাংশুর মশারি তুলিয়া খাটের ধারে বসিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আদিনাথ ডাকিল, "সুধাংশু !"

সুধাংশুর ঘুম সে মৃদুস্বরে ভাঙ্গিল না। গলা পরিষ্কার করিয়া আদিনাথ আবার ডাকিল, "সুধাংশু !"

সুধাংশু তবুও জাগিল না। আদিনাথ তাহার মাথা ধরিয়া নাড়া দিল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বিহ্বল কণ্ঠে সুধাংশু কহিল, "কে ?"

আদিনাথ বলিল, "আমি"।

প্রবল স্বরে সুধাংশু আবার বলিয়া উঠিল, "কে?"

আদিনাথ বলিল. "আমি আদিনাথ, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আজ!" অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। *

অদ্যকার এই সভায়—মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সুপ্রসিদ্ধ বক্তাগণের সঙ্গে কিছু বলিবার জন্য যখন আমাকে অনুরোধ করা হইল তখন আমি স্বভাবতঃই নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম।—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাগর-সদৃশ বিশাল জীবনের গুণাবলী আমার অক্ষম রসনা কি বর্ণনা করিবে? কিন্তু ছাত্রসমাজের সভ্যগণের এবং কয়েকটী শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে এই কথাই মনে হইল—পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধের অধিকারী ত শুধু পুরুষেরাই নহেন. ভারত-নারী কিছু সে বিষয়ে কম অধিকারী নহে। বরং বিদ্যাসাগর চরণে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিবার প্রয়োজন এদেশের পুরুষ অপেক্ষা নারীরই অধিক। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত হইয়াই আমার ক্ষীণকণ্ঠে দুচারিটী কথা বলিয়া আমি আসন গ্রহণ করিব. আমার পরবর্ত্তী সুবক্তাগণ সুললিত বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিবেন।

মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের পরে এদেশে অনেক পুরুষরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, সাহিত্যচর্চ্চা, বাগ্মিতা, ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরুষের জন্ম হইয়াছে; কিন্তু সরল, সবল, খাঁটি মনুষ্যত্বে বিদ্যাসাগরই আজ দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় আপন ভাস্বর জ্যোতিতে ভারতাকাশকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে সকলই সার-সত্য, তথায় অসারতা অসত্যের লেশমাত্র নাই। ব্যক্তিগত মতামত ও হৃদয়নিহিত ভাবরাশিকে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে সহজ সরল পথে, দৃঢ়ভাবে জীবন-পথে চালিত করাতেই জীবনে সত্যের অনুসরণ করা হয়। সাধারণ মানুষ হৃদয়ে সত্যের আভাস পাইলেও অধিকাংশস্থলে স্বার্থের অনুরোধে অথবা সামাজিক শাসনের ভয়ে সত্যের অনুসরণ করিতে পারে না, হৃদয়ে একপ্রকার মত ও চিন্তা পোষণ করে, কার্য্যে বিপরীত ভাবের পরিচয় দেয়। সাধারণ মনুষ্যের দুর্ব্বলতাই এখানে এই অসামঞ্জস্য ঘটায়, কিন্তু মহাপুরুষেরা হৃদয়ে যাহা অনুভব করেন সমস্ত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও তাহাই পালন করেন। মহাপুরুষগণের তিরোধানে আমরা সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা দিয়াই আপন কর্ত্তব্যের সমাপন করি, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণেই প্রকৃত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হয়। ভারত-সন্তান যদি সত্যই বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, সত্যই যদি তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারে, তবে তাহার স্বার্থদুষ্ট, জড়তাগ্রস্ত জীবনে ত্যাগ ও তেজস্বিতা আবির্ভূত হইবে, দীনা জন্মভূমির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইবে। কে জানে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধ্যানস্তিমিত লোচনে একদিন অন্তরে সত্যকে দর্শন করিয়া ভারত-মহিলা মৈত্রেয়ী গাহিয়া উঠিয়াছিলেন, "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"—অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও। এ মন্ত্র ভারতের উপাস্য মন্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন এ মন্ত্র সাধনের আবশ্যকতা, জাতীয় জীবনেও তেমনি এই সত্যমন্ত্র সাধনের প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর এই মন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি যাহা হইয়া গিয়াছেন তাহা হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবাসীর জীবন কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি নৈতিক বিষয়ে, কি সংসার বিষয়ে, সকল বিষয়েই অসত্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সত্যের অর্চ্চনা দ্বারা এ অসত্য দূর না হইলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সৌভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগর এই সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, সত্যজীবন যাপন করিয়া আমাদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কোনও দিক দিয়া অসত্য বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

* বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় সম্পাদিকা কর্ত্তৃক পঠিত। "বিশ্ববার্ত্তা" হইতে উদ্ধৃত।

যাঁহারা সত্যের উপাসক—সত্য তাঁহাদিগের নিকট আত্মগোপন করিয়া থাকেন না, থাকিতে পারেন না। বিধবা বিবাহের অন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণ সংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল এবং "দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্রমন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষামন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন"—তথাপি বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। সুখে থাকিতে দুঃখকে আলিঙ্গন করিতে মানুষকে প্ররোচিত করিতে পারে শুধু সত্যের প্রেরণা। কত শাস্ত্রের যুক্তি, কত ন্যায়ের ফাকি, কত আত্মীয় স্বজনের দোহাই বিদ্যাসাগরের জন্য সঞ্চিত ছিল কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় তিনি সত্যের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন, কোন দোহাই দস্তুর তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগরকে অনেকে দয়ার অবতার বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মনে হয়, 'সত্যের অবতার' এই বিশেষণই তাঁহার প্রতি সমধিক প্রযোজ্য। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হাড়িডোমের মেয়েরা রুক্ষকেশে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের আত্মীয়েরা, ভৃত্যেরা দয়া করিয়া, অনুগ্রহ করিয়া দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদিগকে একটু একটু তেল ঢালিয়া দিতেছে, কি জানি পাছে স্পর্শ দোষ ঘটে! কিন্তু বিদ্যাসাগর কি করিলেন? তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন, মানবাত্মার জাতিভেদ নাই, তিনি বুঝিয়াছিলেন, মানুষকে জাত্যংশে হীন বলিয়া ঘৃণা করিলে তাহার স্রষ্টা ভগবানের অবমাননা করা হয়, তাই তিনি স্বয়ং উক্ত "অস্পৃশ্য ও অপকৃষ্ট" জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিলেন। তাই তিনি সাঁওতালকে কোল দিলেন, অস্পৃশ্য কলেরা রোগীকে স্কন্ধে বহন করিলেন। তাই তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননা ও দেবতার অবমাননা এক কথা বলিয়া মনে করিতেন। সাহেব যখন টেবিল হইতে পা না নামাইয়া বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন কেন?—না তিনি সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতর যে মনুষ্যত্ব আছে—তাহার অবমাননা করিবার অধিকার কাহারো নাই।

বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীগমন করিলে কাশীর কতিপয় ব্রাহ্মণ, কাশীবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহারা শিবতুল্য এই অজুহাতে তাঁহার নিকট অর্থ চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদিগকে ভক্তি বা দয়ার পাত্র মনে করেন নাই, সেজন্য উত্তর দিয়াছিলেন, "কাশীতে আছেন বলিয়া আমি যদি আপনাদিগকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি তবে আমার মত নরাধম আর নাই।" —এমন সরল সত্যনিষ্ঠা এদেশে কোথায় পাওয়া যায়? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—বিদ্যাসাগর এমন উঁচু হইতে পারিয়াছিলেন কিসের বলে,—তাহার উত্তর—সরল সত্যানুরাগের বলে। তিনি খাঁটি সত্যের উপাসক ছিলেন, সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি খাঁটি সত্যকে দর্শন করিতে পাইত। সে দৃষ্টিলাভ করিলে মোহ থাকে না, দেশাচার কুশাস্ত্রের দোহাই, ভেদবুদ্ধি সকলই দূর হয়। বঙ্গের যুবকগণ, যদি বিদ্যাসাগরের প্রতি সত্যই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে চান—তবে তাঁহার ন্যায় সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে সচেষ্ট হউন। সত্য বড় uncompromising কিছুর সঙ্গেই সে compromise করিতে জানে না। পিতামাতা, ভাইবন্ধু, দেশাচার, লোকাচার, চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা, সকলের সহিত যদি সংগ্রাম করিতে হয় তাও করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্যসাধনে দৃঢ়সংকল্প হউন, দেখিব, আমাদের ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগরের ছোটবড় সংস্করণ। নতুবা শুধু ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া কি হইবে? এক কাণে তাহা শুনিব, অন্যকাণে বাহির হইয়া যাইবে। আর একটা কথা বলিয়াই আমি শেষ করিতেছি। আপনারা সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী অসাধারণ মহিলা ছিলেন। এমন জননী পাইয়াছিলেন বলিয়াই বিদ্যাসাগর মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবতী দেবী ত আর গাছ হইতে জন্মায় না, স্বর্গ হইতেও খসিয়া পড়ে না। দেশের যুবকগণ! আপনারা যদি চেষ্টা করেন, দেশের মাতৃজাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যদি আপনারা সংকল্প গ্রহণ করেন, দেখিবেন দেশের অন্ধকার দূর

হইবে। এ দেশের জননীকুল ভগবতী দেবীর স্বজাতীয়া বলিয়া গৌরব করিতে সমর্থ হইবেন। জননীকুল যদি উন্নত হন, তবে দেশের সন্তানগণও বিদ্যাসাগরের জাতীয়তা গৌরবের দাবী করিতে পারিবে।

কবি আক্ষেপ করিয়াছেনঃ—"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতিসোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সহযোগী অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদায়ই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলী মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কার্য্য করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা-লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি;—পরের অনুগ্রহে আমাদের গর্ব্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্‌চাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

যদি দেশবসী সত্যের উপাসক হন, যদি দেশবাসী বিদ্যাসাগরের ন্যায় নারীজাতির প্রকৃত সম্মান করিয়া তাঁহার ন্যায় তাহাদের উন্নতি সাধনে তৎপর হন তবে নিশ্চয়ই দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচিবে। যদি আপনারা বিদ্যাসাগরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে চান তবে আপনাদিগকে আজই—এখনই—প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—আমরা সত্যের উপাসক হইব, প্রয়োজন হইলে সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব। তবে আজই আপনাদিগকে সংকল্প লইতে হইবে—নারীজাতিকে আর হীন মনে করিব না, তাহাদের উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আজই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—বিধবাদিগের উন্নতির পথে যত অন্তরায় আছে তাহা দূর করিব।

সাজঙ্গী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

তারপর কেমন করিয়া কি হইল, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয় এবং সে সকল কথা ভাল করিয়া হয় ত বুঝাইতেও পারিব না। কারণ উন্মাদ তাহার উন্মত্তাবস্থায় কি কি কার্য্য করিয়াছে সে কথা সে সহজ অবস্থায় স্মরণে আনিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাদুল্লাখাঁর প্রতিহিংসাগ্রহণেচ্ছু মাতা ও ভ্রাতার পূর্ব্ব চেষ্টার উদ্যোগ দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল।

বিদ্রোহী সৈন্যদল, এমন কি মহম্মদের গৃহভৃত্যগণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাদের সাহায্য করিয়াছিল। আমি ও দেলেনার পিতৃব্য একজন দাসীর নিকট সংবাদ লইয়া মহম্মদখাঁর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানবাটিকার উদ্দেশে ছুটিলাম। শুনিলাম, সেখানে 'নূতন বিবির' সহিত খাঁ সাহেবের বৈবাহিক অনুষ্ঠান অল্পমাত্র পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। আমার সমস্ত শরীরের রক্ত আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া সবেগে মাথার মধ্যে উঠিতে লাগিল, উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিলাম।

এই বুঝি সেই ঘর, এই রুদ্ধ কবাটের মধ্যে হিন্দু দেবীপ্রতিমার সম্মুখে ক্ষুদ্র কম্পিত ছাগশিশুকে যেমন করিয়া উৎসর্গ করা হয় তেমনিতর একটা অনুষ্ঠান চলিতেছে। রুদ্ধ জানালার কবাটে সজোরে ধাক্কা দিয়া ডাকিলাম, "দেলেনা!" সহসা সবেগে জানালাটা খুলিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, কাহারো দেহভার সজোরে সেই লৌহদণ্ডগুলার

উপর পতিত হইল, পরমুহূর্ত্তে কেহ সকরুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "ওগো কে আছ, আমায় রক্ষা কর, আমি অসহায়া স্ত্রীলোক, আমি বিবাহিতা রমণী, আমার পুনর্ব্বিবাহ অসম্ভব—"

নিমেষের মধ্যে সমুদয় দৃশ্যটা আমার চোখে পড়িয়া গেল, যাহা দেখিলাম তাহা সহস্র বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অসহ্য! হায় ভগবান, এই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইবার জন্যই কি জাতিধর্ম্ম ও গুরুদেবের আয়াস-প্রাপ্ত সঙ্গ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলাম? দেখিলাম, আলোকোদ্ভাসিত কক্ষে ঘৃণিত পৈশাচিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। হা ধর্ম্ম! হা পবিত্র ধর্ম্ম! তোমার একি অবমাননা! মহম্মদ খাঁ বিবাহিতা বালিকাকে তাহার একজন তোষামোদকারী ভণ্ড মৌলবীর সাহায্যে বিবাহ করিতে উদ্যত, নিরাশাহত হৃদয়ের তীব্র তাপজ্বালার অগ্নিবর্ষীস্বরে ডাকিলাম, "দেলেনা!"

সে স্বরে বংশীরব-চকিতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় চমকিয়া দেলেনা মুখ তুলিল, বুকফাটা হতাশার মর্ম্মভেদী স্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "যদি এসে থাক—সত্যই যদি এসে থাক তবে আমায় রক্ষা কর। আমি আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমি—ঈশ্বর জানেন—আমি তোমারই ধর্ম্মপত্নী। কে বলে এ বিবাহ সিদ্ধ নয়!" তাহার অম্লান শুভ্র ললাট বহিয়া সবেগে শোণিত-ধারা বহিতেছিল! বোধ হয় জানালার লৌহ-দণ্ডে আঘাত লাগিয়াছিল।

মুহূর্ত্ত—একমুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় ঘটনাটা ঘটিয়া গিয়াছিল, তারপর কখন কেমন করিয়া কি হইল জানি না, শুধু এই মাত্র জানি, এটুকু শুধু মনে পড়ে, জ্বলন্ত ধূমকেতুর মত সেই অশান্ত সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, "তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমি তোমায় রক্ষা করিব, ইহা আমার কর্ত্তব্য!" সেই মুহূর্ত্তে আমার পশ্চাৎদিকে একটা তুমুল কোলাহল উঠিল এবং গৃহের মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চকণ্ঠে একটা আদেশ প্রদান করিয়া, হিংস্র পশু তাহার করায়ত্ত শিকারকে অন্যের করতলস্থ দেখিলে যেমন করিয়া উভয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে তেমনি করিয়া দেলেনাকে আসিয়া ধরিল এবং তাহাকে সবলে গৃহের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান ফুরাইয়া গিয়াছিল, বিবেচনা বা বিবেক লোপ হইয়া আসিতেছিল, বিশেষতঃ পশ্চাতের 'ধরো' 'পাকড়ো' শব্দে জ্ঞানশূন্য হইয়া দেলেনার পিতৃব্যদত্ত ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র তুলিয়া মরণাহতের শেষ চেষ্টার ন্যায় আশাহীন ভাবে গৃহের মধ্যে লক্ষ্য করিলাম। হস্ত অশিক্ষিত, কিন্তু অস্ত্র অব্যর্থ। বিশেষতঃ মহম্মদ খাঁ স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার আততায়ী একজন বনবাসী হিন্দু সন্ন্যাসী এরূপ কোন দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে সক্ষম, তাই সে ততদূর সাবধানতা অবলম্বন করে নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সর্ব্বনাশী রাক্ষসীরূপী সংহারাস্ত্র গর্জ্জিয়া উঠিল, সে শব্দে চারিদিক কম্পিত হইয়া উঠিল। রোষে গর্জ্জিয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেলেনাকে সরাইয়া দিয়া জানালা বন্ধ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার সেই স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবান আসিয়া ভীষণবেগে আমার দেলেনার আহত ললাট ভেদ করিয়া দিয়াছিল। আবার, আবার সেই সংহারাস্ত্র সগর্জ্জনে ধূমোদ্‌গার করিল, বোধ হয় মহম্মদ আলি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া থাকিবে, সেই বন্দুকের শব্দও মহম্মদ আলির গভীর আর্ত্ত চীৎকারের মধ্যে একটি ক্ষীণ অস্ফুট স্বর কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল! কিন্তু আমার কর্ণে সেই মৃত্যুযাতনার ক্ষীণ কাতরধ্বনি সহস্র কামানের গর্জ্জনের চেয়েও ভীম রবে আঘাত করিল। শেষ মুহূর্ত্তে ধূমাস্পষ্ট কক্ষ মধ্যে ঝটিকাচ্ছিন্ন স্বর্ণলতার ন্যায় দেলেনার কমনীয় দেহলতা লুণ্ঠিত দেখিলাম।

তার পর কি হইল জানি না, কেবল ইহাই জানি, আমি তখন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলাম। যেদিকে পথ পাইলাম সেই দিকেই ছুটিয়া চলিলাম। তখন চারিদিকে কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিতেছিল, বালক ও নারীর আর্ত্তনাদে, বন্দুকের ঘন ঘন গর্জ্জনে, শতকণ্ঠের জয় ধ্বনিতে সেই ভীষণ অভিনয়-ভূমি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্রোহী সৈন্যদল বুঝি প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিল? আর কিছুই স্মরণ নাই।

ইহার পর যখন প্রথম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম চক্ষু

মেলিতেই আমার সেই চির পরিচিত কুটীরের অন্তর্দৃশ্য চোখে পড়িল। গৃহ প্রাচীরে সেই ব্যাঘ্রাজিন লম্বিত, একপার্শ্বে সেই পুঁথি কয়খানি সজ্জিত এবং বৃক্ষতলে কম্বল শয্যায় আমি শায়িত। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম নাকি? না এ দৈব মায়া? গুরুদেবই কি কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টিদানে আমার এই অন্ধ মোহের পরিণাম— দেলেনার ভবিষ্যৎ ভাগ্যচিত্র আমায় প্রদর্শন করিলেন! কিন্তু কি মর্ম্মবিদারী সেই শোণিতাপ্লুত মুখের ব্যাকুল দৃষ্টি! ব্যাধ-বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী বুঝি অমনি করিয়া চাহে! আর সেই করুণ কাতর কণ্ঠস্বর—"যদি এসে থাক আমায় রক্ষা কর, আমি তোমারি ধর্ম্মপত্নী!" সেই হৃদয়ভেদী শোণিত-স্তব্ধকারী স্বর আমার উভয় কর্ণে বজ্রনাদে ধ্বনিয়া উঠিল। স্বপ্ন যদি ইহা হয় তবে কি নিদারুণ দুঃস্বপ্ন।

সহসা নিজ বক্ষে দৃষ্টি পড়িল; শুষ্ক, ছিন্ন-সূত্র -লগ্নপুষ্প-মাল্য গাছি। এ যে দেলেনার স্বহস্তগ্রথিত, ওই রঙ্গীন উত্তরীয় বিবাহ-বাসরের মঙ্গল পরিচয় দিতেছে তবে? তবে কেমন করিয়া আর স্বপ্ন বলিব! সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষতলে হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল—দেলেনা নাই! যে হস্তে সে সেই দুটো দিন পূর্ব্বে নিজের সর্ব্বস্ব পূর্ণ-বিশ্বস্ততার সঙ্গে অর্পণ করিয়াছিল সেই হস্তই তাহার কুসুম-কোমল শরীরে বজ্র হানিয়াছে! নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর জগৎ, নিষ্ঠুর বিধাতা—আর ততোধিক নিষ্ঠুর এই অভাগা আমি! শয্যা যেন কঠিন কণ্টকে ভরিয়া উঠিল, সবেগে উঠিয়া বসিতে গেলাম, কণ্ঠরুদ্ধশ্বাসে আপনার মনে ডাকিলাম, "দিল্—দিল্ আমার! এসো, ফিরে এসো, আমি যে তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না দিল্, আমায় ত্যাগ করো না!" সহসা ললাটে শীতল স্পর্শ অনুভব করিলাম—অতি স্নেহপূর্ণ সুখস্পর্শ! আশান্বিত চিত্ত মুহূর্ত্তে চমকিয়া ফিরিল— "ফিরে এলে কি? এলে কি তবে দেলেনা? এসো এসো।" শয্যাপার্শ্ব হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে গুরুদেব কহিলেন, "বৎস, এরূপ কাতর হইয়া রোগ বৃদ্ধি করিও না—ধৈর্য্য অবলম্বনের চেষ্টা কর।"

রোগ বৃদ্ধি! তবে কি সবই স্বপ্ন? গুরুদেব কি আমায় ছাড়িয়া যান নাই; আমার বিবাহ হয় নাই? আর—? ব্যাকুল হইয়া কহিলাম, "আমি কি রোগ-শয্যায়?" "হাঁ বৎস!" আমার মন্থিত সাগরবৎ আলোড়িত বক্ষ স্থির হইয়া আসিল, "সে সব তবে স্বপ্ন? প্রভু! বল বল, আমি দেলেনার হত্যাকারী নই, তুমি বলো প্রভু!"

গুরুদেব কোমল পদ্মহস্ত আমার জ্বলন্ত ললাটে মর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "বিধিলিপি অখণ্ডনীয় বৎস! তাঁহার বিধান কে লঙ্ঘন করিতে পারে!"

বুঝিতে কিছু বাকি থাকিল না।

বহুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী কহিলেন, "অদৃষ্ট দেবতাকে বঞ্চনা করিতে পারে এমন শক্তিমান কেহ নাই। আমরা যাহা কিছু করি সেই অদৃষ্ট জালের বুনানীতে কেবল গ্রন্থির পর গ্রন্থিই পড়িতে থাকে, খুলিতে চাহিয়া আরও জড়িত হই। অধীর হয়ো না বৎস, স্রোতস্বিনীর সিন্ধু অভিমুখে ধাবন সহস্র বাধাও রোধ করিতে পারে না। সুনন্দা ও আমি তোমার এই অবস্থা না ঘটিবার জন্য প্রথম দিন হইতে অল্প সতর্কতা অবলম্বন করি নাই। 'পিতৃব্য হত্যা ও নারী হত্যা' তোমার ভাগ্যলিপি জানিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় তোমার নিকট গোপন রাখিয়াছি। ঈর্ষা বিদ্বেষ বর্জ্জিত হইতে পারিবে মনে করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু যখন দেখিলাম, তুমি দেলেনার মোহে একান্ত মুগ্ধ তখন আর বাধা দিই নাই। বুঝিলাম, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! কিন্তু ভাগ্যফল যে এমন অতর্কিতরূপে ফলিবে তাহা বুঝি নাই।"

গুরুদেব নীরব হইলেন! বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিলাম, পিতৃব্য-হত্যা! একি রহস্যময় অনুযোগ! আমি মহম্মদ আলি সাহেবকে মারিয়াছি, আমার পিতৃব্য কোথায়?

প্রভু এ মৌন সন্দেহ বুঝিলেন। তখনি এসন্দেহ ঘুচাইয়া কহিলেন, "বৎস তুমি নিজেকে যাহা দেখিতেছ তুমি তাহা নও, তুমি হিন্দুসংসর্গে প্রতিপালিত হইলেও তুমি হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ কর নাই!"

বিস্ময় সীমাতিক্রম করিল। অস্ফুট চীৎকারে বলিয়া উঠিলাম, "আমি হিন্দু নই! তবে কি প্রভু?"

"স্বর্গীয় মহানুভব সুজাদালি খাঁর পুত্র মেহের আলি, মহম্মদ আলির ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি।"

তাড়িৎ সঞ্চালিতবৎ মুহূর্ত্তে উঠিয়া বসিলাম। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, কোন মতে কহিলাম—"আমি, মেহেরআলি, সুজাদআলির পুত্র--সম্ভব এও?" গুরু কহিলেন, "হা বৎস।"

"সে তো মরিয়া গিয়াছে--প্রভু!"

গুরু কহিলেন,"না বৎস, যে শিশু মরিয়াছে সে দাসী-পুত্র। সুজাদালির পুত্রকে সাদুল্লাখাঁর মাতা পূর্ব্বাহ্নেই ধাত্রীহস্তে দিয়া গোপনে গৃহের বাহির করিয়া দেয়। দাসী-পুত্রের রোগ শয্যায় মহম্মদের সেবা যত্ন দেখিয়া সকলে তাহার প্রতি সন্দেহহীন থাকিবে এই উদ্দেশ্যে তাহারা এই অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছিল। অভিসন্ধি ছিল, জাল মেহেরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মেহেরও ইহলোক ত্যাগ করিবে। কিন্তু সেই গূঢ় অভিসন্ধি সফল হইতে পারে নাই, বিশ্বস্তা ধাত্রী শিশুকে করুণাময়ী সুনন্দার নিকট লইয়া আসিয়া আশ্রয় চাহে। সেই শিশুই তুমি সচ্চিৎ, দেলেনার পিতামহীর নিকট তোমার বস্ত্রালঙ্কার, তোমার সব কাহিনী লিখিত আছে, সুনন্দা অপ্রয়োজনে সে সকল তোমায় দেখাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জানিও বৎস, অদৃষ্টলিপি কোন মতে ঘুচিবার নয়।"

যাহা আমার নিকট এতদিন অস্পষ্ট ছিল আজ সে সমস্তই যেন মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল ও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মা যে কেন কৌতুকচ্ছলে দেলেনাকে আমার বধূরূপে উল্লেখ করিতেন, কেন দেলেনার পিতামহী সেদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজের সম্বন্ধে আজও অজ্ঞ" সে সব,--এবং পরম বন্ধু হিন্দু সন্ন্যাসী কেনইবা একজন ব্রহ্মচারী যুবার মোহ সমর্থন করিয়া মুসলমান বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মতি দিলেন সে রহস্য এখন আমার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আরও একটা কথা অকস্মাৎ আমার চিত্ত তমসার সব অন্ধকার কাটাইয়া সচমক তড়িৎস্ফুরণের মত মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। সেই শ্রান্ত অশ্বারোহীর আমার দিকে নেত্রপাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভূতাহতের ন্যায় পাংশুল মুখ ও অসংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত "সেই মুখ সেই চিহ্ন" এই কথা দুটির প্রকৃত অর্থবোধ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

সমস্ত সঙ্কেতই আমার নবীন পরিচয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল।

পরদিনই গুরুদেব সাজঙ্গী ত্যাগ করিয়া সুদূর হিমালয়ের পাদ প্রদেশে চলিয়া গেলেন। চরণে পড়িয়া সাথী হইলাম। আর কিসের বাধা? যে আলের বন্ধন ছিল তাহাতো নিজের হাতেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি!

সেই অবধি আজ এই সুদীর্ঘ উনপঞ্চাশৎ বর্ষ নির্জ্জন গিরিগুহায় গভীর অরণ্য মধ্যে যাপন করিয়াছি, দেলেনার অধিকৃত এ জীবন মন জগতের জীবনকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারি মধ্যে তাহার বিয়োগ-যন্ত্রণার সান্ত্বনা খুঁজিয়াছি,—বুঝি তাহা অংশত পাইয়াছিও।

আজ জীবনের সন্ধ্যা সমাগত রাত্রি আসিবার আর বিলম্ব নাই,—তাই একবার বেড়াইতে বেড়াইতে এ অঞ্চলে আসিয়া এই আমার আশৈশবের আশ্রয়স্থান দর্শনের লোভ দমন করিতে পারিলাম না। এই খানেই আমি সব পাইয়া আবার সব হারাইয়াছিলাম, এবং এইখান হইতেই পুনরায় হৃতসর্ব্বস্ব আমি আমার সর্ব্বস্ব খুঁজিয়া পাইয়াছি।

ফকির নীরব হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

তাঁহার সেই বৈচিত্রময় জীবন-কাহিনী আমাদের কর্ণে যেন কোন রহস্যজটিল করুণ উপাখ্যানের মত শুনাইতেছিল। সুখে দুঃখে সহানুভূতিতে হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, চক্ষের উপর তাঁহার বর্ণিতা অপরূপ রূপবতী পারসীক মহিলা দেলেনার লাবণ্যমণ্ডিত মূর্ত্তিখানি ভাসিয়া উঠিল, তারপর সেই বাতায়ন-মধ্যবর্ত্তিনী আহত-ললাট আর্ত্ত-দৃষ্টি অভাগিনী!—আমাদের প্রতি নেত্রে অশ্রুজলের নির্ঝর কখন্ ছুটিয়াছিল জানিতেও পারি নাই।

ভাল কিম্বা মন্দ যে বিষয়টা মানুষের মর্ম্মস্পর্শ করে তাহা অতীত হইয়া গেলে তাহার প্রভাব হইতে সহসা চিত্তকে বিমুক্ত করা যায় না। যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলাম, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া আসিয়াছে, বিজন বনভূমি শব্দহীন। পৌষের প্রখর শীত সেই উচ্চ ভূমিতে দ্বিগুণ প্রকোপে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল। হিম-শীতল শীত-বায়ু সাজঙ্গীর জলকণা স্পর্শে শীতলতর হইয়া আমাদের অঙ্গে বরফের ছুরিকা বিদ্ধ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। সাজঙ্গীর সুদীর্ঘ কৃষ্ণবক্ষে অসংখ্য তারকার দীপ্তজ্যোতিঃ দেওয়ালি উৎসবের বাতি জ্বালিয়া বুঝি পুরাতন স্মৃতির সমাধি-উৎসব সম্পন্ন করিতেছিল। আম্র ও তালীবনে জমাট-বাঁধা অন্ধকার ভীষণ কৃষ্ণপর্ব্বতের মত দেখাইতেছিল। সেই শুদ্ধমাত্র গম্ভীর ঝিল্লিকুল-মুখর জনহীন নির্জ্জন কাননভূমে এতক্ষণে আমাদের মুগ্ধ হৃদয় কম্পিত হইল। করিয়াছি কি! এই পথে কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিব?

কিন্তু পরক্ষণেই অদূরের আলোকটা নিকটবর্ত্তী হইল এবং পুরাতন ভৃত্যসঙ্গে বাড়ীর একটি ছেলে আসিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনারা কি বাড়ী যাবেন না?" নামিতে নামিতে সুগম্ভীর গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম, ফকির সাহেব গাহিতেছেন—"নাম না জানে ঠিকানা, নেহি হিন্দু, নেহি মুসলমানা।"

সেই শোকাবহ ঘটনার শ্রুতচিত্র সেদিন আমাদের চিত্তে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলিয়া ফুটিয়া রহিল। সারাপথটা নীরবে কেবল সেই সকল কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। যাঁহাকে দেখিলাম তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী অথবা মুসলমান ফকির সে কথা ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র মনে জাগিতে লাগিল, তিনি একটি হৃদয় বিদারণকারী সকরুণ আখ্যায়িকার ভাগ্যহীন নায়ক।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলাম, ভাঁড়ারের চাবির জন্য রান্না চড়ে নাই, বাড়ীর লোকেরা সকলেই খুব চটিয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র রোদনপরায়ণ খোকাবাবুই অশ্রু-চক্ষে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। (সমাপ্ত)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মিকাডোর লোকান্তর।

২৯শে জুলাই জাপানের রাজধানী টোকিয়ো নগর হইতে "রিউটার" তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন,—জাপানের জনপ্রিয় সম্রাট,—নিপ্পন সাম্রাজ্যের "মহতী দেবতা" ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

রাত্রি ১২টা ৪৩ মিনিটের সময় রাজপ্রাসাদ হইতে সরকারী ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞাপিত হইল,—সম্রাট মিকাডো লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার পর জাপানের যুবরাজ মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজপ্রাসাদের পবিত্র কক্ষে গমন করিয়া জাপানী বিধি অনুসারে প্রাচীন-তন্ত্রের শাসন-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিলেন।

রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে জনতার সীমা ছিল না। অসংখ্য নরনারী নতজানু হইয়া, ভূতলে ললাট স্পৃষ্ট করিয়া সম্রাটের কল্যাণ-কামনা করিতেছিল। তাহাদের প্রত্যেকের পার্শ্বে এক একটি কাগজে নির্ম্মিত, আলোকিত, ফানুস্। এই উপাসক-মণ্ডলীর চারিদিকে সহস্র সহস্র নরনারী অনাবৃত-মস্তকে দণ্ডায়মান। এই জনতার মধ্যে পুরোহিতগণ স্থানে স্থানে বেদীর উপর অধিষ্ঠিত হইয়া, সম্রাটের কল্যাণের জন্য প্রার্থনায় নিরত। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেই বিস্মিত ও মোহিত হইয়াছে।

জাপানের সম্রাজ্ঞী—মিকাডোর মহিষী দিন রাত্রি স্বামীর সেবায় নিরত ছিলেন। অহোরাত্রির মধ্যে তিনি তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। তিনি স্বয়ং অবিশ্রামে সম্রাটের সেবা করিয়াছিলেন। বিশ্রামের অনুরোধেও তিনি সম্রাটের কক্ষ ত্যাগ করেন নাই।

গত শনিবার ও রবিবার সম্রাট তাঁহার দেহে শস্ত্র-বিদ্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। জাপানে ইহা অভাবনীয় ঘটনা। জাপানের সম্রাট দেব-তুল্য। তাঁহার পবিত্র দেহ অধৃষ্য, মিকাডোর ত্বকে শস্ত্রস্পর্শ দণ্ডনীয় অপরাধ। সম্রাটের প্রাণরক্ষার জন্য এই অঘটনও ঘটিয়াছিল। কিন্তু হায়! মানবের সকল চেষ্টাই বিধাতা নিস্ফল করিলেন।

প্রাসাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র জাপানী নরনারী সম্রাটের বিয়োগ-শোকে রোদন করিতেছিল, এবং নত-

জানু হইয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ-কামনা করিতেছিল। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পুরোহিতগণ প্রার্থনায় নিরত ছিলেন। যুবরাজ শপথ গ্রহণ করিবার পর এই জনতায় ঘোষিত হইল,—যুবরাজ—মিকাডোর উত্তরাধিকারী জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এখন তিনি জাপানের সম্রাট,—মিকাডো।

এক জন রাজভক্ত জাপানী আপনার পরমায়ু সম্রাটকে দান করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন! এ রাজভক্তি জগতে অতুলনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

দুই জন ফটোগ্রাফার--"ফ্যালাশলাইটে"র সাহায্যে এই মর্ম্মভেদী শোক-দৃশ্যের ফটো তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে লোষ্ট্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল। দুই জন ফটোগ্রাফারই আহত হইয়াছে।

জাপান-দরবার এক বৎসর রাজ-বিয়োগ-জন্য অশৌচ পালন করিবেন। জাপান-সাম্রাজ্যের সমগ্র জনসাধারণ তিন দিন ও সমাধির দিন অশৌচ পালন করিবেন।

জাপানের কিয়োটো নগরে এক কি দুই বৎসর পরে নবীন মিকাডোর অভিষেক-মহোৎসব সম্পন্ন হইবে।

লণ্ডনস্থিত জাপানী-দুতের বাসভবন সহানুভূতি-সূচক পত্রে প্লাবিত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর সংবাদপত্র সমূহে মিকাডোর গুণগাথা কীর্ত্তিত হইতেছে। মিকাডো মুৎসু-হিতো জাপানে নব সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে জাপান শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সকলেই একমত। বিলাতের "টাইমস" জর্ম্মণীর কৈসর প্রথম উইলিয়মের সহিত মুৎসুহিতোর তুলনা করিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জাপানী কন্সল-জেনারেলের নিকট মিকাডোর বিয়োগে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৩০শে জুলাই লোকান্তরিত মিকাডোর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য সিমলা শৈলে সমস্ত সরকারী দপ্তর বন্ধ হইয়াছিল।

মিকাডোর জীবন-চরিত।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর জাপানের লোকান্তরিত সম্রাট মুৎসুহিতো টোকিয়ো নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাপানের সিংহাসনে আরূঢ় হন। ১৮ ৮ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের শেষ দিবসে তাঁহার অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জাপানের প্রথম শ্রেণীর অভিজাত-বংশীয় প্রিন্স ইছিয়োর দুহিতা প্রিন্সেস হারুকোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুৎসুহিতো যখন জাপানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন জাপান বিষম বিক্ষোভে কম্পিত হইতেছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে শোগুন ইয়েমোচি বিদেশীদিগকে জাপানে বাণিজ্য করিবার ও জাপানী বন্দরসমূহে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। জাপানের রক্ষণশীল সম্প্রদায়—দাইমীয়োগণ ইহার বিরোধী হইয়াছিলেন। নবীন সম্রাট দাইমীয়োগণের অনুরোধে শোগুণের প্রাধান্য ও অধিকার বিলুপ্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনেকে তাঁহার বিরোধী হইলেন। কিন্তু মুৎসুহিতোর দৃঢ় সংকল্প অক্ষুণ্ণ রহিল। তিনি অস্ত্রবলে জাপানে নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মিকাডো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি সার হ্যারি পার্কস সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। পথে কয়েক জন সামুরাই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ভুক্ত বীর সার হ্যারীকে আক্রমণ করে। সার হ্যারী শরীররক্ষী সৈন্যদিগের সাহায্যে কোনও মতে আত্মরক্ষা করেন।

মিকাডো মুৎসুহিতো এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজশক্তি আপনার করায়ত্ত করিবার সংকল্প করিলেন। এই নূতন চেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ সর্ব্বাগ্রে জাপানের রাজধানী কিয়োটো হইতে ইয়োডো নগরে নীত হইল। পরে ইয়োডো নাম পরিবর্ত্তিত ও "টোকিয়ো" অভিধানে অভিহিত হইল। "টোকিয়ো" শব্দের অর্থ -পূর্ব্বঅঞ্চলের রাজধানী।

তাহার পর মিকাডো শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হই-

লেন, শাসন-সংস্কারে তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান 'Deliberative Assembly' অর্থাৎ আলোচন-সমিতি।—ইহা জাপানের বর্ত্তমান রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম অঙ্কুর। এই পরিষদের অনুষ্ঠানে দাইমীয়ো সম্প্রদায় মিকাডোর সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু শতাব্দী হইতে জাপান যে 'হোকেন সেইজি' অর্থাৎ সামন্ত-তন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল। নবীন মিকাডো সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অপ্রহিত প্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রজাবর্গকে নবীন জাতীয় জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন জাপানে নবীন যুগের অভ্যুদয় হইল। পুরাতনের উপাদানে সম্রাট মুৎসুহিতো নবীন জাপানের গঠন করিলেন। এই বৎসর জাপানে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হইল; সাম্রাজ্যে সুবিচার বিতরণ করিবার জন্য নূতন আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হইল। জাপান সকল বিষয়ে ইউরোপীয় আদর্শের অনুবর্ত্তী হইল, জাপানে যুগান্তর ঘটিল।

বলা বাহুল্য, বিনা বাধায় এই সকল সংস্কার সম্পন্ন হয় নাই। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই সকল সংস্কারের ও পরিবর্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনবার জাপানে বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু মিকাডো দৃঢ়হস্তে তিন বারই এই অভ্যুত্থানের দমন করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট ও তাঁহার উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের সহিত বহুবর্ষ পূর্ব্বে জাপানের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল সেই সকল সন্ধিপত্রের পুনঃ সংস্কার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বহুদিন তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মিকাডো আবার এই বিষয়ে অবহিত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ পুরাতন সন্ধিপত্রের সংস্কারে সম্মতি দিলেন, এবং জাপানের সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জও ইংরেজের আদর্শের অনুসরণ করিলেন। জাপান একচক্ষু সন্ধির পক্ষপাতপূর্ণ অনুশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পররাষ্ট্রনীতির জটিল পথে আপনার আলোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার অবকাশ লাভ করিলেন। মিকাডোর চেষ্টা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তে জাপান যুদ্ধের ফলভোগে বঞ্চিত হয়। ১৯০৪-০৫—খৃঃ অব্দে জাপান রুশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়লক্ষ্মী মিকাডোর কণ্ঠে বিজয়-মাল্য অর্পণ করেন। এই যুদ্ধে জাপানীগণ যেরূপ শৌর্য্য-বীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, রাজভক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। মিকাডো মুৎসুহিতো যে এই অদ্ভুত শক্তির উৎস, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রাচ্য দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই প্রথম ইউরোপীয় শক্তির—ইংরেজের সহিত সঙ্কটকালে পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য সন্ধিসূত্রে—মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, বিশৃঙ্খল জাপানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিকাডো মুৎসুহিতো সমগ্র জাপানকে মিলিত ও শক্তিধর জাতিতে পরিণত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জাতির প্রতিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপালনে যদি স্বর্গ থাকে, তাহা হইলে সে স্বর্গ তাঁহার।

মিকাডো এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীঃঅব্দে রাজকীয় উত্তরাধিকার-বিধানের পুরুষ শাখায় সম্রাটের উত্তরাধিকার-অর্শিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৭৯ খ্রীঃঅব্দের নবেম্বর মাসে সম্রাটের জীবিতকালেই যুবরাজ ইয়োসুহিতো জাপান-সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ৩১শে অগষ্ট জাপানের বর্ত্তমান নবীন সম্রাট মিকাডো জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃ অব্দে তিনি প্রিন্স কুজার দুহিতা প্রিন্সেস্ সাদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র। (বসুমতী)

অম্বপালী।

এই সুপ্রসিদ্ধ রমণীর নিজের নাম কি ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। ইঁহার অতি বৃহৎ একটি

আম্রকানন ছিল বলিয়া সাধারণ ডাকনাম অম্বপালী হইয়াছিল। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে ইঁহার জীবনী কথা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। যথা—(১) ধম্মপাল প্রণীত পরমত্থদীপনী; (২) অপদান; (৩) মালালঙ্কার বত্থু এবং বিশেষরূপে (৪) মহাবগ্‌গ (৬—৩০) এবং (৫) মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬—২৫)।

অম্বপালী অতি রূপসী পতিতা রমণী ছিলেন। বেসালি নগরের অনতিদূরে কোটিগ্রামে ইঁহার সুবৃহৎ প্রাসাদ, উপবন এবং আম্রকাননাদি ছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণের চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে (বর্ষা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে) এক দিন মধ্যাহ্নে অম্বপালীর আম্রকাননে শিষ্যদল সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে অম্বপালী ভগবানের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেব সে সময়ে কি শিক্ষা দিতেছিলেন, জানি না; কিন্তু তাঁহার সেই ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া সুন্দরী যুবতী পতিতা রমণী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অম্বপালী গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে ভক্তিভাবে বুদ্ধদেবকে পরদিন মধ্যাহ্নে ভোজনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ যখন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তখন সকলের বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল।

বেসালির লিচ্ছবি বংশীয় রাজা তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে ভগবানের অবস্থানের কথা শুনিয়া বহুসংখ্যক লোক এবং যানাদি সঙ্গে করিয়া ভগবান্‌কে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন কহিলেন যে, তিনি অম্বপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বেসালিপতি আশ্চর্য্য হইয়া অম্বপালীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে অম্বপালী নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বুদ্ধদেবকে রাজভবনে যাইতে দিন। অম্বপালী অস্বীকৃতা হইলে রাজা অম্বপালীকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দান করিতে চাহিলেন। অম্বপালী পতিতা রমণী; অম্বপালী বেসালি-রাজার অনুগ্রহপালিতা; অম্বপালী প্রভূত ধনশালিনী হইলেও রাজার একজন প্রজামাত্র;—কিন্তু অম্বপালী কহিলেন যে রাজকোষের সমস্ত অর্থ দান করিলেও তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবেন না।

পরদিন প্রভাতে বুদ্ধদেব সশিষ্য অম্বপালীর গৃহে আহার করিলেন। আহারের পর অম্বপালী আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন, যে তাঁহার রাজপ্রাসাদের মত বিপুল ভবন শ্রমণদিগের বিহারগৃহের জন্য দান করিলেন; এবং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি বিহারের ব্যয়ের জন্য অর্পিত হইল।

অম্বপালী যখন যৌবনে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া থেরী হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বেসালির অনতিদূরস্থ বেলুব গ্রামে বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই বর্ষা অতিবাহিত হইবার পর কার্ত্তিকের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে ভগবানের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছিল।

মহাপরিনির্ব্বাণের পরে যুবতী থেরী বহুদিন জীবিতা ছিলেন; এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এই অতি সুরচিত গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন। রচনাকৌশলে এবং কবিত্বে এই গাথাটি কত মনোহর হইয়াছে, তাহ পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। প্রাচীনযুগে একজন পতিতা রমণী কতদূর সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকেরই বিস্ময় উপস্থিত হয়। অম্বপালীর কথায় গ্রীস দেশের শিক্ষিতা পতিতা রমণীদিগের কথা মনে পড়ে।

এই গাথাটির পূর্ব্ব সময়ের অন্য কোন আলঙ্কারিক কাব্যরচনা পাওয়া যায় না বলিয়া এই রমণী-রচিত গাথাটি বিশেষ আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত রচনায় বাঁধা নিয়মে যে সকল উপমাপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এ রচনায় তাহা নাই। উপমা নূতন; ভাব নূতন; এবং রচনাকৌশল নূতন।

ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে জরা একদিন আসিবে। যখন সত্য সত্য জরা আসিয়াছিল, তখন তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ রূপগৌরবের কথা অম্বপালী এই গাথায় লিখিয়া গিয়াছেন।

(আর্য্যা ছন্দের accent দিয়া জগতী ছন্দের এই রচনা বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিস প্রতি ছত্রের ১১ অক্ষরের পদ মাত্রানুসারে সাজান,—অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ করিয়া নহে।)

কালকা ভমরবণ্ণসদিসা
বেল্লিতগ্‌গা মম মুদ্ধজা অহুং।
তে জরায় সাণবাকসদিসা।
সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা॥ ২৫২

বাসিতো ব সুরভিকরণ্ডকো
পুপ্‌ফ পূরং মম উত্তমঙ্গভূ।
তং জরায় সসলোমগন্ধিকং।
সচ্চবাদিবচনং ইত্যাদি॥ ২৫৩

কাননং ব সহিতং সুরোপিতং
কোচ্ছসূচিবিচিত্তগ্‌গশোভিতং।
তং জরায় বিরলং তহিং তহিং
........................॥ ২৫৪

সণ্‌হগন্ধকসুবণ্ণমণ্ডিতং
সোভতে সু বেণিহি অলঙ্কতং।
তং জরায় খলতি সিরং কতং
........................॥ ২৫৫

চিত্তকারসুকতা ব লেখিতা
সোভতে সু ভমুকা পুরে মম।
তা জরায় বলিহি পলম্বিতা।
........................॥ ২৫৬

ভস্‌সরা সুরুচিরা যথা মণি
নেত্তাহেসুং অভিনীলমায়তা।
তে জরায়াভিহতা ন সোভতে।
........................॥ ২৫৭

সণ্‌হতুঙ্গসদিসী চ নাসিকা
সোভতে সু অভিযোব্বনং পটি।
সা জরায় উপকূলিতা বিয়।
........................॥ ২৫৮

কঙ্কণং ব সুকতং সুনিট্‌ঠিতং
সোভতে সু মম কণ্ণপালিয়ো পুরে।
তা জরায় বলিহি পলম্বিতা।
........................॥ ২৫৯

পট্টলিমকুলবণ্ণসদিসা
সোভতে সু দন্তা পুরেমম।
তে জরায় খণ্ডা যব-পীতকা।
........................॥ ২৬০

কাননম্হিং বনসণ্ডচারিণী
কোকিলা ব মধুরং নিকূজিতং।
তং জরায় খলিং তহিং তহিং।
........................॥ ২৬১

সণ্‌হকম্বুরীব সুপ্‌পমজ্জিতা
সোভতে সু গীবা পুরে মম।
সা জরায় ভগ্‌গা বিনামিতা।
........................॥ ২৬২

বট্টপালিঘসদিসোপমা উভো
সোভিতে সু বাহা পুরে মম।
তা জরায় যথা পাটলী দুব্বলিকা।
.... ২৬৩

সণ্‌হমুদ্দিকা সুবণ্ণমণ্ডিতা
সোভতে সু হত্থা পুরে মম।
তে জরায় যথা মূলমূলিকা।
........................॥ ২৬৪

পীনবট্টসহিতুগ্‌গতা উভো
সোভতে সু থনকা পুরে মম।
তে রিন্দীব লম্বন্তে নোদকা।
........................॥ ২৬৫।

কঞ্চনস্‌স ফলকং ব সুমট্‌ঠম্‌
সোভতে সু কায়ো পুরে মম।
সো বলিহি সুখুমাহি ওততো।
........................॥ ২৬৬

নাগভোগসদিসোপমা উভো
সোভতে সু উরূ পুরে মম।
তে জরায় যথা বেলুনালিয়ো।
........................॥ ২৬৭

সণ্হনূপুরসুবন্নমণ্ডিতা
সোভতে সু জঙ্ঘা পুরে মম।
তা জরায়তিসদণ্ডকারিব।
.... ॥ ২৬৮

তূলপুন্নসদিসোপমা উভো
সোভতে সু পাদা পুরে মম।
তে জরায় ফুটিকা বলীমতা।
.... ॥ ২৬৯

এদিসো অহু অয়ং সমুস্সয়ো
জজ্জরো বহুদুক্খানমালয়ো।
সোপলেপপতিতো জরাঘরো।
সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা ॥ ২৭০

অনুবাদ ঃ—ভ্রমরের মত কাল ছিল কেশ বর্ণে,
কুঞ্চিত ছিল বেণী-পর্ণে;
আজি যে জরায় মাথা, শণের মতন সাদা;
প্রভুর বচন জাগে মর্ম্মে।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ? (ধুয়া)
সুগন্ধি চূর্ণকে ছিল কেশ সুরভি,
গুঞ্জিতাম চম্পক করবী;
শশকের লোম প্রায়, গন্ধ এখন তায়;
যাবে সব; সারহীন গরব-ই—
সত্যবচনে........................।
যবে কেশ—কাননের মত ঘন রোপিত—
স্বর্ণ সূচিতে হত গ্রথিত,—
ফুটিত কানন পরে, পল্লব শোভাভরে;
আজি যে বিরল আর পলিত।
সত্য...........................।
সুরভিত কাল কেশে বেণী হত রচিত
স্বর্ণভূষণে হয়ে খচিত;
দুলিত শোভায় সাজি, স্খলিত জরায় আজি;
আজি মোর শির কেশরহিত।
....
নীল রঙ্গে তুলি দিয়া যেন পটে লিখিত
ভ্রূযুগল সুন্দর লখিত।

জরায় এখন তথা, পেশীগুলি অবনতা;
সুন্দরী আমি আজ নহি ত।
....

মণি সম সুরুচির ভাস্বর আলোকে
সুনীল আয়ত আঁখি, পলকে
করিল মলিন যেহে! জরা প্রবেশিয়া দেহে?
আদরিবে হেন ধন বল কে?
....

উচ্চ নাসিকা মোর স্বর্ণের বরণে
কি শোভিত! পড়ে শুধু স্মরণে।
শুকায়ে পড়েছে ঝুলে যেন রে মুখের কূলে;
দলিত এ দেহ জরা মরণে।
....

(উপকূলিতা বিয়=উপকূলিতা ইব। কেন যে Mrs. Rhys Davids ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা বুঝিলাম না।)

কঙ্কণ* সম তার সুগড়ন, বর্ণ,—
এমনি শোভিত মম কর্ণ;
বরণ, গড়ন তার কোথায় সে শোভা আর?
এ জরায় সে যে লোল চর্ম্ম।
....

নবোদ্গত কদলীর মত ছিল দন্ত
সারবাঁধা;—আজি শোভা অন্ত;
যবের মতন পীত; শোভা তার অপনীত।
পড়ে খসি! জরা বলবন্ত।
....

উপবনে কোকিলার মত আমি নিতি গো
গাহিতাম সুস্বরে গীতি গো।
গেছে সে মধুর স্বর! তবু কেন কর নর
এ দেহের পরে এত প্রীতি গো?
....

সোনার শাঁখের মত ছিল যার শোভা গো,
এই কি আমার সেই গ্রীবা গো?

(* সে কালের কঙ্কণে কাণের মত পাতা থাকিত।)

জরায় গিয়েছে ভেঙ্গে ঝুলিয়া পড়েছে নেমে।
এ দেহের গৌরব কিবা গো ?

....

বাহু দুটি ছিল যেন বর্ত্তুল অর্গল ;
এখন হয়েছে নত দুর্ব্বল।
জরা বশে হল বাঁকা যেন পাটলীর শাখা।
হায়রে জীবের বল-সম্বল !

....

স্বর্ণ মুদ্রিকা আর বিভূষণ ন্যস্ত
শোভিত আমার দুটি হস্ত।
জটা বাঁধা শিরা তায় গাছের শিকড় প্রায়
জরা ভরে চারুশোভা ত্রস্ত।

....

সুগোল পৃথুল উচুঁ কুচযুগ নমিত ;
যেন তারা রাজে—জল-গলিত
চর্ম্মমোশক প্রায় শুষ্ক বাঁশের গায়।
কোথা আজি চারুশোভা ললিত ?

....

কাঞ্চন ফলকের সুমসৃণ বর্ম্ম,—
এমনি সুঠাম ছিল অঙ্গ ;
জরা আসি আজি তায় শুকায়ে দিয়াছে হায়,
আজি দেহভরা লোল চর্ম্ম।

....

করিকর* সম মম গুরু উরু শোভিত ;
হয়েছে সে দিন আজি অতীত।
রসহীন, দুর্ব্বল, যেন রে বাঁশের নল
আজি সারা দেহ জরামথিত।

....

স্বর্ণ নুপুর আদি বিভূষণ যতনে
সাজাইয়া রাখিতাম চরণে ;
তিলের ডাঁটার প্রায় শিরা তোলা দেখি তায়।
অভিভূত দেহ জরা-মরণে।

তুলা ভরা তুলতুলে রক্তিম ললিত
পদতলে কত শোভা ফলিত ?
ফেটে গেছে পদতল নহে আর সুকোমল
জরাবশে দেহ আজি গলিত।

....

এমনি ত জর্জ্জর দেহ দুখ-গেহটি
তারি পানে ফিরে চাহে কেহ কি ?
দেয়াল হইতে ঝরে রূপের প্রলেপ পড়ে !
গরবের ধন এই দেহ কি ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(* নাগভোগ ইত্যাদি টীকায় অর্থ থাকিতেও Mrs. Rhys Davids কেন যে সাপের সঙ্গে তুলনা করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। পরবর্ত্তী সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিলে এ উপমা বুঝিতে ভুল হইত না।)

ভাগ্যচক্র

(গল্প)

আমার বিবাহের ঠিক পরদিনই প্রাতে দেখি, আমার নবপরিণীতা স্ত্রীর নামে একটা পার্শেল আসিয়াছে। সকলে মিলিয়া পার্শেলটি খুলিলাম। খুলিতেই কতকগুলি টাট্‌কা নূতন পুস্তক ও একখানা পেয়াজ রঙ্গের শাড়ী বাহির হইল। পুস্তকগুলিতে শুধু লেখা রহিয়াছে, আমার স্ত্রীকে উপহার দেওয়া হইল ; কে পাঠাইল, কোথা হইতে আসিল তাহা কিছুই লেখা নাই।

কোন্ অজ্ঞাত-নামার কাছ হইতে আমার স্ত্রীর নামে এই জিনিষগুলি আসিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যতই বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ততই আমার মনটা খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। যাহা হউক, এক একখানা করিয়া পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিলাম। সুন্দর নূতন নূতন পুস্তক। কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রত্যেকখানা পুস্তকেরই মলাটের তলের পাতাখানা লাল কালীতে রঞ্জিত ! আমি ইহার কোনে অর্থ বাহির করিতে পারিলাম না, কিন্তু বুঝিলাম, নিশ্চয়ই ইহার কোনো উদ্দেশ্য আছে

সেবার আমার এম, এ পরীক্ষার বছর। 'মধুচন্দ্রটা' বেশিদিন উপভোগ করিবার অবসর ছিল না, কাজে কাজেই কয়েকদিনের ভিতরই মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিতে হইল।

এম, এ পাশ করিয়াই একটা মফঃস্বল কলেজের প্রফেসারের পদ পাইলাম। আমি সেখানে নিযুক্ত হইবার কিছুদিন পরই আর একটি প্রফেসর আসিলেন। নির্জীব গম্ভীর প্রকৃতির লোক তিনি, আমার মতই অল্প বয়স, কাহারো সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিতেন না; হাসিতেন তো কদাচিৎ দুই এক সেকেণ্ডের জন্য। যেদিন তিনি ক্লাসে একটু হাসিতেন সেদিন ছাত্রেরা বলাবলি করিত, 'আজ জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম!'

আমি কলেজ হোষ্টেলে থাকিতাম। সেই ভদ্রলোকটিও আসিয়া আমর সঙ্গে এক কোঠায় বাসা নিলেন। আমি প্রথম ভাবিয়াছিলাম, এই গম্ভীর পেচকটির সহিত সময়টা বড় সুখে কাটিবে না। কিন্তু পরে সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

নির্জীব এবং গম্ভীর যাহারা, তাঁহাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, যে দুই একজনের সহিত তাঁহারা আলাপ করেন তাহাদের কাছে হৃদয়ের দ্বারটা একবারেই খুলিয়া দেন। ভদ্রলোকটির সহিত এমন ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল যে তাঁহার এমন কোনো কথা ছিল না যাহা আমি জানিতাম না, বা এমন কোনো কাজ ছিল না যাহা আমার কাছে না জিজ্ঞাসা করিয়া করিতেন।

সে সময় ফাল্গুনের প্রথম ভাগ। শীত কাটিয়া গিয়া গরম দেখা দিয়াছে। দুই একটা কোকিল ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের গত বছরের ঘর বাড়ীর সহিত পরিচয় করিয়া লইতেছে।

সেদিন দুপুর বেলা শুকনো বাতাসে সকলকে একবারে ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যখন রাত্রি হইল এবং চন্দ্র উঠিল তখন ধরার উপর এমনি একটা মাধুরী ছড়াইয়া পড়িল যে তখন কাহারো বলিবার সাধ্য ছিল না যে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই পৃথিবীই খা খা করিতেছিল। সে চন্দ্রকিরণের যেন কি একটা মত্ততা ছিল; মানুষ তখন ঘরে থাকিতে পারে না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে—সমস্ত দেহ-মন দ্বারা ইহা উপভোগ করিবার জন্য। মনে নিরবচ্ছিন্ন সুখই থাক বা যাতনাই থাক, এ চন্দ্রকিরণের ভিতর তাহা টিকিতে পারে না; মনের উপর ইহা এমন একটা ভাব বিস্তার করিবে যাহা সুখ কি দুঃখ, হর্ষ কি বিষাদ, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না, অথচ তাহা উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়।

আমি ও সেই ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ধরিয়া হোষ্টেলের সম্মুখস্থ ময়দানে বেড়াইতে লাগিলাম। কাহারো মুখে কথা ছিল না। হৃদয়ের বিষাদের তন্ত্রীগুলির উপর জ্যোৎস্নার মত্ততা আসিয়া আঘাত করিতেছিল। অনেক রাত্রি হইল। ঘরে গিয়া যে শুইতে হইবে একথা কাহারো মনে ছিল না। ধরণী তখন একটা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; শান্ত চাঁদের কিরণ যেন পৃথিবীর উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অনেকক্ষণ পর তিনি বলিলেন :—"না, আর পারি না, আপনাকে একটা ভয়ানক ঘটনা শুনতে হবে—আমার জীবনের কাহিনী, আমার সব। আপনাকে বললে যে কোনো একটা লাভ হবে তা নয়, তবু আজ যেন আমি আর তা চেপে রাখতে পারি না। আমার হৃদয় মন সে কথাটা আজ পূর্ণ করে ফেলেছে, আর তাকে আটকে রাখতে পারছি না, বাধা জলের মত আজ উপছিয়ে তার বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চাহিতেছে।

"সে আজ তিন বছরের কথা। একদিন কলেজ হতে ফিরে এসে বিকালবেলা আমার এক সতীর্থ বন্ধুর সহিত দেখা করতে গেলাম। ছেলে পড়াইয়া এক ভদ্রলোকের বাসায় তিনি থাকতেন। বাসাটির সামনে সুন্দর ঘাসে-ঢাকা কতকটুকু জায়গা ছিল। বাড়ীতে প্রবেশ করবার সময় দূর হতে দেখতে পেলাম, সেই ঘাসের উপর একটা ট্রাইসাইকল নিয়ে একটি বালিকা একটি ছোট ছেলের সঙ্গে খেলা করছে। আমি সামনে আসতেই আমাকে দেখে বালিকা ছুটিয়া পালাইল। আমি তার লাফিয়ে লাফিয়ে ক্যাঙ্গারুর মত দৌড় দেবার ভঙ্গিটির দিকে চেয়ে রইলাম।

"মানুষের জীবনে এক এক সময় এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন অতি ক্ষুদ্র বিষয়, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা

অভাবনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং এবং সেই মুহূর্ত্তটিকে একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত করে গড়ে তুলে।

রাত্রে যখন শুলেম তখন আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্যটি ফুটে উঠলো। সমস্ত শরীর তরঙ্গিত করে কোমল ঘাসের উপর নৃত্যের ভঙ্গিতে সেই যে দ্রুত চরণক্ষেপ তাহা আমার কাছে কতই মধুর বোধ হইল!

"মাঝে মাঝে আমার সেই সতীর্থের সহিত দেখা করতে যেতাম আর প্রায়ই কোনো না কোনো অবস্থায় বালিকাকে দেখতে পেতাম। তাহার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা আনন্দের ঢেউ খেলা করত; যে যেখান দিয়ে চলে যেত তার চতুর্দ্দিকের বাতাস যেন আনন্দে কেঁপে উঠতো, আর সেই কম্পন যেন দূরে বাতাসের গায় আমি উপলব্ধি করতেম।

"এই ভাবে অনেক দিন চলে গেল। বালিকাকে আমি মনে করতেম একটি আনন্দের টুকরা—তার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আনন্দের কণা ছড়িয়ে পড়ছে। আমি ভেবেছিলাম কোনো প্রকার আঘাত না করে এ আমার জীবনটা বেশ একটা শান্ত মাধুরীতে ভরপুর করে রাখছে। কিন্তু ভগবান তা' হতে দিলেন না। দেয়ালে ঠেস দিতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি নাই যে পিঠে গজাল ফুটবে। একদিন শুনতে পেলেম যে তার বিয়ে স্থির হয়েছে।

"তার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না—সমাজ তাহা দেয় না, এবং সে জন্যই বোধ হয় তাকে বিয়ে করব, এ ভাব কখনো আমার মনে জাগে নাই। কিন্তু আজ যখন শুনলেম যে তার বিয়ে স্থির হয়েছে তখন কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটা ধরে খুব করে একটা মোচড় দিয়ে দিলে।

"সে দিন হতে আমি সংসারের কোনো কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না—হৃদয়ের সহিত, প্রকৃত মনের বলের সহিত কোনো একটা কাজে প্রবৃত্ত হতে পারছি না। সংসারের কোনো বন্ধনই এখন আমার কাছে উপযুক্ত-রূপ শক্ত বলে বোধ হচ্ছে না।" এই বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

"হাঁ, তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে আজ এক বছর। আমি তাকে বিয়ে করব, এরূপ দুরাশা আমি কখনো হৃদয়ে পোষণ করি নাই। তার প্রতি আমার ভাবটা ঠিক কিরূপ ছিল তা আপনাকে ভাল করে বুঝাতে পারছি না। তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এ কথাটা আমাকে বড়ই পীড়ন করতেছিল। তার কেন বিয়ে হচ্ছে? সে আমার কাছে উদয় হয়েছিল একটি স্নিগ্ধ প্রীতির আবরণ প'রে—তাহা আমার কাছে চিরসবুজ বলে বোধ হত, এবং আমার পক্ষে তাহা চিরসবুজই থাকবে এইরূপ ছিল আমার বিশ্বাস। কিন্তু তার বিয়ের সময় আমার মন সে ভাব অটুট রাখতে পারে নাই—একটা নৈরাশ্যের ছায়া সেখানে উদয় হল এবং বোধ হল তার প্রতি আমার যে ধরণের ভাব আছে বলে মনে করতেম তাহা মিথ্যা; আমার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বীণায় বেদনা ও বিফলতার সুর বাজতে লাগল।

তার বিয়ের সময় ভাবলেম, আমি যেন দুঃখিত হচ্ছি আমার তো কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হল না! তার বিয়ে, এতে যে আমার আনন্দ করতে হবে! বিয়ের দিন তাকে কিছু উপহার পাঠিয়ে দিলাম। প্রথম ভেবেছিলাম, আনন্দের সহিত তাকে এ উপহার পাঠাতে পারব, কিন্তু দেবার বেলা দেখি আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে! উপহার পাঠিয়েছিলাম কয়েক খানা বই আর একখানা পেয়াজ রঙের শাড়ী। প্রথম যেদিন তাকে দেখি, সেদিন তার সেই রঙের একখানা শাড়ী পরা ছিল—তাহাই যেন তাকে সবচেয়ে ভাল মানাইত। সেই স্মৃতি মনে করে তাকে শাড়ীখানা পাঠাই; আর বইগুলির প্রথম পৃষ্ঠা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করে দিয়েছিলাম! সব লাল—হৃদপিণ্ড ফেটে অন্তর বাহির আমার একবারে লালে লাল হয়ে উঠেছিল!"

আমি হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। সে গুলির যে উত্তর পাইলাম তাহাতে এতদিন যে একটা কথা মাঝে মাঝে আমার মনে উঠিত এবং আমাকে পীড়ন করিত সেই কথার অব্যক্ত ক্লেশটুকু দূর হইয়া গেল। বুঝিলাম, ব্যাপার খানা এই।

তিনি চুপ করিলেন, আমিও কিছু বলিলাম না। অনেক রাত্রি হইয়া গেল, দুজনেই আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন ঘুম হইতে উঠিলাম তখন আমি উৎসুক নয়নে তাহার দিকে চাহিলাম কিন্তু তিনি যেন আমার দিকে চাহিতে নেহাৎ লজ্জা অনুভব করিতেছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, বেচারা!

আমি আমার স্ত্রীকে খুব রগড় করিয়া--সমস্তটা ঘটনা লিখিলাম। তাহার যে উত্তর আসিল ভুলক্রমে তাহা আমি টেবিলের উপর রাখিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি টেবিলের উপর সেখানা নাই। বুঝিলাম সেখানা কি হইয়াছে। বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম।

পরদিন হঠাৎ ভদ্রলোকটী বিদায় নিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পর শুনিলাম, তিনি আর এখানে আসিবেন না—কোনো মফস্বল-স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ লইয়াছেন। আমি বাস্তবিক দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলাম 'বেচারা কি হতভাগা!'

হেমচন্দ্র বক্সী।

ধর্ম্ম কি?

২। পরোপকার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়-কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অর্থ—তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি? মানবের সেবা। দেবেন্দ্রনাথ এই সেবাকে সাধনেরই একটি অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, —"মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।" মানুষ যখন প্রীতিপূর্ণ অন্তরে দুঃখীর দুঃখ মোচন করেন, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা ও শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করেন, তখন ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। সেবা আর পরোপকার একই কথা। সংসারের সাধারণ ভাষায় যাহাকে পরোপকার বলা হয়, ধর্ম্ম-রাজ্যের ভাষায় তাহাকেই সেবা বলা যাইতে পারে। অতএব পরোপকার যে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণতঃ তিনটি ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরোপকার করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ দয়া। মানুষ দারিদ্র্য, রোগ, শোক ও পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে এবং হৃদয়ের অসহ্য যাতনায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। এই অশ্রু দর্শন করিলেই দয়াবান ব্যক্তির অন্তরে করুণা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। তখন তিনি আপনার উচ্ছ্বসিত করুণার আবেগে অধীর হইয়া দুঃখীর দুঃখ যাতনা দূর করিতে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে এই করুণার অমৃত-উৎস লুক্কায়িত ছিল; তাই তিনি যখনই লোকের দুঃখের কথা শ্রবণ করিতেন, তখনই সেই উৎস হইতে করুণার অমৃত-বারি উৎসারিত হইয়া উঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণার সুধা ধারায় কত লোকের জ্বালাময় হৃদয় যে জুড়াইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? এ দেশের অনেক দয়াবান পুরুষ ও দয়াবতী নারী একমাত্র করুণার জন্যই দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে যত্নবান হন। তাঁহারা মনে করেন, প্রত্যেক নরনারী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে বাধ্য। নতুবা সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য কি? ইতর প্রাণীদিগের ত কোন সমাজ নাই, তাহারা কেহই কাহারও দুঃখ নিবারণের জন্য চিন্তিত হয় না; সকলেই আপন আপন আহার নিদ্রা ও সুখের জন্য ব্যস্ত। মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছে, সমাজে বাস করিতেছে, এজন্য মানুষের প্রকৃতি অন্য প্রকার। মানুষ শুধুই আপনার আহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাহাকে অন্যের জন্য ভাবিতে হয়, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়াও অপরের দুঃখ দূর করিতে হয়।

সমাজের প্রত্যেক নরনারী সাধ্যানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির অভাব দূর করিবে—এই জন্যই সমাজ, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের উন্নতিই সমাজের উদ্দেশ্য। মানুষ সর্ব্বদা স্বার্থপর না হইয়া পরার্থে জীবন ধারণ করিতে পারিলেই সমাজের কল্যাণ। একটু চিন্তা করিলেই এ বিষয়ে একটি সত্য উপলব্ধি করা যায়। অন্যের সাহায্য ব্যতীত মানুষের একটি মুহূর্ত্তও চলে না। দরিদ্র ও অসহায়ের কথা নয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু এমন কোন্ ধনী, কোন্ জ্ঞানী আছেন যিনি অপরের সাহায্য ভিন্ন এই বৃহৎ বিশ্বে একটি দিনও বাস করিতে পারেন। পুরাতন "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত একটি কাব্যে লেখা ছিল;—

"এই বিশ্বে অপরের সাহায্য বিহনে
কেহ নাহি দাঁড়াইতে পারে ক্ষণকাল।
চক্ষু খোল, চেয়ে দেখ, মাতা বসুন্ধরা
স্নেহ-কোলে রেখেছেন তাঁর! দিতেছেন
পিতা মাতা রক্ত হৃদয়ের, ভাই ভগ্নী
সুমধুর প্রীতি;— তাই তুমি সুখে আছ
নিত্য নিরন্তর। চেয়ে দেখ কত গুরু
করে বিদ্যা দান, তাই মোরা পাই দিব্য
জ্ঞান। কৃষকেরা ক্ষেত্রে করে চাষ, তাই
মুখে উঠে অন্নগ্রাস। তন্তুবায় বস্ত্র
করে নিয়ত বয়ন, তাই হয় লজ্জা
নিবারণ। কে আছে এমন? অপরের
মুখাপেক্ষী না হয়ে জগতে, এক দণ্ড
আপনারে পারে বাঁচাইতে?"

ঠিক কথা! কেহই কাহারও সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অতএব আমরা সকলেই সমস্ত নরনারীর কল্যাণ চিন্তা করিতে বাধ্য। আমি প্রত্যহ খাইতে, পরিতে ও অধ্যয়ন করিতে সহস্র লোকের শ্রমের ফল গ্রহণ করিতেছি, আমার শ্রমের ফল অন্য লোককে দিতে কেন বাধ্য হইব না? বহুলোক এই বাধ্যতা-বোধ এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জন্যই পর-সেবায় প্রবৃত্ত থাকেন। ইউরোপের কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত রূপ বাধ্যতা-বোধ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ জগতের ধার্ম্মিক লোকেরা প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এই প্রেম লাভ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। জগতের অধিকাংশ লোক স্বার্থপরতার মধ্যে বর্দ্ধিত হয় এবং আত্মসুখের জন্য উন্মত্ত হইয়া সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাতে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম ও হিংসা বিদ্বেষের জন্য সর্ব্বত্রই কি অশোভন দৃশ্য! শত সহস্র মানুষ মানুষকে প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া হিংসা এবং ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেছে; শত সহস্র শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্ব্বলকে সবল ও দুঃখীকে সুখী না করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও দুঃখীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। এই রকম অবস্থায় মানব-প্রীতি যে দুর্লভ সামগ্রী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তবে মানুষ যখন ঈশ্বরকে লাভ করে, ঈশ্বরকে প্রেমের দেবতা বলিয়া বরণ করে, এবং ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শে হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন সেই প্রেম স্বাভাবিক গতিতে মানুষের দিকেও ছুটিয়া যায়। এই জন্য যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনিই পৃথিবীর প্রকৃত সেবক; নরনারীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণই কাঁদিয়া উঠে এবং তিনিই প্রেম লইয়া নরনারীর দ্বারে উপস্থিত হন। একজন লেখক একটি কবিতায় লিখিয়াছেনঃ—

"বুঝিনা কে প্রাণে থেকে আকুল করে যে ডেকে
মরমে উথলে প্রীতি পরশে কাহার!
সাধ যায় শুধু চিতে এ নিখিল ধরণীতে
আপনি গলিয়া যাই প্রেমে আপনার!
কেন মোহে ম্লান আঁখি স্বার্থে আর বাঁধা থাকি?
ঘুচাই যেখানে যত দুঃখ আছে যার!"

ইহাই ত প্রেমিকের হৃদয়ের কথা। প্রেমের শক্তিতেই মানুষ স্বার্থের বাঁধন ছিন্ন করিয়া দুঃখী ও পাপীর সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রাচীন কাল হইতেই খ্রীষ্টান

ধর্ম্মের সাধকগণ একমাত্র ঈশ্বরের প্রেমের জন্য মানবের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং সেই সেবাব্রত উদ্যাপনের নিমিত্ত আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবকগণ ঈশ্বরের প্রেমের খাতিরেই মানবের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক দল শিষ্য ঈশ্বরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই দুঃখীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মানুষ ভাবুকতায় প্রতারিত না হইয়া যদি যথার্থই ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে নরনারীর সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কারণ কেহই আপনার প্রেমাস্পদের অনুকরণ ও অনুসরণ না করিয়া পারে না। মানুষের প্রেমের দেবতা ঈশ্বর নিরন্তর নরনারীর কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন এবং প্রেমময় হইয়া জগতের ধনী দরিদ্র সমস্ত নরনারীকে প্রীতি ও করুণা অর্পণ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। প্রেমিকের জীবন-দেবতা ঈশ্বর প্রেমিক সাধকদিগকে আপনার কার্য্যের অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। এ অবস্থায় প্রেমিক ব্যক্তি কি মানুষকে প্রীতি অর্পণ না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? তিনি আপনার হৃদয়ের আবেগেই দুঃখী ও অসহায়ের দ্বারে ছুটিয়া যান এবং প্রীতির পীযুষ-ধারায় নরনারীর দুঃখ জ্বালা দূর করেন।

এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই জানেন, প্রেমের অতি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। প্রেম স্বার্থপরতা দূর করে, প্রেম আত্মত্যাগের শক্তি জাগাইয়া দেয় এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধি হইতে মানুষকে রক্ষা করে। অতএব ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিতে পারিলেই নরসেবার উপযুক্ত হওয়া যায়; ঈশ্বরের প্রেমই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এবিষয়ে ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তৎপ্রণীত "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"এই পরসেবা ব্রহ্মের প্রতি প্রেমের অনিবার্য্য ফল। এই সেবা প্রেমপ্রসূত এবং মধুময়। ঈশ্বরকে ভাল বাসিলেই জীবে দয়া এবং পরসেবা করিতে হয়।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মহাবীর কাইরাস ও রাণী তমিরি।

অনেক দিনের কথা। সেকালে এশিয়া মাইনরে মীড় নামে এক রাজ্য ছিল। সেই দেশের রাজার নাম আস্ত্যগী। তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এক রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, যে তাঁর কন্যার উদর হইতে জলের স্রোত হুহু শব্দে, প্রবল বেগে বাহির হইতেছে; দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজধানী ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সমগ্র এশিয়া সেই জলের তলে ডুবিয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই রাজা দেশের বড় বড় ম্যাগি পুরোহিত—যাঁহারা ঘর কাটিয়া, মন্ত্র পড়িয়া তারা গুণিয়া, তিথি দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ অতীত বলিতে পারিত,—তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাদের নিকট স্বপ্নের অর্থ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন আস্ত্যগী ঠিক করিলেন, এ মেয়ের বিবাহ কখনই রাজারাজড়ার সহিত দিবেন না, নিতান্ত সামান্য লোকের ঘরে ইহাকে সমর্পণ করিবেন। এই ভাবিয়া পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের সহিত তাঁর কন্যা "মনদানী"র বিবাহ দিলেন। জামাতার নাম কাম্বইস। মীডদের মত তাঁর অতুল ধনদৌলতের জাঁক জমক্ ছিল না। নিতান্ত সাদাসিদা ভাবে তাঁর দিন কাটিত। রাজার মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়া সংসার পাতিলেন।

এক বৎসর যাইতে না যাইতে রাজা আর এক স্বপ্ন দেখিলেন যে মনদানীর গর্ভ হইতে এক প্রকাণ্ড দ্রাক্ষা গাছ বাহির হইয়া সমস্ত এশিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যদ্বক্তারা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যার পুত্র সসাগরা এশিয়ার রাজা হবেন, আপনার সকল ক্ষমতা, সকল তেজ লোপ পাইবে।" স্বপ্নের কথা শুনিয়া রাজার গায়ে কাঁটা দিল, শরীর শুকাইয়া আসিল। সোণার পালঙ্কে তাঁর নিদ্রা নাই, রাজভোগ আর মুখে উঠে না,—হাসি, গান, বাজনা কাণে আর ভাল লাগে না। থাকিয়া থাকিয়া ভাবনায় শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—ম্যাগি পুরোহিতের কথা মনের মাঝে কেবলি তোলাপাড়া করিতেছে।

কিছুদিন পরে আস্ত্যগী তাঁর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী হইতে

তাঁর কাছে আনিলেন। মনদানীর গর্ভে পরম সুন্দর একটি সন্তান হইল। আস্ত্যগীর বড় ভয় পাছে এই সন্তান বড় হইয়া রাজ্য রাজা সমস্ত উলট্ পালট করিয়া দেয়। তাই তাঁকে হত্যা করিবার জন্য রাজা তাঁর বিশ্বাসী কর্ম্মচারী হার্পেগাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন বলিলেন,—"হার্পেগাস, তোমাকে যে কাজের ভার দিব তা সযত্নে কর্‌তে হবে। তোমার প্রভুর স্বার্থ অপরের জন্য নষ্ট করো না, তা'হ'লে হয়ত ভবিষ্যতে তোমাকে এর জন্য দুঃখ পেতে হবে। মনদানীর ছেলেটিকে নেও, তোমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেল। তারপর তা'কে তোমার ইচ্ছামত কবর দেবে।"

হার্পেগাস বলিলেন, "মহারাজ, দাস এ পর্য্যন্ত কখনো ত আপনার আদেশ অমান্য করে নাই, ভবিষ্যতে যে কখনো করিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। আপনার যদি এমন কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে?" হার্পেগাসের হৃদয় ছিল ফুলের মত কোমল; পাষাণ রাজার সেবা করিয়া তাঁর হৃদয় নিষ্ঠুর হয় নাই। কোলে ছোট ছেলেটিকে তুলিয়া দেওয়া হইলে চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া হার্পেগাস বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রীর কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে ঠিক করিয়াছ?" হার্পেগাস বলিলেন, "আস্ত্যগী যা বলিয়াছে, তা আমি কখনো করিতে পারিব না। প্রথমতঃ এই বালক আমার আত্মীয়, কেমন করে আপন হাতে একে আমি মারবো? দ্বিতীয়তঃ বুড়া আস্ত্যগী দু দিন পরে মরে যাবে, তখন দেশের রাজা হবে কে? আমি যেন বিপদে না পড়ি এজন্য এর মরা দরকার, কিন্তু সে কাজ আমা দ্বারা হবে না, রাজার আর কোনো লোককে বলিগে।"

এই বলিয়া রাজবাড়ীর রাখাল মিথ্রদত্তকে তিনি ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হার্পেগাস তাহাকে বলিলেন, "মিথ্রদত্ত, রাজার আদেশে তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, এই ছেলেটিকে পাহাড়ের উপর, বনের মাঝে, জলের ধারে হিংস্র জন্তুর সাম্‌নে ফেলে দিয়ে এসো—তাড়াতাড়ি কাজ সার্‌বে; আর যদি রাজার হুকুম তামিল কর্‌তে একটু অবহেলা কর, তবে যন্ত্রণায় তোমাকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতে হইবে। আমি দেখ্‌তে চাই যে এই ছেলে মরেছে।"

রাখাল রাজার নাতিকে বুকে করিয়া—যেখানে তৃণে ঢাকা মাঠের মাঝে তার গরুর পাল খোঁয়াড়ে বাঁধা ছিল, আর মেষগুলি উদাসভাবে একদিকে তাকাইয়া ডাকিতেছিল, আর ছাগলগুলি আপন মনে চরিতেছিল—সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখে, তার স্ত্রী এক মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে। রাজবাড়ীতে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া ভয়ে ভাবনায় তার স্ত্রী কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এখন স্বামীকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া ব্যাপার খানা কি—জিজ্ঞাসা করিল। মিথ্রদত্ত বুক চাপড়াইয়া বলিল—"হায় হায় আমার অদৃষ্টে এমনও ছিল, এমন কথা শুন্‌তে হবে বলে কি আমাকে নগরে যেতে হয়েছিল! আর কি বল্‌বো! গিয়ে দেখি কি হার্পেগাসের বাড়ীতে মহা কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে! আমার খুবই ভয় হইল, তথাচ বাড়ীর ভিতর গেলাম। সেখানে দেখি, মেজের উপর সোণায় রূপায় সাজানো নানা রঙ্গের কাপড় পরা এক ছেলে। হার্পেগাস আমাকে দেখিয়াই বালকটিকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল। তখন আমি কি করি বল দেখি? আমায় নাকি এই ছেলেকে বনের মাঝে হিংস্র-জন্তুর মুখে দিয়ে আস্‌তে হবে? হায় হায় রাজার হুকুম! আমি ভাবিয়াছিলাম, এ বুঝি কোনো দাসী-পুত্র। কিন্তু তার গায়ে এত সোণা রূপার আড়ম্বর কেন? তারপর নগর থেকে পথ দেখাইয়া বাহিরে আনার জন্য এক দাস আমার সঙ্গে আসিল। তার কাছ থেকে শুনিলাম যে এই ছেলেটি মহারাজের দৌহিত্র। রাজকন্যা মনদানীর পুত্র। তাকেই কিনা রাজা মারতে বলেন; দেখ এই সেই ছেলে!"

রাখাল এই কথা বলিয়া কাপড়ের মধ্য হইতে ছেলে-টিকে বাহির করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে ধরিল। মিথ্রদত্তের স্ত্রীর পুত্র জন্মিয়াছে মরা। তার হৃদয় শোকে এখন কাতর, কোল শূন্য; মায়ের প্রাণ ছোট ছেলে দেখিলে স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠে। রাখাল-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই

ছেলেটিকে চাহিল। বার বার বলিতে লাগিল, "আমার শূন্য কোল পূর্ণ করে দাও গো," "আমার শূন্য কোলে ঐ ছেলেটিকে দাও গো!" কিন্তু হার্পেগাসের ভয়ে মিথ্রদত্ত কিছুতে রাজি হয় না, তখন তার স্ত্রী বলিল, "দেখ, যদি নিতান্ত একটি ছেলেকে পাহাড়ে ফেলিয়া আসিতে হয়, তবে আমাদের মরা ছেলেকে সেখানে রাখিয়া এস। আস্ত্যগীর হুকুম পালন করা হইবে। আর এদিকে আমরা এই ছেলেটিকে মানুষ করিতে থাকি। আমাদের মরা ছেলে রাজ-সৎকার পাউক্, আর জীবন্ত ছেলে আমাদের ঘরে বেঁচে থাকুক!

রাখালের কাছে এই প্রস্তাবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তখন সেই মরা ছেলেকে রাজসজ্জা পরাইয়া বিজন বনের মাঝে ফেলিয়া আসিল। হার্পেগাসের লোক আসিয়া দেখিয়া গেল চিল, শকুনিতে খাওয়া, শৃগাল কুকুরে কামড়ানো এক ছেলে গহন বনের মাঝে পড়িয়া আছে। তাকে চিনা যায় না। তারা ভাবিল, এই বুঝি রাজার নাতির অবস্থা! রাখাল এই ছেলের নাম রাখিল কাইরাস্। কাইরাস্ তার মাবাপের নয়নের মণি, কণ্ঠের হার, আদরের ধন, মায়ের বুক জুড়ানো রত্ন, বাপের বৃদ্ধবয়সের যষ্টি! দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়। বালক বড় হইল। তার গায়ে কি জোর! অল্প বয়সেই সে তার বাপের পশুপাল লইয়া মাঠে বনে বেড়াইতে যাইত। কত বার নিবিড় বনে নেকড়ে বাঘ দাঁত খিচাইয়া, থাবা পাতিয়া, গর্জ্জন করিয়া পশুপালের সামনে আসিয়া বসিত, আর বীর বালক ধীরভাবে, লম্বা লাঠির কঠিন আঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিত! এমনি করিয়া সাহসে, সামর্থ্যে, তেজে, গর্ব্বে, রাজার নাতি চন্দ্রের কলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

গ্রামে কাইরাস্ ছিলেন বালকদের সর্দ্দার। তার বুদ্ধির কাছে সকলকে জব্দ হইতে হইত; তার শক্তির কাছে সবাইকে হার মানিতে হইত!

একদিন বালকেরা 'রাজা রাজা' খেলা করিতে করিতে কাইরসকে রাজা করিল। রাজপদ পাইয়া সে কাহাকেও করিল মন্ত্রী, কাহাকেও ধনাধ্যক্ষ, কাহাকেও অঙ্গরক্ষক, কাহাকেও বা সভাসদের পদ দিল। মাথায় বনফুলের মুকুট, গলায় বনফুলের হার! তখন তার চালচলন ভাবভঙ্গী কথা বার্ত্তা সমস্ত যেন রাজার মত হইয়া গেল! সকলে পারসিক রাজ-দরবারের আদব কায়দা অনুসারে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল! নকল রাজার খেলার দিন এমনি করিয়া কাটিতে লাগিল।

একদিন এক ছেলে তাঁর 'রাজা রাজা' খেলার সময়ে অবাধ্য হইয়া উঠে। ক্রমে যখন সে রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন কাইরাস্ তাহাকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া বেত কশাইয়া ছাড়িয়া দিল। ছেলেটা ছিল নিতান্ত ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্ পেনে আদুরে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে একেবারে তার বাপের কাছে হাজির! এই ব্যাপার দেখিয়া বাপ রাগের মাথায় বকিতে বকিতে রাজার কাছে হাজির হইলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ক্রীত-দাসের ছেলে আমাদের এমন করে অপমান করবে?"

আস্ত্যগীরও ভারি রাগ হইল! তিনি রাখাল ও তার ছেলেকে রাজসভায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আস্ত্যগী কাইরাসকে বলিলেন,—'কি! তুমি নীচকুলে জন্মিয়া এই সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেকে মেরেছ?" কাইরাস্ ধীরে ধীরে বলিল, 'মহাশয়, সে যা পাইবার উপযুক্ত আমি তাকে তাই দিয়াছি।' এই বলিয়া সংক্ষেপে ঘটনাটি রাজার কাছে বলিল।

বালক কাইরাস্ যখন কথা বলিতেছিল, তার হাত পা নাড়ার ভঙ্গী, কথা বলার ধরণ, কণ্ঠের স্বর আস্ত্যগীর কাণে যেন কিসের প্রতিধ্বনির মত বলে বোধ হইতেছিল। আস্ত্যগীর মনে নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সেই সভাসদকে বলিলেন, যে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রের সঙ্গে ইহার আর বিবাদ হইবে না।

তারপর রাজ-ইঙ্গিতে সভাস্থল হতে সকলে চলিয়া গেল। থাকিল কেবল মিথ্রদত্ত ও রাজা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ছেলেটি কে?' রাখাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রাজার ভয়ে সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িল। আস্ত্যগী সকল কথা নীরবে শুনিলেন, ব্যাপারখানা বুঝিতে বাকি রহিল না। হার্পেগাসকে ডাকিতে পার্শ্বরক্ষকগণকে আদেশ করিলেন।

হার্পেগাস্ আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হার্পেগাস্, আমার মেয়ের ছেলের কেমন করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল?" হার্পেগাস্ অবাক্ নির্ব্বাক্! রাখালকে দেখিয়া অসত্য কথাও আর মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মেয়ের ছেলেকে আমি নিজ হাতে মারিনি; হত্যার জন্য আমি এই রাখালের হাতে মনদানীর পুত্রকে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বস্ত লোক গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল, যে মৃতদেহ্ পাহাড়ের উপর পড়িয়া আছে। তারপর কি হইয়াছে, আমি ত জানি না মহারাজ!"

সরল ভাবে হার্পেগাস সকল সত্য কথা রাজার কাছে বলিলেন। আস্ত্যগী মনের রাগ গোপনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন। রাখালের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন হার্পেগাসকে তাহা বলিয়া শেষে বলিলেন; 'যাক্, ভালই হইয়াছে, সেই ছেলে এখন বাঁচিয়া আছে। যাক্, ভগবান্ যা করেন তা ভালর জন্যই করেন। আজ আমার নাতিকে ফিরে পেলাম। আজ কি আনন্দের দিন! আজ আমার বাড়ীতে রাত্রে উৎসব হবে, ভোজ হবে; হার্পেগাস, আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ।"

হার্পেগাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া হৃষ্টমনে গৃহে ফিরিলেন; ভাবিলেন, ভাগ্যে আমি রাজার কথা শুনিনি—না জানি তা'হলে কি হ'ত?"

কিন্তু আস্ত্যগী ত আর এতে বড় সন্তুষ্ট হন নি! তিনি যা করিলেন তা কল্পনা করিলেও পাপ হয়! সেই দিন বিকাল বেলায় হার্পেগাসের একমাত্র ছেলেকে রাজা ডাকাইয়া আনিলেন। তারপর তাহাকে কাটিয়া তার মাংস রাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন! রাত্রে অন্যান্য অনেক অতিথি আসিল। সকলে পশুর মাংস খাইল, কিন্তু হার্পেগাসের টেবিলে কেবল তার ছেলের মাংস দেওয়া হইল! হার্পেগাস্ যখন সমুদয় মাংস আহার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হে, মাংস কেমন রান্না হইয়াছে, ভাল লাগ্‌লো?" হার্পেগাস্ বলিলেন, "খুব ভাল হইয়াছে।" তখন পরিবেশক একটা ঢাকা পাত্র তার সম্মুখে আনিল। রাজা বলিলেন, "নাও নাও, আরও নাও।" কিন্তু ঢাকা খুলিয়া হার্পেগাস্ দেখিলেন, তার একমাত্র পুত্রের কাটা হাত পা, ছিন্ন মুণ্ড! তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু তিনি নিমেষের মধ্যে মনের ভাব দমন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে হারপেগাস্, কোন্ পশুর মাংস বুঝ্‌তে পার্‌ছ?" হারপেগাস বলিলেন, "জানি বৈকি, মহারাজ—আপনি যা দান কর্‌বেন তা আমার কাছে মধুময়—অমৃত!" এই কথা বলিয়া পুত্রের সৎকার করিবার জন্য হারপেগাস্ লুকাইয়া কয়েক টুকরা হাড় বাড়ী আনিলেন।

এমনি করিয়া আস্ত্যগী হারপেগাসের শাস্তি দিলেন! তারপর তাঁর প্রধান ভাবনা হইল—কাইরাসকে লইয়া কি করিবেন। আস্ত্যগী দেশের বড় বড় ম্যাগি পুরোহিতকে ডাকাইয়া কাইরাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বলিল, "বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ছেলেটিকে এখন তার বাপের কাছে পারস্যে পাঠাইয়া দিন।" সেই পরামর্শই ঠিক হইল।

আস্ত্যগী দৌহিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, এক সময়ে এক স্বপ্ন দেখে তোমার প্রতি বড়ই অন্যায় করিয়াছি! তোমার ভাগ্যগুণে তুমি জীবন পেয়েছ! যাক্, এখন তুমি সরল মনে, হৃষ্টচিত্তে পারস্যে ফিরে যাও।"

এই বলিয়া তাকে তিনি পারস্যে পাঠাইয়া দিলেন। মনদানী বা কাম্বইস্ কেহই তাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। যখন চিনিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের কি আনন্দ সে কি বর্ণনা করা যায়! কাইরাস সব কথা বলিয়া বলিলেন, "আমি যে তোমাদের ছেলে, আস্ত্যগীর দৌহিত্র, তা আমি জান্‌তাম্ না, পথে আমার সঙ্গের লোকেরা আমার পরিচয় আমার কাছেই দিল! আমি জানিতাম, মিথ্রদত্ত আমার বাপ ও তাহার স্ত্রী আমার মা—তাদের স্নেহ জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না।"

কাইরাস মাঝে মাঝে মিডিয়ার রাজধানী 'আগবতনা'য় যাইতেন। আস্ত্যগী তখন তাঁর খুব যত্ন আদর করিতেন। একদিন ভোজনগৃহে সকলে টেবিলের চারিদিকে বসিয়া আহার করিতেছে, এমন সময়ে কাইরাস্ বলিলেন, "দেখুন, আমাদের দেশে কিন্তু আহারাদির এত আড়ম্বর নাই, আমাদের ক্ষুধা অল্পেই মেটে।"

ভোজনাগারে সকল কাজই খুব ব্যস্ত-সমস্ততার সহিত হইতেছে। একজন খাদ্যপরিবেশক খুব তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্ম করিতেছে দেখিয়া রাজা তাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কাইরাস সেই অযথা প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'আমি ইহার চেয়ে অনেক ভাল করিয়া পরিবেশন করিতে পারি।' তখনই রাজাজ্ঞায় পরিবেশকের বেশ পরিয়া কাইরাস খাদ্য লইয়া টেবিলের পাশে উপস্থিত হইলেন। কি সুন্দর ভাবে, কি তৎপরতার সহিত, কি পরিপাটি রূপে বালক পরিবেশন করিতে লাগিল! সকলে ত দেখিয়া অবাক্! আস্ত্যগী বলিলেন—"এমন সুন্দর পরিবেশক আমি কখনো দেখি নাই—আমার নাতির মত পরিবেশক মেলা ভার! কিন্তু ভাই, তুমি একটা কাজ কর্‌তে ভুলেছ; তুমি খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ ত' গ্রহণ কর নাই—এটা যে নিয়ম!" কাইরাস বলিলেন—"সেটা আমি ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়াছি।" আস্ত্যগী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, তা কর্‌লে কেন?" কাইরাস ধীরভাবে বলিলেন—"ঐ পেয়ালার মধ্যে বিষ আছে বলে বোধ হলো।"

রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষ! বিষ! বল কি? বিষ কোথা থেকে আসবে! এ কথা তোমার মাথায় কোথা থেকে এলো?"

বালক কাইরাস নিতান্ত সরল ভাবে বলিয়া গেল—"কিছু দিন আগে আপনি এক ভোজ দিয়াছিলেন। সে দিন দেখি কি মীডিয়ার বড় বড় লোকেরা এই বিষ পান করে পাগলের মত হয়ে যা' তা' কর্‌তে লাগ্‌লো! আর আপনিও দাঁড়াইতে পর্য্যন্ত পারিতেছিলেন না, বার বার উঠিয়া উঠিয়া হেলিয়া পড়িতেছিলেন।" আস্ত্যগী বলিলেন—"কেন, তোমার বাবাকে কি কখনো এমন অবস্থায় দেখনি?"

কাইরাস্ বলিলেন,—"না, কখনো না! তাঁর তৃষ্ণা পেলে তিনি জল খান! আমাদের দেশে তাই যথেষ্ট।"

পারসিরা প্রাচীন কালে মদ খাইত না; এমন কি, শোনা যায় যে অতি প্রাচীন কালে যখন আর্য্যেরা একত্র বাস করিত তখন তাহাদের মধ্যে একদল 'সোমরস'কে [illegible] করিয়া পান করিত বলিয়া, তাহারা পৃথক হইয়া যায়! এই আর্য্যদের পারসিক শাখার নাম ইরাণী, ভারতীয় শাখার নাম হিন্দু।

যাক্ সে কথা! তারপর এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল। হারপেগাস্ কিন্তু প্রতিশোধের কথা ভুলেন নি। ছেলের শোকে, আস্ত্যগীর অত্যাচারে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিতেছিলেন।

এদিকে কাইরাস বড় হইয়া লোকের মন অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি সকলের হৃদয়ের দেবতা, বাহিরে রাজা হইয়া উঠিলেন। হারপেগাস্ সুযোগ বুঝিয়া তাঁকে হাত করিবার জন্য মাঝে মাঝে নানারূপ উপহার পাঠাইতেন। এদিকে মীডিয়ার রাজধানী 'আগবতানায় অনেক সম্ভ্রান্তলোক আস্ত্যগীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে হারপেগাস্। পারস্য হইতে মীডিয়ায় যাইবার রাস্তা প্রহরীতে পরিপূর্ণ! খবরাখবর পাঠানো বড় কঠিন! তাই হারপেগাস্ এক বুদ্ধি খাটাইলেন। তাঁর এক বিশস্ত চাকর ছিল; তাকে ব্যাধের বেশে সাজাইয়া মরা জীবজন্ত কাঁধে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন! একটি খরার পেট চিড়িয়া তার মধ্যে একখানি চিঠি পুরিয়া এমনি করিয়া শেলাই করিয়া দিলেন যে বাহির থেকে কিছু বোঝা যায় না। ছদ্মবেশী ব্যাধকে বলিয়া দিলেন যে 'কাইরাসকে নিজ হাতে এই খরার পেট চিড়িতে বলিও।

তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। খরার পেট চিড়িয়া কাইরাস এক পত্র পাইলেন। সেই চিঠি পড়িয়া কাইরাসের শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। গায়ের লোম পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। পারস্যকে স্বাধীন করিয়া মীড় জাতিকে পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিবার সাধ তাঁর অন্তরে জাগিয়া উঠিল!

পারস্যে তখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বাস করিত। কাইরাস নানা জাতির লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল সকালে তোমরা কাস্তে লইয়া আসিও।" সকলে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের কাঁটা কাটিতে বলিলেন। সকলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে খাটিয়া কাঁটা কাটিল। তারপর দিন কাইরাস তাঁর বাড়ীর সমস্ত গরু, ভেড়া ছাগল কাটিয়া বিরাট এক ভোজের আয়োজন করিলেন। সমস্ত লোককে ডাকিয়া

বলিলেন,"যত পার তত খাও।" তারাও যে যত পারিল তত খাইল। সকলে বলিতে লাগিল, 'এমন খাওয়া কখনো খাই নাই।' সুযোগ বুঝিয়া ক্যাইরাস্ বলিল, "তোমরা আজকের দিন পছন্দ কর, না কালকার দিন?" সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "আজকার—আজকার।" তখন কাইরাস বলিলেন, "তবে মীড়দের হাতথেকে পারস্যকে উদ্ধার কর, তোমরা স্বাধীন হও; তাহা হইলে এমনি সুখে দিন কাটবে, কত সামগ্রী খেতে পাবে!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারত-মহিলা-মিলনক্ষেত্র।

সম্প্রতি ষ্টেট্স্‌মেন পত্রে জনৈক অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা ভারত-মহিলাদের জন্য একটি ক্লাব (club) অর্থাৎ মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এদেশীয় মহিলাদের জন্য একটি মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আমি বহু দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমা অপেক্ষা কোন উপযুক্ততর ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিবেন মনে করিয়া আমি এতদিন নীরব ছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি নিরাশ হইয়াছি। আমাদের নেতৃবর্গ সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিতেই পটু—কিন্তু সে সকল সংস্কার ত আর ত শুধু বক্তৃতাদ্বারাই সুসিদ্ধ হয় না! আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের বালিকারা শিক্ষিতা না হইলে এবং মহিলাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার না হইলে সমাজসংস্কার অসার স্বপ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। পুরুষদের নিকট হইতে আমাদের বেশী আশা করা উচিত নহে, আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টি নারীর কাজ—তাহাদেরই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক।

বহির্জগতের সহিত ভারত-নারীর সম্বন্ধ অতি সামান্য। তাহাদের নিত্যকর্ম্ম হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং তাহারা সাধারণতঃ প্রফুল্লতা বর্জ্জিত, খিটখিটে ও সঙ্কীর্ণমনা। তাহাদের স্বাস্থ্যও অল্পবয়সেই খারাপ হইয়া যায় এবং তাহারা অকালবার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। আপন আপন আত্মীয় কুটুম্ব ব্যতীত অন্য মহিলাদের সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ তাহাদের নাই বলিলেই চলে। সুতরাং তাহারা সমশ্রেণীস্থ ভগিনীদের সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞা এবং তাহাদের সহিত যথোচিত সহানুভূতি স্থাপনে অসমর্থা। এই নিমিত্ত আমরা জনহিতকর কোন সৎকার্য্যের জন্য আবেদন নিবেদন করিলে তাহাদের নিকট হইতে যথোচিত সহৃদয় ব্যবহার পাই না। আর, আমোদ প্রমোদের প্রতি অনুরাগ মানুষ মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং উপযুক্ত আমোদ প্রমোদের সুবিধা না পাইয়া সময় সময় তাহারা এমন আমোদে যোগ দেয় যাহা হিতকর বা পবিত্র নহে। সুতরাং তাহাদের জন্য যদি স্থানে স্থানে মিলনক্ষেত্র (Club) প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তদ্দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

কিছুদিন হইল মহিলাদের জন্য কয়েকটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডল ও মহিলা-শিল্পসমিতি এই দুইটির নামই আমি জানি। কিন্তু আমি যেরূপ মিলনক্ষেত্রের কথা বলিতেছি, এই দুটির কোনটিই সেই শ্রেণীভুক্ত নয়। আমার প্রস্তাবিত মিলনক্ষেত্র শিক্ষা বৃদ্ধির সহায়তা করিবে বটে কিন্তু তাহা বিদ্যালয় নহে। সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি ব্যতীত, অবসর সময় কিরূপে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াদিতে যাপন করিতে হয় এবং পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় দ্বারা কিরূপে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতে হয় এই মিলনক্ষেত্র সে বিষয় সাহায্য করিবে।

আমাদের প্রস্তাবিত মিলনক্ষেত্র গুলি সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষিতা মহিলাগণের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সভ্যগণের চাঁদা খুব অল্প হওয়া আবশ্যক—যেন সকলেই যোগ দিতে পারেন। সূচনায় অবশ্যই বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমার বোধ হয়, উপযুক্ত মহিলাগণ আবেদন করিলে জন সাধারণ এবিষয়ে মুক্ত-হস্তে অর্থসাহায্য করিবেন। নেত্রীগণ যদি সরল ও মিষ্ট

প্রকৃতিবিশিষ্ট হন আমরা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিতে পারিব। যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাবে আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

অবশ্য এই সুবিশাল দেশের পক্ষে একটা মিলনক্ষেত্র কিছুই নয়। কালে প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু প্রথমে বড় বড় সহরে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। তারপর ছোট ছোট সহরে ও গ্রামে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে। এইরূপে ভবিষ্যতে দেশে একটা প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে—যাহার শক্তি কেহই আর অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্য প্রথমে অতি সামন্য ভাবেই আমাদিগকে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমে কোন বড় সহরেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। বড় বড় সহরেই এরূপ মিলনক্ষেত্রের আবশ্যকতা অধিক, কারণ সহরের স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসিনীগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অন্তঃপুরনিবদ্ধা। যদিও তাঁহারা বিশাল জনতাদ্বারা বেষ্টিত হইয়াই বাস করেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা বাহিরের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বর্জ্জিতা।

সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই এই মিলনক্ষেত্রে যোগ দিবার অধিকার থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় মহিলা এই শ্রেণীর বিলাতী সমিতিগুলির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইলে ভাল হয়। অবশ্যই বিলাতী ক্লাবের সহিত আমাদের মিলনক্ষেত্রগুলির যথেষ্ট প্রার্থক্য থাকিবে, তবে ঐগুলি হইতে কার্য্যপ্রণালীর অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বাগ্রে একটা ভাল বাড়ীর আবশ্যক। সহরের স্বাস্থ্যকর পল্লীতে, বেশ একটু খোলা জায়গা আছে এমন একটা বাড়ী ভাড়া করিতে হইবে। সেই খোলা জায়গাতে একটু বাগান করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়, এবং বাহিরে একটু খোলা স্থানও নিশ্চয়ই থাকিবে। মহিলাগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করেন বাগানে নানা প্রকার ফুল ও তরকারীর চাষ করিতে পারিবেন। সেই বাড়ীতে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, তাহাতে ভাল ভাল পুস্তক, পত্রিকা থাকিবে। পাঠ গৃহটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত থাকিবে। একটি গৃহে কোন কোন বাদ্যযন্ত্র, অন্ততঃ একটি হার্মোনিয়াম থাকিবে। যাহাদের বাড়ীতে হার্মোনিয়াম নাই তাঁহারা এখানে হার্মোনিয়াম শিখিতে পারিবেন। একটি শিলাইয়ের কলও থাকিবে। যাহাদের অবস্থা খারাপ তাহারা শিলাই না জানিলে এখানে শিলাই শিখিতে পারিবেন। একটি গৃহে তাস, দাবা প্রভৃতি নির্দ্দোষ খেলার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়।

একটি বড় ঘর থাকা আবশ্যক। তাহাতে পাক্ষিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত থাকিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষিতা মহিলাগণ বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ করিবেন। নারী জাতির উন্নতি বিষয়ে সেখানে নানা আলোচনা হইতে পারিবে, নানা প্রকার সৎকার্য্যের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে। স্থানান্তর হইতে কোন সুশিক্ষিত মহিলা আসিলে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয় জানিয়া লইতে পারা যাইবে।

সময় সময় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, বায়োস্কোপ ইত্যাদি দেখাইয়া, গ্রামোফন শুনাইয়া, মহিলাদের প্রীতিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। কখনো কখনো সেখানে মহিলাদের প্রস্তুত নানা প্রকার শিল্পের প্রদর্শনী হইতে পারে ; দরিদ্র ও বিধবাদের প্রস্তুত শিল্পাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। একবার ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

পরিচারিকাগণ যদি সদয়হৃদয়, প্রফুল্লচিত্ত ও সুদক্ষ হন তবে এইরূপ মিলনক্ষেত্রের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

———

অষ্টম ভাগ। আশ্বিন, ১৩১৯। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কার্ত্তিকের ভারত-মহিলা ২৪শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

জেনারেল বুথ।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :- স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। } আশ্বিন, ১৩১৯। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

উম্‌অল্‌ খয়ের রাবেয়া।

দিগন্তহারা বালুকা-প্রান্তরের এক কোণে একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম,—বিশুষ্ক প্রকৃতির মধ্যে ছায়ালালিত স্নেহ-পুষ্ট একটী আনন্দ-নিকেতন। বৃক্ষলতাপরিশূন্য মরু-প্রান্তরের মধ্যে দূরে দূরে কেবল মাত্র উষ্ট্র-আস্বাদিত ক্ষুদ্র, কণ্টক-লগ্ন, সাদা পত্র-শাখা-সংবৃত মনসাফণী গুল্মের সুতীক্ষ্ণ অঙ্গুলিগুলি সাদা বালুকার উপর শ্যামল রেখাপাত করিয়াছে। দৃষ্টি যখন গগনতল-ব্যাপিনী মরুভূমির তরুলতা-জল-জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করে তখন ভীতিবিহ্বল মন অবশ হইয়া আসে, এবং দূরে এই শান্ত পল্লীর ছবিখানি নন্দনের সহস্র স্নেহ-হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠে।

অপরাহ্নে রাবেয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে বসিয়া বোরকা শেলাই করে, পশমিনা বুনন করে, আর ক্ষণে ক্ষণে দূর প্রান্তরের দিকে সাগ্রহে অবলোকন করে,—কখন তাহার ক্ষুধিত শ্রান্ত পিতার মূর্ত্তিখানি সুদূর পল্লীর প্রান্ত-পথে খর্জ্জুর-কুঞ্জের মধ্যদিয়া অস্পষ্ট দেখা যাইবে। রাবেয়া পিতার জন্য রুটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, মরু-দুর্লভ পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে,—কখন পিতা আসিয়া সাগ্রহে পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত ক্লান্তি দূর করিবেন।

পিতা কায়িক পরিশ্রমে জীবনোপায় সংগ্রহের জন্য প্রভাতে উঠিয়া সুদূর পল্লীগ্রামে চলিয়া যান, অপরাহ্নে কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া স্নেহশীলা কন্যার সযত্ন প্রস্তুত আহার্য্য, প্রাণভরা স্নেহ ও যত্ন পাইয়া পরিতৃপ্ত হন;

মাতৃবিয়োগ বিধুরা এই ক্ষুদ্র কন্যা আপনার প্রাণভরা স্নেহ এবং শ্রমনৈপুণ্য দ্বারা গৃহের শ্রী ও শান্তি বজায় রাখিয়াছে। পিতা এ হেন কন্যারত্নের অধিকারী হইয়া সংসার-মরুভূমের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া আছেন; সুদূর পল্লীগ্রামে দৈনিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহার দেহ যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসে, তখন গৃহে ফিরিতে ফিরিতে তাঁহার মন কি এক অজানিত পুলকে ভরিয়া উঠে, কখন গৃহে পৌছিয়া তাঁহার নয়নানন্দ দায়িনী কন্যার স্নেহ-প্রফুল্ল মুখখানি অবলোকন করিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। এত শ্রমেও তাহার জীবনের আনন্দ-ধারাটী বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই, বরং কন্যার প্রসাদে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল!

যখনই সুদুর খর্জ্জুর-বীথির মধ্য দিয়া পিতার দীর্ঘমূর্ত্তি ও মস্তকের শুভ্র কেশগুচ্ছের উপরিস্থিত জড়ান পাগরীটী অস্পষ্ট নয়নগোচর হইত, তখনই রাবেয়া পশমিনা ফেলিয়া উঠিত, এবং একখানা আসন বিছাইয়া ও পানীয় জল প্রস্তুত রাখিয়া দ্বারদেশে আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে পিতার দিকে চাহিয়া থাকিত। বৃদ্ধ পিতা উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমির মধ্যে দ্রুত পাদক্ষেপ করিয়া আগ্রহ-দৃষ্টিপূর্ণ কন্যার পরম স্নেহপূর্ণ মুখখানি দুর হইতেই অবলোকন করিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিত এবং বলিত,—"প্রাণের রাবেয়া!" "বাবা!" এই ক্ষুদ্র স্নেহপূর্ণ কথাটী মাত্র রাবেয়ার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত; কিন্তু তাহাতেই বৃদ্ধ সমস্ত বিশ্ব জগত এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ও লাবণ্যে পূর্ণ বলিয়া অনুভব করিত; মরুভূমির বুক চিড়িয়া যদি তখন একটা শীতল কুলপ্লাবিনী তটিনী বহিয়া যাইত তাহা হইলেও সে ক্ষুদ্র কথার সম্পূর্ণ আনন্দ পরিব্যক্ত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ!

রাবেয়া ত্রস্ত হস্তে পিতার হস্তপদ প্রক্ষালনের জল আনিয়া দিত; হস্ত পদ প্রক্ষালনের পর পিতাকে আসনে বসাইয়া স্বহস্তে একটীর পর একটী খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিত; পিতার আহারাদি শেষ হইলে শয্যা বিছাইয়া দিয়া তাহার ক্ষুদ্র কর-পল্লব বুলাইয়া শায়িত শ্রান্ত পিতার সমস্ত ক্লান্তি অপনোদন করিত; সন্ধ্যায় শিয়রে বসিয়া পিতার নিকট কত পুণ্যবতী মহিলার জীবনকাহিনী শুনিত। এমনি করিয়া বৃদ্ধের জীবন-অপরাহ্নের দিন গুলি আনন্দ ও শ্রমের মাঝখানে কাটিতেছিল; জীবনের তৃপ্তি তাহার পরিপূর্ণ ই ছিল।

কিন্তু একদিন হঠাৎ দৈব প্রতিকূল হইল! নৈরাশ্য-পূর্ণ ভীষণ মরু-প্রান্তরে নিষ্ঠুরহৃদয় বেদুইন দস্যুরা নিরাপদে বিচরণ করিবার সুবিধা পাইত; সুযোগ পাইলেই তাহারা নিঃসহায় পথিকের ধন ও জীবন হরণ করিত, এমন কি সময় সময় নিরীহ শান্ত পল্লিগুলির উপর নিপতিত হইয়া মনুষ্য, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, ধনরত্ন যাহা কিছু পাইত অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত; ইহাদিগের জন্যই আরবের মরুভূমি তীক্ষ্ণধার ক্ষুর অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ এবং শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য অপেক্ষা অধিক বিপদাকীর্ণ!

এই নিষ্ঠুরহৃদয় নর-পশুরা দ্রুতগামী উটের সাহায্যে অতি সহজেই বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়ে; অনুসরণকারীরাও অধিক দুর অগ্রসর হইয়া জীবন বিপদাপন্ন করিতে সাহসী হয় না।

একদিন এই বেদুইন দস্যুরা এই পল্লীর উপর নিপতিত হইল,—পল্লী ছারখার করিল, এবং ক্ষুদ্র বালিকার একমাত্র অবলম্বন রাবেয়ার পিতাকেও বন্দী করিয়া লইয়া গেল। নিশার অন্ধকারে ক্ষণকালের মধ্যেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। ১২ বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা সারারাত্রি বালুকায় মুখ গুজিয়া কাঁদিল,—সান্ত্বনার জন্য কেহ আসিল না; নৈশ আঁধারের মধ্যে একটা করুণ আর্ত্তনাদ মরুভূমির নিষ্ঠুর প্রাণের মধ্যে অজস্র অশ্রুজল সঞ্চিত করিতে লাগিল।

প্রভাতে পল্লীবাসীরা আসিয়া দেখিল, রাবেয়া একাকিনী, বালুশয্যা আলিঙ্গন করিয়া অজস্র অশ্রুভারে ধরণীতল সিক্ত করিতেছে।

দয়ার্দ্র পল্লীবাসীরা রাবেয়ার ভার স্কন্ধে লইল। সকলেই দরিদ্র—কাজেই স্থির হইল, রাবেয়া প্রত্যহ এক এক জনের বাড়ী আহার করিবে। এই ক্ষুদ্র বালি-কার পক্ষে শ্রমদ্বারা জীবনোপায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল না; কাজেই দরিদ্র পল্লীবাসীদের এই সহৃদয় ব্যবস্থা রাবেয়ার জীবনরক্ষার হেতু হইল।

তবুও রাবেয়া প্রত্যহ প্রতি বাড়ীতে নানা কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিত না। সে অনেক যত্নে ও শ্রমে মরুদুর্লভ জল সংগ্রহ করিয়া ও পল্লীবাসীর শিশুসন্তানদের যত্ন করিয়া আপনার নিরুদ্ধ যাতনার আগ্নেয়গিরিকে সারাদিন প্রশমিত করিয়া রাখিত; সন্ধ্যা শেষে আপনার নির্জন কুটীরে প্রবেশ করিয়া যাতনার সহস্র উৎস উৎসারিত করিয়া দিত। শৈশব-স্মৃতি বিজড়িত এই গৃহখানি একদিন পিতার গভীর স্নেহে পূর্ণ ছিল, স্বর্গগত মাতার অমৃত-প্লাবনে শীতল ছিল,—রাবেয়া কি করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? শৈশবের সেই আনন্দ-কুটীরেই তাহার সমস্ত বেদনার সমাধি রচিত হউক, এবং তপ্ত অশ্রুধারার মধ্যে অতীতের আনন্দ, স্নেহ-ভক্তির ছবিখানি হৃদয়কে অভিষিক্ত করুক,—ইহাই তাহার প্রাণের ইচ্ছা। সারা-দিন কর্ম্মক্লান্তির পর রাবেয়া আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার সান্ত্বনাময় স্নেহ-মধুর কোল-খানির যেন অর্দ্ধেক ফিরিয়া পায়, আর অর্দ্ধেক নীরব বেদনায় পুঞ্জীভূত হইয়া বালিকার কোমল প্রাণকে নিষ্পেষিত করিতে থাকে। পিতার স্মৃতির সহস্র কথা উদিত হইতে হইতে একটা নিগূঢ় রস প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পিতার স্মৃতির চিত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে;—তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও তাহাকে প্রতারণা করিতে থাকে; বাহিরে পিতার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া আগ্রহে দুয়ার খুলিয়া দেয়, কিন্তু ক্ষণপরেই এ বিভ্রম যাতনার ও নৈরাশ্যের আঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়;—ক্ষুদ্র বালিকা কক্ষতলে লুটাইয়া বেদনার দীর্ঘ-শ্বাসে বায়ু উত্তপ্ত করিয়া তোলে। বিনিদ্র রজনীর কালিমা, নিরাশ হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষত এবং দগ্ধ হৃদয়ের বিশীর্ণতা দিন দিন বালিকার বদনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিতে ছিল।

কোন দিন অপরাহ্ণে জল লইয়া স্বীয় গৃহপ্রাঙ্গণ দিয়া ফিরিবার সময় তাহার বিস্মৃত চেতনা যেন ফিরিয়া আসিত—এখনই ত পিতা ফিরিয়া আসিবেন!—দূরে খর্জ্জুর-কুঞ্জের দিকে সে সাগ্রহে ফিরিয়া চাহিত;—ঐ দূরে কি যেন দেখা যায়!—মরুভূমির স্বপ্নমরীচিকা ক্ষণকালের জন্য বালিকার বেদনাতপ্ত হৃদয়ে তরলতা ঢালিয়া তাহাকে বহ্নির মত প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছে!

রাবেয়ার দিন এমনি করিয়া কাটিতে লাগিল;—দিন যায়, মাস যায়,—বৎসরও গত হইল।

একদিন অপরাহ্ণে সমস্ত কাজের অবসানে রাবেয়া আপন কুটীর-দ্বারে বসিয়া ভাবনানিবিষ্ট আছে। বৃদ্ধ পিতার কথা মনে করিয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল;—কোথায় কোন্ মরুপ্রান্তরে দস্যু-শিবিরে তাহার বৃদ্ধ পিতার দিন না জানি কেমনে কাটিতেছে!—হয়ত ক্ষণে ক্ষণে তাহার কথা মনে করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভিজাইতেছেন! হায়! দস্যুরা তাহাকেও কেন লইয়া গেল না—এই সারা উত্তপ্ত দিন পিতার না জানি কেমনে কাটিয়াছে? কেহ বলিয়া দিলে রাবেয়া দস্যু-শিবিরে উপনীত হইয়া পিতার অবসন্ন দেহের শ্রান্তি দূর করে! রাবেয়ার অবসন্ন দেহের বেদনা নানা চিন্তায় ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় দীর্ঘপথ-শ্রমকাতর, সচকিত শ্বাস, ক্লান্তি-অবনমিত একটী বৃদ্ধ রাবেয়ার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিশুষ্ক যাতনায় ব্যথিত কণ্ঠে করুণ চীৎকার করিয়া বলিল—"রাবেয়া, প্রাণ যায়—শীঘ্র জল!"

রাবেয়া চিনিল,—এ তাহারই বৃদ্ধ পিতা। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাবেয়া জল আনিবার জন্য ছুটিল। রাবেয়া অত্যল্প সময় মাত্র গৃহে থাকিত বলিয়া সেখানে জল রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিত না; গৃহে এক বিন্দুও জল ছিল না; নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে সে জল আনিতে ছুটিল। জল লইয়া আসিতে কিছু সময় লাগিল।

আসিয়া দেখে, পিতা বালুকাশয্যায় অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন,—নিস্পন্দ দেহ, স্থির আঁখিতারা, বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর। রাবেয়া তাড়াতাড়ি জল লইয়া পিতার ওষ্ঠে চক্ষে সিঞ্চন করিতে লাগিল। এই শীতল জলে তৃষিতের স্পৃহা আর মিটিল না; মরণের কোন্ অগাধ সমুদ্রে সে পিপাসা এতক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে! কিছুক্ষণ গত হইলে রাবেয়ার ভ্রান্তি বিদূরিত হইল; পিতাকে মূর্চ্ছিত মনে করিয়া পিতার হস্ত পদ মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন

করিতেছিল; কিন্তু হায়! কন্যার অগাধ স্নেহ, অপরিসীম যত্নেও পিতা পুনর্জীবিত হইল না;—তখন রাবেয়া স্বীয় অশ্রুজলে মৃত্যু-মলিন দেহের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ, সমস্ত কঠোরতা ধৌত ও কোমল করিয়া দিতে লাগিল। হায়, প্রকৃতির কি নিশ্চল কঠোরতা! এক বিন্দু পানীয় জলের অভাবে পিতার মুখে সুধাস্রাবী "রাবেয়া"——এই কথাটী আর শুনিতে পাইল না! রাবেয়া নিজ দোষে যথা সময়ে এক বিন্দু পানীয় পিতার মুখে দিতে পারিল না!—তবে সে নিজেই কি তাঁহার মৃত্যুর কারণ নয়!—এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! নিদারুণ অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস!

গভীর যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া রাবেয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পল্লীবাসীরা আসিয়া গতজীবন পিতার পার্শ্বে কন্যাকে মূৰ্চ্ছিত দেখিতে পাইল।

কন্যার মূর্চ্ছা দূর করিয়া পল্লীবাসীরা দস্যু শিবিরে ক্ষুধাক্লিষ্ট, বেদনাপ্লুত, বিনিদ্ররজনীর কালিমা-অঙ্কিত বৃদ্ধের বিশীর্ণ দেহযষ্টির সৎকার করিল।

ইহার পর রাবেয়া নিরাশ জীবনের দীর্ঘ শ্বাসের মত, শূন্য হৃদয়ের আৰ্ত্তনাদের মত বাঁচিয়া রহিল;—তাহার শূন্য কুটীরখানি সমাধির প্রিয় আবরণের মত তাঁহাকে বুকে করিয়া রহিল।

আবার একদিন বেদুইন দস্যুরা এই পল্লীর উপর নিপতিত হইল; এবং রাবেয়ার শূন্য গৃহখানি আরও শূন্য করিয়া তাহারা রাবেয়াকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। অর্থলোভে দস্যুরা তাহাকে পারস্যের দাস-বন্দরে বিক্রয় করিল। বসোরার এক ধনী যুবক রাবেয়াকে দাসী-রূপে ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। গৃহস্বামীর নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন রাবেয়াকে অনেক সময় অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। সে নীরবে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিত; কিন্তু অন্যান্য দাস দাসীর কোন ব্যসনে লিপ্ত না হইয়া সে স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এবং বিদ্যা চর্চ্চায়ও কিঞ্চিৎ মন দিয়াছিল।

একদিন প্রভুগৃহে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রচুর কয়েক জন বন্ধু বান্ধব সমাগত হইল। বিলাস ব্যসনে তৎকালীন সমাজ ঘোরতর দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছিল। গৃহস্বামী ও সমাগত বন্ধু বান্ধব সকলেই মদিরা পানে বিভোর ছিল,—কিন্তু তাহাদের হৃদয়নিহিত নিষ্ঠুর প্রকৃতি সজাগ ছিল।

একজন প্রশ্ন করিল,—"মনুষ্য ও পশুর পদ-জঙ্ঘায় কি কোন সাদৃশ্য আছে? তন্মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ উত্তর করিল,—নির্ম্মাণ-কৌশলের কোন পার্থক্য নাই—কেবল মাত্র গঠনের তারতম্য। পশুর দেহনির্ম্মাণ-কৌশল মনুষ্যেরই অনুরূপ; অবস্থা বিশেষে তাহার গঠন পারিপাট্য ও অবস্থানের মাত্র প্রভেদ, তদ্ব্যতীত অনেক অংশের সহিত মনুষ্য শরীরের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়;—কিন্তু বোধ ও বুদ্ধিবৃত্তি হিসাবে মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব।

অন্য একজন বলিল,—"মনুষ্যের শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি সবই অবগত আছ।"

বিশেষজ্ঞ হাসিয়া বলিল, "জিনিষ পাইলে পদ-জঙ্ঘার ব্যাপারটুকু তোমাদের সমক্ষে দেখাইয়া দিতে পারিতাম।"

এমন সময় রাবেয়া ভোজন-দ্রব্যাদি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

একজন বলিল, "এখানে ত তা হইবার উপায় নাই!"

গৃহস্বামীর আগ্রহও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, বলিল, "কেন, এই খানেই হোক, এই বিশ্রী দাসীটার পা কাটিয়া দেখিলেই ত চলিতে পারে!"

অবিলম্বে ছুরি আনিয়া রাবেয়ার পায়ের জঙ্ঘা কাটিয়া বিশেষজ্ঞ মহাশয় হাড়ের অবস্থান-কৌশল সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল; কিন্তু রাবেয়া এত যাতনায়ও অবিচল রহিল, যাতনার একটী করুণ স্বরও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। জঙ্ঘা দেখা শেষ হইলে সকলে বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের প্রশংসা করিয়া বলিল, "বাঃ! ভগবানের কি অদ্ভুত রচনা-কৌশল!"

এই অসহ্য যন্ত্রণার সময় ভগবানের মহামৃতময় নাম রাবেয়ার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সে মুগ্ধ হইল; তাহার তিমিরান্ধ জীবনের মধ্যে এক মহালোকের ধারা আসিয়া প্রবেশ করিল। সেই আলোকে রাবেয়া জীবনের মহাপথ

চিনিয়া লইল! কোন ব্যথা কোন যন্ত্রণাই তাহাকে আর অভিভূত করিতে পারিল না। তারপর কয়েক মাস রাবেয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যায় শুইয়া একমনে পরম পিতার আরাধনা করিতে লাগিল। ক্রমেই তাহার জীবন এক নবালোকে ভরিয়া উঠিতে লাগিল

রাবেয়া সুস্থ হইয়া পুনরায় প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল; কিন্তু সমস্ত কার্য্যের অন্তরালে এক নিভৃত স্থানে বিশ্বদেবতার সহিত তাঁহার মিলন সম্পাদিত হইত। গৃহকার্য্যের অবসানে গভীর রাত্রিতে রাবেয়া একা নির্জ্জন কুটীরে বিশ্বদেবতার সহিত মিলন সম্ভোগ করিত; তাহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু নির্গত হইত এবং মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত।

রাবেয়া মৃদুস্বরে প্রার্থনা করিত, "হে অরূপের রূপ-স্বরূপ! আমার নয়নের জ্যোতিঃ! চিত্তের সৌন্দর্য্য! আত্মার আনন্দ! প্রাণের সর্ব্বস্ব! হৃদয়সখা! গোপনে তোমার নিভৃত আসনখানিতে বসিয়া আমাকে দেখা দেও; তোমার মধ্যে বিশ্বজগত যেমন ভাবে আশ্রয় করিয়া আছে, বিশ্বজগত তোমাকে সে রকম ভাবে অনুভব করে না কেন প্রভো? তুমি তাহাদিগকে যে রকম স্নেহদ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছ তাহারা তোমাকে সে রকম ভাবে স্নেহ করে না কেন নাথ! বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা-ভার আমাকে বহিতে দেও প্রভো! আর বিশ্বের প্রসন্ন মুখের ধ্বনি আমার কৃতজ্ঞতার বাণীতে ভরিয়া তোল।" গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রাবেয়া প্রত্যহ এই প্রকার উপাসনায় অতি-বাহিত করিত।

একদিন কোন দাসী আসিয়া গৃহস্বামীকে সংবাদ দিল—রাবেয়া ভ্রষ্টা, সে স্বকর্ণে গভীর রাত্রিতে রাবেয়াকে তাহার প্রেমাস্পদের সহিত অস্পষ্ট প্রেমালাপ করিতে শুনিয়াছে।

গৃহস্বামী সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রাবেয়ার গুরুতর শাস্তি বিধানের সংকল্প করিল; কিন্তু তাহার আগ্রহ হইল, রাবেয়া কাহার সহিত প্রণয়াসক্ত তাহা জানিতে হইবে। সেই দিন গভীর রাত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে বলিয়া সে মনস্থ করিল।

সেই দিন গভীর রাত্রিতে গৃহস্বামী স্বীয় কক্ষ হইতে বহির্গত হইল; গৃহ হইতে বাহির হইয়াই উদার আকাশ ও জ্যোৎস্না-পরিস্নাত উদ্যান, আলো ছায়ায় গলাগলি, যেন একটা অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য তাহার চক্ষের দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়া মর্ম্মের মধ্যে একটা বিস্ময়াবিভূত আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিল।

একি! এ কা'র মহোৎসব! এ কা'র কক্ষ-নির্গত জ্যোতি-রেখা এমন আনন্দের মধুময় আবেশ রচনা করিয়াছে! কার জন্য এ সৃষ্টি! আমি কি অন্ধ ছিলাম এতদিন? কই এ বিশ্ব-আনন্দের জ্যোতি-রেখা ত এত দিন আমার চক্ষে পড়ে নাই!

হঠাৎ একটা আনন্দের আঘাতে সচেতন হইয়া গৃহস্বামী কেমন একটা গভীর বিস্ময় অনুভব করিল; কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার পূর্ব্ব চেতনা ফিরিয়া আসিল; সে আজ রাবেয়ার প্রণয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবে, ধীরে ধীরে রাবেয়ার গৃহের নিকট উপস্থিত হইল। অস্পষ্ট এক সঙ্গীত তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। গৃহকক্ষের রন্ধ্র দিয়া দেখিল, রাবেয়া নিভৃত কুটীরে প্রণত হইয়া বলিতেছে, "হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি জান, প্রতি নিয়তই আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করি। হে মনোমন্দিরের স্বামী, প্রতিমুহূর্ত্ত তোমার সেবায় লিপ্ত থাকি, যদি স্বর্গের লোভে তোমার উপাসনা করি তবে আমাকে দগ্ধ কর, যদি নরকের ভয়ে তোমার উপাসনা করি, তবে নরকেই আমার যেন স্থান হয়। প্রভু, তুমি আমার চিত্তের একমাত্র আশ্রয়, তুমি ছাড়া চিত্তের অন্য কিছু ভাবনা নাই।"* তারপর রাবেয়া স্বীয় গৃহস্বামী, দাস দাসী সকলের জন্য প্রভু পরমেশ্বরের নিকট মঙ্গল কামনা করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রাবেয়ার প্রার্থনা শুনিয়া গৃহস্বামীর নির্দ্দয় হৃদয়ও বিগলিত হইল। জীবনের সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া কোন্ মহাসঙ্গীতের ধ্বনি আজ তাহার প্রাণে প্রবিষ্ট হইল! গত জীবনের সমস্ত বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া কি এক বিপুল ভাবাবেগ তাহার হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিল!

---

* পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন কৃত তাপসমালা।

গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার জীবনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ক্ষুদ্রতার সমস্ত জাল, সংশয়ের সমস্ত বাধা, স্বার্থের প্রবল বন্ধন এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া গেল। পরদিনও গৃহস্বামী নিভৃতে দাড়াইয়া রাবেয়ার প্রেমভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিল; সমস্ত সংশয় বাধা বিমর্দ্দিত তাহার জীবনের মধ্যে এক মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত হইল।

তার পর দিন প্রাতে গৃহস্বামী অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া সমস্ত দাস দাসীকে মুক্তি প্রদান করিল; এবং রাবেয়াকে ডাকিয়া বলিল—"রাবেয়া তপস্বিনী! তোমার নিষ্কাম প্রেম আমার জীবনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়াছে; রুদ্ধ গৃহে স্বার্থ অপবিত্রতা লইয়া মত্ত ছিলাম; তুমি বুঝাইলে জীবনের শুভ সঙ্কল্প, ঈশ্বর প্রেমের মাধুর্য্য ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত পথ। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম; তুমি কি চাও বল, তোমাকে কিছুই আমার অদেয় নাই। রাবেয়া লজ্জিত হইয়া বলিল,—আপনার কাছে কি আর চাহিব! জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ দান, প্রাণের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বস্তু—সেই প্রভু পরমেশ্বরকে আপনার আলয়ে আসিয়াই আমি পাইয়াছি—আপনার কৃপার জন্য সহস্র সহস্র ধন্যবাদ; আপনার জন্যই আমি প্রভু পরমেশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছি, আর আমার কোন কামনা নাই।"

সেই দিন হইতে রাবেয়া স্বাধীন ভাবে বসোরাতেই বাস করিতে লাগিল। তাহার নিষ্কাম লোকসেবা, পরোপকার ব্রত ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ দর্শনে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। তাঁহার অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণ করিবার জন্য সহস্র লোক তাঁহার দ্বারে সমাগত হইত। নিষ্কাম ব্রতী এই মহিলার যশ সুদূর দিগন্তেও পরিব্যাপ্ত হইল। সহস্র সহস্র ধনী অর্থসম্ভার দানে কৃতার্থ হইবার জন্য এই পুণ্যবতী মহিলার নিকটবর্ত্তী হইত; কিন্তু তাপসী সমস্তই সবিনয়ে ফিরাইয়া দিতেন; এবং নিজে অত্যন্ত দীনভাবে ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতেন।

তিনি স্বীয় সঞ্চিত অর্থে বোগদাদ হইতে মদিনা পর্য্যন্ত একটী খাল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ও তৃষ্ণার্ত্তের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। তৃষিত পিতার মৃত্যুমলিন ছবি তাঁহার এই মহোপকার ব্রতের মধ্যে নিশ্চয়ই সজীব ছিল।

রাবেয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ অলিভ পর্ব্বতের সমুচ্চ শিখরে সমাহিত করা হয়।

তিনি লোকসেবার জন্য এত দূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁহার কবর-স্থান একটী তীর্থে পরিণত হইল। লোকে তাঁহাকে "উম্ অল্ খয়ের রাবেয়া" 'মঙ্গল মাতা রাবেয়া' নামে প্রসিদ্ধ করিল। তাঁহার কবর-স্থানে ভক্তির অজস্র উপহার আজো নিপতিত হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

আমার দয়াল স্বামী।

রাজার হালেতে ছিনু এতদিন, তোমারে ডাকিনি' কভু,
দয়া করে' আজ দীনের কুটীরে, আপনি এসেছ প্রভু!
আনন্দ আমোদে আছিনু মত্ত;—বিবশ দিবস যামী,
পথের ভিখারী করিয়া আমারে বাঁচালে দয়াল স্বামী!
সোণার সংসার আছিল আমার পূর্ণ রতন মাণিকে,
ফুৎকারে সকল দিলে উড়াইয়া—যাদু মন্তরে জানি কে!
গর্ব্বের পর্ব্বত গিয়াছে গলিয়া,—গহ্বরে এসেছি নামি,
করুণা করিয়া তুলিলে আমারে—তুমি হে দয়াল স্বামী!
পুত্র কলত্র প্রিয় পরিজন—সহোদর সখা-সাথী,
যাহা কিছু ছিল, লইয়াছ কাড়ি' ভিটায় জ্বলে না বাতি!
সুখের বদলে দেছ দৈন্যদুঃখ!—ছিন্ন স্নেহের বন্ধ,
পুণ্য আলোকে খুলে দিলে আঁখি—টুটিল সকল ধন্দ!
এতদিন প্রভু, তোমারে ছাড়িয়া, দূরে দূরে ছিনু আমি,
করুণা করিয়া টেনে নিলে কাছে—হে মোর দয়াল স্বামী!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

নীলিমা।

রাক্ষসী প্লেগ যখন কত সোণার সংসার ছারখার করিয়া শত শত নরনারীকে মাতৃহীন, পিতৃহীন, পতি-পুত্রহীনা করিয়া আপন ভীষণ ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছিল,

সেই সময় ডাক্তার করুণাময় হালদার একাকী জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজয় বাবুর কন্যা নীলিমাকে প্লেগের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন।

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল করিয়া, বিজয় বাবুর চিরানন্দময় গৃহ শ্মশানভূমে পরিণত করিয়া, একে একে তাঁহার স্ত্রী, তিনটী পুত্র ও একটী মাতৃহীন পৌত্র সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল; অবশেষে বিজয়বাবুও তাঁহার একমাত্র কন্যা নীলিমাকে করুণাবাবুর হাতে সঁপিয়া দিয়া ও তাঁহার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রী পুত্রের অনুগমন করিলেন। কেহ কাহারও জন্য কাঁদিবার রহিল না!

ভয়ে দ্বারীরা দ্বার ছাড়িয়া, মালীরা বাগান ফেলিয়া, চাকর দাসীরা কাজকর্ম্ম রাখিয়া যে যাহার স্থানে পালাইল। গয়লানী আর দুধ দিতে আসিল না, পিয়ন চিঠি দিতে আসা বন্ধ করিল। চিঠি কাহাকে দিবে, কে লইবে? প্রতিবাসীরা বাহির হইতে বিজয়বাবুর বাড়ীর দিকে চাহিয়া শিহরিয়া চোখ ঢাকিল। জানা শুনা লোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"হায় হায়! প্লেগ লোকটার সুখের গৃহ শ্মশান করে ছাড়লে!"

খবর পাইয়া কোম্পানির লোক খালি বাড়ীতে তালা দিতে আসিয়া দেখিল, ফুলবাগান ধুধু করিতেছে, ফলের বাগানে শুষ্কপত্র রাশীকৃত হইয়া পথ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; শূন্যবাড়ীতে ঘরে ঘরে বাতাস হা হা করিয়া ফিরিতেছে, খোলা দরজা জানালাগুলি জীবিত প্রাণীর স্পর্শ অভাবে মনের দুঃখে আছড়াআছড়ি করিয়া মরিতেছে। কেবল দ্বিতলের একটা কোণের ঘরে "ওকি ও?"—সভয়ে সে তিনহাত পিছাইয়া গেল, গা-টা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্নার স্বর তাহার কাণে গেল, কাহার যেন ফিস্‌ফিসে কথা সে অস্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে বুঝিল, বাড়ীতে ত আর এক প্রাণীও নাই, সকলে একসঙ্গে গিয়াছে, কাহারও শ্রাদ্ধ শান্তিও হয় নাই, মুখে আগুন পড়িয়াছিল কিনা তাই বা কে জানে, সুতরাং যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। সঙ্গের লোকদের বাহির হইতে ডাকিবারও তাহার সাহস হইল না, অস্ফুট রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সে একেবারে বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের মুখে শুনিল, "সত্যই সকলে মরিয়াছে, সে শ্মশান সম গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ, কেহ কাহারও জন্য বিলাপ করিবার নাই।"

তাহার মুখে খালি বাড়ীর এই সংবাদ পাইয়া আর কেহই যখন সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় যাইতে সম্মত হইল না তখন বিরক্ত মনে স্বয়ং বড়কর্ত্তা কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ লইতে লইতে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বিতলের কোণের ঘরটীতে পালঙ্কের উপর একটী সুপরিষ্কৃত শয্যায়, ডাক্তার হালদার একটী মুমূর্ষু যুবতীর পার্শ্বে স্পন্দহীন প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন; আর একটী কঙ্কালসার বৃদ্ধ যুবতীর পদতলে বসিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, শূন্য অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই পালঙ্কের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সুকুমারমূর্ত্তি যুবক করুণাময়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবু! কেন এ বিপজ্জনক স্থানে থাকিয়া নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন? এত লোক এ বাড়ীতে প্লেগে মরিয়াছে, আর এক মুহূর্ত্তও কোন সুস্থ ব্যক্তির এখানে থাকা উচিত নয়। যদিই মেয়েটীর বাঁচিবার কিছু আশা থাকে, হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া এ বাড়ী ছাড়িয়া যান, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না।"

করুণাময় সাহেবকে এই সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিয়া দৃঢ়স্বরে জানাইলেন, যুবতীর পিতা যখন জীবনের অন্তিম সময়ে ডাক্তারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কন্যা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ দুশ্চিন্তামুক্ত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন, তখন ইঁহার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তিনি এই শয্যাপার্শ্বেই থাকিবেন এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে প্রাণের বিনিময়েও যদি ইঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন, আপন জীবন ধন্য জ্ঞান করিবেন।

সাহেব তাঁহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া এবং এই মুমূর্ষু নারীর জীবন অপেক্ষা ডাক্তারের নিজের জীবন কত

মূল্যবান্ তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারিয়া. ডাক্তারের জীবনাশায় একরূপ নিরাশ হইয়া দুঃখিত মনে সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। সংবাদ পাইয়া করুণাময়ের আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন. আরও অনেকেই তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসলেন। অনেক সাধ্যসাধনা অনুরোধ উপদেশেও যখন কোন ফল হইল না তখন সকলেই তাঁহার জীবনাশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়া গেলেন। গৃহে তাঁহার পত্নী ছেলেমেয়ে তিনটীকে লইয়া কাঁদিয়া দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বিশ্বের সকলেই যখন করুণাময়ের বুদ্ধির দোষে তাঁহাকে ত্যাগ করিল তিনি তখন দিনের পর দিন সেই শ্মশানভূমে, একাকী আহার নিদ্রা ভুলিয়া নীলিমাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, পরানুগ্রহে প্রতিপালিত করুণাময়ের প্রাণ আজ এই পিতৃমাতৃহীনার দুঃখে করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাই বিশ্বের আহ্বান তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

* * * * * *

ডাক্তারের অশেষ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমে নীলিমার জীবনের আশা হইল। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে একে একে নীলিমার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল; তাহার ছোট ভাইটীর পার্শ্বে মা-ও যে রোগশয্যা লইয়াছিলেন তাহা তাহার মনে পড়িল, গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া যোগাকে দেখিয়া ক্ষীণস্বরে নীলিমা মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। এই পরিবারের সুখ দুঃখের নিত্যসাথী বৃদ্ধ ভৃত্য যোগা আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া নিরুত্তরে হঠাৎ ব্যস্ততার ভাণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার বাবু ঔষধের গ্লাস হাতে করিয়া নীলিমার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঔষধ না খাইয়া ব্যগ্রভাবে সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নীলিমা পিতাকে তাহার কাছে ডাকিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া, কেন কেহই তাহার নিকটে নাই, ব্যাকুল ভাবে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বহুকষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া ডাক্তার করুণাময় অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে বুঝাইলেন—সকলে রোগমুক্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু বাড়ীর হাওয়া খারাপ হওয়ায় সকলকেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নিতান্ত অসম্ভব হওয়ায় কেবল মাত্র তাহাকেই স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় নাই; কিন্তু শরীরে একটু শক্তি হইলে নিজে উঠিয়া দাঁড়াইবার ও উপর হইতে নীচে নামিবার সামর্থ্য হইলেই তাহাকেও স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইবে। পিতার কথা বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া নীলিমা জানিল, তাঁহার সঙ্গেই সকলে গিয়াছে।

চোখের জলে নীলিমার বালিস ভিজিল; বাড়ীতে তাহার আপনার লোক কেহই নাই শুনিয়া উজ্জ্বল দিবা-লোকও যেন তাহার চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। সন্দেহ হইল, ডাক্তার মিথ্যা প্রবোধ দিতেছেন না ত? সত্যই কি সকলে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন? সত্যই কি সে আবার সকলকে দেখিতে পাইবে? ডাক্তার বাবুর কথায় নীলিমা অবিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু পিতা-মাতার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিল। তাঁহা-দের বিপদের আর কোন আশঙ্কা নাই, ডাক্তার বাবু ইহা বিশেষ ভাবে জানাইলেও বিপদাশঙ্কায় তাহার প্রাণ মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। পিতা দুর্ব্বল শরীরে নিজে আসিতে পারিবেন না, নীলিমাকেই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে, শুনিয়াও প্রতি মুহূর্ত্তে সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহা ভিন্ন ডাক্তারের অপরিসীম সেবা যত্নে প্রতি-দিনই সে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তবুও তাহাকে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তাঁহারই সেবা গ্রহণ করিতে হইল।

ডাক্তার হালদার একদিকে যেমন অশেষ যত্নের সহিত নিয়মিত ঔষধ পথ্যাদি দিয়া নীলিমাকে নীরোগ করিয়া তুলিতেছিলেন, তাহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাহাকে এই বজ্রাঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন।

অবশেষে নীলিমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এইবার

করুণাময়ের স্ত্রী পুত্র কন্যার কথা স্মরণ হইল, এতদিনে তিনি তাহাদের জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু নীলিমার নিকট তিনি যে নিদারুণ সংবাদ এতদিন গোপন রাখিয়াছেন এখন বিদায় কালে তাহা না বলিলেই নয় জানিয়া কোন্ সময়ে কি ভাবে কথাটা তাহাকে জানাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(২)

সকলি বিসর্জ্জন দিয়া, অশ্রুমাত্র সাথী করিয়া, শোকসন্তপ্ত প্রাণ নীলিমা তাহার আজন্মের বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তার করুণাময়ের সহিত তাঁহারই গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইল।

ছেলে মেয়েরা তাহাদের এই নূতন পিসীমাকে পাইয়া হৃষ্ট হইল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহার হৃদয়রাজ্যটা নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়া মনের সুখে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল. আর করুণাময় অকৃত্রিম স্নেহে যত্নে এই পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, অভাগিনীর দুঃখ যৎকিঞ্চিৎ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু করুণাময়ের গৃহিণীর সহিত নীলিমার কি যে অশুভক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল জানি না। প্রথম দর্শনাবধিই তিনি তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। যত দিন যাইতেছিল নীলিমার প্রতি তাহার এই বিরাগ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল; প্রতিদিনের প্রত্যেক কথায় প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার অসন্তোষ ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। আবার নীলিমার ন্যায় অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা ঘরে রাখা যে নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য তাহা চপলার শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিণীগণও তাঁহাকে বুঝাইতে ত্রুটি করিতেছিলেন না। চপলার জননীও একদিন দৌহিত্র দৌহিত্রকে দেখিবার ছলে আসিয়া দুধ কলা দিয়া ঘরে কাল সাঁপ পোষার পরিণাম অন্তরালে কন্যাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কন্যা অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন—"কি করব বল মা? উনি কি আমার কথার বশ! জান ত প্লেগের ভয়ে যখন লোক পালাচ্ছিল, চারিদিকে হাহাকার উঠেছিল, উনি সেই সময় সেই শ্মশানের মাঝে ওই প্লেগ রোগীর পাশে বসে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন! একবার ছেলে মেয়েদের কথা ভাবেন নি, কারও বুদ্ধি নেন নি, কোন কথায় কান দেন নি, মা কালী মুখ তুলে চাইলেন তাই ওঁকে প্রাণে প্রাণে ফিরে পেলুম, নইলে আমারই যে আজ কি দশা হ'ত তা' জানি না!"

"তা হোক গে বাছা, এ আবার করুণার বাড়াবাড়ি, লোকের মার পেটের বোনেরও যত্ন দেখেছি, কিন্তু এমনতর যত্ন আর কোন কালে দেখিনি। আর যা হোক, দুদিন পরে তোমার মেয়েটারও ত বিয়ে দিতে হবে, তা অমন আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলে কেউ তোমার মেয়ে নে যাবে কেন?"

চপলা দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কি আর বলব মা, বরাত আমার! নইলে ও বাহিরের জঞ্জাল আমার ঘরে আসবে কেন!" কন্যার দুঃখে মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ বিষাদে মৌন থাকিবার পর বাহিরের জঞ্জাল আবার বাহিরে ফেলিবার উপায় স্থির করিতে সঙ্কল্প করিয়া সেদিনের মত জননী কন্যার নিকট বিদায় লইলেন।

চপলার মনোভাব নীলিমার বুঝিতে বাকি ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জগতে তাহার নিকট-আত্মীয় কেহই ছিল না, তাহার পিতা বিজয়বাবু ছিলেন জনৈক গ্রাম্য জমিদারের সন্তান। অন্য কোন অংশীদার না থাকায় তিনি একাই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হন এবং পিতার মৃত্যুর পর পল্লীবাস উঠাইয়া রাজধানীতে আসিয়া স্থায়ী বসবাস করেন ও মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই তাহার দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্বগণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

প্লেগ যখন তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণকে আক্রমণ করে তিনি তখন তাঁহার খৃষ্টান বন্ধুগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, ক্রমে রাক্ষসী যখন তাহার দারুণ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিজয়বাবুর পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া পৌত্র ও কন্যাটীকেও আক্রমণ করিল তখন সে আনন্দময় গৃহে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া একে একে সকলে আপন আপন প্রাণ নিরাপদ করিবার চেষ্টায় নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পৌত্রটীর মৃত্যুর

পর, জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া রোগশয্যায় শয়ন করিয়া বিজয়বাবু ভাবিলেন—ঈশ্বরেচ্ছায় যদিই নীলিমা রক্ষা পায়, তাহাকে দেখিবার এক ডাক্তার ভিন্ন উপস্থিত আর কেহই নাই, তাই তাঁহারই উপর নীলিমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকিবে, আর যদি নীলিমার মৃত্যু হয়, তাঁহার অসময়ের বন্ধু পুত্রোপম করুণাময়ই তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইবেন, ইহা রোগে জ্ঞানশূন্য হইবার পূর্ব্বেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ করুণাময়ের হৃদয় অপার্থিব করুণায় পূর্ণ, পার্থিব সম্পদের লোভ তাঁহাকে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম যত্নের ফলে ঈশ্বর নীলিমার জীবন দান করিয়া বিজয়বাবুর দানপত্র কীটের ভক্ষ্য করিয়া ছিলেন। কোন প্রকারে চপলা ইহাও অবগত হইয়াছিলেন এবং ইহা হইতে নীলিমার "অখণ্ড প্রমাই" ও করুণাময়ের নির্ব্বুদ্ধিতার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া নীলিমার প্রতি চপলার বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোন রকমে আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল কিন্তু ক্রমেই নীলিমার করুণাময়ের গৃহে অবস্থান করা দুরূহ হইয়া উঠিল।

গৃহিণীর গঞ্জনা ও উপদেশের জ্বালায় বিব্রত হইয়া করুণাময় গৃহে বিনা দর্শনীতে রোগী দেখার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, দরিদ্রগৃহে পীড়িতের চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহাদিগের শুশ্রূষায় প্রায়ই রাত্রি অতিবাহিত করিতে এবং দিবসের অবসর সময়টুকু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। চপলার স্বামী-দর্শনও ক্রমে দুর্লভ হইয়া উঠিল। নীলিমার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধে তাঁহার অন্তর জ্বলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বিবাহের ভাবনাও প্রবল হইয়া উঠিল।

করুণাময়ের যত্নে, শিশুদের স্বর্গীয় ভালবাসায় নীলিমার হৃদয়ে যে শান্তিটুকু আসিয়াছিল ক্রমে তাহা বিলীন হইতে লাগিল। আবার জগত তাহার শূন্যবোধ হইতে লাগিল, শিশুরা তাহার মলিন মুখের যে হাসি ফুটাইয়াছিল, সে মুখের হাসি মুখে মিলাইল, নীলিমার চোখের কোণে কালি পড়িল।

নীলিমার সে বিষণ্ণতা লক্ষ্য করিয়া করুণাময়ের হৃদয়ে ব্যথা লাগিল, আর একবার, স্ত্রীর তর্জ্জন গর্জ্জনের প্রত্যুত্তরে কোমল স্বরে বলিলেন, "আহা, অভাগিনীর এ পৃথিবীতে আর আপনার বলবার কেহ নাই, নহিলে ধনকুবেরের কন্যা হয়ে ও কি আজ পথের ভিখারিণীর মত আমার বাড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ করে পড়ে থাকে!"

কিছুতেই কিছু হইল না, গৃহিণীর মন টলিল না। পাষাণও কখন গলিতে পারে কিন্তু নীলিমার দুঃখে চপলার চক্ষে জল পড়িতে চাহে না। (ক্রমশঃ)

প্রয়াগ প্রবাসী।

মীরাবাই।

(১)

[ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই—রাখাল বালকগণের আবেগপূর্ণ সঙ্গীতে, যুবকদিগের সান্ধ্য-মজলিসে অথবা ধনীগণের বিলাস-কক্ষে প্রতিধ্বনিত গীতবাদ্যের মধ্যে একটি পরিচিত নাম সর্ব্বদাই শ্রুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের ইতিহাসে উল্লিখিত মীরাবাই। আজ আমরা ইঁহার পবিত্র জীবনের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা সংযোজিত করিয়া কাহিনীরূপে উপস্থিত করিতেছি। বোধ হয় পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট তাহা অনাদৃত হইবে না।]

রাজপুতানার অন্তর্গত 'নিরতা' (Nerata) একটি ক্ষুদ্র মনোরম গ্রাম। গ্রামটির চারিপার্শ্বেই ছোট ছোট পাহাড়, সেই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া সঙ্কীর্ণ কয়েকটি নদী এঁকে বেঁকে গ্রামটির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতি কত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই স্থানেই আমাদের স্বনামধন্যা ধর্ম্মপরায়ণা সতীলক্ষ্মী মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী তৎকালে রাজপুতানায় আর কেহই ছিল না, তাই তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজপুতানার অধিবাসিগণ তাঁহাকে 'জ্যোতির্ম্ময়ী' বলিয়া আখ্যাত করিত।

অতি বাল্যকাল হইতেই রমণীসুলভ যাবতীয় গুণ—দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। দেবতার প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ও ঐকান্তিক বিশ্বাস তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও উন্নীত করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি এমন সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন যে তাহা শুনিলে বালক বৃদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিত, এত অল্প বয়সে ইনি এ সকল বিষয় কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেন! শ্রীমৎভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাহা ছোট ছোট ছড়া করিয়া যখন সুললিত স্বরে গাহিতে থাকিতেন তখন কত বৃদ্ধেরও চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িত। ভগবানে এমন আত্মনির্ভর জগতে দুর্লভ। কৃষ্ণলীলা গাহিতে গাহিতে মীরা কত দিন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন, আবার জ্ঞানলাভেও অনেক সময়ে আপনার আরাধ্য দেবতাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন।

বাল্যকাল কাটিয়া ক্রমে যৌবন আসিল। চিতোরের মহারাণা কুম্ভসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। মহারাণাও বাল্য হইতে কবিতাপ্রিয় ছিলেন। নব-বিবাহিত বধূর সহিত দিনকতক বেশ একরূপ সুখে কাটিল। কিন্তু চিরকাল সমান যায় না।

মীরা প্রায় সর্ব্বদাই সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা গানে বিভোরা। কখন বা কোন সখীকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া স্বয়ং রাধিকা হইয়া তাহার বামে দাঁড়াইতেছেন, আবার কখন বা নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতীর মানভঞ্জনের পালা অভিনয় করিতেন। মহারাণা প্রথম প্রথম বেশ আনন্দ পাইলেও শেষে আর এসব ভাল লাগিত না। তিনি যেটুকু চান সেটুকু যেন মীরার নিকট হইতে পান না—এই তাঁর আক্ষেপ। তরুণ বয়সে যাহা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মীরার পক্ষে তাহা যেন মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক।

(২)

দিল্লীর রত্নসিংহাসনে বসিয়া মোগল সম্রাট আকবর সা মীরাদেবীর সঙ্গীতের প্রশংসা শুনিলেন। আকবর সা চিরদিনই গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। এই সহৃদয়তা গুণেই তিনি একদিন বিস্তৃত মোগল-সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মীরাদেবীর সঙ্গীতের সাতিশয় প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য আকবরের ঐকান্তিক আগ্রহ হইল। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর চিতোর মোগল সম্রাটের অধীন না হইলেও উভয় রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা ছিল না। আকবর একবার মনে করিলেন, মহারাণা কুম্ভসিংহের নিকট প্রস্তাব করিয়া দেখিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পদ্মিনীর কথা স্মরণ হওয়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন! তিনি জানিতেন, হিন্দুর পর্দ্দাপ্রথা বড়ই কঠোর, ইহা রক্ষার জন্য তাহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি তাঁহার রাজসভার বিখ্যাত গায়ক তান-সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা উভয়ে একদিন গুপ্তবেশে চিতোর মন্দিরে গিয়া মীরা-দেবীর গান শুনিয়া আসিবেন।

তাহাই হইল। তাঁহারা উভয়েই গুপ্তবেশে মীরা-দেবীর প্রাণমাতান সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। আকবর সা তাঁহার সঙ্গীতে এতদূর মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন যে আপন অবস্থা ভুলিয়া গিয়া মীরাদেবীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার বহুল প্রশংসা করিতে লাগিলেন; পরক্ষণে তাঁহার বস্ত্রমধ্য হইতে একছড়া বহু-মূল্য হার বাহির করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'দেবী এই হার ছড়াটি দেব প্রতিমার গলদেশে পরাইয়া দিন—আমি চরিতার্থ হই।'

মীরা সেই হার দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, অপরাধ লইবেন না, দেখিতেছি এটি একটি বহুমূল্য হার—এ হার আপনি কোথায় পাইলেন?'—আকবর সা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মা, আমি যমুনায় স্নান করিবার কালে এই হার কুড়াইয়া পাই। এ বহুমূল্য হার আমাদের উপযোগী নহে, তাই দেবতাচরণে অর্পণ করিলাম।'

মীরা তাঁহার দেবভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া হার ছড়াটি দেবতাচরণে উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারাও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই হার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মীরার ভাগ্যাকাশে এক বিপদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মহারাণা লোক পরম্পরায় হার প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া হার দেখিতে চাহিলেন, হার আসিল। মহারাণা সে বহুমূল্য হার দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। জহরীরা আসিয়া দর কষিল—দশ লক্ষ মুদ্রা! কে তাঁহাকে এই বহুমূল্য হার দিয়া গেলেন? চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল—সংবাদ আনিতে। সংবাদ আসিল—মোগল সম্রাট আকবর সা গুপ্তবেশে আসিয়াছিলেন। মহারাণা শুনিয়াই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানশূন্যের ন্যায় আদেশ দিলেন, 'কে আছ, এই দণ্ডেই কলঙ্কিনী মীরার জীবন নাশ করিয়া আমাদের বংশের কালিমা দূর কর।'

(৩)

আদেশ প্রচারিত হইল, কিন্তু কেহই সে বীভৎস কার্য্যে অগ্রসর হইল না। রাজা অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিবার জন্য আদেশ দিয়া একখণ্ড পত্রে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মীরা দৈনিক পূজা সমাপনান্তে যখন মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে সেই আদেশ পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হইল। তিনি একবার মাত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একটিবারও তাঁহার চরণ দর্শন মিলিবে না?' পত্রবাহক মস্তক নত করিয়া কেবল মাত্র অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'মহারাজের বোধ হয় সে আদেশ নাই।' তিনি আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া পত্র-বাহককে বলিয়া দিলেন, 'তাঁহাকে বলিও, রাণী তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে', এই বলিয়া রাণী অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* * * *

রজনীর গভীর অন্ধকারে মীরা বিলাস পোশাক ত্যাগ করিয়া ভিখারিণীর বেশে রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কেহই জানে না, মীরা আজ কোথায় চলিয়াছে। সেই অন্ধকারে ক্রমাগত পথ অতিক্রম করিয়া শেষে এক নদীর ধারে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার জীবন মরণের আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে নদীর সেই অচঞ্চল জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ভগবানের অসীম দয়া। কোথা হইতে কি হইল মীরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র তাঁহার মনে এই হইল, কে যেন অলক্ষ্যে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিল,—শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, 'মীরা তোমার স্বামীর আদেশ রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু এ পৃথিবীতে তোমার যে আরও অনেক কাজ বাকী আছে। আমার মহিমা প্রচার করিবার জন্যই যে তোমার জন্ম! যাও, চিন্তা করিও না, তোমার কার্য্য করগে।'

* * * *

প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াই-তেছে। মীরা চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, তিনি সেই নদীর বালুচরের উপর পড়িয়া আছেন—সূর্য্যের রশ্মিতে আশ-পাশের বৃক্ষের অগ্রভাগগুলি রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে—চক্ষুর দৃষ্টি যতদূর যায় তাহার মধ্যে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল না। তখন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সেই নদীর তীর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অজানা পথে চলিতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই ছিল না। কতকদূর যাইবার পর কতিপয় রাখাল বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদের মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছারা, আমি বৃন্দাবনের পথিক,—বৃন্দাবনের পথ কোথায় আমায় বলিয়া দিতে পার?" বালকেরা তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া বলিল, "মা তুমি পথশ্রমে বড় ক্লিষ্ট হইয়াছ দেখিতেছি,—আমাদের নিকট অন্য কিছু নাই, কেবল এই দুধটুকু,—ইহাই পান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর, আমরা তোমাকে বৃন্দাবনের পথে রাখিয়া আসিতেছি।" মীরা তাঁহাদের কথা এড়াইতে পারিলেন না।

বালকদিগের সহিত হরিনাম করিতে করিতে মীরা বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। পথের লোক তাঁহার গান শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার কিন্তু সে দিকে

লক্ষ্য নাই—ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আপন মনেই বিভোরা হইয়া তিনি চলিয়াছেন—সঙ্গে অসংখ্য ভক্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে। যখন বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই।

* * * *

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নাম বৃন্দাবনে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার সুমিষ্ট কৃষ্ণলীলা শ্রবণের জন্য অযুত ভক্ত দলে দলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মীরা এখন মিবারে মহারাণী নহেন—ভিখারাণী—প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ পান নাই এক্ষণে তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া তাঁহার শ্রীমুখের হরিনাম শুনিয়া তাঁহাদের রসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে তৎকালে রূপগোস্বামীর ন্যায় ভগবৎভক্ত আর কেহই ছিল না। অনেকে তাঁহাকে ভগবানেরই অবতার বলিয়া মনে করিত। তিনি কখন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না, কিন্তু মীরা দেবীর ঐকান্তিক ভক্তি ও ভগবানে একনিষ্ঠতা দেখিয়া তাঁহাকে কন্যার ন্যায় সস্নেহে কাছে রাখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অনেক সময়েই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

মীরা দেবীর সঙ্গীতের প্রশংসাধ্বনি ভারতের দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চিতোরের মহারাণা কুম্ভ সিংহও তাহা শুনিলেন। আজ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, "মীরা সত্য সত্যই কি আমার বংশে কালিমা লেপন করিয়াছে—না আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে? আজ তাঁহার নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত, কিন্তু কই আমার নাম ত কেহই করে না! বিশেষতঃ আমার প্রজারা যখন তাহাকেই চায় তখন আমি স্বয়ং যাইয়াই আমার প্রাণের মীরা—অভিমানিনী মীরাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব,—আমার গৃহের লক্ষ্মী গৃহেই থাকিবে।"

একদিন ছদ্মবেশে মহারাণা বৃন্দাবনে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি দেখিলেন, মীরা মন্দিরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন—সে কি মধুর নাম! যেন স্বর্গ হইতে সুধা ক্ষরিতেছে। মহারাণা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "দেবী, আমায় দুটী ভিক্ষা দাও?"

মীরা অতি বিনীত স্বরে বলিলেন, 'আমি ভিখারিণী, ধনীর দুয়ারে যান, প্রচুর অর্থ পাইবেন।'

তখন মহারাণা ছদ্মবেশ দূর করিয়া মীরার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "মীরা আমায় ক্ষমা কর, আজ তুমি যদি ভিখারিণী তবে রাজরাণী কে?"

মীরা সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে আপনা আপনিই যেন উচ্চারিত হইল, 'স্বামিন্, প্রভো এতদিন পরে এ অধীনীকে স্মরণ করিয়াছেন?'

বলা বাহুল্য মীরা গোস্বামীর পদধূলি লইয়া চিতোরে ফিরিয়া গেলেন। মিবার রাজ্যে আবার আনন্দের স্রোত বহিল।

তারপর হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত মীরাদেবী বৎসরের অর্দ্ধভাগ চিতোরে এবং অর্দ্ধভাগ বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

শ্রীগুরুদাস আদক।

ধর্ম্ম কি?

৩। ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় কি?

ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় কি, কিরূপ বিশ্বাস ও সাধনের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার অস্তিত্ব ও স্বরূপে এবং আত্মার অমরত্ব ও পরকালে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। এজন্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের নিকট উপনীত হইয়া উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মবিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, এক জন নিরাকার জ্ঞানময় অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি জ্ঞানময়ী শক্তিরূপে জড়জগতে থাকিয়া

বিশ্বের অদ্ভুত ঘটনা সকল সংঘটন করিতেছেন। আবার তিনিই মহাপ্রাণরূপে প্রাণে বিরাজিত থাকিয়া আমাদের মনোরাজ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে। সেই ঈশ্বর মঙ্গল-বিধাতা রূপে মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সেই ঈশ্বরের মধ্যেই ইহকাল পরকাল দুইই রহিয়াছে। মানবাত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যতদিন এই জগতে বাস করিবে, ততদিন সেই ঈশ্বরেরই শাসন-শক্তির অধীন থাকিবে, আবার মানবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া যখন অন্য লোকে যাইবে, তখনও ঈশ্বরেরই শাসন-শক্তির অধীন থাকিবে।

উক্ত প্রকার বিশ্বাস ব্যতীত আমরা ভক্তসংসর্গে বাস করিয়াও ভক্তিশাস্ত্র পড়িয়া আর একটি বিশ্বাস লাভ করিতে পারি। সে বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরই আনন্দস্বরূপ; মানুষের অন্তরাত্মা নিরন্তর যে ভূমানন্দের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, ঈশ্বর স্বয়ংই সেই ভূমানন্দ। তাঁহাকে না পাইলে আর কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি লাভের আশা নাই। উপনিষদ বলিয়াছেন:—

"রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং
লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

অর্থ—সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হন।

এই ঋষিবাক্যে যতই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব ততই ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। বলিতে গেলে ব্যাকুলতায়ই ধর্ম্মের আরম্ভ। মানুষ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া যখন ধর্ম্মসাধনে ব্রতী হয়, তখনই সাধনের সমস্ত ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে। এই অবস্থায় সাধন রাজ্যের পথ খুঁজিয়া পাওয়াও বড় কঠিন হয় না; স্বয়ং ঈশ্বরই বিশ্বাসী ও ব্যাকুল মানুষকে সাধন রাজ্যের পথ দেখাইয়া দেন। তথাপি ধর্ম্মলাভার্থীদিগকে কোন সাধকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত হইয়া সাধনের কোন একটি প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। শুধু শিক্ষা করা প্রয়োজন নয়, সাধকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত হইয়া সাধন করা আবশ্যক। প্রত্যেক সাধকই জীবনের পরীক্ষায় বুঝিতে পারেন, কোন মণ্ডলী অথবা ধর্ম্মবন্ধুদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে মন শুষ্ক হইয়া যায় এবং সংগ্রাম ও প্রলোভনের মধ্যে অবিচলিত ভাবে সাধন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। *

তদ্ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে কোন একটি মণ্ডলীর নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেই প্রণালী অনুসারে কিছুদিন সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে একটুকু অগ্রসর হইতে পারিলে নিজের মনের মত একটি নূতন সাধনপ্রণালীও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে কোন পুরাতন সাধনপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। সেই জন্য এ স্থানে একটী সাধনপ্রণালীর উল্লেখ করিব। এই সাধনপ্রণালী সকলের নিকট উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে কি না জানি না; তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করিতেছি। এই সাধনপ্রণালীর নাম উপাসনা। ব্রাহ্মসমাজের বিস্তর সাধক এই উপাসনাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির একটি উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমার বোধ হয়, এই স্থানেই অনেকের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইবে। বলিবেন, "নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা আবার কি? যাহার কোন আকার নাই, তাঁহাকে কিরূপেই বা চিন্তা করিব? কিরূপেই বা জানিতে পারিব?"

ঈশ্বরের কোন আকার নাই বটে; কিন্তু তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাচীন ঋষিগণ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াই ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন; এবং হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপনিষদের মধ্যে সেই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন শিখধর্ম্মাবলম্বীগণ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও য়িহুদিগণ নিরাকার ঈশ্বরেরই অর্চ্চনা করিতেছেন। যাহা হো'ক, এখন দেখা যাউক, কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরকে জানিতে পারা যায়। আগেই বলিয়া রাখি, নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা করা সহজ, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই মনের ব্যাপারটি মানুষকে বুঝানো বড় কঠিন। প্রকৃত পক্ষে অনন্তের উপাসনাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। নদী যেমন অনন্ত সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্যই ছুটিয়া চলিয়াছে, তেমনি আমাদের হৃদয় অনন্তকে জানিবার জন্যই

আকুল হইয়া আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মানব হৃদয়ের যে অনন্তের দিকে স্বাভাবিক গতি—উহা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কাজেই অনন্তের উপাসনা ভিন্ন কেহই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। এজন্য যাঁহারা সাকার দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও অনেক সময় আপন আপন আরাধ্য দেবতার মধ্যে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ আরোপ করিয়া নিরাকারেরই ধ্যান করেন। তাহা করেন বলিয়াই ভক্তির উদ্রেক হয় ও হৃদয় চরিতার্থ হয়।

মনে করুন, একজন সাধক দেবী ভগবতীর সাধনা করিবেন। তিনি সম্মুখে দেবীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি রাখিয়া তাঁহার নিরুপম মুখশ্রী এবং সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলেন, অন্তরে ভাবোদয় হইল; কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য সফল হইল? আমরা ত অনেক সাধককে দেবালয়ে বসিয়াও মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান করিতে দেখি। তাঁহাদের চোখের সামনেই দেবতা, অথচ নয়ন নিমীলিত করিয়া তাঁহারা কিসের চিন্তা করেন? দেবীর অনন্ত শক্তি, অসীম মহিমা ও অপার করুণার বিষয় চিন্তা করেন। ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই সাধকের চিত্ত মহিমাময়ী দেবীর মহাভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। তাহাতেই জীবন সার্থক ও ভক্তি চরিতার্থ হয়।

কিন্তু ঐ সাধক যে সাকার দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া করুণা, প্রীতি ও মঙ্গলভাব সমূহের চিন্তা করিলেন, উহা ত আকারবিহীন ভাবেরই চিন্তা হইল। তাহাই নয় কি? কে কবে করুণা ও প্রীতির চেহারা দেখিয়াছে? কে ভাবের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতে পারে? উহা হৃদয়েরই সামগ্রী; একমাত্র হৃদয়ের দ্বারাই উহার অনুভূতি সম্ভব। নচেৎ চোখের দৃষ্টি দ্বারা অন্তরের প্রেম ও করুণা প্রভৃতি ভাব সমূহের চেহারা দেখিবার কোনই উপায় নাই। এইজন্যই সাকারবাদী সাধক সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি রাখিয়াও ধ্যানস্থ হইয়া অন্তরে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত করুণা, অনন্ত প্রেম প্রভৃতি ভাবগুলি উপলব্ধি করেন। ঐ ভাবগুলি দেবীর না বলিয়া ঈশ্বরের বলিতেছি এই জন্য যে, অনন্ত শক্তি, অনন্ত করুণা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারই থাকিতে পারে না। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই সকল কারণেই বলিতেছি, সাকারবাদী সাধকও অনেক সময় অজ্ঞাতসারে নিরাকার ঈশ্বরেরই স্বরূপ ধ্যান করেন এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন; অথচ চিরন্তন সংস্কারবশতঃ মনে করেন, মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবতা ভিন্ন নিরাকারের উপাসনা সম্ভব নয়।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে আর একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করা যাউক। ঈশ্বর জ্ঞান, ইচ্ছা, দয়া ও প্রেম সমন্বিত মহাশক্তি। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও করুণা প্রভৃতি ভাবগুলিকে মনের চিন্তা ও হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারাই উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের, তাঁহার প্রেমের সঙ্গে আমাদের প্রেমের, তাঁহার শক্তির সঙ্গে আমাদের সমস্ত জীবনের একটি আশ্চর্য্য যোগ আছে। শুধু যোগই বা বলি কেন? ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা রহিয়াছি। একজন সাধক বলিয়াছেন, যেমন পুষ্পের মধ্যে সুগন্ধ, তেমনই ঈশ্বরের মধ্যে জীব। পুষ্পকে বাদ দিয়া পুষ্পের গন্ধটুকুর ধারণা করা অসম্ভব, তেমনি ঈশ্বরকে বাদ দিয়াও মানবাত্মার ধারণা করা যায় না। আমরা যখনই আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার ধারণা করিতে যাই, তৎকালে ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করি। এ সকল কথা শুনিতে অনেকটা হেঁয়ালীর মত বটে; কিন্তু জ্ঞানালোচনা, গভীর চিন্তা ও সাধনের দ্বারা ঈশ্বরকে একবার যদি জানা যায়, তাহা হইলেই সকল সমস্যার মীমাংসা হয়।

ঈশ্বরকে কিরূপে ভাবা যায়, তৎসম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। কবি কালিদাসের চেহারা কে দেখিয়াছে? আমরা ত তাঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন রকম ধারণাই করিতে পারি না। অথচ কালিদাসকে জানিতে পারি। তাঁহার রচিত শকুন্তলা পড়িতে পড়িতে যখন মুগ্ধ হইয়া যাই, যখন তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে থাকি, তখনই তাঁহাকে জানি। একজন তরুণ যুবক স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কখনই দেখে নাই, তাঁহার ছবিগুলিও কখনো তাহার চোখে পড়ে নাই; অথচ সে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত পড়িয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহার

দয়া ও মহত্ত্বের বিষয় প্রতিদিন চিন্তা করে ; চিন্তা করিতে করিতে একেবারে বিদ্যাসাগরের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়। এখন আপনারা বলুন, এই যুবক বিদ্যাসাগরকে জানে কি না? এই যুবক যেরূপ বিদ্যাসাগরের গুণাবলী চিন্তা করিয়া তাঁহার মধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়, তেমনি মানুষ নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়। এই অবস্থায়ই মানুষের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এখানে কেহ যদি প্রশ্ন করেন, ঈশ্বরের মধ্যে যে জ্ঞান, প্রেম, করুণা ও শক্তি প্রভৃতি গুণগুলি আছে, উহা যে তাঁহারই এক একটি স্বরূপ, তাহাই বা জানিব কেমন করিয়া? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহা আমাদিগকে জানিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সাধকেরা ঈশ্বরকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি জগতের নানা দৃশ্য ও জীবনের নানা ভাবের মধ্য দিয়া আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন আমরা যতই তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানে নিমগ্ন হই, ততই তিনি আমাদের নিকট তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের সম্মুখের বিচিত্র ও সুশোভন জগৎ এবং মানবসামাজের বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন। আমাদের জীবনের দুঃখ শোকের মধ্যে তিনি করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দয়ার পরিচয় দিতেছেন। এইরূপ প্রতিদিন সহস্র ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপের প্রমাণ পাইতেছি এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। তবে এই সকল প্রমাণ সত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপের প্রতি যাঁহাদের সন্দেহ জন্মিবে, তাঁহাদের জন্য কোন সাধন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস চাই।

আমরা এতক্ষণ কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরকে জানা যায় এবং তাঁহার উপাসনা সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখন ঈশ্বরের উপাসনা প্রণালীটি কি রকম, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

উপাসনার চারিটি অঙ্গ। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া নির্ম্মল চিত্তে এবং ব্যাকুল ভাবে উপাসনায় বসিতে হইবে। প্রথমতঃ উদ্বোধন ; অর্থাৎ উপাসনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সময় একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত আর সকল চিন্তাই মন হইতে দূর করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে একটি অংশ পাঠ এবং ধর্ম্মভাবোদ্দীপক সঙ্গীত করা আবশ্যক। বহির্মুখীন ও বিষয়চিন্তায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত সঙ্গীতের সুর ও ভাবের সঙ্গে মিশিয়া সহজেই অন্তর্মুখীন হয়। এই সময়ই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বে যে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি ও করুণা প্রভৃতি ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল ঐশ্বরিক ভাবের চিন্তা ও অনুভূতির নামই আরাধনা। ঐ সমস্ত ভাব একটির পর আর একটি যোজনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আরাধনা প্রণালী রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অত্যন্ত সংক্ষেপে সামান্য একটি আরাধনা প্রণালী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমিই আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছ ; তুমি শক্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ। আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমিই সত্য দেবতা।

তুমি জ্ঞানস্বরূপ। তোমার জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা এই জগতে এবং আমাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছ। তোমার জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যেক নরনারীকে দেখিতেছ ; আমাদের মনের প্রত্যেক চিন্তা অবগত হইতেছ ; তুমি আমাদের অন্তর্যামী দেবতা।

তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার আদিও নাই, অন্তও নাই ; সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান হইয়া রহিয়াছ। তোমার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি পারাবারে বিশ্বচরাচর নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

তুমি আনন্দস্বরূপ। সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত ও সুনির্ম্মল সুখের মধ্য দিয়া তুমিই অমৃতরস হইয়া হৃদয়ে আসিতেছ এবং আমাদের প্রাণকে তৃপ্ত ও চিত্তকে আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছ। আমরা সংসারের দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া তোমার কাছেই জুড়াইতে চাই। তুমিই শান্তি দান করিয়া হৃদয়কে শীতল কর।

তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও দয়াময়। নিরন্তর আমাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেছ। যখন আমাদিগকে সুখ দিলে ভাল হয়, তখন সুখই দিতেছ। যখন অপরাধের জন্য দুঃখ দেওয়া উচিত মনে কর তখন দুঃখই দিতেছ। সুখ দুঃখ দুইই তোমার করুণার দান। তুমিই আমাদের চিরদিনের পিতা ও মাতা। সর্ব্বদাই আমাদিগকে ভালবাসিতেছ; আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তুমিই দান করিতেছ। তোমার মত আপনার জন আর কে? এ সংসারের সকলেই যদি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবু তুমি আমাদের হৃদয়ের দেবতা হইয়া প্রাণের কাছেই থাকিবে।

তুমি এক অখণ্ড চিন্ময় সত্তা। ইহকাল ও পরকাল তোমারই মধ্যে। ইহকালেও তোমারই মধ্যে রহিয়াছি, পরকালে আমাদের আত্মা তোমার মধ্যে থাকিয়াই অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। একমাত্র তুমিই আমাদের চিরদিনের সহায়।

তুমি পবিত্র স্বরূপ। তোমাকে যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হয়। তাই পাপে কাতর হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি।

ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি যদি শুধুই মুখে উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্তুতি করা হইল, কিন্তু আরাধনা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি ও করুণা প্রভৃতি ভাবের অনুভূতিই আরাধনা। উল্লিখিত আরাধনা প্রণালীর মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল গুণ ও ভাবের বর্ণনা আছে, ঐসকল গুণ ও ভাব চিন্তা করিতে করিতে একটি অভিনব ভাবের রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়; সেই স্থানেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যেমন অন্তরের আনন্দ মনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে, চোখে কিছুই দেখি না, শুধুই মনের উপর একটি ভাবের ক্রিয়া অনুভব করি; তেমনি আরাধনার মধ্যে অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব হইলে, চোখে কিছুই দেখিব না অথচ হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের ক্রিয়া অনুভব করিব।

এইরূপ আরাধনার পর ঈশ্বরকে এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ পুরুষরূপে উপলব্ধি করার নামই ধ্যান। তদ্ভিন্ন হৃদয়ের অভাব পূরণের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কিছু চাওয়ার নাম প্রার্থনা।

ঐ সকল ব্যতীত নাম জপ, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনার আরও অনেক উপায় আছে। সে সকল বিষয়ে অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। জগতে সাধনার বহু উপায়ই রহিয়াছে। কিন্তু বহু লোকেই তাহার কোন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রস্তুত নহেন। এ জন্য ধর্ম্ম ব্যাপারটা আমাদের তর্ক ও আলোচনার মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমরা যে সাধনপ্রণালীর উল্লেখ করিলাম, এই প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া বিস্তর লোক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই জন্যই বলিতেছি, এই সাধনপ্রণালী ঈশ্বরকে লাভ করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বাঞ্ছিত-দান।

অমিয় সারাদিন ধরিয়া লেখা-পড়া করে, আর পরীক্ষা দিয়া প্রথম হয়; কিন্তু তার বউদিদির বড় দুঃখ যে অমন সফল জীবনটীকে সরস-স্নিগ্ধ হাসি দিয়া অভিনন্দন করিবার কেউ নাই।

আশ্বিন মাসের সংক্ষিপ্ত ছুটীটা শুধু ইংরাজী নাটক ও মনস্তত্বের মধ্যে ডুবিয়া নির্জ্জনে ফুরাইয়া ফেলিবার জন্য অমিয় এবার বাড়ীতে আসিয়াছে, বৌদিদি রসাইয়া রসাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া, তার বিবাহের কথা পাড়িবার অবকাশ পাইয়াছেন।

পাড়ার আর ছেলেরা কি আনন্দেই ছুটী কাটায়! বন্ধুদের লইয়া হল্লা করিতেই সকাল-বেলাটা শেষ হইয়া যায়। দুপুরে কখনো "কলেজের" "লেক্‌চারের" খাতা খানা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, অবশেষে কখন এক সময় অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়ে। বিকালে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খানিকটা "ফুটবল" খেলে,—তারপর যখন শ্যাম-তরু-বীথি-তলে অরুণা-সন্ধ্যা-তরুণী নীরবে উপস্থিত হয়, তখন তারা 'সেজের' আলোর সম্মুখে তর্কশাস্ত্রের

ইংরাজী পুঁথিখানি খুলিয়া রাত্রি নয়টার প্রতীক্ষায় গুন্‌গুন্ করিতে থাকে।

বউদিদিও তাই তাকেও সেই ছুটীর সন্ধ্যা-বেলা, অবসরের রাত্রিগুলাকে তেমনি মধুর, তেমনি সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত একটী বউ আনিয়া দিবার কথা কতবার বলিয়াছেন কিন্তু অমিয় তার নিবিষ্ট মনখানির মধ্যে অনেক দুর পর্য্যন্ত খুঁজিয়াও সেই কোন্ অজানা বধূ লাভের কোনোই আগ্রহ দেখিতে পায় নাই, ভাবিয়াও অন্তরের তলে বিরহ-বেদনার একটু আভাসও বুঝে নাই, সে তাই সে প্রস্তাবে কেবলি অসম্মতি দিয়াছে।

এবারো কিছুতেই সে রাজী হইল না। পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেল। অমিয় তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই অমিয় তার টেবিলের উপর মোটা মোটা বইগুলি গোছাইয়া লইল। দুই পাশে ফিলজফির লেক্‌চারের নোটগুলি সাজাইয়া তন্ময় পড়ুয়ার মত এক মনে পড়া সুরু করিয়া দিল। সহরের কোলাহলের মধ্য দিয়া হেমন্তের ছোট ছোট দিনগুলা নিঃশেষ হইয়া যায়, অমিয়ের পড়ার তবু বিরাম নাই। বিত্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর আশীর্ব্বাদের মন্ত্র দিয়া অমিয়কে যেন যাদু করিয়াছেন।

মেসের ছোট ঘর খানির মধ্যে সে আর তার একটী বন্ধু থাকে। বন্ধু য়ুনিভারসিটীর একজন নামজাদা স্কলার নয়, কাজেই স্কার পড়ার শেষে যথেষ্ট অবসর মেলে। এই সৌভাগ্যবান যুবকটীর এমন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যশে সে অনুমাত্রও ঈর্ষা করে না। মাঝে মাঝে বরং এত পড়াশুনার ব্যবসায়ে বছরের শেষে ঐ নামটুকু মাত্র লাভের কথা লইয়া অমিয়কে খুব ঠাট্টাই করে। সে রাজধানীর মুখরিত অপরাহ্নটী রাজ-পথের এপাশে ওপাশে, কখনো বা গোলদীঘির তীরে বেড়াইয়া কাটায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর প্রায় একটী ঘণ্টা ভরিয়া প্রায় প্রতি দিনই ছাদের কার্ণিসের উপর বসিয়া, একটী ছোট বাড়ীর খোলা একটী জানালার পানে নিমেষহীন চোখে তাকাইয়া থাকে। তখন তাহার অমূর্ত্ত হৃদয়খানি দৃষ্টি পথে বাহির হইয়া গিয়া কার যেন প্রাণের দুয়ারে নীরব-নিবেদন জানাইয়া আসে। অমিয় কিন্তু এদিকে ফিরিয়াও চায় না; ছুটীর পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়াই পড়ার টেবিলে খোলা বইখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার পড়া আরম্ভ করে। পড়িতে পড়িতে আরো অনেক দিন চলিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা; — বন্ধু যেন কি একটা বিশেষ কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, ঘরে আর কেউ নাই, শুধু অমিয়ের পড়ার শব্দ চেয়ার, টেবিল, দে'য়ালগুলাকে মৃদুভাবে ধ্বনিয়া তুলিতেছে। এমন সময় অমিয় সাহিত্যের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অপ্রয়োজনে একবার সম্মুখে তাকাইল—দেখিল এ কি? —এ যে একখানি মূর্ত্ত কাব্য! অপ্রত্যাশিত পরিতৃপ্তির অজ্ঞাতস্পর্শে আজ তার দুটী চক্ষু সার্থক হইয়া গেল।

অমিয় আস্তে আস্তে আসিয়া ছাদের উপর দাঁড়াইল। সেখান থেকে পাশের বাড়ীর সেই মুক্ত জানালাটী স্পষ্ট দেখা যায়; অমিয় আবার সেই দিকে চাহিল। দেখিল বিলাতী দৃশ্যকাব্যের অনিন্দ্য নায়িকার যে চিত্রখানি অমর কবি সরস পটু ভাষার তুলিতে আঁকিয়াছিলেন, আজ তাহা ঐ বিচিত্র-বর্ণ রঞ্জিত সায়াহ্নে সজীব হইয়া, সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ যেন তার চেয়ে অনেক খানি উপাদেয়, সে কথাগুলির চেয়েও ঢের বেশী উপভোগ্য। অমিয়ের চোখের সম্মুখে একটী স্বপ্ন-সুকুমার স্বর্ণরাজ্য ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন হইতে রোজই সন্ধ্যাবেলা সে ছাদের উপর আসিয়া দাঁড়াইত। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিত, একটী হেমপ্রতিমা টেবিলের উপর চায়ের বাটী ধরিয়া দিতেছে। অমিয় মনে করিত—বুঝি তাহারই ব্যাকুল দৃষ্টির পানে গোপনে চাহিতে পরিবেশনের সময় সে মৃণাল হস্ত কম্পিত হইতেছে। কলেজ ছুটীর পর অমিয় তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাসায় আসিত; মেসের ভিতর ঢুকিবার সময় দেখিতে পাইত—পাশের বাড়ীটীর দরজায় একখানি ইস্কুলের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মধ্য হইতে একটী কিশোরী—সুন্দরী—ফ্রেমে বাঁধা ফটোগ্রাফ খানির মত—ধীরে ধীরে নীচে নামি-

তেছে;—তাহার হাতে বুকষ্ট্র্যাপ দিয়া আঁটা খান কয়েক বই; তার উপরে একটা কাগজের বাক্স। বালিকা বইগুলি কটী পর্য্যন্ত তুলিয়া ধরিয়াছে; এক গোছা স্খলিত কালো চুল বাক্সটার উপর দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাথার মাঝখানে চুলগুলি একগাছা চওড়া রেশমী ফিতায় বাঁধা। তখন যেন সেই কেশরাশির মধ্য হইতে গন্ধ-তেলের সুগন্ধ ছুটিয়া আসিয়া অমিয়ের অন্তর খানির চারিদিক সুবাসিত করিয়া তুলিত। এমনি করিয়া অবসর কাটাইতে অমিয়ের এখন পড়ার ক্ষতি হইত না।

বন্ধু, অমিয়ের এ অতর্কিত পরিবর্ত্তনটা বিস্মিত চোখে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু পাছে বা তার সকল আশা এক দণ্ডে নিঃশেষিত করিয়া সেই অপ্রকাশিত প্রেমের লক্ষ্যস্বরূপ মৌন দৃষ্টিটুকু চিরজনমের মত ফিরাইয়া লইতে হয়—এই ভয়ে ব্যক্ত কথায় তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে এতদিন কুণ্ঠিত হইয়াছে।

একদিন অমিয় সেই জানালাটার সম্মুখে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোধূলি-লগ্নের অস্তম্লান লালিমায় পূর্ব্ব আকাশের নীচে স্নিগ্ধ, তরুণ সন্ধ্যাটী ধূসর হইয়া গিয়াছিল। তাহার বন্ধু এমন সময় হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল:—

"কিরে, হাঁ ক'রে কি তাকিয়ে দেখ্‌চিস্?"

"ঐ বাড়ীটার ওপোরকার ঐ নীল মেঘ খানা।"

"আর চালাকি কেন যাদু! মেঘ না, ঐ ঘরের ভেতোরকার ঐ মেঘের মতোই অম্‌নি কালো চুলের গোছা।"

"বেশ ঠাউরেচিস্ যা'হোক!"

"ঠিক ঠাউরেচি,—কিন্তু তুই যে, যা কিছু ধরবি, তাতেই একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাবি—এতো বড় মুস্কিলের কথা!"

"কেন, আবার কিসে তন্ময় হ'য়ে গেলুম?"

"এই নূতন "প্র্যাক্‌টিক্যাল পড়াটায়। চুরি ক'রে ক'রে চেয়ে থাকায়!"

অমিয়ের কপোল দুটী হঠাৎ ফাগের মত রাঙ্গা হইয়া গেল। সে বড় বড় করিয়া বলিল:—"কক্‌খনো না"!

বন্ধু সহাস্য দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল:—"নিশ্চয়। লুকোচ্ছিস্ কার কাছে?—তা বেশ খুব চেয়ে থাক্!"

"এতেও তোর জুলুম নাকি?"

"'অবিভ্জি'—প্রেমের ওপোর দস্তর মতো জবরদস্তী।"

একথা বলিবার সময় বন্ধুর মর্ম্ম ব্যাকুলতার স্পষ্টতর প্রকাশটুকু গণ্ডের লালিমায় ফুটিয়া উঠিল। অমিয় কিন্তু সরম-সঙ্কুচিত দুই চক্ষে বন্ধুর কপোলের উপরকার সে মৌন অনক্ষর ভাষার কাহিনীটী পড়িবার অবসর পাইল না। বন্ধুর দিকে ফিরিয়া নূতন-পরিচিতা বালিকা-বধূর সকুণ্ঠ প্রশ্নোত্তরের ভাবে কহিল—"আচ্ছা-তবে—রাজার মেয়ে ওগো প্যারী যা, বলিস্ তাই শোভা পায়।"

তাহার ঘণ্টা খানেক পরে দুজনেই পড়ার উদ্দেশ্যে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

(২)

পরদিন সকালে বন্ধুর কাকা আসিলেন। বন্ধুকে গোপনে বলিলেন—তার বিবাহ ঠিক হইয়াছে; উলীপুরের রজনীবাবুর মেয়ের সহিত। এই পাশের বাড়ীটাতেই রজনীবাবু থাকেন, তিনি আলিপুরের জজের সেরেস্তাদার। এই মাসেই বিবাহ, সাত দিনের ভিতর তাকে বাড়ীতে পৌঁছিতে হইবে।

বন্ধুর বুকের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।—বুঝিল এ অমিয়েরই মর্ম্ম-ভাঙা অঘটন,—আমার শুভ বিবাহ নয়, অতখানি পবিত্র প্রেমের বিরুদ্ধে প্রজাপতির অভিশাপ। কিন্তু এ কিছুতেই হইতে দেওয়া হইবে না। বন্ধুত্ব যখন, তখন অন্তর শতধা করিয়া প্রীতিউপহার দিতে হইবে। সে কাকাকে বলিল, "আমি এ মেয়েকে বিয়ে ক'র্ত্তে পারবো না, তাকে আমি জানি।"

কাকা অনেক প্রতিবাদ করিয়া তাহার মন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বন্ধু যখন কোন মতেই রাজী হইল না, তখন দুঃখিত চিত্তে কলিকাতা ছাড়িলেন। অমিয় এ সকল কিছুই জানিতে পারিল না।

সেই দিনই বিকালে বন্ধু যেন কোথায় চলিয়া গেল। অমিয়কে বলিয়া গেল, কাজ সারিয়া ফিরিতে তার দিন দুই দেরী হইবে।

তৃতীয় দিনের সকালবেলা। অমিয় "As you like it" খুলিয়া তাহারি "Rosalind" এর কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় মেসের একটী ছেলে তার বউ দিদির একখানা চিঠি আনিয়া দিল। অমিয় পড়িল:—

"ঠাকুরপো, ছালনাতলা একেবারে তৈরি, তুমি 'টেলিগ্রামের' খবরের মত ছুটিয়া বাড়ী এস, বিস্তারিত মিলনরাত্রির বাসর-শয়নে বুঝিয়া লইও।" ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—বৌদিদি।

এ পরিহসিত সত্য কথায় অমিয়ের অন্তরখানি আরো শুকাইয়া গেল। কথাগুলি সব যেন অভিশাপ গরলে জারিত। অমিয়ের অন্ধকার হৃদয়ে আশঙ্কার ব্যাকুলতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে একখানি ডাক কাগজে বৌদিদির চিঠির জবাব লিখিতে বসিল।

তারিখটা শুধু লেখা হইয়াছে, হঠাৎ বন্ধু পিছন দিক হইতে বলিল—"শীগ্‌গির ওঠ, গাড়ী এয়েছে!"

অমিয় চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল—দেখিল, পথের পরিশ্রমে বন্ধুর মুখের উপর মলিনতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভাঙ্গা টেরিটার পাশে চুলগুলা রুক্ষ। অমিয় বুঝিল, বন্ধু এইমাত্র রেলগাড়ী হইতে নামিয়া আসিতেছে। সে তখন বন্ধুর মুখের পানে ভ্যাবাচাকার মত চাহিয়া কহিল—"সে কি?"

"সে মধুরে ভাই, সে পদ্মমধু! চোখের অসুখের অব্যর্থ ওষুধ—বুঝ্‌লি? আর অমন হাঁ ক'রে সারা সন্ধ্যাবেলা কাটাতে হবে না—"Your marriage comes by destiny, your cuckoo sings by kind—বুঝ্‌লি?"

"একটুও বুঝ্‌লুম না—কে ব'ল্লে?"

"আমি ব'ল্লাম, আর বৌদিদির চিঠিতে ব'ল্লে।"

"বেশ—বলুক"।

"ব্যাস্—তবে এক্ষুনি ওঠ্, গাড়ী তোমের।"

"রেখেদে তোর গাড়ী—আমি যাবো না।"

"তোর যেতেই হবে, কেন যাবি নে?"

অমিয় অস্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাইয়া বেদনা ব্যাহত কণ্ঠস্বরে প্রাণের কাতর ভাষার কথাগুলা ব্যক্ত করিয়া দিল। আজ আর সে স্পষ্ট আবেগের কাতরতা লজ্জার জন্য বাঁধিয়া রহিল না। সে বলিল—ঐ মেয়ে ছাড়া সে আর কাউকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

বন্ধু বলিল, "তাই নাকি? আলাপটুকুও তো হয় নি, তাতেই এত? আচ্ছা আমি ভরসা দিচ্ছি, তুই চল্, বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বি, বৌদিদি এরি মধ্যে তোর Love নিয়ে দিব্যি একটা গল্প লিখে ফেলেছেন।"

"সে কিরে?"

"হ্যাঁ, এর ভেতর অনেক কথা আছে, তুই ওঠ্"।

দুই বন্ধু রেল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল! ঘণ্টা দুই পড়ে গাড়ী অমিয়দের বাড়ীর ষ্টেশনে দাঁড়াইলে, দুইজনে নামিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে পৌঁছিল।

জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিবাহ হইতেছে। নহবতে "শুভদৃষ্টির" বাজনা বাজিয়া উঠিল। তারপর অমিয় তার উৎকণ্ঠা-চঞ্চল দুই চক্ষু বিস্তার করিয়া তাহার নূতন বধূর মুখের পানে চাহিল। সে মৌন দৃষ্টির নিবেদনে তরুণীরও হৃৎপিণ্ড অপূর্ব্ব পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। অমিয় দেখিল একি! আবার দেখিল—সেই যে মেয়েটী রোজ বিকালবেলা 'ইস্কুলের' গাড়ী থেকে নামিবার সময় অপূর্ব্ব রূপের প্রভায় তাহার অন্তরে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিয়া দিত, এ যে সেই! আজ লজ্জারক্তিম সুষমা-ভূষিতা হইয়া, তাহারি মিলন-বাসরে বধূ হইয়া আসিয়াছে, অমিয়ের অধরপ্রান্তে তৃপ্তিসরস মৃদু হাসির একটী সরলরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিবাহ মিটিলেই অমিয় বন্ধুর খোঁজ আরম্ভ করিল। কিন্তু সে কোথায়? সে ততক্ষণ ষ্টেশনে গিয়া 'বেনারসের' একখানি টিকিট চাহিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যুতের নির্ম্মল আলোকে বেদনার একফোঁটা অশ্রু তখন তার গণ্ডের উপর ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জেনারেল বুথ।

২০শে আগষ্ট সন্ধ্যার কাগজে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বুথের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। দরিদ্রের চিরবন্ধু এই মহাপ্রাণ ঈশ্বরভক্তের মহাপ্রয়াণে সমগ্র লণ্ডনের জনসাধারণ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমান জগতে জীবিত মহাপুরুষদের মধ্যে জেনারেল বুথ নরসেবায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

বর্ত্তমান ইংরেজ-ক্ষমতার যে বিপুল প্রতাপ সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে তাহা কেবল কামান ও গোলাগুলির ফল নহে। ইহার পশ্চাতে অনেক ঈশ্বরভক্ত মানব-হিতে উৎসর্গীকৃত-জীবন মহাপুরুষের আজীবন সাধনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাঁহাদের ত্যাগ, প্রেম ও ধর্ম্ম জীবনের মহাসাধনায় ইংরেজ আজ জগতে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত, মহাত্মা বুথ তাঁহাদেরই অন্যতম। জন ওয়েস্লী ব্যতীত ইংলণ্ডে এত বড় ধর্ম্মসংস্কারক আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। জন্‌ওয়েস্লীর মধুর ধর্ম্মসঙ্গীত পথে ঘাটে, গৃহে মন্দিরে সর্ব্বত্র নিনাদিত হইয়া ইংরেজের সুপ্তবিবেককে জাগ্রত করিয়াছিল। তেমনি জেনারেল বুথের মুক্তি-সেনাদলের প্রেমসঙ্গীত গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের রাস্তা ঘাটে সর্ব্বত্র জনসাধারণের চিত্তকে দুঃখীর সেবা, পতিতের উদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। জন্‌ওয়েস্লীর সঙ্গে বুথের তফাৎ এই যে, ওয়েস্লী কেবল সঙ্গীতে ও শাস্ত্রচর্চ্চায় ইংরেজের বিবেককে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর বুথ ত্যাগ ও বীরত্বের সহিত বিরাট সেনাদল গঠন করিয়া জগতের দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ ও প্রলোভন হইতে মানুষকে প্রেম ও পুণ্যের দিকে, সত্য ও ন্যায়ের দিকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেবা দ্বারা ধর্ম্মকে শাস্ত্র হইতে টানিয়া আনিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইং ১৮২৯ সালে ইংলণ্ডের নটিংহাম নামক স্থানে জেনারেল বুথ জন্ম গ্রহণ করেন। তের বৎসর বয়সে রাজকীয় ধর্ম্মসমাজের (Church of England) গোঁড়ামীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি জনওয়েস্লীর প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম মেথডিষ্ট্। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অন্তরে অনুভব করিলেন যে ভগবান তাঁহাকে মানবের সেবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সেই ডাক শুনিয়া তিনি তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিলেন। উইলিয়াম বুথ একদল যুবককে লইয়া নির্জ্জন প্রান্তরে, সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপরে জানু পাতিয়া ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেন। মধ্যখানে থাকিতেন ভক্ত বুথ—তাঁর চারিদিকে প্রায় ২৫।৩০টী উৎসাহী যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনায় তাহাদের চিত্ত অনুপ্রাণিত হইত। এই সময় জ্বরে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তিনি শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাস্তার ধারে বাক্স ফেলিয়া সাধারণের নিকট সেবার বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তখনও তিনি বালক মাত্র। কিন্তু ঐ বালকের মুখের বাণীতে শত শত লোকের প্রাণ জাগিয়া উঠিল।

১৭ বৎসর বয়সেই তিনি প্রচারক নিযুক্ত হন। সেই সময় ডাক্তার তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বার মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত ইহা জানাইয়া সাবধান করিলেন। বুথ ডাক্তারের কথায় ভীত না হইয়া প্রচারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তিনি প্রচারার্থ নটিংহাম হইতে লণ্ডনে আসিলেন। ইং ১৮৬৫ সালের জুলাই মাসে তিনি নরসেবার জন্য বৃহৎ সেনাদল গঠন করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করেন। পাপীকে পাপের পথ হইতে, দরিদ্রকে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে, নিপীড়িতকে অত্যাচারীর নির্দ্দয় হস্ত হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য তিনি বিরাট সেবক-দল গঠন করিবার শুভ সংকল্প যখন মানবসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন—তখন কেহ বা হাসিল—কেহ বা অসম্ভব মনে করিয়া বিদ্রূপ করিল। এই ভোগ-প্রধান স্বার্থ-সংগ্রাম-লোলুপ পার্থিব সভ্যতার যুগে মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ বিলাসে পদাঘাত করিয়া—জগতের দুঃখকে নিজের বুকে বরণ করিয়া লইবে, ইহা কি সম্ভব?

কিন্তু মানুষ যখন নিজের দিকে না তাকাইয়া ভগবানের সেবায় নিজকে ছাড়িয়া দেয় তখন ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া অসাধ্য সাধন করে। বুথের ব্যাকুল আহ্বানে সহস্র লোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জগতের পাপ ও দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পুণ্য-পতাকার নিয়ে সমবেত হইল।

ছবিতে পাঠক দেখিতে পাইবেন বুথ তাহার সেনা দলের সম্মুখে প্রচার করিতেছেন। তাহার অসাধারণ বাগ্মিতা, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, বিস্তৃত ললাট করুণায় উজ্জ্বল নয়ন যুগল সহজেই শ্রোতার চিত্তকে আকৃষ্ট করিত। মানবের নেতৃত্ব করিবার জন্যাই যেন তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের মনকে কেবল মাতাইয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। প্রেমের আকর্ষণে টানিয়া আনিয়া মানুষকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার তাঁহার একটা অসাধারণ শক্তি ছিল। এইখানেই সাধারণের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব। তাঁহার ডাকে কত ভোগী ভোগ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; কত পাপী দেবতা হইয়াছে। কত সহস্র জগাই মাধাইকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সেনাদলের সংখ্যা পঁচিশ হাজার। ইয়োরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই বিপুল সেনাদল জগতের পাপ ও দুঃখের বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তিদানের জন্য কি কঠোর সংগ্রামই না করিতেছে! অষ্ট্রেলিয়াতে প্রায় ৫০টী সেবাশ্রম ইহাদের দ্বারা পরিচালিত। কোনটী স্ত্রীলোকের জন্য উদ্ধারাশ্রম, কোনটী অনাথ বালকবালিকাদের জন্য, কোন কোনটী কারাগার হইতে সদ্যমুক্ত সম্বলহীন কয়েদীদের জন্য আশ্রয়স্থান। ইংলণ্ডে আসিবার পথে আমি কলম্বোতে এই মুক্তি সেনাদলের আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। সিংহলে পতিতা নারীদের জন্য ইহাদের একটী উদ্ধারাশ্রম আছে। কয়েদীদিগের জন্যও একটী বৃহৎ আশ্রম আছে। জেল হইতে যে সকল কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয় ইঁহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন, এবং তাহাদের কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

অনেক নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক অভাব ও দারিদ্র্য নিবন্ধন অনাথা হইয়া অসৎ লোকের প্রলোভনে দুর্গতির পথে পতিতা হয়। অনুতপ্ত হইলেও সমাজে তাহাদের স্থান নাই। ভুলক্রমে পাপের পথে পা ফেলিয়া পরে সেই পথ হইতে ফিরিতে চেষ্টা করিলেও অনেক নারী সমাজে স্থান ও আশ্রয় পায় না। উহাদের উদ্ধারাশ্রমগুলি এই শ্রেণীর পতিতাদিগের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ। আশ্রম-পরিচালিকা মাতৃরূপিণী সন্ন্যাসিনীদিগের ক্ষমা ও প্রেমপূর্ণ সংসর্গে আসিয়া কত নারকিনী দেবী হইয়াছে, মুক্তি সেনাদলের কার্য্যবিবরণী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন।

কলম্বোতে এই দলের একজন ভারতীয় পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল; গৈরিক পরিহিত ঠিক যেন একটী বৌদ্ধসন্ন্যাসী। বদন প্রশস্ত। জুতা পায় দেন না। পদব্রজে গমন ব্যতীত গাড়ীঘোড়ায় চড়েন না। পাপীর কাছে কাছে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন।

ভারতবর্ষের সেনাদলের নেতা কমিশনার বুথটুকার একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। জেনারেল বুথের প্রেমের বাণী তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সহস্রাধিক মুদ্রা বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া টুকার-দম্পতি ভারতে ও সিংহলে সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। কলিকাতায় ইঁহাদের একটী উদ্ধারাশ্রম আছে। শিমলাতেও ইঁহাদের একটী সেবাশ্রম আছে। ইঁহারাই ভারতে উন্নতপ্রণালীর তাঁত প্রচলন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ তাঁহাদের সামান্য আয় মদে উড়াইয়া পরিবারের—স্ত্রীপুত্রের অশেষ কষ্ট ও অশান্তির কারণ হইত। বুথের সেনাদল কতশত মাতালকে মদ ছাড়াইয়া—কত দুঃখিনী রমণীর অশ্রুজল মুছাইয়াছে—কত অনাহারক্লিষ্ট শিশুর জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তাই আজ বুথের মৃত দেহ দেখিবার জন্য লক্ষাধিক শ্রমজীবী ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে। লণ্ডনের কংগ্রেস হলে

তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল। হাজার হাজার কৃতজ্ঞ নরনারী প্রতিদিন তাঁহার মৃতদেহের চারিধার ঘিরিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। সম্রাট জর্জ্জ, জর্ম্মান সম্রাট ও রাজমাতা আলেক্‌জেণ্ড্রার প্রদত্ত পুষ্পমালায় তাঁহার মৃতদেহ সজ্জিত করা হইয়াছিল। আজ সম্রাটের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত শোকাচ্ছন্ন করিয়া জগতের পরম বন্ধু উইলিয়ম বুথ তাঁহার ভুবনজয়ী কীর্ত্তিধ্বজা পশ্চাতে রাখিয়া কালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি ইচ্ছা করিলে অসাধারণ প্রতিভাবান নেপোলিয়ানের মত পার্থিব শক্তি দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেবার, ত্যাগের ও প্রেমের পন্থা অনুসরণ করিয়া মানবের মুক্তির জন্য—যে পঁচিশ সহস্র সেনাবিশিষ্ট বিশাল বাহিনী স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেই সম্রাট হইতে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় জয় করিয়া পৃথিবী-জোড়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।
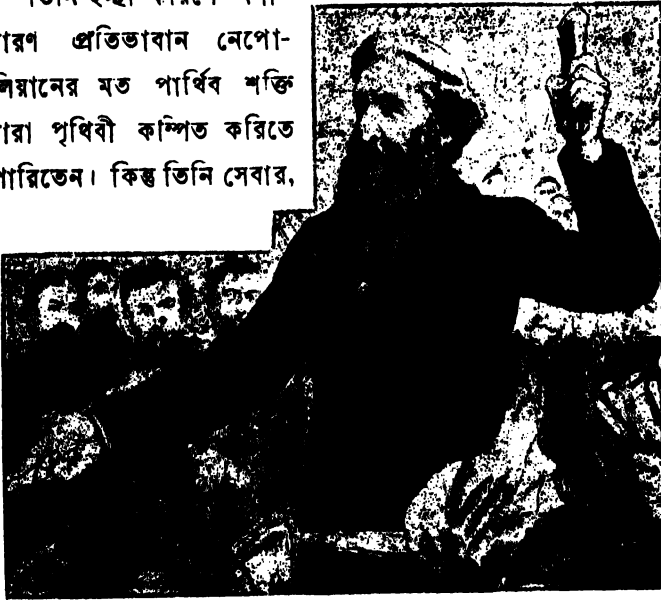
বুথ বলিতেন, "একটা মানুষ যখন জলে ডুবিয়া মরে—তখন আমরা তীরে দাঁড়াইয়া থাকাটাকে কাপুরুষতা মনে করি—আর একটা আত্মা পাপের পথে ডুবিয়া মরিতেছে—তাহাকে উদ্ধারের কোনও চেষ্টা না করিয়া পোষাকী পুণ্যজীবন লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখা কি ততোধিক কাপুরুষতা নহে ?"

যাহাদের প্রাণ আছে চারিদিকেই তাহাদের শক্তির লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ-জাতির জীবনী শক্তি আছে। তাই মানবসেবার কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহাদের প্রয়াস অসাধারণ, আমরা জড়তাপূর্ণ জীবন লইয়া ভারতের কোটি কোটি অনুন্নত ও পতিত নরনারীর কাতর বেদনায় উদাসীন থাকিয়া, এখনও কেবল জাতিভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় উন্নতির গতিরোধ করিতেছি।

ভারতের এই দুর্দ্দিনেও যে কয়টী প্রাণ পতিতের দ্বারে—অবনত জাতির মধ্যে নীতি ও জ্ঞানের আলো হস্তে লইয়া আশার বাণী প্রচার করিতেছেন, বুথের পুণ্যজীবনের আদর্শ তাঁহাদিগকে বল দিবে। সকল ভাষা অতিক্রম করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ জয়যুক্ত হইবে।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।
লণ্ডন।

বঙ্গমহিলার ব্রতকথা।

(শীতলা ষষ্ঠী।)

এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী একটা পেড়ো প্রসব করিয়া তাহা বাঁশ বনে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বধূর শ্বশুর তাহা শুনিয়া পেড়োটা কুড়াইয়া আনিয়া ছিড়িয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে ষাটটি ছেলে রহিয়াছে। শ্বশুর নাতিদের জন্য বাটী, ঝিনুক, বিছানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন এবং পুত্রবধূকে বলিলেন, "এই তোমার পুত্রদিগকে লও!" বধূ পুত্রদিগকে যথারীতি স্তন্য দান ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি হইল। পুত্রগণের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ পুত্র-বধূকে বলিলেন, "ছেলেদের বিবাহ দিব।" বধূ তাহাতে উত্তর করিলেন, যাহার ষাটটী মেয়ে, তাহার ঘরে বিবাহ দিব।" শ্বশুর বলিলেন, "কে এমন মা আছে, যাহার ৬০টী মেয়ে?" বধূ বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে।"

শ্বশুর পান, সুপারি, ধান, চন্দন ইত্যাদি লইয়া কন্যার অন্বেষণে বাটী হইতে বাহির হইলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া তিন মাস অতীত হইল। একদিন দুপুর বেলা পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, তেপান্তর মাঠে একটি পুকুর রহিয়াছে। ঐ পুকুরে স্নান করিয়া জলযোগ করিবেন মনে করিয়া পুকুর ধারে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময়ে একটি স্ত্রীলোক কন্যা লইয়া স্নান করিতে আসিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণীর ৬০টী কন্যা। তখন ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার বাটী যাইয়া কন্যাগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে পুত্রগণের বিবাহ হইল, ৬০টী বধূ ঘরে আসিল।

ছেলেরা ভারী বিদ্বান, বড় চাকুরে হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর সুপ্রসন্ন কপাল! কোন কার্য্যোপলক্ষে সব ছেলেই মাঘ মাসে বাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীতে বুড়াবুড়ী, শ্বশুর পরম সুখে আছে। মাঘ মাসের শীতলা ষষ্ঠীর দিন। সেদিন ব্রাহ্মণী ৬০টী বধূকে বলিলেন, "মা, আজ গরম গরম ভাত, ডাগর কই মাগুরের ঝোল রাঁধ, গরম জল করিয়া দাও, স্নান করি।" ৬০টী বউ, কোন বিষয়ে দুঃখ নাই, কেহ জল গরম, কেহ জল আনা, কেহ তেল গরম, কেহ রান্না করিল। বুড়ী পরম সুখে স্নান করিল এবং গরম গরম কই মাগুর মাছের ঝোল দিয়া গরম গরম অন্ন ভক্ষণ করিল। রাত্রে শুয়ে আছে, ৬০টী ছেলে, ৬০টী বউ সব ম'রে আছে। রাত পোহাল অথচ ছেলে বউরা কেউ আর ওঠে না। বেলা হ'ল দেখে কামার ডাকাইয়া দু'য়োর ভাঙিয়া দেখে, সব মরিয়া গিয়াছে।

তখন মনের দুঃখে ব্রাহ্মণী দেশান্তরে চলিলেন, যাইতে যাইতে দেখে, একটী বার বৎসরের বালিকা অশ্বত্থ গাছের ডালে দোল খাইতেছেন। ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, 'তোমার একি রীতি, সেয়ানা মেয়ে।' বালিকা বলিল, "তুই ত বেশ গরম গরম ভাত, কই মাগুর মাছের ঝোল খেয়েছিস্।" তৎপরে কিয়দ্দুর যাইয়া ব্রাহ্মণী পুনরায় দেখিলেন, একটি ১৩।১৪ বৎসরের মেয়ে বটগাছে উলঙ্গ হয়ে গাছের এ ডাল ও ডাল করে বেড়াচ্চে। ব্রাহ্মণী তাহাকে ভৎর্সনা করায় সে বলিল, "আমি বেশ করৃছি, তুই ত গরম জল করে বেশ স্নান ক'রে কই মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিস্!' তাহাতে ব্রাহ্মণী বলিল, "আমি খাইলাম কনে, তুমি রইলে বনে, কি ক'রে জান্‌লে?"

বালিকা।— 'তা' আমি যা ক'রে জানি না!

ব্রাহ্মণী।—'তুমি কাদের মেয়ে?'

বালিকা। আমি বামুনদের মেয়ে।

ব্রাহ্মণী। না বাপু! তুমি কে বল!

অবশেষে ব্রাহ্মণী অনেক কাকুতি মিনতি করাতে বালিকা নামিয়া আসিলে তাহার পায়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণী অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বালিকা কে, জানিতে চাহিলেন।

বালিকা তাঁহার এইরূপ অনুনয় বিনয়ে উত্তর করিল, 'তুমি জান না, আজ শীতলা ষষ্ঠী! মাঘ মাসে এ দিনে তুমি গরম ভাত, মাছ কেন খাইলে?'

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি কেমন করিয়া তা জানিলে? তুমি কে?

বালিকা। আমি যে হই না কেন, তোমার তাতে কি?"

তৎপরে তিনি (ষষ্ঠী) বলিলেন, 'ঐ পুকুরে স্নান করগে। স্নান করিয়া তোমার হাতের একগাছি সোণার কঙ্কণ দিয়া এক ভাঁড় দই ও আর একগাছি কঙ্কণ দিয়া পাখা কিনিয়া আন।' অতঃপর ব্রাহ্মণী দই ও পাখা আনিল। সেইখানে একটা মরা পচা বিড়াল ছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ষষ্ঠী বলিলেন, "যদি তুমি এই পচা বিড়ালের গায় দই ঢেলে দিয়ে চাটিতে পার; তবে তোমার ছেলে বাঁচে!' ব্রাহ্মণী পুত্রশোকে তাহাই করিল। ষষ্ঠী দেখিলেন যে, 'ভক্ত বটে!' তিনি বলিলেন, 'দয়ের ভাঁড় লইয়া গিয়া দয়ের ফোঁটা সকলের কপালে দিলে তোমার ছেলেরা বউয়েরা বাঁচিবে।' ব্রাহ্মণী, ঘরে গিয়ে ফোঁটা দেওয়াতে সকলেই বাঁচিল। পুত্র ও বধূরা বাঁচিয়া উঠিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'একি, এত অধিক বেলা হ'য়েছে, তবু ঘরের কাজ কর্ম্ম হয় নাই!'

বুড়ী তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'বাবা মা, তোমাদের

মেরে ফেলেছিনু!' তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তারপর বুড়ী ষষ্ঠীর কথা বিস্মরণ হওয়ার কথা বল্লেন। "শীতল ষষ্ঠীর দিনে 'আমি গরম জলে স্নান করিয়া কই মাগুর মাছের ঝোল খাওয়াতে এই বিপদ ঘটেছিল। তাই আমি শীতল ষষ্ঠী ক'রে মা ষষ্ঠীর কৃপায় তোমাদের ঘরে পেয়েছি, নচেৎ অত্যাচার ক'রে মের়ে ফেলেছিলুম্।"

তখন সেই বালিকা আসিয়া বলিল, 'আমি মানুষ নই, আমি ষষ্ঠীদেবী, মাঘমাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে কোন স্ত্রীলোক যেন গরম না খায়, আর দ'য়ের যেন ফোঁটা পড়ে, ভক্তি সহকারে পূজা করে, আর ষাট কলাই ছেলে পুলেদের খেতে দেয়। আর পোয়াতিতে যেন পঞ্চমীর দিন সাদা সিম, সাদাবেগুন, কলাই সিদ্ধ, পান্ত-ভাত করিয়া ষষ্ঠীর দিন পূজা করিয়া মায়ের পাতের কলাই 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া ছেলেদের দেয়। বাঁঝাতে ইহা করিলেও তার সন্তান হয়। ইহাই প্রচার করিবে।' এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। পশ্চিম বঙ্গে এই পূজা এবং নিয়মাদি অতীব যত্ন সহকারে বঙ্গ-ললনাগণ পালন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

ইসিদাসী (ঋষিদাসী)। *

[ইঁহার সমগ্র জীবনচরিত গাথা হইতেই পাওয়া যাইবে। টীকাকার নিজেই লিখিয়াছেন যে ৪০০ হইতে ৪০২ পর্য্যন্ত প্রথম তিনটি শ্লোক সঙ্গীতকারকের যোজনা। ইঁহার জীবনের তিন বার বিবাহের কথা সামাজিক অবস্থার ইতিহাসে বড় উপযোগী। গাথার শেষ অংশে পূর্ব্বজন্মের যে সকল কথা আছে, তাহাও সঙ্গীতকারকের যোজনা বলিয়া আমার মনে হয়। যে টুকু এ কালের যথার্থ জীবন, সেই টুকুই বড় মনোরম।]

* স্থানাভাবে সুদীর্ঘ মূল পালি দেওয়া গেল না। ভাঃ মঃ সঃ।

অনুবাদ :—কুসুমের নামে নাম, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধাম,
পাটলীপুত্রেতে শাক্যবংশীয়া সুমতি
দুজন ভিক্ষুণী ছিল অতি গুণবতী।
ইসিদাসী আর বোধী, শীল ধর্ম্মে নিরবধি
রহিয়া নিরতা, ধ্যানে করিত সাধনা।
ছিল বহুশ্রুতা ; চিত্তে ছিল না যাতনা।
ভিক্ষান্ন আহার শেষে, পাত্র দুটি ধুয়ে এসে,
একদা বিজনে বসি তারা দুই জন,
করেছিল এইরূপ কথোপকথন।

[এইটুকু সঙ্গীতকারকের যোজনা বলিয়া টীকাতেই লেখা আছে।]

"কহ আর্য্যে ইসিদাসি! গৃহাশ্রম তেজি আসি,
কেন এ বৈরাগ্য ব্রত যৌবনে তোমার?
হে সুন্দরি! কি হেরিয়া তেজিলে সংসার?
শুনি কহে ইসিদাসী, ধর্ম্ম উপদেশ ভাষি,
কেন সে তেজিল গৃহ, কি দেখিল ভবে ;
বোধী শোনে সে জীবন-কাহিনী নীরবে।
জন্ম মম শ্রেষ্ঠী ঘরে উজ্জয়িনী পুরবরে
একমাত্র কন্যা আমি আমার পিতার,
স্নেহের পুতলি ছিনু পাত্রী মমতার।
সাকেত হইতে পরে মোরে পুত্রবধূ তরে
যাচিল বণিক এক উচ্চকুল জাত ;
বিবাহেতে সম্প্রদান করিলেন তাত।
সায়াহ্নে প্রভাতে নিত্য ভক্তিপূর্ণ করি চিত্ত
শ্বশুর শাশুড়ী দোঁহে করিয়া প্রণাম,
গৃহ ধর্ম্মে নিয়োজিতা সদা রহিতাম।
আপনি আসন দিয়া বসাতাম সম্ভাষিয়া
পতির ভগিনী, ভ্রাতা, অন্য পরিজনে,
নিকটে দেখিবামাত্র আগ্রহে যতনে।
গৃহে অন্নপান যাহা রহিত, দিতাম তাহা
যাহাকে যেমন ভাবে দিবার বিধান ;
পাইতেন সবে তাহা, যিনি যাহা চান।
উঠে আমি ভোরে ভোরে কাজ করি ঘরে দোরে
হাত পা ধুইয়া শেষে দ্রুতভাবে অতি,
যাইতাম করযোড়ে সম্ভাষিতে পতি।

অঞ্জন লেপন নিয়ে, চিরুণী আরসি দিয়ে
পরিচারিকার মত নিজে হাতে আমি,
দিতাম সাজায়ে তাঁরে ; সাজিতেন স্বামী।
একপুত্রা মাতা সম আদরে পতিকে মম
সাধিতাম ; রাঁধিতাম নিজ হাতে ভাত ;
ধুতাম বাসনগুলি, ফেলিতাম পাত।
কথায় কহিনি কথা, দাসী সম কাজে রতা ;
অশ্রান্ত প্রভাত হতে খাটিতাম আমি,
তবুও আমাকে ভালবাসিল না স্বামী।
কহিল সে বাপ মায়, আমাকে সে নাহি চায়।
কহিল—"তেজিয়া গৃহ হব দূরগামী ;
ইসিদাসী নিয়ে ঘর করিব না আমি।
কহিলেন মাতাপিতা— "ইসিদাসী সুপণ্ডিতা ;
আলস্য জানে না কভু, ভোরে, ভোরে জাগে।
কেন পুত্র, বল তায় ভাল নাহি লাগে ?"
উত্তরে কহেন পতি— "করেনি সে কোন ক্ষতি ;
তার সঙ্গে বাস আমি করিব না তবু
আমাকে বিদায় দাও, ফিরিব না কভু।"
শ্বশুর শাশুড়ী মোরে জিজ্ঞাসে যতন করে,
"কহ বধূ, কোন কথা কোরো না গোপন ;
কিবা অপরাধে তব হইল এমন ?"
কহিলাম প্রাণ খুলে— "কোন দোষ কভু ভুলে
করি নাই ; কহি নাই কভু কটুবাণী ;
কেন এ বিরাগ তবু, কিছু নাহি জানি।"
"রূপসী লক্ষ্মী কি তবে আজিকে বিদায় লবে"—
বলিয়া দুঃখিত মনে দিলেন বিদায় ;
ফিরিলাম পিতৃগৃহে পতির ইচ্ছায়।
অর্দ্ধ শুল্ক লয়ে পরে পিতা মোরে অন্য বরে
করিলেন সম্প্রদান ; ধনাঢ্য সে জন।
এরূপে দ্বিতীয় কুল করিনু গ্রহণ।
এক মাস পরে, ওরে, ফিরাইল সেও মোরে,
যদিও দাসীর মত খাটিতাম ঘরে
বিনাদোষে দণ্ড মোর হল পরে পরে।
ভিক্ষা নিতে একদিন গৃহে এল দীন হীন
সংযত ভিখারী যুবা ; হেরি পিতামাতা
কহিলেন যত্নে সাধি— "চীবর ঘটিকা আদি
ফেলে দিয়ে কর ঘর, হওগো জামাতা।"
একপক্ষ রহি ঘরে কহিল পিতাকে পরে—
"চীবর ঘটিকা দাও, তেজিব সংসার ;
ভিক্ষায়ে জীবন যাত্রা হইবে আমার।"
পিতামাতা, জ্ঞাতি জন শুনিয়া ভিক্ষুর পণ
কহে সাধি —"রহ গৃহে যাহা চাহ দিব।"
কহিল সে—"মোর তরে যথেষ্ট রয়েছে ঘরে ;
ইসিদাসী সহ আমি কভু না রহিব।"
সেও গেল তেজি হায়! যাচিলাম বাপ মায়
মরণেতে অনুমতি কিম্বা প্রব্রজ্যায় ;
জীবনের কথা মোর দলিত লজ্জায়।
তারপর জিনদত্তা (বিনয়-ভূষিত সত্তা)
আসিলেন পিতৃগৃহে ; সেবিলাম তাঁয়,
আসন, আহার দিয়ে প্রণমিয়ে পায়।
অন্নপানে তুষি তাঁরে কহিলাম—"এ সংসারে
রহিব না, প্রব্রজ্যায় যাব আমি বনে।"
কহিলেন পিতা স্নেহে— "পার তুমি রহি গেহে
লভিতে সাধুতা, সেবি সাধু, দ্বিজজনে।"
কাঁদিয়া যুড়িয়া কর কহিলাম অতঃপর,
"না পিতা, করিব ক্ষয় পূর্ব্ব পাপ যত ;
ধর্ম্মের সেবায় আমি রহিব সতত।"
পিতা কহিলেন—"তবে যাও বৎসে! এই ভবে
নরশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর ধর্ম্ম কর লাভ ;
লভিয়া নির্ব্বাণ তুমি হওগো নিষ্পাপ।"
পিতামাতা জ্ঞাতিজনে, বন্দনা করিয়া বনে
চলিলাম ; সাত দিন না হইতে গত
ত্রিবিদ্যা ভাতিল প্রাণে ; পূর্ণ হল ব্রত।
সপ্ত জন্ম ব্যাপী মোর ছিল যে কর্ম্মের ডোর
হেরিনু প্রত্যক্ষ তাহা ; বুঝিলাম হিয়া
ছিল কোথা বাঁধা। কথা শোন মন দিয়া।

বুদ্ধদেব নিজে পূর্ব্ব জন্ম বা পর জন্ম মানিতেন, এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। এ সকল বিষয়ে যাহার যে বিশ্বাস ছিল, অনেক সময়েই তাহা সংস্কৃত হইতে পারে নাই। অমুক পাপ করিলে পর জন্মে

অমুক ফল হয় বা অমুক পাপের ফলে এ জন্মের এইরূপ দুরবস্থা বা ভোগ হইতেছে, এ সকল কথা খানিকটা বাঁধা-বাধি নিয়মে লোকে বিশ্বাস করিত। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া কাহারও কাহারও মনে এপ্রকার ধাঁধা বা delusion হওয়া বিচিত্র নহে যে, প্রত্যেক পাপের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের উৎপত্তির ইতিহাস বুঝিতেছি। জাতকের গল্পগুলিতে, পরবর্ত্তী যুগে, যেমন বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা কল্পনা করিয়া যোজিত হইয়াছে, তেমনি যদি সঙ্গীতকারকদের হাতে থেরীদিগের পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ কথার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নহিলে বুঝিতে হইবে যে সরলপ্রকৃতি সত্যপরায়ণা থেরীগণ মানসিক ধাঁধায় পড়িয়া এ সকল কথা লিখিয়াছিলেন।

এরকচ্ছ নগরেতে ছিল এক ধনী স্বর্ণকার ;
ছিনু তাঁর পুত্র আমি ; যৌবনে করিনু পরদার।
[এরকচ্ছ মালব দেশের অনতিদূরে (ভরুকচ্ছ বা বরোচের পূর্ব্বে)।]
মরিয়া নিরয় ভোগ করিলাম দীর্ঘকাল ধরি ;
বানর হইয়া পরে আর বার জন্ম লাভ করি।
জন্মের সপ্তাহ পরে মহাকপি 'খোজা' করে দিল।
পরদার করিবার ফলে মোর এ দশা ঘটিল।
সিন্ধুদেশে গিয়া এক অরণ্যেতে যবে মরিলাম,
কাণা আর খোঁড়া এক ছাগীগর্ভে জন্ম লভিলাম।
বহিনু বালকগণে খাসী হয়ে বারটি বৎসর ;
গায়েতে পড়িল পোকা ; এত কষ্ট জন্ম জন্মান্তর।
গো বণিক গৃহে এক গো-উদরে হইল জনম ;
লাক্ষা সম তাম্রবর্ণ ছিল মোর গায়ের বরণ।
খাটিনু বলদ হয়ে বারমাস ; এমনি করম।
শকট লাঙ্গল আদি টানিলাম বহুদিন ধরি,
হইনু দুর্ব্বল অন্ধ ; এই ফল পরদার করি।
তারপর হল জন্ম দীনা এক বীথি-দাসী ঘরে ;
হইলাম নপুংসক। পরদারে এই ফল পরে।
বত্রিশ বছরে মরি, শকটচালক দরিদ্রের
কন্যা হয়ে জন্মিলাম ; ঋণগ্রস্ত বহু বণিকের।
অনেক সুদের দায়ে শ্রেষ্ঠী এক একদা বাঁধিয়া
ধরে নিয়ে গেল মোরে ; বিলপিনু কত না কাঁদিয়া।
ষোড়শী হইনু যবে,—হেরি মোরে কুমারী যুবতী,
শ্রেষ্ঠী পুত্র গিরিদাস হইল আসক্ত মোর প্রতি।
অন্য ভার্য্যা ছিল তার, শীলে গুণে যশে চমৎকার ;
পতিপ্রাণা। আমি কিনা ভাঙ্গিলাম কপাল তাহার।
কর্ম্মফলে তেয়াগিল সবে মোর সেবা উপেক্ষিয়া।
যা হোক্, করেছি অন্ত দুঃখ যত আসিনু সহিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাঙ্গালীর চা-পান।

চা একরূপ গাছের পাতা। আজ কাল আসামে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞদের মতে এই চা-বৃক্ষ ক্যামেলিয়া (Camelia) শ্রেণীভুক্ত। বহু প্রাচীন কাল হইতে চীন দেশে চায়ের আবাদ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা জানা যায় যে চীনদেশ চায়ের আদি জন্মস্থান নহে যেহেতু চীনদেশে বন্য চা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আসামেই বন্য চা দেখিতে পাওয়া যায়। খুব পুরাকালে আসাম হইতেই চা চীনদেশে নীত হইয়া আবাদ হইতে থাকে—ইহাই উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞদের মত। চা যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে নীত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনী-লাল বসু বাহাদুর, এম্, বি, মহাশয় জাপান দেশে প্রচলিত যে এক অদ্ভুত গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :--

"৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধসাধু ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করেন, এবং তিনিই প্রথমে তথায় উহার প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। বোধিধর্ম্ম সংসারবিরাগী ও অতিশয় কঠোর আচার নিরত সাধুপুরুষ ছিলেন ; এমন কি তিনি একেবারে বীতনিদ্র হইয়া তপস্যাচরণ করিতেন। একদিন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং পুনরায় যাহাতে চক্ষু নিমীলিত না হয়, তজ্জন্য চক্ষুর দুইটী পাতা শাণিত ছুরিকাদ্বারা

ছেদন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং প্রবাদ এই-যে, তাহা হইতেই চা-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়"।

ইহার সারাংশ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে চা নীত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ চা-তে অনিদ্রা আনয়ন করে। অবশ্য ভারতবর্ষে চা-র চাষও হইত না বা ইহার কোন আদরও ছিল না।

মধ্যযুগে (সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) ওলন্দাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী (Dutch East India Company) কর্ত্তৃক চা ইউরোপে আনীত হয়। সেই সময় পাশ্চাত্য-দেশে চা অতি উপাদেয় ও মূল্যবান্ সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইল। পরে বর্ত্তমানকালে ইংরাজের আমলে চা ইহার আদিজন্মস্থান আসামে উৎপাদিত হইতেছে। আজকাল ইহা ভারতবর্ষের একটী প্রধান ফসল তবে এই ব্যবসা পোনর আনা তিন পাইএরও অধিক বিলাতি-মূলধনে পরিচালিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের চায়ের আবাদ বেশ সুন্দররূপে চলিয়াছিল; পরে এখন আসামের চা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

চা প্রধানতঃ দুই প্রকার—

(১) চীনে চা (Thea Chinensia).

(২) আসামী চা (Thea Assamica).

বাজারের শুষ্ক চা সাধারণতঃ দুই প্রকার—

(১) সবুজ চা (ইহা গাঁজান নহে)

(২) কাল চা (ইহা গাঁজান এবং তজ্জন্যই এই রং পরিবর্ত্তন)

সবুজ চা অতীব বিরল; ভারতবর্ষে ইহা তৈয়ারী হয় না বলিলেই হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা চায়ের নিম্নলিখিত উপাদান-গুলি পাওয়া যায়:—

(১) থিয়েন্ (কেফিন্) ... শতকরা ২½

(২) ট্যানিন্ ... " ১০½

(৩) সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈল জাতীয় পদার্থ ½

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় পদার্থ চায়ের পাতা বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। উক্ত তিনটী পদার্থ চীনে চা অপেক্ষা ভারতীয় চা-তে বেশী মাত্রায় লক্ষিত হয়।

চা'কে গাঁজাইয়া কাল রঙের করিলে তাহাতে যে ট্যানিন্ থাকে তাহা চা তৈয়ার কালে জলের সহিত সম্যক্‌রূপে মিশিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় কাল চা'র বেশী আদর।

চা পাতা গরম জলে ৫ মিনিট কাল রাখিয়া পরে সেই পাতাগুলি শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে দেখা যায় যে প্রায় সিকি ভাগ জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাক চা পাতা ৫ মিনিট হইতে ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত গরম জলে রাখিয়া পরে সেই জল পর পর পরীক্ষা করিয়া কোন্ কোন্ উপাদান শতকরা কত মাত্রায় পাওয়া যায়:—

	৫ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	৪০ মিনিট
কেফিন্	১˚১০	১˚৩০	১˚১৬	০
ট্যানিন্	৬˚৮	৮˚৫	১˚১৭	১˚৬৩

(সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ, চা-পাতা গরম জলে দিবামাত্র সব জলে মিশিয়া যায়)।

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে শুষ্ক চা পাতা যত বেশীক্ষণ গরম জলে রাখা যায় ততই তাহা হইতে কম পরিমাণে কেফিন জলে মিশিতে থাকে অবশেষে ৪০ মিনিটের সময় দেখা গেল যে কেফিন্ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু ট্যানিন্ ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যত বেশীক্ষণ চা গরমজলে রাখা হয় ততই বেশী পরিমাণে ট্যানিন্ জলে মিশিতে থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেফিন্, ট্যানিন্ ও তৈলযাতীয় পদার্থ আমাদের আলোচনার বিষয়, চায়ের অন্যান্য উপাদান লইয়া আমরা তত মাথা ঘামাইতে যাইব না।

এখন দেখা যাক্ কেফিন্ ও ট্যানিন্ আমাদের শরীরে যাইয়া কি কি কার্য্য করে।

কেফিন্—ইহার কার্য্য সাধারণতঃ ত্রিবিধ, যথা—

(১) হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন ধমনী প্রভৃতির উপর ইহার কার্য্য।

(২) শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য।

(৩) মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য।

কেফিন্ আমাদের শরীরাভ্যন্তরে পৌছাইয়াই হৃৎ-পিণ্ডকে উত্তেজিত করে; ধমনী সকল প্রথমে কিয়ৎক্ষণ

সঙ্কুচিত থাকিয়া পরে স্ফীত হয় তজ্জন্য অধিক পরিমাণে রক্ত নানাস্থানে চলাচল করে। অধিক রক্ত মস্তিষ্কে যাওয়ায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, ফলে অনিদ্রা আসিয়া পড়ে।

এই অনিদ্রার জন্যই ছাত্রমহলে চা'র এত আদর। পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাত্রেরা চা পান করিয়া অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করেন। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলে। কারণ, অবশেষে পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্রই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে (বুক ধড়ফড়, মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, শিরঃশূল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন, পাঠে অনিচ্ছা, স্মরণ-শক্তির হ্রাস প্রভৃতি) ভুগিয়া থাকেন। অত্যধিক চা-পানে উক্ত ব্যাধি সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসক্রিয়াও তাড়াতাড়ি হইতে থাকে, অধিক অম্লযান বাষ্প (Oxygen gas) শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণে অঙ্গারযান বাষ্প ও (Carbon dioxide gas) শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা ইহতে বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে আমাদের শরীরের দহন ক্রিয়া ক্ষিপ্রভাবে সম্পাদিত হয়।

যেমন অধিক পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্কেতে যাওয়ায় অনিদ্রা আসিয়া পড়ে সেইরূপ ধমনীর স্ফীততা বশতঃ অধিক পরিমাণে রক্ত মূত্রকোষের ভিতর দিয়া যাওয়ায় অধিক মূত্র বাহির হয়।

ট্যানিন্—ইহা যে সব শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় স্থানের সংস্পর্শে আসে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মুখবিবরে যাইবা মাত্র মুখ শুষ্ক বোধ হয়; পাকস্থলীতে পৌঁছাইয়া ইহা উক্ত যন্ত্রের অভ্যন্তর কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক করিয়া দেয় এবং তজ্জনিত পাকস্থলীর রসও কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহা দ্বারা পেপ্‌সিন্ উক্ত রস হইতে পৃথক্ হওয়ায় পেপ্‌সিনের খাদ্য হজম করিবার ক্ষমতা মন্দীভূত হয়। ফলে ইহা অগ্নিমান্দ্য ও বদ্‌হজম (Dyspepsia) আনয়ন করে। ইহার সংস্রবে আসায় অন্ত্রের মধ্যস্থিত মল শুষ্ক হইয়া যায় এবং সেই জন্যই চা-খোরেরা কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভুগিয়া থাকেন।

তৈল জাতীয় পদার্থে তৈয়ারী চা-তে কেবল সদ্‌গন্ধ প্রদান করে।

নিদান ব্যবসায়ীরা কেবল দুই একটী ব্যারামে বেশী মাত্রায় মূত্র বাহির করিবার জন্য এবং দুর্ব্বল রোগীর শরীরে কিছুক্ষণের নিমিত্ত বল আনিবার জন্য কেফিন্ আর উদরাময়ে কিংবা কোন স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ট্যানিন্ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর বেশী কোন ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায় না।

কিন্তু সাধারণে চা পান করেন অন্য উদ্দেশ্যে—ইহা সম্পূর্ণ নেশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরিশ্রমের পর এক পেয়ালা গরম চা পান করিলে তদ্দ্বারা শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া পুনরায় কার্য্যে স্পৃহা জন্মে বটে কিন্তু এই সামান্য উপকারিতার জন্য আমরা চা পান করিয়া শরীরের কত অনিষ্ট করিতেছি। অধিকন্তু উক্ত উপকারিতা অপর দ্রব্যের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে৮ এক পেয়ালা গরম দুগ্ধ পানে পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বেশ দূর হয় এবং পুনরায় কার্য্যে মন যায় অথচ দুগ্ধ পানের অশেষ গুণ। পাঠ্যাবস্থায় Materia Medicaয় কেফিন্ অধ্যয়ন কালে আমাদের শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"Tea drinking is a fashion of the day : a cup of warm milk does immense good" বলা বাহুল্য উক্ত শিক্ষক একজন ইংরাজ এবং ইনি এখন ভারতবর্ষের একটী খ্যাতনামা চিকিৎসক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অত্যধিক চা পানে মস্তক ঘূর্ণন, হৃৎকম্পন, শিরঃশূল, প্রভৃতি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। আজকাল এদেশে, বিশেষ ছাত্রমহলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী—চা যে ইহা আনয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে এ ধারণা অমূলক নহে। দ্বিতীয়তঃ এই দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদ্‌হজমের (Dyspepsia) অতিশয় প্রকোপ—চা-ও এই দুইটী ব্যাধি সৃষ্টি করিতে বিশেষ পটু।

কলিকাতার দোকানের তৈয়ারী চা অতিশয় কড়া, অতএব তাহাতে ট্যানিনের পরিমাণও বড় বেশী; এজন্য ইহাতে অজীর্ণ ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিশেষরূপে আনয়ন করে। যাঁহাদের কোনরূপ হৃদ্‌রোগ কিম্বা হিষ্টিরিয়া বা

অন্ত কোন স্নায়বিক ব্যাধি আছে তাঁহাদের পক্ষে চা পান বিশেষ অপকারী।

পূর্ব্বেকার লোকের ধারণা ছিল যে চা আহারের কার্য্য করে অর্থাৎ চা পান করিলে আহার তত দরকার হয় না। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। চা ত আমাদের আহারের স্থান অধিকার করিতে পারেই না, অধিকন্তু ইহাতে শরীরের দহন কার্য্য ক্ষিপ্র হওয়ায় শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। সারবান্ খাদ্য আহার করিলে চা তাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে সহায়তা করে কিন্তু খাদ্য সারবান্ না হইলে উহাতে অপকার দর্শায়। অতএব আমরা "ভেতো বাঙ্গালী" আমাদের পক্ষে চা বিশেষ অনিষ্টকারী।

অতএব এত অনিষ্ট সত্ত্বেও আমরা চা ব্যবহার করি কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ—চা যে সাহেবেরা ব্যবহার করে! মধ্যযুগে মুসলমানদের সংস্রবে আসায় আমরা ধূমপান করিতে শিক্ষা করি; আবার এখন ইংরাজদের নিকট হইতে চা পান করিতে ও চুরুট টানিতে শিখিতেছি। আমরা ইংরাজদের দোষগুলি বেশ গ্রহণ করিতেছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাহাদের গুণগুলি অনুকরণে ব্যস্ত? কয়জন লোক তাহাদের একাগ্রতা, একতা, কার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি সদ্গুণ লাভ করিতে চেষ্টা করে! কোন্ বাঙ্গালী ইংরাজদের মত বিদেশে ব্যবসা করিয়া স্বদেশের দৈন্য মোচন করিতে যত্নবান!

আবার যাহা অনুকরণ করি তাহাও ঠিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বেলা ১২টার সময় প্রাতঃস্নানের মত। সাহেবেরা সেরি, স্যাম্পেন্, ক্লারেট্ পান করেন, আর এদেশের লোক পান করেন ধান্যেশ্বরী, সাহেবেরা হাবানা ও অন্যান্য মূল্যবান চুরুট ব্যবহার করেন, আর বাঙ্গালী বাবুরা টানেন বিড়ি বা হাওয়াগাড়ি সিগারেট্, কি খুব উর্দ্ধ কলুটোলার চুরুট্।

সাহেবেরা যে চা পান করেন তাহা পানীয় হিসাবে একটী উপাদেয় খাদ্য। ইহা প্রস্তুত করাও তত সহজ নহে। আর বাঙ্গালীর চা পান ধৃষ্টতা মাত্র।

উত্তম চা প্রস্তুত করিতে হইলে যে গরম জল দরকার তাহা অধিকক্ষণ ফুটান উচিত নহে, অধিকক্ষণ জল ফুটাইলে তাহা হইতে সমস্ত বায়ু উড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বেশী soft* কিম্বা বেশী hard* জল চায়ের পক্ষে ভাল নহে। মধ্যম রকমের জলই প্রশস্ত।

চার পাতাগুলি উক্তরূপ গরম জলে ৫ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নহে কারণ সদ্গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ চা পাতা গরম জলে দিবামাত্রই জলে মিশিয়া যায় এবং কেফিনও অনেকটা বাহির হইয়া জলে মিশ্রিত হয়। চা অধিকক্ষণ গরম জলে রাখিলে কেবল বেশী পরিমাণে ট্যানিন্ ও অন্যান্য কটু দ্রব্য জলে মিশিয়া যায়; ট্যানিন্ ও ঐ সব কটু দ্রব্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। অনেকে (বিশেষ কলিকাতার দোকানদার) চা পাতা জলে সিদ্ধ করেন, তাহা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থানে বলা দরকার যে চাতে দুগ্ধ মিশাইলে ট্যানিনের কিয়দংশ পৃথক্ অবস্থায় পেয়ালার নিম্নে পড়িয়া যায়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে চা তৈয়ার করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত। যাঁহারা নিজের বাড়ীতে চা তৈয়ার করিয়া পান করেন তাঁহারা উক্ত নিয়মগুলি পালন করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ জল অনেকক্ষণ ফুটাইয়া থাকেন। তবু তাঁহাদের এ অভ্যাস তত নিন্দনীয় নহে, যেহেতু তাঁহারা ৫ মিনিটের বেশী গরম জলে চা পাতা রাখেন না, অবশ্য ইঁহারা যে চা পানজনিত অপকারিতার হাত এড়াইতে পারেন এ কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাহারা কলিকাতার দোকানের তৈয়ারি চা পান করেন তাঁহারা এক রকম বিষ পান করেন।

কলিকাতার দোকানদারদের প্রতারণার বিষয় বোধ হয় অনেকেই জানেন না। প্রাতঃকালে লৌহের উনানে নিকৃষ্ট চা ও জল একসঙ্গে গরম করিতে দেওয়া হয়। সেই চা জলে সিদ্ধ হইতে থাকে এবং খরিদ্দার বাবুরা আসিলে উক্ত গরম জল খানিকটা উঠাইয়া একটু চিনি ও জমাট দুগ্ধ (Condensed milk) মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার পর যতই খরিদ্দার আসিতে

* যে জলে একটু সাবান মিশাইলেই ফেণা হয় তাহাকে Soft (নরম) জল বলে এবং ইহার বিপরীত hard (শক্ত) জল।

থাকে ততই দোকানদার মহাশয় উক্ত গরম জলের পাত্রে জল ঢালিতে থাকেন। এইরূপে প্রাতঃকালের, সেই মুষ্টিমেয় চার দ্বারা সমস্ত দিনের খরিদ্দার দিগকে সরবরাহ করা হয়। নিকৃষ্ট জাতীয় চাতে ত সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ নাই বলিলেই চলে; যাহা একটু থাকে তাহা কেবল প্রথম খরিদ্দারের অদৃষ্টেই ঘটে, যাঁহারা পরে আসেন তাঁহারা কেবল ট্যানিন গোলা জল পান করিয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে বাড়ী যান এবং ইহার ফলে পরিশেষে কোষ্ঠ কাঠিন্য, বদ হজম, (Dyspepsis) রোগে আক্রান্ত হইয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ করেন।

এই শ্রেণীর দোকানদারেরা তবু একটু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কার্য্য করেন; কেহ কেহ কিন্তু একেবারে দিনে ডাকাতি করিয়া থাকেন। শুনা যায় যে বাজারে এক প্রকার নকল চা বিক্রয় হয়। ইহা সাধারণতঃ শুষ্ক কপির পাতা. দেখিতে ঠিক শুষ্ক চা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোকানদারেরা এই কপিপত্র প্রস্তুত চা গরম জলের সহযোগে তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করেন আর বাঙ্গালী বাবুরা তৃপ্তি সহকারে এই কপিপাতার ঝোল পান করিয়া চা খাওয়ার সাধ মিটান।

দোকানে যে পেয়ালা (Cup) করিয়া বাবুদের চা সরবরাহ করা হয় তাহার বিষয় কিছু সমালোচনা দরকার। সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ১ কিম্বা ২ ডজন পেয়ালা দ্বারা অন্যূন ২০০।৩০০ খরিদ্দারকে চা পান করিতে দেওয়া হয়, প্রত্যেক খরিদ্দার পান করার পর পেয়ালাটী কেবল একবার এক বালতি জলে ডুবাইয়া লওয়া হয় মাত্র। আবার সেই বালতির জলও যে মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করা হয় সে বিষয়ও সন্দেহ। এই প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা মীমাংসা করিবার ভার উক্ত খরিদ্দার মহাশয়দের উপরই রহিল।

নিম্ন শ্রেণীর কেরাণী বাবুদের মধ্যেই দোকানের তৈয়ারি চার আদর বেশী। বৈকালে অফিসে অনেকে দোকানের ঘৃত খারাপ বলিয়া দোকানের তৈয়ারি কচুড়ি শিঙ্গাড়া আহার করেন না কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দোকানের চা ২।১ পেয়ালা পান করিয়া থাকেন। কেরাণী বাবুরা সাধারণতঃ ২০।৩০ টাকা মাহিনা পান কিন্তু দিনে তাঁহাদের সিগারেট, চাতে প্রায় ৵০ দুই আনা ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত ৵০ আনা দিয়া তাঁহারা যদি কোন ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়া বৈকালে একটু জলযোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শরীরের উন্নতিও হয় এবং ঐ সঙ্গে দুইটী নেশার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অনেক চা পায়ী ধূমপায়ীদের উপর খড়্গ হস্ত কেননা ইঁহারা তাম্রকূটের বশীভূত। পূর্ব্বোক্তেরা চা-কে নেশার মধ্যে স্থান দেন না। ধূমপায়ী যে দোষে দোষী চা পানকারীও সেই দোষে দোষী। দুই সম্প্রদায়ই যে নেশার অধীন ইহা স্থূল সত্য। "যারেই বলে ভাজা চাল তারেই বলে মুড়ি।" বাঙ্গালা দেশে আজকাল চা বড় বেশী সমাদৃত হইতেছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহার প্রচলন বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা যথার্থই মর্ম্মাহত হইতেছি। অনেক বাড়ীতে পুরুষ স্ত্রী এমন কি ঝি চাকরেরও প্রাতঃকালে চা পানের বন্দোবস্ত আছে। আমরা দীন দুঃখী বাঙ্গালী আমরা যে দিন দিন এত বাজে খরচ বাড়াইতেছি এবং তৎসঙ্গে শরীরেও অনিষ্ট করিতেছি ইহা কেবল আমাদের অপরিণামদর্শিতার ফল।

ধূমপানের প্রতিকূলে যেমন কলিকাতার Anti-smoking Union নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে সেইরূপ Anti-Tea drinking Union নামে একটী সমিতি হওয়াও একান্ত দরকার।

(স্বাস্থ্য সমাচার)

বিলাতে সমাজ সমস্যা।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহে বিতৃষ্ণা।

বিলাতের বিবাহ রেজিষ্ট্রার-জেনারেলের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বিলাতে বিবাহের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমান ১৯১২ সনের প্রথম তিন মাসে প্রতি ১০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যা ৮.৯ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে।

এই তিন মাসে বিলাতে যত কম বিবাহ হইয়াছে, আর কোনদিনই এরূপ হয় নাই। জন্ম সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও পূর্ব্বোক্ত বিবাহ হ্রাসের কথা আরও স্পষ্ট প্রতীত হইবে। গত তিনমাসে জন্ম সংখ্যাও প্রতি হাজারে ২৯ হিসাবে কম হইয়াছে। এই বিবাহ ও জন্মসংখ্যা হ্রাসের কথা লইয়া বিলাতের বৈজ্ঞানিক মহলে একটু তীব্র আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং সকলেই পাশ্চাত্য সমাজের ভবিষ্যৎ শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিলাতে রমণী সমাজ দিন দিনই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছেন বলিয়াই তাহারা ক্রমশঃ বিবাহের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "এক্সপ্রেস" পত্রের জৈনক প্রতিনিধি সেদিন সেমুর প্রেসের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ইজিকেল বয়ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধির নিকট ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, "আমি মনে করি, আধুনিক যুগের মহিলাগণ অতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন বিবাহের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছেন। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বিবাহ সংখ্যা আরও অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং একদিন পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিবাহ প্রথা একেবারে উঠিয়া যাইবে, এমন দিন উপস্থিত হওয়া তেমন অসম্ভব নহে। গ্রেট বৃটনের রমণীকুল প্রতিবৎসরই অল্পে অল্পে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। তাহারা ক্রমশঃ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া উঠিতেছেন। এই স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহারা এখন আর কোন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন না। সকলেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপাসিকা হইয়া উঠিতেছেন। বিবাহের ব্যয়ও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাও বিবাহের প্রতি লোকের বিরাগ জন্মিবার আর এক প্রধান কারণ। আজকাল বিবাহিত জীবনে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়, এজন্য নব্য সম্প্রদায় বিবাহরূপ কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়া থাকে। যাঁহারা মানব সমাজের গতি, স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটা একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

সফরিগেট।

বিলাতের সফরিগেট রমণীরা গবর্ণমেণ্টকে পদে পদে বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়েও ইহাদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি বিলাত হইতে খবর আসিয়াছে, বিলাতের উত্তরাংশে আটর্স বার নামক স্থানে টেলিগ্রাফের যে তার আছে, উহার কোন কোন স্থান ছিন্ন হওয়ায় সংবাদ আদান প্রদানে বাধা জন্মিতেছে বলিয়া তার আফিসের কর্ম্মচারীগণ তার ছিন্ন হওয়ার কারণানুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। প্রেরিত লোকেরা ঘটনাস্থলে গমন করিয়া দেখিতে পায়, এক দল রমণী তারের থাম গুলির উপর উঠিয়া তার কাটিয়া দিতেছে। এই প্রকারে তাহারা চৌদ্দটা তার একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তারের কোন কোন থামে এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ ছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে সফরিগেট রমণীদের দাবী গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এজন্য তাহার প্রতিশোধস্বরূপ তাহারা এই সকল তার কাটিয়া দিতেছে। ভোট প্রার্থিণী রমণীদের এই কার্য্যে বিলাতের ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায় পরিচালনে বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, তাহারা তারে খবর পাঠাইয়া নানা স্থানে ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। আটর্সবার ব্যতীত আরও অনেক জাগায় সফরিগেট রমণীরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পুলিশ আজ পর্য্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

(বিশ্ব-বার্ত্তা)।

জেনারেল নোগী।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ ঃ– স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON).

মর্ম্মানুবাদ ঃ—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৯। | ৭ম সংখ্যা।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমাইজী।

গত ভাদ্রমাসের ভারত-মহিলায় কোন মনস্বিনী লেখিকা ভারতী নাম্নী নারীরত্নের পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠিকা সমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে নারীসমাজের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, কুটনো কোটা বাটনা বাটা বা সন্তান পালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্যও তাঁহাদের ছিল—খনা, লীলাবতী, গার্গী, ভারতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত-মহিলাবর্গ ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।—কিন্তু প্রতিভাময়ী ভারত-মহিলাগণ যে সর্ব্বকালেই শিক্ষিত সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ, ইহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিগত শতাব্দীতে পণ্ডিতা হটী বিদ্যালঙ্কার যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, প্রাচীন যুগে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয় কালে কর্ণাট রাজপ্রিয়া রাজ্ঞী পদ্মাবতীর যশোভাতি অপেক্ষা তাহা কোন অংশে ম্লান নহে। কিন্তু সে সময় সাগর-মেখলা ভারতের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তেমন বেশী পরিচয় হয় নাই, এই জন্যই প্রাচীন যুগের ভারত-মহিলাগণের কীর্ত্তিকাহিনী এ কালের মত দিগন্তব্যাপিনী হইতে পারে নাই। কিন্তু আধুনিক যুগে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে আমাদের পরিচয় হইয়াছে।—পরিচয় হইয়াছে বলিয়াই কুমারী তরুদত্তের নাম ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে অজ্ঞাত নহে, আর এই জন্যই মহিলা-কবি সরোজিনী নাইডুর কবিতা প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেও 'কোটেসন' রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিতেছি। সারদাসদনের প্রতিষ্ঠাত্রী

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর সহিত পরিচয়ে সুবিখ্যাত আচার্য্য মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আবার সেদিন শ্রীমতী সত্যবালা মূর্ত্তিমতী বীণাপাণির ন্যায় বীণা যন্ত্রের সুমোহন ঝঙ্কারে সাহিত্য-সঙ্গীত-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাতীর্থ, স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন মার্কিন যুক্ত সাম্রাজ্যের বিদ্বৎসমাজকে যেমন বিস্মিত পুলকিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকপাঠিকা-গণের অজ্ঞাত নহে।—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এ দেশে মহিলা সমাজের উন্নতির পথের বাধা যতই প্রবল হউক, প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া যাঁহারা সাধনার কনকমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা একদিন না একদিন সিদ্ধি লাভেরও অধিকারিণী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

সাহিত্যে, কাব্যে, গণিতে, শাস্ত্রানুশীলনে ও বিবিধ দেশ হিতকর কার্য্যে আমরা প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত-মহিলা-গণের প্রতিভার যে পরিচয় পাই, ধর্ম্মানুশীলনেও সেরূপ পরিচয়ের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বারাণসী ধামের পরলোকগতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমাইজির নাম উল্লেখ করিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর উল্লেখ করিব।

শ্রীমাইজির নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; তাঁহাকে দেখিয়াছেন এরূপ লোকের সংখ্যাও বিরল নহে। তিনি অবধূতি, যোগিনী কি ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে মত ভেদ থাকিলেও তিনি যে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসিনী-গণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য নিরূপণ করাও সহজ নহে।

শ্রীমাইজির পিতৃদত্ত নাম হরিবাঈ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গুর্জ্জর দেশের কোনও একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ রামেশ্বর দেব গুজরাথী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রামেশ্বরদেব নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন; গুজরাথী ব্রাহ্মণ গণের একসম্প্রদায়ের নাম নাগর ব্রাহ্মণ। বরোদা রাজ্যের সিধপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহে, কাথিয়াবারে, জুনাগড় রাজ্যে নাগর ব্রাহ্মণ গণের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। জুনাগড় মুসলমান নবাবের রাজ্য হইলেও, তত্রত্য প্রধান প্রধান পদগুলিতে নাগর ব্রাহ্মণ গণের একাধিপত্য; বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক যখন গুর্জ্জর দেশে ছিলেন, তখন জুনাগড়ে নাগর ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল, এখনও সম্ভবতঃ সেইরূপ আছে।

নাগর ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী এবং অনেকেই শাস্ত্রানুরাগী। রামেশ্বর দেব সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও শুদ্ধাচারী ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছয়টি পুত্র কন্যার মধ্যে হরিবাঈ সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু মাতৃ-স্নেহ কি পদার্থ, জ্ঞান হইবার পর মাইজি তাহা জানিতে পারেন নাই; যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময় রামেশ্বর দেবের সাধ্বীপত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন।

জননীর মৃত্যুতে হরিবাঈর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে; বৃদ্ধ রামেশ্বর দেব তাঁহার জননীর স্থান অধিকার করিয়া পরম স্নেহ যত্নে কন্যাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কন্যাকে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না। হরিবাঈ শৈশব কালেই তাঁহার পিতৃদেবের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানানুরাগের অধি-কারিণী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রামেশ্বর দেব সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশু কন্যাকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মাইজির হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। হরিবাঈ পিতার নিকট সর্ব্বদা পরম আগ্রহে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বয়স কিছু অধিক হইলে তিনি পিতার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, পিতাই তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু হইলেন।

গুর্জ্জরের ব্রাহ্মণ সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে; সুতরাং বাল্য বিবাহের কুফলও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। হরি বাঈর বয়স যখন দশ বৎসর সেই সময় কাশীধামে একটি সদ্বংশজাত রূপবান সুশীল যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রামেশ্বর দেব পণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের গৃহেই তিনি কন্যা সম্প্রদান

করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতা পুরুষ হরি বাঈর অদৃষ্টে দাম্পত্য সুখ লেখেন নাই। হরি বাঈ বিবাহের তিন বৎসর পরে,—ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ হইতে কাশীধামে স্বামীগৃহে গমন করেন। দুই বৎসর পরে যৌবনের প্রারম্ভ কালেই তিনি স্বামীরত্নে বঞ্চিত হইলেন। সংসার-সুখের সহিত পরিচয় হইতে না হইতে তাঁহার গার্হস্থ্য সুখের দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

পঞ্চদশ বৎসর বয়সে নন্দনতুল্য সংসার শ্মশানে পরিণত হওয়ায়, গার্হস্থ্য জীবনের সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হরিবাঈ শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক নানা ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে ও যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। এইভাবে দুই বৎসর অতীত হইলে, হরিবাঈ ব্রহ্মচারিণী বেশে বীণাপাণির পীঠতল বারাণসীধামে ফিরিয়া আসিলেন; বারাণসীর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজে হরিবাঈর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি প্রচারিত হইল। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শাপভ্রষ্টা সরস্বতী মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কাশীতে বসিয়া সাহিত্য ও শাস্ত্রালোচনায় জীবনের সুদীর্ঘ অবসর অতিবাহিত করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। কিছুদিন পরে রামেশ্বর দেব পদব্রজে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, হরিবাঈ পিতাকে একাকী যাইতে দিলেন না. তিনি ছায়ার ন্যায় পিতার অনুসরণ করিলেন; এবং তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে যে সকল সামগ্রী অপরিহার্য্য, হরিবাঈ সেই সকল সামগ্রী একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া সেই পুঁটুলী মস্তকে বহনপূর্ব্বক বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পিতা ও পুত্রী উভয়ে এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাল পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়ে জগন্নাথ ক্ষেত্র, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ প্রভৃতি দুর্গম ও বহুদূরবর্ত্তী দেশদেশান্তরে অবস্থিত পুণ্যতীর্থ-সমূহ সন্দর্শন করিয়াছিলেন; শত শত ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করায় তাঁহার কোমল চরণদ্বয় স্ফীত ও বেদনাপ্লুত হইয়াছিল, নানা অনিয়মে ও কষ্টে তাঁহার রূপলাবণ্য পাংশুরাশি-সমাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখখানি কোন দিন কেহ কাতর দেখে নাই। দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুখদুঃখকে তিনি সমজ্ঞান করিতে শিখিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল তীর্থ ভ্রমণের পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাইজি তাঁহার পিতৃদেবের সহিত পুনর্ব্বার কাশীধামে সমুপস্থিত হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র!

রামেশ্বর দেবের গুরু শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কাশী-ধামের এক ক্রোশ পূর্ব্বে আনন্দ গুম্ফা নামক একটি গুহায় বাস করিয়া ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। মাইজির কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরে সচ্চিদা-নন্দ স্বামীর দেহাবসান হয়; তাঁহার লোকান্তর গমনের পর মাইজি পিতার সহিত সেই গুহায় বাস করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রানুশীলনে ও যোগাভ্যাসে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু নর-নারী তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া আনন্দ গুম্ফায় মাইজিকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহার মধুর উপদেশে অনেকের শোক-তাপ-পূর্ণ জীবনের জ্বালা প্রশমিত হইত। সংসারীর হৃদয়ও কিছুকালের জন্য বিমলানন্দ রসে পূর্ণ-পরিতৃপ্ত হইত।

মাইজি চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তাঁহার পিতার সহিত এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও শাস্ত্রানুশীলনে অতিবাহিত হইয়াছিল। আনন্দ গুম্ফায় মাইজি একাদি-ক্রমে ৩৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন; এই সময় বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, দেহ রক্ষার জন্য কখন কখন দুগ্ধ ও ফলমূলাদি আহার করিতেন মাত্র, অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর দেবের মৃত্যু হইলে, তাহার পর হইতে মাইজি এই গুহায় একাকিনী বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মাইজি ৭২ বৎসর বয়সে আনন্দ গুম্ফায় দেহত্যাগ করেন

এখনও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থপর্য্যটক ও ভক্ত নর-নারী আনন্দ গুম্ফায় উপস্থিত হইয়া পরলোক-

গতা মাইজির উদ্দেশে শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মাইজি যে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, এরূপ নহে, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক বা নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দু সকলেই তাঁহাকে সমান ভক্তি করিতেন। যতদিন আনন্দ গুম্ফার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন স্বর্গীয়া মাইজির পবিত্র স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পূজার পল্লী।

তেলকলঘাটে মার্টিনের খেলাঘরের ট্রেনে গিয়া যখন উঠিলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। যে গাড়ীতে আমরা উঠিয়াছিলাম সেখানা একখানা লম্বা গাড়ী, অন্যান্য গাড়ীর মতো ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত নয়। শুনিলাম, মার্টিনের লোকেরা ঐ গাড়ীকে বলে দরবার গাড়ী (Durbar Carriage)। কাণার নাম পদ্মলোচন!

গাড়ীতে যখন উঠিয়াছিলাম তখন তাহাতে লোক-ছিল না বলিলেও চলে। মনে করিয়াছিলাম, বেশ আরামেই যাওয়া যাইবে। কিন্তু এস্বপ্ন ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না। পরের ষ্টেসনেই গাড়ীখানি একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গেল এবং আরোহীদের বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কির সংখ্যাধিক্যে হাত পা ছড়ান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

গাড়ী ছাড়িতেই তাঁহারা আলোচনা আরম্ভ করিলেন, 'মেয়েদের গাড়ী আলাদা আছে, এ গাড়ীতে মেয়েদের আনা কেন?' মাতাঠাকুরাণী ও বালিকা ভগ্নী আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই ছিলেন। আমরা কয়জনে তাঁহাদের চেয়ে বিশেষ সুখে যাইতেছিলাম তা' নয়, তবে বোধ হয় তাঁহাদের মনে হইতেছিল, পুরুষের আরামের পথে রমণী কেন কাঁটা দেয়! আমি তাঁহাদের সমালোচনায় হাঁ বা না কিছুই বলিলাম না, একমনে সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' পড়িতে লাগিলাম।

প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া সশব্দে অতি মৃদুগতিতে পাটক্ষেতের ধার দিয়া, গ্রাম্য পাঠশালার সম্মুখদিয়া, বাঁশবন আন্দোলিত করিয়া ট্রেন চলিল। আরোহীদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা চলিতেছিল; কোথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে; ধানগাছের মাথা এক বিঘৎ মাত্র বাহির হইয়া আছে; কিছুদিন আগে ট্রেনে একটা ছেলে কাটা পড়িয়াছে; আপিসের ছুটি মোটে পাঁচদিন; জুতা জোড়ায় পৌণে তিন টাকা খরচ পড়িয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের গন্তব্য স্থানের আগের ষ্টেসনটি একটি জংশন। সেখানে সকলের টিকিট দেখা হইল। একটি বাচাল ছেলে—যাহার মুখে এতাবৎকাল 'খই ফুটিতেছিল', সে একখানি হাফ্ টিকিট দেখাইল। টিকিট কালেক্টর জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার বয়স কত?' সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল 'এগারো'। 'তবে তোমার হাফ্ টিকিট কেন?' ছেলেটি থতমত খাইয়া গেল, ইতিমধ্যে ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। তখন অন্যান্য আরোহীরা বলিল, "তুই ত এতক্ষণ খুব জ্যাঠামো কর্‌ছিলি! বল্‌তে হয় বয়েস দশ বছর, ব'লে ফেল্লি এগারো। নেহাৎ আহাম্মক!" একজন বলিল 'ওর ঠেঙ্গে এক্‌সেস্ ফেয়ার আদায় করবে।' একজন বলিল, "তোকে যখন জিজ্ঞেস করবে হাফ্ টিকিট কেন, তুই বল্‌বি আমি কি জানি, বাবা আমায় টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে।" আর একজন বলিল, "না সেটা সুবিধে হবে না। ওর উচিত, যেই গাড়ী ষ্টেসনের কাছাকাছি হবে অমনি ট্রেন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে পাটক্ষেতের মাঝ দিয়ে ছুট দেওয়া।"

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় ট্রেন হইতে নামিলাম। ছেলেটি কি করিল লক্ষ্য করি নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়াই শুনিলাম ঝি পলাইয়াছে। সুখবর নয়!

বাহিরে যতক্ষণ রোদ ছিল সে সময়টা বিছানাতেই কাটিল। সন্ধ্যার কিছু আগে কয়েকজনে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। মাঠের মাঝ দিয়া অনতিপ্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ঘন বনের মধ্যে দিয়া কতকটা সিঁদুরে আকাশ দেখা যাইতেছে। ঝোপের মধ্যে ঝিল্লীরা তান ধরিয়াছে; উহা সারারা'ত চলিবে। এমন সময়ে বেশ একটা শান্তি

অনুভব করা যায়, কিন্তু সে শান্তির মধ্যে একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষাদও যেন উঁকি ঝুঁকি মারে।

ঝোপের ধার দিয়া চলিতে চলিতে আলোচনা হইতেছিল, ঝোপের ভিতর কি থাকা সম্ভব। সর্পের কথাটাই সকলের মনে উদয় হইল। চিন্তাটা যে বিশেষ আরামদায়ক তা' কেহই বলিবেন না। এমন সময় ঝোপের ভিতর হইতে আমাদের দলের অগ্রগামীর পায়ের কাছে কি একটা তীরবেগে লাফাইয়া পড়িল। তিনি সভয়ে ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিলেন। আমাদের পশ্চাতে দুইজন চাষার ছেলে আসিতেছিল, তারা কিছুই দেখে নাই, কিন্তু আমদের লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়া ভাবিল, একটা ভয়ানক কিছু ঘটিয়াছে! তাই তাহারাও লম্ফ প্রদান করিল। তখন দেখাগেল আমাদের ভীতি উৎপাদনকারী জীবটি নিরীহ ভেকজাতির বংশধর!

পল্লীগ্রামে সন্ধ্যা হইলেই মনে হয়, যেন অনেক রাত্রি হইয়াছে। সকলে যা করে আমিও তাই করিলাম। তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম। সবেমাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি, অমনি নাকের ডগার কাছে শুনিলাম 'পন্'শব্দ। সর্ব্বনাশ! মশা ঢুকিয়াছে। মশাগুলো যদি ঐ শব্দটা না করিয়া চুপ চাপ রক্তপান করিয়া চলিয়া যায় তবে বোধ হয় ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ঐ 'পন্' শব্দটা দুঃসহ,কেবল মনে হয় এই বুঝি কামড়াইল, এই বুঝি মুখের উপর বসিল। উঠিয়া বসিলাম; মশাটাকে নিহত করিব সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু উঠিয়া বসার সঙ্গে সঙ্গে 'পন্' শব্দ থামিল,তখন মশাটা কোথায়—বাহির করা দুঃসাধ্য। ভাবিলাম, যাক্ আপদ গেছে, এইবার একটু আরামে ঘুমাইব। কিন্তু যেই চোখ বোজা অমনি 'পন্'! বুঝিলাম মশাগুলোর বুদ্ধিও আছে, প্রাণের মমতাও আছে। মনে মনে স্থির করিলাম কামড়ায় কামড়াক্ আর মশা মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা নয়। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, অমনি শৃগালের দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এ চীৎকার শৃগালদের হর্ষকোলাহল বা ক্রন্দনধ্বনি তা আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের একতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

শৃগালের মধ্যে কোনটা বা আনাড়ির মতো একই সুরে চীৎকার করিতে লাগিল, কেহবা বেশ একটু সমঝদার, ওস্তাদের মতো সুর কাঁপাইয়া গিট্‌কিরি দিয়া গাহিতে লাগিল। তাহাদের কোলাহল থামিলে আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলাম।

অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম ঘুমের চেষ্টা বৃথা। মশারির ছাত হইতে গায়ের উপর কি পড়িতেছে। ছারপোকা! এই ঘৃণ্য জীবগুলোকে নিহত করিতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল।

এইবার কিছুক্ষণ শয়ন করিতেই চৌকিদারের বিকট চীৎকারে জাগিয়া উঠিলাম। হতাশ হইয়া জাগিয়া জাগিয়া ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত ডাক শুনিতে শুনিতে এ দিগে পূর্ব্বাকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

প্রভাতে উঠিয়াই বালিকা ভগ্নীকে ছারপোকা ধ্বংস কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম, নিজে মশার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত হইলাম। দ্বিপ্রহরে স্থির করিলাম, খিড়কির ঘাটে মাছ ধরিতে হইবে। কি মাছ ধরা যায়! রুই মাছ বা অন্য কোনো বড় মাছ ধরিতে অনেক আয়োজন করিতে হয়—ভাল ছিপ চাই, চার ফেলিতে হয়, ময়দার টোপ চাই। এত আয়োজন সত্বেও মাছ গুলো এতই অসভ্য, যে 'ভদ্রলোক ছিপটা ধরিয়া সারাদিন বসিয়া আছে, চট্ করিয়া টোপটা গিলিয়া ফেলা দরকার,' এ চিন্তা তাদের আদৌ নাই। তাই স্থির করা গেল, বেলে মাছ ধরা হইবে। বেলে মাছগুলো সব মাছের চেয়ে simple—বাঙ্গলা ভাষায় যাকে বলে মূর্খ। টোপ ফেলিতে না ফেলিতে তারা একেবারে গিলিয়া ফেলে ও বোধ হয় তৎক্ষণাৎ জলের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে। ছিপটা একটু টানিয়া দেখিতে হয়; ভারী ঠেকিলেই তুলিয়া দেখিবেন বেলে মাছ! এ মাছ ধরিতে চার ফেলিবার প্রয়োজন নাই, ময়দার টোপের প্রয়োজন নাই, চিংড়ি মাছের টোপ দিতে হয়; এবং চিংড়িগুলা গামোছা সাহায্যে পুষ্করিণীর সিঁড়ির ধার হইতে ধরিতে হয়। ছিপের দরকার নাই, খানিকটা সুতা হইলেই হইল। ফাৎনারও কিছুমাত্র দরকার নাই। উপদেশ—Moral: বিনা খরচায় ও

আয়োজনে যদি মাছ ধরিবার আনন্দ উপভোগ করিতে চান তো বেশ মাছ ধরুন।

বেলা প্রায় চারিটার সময় শুনিলাম সামনের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আহারে বসিয়া গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি ছিপ ফেলিয়া ছুটিলাম। কয়েকটা স্থান খালি ছিল, সেখানে আমরা তিন ভ্রাতা বসিলাম। যে কয়েকটা ব্যঞ্জন পরিবেশন হইয়া গিয়াছিল সে গুলো আমাদের পাতে একসঙ্গে দেওয়া হইল। তার মধ্যে ছিল শাকের ঘণ্ট। কিছুক্ষণ আহারের পর আমার মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্তের উপর দৃষ্টি পড়িল; দেখিলাম কি একটা কালো পদার্থ লাগিয়া আছে। প্রথম দর্শনে বোধ হইল, এক খণ্ড শাক, শাকের ঘণ্ট পরিবেশনের সময় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। স্থির করিলাম, আমার পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণদের অলক্ষ্যে ডান হাত দিয়া ওটি ফেলিয়া দিতে হইবে। যেমন চিন্তা—তেমন কাজ। বেশ নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ আহার করিলাম তারপর হঠাৎ ফিরিয়া দেখি শাকটি পূর্ব্বস্থানে লাগিয়া রহিয়াছে, পড়ে নাই। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, শাকটা ন্যাছোড়বান্দা, ছাড়ে না। মনে হইল এটা শাক না হইলেও হইতে পারে—কি ভয়ানক! তাই তো! এটা তো নিরীহ শাক নয়, এটা যে একটা ভীষণ রক্তপায়ী জীব—জোঁক! তখন ভায়া সেটাকে টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। হায় হায়! জোঁকটা নির্ব্বিবাদে আমার অনেকটা রক্ত পান করিয়াছে, শাকের ঘণ্ট খাইয়া সে ক্ষতি পূরণ করা অসম্ভব!

সে দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে নীচেকার ঘরের মশারিটা ফেলিলাম ও বিছানার উপর আলো লইয়া পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলাম। সন্ধ্যার পর অসংখ্য মশা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মশারির ভিতর দিব্য আরামে তাদের হাত এড়াইয়া আমি বসিয়া আছি দেখিয়া রাগে দুঃখে মশারির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তারা ক্রন্দন—বলা উচিত গর্জ্জন—করিতে লাগিল। সে ক্রন্দন শুনিয়া দুঃখের পরিবর্ত্তে আমার মনে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, যদি কোনোক্রমে মশারিতে একটা বৃহদাকার ছিদ্র হইয়া যায় তাহা হইলে আমার কি শোচনীয় অবস্থাই না হইবে! কিন্তু মশাগুলোকে জব্দ করিতে সমর্থ হইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দানুভবও করিতেছিলাম।

কয়েকদিনের পল্লীবাসের পর আমার আর বুঝিতে বাকি নাই যে এই মশাগুলোই যত নষ্টের মূল। এই মশা হইতেই ম্যালেরিয়া, এবং ম্যালেরিয়ার ভয়েই পল্লীবাসী সহরবাসী হইয়াছে। আবার পরিত্যক্ত পল্লীগুলিকে লোকপূর্ণ করিতে হইলে মশা তাড়াইতে হইবে; এবং মশা তাড়াইতে হইলে পুরাণো ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীগুলি ভূমিসাৎ করিতে হইবে, পুষ্করিণীগুলি ভরাট করিতে হইবে, কূপ বা কলের জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে; বাঁশবন, বেতবন, তেঁতুল গাছ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলিতে হইবে; এক কথায় পল্লীগুলিকে সহর করিয়া তুলিতে হইবে।

যাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একপ্রকার অসম্ভব!

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতির পূজা।*

মোহিনী শারদ-লক্ষ্মী মুক্ত সুষমায়
উদ্ভাসিয়া দশদিশি নিখিল ধরায়
পাতিয়াছে সিংহাসন, আকাশে বাতাসে
রবি-চন্দ্র-তারকায় তটিনী-উচ্ছ্বাসে
তরু-লতা-ফল-পুষ্পে বিহঙ্গ-সঙ্গীতে
অন্তরের অন্তঃপুরে চকিতে চকিতে
আনন্দ তরঙ্গ কিবা উঠিছে উথলি
শারদীয়া জননীরে লইতে কেবলি
বরিয়া অর্চ্চিয়া প্রাণে! আজি জগতের
যত দুঃখ-দৈন্য-ব্যথা গোপন মর্ম্মের
সব বুঝি শেষ হবে বিশ্ব-জননীর
অভয় আশীষ লভি!
নতকরি শির

* চট্টগ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

হে মোর স্বদেশ-বাসী, এস আজি তবে
পূজি পূর্ব্বে মাতৃ-সুতে ভুবন-গৌরবে
আহ্বানিয়া লই মায় ! ক্ষণেকের তরে
শান্ত হোক্ কোলাহল, ভক্তি-প্রীতি ভরে
উঠুক্ বিকশি হৃদি !

ছিল এ ভারত

ধর্ম্মে-কর্ম্মে একদিন জ্যোতিষ্কের মত
তমোময়ী বসুধায় করিয়া উজ্জ্বল
সবার আদর্শ সৃজি, পুণ্য-সুশীতল
শান্তি-প্রস্রবণ রচি ! তপোবনে আর
রাজাসনে পরস্পরে মিলি অনিবার
প্রফুল্ল নলিনী হেন চাহি ঊর্দ্ধমুখে
দুর্জ্জেয় সুধাংশু হতে তৃষ্ণাতুর বুকে
কি সুধা আহরি নিত, ঘরে ঘরে ঘরে
মাতৃজাতি দেবীরূপে সম্ভ্রমে আদরে
হইতেন সম্পূজিতা, মুমুক্ষু দম্পতি
করিতেন যুগপৎ আরাধ্যে আরতি
নদী আর সিন্ধু যথা মিলিয়া পুলকে
গাহে অনাদির গান ! ঝলকে ঝলকে
চৌদিকে অমৃত শুধু উঠিত উথলি
দেব-আশীর্ব্বাদ-পূত !

ধীরে গেল চলি

ভারতের স্বর্ণ যুগ ; তমঃ গাঢ়তর
ঘেরিল দিনান্তে আসি ; দাসত্ব-নিগড়
শৃঙ্খলিল নাগপাশে ; স্বার্থ-কীট হায়,
কাল-ভুজঙ্গিনী রূপে ভারত মাতায়
দংশিল কুলগ্নে কিবা ! আনন্দ-গৌরবে
সকলি সমাপ্ত হল—থামিল উৎসব
পিশাচের অট্টহাসে ! ধর্ম্মে পদে দলি
গর্জ্জে তুচ্ছ লোকাচার ! ক্রীড়ার পুতলি
জীবন-সঙ্গিনীগণ ! নন্দন শ্মশান
কার অভিশাপে যেন ! হায়, মহাপ্রাণ
নানক চৈতন্য আদি আহ্বানি সবায়
স্বর্গীয় বাঁশরী-সুরে বুঝিবা বৃথায়
ফিরে গেলা একে একে ! চৌদিকে কেবল
মহা সুপ্তি—মহা হাহাকার !

ভূমণ্ডল

পূর্ণ করি রশ্মিরাগে নব প্রভাতের
আগমনী-বার্ত্তা লয়ে প্রভা মহেশের
অকস্মাৎ দিল দেখা ! ঘুমন্ত কুলায়
বিহঙ্গ উঠিল গাহি, প্রসূন-মালায়
আবরিল অরণ্যানী, সুবাসিত বায়
ছুটিল বিশ্বের দ্বারে উন্মত্তের প্রায়
সঞ্জীবনী-সুধা লয়ে, শুনিল ভারত
অক্ষয় "মাভৈঃ"-গীতি,—অন্ধ গুহাগত
"একমেবা দ্বিতীয়ম্" বাণী রাজর্ষির
মহর্ষির অনুগামী !

লয়ে পুণ্য ঝারি

দূরতম তিব্বতের স্নেহশীলা নারী
দাঁড়াইল হৃদি-পথে, জীবন্ত দহন
প্রেম-প্রতিমার হায়, চকিতে বারণ
হয়ে গেল শুভক্ষণে ! চ্যুত সিংহাসনে
অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুনঃ !

ডমরুর সনে

ঝঙ্কারিল সপ্ত স্বরা—জ্ঞানের ভাষায়
প্রাণের কাহিনী জাগে !* সুদূর অতীত
বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে করিতে মণ্ডিত
জ্ঞানে ধর্ম্মে পুণ্যে কর্ম্মে শৌর্য্যে গরিমায়,
আকর্ষিলা রাজ-ঋষি ধ্যানযোগে হায়,
আপনা উৎসর্গ করি ! নব চেতনায়—
অমৃত-প্লাবনে নব সোণার ভারত
হাসিল ব্যাকুল হর্ষে, তৃণ পুঞ্জ মত
ভেসে গেল আবর্জ্জনা !

তরঙ্গ তাহার

সুদূর পাশ্চাত্য ভূমে দিতে উপহার

* পদ্য প্রাণের এবং গদ্য জ্ঞানের ভাষা। রামমোহন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া প্রবাদ আছে। সবিশেষ লেখকের "গদ্য ও পদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

নিরুপম আর্য্য-নীতি, আর্য্য-সুত সনে
ছুটিল বিজয়ী বেশে—পূরব গগনে
উদিয়া ভাস্কর যথা প্রতীচ্য অচল
ভাতিতে পুলকে ধায়!

'ব্রিষ্টল!' 'ব্রিষ্টল!' *

রাহু রূপে অকস্মাৎ গ্রাসিলে সে রবি
মিটাতে বুভুক্ষা তব মধ্যাহ্নের ছবি
আবরিলে সন্ধ্যা রাগে!

ভারতমাতার

অঞ্চলের স্নেহ-নিধি তুচ্ছ মৃত্তিকার
সমাধির কারাগারে চির তরে হায়,
ইচ্ছিলে রাখিতে বাঁধি'—ফুল্ল পূর্ণিমায়
অমার অশনি হানি!

বৃথা সে প্রয়াস,—

চেয়ে দেখ হে ভুবন! করগো বিশ্বাস,
তারি দীপ্ত শুভ্র শান্ত ময়ুখমালায়
ভারত ফেলেছে ছেয়ে! হিয়ায় হিয়ায়
প্রজ্বলিত হোমানল, কর্ম্মে সাধনায়
তড়িৎ-স্পন্দন খেলে, স্মৃতির পূজায়
জেগেছে ভারতবাসী এক মহাপ্রাণ—
একখানি জীবনের পূর্ণ আত্ম-দান
করিয়াছে কোটি প্রাণে চেতনা সঞ্চার
অভিনব অতুলন! যুগ-যুগ আরো
ধাইবে প্রবাহ এই হিমাদ্রি-চূড়ায়
ভারতের ভাবী-বংশ এক প্রাণতায়
উড়াতে বিজয়-কেতু!

স্বদেশী কবির

ভক্তির অঞ্জলি দেব! অর্চ্চনা স্মৃতির
করগো গ্রহণ আজি! সর্ব্ব ব্যবধান
ঘুচাইয়ে দাও দেখা, জুড়াও পরাণ
প্রাণভরা আলিঙ্গনে! সোদর নিকর
পুজুক তোমার সনে চিন্ময় ঈশ্বর!

* এখানে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজর্ষি রামমোহন লোকান্তর গমন করেন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নীলিমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

নীলিমা ভিতর বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া খোকার পায়ের মোজা বুনিতেছে, পাশে খোকা তাহার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা লইয়া খেলা করিতেছে। যত্নবিহীন অসংস্কৃত কেশরাশি নীলিমার সাড়ীর আবরণ ছাড়াইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ধূলায় লুটাইতেছে, অপরাহ্নের ম্লান আলো তাহার বিষণ্ণ মুখে একটী করুণ আভা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহার নত নেত্রের অচঞ্চল দৃষ্টি মোজা বোনার যথেষ্ট সাহায্য করিলেও মনটা যে মোজার ঘর ঠিক রাখিতেছিল না, তাহা মাঝে মাঝে তাহার মুখের ভাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল।

চিন্তিত মনে, ধীর পাদক্ষেপে করুণাময় তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, খোকা নীলিমার অঞ্চল ছাড়িয়া, একমুখ হাসিয়া, কচি হাত দুখানি পিতার দিকে বাড়াইয়া দিল; করুণাময় কিছু অন্যমনস্ক ভাবে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"নীলিমা! আজ তোমায় একটা কথা বল্‌ব বলে"—

নীলিমা মোজাটা কোলের উপর ফেলিয়া করুণাময়ের মুখে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল—"দাদা, বুঝেছি আমি, আপনি আজ আমায় কি কথা বলতে এসেছেন; আর এও বুঝ্‌তে পারছি যে কথাটা বলতে আপনার প্রাণে কতটা ব্যথা লাগছে। আমিও আজ কদিন থেকে আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করুচি কিন্তু আপনার দেখা পাই না বলে বল্‌তে পারি না, দিনরাতই বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকেন, বাড়ীর ভিতর ত বড় আসেনই না। সে যা হোক্, আমি দেখচি আমার এখানে থাকায় আপনাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্চে"—

করুণাময় তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, আমাদের কষ্ট কি, তোমাকেই বরং যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হচ্চে; নীলিমা, তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝতে পারচি না? আমি সব জানি, সব বুঝি কিন্তু"—

নীলিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সে কি দাদা, আপনি কি বলছেন, আমি আপনাদের স্নেহ জীবনে ভুলতে পারব না, আপনারা ভিন্ন এ জগতে আমার আর কে আছে? যে দুর্দ্দিনে মৃত্যুও আমায় আশ্রয় দেয় নি আপনি আমাকে সহোদরার অধিক স্নেহে গৃহে স্থান দিয়াছেন"—বলিতে বলিতে নীলিমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। করুণাময়েরও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

নীলিমা—পিতার স্নেহপুত্তলি, মাতার নয়নমণি, ভ্রাতৃজায়ার আদরের ননদিনী, ভ্রাতাদের একমাত্র ভগিনী, অতুল বিভব অসীম স্নেহের অধিকারিণী নীলিমা আজ বিশ্ববাসীর দ্বারে অসহায়া অনাথিনী অতিথি, আজ বিশ্ব-সন্তানের বিন্দুমাত্র স্নেহের ভিখারিণী, প্রাসাদসম ভবন-বাসিনী নীলিমা আজ সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য লালায়িতা! অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিদীর্ণপ্রায় বক্ষে নীলিমা ভাবিল, "হায়! ভগবান্! দুঃখিনী কন্যাকে এত কাঁদাইয়াও কি তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল না! অভাগিনীর সকলি ত শেষ হইয়াছে, শেষে তাহাকে আশ্রয়চ্যুতা করিয়া জগতের আরও কি মঙ্গল সাধিত হইবে পিতা?"

ক্রমে নীলিমার বিষণ্ণ অন্তরের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ সন্ধ্যার আঁধার দিনশেষের ম্লান আলোকটুকু ধীরে ধীরে ঢাকিয়া ফেলিল। নীলিমার সহিত কথবার্ত্তা ঠিক করিয়া করুণাময় একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ঠিক হইল, সুবিধা মত স্থানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া করুণাময় নীলিমাকে রাখিয়া আসিবেন। একজন পাচিকা, একটী বৃদ্ধাদাসী ও একজন দ্বারবান্ তাহার রন্ধন, গৃহকার্য্য ও গৃহরক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইবে, আর বৃদ্ধ ভৃত্য যোগা তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। নীলিমা নিজের টাকায় আপনার সমস্ত খরচ চালাইবে করুণাময়ের সহিত তাহার আর কোন সংস্রব থাকিবে না, তিনি কেবল সপ্তাহান্তে একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইয়া আসিবেন।

নীলিমা তাহার নিরানন্দ, সুজনহীন পিতৃভবনে আর যাইতে পারিবে না এবং গৃহের দ্রব্য সামগ্রীও দেখিতে পারিবে না বলিল। করুণাময় সে সকলের যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া নীলিমার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র সংসারের উপযোগী সকলই নূতন কিনিয়া দিলেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসীকে ভগিনীর সংসার সাজাইতে নিযুক্ত করিয়া, একদিন তাহাকে তাহার বিষয় আশয় টাকা কড়ি সমস্ত বুঝাইয়া দিতে আসিলেন।

নীলিমা মনকে বুঝাইল 'ঈশ্বর যখন আমার সকলি কাড়িয়া লইয়াছেন তখন ত আমায় একা থাকিতেই হইবে, নিজের সকল ভার নিজেকে বহন করিতে হইবে,' তবুও সহোদরপ্রতিম করুণাময়ের নিকট হইতে নিজের বিষয় আশয় বুঝিয়া লইতে, তাঁহার ছেলে মেয়েদের স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূরে যাইতে তাহার প্রাণে আবার নূতন বেদনা অনুভূত হইল। মনে পড়িল—রাক্ষসী প্লেগ তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার পিতৃভবন শ্মশান করিয়া শুধু এই নিদারুণ শোক বহন করিবার জন্যই মাত্র তাহার জীবনটী ফিরাইয়া দিয়াছে জানিয়া সে যখন গভীর শোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল, তখন বিশ্বের একটী প্রাণীও তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, একটী সান্ত্বনার কথাও তাহাকে কেহ শুনায় নাই, একখানি হাতও তাহার দুঃখ-দিনের অশ্রুমোচনে অগ্রসর হয় নাই; তাহার সুখের দিনের বন্ধুরা সকলেই তখন আপনাপন প্রাণ, পুত্র পরিজন লইয়াই ব্যস্ত,—প্লেগের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সকলে দেশ দেশান্তরে পলায়নপর, কেবল ডাক্তার করুণাময় মানুষের দেহে দেবতার প্রাণ লইয়া একা নীলিমার মাতা, পিতা ও ভ্রাতার স্থান পূর্ণ করিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিশাল বিশ্বের মাঝে একরাশি সম্পত্তির পাশে নবযুবতী নীলিমা যখন নিজকে নিতান্ত অসহায়া ভাবিয়া নানা বিপদাশঙ্কায় শিহরিয়া ছিল,—নীলিমার আজ আবার নূতন করিয়া মনে পড়িল—একা করুণাময় তাহাকে অভয় দিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ভয় কি নীলিমা! আমি আছি, আমি তোমায় দেখ্‌ব। তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুকালের অনুরোধ আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ষা করব। নীলিমা বোন্ আমার! আমিও যে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন! তোমার দুঃখ যে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌চ, তাই

জগতের সকলে যখন আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে আমায় পাগল বলে উপহাস করে চ'লে গিয়েছিল, আমি লোক নিন্দার ভয়ে, স্ত্রী পুত্রের মায়ায় বা নিজের প্রাণের ভয়ে তোমার রোগশয্যা ছেড়ে যেতে পারি নি।" সাশ্রুনয়নে সকৃতজ্ঞপ্রাণে নীলিমা আবার জগতপিতার নিকট করুণাময়ের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

বিদায় কালে নীলিমা ছেলে মেয়েদের কোলে করিয়া তাহাদের মুখচুম্বন করিল; করুণাময়কে প্রণাম করিতে গিয়া চোখের জলে তাঁহার চরণ সিক্ত করিল, চপলাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার দুটী হাত অশ্রুসিক্ত করিয়া করুণ-স্বরে বলিল, "বৌদিদি, কত উপদ্রব করেছি, কত কষ্ট দিয়েছি, ভাই! ছোট ননদ বলে সকল অপরাধ মার্জ্জনা কোরো, আর, একেবারে ভুলে থেকনা, মনে রেখো বৌদি', তোমরা ভিন্ন এজগতে আমার বলে পরিচয় দেবার আর আমার কেউ নাই।"

নীলিমাকে বলিবার মত কথা সহসা চপলার মুখে যোগাইল না চপলা কথায় বা আচরণে তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশে অসমর্থ বুঝিয়া ব্যথিত অন্তরে নীলিমা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। চলন্ত গাড়ীর অবিরাম শব্দে কেহ শুনিতে পাইল না; ক্ষুদ্র শিশুর মত দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া নীলিমা আকুল প্রাণে কাঁদিয়া ডাকিল, "মাগো কোথা আছ মা একবার এসে দেখা দাও!"

(৪)

নীলিমার বাড়ীটা ছিল ঠিক বড় রাস্তার কাছেই একটা খালি বাড়ীর সামনে আর দুতিন খানা গৃহস্থ বাড়ীর পাশেই। প্রথম প্রথম এই তিনটী গৃহস্থ বাড়ীর গৃহিণীরা নীলিমার খোঁজ খবর লইতেন না সুযোগমত দুপুর রোদে 'কেউ কোথাও নেই' দেখিয়া দুই চারিটী 'বৌ ঝি' দুই এক ঘন্টার জন্য আসিয়া, দুই চারিটী শেলাই বোনা শিখিয়া বা দুই এক পাতা ইংরাজী পড়িয়া, কখনও বা দু'দশটা সুখ দুঃখের কথা কহিয়া যাইত। নীলিমার একক জীবন কাটান এতই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল যে দ্বিপ্রহরের এই প্রার্থনীয় সময়টুকুর জন্য সে উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিত; দৈবাৎ যেদিন কেহই আসিত না, বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ অশ্রুর বোঝা বহন করিয়া পালঙ্কে গিয়া শয়ন করিত; কখন বা বিনা আহ্বানে নিজেই তাহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু শেষে 'যখন ব্রহ্মজ্ঞানীদের এই আইবুড়ো মেয়েটীর সঙ্গে এমনতর মেলা মেশা বৌঝির পক্ষে প্রশস্ত কিনা?' গৃহিণীদের মনে এই তর্ক উঠিল তখন পরস্পরের আসা-যাওয়া ক্রমেই কমিতে আরম্ভ হইল; অবশেষে কয়েক মাসের মধ্যেই নীলিমার বন্ধুদর্শন অমাবস্যায় চন্দ্র দর্শনের ন্যায় হইয়া উঠিল। ইহার পর নিজেই নীলিমা মান অভিমান ভুলিয়া তাহাদের নিকটে যাইতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহার এত বড় বাড়ীটায় একলা থাকা, এত বয়সে বিবাহ না করা, লইয়া নিত্য নূতন প্রশ্নাদি উঠিতে লাগিল, জাতবিচার না করায়, ছোট বড়র প্রভেদ না মানায়, তাহার সহিত ছুঁই ছুঁই লইয়া, আচার বিচারের বাড়াবাড়ি গঙ্গাজলের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল, নীলিমা তখন বিরক্ত হইয়া প্রতিবাসীদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল।

কখন কখন নীলিমার শৈশব সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, কিন্তু একলা কোথাও যাওয়ায় করুণাময়ের নিষেধ থাকায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া নীলিমার ঘটিয়া উঠিত না। নীরবে আপনার নির্জ্জন ঘরটীতে বসিয়া ইচ্ছামত দু'দশখানা বই আর কয়েকখানা ক্যাম্বিস্ কয়েকটা তুলি ও রং লইয়া যখন যাহা মনে হয় আঁকিয়া, যখন যাহা ভাল লাগে পড়িয়া, কোন এক রকমে সে দিনগুলা কাটাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না, প্রাণের হাহাকার থামিতে ছিল না, হৃদয়ের দৈন্য ঘুচিতেছিল না, সময়টা কাটাইবার মত, ঠিক মনের মত একটা কর্ম্ম জুটিতেছিল না, দুদণ্ড কথা কহিয়া বুকটা হালকা করিবার মত কোন বন্ধু মিলিতেছিল না। গৃহ তাহার কারাগার, জীবন তাহার মৃত্যুদণ্ড স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

রবিবারের ভোরে করুণাময় আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপাসনা মন্দিরে লইয়া যান, দুই এক ঘণ্টা তাহার সহিত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করেন, নানা উপদেশ দেন, কিন্তু সপ্তাহ শেষের সেই প্রার্থনীয় সময়টুকু কোথা

দিয়া কি করিয়া কাটিয়া যায় নীলিমা তাহা বুঝিতেই পারে না। সপ্তাহান্তে বন্ধুগণের সম্মিলনে, আচার্য্যের উপদেশে, করুণাময়ের সহিত আলাপে যে নূতন জ্ঞান সে লাভ করে, নূতন আনন্দ সে উপলব্ধি করে—ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দিন মনে মনে তাহারই আলোচনা করিবার পর আর যখন তাহার কোন কাজই থাকে না তখন তাহার প্রাণটা যেন পিঞ্জরের পাখীর মত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। তাহার দিন রাত্রির সঙ্গী বইগুলাকে তখন তিক্ত ঔষধের মত মনে হয়, রংয়ের বাক্স ও তুলি-গুলা চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে, বাহিরে রাস্তার কলরব অসহ-নীয় বোধ হয়, নীলিমা তখন ঘর হইতে বারান্দায়, উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে অনাবশ্যক হাঁটাহাঁটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠানে যুঁই ফুলের গাছটীর কাছে বসিয়া, গাছটা কেন শুকাইয়া আসিতেছে, ফুল আর তেমন হয় না কেন, জল বুঝি নিয়মিত দেওয়া হয় না, এই সব কথা তুলিয়া খানিকক্ষণ নিজেকে ভুলাইয়া রাখে। কোন দিন বা বামুন ঠাকরুণকে ডাকিয়া বলে—"দেখ রাধুর মা! আজ আর রাঁধতে হবে না, উনানটা নিবিয়ে দিয়ে, আমার কাছে ব'সে তোমাদের দেশের একটু গল্প কর শুনি।"

রাধুর মা যদি ইহাতে আপত্তি করে, রান্নাটা শেষ করিয়া আসিবার চেষ্টা পায়,—নীলিমা নিজের হাতে আগুনে জল ঢালিয়া রাধুর মাকে রান্না ঘরের বাহিরে আনিয়া বসাইয়া, তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়ে। বহুসন্তানের জননী বয়োবৃদ্ধা রাধুর মা এই মাতৃহীনার প্রাণের বেদনা বুঝিয়া সস্নেহে তাহার কপাল-টীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, চুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, তাহার দেশের গল্প, তাহার গত জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনাইতে থাকে। কতক বা নীলিমার কাণে যায় কতক যায় না; সে কেবল স্থিরভাবে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে। ভৃত্য যখন ঘরে আলো দিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "মা ল্যাম্প জেলে রেখে এসেছি, ঘরে বসেই পড়বেন, না বাইরে পড়বার জায়গা করে দেব?" তখন নীলিমার চমক ভাঙ্গে, কখন উঠিয়া যায়, কখন বা সেই ভাবেই থাকিয়া বলে—"না, আলো আলাবার দরকার নেই, নিবিয়ে দাও অন্ধকারই ভাল। বল রাধুর মা বল তোমার গল্প। ওরে ভুতো! যোগার জন্যে আজ খাবার এনে দিয়ে তাকে খেতে বলে বাড়ী যা, আর কোন কাজ নেই।"

রাধুর মা শশব্যস্ত হইয়া বলে—"না, না, শুধু যোগার জন্যে নয় মার জন্যেও আনিস্।"

তারপর রাত্রে তাহার গল্প শেষ করিয়া—"ছিঃ মা, রাত উপোসী কি থাকতে আছে, যা পার একটু খাও"—বলিয়া নীলিমাকে জোর করিয়া অল্প স্বল্প কিছু খাওয়াইয়া, সব ঘরে তালা দিয়া চাবির গোছাটা নীলিমার শয়ন ঘরের টিপাইয়ের উপর রাখিয়া বাড়ী যায়। নীলিমা দ্বারবন্ধ করিয়া শয়ন করে। যোগা নিজের খাটিয়া খানি সেই ঘরের সামনে টানিয়া আনিয়া শয্যা বিছাইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। ঘরের মধ্যে নীলিমা নিদ্রাহীন চক্ষে, বাহি-রের খোলা জানালার ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে, শেষে কখন যে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার মোহনস্পর্শে তাহাকে অভিভূত করিয়া যান তাহা সে বুঝিতেই পারে না।

এমনি ভাবে নীলিমার কত দিন কত রাত্রি কাটে। আবার যে দিন বড়ই অসহ্য বোধ হয়, যোগাকে ডাকিয়া পুরান দিনের কথা পাড়ে। একে একে বাবা, মা, দাদা, বৌদিদি, খোকা ও ভাই দুটীর কথা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গত জীবনের বিশ বৎসরের প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ঘটনা সমস্তই মনের ভিতর হইতে যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে; তখন কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে, শেষে যখন দিন শেষে সন্ধ্যা বা রাত্রি শেষে উষা দেখা দেয় দুজনেই চমকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, দুজনেই ভাবে—উঃ মানুষের প্রাণ কি কঠিন! কি না সহ্য হয়! (ক্রমশঃ)

প্রয়াগ প্রবাসিনী।

শুভা জীবকাম্বনিকা। *

ইনি জীবক নামক এক ব্যক্তির আম্রকাননে একদিন একজন ধূর্ত্তের হস্তে পড়িয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে জীবকাম্বনিকা নাম দেওয়া হইয়াছে।

একদা ভিক্ষুণী শুভা জীবকের রম্য আম্র বনে
বিচরিছে একাকিনী; ধূর্ত্ত এক আসি সেইক্ষণে
দাঁড়াল নিবারি পথ। কহিছে ভিক্ষুণী সেই জনে—
"কি করেছি অপরাধ? কেন কর পথ আবরণ?
প্রব্রজিতা নারী সহ কেবা করে হেন আচরণ?
সুগত নিদেশে যেবা গুরুশিক্ষা লভিয়াছে নারী—
কামশূন্যা পরিশুদ্ধা; কেন পথ রুধিছ তাহারি?
আবিল তোমার চিত্ত, পাপী তুমি; মুক্ত মম মন,
পাপভোগশূন্য আমি অনাবিল। কোরো না এমন।"

ধূর্ত্ত— নিষ্পাপ যুবতী তুমি; কেন তুমি প্রব্রজ্যা করিবে?
কষায় চীবর ত্যজ; রম্য বনে এস গো রমিবে।
কুসুমিত তরুগণ বিতরিছে সুরভি মধুর;
প্রথম বসন্ত ঋতু; সুখভোগ কর গো প্রচুর।
পুষ্পিত পাদপ শাখা হের কিবা মারুত কম্পিত,
একাকিনী এই বনে কিবা সুখ পাবে তব চিত?
বিচরিছে নানা মৃগ, মত্ত হস্তী করে বিচরণ,
একাকিনী কেন যাবে যথা বন দারুণ ভীষণ?
সূক্ষ্ম বারাণসী শাড়ী-স্বর্ণোজ্জ্বলা-পরিধান করি
চিত্ররথে অপ্সরার মত, ভ্রম তুমি কাননে সুন্দরি!
আমি তব অনুগত, র'ব সাথে সাথে এ কাননে;
তোমার মতন প্রিয় কেহ নাহি কিন্নর-লোচনে!
যদি মোর কথা রাখ, চল সুখে রবে মোর ঘরে,
প্রাসাদে করিবে বাস, দাসীগণ রবে সেবা তরে।
পর সূক্ষ্ম বারাণসী সাড়ী, পর মাল্য, মুখে অঙ্গরাগ;
মণিমুক্তা কাঞ্চনেতে বিভূষিব করি অনুরাগ।
ধৌত আস্তরণে ঢাকা, পালক ও তুলায় রচিত,
মহার্ঘচন্দনগন্ধি শয্যা তব করিব সজ্জিত।
প্রফুল্ল উৎপল যাহা নরলোকে কেহ নাহি পায়,
তেমনি ও অঙ্গখানি ব্রহ্মচর্য্যে কেন গো শুকায়?

শুভা—কেন এত অনুরাগ? শবপুরী এ মোর শরীর;
শ্মশানবর্দ্ধন এই ক্ষয়শীল কলেবর স্থির।
হেরি তাহা কেন হও এত তুমি বিমনা অধীর?

ধূর্ত্ত— হরিণীর মত কিংবা পার্ব্বতী কিন্নরী সম আঁখি;
হেরি ও নয়ন দুটি প্রেমতৃষ্ণা বাড়ে জান না কি?
স্বর্ণবর্ণ সুবিমল ঐ তব মুখ-পদ্ম-পরে
হেরিয়া নয়ন দুটি, লালায়িত চিত্ত তৃষাভরে।
দূরে গেলে রবে মনে আয়ত ভ্রূযুগ মনোহর;
কিন্নর-নয়নে! তব আঁখি হতে কিবা প্রিয়তর?

শুভা—অপথে চলিতে চাও? চাঁদ চাও খেলনার তরে?
লঙ্ঘিতে চাহিছ মেরু? বুদ্ধ-সুতা চাহ নিতে ঘরে?
ভোগতৃষ্ণা নাই মোর, এ লোকে বা স্বরগের পথে;
নাহি চিনি ভোগ; সে যে নিহত সমূলে ধর্ম্মব্রতে।
প্রতপ্ত অঙ্গার সম, বিষপাত্র সম তেজিয়াছি—
সমূলে নিহত ভোগ; আমি তারে কভু নাহি যাচি।
গুরু যার শিষ্য মাত্র, পায় নাই সত্য যার চিত,
তাহাকে দেখাও লোভ; মোর কাছে তুমি পরাজিত।
অকুণ্ঠিত চিত্ত মোর, নাহি মজি সুখে, দুঃখে, রাগে;
জনম অশুভ জানি কিছুতেই মন নাহি লাগে।
বুদ্ধের শ্রাবিকা আমি, অষ্টাঙ্গিক পথে মোর গতি;
দুঃখ-পাপ-শূন্য আমি, অনাগার-সুখে মম রতি।
দেখেছি ত সুচিত্রিত কাঠের পুতুল নানা সাজে
সুতা ও কাঁটায় বাঁধা; কেমন বিবিধ ভঙ্গে নাচে।
খুলে নিলে কাঁটা, সুতা খণ্ডে খণ্ডে পড়ে ত খসিয়া;
কোন্ খণ্ড পানে তার চাহে লোক মন নিবেশিয়া?
তেমনি নরের তনু ধর্ম্ম বিনা হয়রে বিকল;
ধর্ম্মশূন্য দেহে বল কিবা থাকে? সকলি নিষ্ফল।
হরিতাল রঙ্গে যথা দেওয়ালেতে চিত্র আঁকা থাকে;
ভ্রান্তমনে মানবের প্রজ্ঞা তথা সত্য মনে লাগে।
মায়াবশে স্বপ্নে যেন স্বর্ণতরু দেখিবারে পাও;
আরোপিত রূপ হেরি ওহে অন্ধ! কেন বৃথা ধাও?
কিবা আঁখি? কোটরেতে গুলি দুটি জলের বুদ্বুদ—
অক্ষিপিণ্ড সম তাহে হয় কত পিঁচুটি উদ্ভূত।
উপাড়িয়া চারু চক্ষু পাপশূন্য মানসে সে নারী
কহিল—লহ এ চক্ষু, হে পুরুষ! আদর যাহারি।

* সুদীর্ঘ মূল পালি দেওয়া হইল না। ভাঃ মঃ সঃ।

তৃষা নাশ হল তার ; কহিল সে—"কভু শুদ্ধতমা
ব্রহ্মচারিণীকে হেন অপমান আর করিব না ;
ফিরে পাও দৃষ্টি তব ; ক্ষম মোর অপরাধ ক্ষমা।
ক্ষতি করি তোমাসম জনে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিলাভ, ওরে
আলিঙ্গিনু আশীবিষ ; লভ দৃষ্টি, ক্ষমা কর মোরে।"
মুক্তি লভি সে ভিক্ষুণী বুদ্ধপদে করিল গমন ;
বরপূর্ণ মুখ হেরি তাঁর, লভে চক্ষু পূর্ব্বের মতন।
(শেষ শ্লোকটি সঙ্গীতকারকের যোজনা।)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

মানবের জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে, মিলনের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই যেন আর কাহারও সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আকুল হইয়া আছে। আত্মার মধ্যে এইরূপ মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই মানুষ একাকী বাস করিতে পারে নাই ; সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের আশ্চর্য্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ; এবং শক্তিশালী ও স্বাধীনচিত্ত মানুষ সম্পূর্ণ রূপে সমাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। মানুষের পক্ষে এইরূপ অধীনতাও অতিশয় বিস্ময়কর। সমাজ অন্যায় রূপে শাসন পীড়ন করিতেছে ; সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে ; তবুও মানুষ সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দূরে গিয়া বাস করিতে পারে না। দূরে গিয়া বাস করিতে হইলেই সঙ্গীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। তাহা ত্যাগ করিলে মানুষ একাকী কয় দিন সুখে বাস করিতে পারে ?

অনেকে হয় ত বলিবেন, মানুষের মনে যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, তন্মধ্যে স্বার্থের ভাব নিহিত রহিয়াছে। মানুষ সেই স্বার্থের খাতিরে এবং আত্মরক্ষার জন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্বার্থ ও আত্মরক্ষার ভাব যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থবিহীন অনেক দেবভাব বিদ্যমান। মানুষ ত মানুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া শুধুই স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইতে চাহে না ; মানুষ যে মানুষকে ভালবাসিতে ও আত্মদান করিতে চায় ; এবং মানুষের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং মানুষ যে অন্তরের সুপবিত্র, সুকুমার ও সুমহৎ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া অন্য মানুষের সহিত মিলিত হইতে চায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা ইতর প্রাণীর মধ্যে—শুধু ইতর প্রাণী বলি কেন ? প্রকৃতিরাজ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঐ উদ্যানের পুষ্পিত বৃক্ষটীর পানে একবার চাহিয়া দেখ ; উহার বৃন্তস্থিত একটি পুষ্প আর একটি পুষ্পের সঙ্গে—পুষ্পের একটি দল আর একটি দলের সঙ্গে যেন মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। বৃন্তের একটী ফুলের নিকট হইতে অন্য ফুলটি তুলিয়া লও, পুষ্পের একটি দলের নিকট হইতে অন্য একটি দল ছিন্ন করিয়া ফেল ; দেখিবে উহা কেমন শ্রীহীন হইয়া পড়িবে। কবির ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, একটি ফুল আর একটি ফুলের বিরহে, একটি পাপড়ি আর একটি পাপড়ির বিরহেই যেন সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়ে।

একটি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কবির ভাবের ভাবুক হও এবং একটি সুন্দর তরু ও তাহার নিকটস্থ রমণীয় লতাটির দিকে ফিরিয়া চাও ; তাহা হইলে মধুর ভাবে অন্তর পূর্ণ হইবে। মনে হইবে, ঐ বৃক্ষটি লতার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সবুজ পত্রে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; এবং লতাটি ললিত লাবণ্যে মনোহর হইয়া মিলনের জন্যই ধীরে ধীরে তরুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কবির সহানুভূতি ও অনুভব শক্তির সাহায্যে উহাদের মনের কথা জানিতে পারিলে বলা যাইত, বৃক্ষ লতাকে বলিতেছে, আমি তোমারই জন্য অন্তরে ভালবাসা লইয়া দাঁড়াইয়া আছি ; এবং লজ্জাবনতা লতা বলিতে চাহিতেছে, আমি মিলনের আশায় আকুল হইয়া তোমারই দিকে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা নির্ঝরিণীর বিরহ ও উদাস সঙ্গীতের কথা প্রাচীন এবং আধুনিক কাব্যে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু উহা কি শুধুই কবির কল্পিত কাহিনী ? নির্ঝরিণী কি যথার্থ ই সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল নহে ? আমি

বহুবার পাহাড়ে গমন করিয়া নির্ঝরের গতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি! সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কি প্রয়াস! কি প্রবল চেষ্টা!

এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে অতি বাল্য-কাল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ছোট ছেলেটি তাহার জননীর বক্ষ ও হৃদয়ের সহিত নিরন্তর যুক্ত হইয়া থাকিতে চায়। আমি এক এক বার এক একটি ছোট ছেলের এই রকম মিলনের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। একটি ছেলের মা সন্তানটিকে ঘুম পাড়াইয়া পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন। ছেলেটি জাগিয়া উঠিতেই বাড়ীর অন্য মেয়েরা তাহাকে কোলে লইতে গেল। কিন্তু সে ছেলে "মা কোথায়? আমি মায়ের কাছে যাইব" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেয়েরা এ কথা সে কথা বলিয়া এবং কথার চেয়েও উপাদেয় কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া ফেলিল। এই সময় তাহার মা আসিয়া গৃহের এক পাশে দাঁড়াইলেন। মাতাকে দেখিয়াই ছেলের সুন্দর মুখখানি আলোকে পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "ঐ আমার মা আসিয়াছে; মা, আমায় কোলে নেও" বলিয়া দুখানি হাত বাড়াইয়া দিল। জননী স্নেহমাধুর্য্যে ও মধুর হাসিতে মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। সন্তান দুখানি সুকুমার হস্তে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা বহু দিন আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকিবে। সংসারের এই সকল দৃশ্য কত সময়ই আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে এই সকল সুন্দর দৃশ্যের বিষয় চিন্তা করিলে মানব প্রকৃতির অনেক রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে।

নরনারীর শৈশব অবস্থায় জনক জননীর স্নেহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিবার জন্য এই রকম ত ব্যাকুলতা! কিন্তু আবার যৌবনকালে যখন পরিণয় হইবে, হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে মিল-নের কি বিচিত্র ভাবই দেখিতে পাওয়া যাইবে!

কিন্তু ইহাতেও নরনারীর মিলনের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। নরনারীর হৃদয়ের প্রেম অনন্ত। এই প্রেম অসীম সুন্দর পুরুষকেই পাইতে চায়; এই প্রেম পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য্যে এবং কোন সামগ্রীতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এই জন্যই মানবাত্মার স্বাভাবিক গতি অনন্তের দিকে। অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্যই মানুষের চিত্ত ব্যাকুল। মানুষের নিভৃত মর্ম্মস্থান হইতে থাকিয়া থাকিয়া এই ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে—

———— "পরাণ শান্তি না মানে
ছুটে যেতে চায় অনন্তের পানে!"

কিন্তু বহির্মুখীন-চিত্ত মানুষ আপনার অন্তরের এই কাতরধ্বনি আপনিই শুনিতে পায় না। শুনিলেও নিজের হৃদয়ের ভাষা নিজের নিকটই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। তাই মানুষ আপনার সম্বন্ধে আপনি ভ্রান্তিতে পতিত হয়। এই ভ্রান্তিবশতঃ কত মানুষ অনন্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়; পৃথিবীর রূপেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্পৃহা চরিতার্থ করিতে চায় এবং ক্ষুদ্র প্রেমের পাত্রের নিকটই অসীম প্রেমের জন্য দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে। কিন্তু সে দাবি-দাওয়া সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণ মিলন" শীর্ষক কবিতাটির মধ্যে লিখিয়াছেনঃ—

"নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
*　　*　　*
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ!
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন-শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!
একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!"

মানুষের অনন্তমিলনের অথবা পূর্ণমিলনের রহস্য-কথা এই কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর ভিন্ন আত্মার পূর্ণমিলন আর কাহার সঙ্গে সম্ভব? ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত দার্শনিক ভিক্টর কুঁজ্যা বলিয়াছেনঃ—

"যতক্ষণ না আমরা অসীমের অমৃত উৎসে উপনীত হই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। আমরা

অসীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু একজন মাত্র আছেন যিনি এইরূপ ভালবাসার যোগ্যপাত্র—যাঁহাকে ভালবাসিলে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে হয় না, আশা-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয় না। তিনি সেই পূর্ণ পুরুষ। * * একমাত্র তিনিই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত স্থান পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ।" *

সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকের প্রত্যেকটি কথা সত্য। তিনি নরনারীর মর্ম্মকথা অবগত হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত স্থান ঈশ্বরই পূর্ণ করিতে পারেন, আমাদের অন্তরের প্রেমের স্পৃহা তিনিই চরিতার্থ করেন, এই জন্য আমরা তাঁহার সঙ্গেই মিলনের জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু শুধু যে আমরাই তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা নহে; প্রেমময় ঈশ্বর স্বয়ংই মানব হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে চাহেন; নরনারীর অন্তরের প্রেম তাঁহারও স্পৃহণীয় সামগ্রী। তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং পূর্ণপুরুষ হইয়াও ত শুধুই আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ণজ্ঞান অথচ তাঁহার জ্ঞানের বস্তর আবশ্যক হইল, নতুবা তিনি জানিবেন কি? তিনি বিষয়ী, তাঁহার বিষয়ের প্রয়োজন হইল। বিষয় ভিন্ন কে বিষয়ীর ধারণা করিতে পারে? তিনি অসীম সুন্দর, সেই জন্য সৌন্দর্য্যগ্রাহী মানুষের আবশ্যক হইল; নচেৎ কে তাঁহার অনুপম রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? তিনি পূর্ণপ্রেম, তাই তাঁহার প্রেমের পাত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেমিক মানুষ যদি আকুল চিত্তে তাঁহার প্রেম না চাহিত, তবে কিরূপে অসীম প্রেম চরিতার্থ হইত? প্রেমের পাত্র ভিন্ন প্রেমের সার্থকতা কি? এজন্য প্রেমিক ও ভক্ত বলেন, প্রেম হইতেই সৃষ্টি; প্রেমময় ঈশ্বর আপনার প্রেম চরিতার্থ করিবার জন্যই মানুষকে কিয়ৎপরিমাণে নিজের অনুরূপ করিয়া রচনা করিয়াছেন।

তিনি জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা সম্পন্ন পুরুষ; আর আমরাও জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষ। তবে তিনি পূর্ণ, আমরা অপূর্ণ; তিনি অসীম, আমরা সীমাবদ্ধ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান, আমরা ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন।

সেই পূর্ণপুরুষ প্রেমময় ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহেন এবং মানুষের তুচ্ছ প্রেমও তাঁহার স্পৃহণীয় সামগ্রী;—এ সকল কথা অনেকের নিকট ভাব-প্রবণ লোকের প্রলাপ উক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়। এ সকল কথা সাধকদিগের সাধনলব্ধ সত্য। এই নবযুগের শ্রেষ্ঠ সাধক এবং জ্ঞানী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"তিনি আমাদের প্রীতি করিতেছেন এবং আমাদের প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমাদের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন।"

"একের প্রীতিতে প্রীতিভাব সম্পূর্ণ হয় না; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে।"

"তিনি আর সমুদয় জীবকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রীতি চাহেন না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতেছেন যে পুনর্ব্বার সে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। * * তিনি মনুষ্যের নিকট প্রীতি চাহেন, এই জন্য তাহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।"

ঈশ্বর যে আমাদের নিকট প্রীতি চাহেন এবং প্রেমে আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন; এ কথা তাঁহার সৌন্দর্য্যময় স্বরূপ আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি। ধর্ম্মরসজ্ঞ দার্শনিকেরা বলিয়াছেন ঈশ্বরই সৌন্দর্য্যময় পুরুষ। সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজ্যা বলেন—

"ঈশ্বরই পরম সুন্দর; কেন না আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিকে—জ্ঞান, কল্পনা ও হৃদয়কে তিনি ভিন্ন আর কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তিনিই আমাদের উচ্চতম ধারণা—যাহার পর আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই। তিনিই আমাদের কল্পনার আত্মহারা ধ্যান, তিনিই

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদিত "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের হৃদয়ের পরম প্রেমাস্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে সুন্দর।"

ঈশ্বরই পূর্ণরূপে সুন্দর এবং তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যই বিশ্বের নানা রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং আমাদের মন মুগ্ধ ও প্রেম উচ্ছ্বসিত করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সঙ্ঘটিত করিতে চাহিতেছে।

আমরা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ের সৌন্দর্য্যস্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হই। সৌন্দর্য্যের জন্য মানুষ একেবারে উন্মাদ! দুটি চক্ষু জগতের রূপের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া শুধুই বিশ্বের মাধুরী সম্ভোগ করিতে চাহে। সৌন্দর্য্যের জন্য কেন এ আকুলতা? স্বয়ং ঈশ্বর জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া তাঁহারই অসীম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতেছেন—তাই না সৌন্দর্য্যের জন্য এত আকুলতা? তবে ত তাঁহার সৌন্দর্য্য এবং জগতের সৌন্দর্য্য আলোচনা করিয়াই বুঝিতেছি তিনিও আমাদের সঙ্গে প্রেমে মিলিত হইতে চাহেন। নচেৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করিবে কেন?

ঈশ্বর প্রেমে আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে চাহেন এবং সৌন্দর্য্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতেছেন;—বুঝিবা সেই জন্যই আমাদের অন্তরে মিলনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা; আমরা এই জগতের কোন বস্তুতে পূর্ণতৃপ্তি লাভ না করিয়া অতৃপ্ত অন্তরে অনন্তের-দিকে যাইবার জন্যই আকুল হইয়া উঠিতেছি। ভক্ত এবং কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে এস।" এই জন্য আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা একজন কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির-বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাঁশীর শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসার অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। * * অন্য যাহারই সহিত মিলিত হই না কেন সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।"

মানুষের মনোরাজ্যের গূঢ় কথা কবি কেমন মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন! আমরা যদি এই সকল কথা সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারি এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হই, তাহা হইলেই আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে এবং মানব জন্ম সার্থক হইয়া যায়। কিন্তু কেন এই সকল কথা সত্য বলিয়া অনুভব করি না, কেন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনায় নিযুক্ত হইতে পারি না—কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে?

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

আহারের মাত্রা নিরূপণ।

খাদ্যের মাত্রার তারতম্য।

খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ অতি দুরূহ ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ভেদে খাদ্য দ্রব্যাদির পরিমাণের তারতম্য হইতে দেখা যায় যথা—

১। দেশ ভেদে—শীত প্রধান দেশে শরীর তাপ উৎপাদনকারী খাদ্য দ্রব্য বেশী খাইতে পারা যায়। ল্যাপল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ড দেশের অধিবাসিগণ তিমি মৎস্যের তৈল খাইয়া থাকে।

২। ঋতু ভেদে—পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ শীতকালে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় আমরা স্নেহজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট আহার করিয়া থাকি।

৩। পরিশ্রম ভেদে—যাহারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে শালিজাতীয় খাদ্য খাইতে হয়। আমাদের দেশের মুটেমজুর ও কৃষকেরা অধিক পরিমাণে ভাত খাইয়া থাকে।

৪। স্ত্রী পুরুষ ভেদে—স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা কিছু কম খাইয়া থাকে। কিন্তু বেশী পরিশ্রম করিলে, স্ত্রীলোক পুরুষের সমান বা বেশীও খাইতে পারে।

৫। বয়স ভেদে—নিতান্ত শৈশবাবস্থায় এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর দুগ্ধই একমাত্র আহার। আট বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধই প্রধান আহার ও তাহার সহিত শালিজাতীয় খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশু ও যুবার আহারের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ শিশু ও যুবার শরীরের দৈনিক বৃদ্ধি আছে, কিন্তু ৩০ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শরীর আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সকল বয়সেই (বিশেষতঃ প্রৌঢ়াবস্থায়) অধিক ভোজন প্রভূত অনিষ্টের কারণ।

সাধারণতঃ সকলে সমান খায় না; কেহ অল্প খাইয়া বেশ সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম থাকেন, কেহ বা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকেন। ইহা কেবল অভ্যাসের ফল মাত্র।

আহারের মাত্রা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

সাধারণতঃ লোকের—বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের বিশ্বাস যে, যত বেশী খাইবে ততই হৃষ্টপুষ্ট হইবে ও শরীর নীরোগ থাকিবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

আজকাল কোন কোন উচ্চ উপাধিধারী ডাক্তারদের মত যে, যত আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বেশী খাইবে ততই শরীরের গঠন ও পুষ্টি সুসম্পাদিত হইবে। এজন্য আমাদের বাঙ্গালী ছাত্রেরা মাংস খাইতে পায় না বলিয়া দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। যদি এই জাতিকে উন্নত করিতে চাও তবে ছাত্র ও যুবকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস খাইতে দাও। ইহাই ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়।

খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ করিবার উপায়।

খাদ্যের মাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহার মোটেই মতৈক্য নাই। এমন কি, কি উপায় অবলম্বন করিলে আহারের মাত্রা নিরূপণ করা যাইতে পারে সে বিষয়েই বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে।

প্রথম উপায়।

পৃথিবীর কোন্ জাতি কোন্ দ্রব্য কি কি পরিমাণে আহার করে এবং তাহারা কিরূপ কার্য্যক্ষম ও তাহাদের শরীরের গঠন ও বল কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে আমাদের কি পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উপরি উক্ত উপায়ে খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপণ করিলে আমরা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইব। কারণ, আমাদের শরীরের বল ও বৃদ্ধি কেবলমাত্র খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। কাবুলীর ন্যায় আহার করিলেই যে বাঙ্গালীর শরীরের গঠন ও বল কাবুলীর ন্যায় হইবে এইরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। দেশভেদে, জাতিভেদে ও ব্যায়ামের অনুপাতে শরীরের গঠন ও বল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগও কখনও কখনও দেশবাসীর শারীরিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইতে পারে।

দ্বিতীয় উপায়।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ করিবার আরও একটী উপায় আছে। আমাদের শরীর নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; এই ক্ষয় পূরণের জন্যই খাদ্যের আবশ্যক। ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিলে খাদ্যেরও পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারিবে। দেহক্ষয়-জনিত পদার্থ সমূহ মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রশ্বাস, বায়ু, মল ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন দেহক্ষয় জনিত পদার্থ সমূহের প্রধান উপাদান। মূত্রাদি পরীক্ষা করিলে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনের পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারে। এ স্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে শরীরক্ষয়-জনিত নাইট্রোজেন ব্যতীত খাদ্য হইতে উদ্বৃত্ত নাইট্রোজেনও প্রস্রাব ও মলের সহিত নির্গত হয়। এই নাইট্রোজেন পৃথক ভাবে নির্ণীত করা যাইতে পারে।

দেহ ক্ষয় হইয়া শরীর হইতে যে নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া যায় আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। শরীরে কার্য্য করিবার ক্ষমতা শালি-জাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভূত। এজন্য বুঝা যাইতেছে যে কেবলমাত্র আমিষ-জাতীয় খাদ্যে শরীর উপযুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। শরীরের নাইট্রোজেন সংযুক্ত উপাদানে ক্ষয় পূরণ করিতে যতটুকু আমিষ-জাতীয়

খাদ্যের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক আহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

ক্ষয় জনিত নাইট্রোজেন নিরূপণ করিয়া যেরূপ আমিষ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীর হইতে নির্গত কার্ব্বন, জলীয় বাষ্প, শরীর হইতে উদ্ভূত উত্তাপ নিরূপণ করিয়া শালি-জাতীয় ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন কার্য্যের পরিমাণ করিলেও কতটা স্নেহ ও শালি জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক তাহার একটা হিসাব হইতে পারে।

খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্ব্বপণ্ডিতগণের মত।

Leibig প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বপ্রধান; ইহা হইতেই আমাদের শরীরের সমস্ত শক্তি উৎপন্ন হয়; অতএব খাদ্যে আমিষ-জাতীয় দ্রব্যেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। আজ-কাল কোন পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নহেন। এখনকার মত এই যে, শালিজাতীয় খাদ্য হইতে শরীরের কার্য্যকরী শক্তি উৎপন্ন হয়—আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে নহে।

Carl Voit বলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য আহার করিয়া থাকেন। উত্তম খাদ্যের প্রভাবেই তাঁহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হইতে উন্নত এবং ইহাই তাঁহাদের জীবনে সাফল্য লাভের হেতু।

Voitএর মতে পরিমিত পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণ আহার্য্য গ্রহণ করা উচিত।

[illegible]	...	...	দুই পোয়া।
ডিম	...	...	দুইটী।
মাখন	...	...	এক ছটাক।
[illegible]	...	...	আড়াই পোয়া।
আলু	...	...	দেড় পোয়া।
[illegible]	...	...	এক পোয়া।
চিনি	...	...	অর্দ্ধ ছটাক।

সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই Voit এর যুক্তির অসারতা উপলব্ধি হইবে। তিনি বলেন যে উত্তম খাদ্যই উন্নতি লাভের কারণ; কিন্তু লোকে অবস্থাপন্ন হইলেই মাংস প্রভৃতি মূল্যবান আহার্য্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব খাদ্যই উন্নতির কারণ কিংবা উন্নতিই উত্তম খাদ্য ব্যবহারের হেতু, নির্ণীত হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

আমেরিকার Yale Universityর অধ্যাপক Chittenden সাহেব খাদ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করেন। তিনি কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র, মল্ল ও সৈনিক প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য দিয়া বহুকাল অবধি পরীক্ষা করেন।

Chittenden এই সকল ব্যক্তির আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেন। ইহারা সকলেই Voit নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আমিষ ব্যবহার করিত; Chittenden পূর্ব্বের পরিমাণ কমাইয়া ৩ ভাগের ১ ভাগ করেন। বহুদিন যাবৎ এই সকল ব্যক্তি পরীক্ষাধীন ছিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ইহারা সকলেই শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বল বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছিল; সৈনিকগণের ওজনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

Folin সাহেব মূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা শরীরের কতটা নাইট্রোজেন ক্ষয় হয় তাহা নিরূপণ করিয়া খাদ্যে কতটা আমিষ থাকা উচিত ঠিক করিয়াছেন। Folin ও Chittenden এর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রায় সমান।

বিখ্যাত জাপানী অধ্যাপক Kintaro Oshima পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সহিত Chittenden এর মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

জাপানীরা যে পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করে তাহা Voit নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অল্প, অথচ এইরূপ খাদ্য ব্যবহার করা সত্ত্বেও জাপানীদিগের শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অবনতি লক্ষিত হয় না। "ভেতো" জাপানীদের বলবীর্য্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীরতত্ত্ববিদ্যার অধ্যা-

পক ম্যাকে সাহেব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি বহুসংখ্যক কলেজের ছাত্র ও চাকর প্রভৃতির রক্ত, প্রস্রাব, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও বল ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালীর শারীরিক পুষ্টি ইউরোপিয়ান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তিনি বলেন যে ইউরেসিয়ান ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করে। ইউরোপিয়ান কুলি মজুর অপেক্ষা বাঙ্গালী কুলি মজুরের কার্য্য করিবার শক্তি অনেক কম। ম্যাকে সাহেব বাঙ্গালীর খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান Chittenden নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রায় অনুরূপ।

ম্যাকে সাহেব Chittenden এর মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে বাঙ্গালীর অল্প আমিষ আহারই শারীরিক অবনতির একমাত্র কারণ।

ম্যাকে সাহেবের যুক্তি ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে। বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতির অনেক কারণ আছে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ায় প্রায় সকল বাঙ্গালীকেই অল্প বিস্তর দুর্ব্বল করিয়াছে। বাঙ্গালী নিজের শারীরিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে মোটেই যত্নশীল নহে। বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা ইউরেসিয়ান ছাত্র ব্যায়ামে অধিক সময় ক্ষেপণ করে। দরিদ্রতার জন্য অধিকাংশ বাঙ্গালীই পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। কেবল আমিষ-জাতীয় কেন, বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যও পায় না। ইউরেসিয়ান ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করে, বাঙ্গালী ছাত্রের বায়ু চলাচল বিহীন অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় মেসের অবস্থা অবর্ণনীয়; এ উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। মোট কথা, ম্যাকে সাহেবের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া Chittenden এর মত ভ্রান্ত বলা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ লক্ষিত হয়, শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে সেরূপ মতভেদ নাই।

উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার মতের আলোচনা করিয়া আমরা একজন সহজ পরিশ্রমী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কি পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

চাউল	...	...	এক পোয়া।
ডাল	...	...	এক ছটাক।
মাছ	...	...	এক ছটাক।
তরকারি (আলু, পটোল শাক ইত্যাদি)			এক পোয়া।
দুগ্ধ	...	...	দুই পোয়া।
ঘি	...	...	অর্দ্ধ ছটাক।
মিষ্টান্ন	...	...	এক ছটাক।

উপরোক্ত তালিকার এক পোয়া চাউলের পরিবর্ত্তে দুই ছটাক চাউল ও দুই ছটাক ময়দা কিম্বা আটা ধরা যাইতে পারে। মাছের পরিবর্ত্তে মাংস খাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা মাছ কিম্বা দুগ্ধ খাইতে পান না তাঁহাদের ডাল ও ভাত আরও অধিক পরিমাণ খাওয়া উচিত।

একেবারে নিক্তির ওজনে উপরিউক্ত তালিকা মত খাইতে হইবে একথা আমরা বলি না। শিশু, বালক ও বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক। অধিক পরিশ্রম করিলে শালি জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকগণের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও রুচি মত আহারের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। আহার সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাবাধি নিয়ম সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না।

ছানা, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি খাদ্য আমিষ জাতীয়। ময়দা, আটা, চাল প্রভৃতি দ্রব্যেও কিয়ৎপরিমাণ আমিষ উপাদান আছে। কি প্রকার আমিষ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত আমরা সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব। (স্বাস্থ্য-সমাচার)।

জেনারেল নোগী।

পোর্ট আর্থার বিজয়ী মহাবীর জেনারেল কাউণ্ট নোগী আত্মহত্যা করিয়াছেন। একদিন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ

ভীষ্মদেব সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার জীবন রক্ষা করিবার জন্য, ভ্রাতৃদ্রোহে শান্তি-সংস্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় স্বেচ্ছায় আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন। স্বদেশের মঙ্গল কামনায়—রাজার মঙ্গল কামনায় সেই অনন্যসাধারণ বীর-পুরুষ যন্ত্রণার আধার শরশয্যা গ্রহণ করতঃ জগতে রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য জাপানে আজ সেই প্রাচীন আদর্শ দেখিয়া জগৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়াছে।

প্রাচ্য জগতে রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা। প্রাচ্য গ্রন্থে ঃ—

"রাজা সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ রাজা কুলবতাংকুলম্।
রাজা মাতাপিতাচৈব রাজা হিতকরোনৃণাম॥

....
....

"দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে।"

রামায়ণ।

জাপানেও ভারতীয় আদর্শে রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে পূজিত। জাপানের নরদেব সম্রাট্ মৎসুহিতো ইহলোক পরিত্যাগ করাতে জাপান বিষাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন আপন পরমায়ু দান করিয়া 'মহতী দেবতা' রাজার জীবন রক্ষার্থ এক জাপানী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ভার্য্যার বিরহে কাতর রুরু আপন অর্দ্ধেক পরমায়ু দিয়া বিগতপ্রাণা পত্নীকে বাঁচাইয়াছিলেন; রুরু প্রেমিক—তাঁহার স্বার্থ ক্ষুদ্র। কিন্তু হায়, রাজভক্ত জাপানী আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও সম্রাটের জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না! এ রাজভক্তি, এ আত্মত্যাগ জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। এ চিত্র স্বর্গীয়। রাজভক্ত ভারতবাসীর নিকটেও এ দৃশ্য মহিমাময়। যে দেশের প্রজা রাজার প্রতি এমন অকপট ভক্তি পোষণ করিতে পারে, সে দেশ ধন্য! সে দেশ ভগবানের করুণা লাভে বঞ্চিত হয় না।

অল্পদিন হইল জাপানসম্রাট্ মৎসুহিতোর দেহ সমাহিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ জাপানে সমাগত হইয়া মৃত সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। জাপানীগণ মনে করেন, মৃতদেহ সমাধিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতের আত্মা সেই শবের নিকটেই অবস্থান করে। সমাধি হইলেই আত্মার সদগতি হয়। মহাবীর, রাজভক্ত কাউণ্ট নোগী পরলোকেও রাজানুচরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিলেন। যে দেবতার চরণতলে জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছে, পরলোকেও তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে কি সুখ!

তাঁহার বিপুল সম্পত্তির কতক অংশ পত্নীর নামে উইল করিয়া অবশিষ্ট সমুদয়ই দেশের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এমন কি, তাঁহার কেশ ও নখ ব্যতীত আর কিছুই সমাহিত হইবে না। তাঁহার দেহ যাহাতে ছাত্রদের কাজে লাগে এজন্য তাহা মেডিকেল কলেজে প্রদানের আদেশও তিনিই করিয়াছেন। তখন কেহ তাঁহার সঙ্কল্প অনুমানও করিতে পারে নাই।

সমাধির দিবস প্রাতঃকালে সস্ত্রীক নোগী সম্রাটের মৃতদেহ দর্শন করিয়া আসিলেন। ক্রমে সমাধির সময় নিকটবর্ত্তী হইল। মৃতদেহ লইয়া অনুগামীগণ বাহির হইল—চারিদিকে সে বার্ত্তা প্রচারের জন্য ভীমনাদী কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাজ্যের যত প্রধান অপ্রধান সেই শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন—কেবল মাত্র মহাবীর নোগী আজ নিশ্চিন্তমনে গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন।

শবাধার সমাধিস্থানে স্থাপন করা হইল, আবার দশদিক প্রকম্পিত করিয়া কামান গর্জ্জন করিল—নোগী বুঝিলেন তাঁহার বাসনাপূরণের আর বিলম্ব নাই। তিনি হাসিমুখে পত্নীকে বলিলেন, "মহতী দেবতা মিকাডোর আত্মা আজ স্বর্গে প্রস্থান করিবে, আমি তাঁহার অনুচর, নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বসিয়া রহিব? আমি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া পারিতেছি না। আমি চলিলাম।" সেই মুহূর্ত্তে পুনরায় কামানের ধ্বনি শোনা গেল—এখনই সমাধি হইবে। অকুতোভয়ে নোগী আপন তরবারি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া আপন কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন! বীর—বীরের ন্যায় আত্মত্যাগ করিলেন। রাজভক্ত—রাজার চরণ তলে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।

নোগীর পত্নী মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন কর্ত্তব্য স্থির

করিলেন। তিনি সাধ্বী—পতি বিরহে, এ জগতে তাঁহার থাকিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই—তিনি পতির তরবারি গ্রহণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আপন পাকস্থলী ছিন্ন করতঃ স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রাণ দম্পতি-মনের আনন্দে সম্রাটের সঙ্গে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন। এ দৃশ্য কি ভীষণ! কি সুন্দর! রাজভক্তির কি অতুলনীয় উদাহরণ! পতিভক্তির কি অসামান্য দৃষ্টান্ত! যে দেশে এমন রাজভক্তের জন্ম হয়, সে দেশে জগতে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

রুষ জাপানের লোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধে জেনারেল নোগী অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী এই যুদ্ধের আরম্ভ, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৩টা ৪৭ মিনিটের সময় উভয় পক্ষীয় প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র অনুসারে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। জেনারেল নোগী স্থলপথে পোর্ট আর্থার অবরুদ্ধ করেন। তখন রুষ সৈন্যের সহিত নোগীর সৈন্যগণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় রহিবে। রুষ সেনাপতি ষ্টোসেল বিপুল বিক্রমে পোর্ট আর্থার রক্ষা করেন। নোগী এক এক দিন ভীষণ বেগে পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিতেন, সহস্র সহস্র জাপানী ও রুষীয় সৈন্যের মৃতদেহে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। বহু যুদ্ধের পর আর আত্মরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সেনাপতি ষ্টোসেল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পোর্ট আর্থার জেনারেল নোগীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। নোগীর জয়ধ্বনিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল।

পোর্ট আর্থারের সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া জেনারেল নোগী সসৈন্যে মুকডেনে উপনীত হইলেন। এই বিরাট কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষে ৯ লক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, এবং উভয়পক্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। এরূপ যুদ্ধ জগতের ইতিহাসে বিরল।

রুষ জাপান যুদ্ধে জেনারেল নোগী আপন যুবক পুত্র-দ্বয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। শোকের আঘাতেও তিনি আপন কর্ত্তব্য পথ হইতে এক বিন্দু বিচলিত হইলেন না। পুত্রশোকে যাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হয় নাই, রাজার শোক তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। জেনারেল নোগীর আত্মবিসর্জ্জনের পর জাপানে আত্মহত্যার খুবই ধুম লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তাহা এখন প্রশমিত হইয়াছে। রাজার প্রতি এইরূপ অমানুষী ভক্তিই যে জাপানের উন্নতির এক প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা।

পিতামাতার নিকট সন্তান কত স্নেহের ও যত্নের ধন! সন্তানের উন্নত জীবন দেখিলে পিতামাতার পার্থিব সুখের আর সীমা থাকে না। স্নেহের ধন সন্তানই তাহাদের শান্তির আলয়। সৎ পুত্রই স্বর্গের ছবি! এ হেন সুখের অধিকারী হইবার ইচ্ছা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এ সুখ সম্ভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? আমাদের দেশে এ সুখ অতি বিরল। ইহার কারণ কি তাহা আমরা অনেকেই রীতিমত আলোচনা করিয়া দেখি না।

যে সকল রমণী নিরক্ষরা, যাহাদের গায় সুশিক্ষার বাতাস লাগে নাই, বোধোদয় বোধগম্য না হইতেই সন্তানের জননী সাজিয়াছেন, যাহারা নিজ চরিত্র গঠন করিতেই অক্ষমা, তাহাদের নিকট সন্তানের সুশিক্ষা পাওয়ার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের দেশে শিক্ষিতা রমণী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাইয়া লোকসমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছেন তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে নিরক্ষরা এবং তাহাদের হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে পূর্ণ দেখা যায়।

পুরুষের ন্যায় রমণীগণ বিদ্যা এবং সন্নীতি সমূহে ভূষিত না হইলে সুসন্তান লাভ করা অসম্ভব। কেন না, সন্তান পিতামাতা উভয়েরই দোষগুণের অধিকারী। এক দিকে সুশিক্ষিত পিতার জ্ঞানালোক যেমন সন্তানে প্রতিবিম্বিত হয় অপর দিকে আবার মাতার কুসংস্কারা-

জন্ম হৃদয়ের অংশ প্রাপ্ত হইয়া সদ্ভাব বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তান পিতামাতার দোষের ভাগ যত পায় গুণের ভাগ তত পায় না। পণ্ডিতপিতার মূর্খ সন্তান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্খ পিতার জ্ঞানবান সন্তান দুর্লভ। বিশেষতঃ শিশুরা পিতা অপেক্ষা মাতার দোষগুণই অধিক লাভ করিয়া থাকে, কারণ, শৈশবে সন্তানের লালন পালনের ভার মাতার উপরই ন্যস্ত থাকে, সেই সময়ে জননীর হৃদয়ের উচ্চতাই তাহাদের ভাবী জীবনে প্রধান অবলম্বন। তখন জননীর দোষ গুণের আদর্শেই শিশুজীবন গঠিত হইয়া থাকে।

অশিক্ষিতা জননীরা সন্তানের সম্মুখে কত রূপ মিথ্যাচরণ ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া নিজেদের উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় দিয়া সন্তানকে কত কুশিক্ষা দান করিয়া থাকেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না। শিশুরা বাল্যকালে যেরূপ শিক্ষা লাভ করে তেমন আর সমগ্র জীবনেও হয় না। শিক্ষিতা জননী এই সময়ই স্বীয় সন্তানের জীবন উজ্জ্বলতাময় করিতে যত্নবতী হন। শৈশবে শিশুদের হৃদয়ে যে সৎ শিক্ষার বীজ বপন করা যায় তাহাই ভাবী জীবনপথে কার্য্যকারী হইয়া থাকে এবং সেই বীজই অঙ্কুরিত হইয়া সময়ে ডাল পালা বিস্তার পূর্ব্বক পিতা মাতার প্রাণে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া থাকে।

আমরা যেসকল যশস্বী লোকের পুরাবৃত্ত পাঠে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকি তাঁহারা সকলেই জননীর গুণে ভূষিত ছিলেন। আজকাল প্রকৃত শিক্ষিতা জননী বিরল বলিয়াই বাঙ্গালী জাতি দিন দিন মনুষ্যত্ব-হীন হইয়া পড়িতেছে। রমণীগণ সুশিক্ষিতা না হইলে সমাজের দুর্গতি দূর হইবে না, সুতরাং 'সুসন্তান লাভ করার জন্য রমণীসমাজের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন।' সুখের বিষয়, আজকাল অনেকেই স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের জন্য মেয়েদের স্কুল কলেজে শিক্ষাদান করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন স্থলে তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিতেছে। আধুনিক মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে বঙ্গনারী-চরিত্রের সদগুণ রাশি বিসর্জ্জন দিতেছে। যে শিক্ষায় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত না হয় তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। দয়া, মায়া, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি নারী প্রকৃতির সদ্‌গুণরাশি বিসর্জ্জন দিয়া শুধু বিদ্যা লাভ করিলেই সুশিক্ষিতা হয় না। এ সংসারে চরিত্রের ন্যায় মূল্যবান সামগ্রী আর নাই। চরিত্রবলে যেমন মানুষ অন্যের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া সুখী হইতে পারে, ধন বা বিদ্যাবলে তেমন হয় না। পূর্ব্বকালে অধিকাংশ রমণী লেখা পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র-প্রভাবে বিমুগ্ধ হইতে হইত। বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাদের জননীরা লেখা পড়া জানিতেন না, তবু কেমন চরিত্রশীলা ছিলেন! তাঁহারা নিজগুণে সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়া এমনই চরিত্রবান করিয়াছিলেন যে সন্তানের যশঃ সৌরভে জননীরাও চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। "শিক্ষা" শব্দে কেবল লেখা পড়া জানা নহে, আর বিদ্যালয়ও শুধু শিক্ষার স্থান নয়। গৃহই আমাদের প্রকৃত শিক্ষার স্থল, সৎ ও সাধু পরিবারের আদর্শে চরিত্র গঠিত হইয়া পরে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিলেই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হইবার আশা করা যায়। স্ত্রীশিক্ষায় যত্নশীলা মহোদয়াদের নিকট বিনীত প্রার্থনা, যে তাঁহারা মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ পরিবারের দোষ সংস্কার করিয়া সৎদৃষ্টান্তে কোমলতাময় নারীচরিত্র গঠনে যত্নবতী হউন। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, বঙ্গের ঘরে ঘরে রমণীগণ সুশিক্ষিতা হইয়া সুসন্তান লাভে সক্ষমা হউন।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

গৃহহারা।

(ওগো) দুঃখী আমায় বলেছে সবায়,
কত আঁখি জল ফেলেছে।
দুঃখ যে মোর সুখের ফোয়ারা,
জগতে কি কেউ জেনেছে?

অঙ্গে আমার দেখে'নি ইহারা
শীতের বাস,
'হায় হায়' বলি ফেলেছে তখনি
দীরঘ শ্বাস!
হয়ত অন্ন জোটেনি কখন,
হয়ত পাইনি ঘর,
হয়ত তখনি বলেছে ইহারা
দুঃখী কেবা এর'পর ?
এরা তো জানে না অঙ্গে আমার
কোন ক্লেশ নাহি লাগে.
অন্তর মোর কি আনন্দে ভোর
মগ্ন কার অনুরাগে ?

শ্রীকুসুমকুমারী দাস।

দূরবীক্ষণ।

হলণ্ড রাজ্যে হান্স লিপারসিম নামে একজন চস্‌মা ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন লিপারসিম্ কোথায় গিয়াছিলেন, তখন সুযোগ পাইয়া তাঁহার পুত্র দুইখানি কাচ লইয়া খেলা করিতেছিলেন। তিনি একবার কাচ দুইখানির ভিতর দিয়া সম্মুখস্থ এক গির্জ্জার চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, গির্জ্জার চূড়ায় স্থাপিত কুক্কুটের প্রতিকৃতিটী অপেক্ষাকৃত বড় এবং উহা বিপরীত অর্থাৎ উপরিভাগ নীচের দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পুত্র এই ব্যাপারে অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে এই কথা জানাইলেন। পিতাও এইরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্র অনেক চিন্তা করিয়া সেই কাচ দুইখানি একটী কাষ্ঠফলকে এরূপ কৌশলে সংযুক্ত করিলেন যে ইহাদিগকে ইচ্ছানুসারে নিকটস্থ ও দূরস্থ করা যায়। ইহাই দূরবীক্ষণের সূত্রপাত!

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটী চোঙ্গা বা নল আছে। ঐ চোঙের দুইদিকে দুইখানি কাচ আটা থাকে। উহাদিগকে ইচ্ছামত পরস্পরের নিকটে ও দূরে নিবার ব্যবস্থা আছে। একদিকের কাচটী বেশ বড়; উহাকে বস্তুর কাচ (Object Glass) কহে। যে বস্তু দেখিতে হইবে সেই বস্তুর ছবি উহাতে পড়া চাই। ছোট কাচটীকে চোখের কাচ (Eye Piece) বলে। উহার ভিতর দিয়া দেখিতে হয়।

যে দুই রকম কাচের কথা বলিলাম, সাধারণ কাচ দিয়া উহাদের কাজ চলে না। কাচকে পালিশ করিয়া খুব মসৃণ করিতে হয়, তারপর বিশেষ ভাবে গড়িয়া লইলে তবে দূরবীক্ষণে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

কাচের গড়নের উপর দূরবীক্ষণের গুণ নির্ভর করে। কোন্ কাচ কতখানি পুরু বা পাত্‌লা হইবে তাহা ঠিক্ করিতে অতিশয় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পূর্ব্বে বস্তুর কাচের স্থানে একরকম আরসী ব্যবহৃত হইত। কাচের ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। যে সময়ে হলণ্ডের চসমা বিক্রেতার পুত্র কাষ্ঠ ফলকে কাচ লাগাইয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন সেই সময়ে ইটালির বিখ্যাত পণ্ডিত গ্যালিলিও জীবিত ছিলেন। তিনি এই বিষয় অবগত হইয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে এক কাষ্ঠময় নলের দুইদিকে কাচ বসাইয়া একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে প্রথম দূরবীক্ষণ।

গ্যালিলিওই সকলের আগে দূরবীক্ষণ দিয়া আকাশের জ্যোতিষ্ক সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন।

গ্যালিলিও যখন তাঁহার দূরবীক্ষণ সাহায্যে 'চন্দ্রের পাহাড়,' 'সূর্য্যের গায় কালদাগ', 'বৃহস্পতির চারটী চন্দ্র' ও আর আর আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সকলের নিকট বলিলেন, তখন কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না; বরং সকলেই তাঁহাকে পাগল মনে করিল। এই সকল অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া গ্যালিলিওকে অতিশয় নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

দূরবীক্ষণের ইতিহাসে গ্যালিলিওর পরই হর্শেলের নাম উল্লেখযোগ্য। হর্শেলের জন্মস্থান জর্ম্মনিদেশে। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন, কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি জর্ম্মনি দেশ হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইলেন। হর্শেল ইংলণ্ডে আসিয়া গানবাজনার ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ঐ ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ পয়সা হইতেছিল। কিন্তু ভগবান সেই সময় তাঁহার সম্মুখে উন্নতির এক নূতন পথ খুলিয়া দিলেন।

হর্শেল দুরবীক্ষণ দিয়া আকাশের জ্যোতিষ্ক দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে যে দুরবীক্ষণটী ছিল সেইটী অতি নিকৃষ্ট রকমের; উহাদ্বারা হর্শেলের কৌতুহল নিবৃত্ত হইত না; তিনি একটী ভাল দুরবীক্ষণ পাইবার জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইলেন। হর্শেল ভাল একটী দুরবীক্ষণ কিনিতে গিয়া দেখিলেন মূল্য এত অধিক যে, দাম দিয়া কিনা তাঁহার অসাধ্য। তখন নিজেই দুরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

হর্শেল সংকল্প করিয়া একেবারে কাজে লাগিয়া গেলেন। দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করা যে খুব কঠিন কাজ তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি পরিশ্রম ও অভ্যাসের দরকার। হর্শেল দমিলেন না। তিনি গানবাজনার ব্যবসায় করিয়া যে অবসর পাইতেন তাহা দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণে ব্যয় করিতেন। স্নান আহারের কথা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহার স্মরণ থাকিত না। তাঁহার ভগিনী 'কেরোলিন' ক্ষুধার সময় ভ্রাতার মুখে আহার তুলিয়া দিতেন এবং আরব্য উপন্তাস পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহার পরিশ্রমের ক্লেশ দুর করিতেন।

হর্শেল বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম করিয়া একটী উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার দুরবীক্ষণ খুব পছন্দ করিলেন। তখন হর্শেল গানবাজনার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ঐ কার্য্যে অতিশয় দক্ষতা লাভ করিলেন। হর্শেল কেবল দুরবীক্ষণই নির্ম্মাণ করিতেন তাহা নহে। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক নুতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। পরিশেষে হর্শেল ইয়ুরেনাস নামক গ্রহ আবিষ্কার করিয়া জগতে অমর হইয়াছেন।

হর্শেল বহু দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে যন্ত্রটী খুব বড় উহার ব্যাস ৪ ফিট্ ছিল; সেই দুরবীক্ষণের দ্বারা আকাশের গ্রহনক্ষত্রকে ৮০০০০০০০ আশী কোটি মাইল নিকটবর্ত্তী দেখা যাইত। হর্শেল একবার আমোদ করিবার জন্ত তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া দুরবীক্ষণের চোঙের ভিতর বসিয়া আহার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের তুলনায় হর্শেলের দুরবীক্ষণও অতি সাধারণ। আমেরিকার হেমিল্‌টন পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত লিক্ মানমন্দিরে একটী খুব উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ আছে, উহার নলটী ৩৮ হাত লম্বা আর সম্মুখের বড় কাচ (Object glass) খানির ব্যাস দুই হাত। প্রায় ২৫ হাত উঁচু একটী স্তম্ভের উপর দুরবীক্ষণটী স্থাপিত।

লিক্ মানমন্দিরের দুরবীক্ষণটীতে মোট সওয়া ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কেবল বড় কাচ খানির জন্য একলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা লাগিয়াছে। 'জেম্‌স্ লিক্' নামক এক ব্যক্তির অর্থে এই মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার নাম অনুসারেই মানমন্দিরের নাম হইয়াছে। লিক্ লেখাপড়া জানিতেন না, ব্যবসায় করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মরিবার সময় তিনি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী মানমন্দির নির্ম্মাণের জন্য দিয়া যান। উইলের একটী সর্ত্ত ছিল যে তাঁহার টাকা দিয়া পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটী দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণের পর আরও বড় দুইটী দুরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ড নিবাসী লর্ড রস্ (Lord Ross)
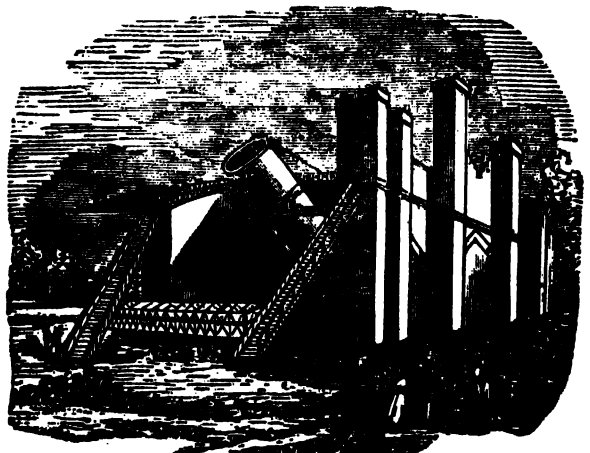
লর্ড রসের দুরবীক্ষণ।

যে দুরবীক্ষণটী প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাই বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত দুরবীক্ষণ। উহার দৈর্ঘ্য ৩৬ হাত এবং চোঙ্গের ব্যাস প্রায় চার হাত। এই দুরবীক্ষণটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রসের দুরবীক্ষণ দিয়া অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের অনেক স্থানে এই বিখ্যাত দুরবীক্ষণের উল্লেখ করিয়াছি। পারিস নগরীর প্রদর্শনীতে যে দুরবীক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল উহা রসের দুরবীক্ষণ হইতেও বৃহৎ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার।

প্রাচীন মিশরের কথা।

বিলাত যাইবার পথে সুয়েজের খাল পার হইয়া, ভূমধ্যসাগরের উপর, সৈয়দ নামে একটি বন্দর আছে। ইংরাজীতে উহাকে বলে পোর্ট সেদ (Port Said)। বন্দরটি বেশ বড়। নানা জাতীয় বাষ্পীয়পোত সেখানে সকল সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এদিক ওদিক যাওয়া আসা করিতেছে। এই বন্দরটি ইজিপ্ট্ দেশে; য়ুরোপের ডাক এখানে বাছা হয়। প্রত্যেক দেশের আপন আপন জাহাজ প্রস্তুত রহিয়াছে—ডাক পাইয়াই সকলে প্রস্থান করিতেছে। বন্দরটির বাহিরে যত জাঁকজমক সহরের ভিতরটিতে তেমন নহে। সহরের ভিতরটি নিতান্ত অপরিষ্কার। এখান হইতে ট্রেণে করিয়া ইজিপ্টের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; কায়রো ইজিপ্টের রাজধানী। এই কায়রোর নিকটে বিখ্যাত মরুভূমি, ইহারই নিকটে প্রাচীন কালের কত চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে।

ইজিপ্ট্ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। দেশটি খুব প্রাচীন। প্রায় সাত আট, এমন কি দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশে লোক বাস করিত।

আফ্রিকার উত্তরদিকে একটী প্রকাণ্ড নদী আছে। ইহার নাম নীল নদ। নীল উত্তর দিকে বহিয়া আসিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। ইহার দুইদিকে বিশাল বালি-সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি; মাঝে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জমির ফালি—প্রস্থে কোথাও সাত কিংবা আট ক্রোশের অধিক নহে। এই অপ্রশস্ত প্রদেশ দিয়া নীল নদ বহিয়া গিয়াছে। এই সরু, সমতল দেশকেই প্রাচীন কালে মিশর বলিত। আজকালকার ইজিপ্ট্ হইতে প্রাচীন মিশরের পার্থক্য অনেক।

নীল নদের উপর মিশরবাসীর সমস্ত সুখসম্পদ নির্ভর করিত। এই নীল মিশরের কল্যাণ বহন করিয়া আনিত। মিশরবাসীদের প্রধান ব্যবসায় কৃষি; সেই জন্য প্রাচীন কালে মিশরকে সকলে বলিত, "পূর্ব্বদেশের গোলাঘর।" এই শস্যশ্যামলা উর্ব্বর দেশে অভাব ছিল না কিছুরই—ইহার এত যে ঐশ্বর্য্য, এত যে সম্পদ—সমস্ত নীল নদের কৃপায় পাওয়া। সেই জন্য মিশরকে অনেকে বলিত—"নীল নদের দান।"

মিশরবাসীরা নীলকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত; আমরা যেমন গঙ্গাকে পূজা করি, অর্ঘ্য লইয়া নদীকে নিবেদন করি, মিশরের লোকেরা নীলকে ঠিক তেমনি ভাবে দেখিত ও তাহার অর্চ্চনা করিত। নীল নদকে তাহারা বলিত 'হাপি'। অনেক মন্ত্র তাহার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল।

মিশরবাসীরা প্রাচীন জাতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ছিল বলিয়া কথিত আছে। তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সকল লোকের বুঝিবার ক্ষমতা এক প্রকারের নয় বলিয়া ধর্ম্মের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়াছিল; একটি জ্ঞানীদের, একটি সাধারণ লোকদের। জ্ঞানী লোকেরা বলিতেন, "ঈশ্বরকে প্রস্তরে খোদাই করা যায় না। তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহার গৃহ কোথায় জানা যায় না। কোনো গৃহে তাঁহাকে কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।" আর এক এক স্থানে তাঁহারা বলিয়াছেন, "তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তাঁহার কোনো পিতামাতা নাই।"

সাধারণ লোকেরা অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করিত। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর প্রাধান্য ছিল।

একই দেবদেবী কোথাও বা পূজিত হইতেন, কোথাও বা ঘৃণিত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অসিরিস্ ও ঈসিস্। তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে।

একদা দেবতারা স্বর্গে রাজত্ব করিতে করিতে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বর্গ ছাড়িয়া তাঁহারা মিশরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দেবতাদের চতুর্থ রাজার নাম অসিরিস্। অসিরিস্ খুব ভাল দেবরাজ ছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যা লোকেরা শিক্ষা করিয়াছিল। দেবরাজের ভাই সেট্ ভ্রাতার বিরুদ্ধে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া বড় ভাইকে তিনি হত্যা করিলেন এবং মৃতদেহ এক সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রীর নাম ঈসিস্—তিনি এক হিসাবে যেমন স্ত্রী আর এক হিসাবে অসিরিসের ভগ্নীও বটে। ঈসিস্ তাঁহার ছোট বোন্ নেফ্থিস্‌কে লইয়া মৃত স্বামীর খোঁজে বাহির হইলেন। বহুকাল মৃত স্বামীর দেহ পাইবার জন্য এদেশ হইতে সে দেশে সে দেশ হইতে আর এক দেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক দিন পরে এক স্থানে সেই সিন্দুক পাইলেন। সৎকারের জন্য ঈসিস্ সেইটিকে রাজধানীতে আনিতেছিলেন। পথে দুষ্ট সেট্ সেই সিন্দুক চুরি করিয়া মৃতদেহকে চৌদ্দ টুক্‌রা করিয়া দেশময় ছড়াইয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য ঈসিস্! তার অদৃষ্টে কত না দুঃখই আছে! বেচারা ভেলায় করিয়া মিশরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত জায়গা খুঁজিল। চৌদ্দ জায়গায় ছড়ানো খণ্ডগুলি একত্র করিয়া মৃতদেহের সৎকার করা হইল; অশ্রুজলে ভাসিয়া রাণী তাঁহার পুত্রকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে বলিলেন।

দেবরাজের পুত্র হোরাস্ যুবা পুরুষ—তাঁহার যেমন অসীম সাহস তেমনি অজেয় বল! যুবক রাজকুমার তখনি তাঁর খুড়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। কিন্তু সেট্‌কে অধিক নির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা ঈসিসের ছিল না; হাজার হোক্ সম্পর্কে ভাই ত! তাই তিনি সেট্‌কে মুক্তি দিলেন। ঈসিসের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া হোরাস্ অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, সে কি ভীষণ রাগ! তিনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতারই শিরশ্ছেদন করিলেন। দেবতারা ত এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি করিয়া ঈসিসের ছিন্ন মুণ্ডের পরিবর্ত্তে গরুর এক মুণ্ড যোড়া দিয়া দিলেন। অপর দিকে ক্রুদ্ধ হোরাস্ তাঁর খুড়াকে বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকেও মারিয়া ফেলিলেন। মিশরের ইহা একটি প্রাচীন গল্প। ইহা কতকটা আমাদের দেশের লখিন্দর ও বেহুলার গল্পের মতন।

ঈসিসের মত আরও অনেক দেবদেবী ছিলেন—যাঁদের মুণ্ড নানাবিধ পশুপক্ষীর মত। ইহা ছাড়া মিশরবাসীরা আরও অনেকগুলি পশুপক্ষীর পূজা করিত। গরু, ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, কুমীর, জলহস্তী, বিড়াল, ইন্দুর, বানর, ভেক, শকুনি, কুকুর, গুবরেপোকা প্রভৃতি নানা ইতর প্রাণী ছিল তাহাদের পূজ্য! এই সকল প্রাণীকে তাহারা দেবতার মত ভক্তি করিত। একবার একজন রোমান সৈন্য অসাবধানতা বশতঃ একটি বিড়ালকে মারিয়া ফেলে। তাহার এই গুরুতর অপরাধের জন্য নগরের সকল লোক মিলিত হইয়া সেই হতবুদ্ধিপ্রায় লোককে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

মিশরের প্রাচীন রাজধানী মেম্‌ফিস্ নগরে এক দেশপূজ্য ষাঁড় ছিল। সেই ষাঁড়ের জন্য প্রকাণ্ড এক মন্দির ছিল মন্দিরে সর্ব্বদা পুরোহিত ও লোকজন উপস্থিত থাকিত; বিছানা পত্র, সুখাদ্য আহার্য্যে সেই মন্দির পরিপূর্ণ থাকিত। প্রতি বৎসরে একদিন করিয়া এই বৃষকে গহনা পরাইয়া সাজাইয়া নগরে বাহির করা হইত। রাস্তায় হাজার হাজার লোক এই বৃষের দর্শন পাইয়া ও একবার মাত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিত। এই বৃষের নাম ছিল "আপিস"। ইহা গেল মিশরের মোটামুটি বাহিরের ধর্ম্ম।

এই সকল ধর্ম্মক্রিয়া করাইবার জন্য মিশরে এক দল পৃথক্ লোকই ছিলেন, তাঁহারা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মত। মিশরে বারমাসে তের পার্ব্বন

হইত, এমন ক্রিয়াকলাপ, বাহাড়ম্বর খুব কম জাতির মধ্যে দেখা যাইত।

মমি।

মিশরবাসীদের আর একটী বড়ই অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাঁহারা ভাবিত যে, মানুষ মরিয়া আবার বাঁচিবে। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তাহারা মৃতদেহ পোড়াইত না বা কবর দিয়া তাহার সৎকার করিত না। খুব প্রাচীন কালে মিশরে মড়া 'পুষিয়া' রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। সে আজ ছয় সাত হাজার বছরের কথা। যখন মিশরের লোকেরা ধাতুর কাজ করিতে শেখে নাই, পাথর কুঁদিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিত; মাটীর ভাণ্ড, মাটির কলসী, যখন তাহাদের চরম বিলাস ছিল সেই প্রাচীন কালে মিশরে মড়া মানুষকে যত্ন করিয়া রাখা হইত। নানারকমের ঔষধপত্র দিয়া, কাপড় জড়াইয়া, কাঠের বাক্সের ভিতর পুরিয়া মৃতদেহ রাখা হইত। ইহাকে বলে 'মমি'। এই সকল মৃতদেহ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই। পাঁচ সাত হাজার বছরের মমি এখনো ঠিক রহিয়াছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে তাহাদের নাক, মুখ, চোখ, এমন কি গায়ের চামড়া, মাথার চুল, পায়ের নখগুলি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি রহিয়াছে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে লোকে মমির নাম শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন কেহ উহা চোখে দেখে নাই। মাত্র বত্রিশ বছর হইল মমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের গল্পটি বড়ই কৌতুকপ্রদ।

'মমি' করিয়া মৃতদেহগুলিকে কবরের মধ্যে রাখা হইত। মৃতদেহের সঙ্গে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। সোণা, রূপা হীরার গহনা রাজাদের মমির সহিত থাকিত। আর তাহাদের মমির সহিত কতকগুলি মন্ত্র-লেখা কাগজ থাকিত। এই কাগজগুলি মড়ার কাছ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইত না। তাহাতে রাজার নাম, বিবরণ প্রভৃতি নানা কথা লেখা থাকিত। যখন প্রাচীন মিশরের রাজারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন তখন আরবের দস্যুরা এই সকল মৃতদেহ হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মৃতদেহের গায়ে চোরের হাত পড়া খুব অপমানের কথা নিশ্চয়! একজন রাজা মৃত পূর্ব্বপুরুষদের এই দুর্দশা দেখিয়া একটি পাহাড়ের কাছে, চল্লিশ ফিট গর্ত্ত করিয়া ঘর বানাইয়া অনেকগুলি রাজার 'মমি' রক্ষা করিয়াছিলেন। মনে ভাবিয়াছিলেন, এইবার সমস্ত নিরাপদ হইবে। কিন্তু চোরের হাত এড়ানো বড় কঠিন। আরবের দস্যুরা এই স্থান পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। গহনাপত্রের সঙ্গে তাহারা মন্ত্র-লেখা সেই কাগজপত্রগুলি বাজারে বিক্রয় করিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন পণ্ডিতের হাতে সেই কাগজগুলি আসিয়া পড়ে। তিনি ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—এ কাগজ কোথা হইতে বাজারে আসিল? ইহাতে যেসকল রাজার বিবরণ রহিয়াছে তাহাদের 'মমি' কোথায়? কাগজগুলি যেখানে ছিল মমিগুলিও নিশ্চয় সেখানে আছে! বহু চেষ্টার পর যে লোকটির কাছে সেই কাগজগুলি পাওয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। কোথায় সে এই কাগজ পাইল? অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক টাকা, অনেক প্রলোভন, অনেক তোষামুদের পর, সেই কবর-স্থান দেখাইতে সে রাজি হইল।

সে এক পাহাড়ের নীচে গর্ত্ত দিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সেই পণ্ডিত—তাঁহার নাম ছিল ব্রাগস্—সেই লোকটির সহিত চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন। গহ্বরের মধ্যে নামিয়া তাঁরা ত অবাক্ হইয়া গেলেন। যেখানে যান সেখানেই এক একটি রাজার মমির সিন্দুক! তাঁহারা এ কোন্ মৃত্যুলোকে জীবন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন? প্রায় বিশ ত্রিশ জন রাজার মমির সিন্দুক! সেই গুলিকে উপরে উঠাইয়া সিন্দুকগুলি অত্যন্ত বড় বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, মমিগুলি য়ুরোপে চালান দিলেন।

যখন নৌকাতে সেই মমিগুলি তোলা হইল, তখন গ্রামের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! স্ত্রীলোকেরা নদীর ধারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, যেন তাহাদের পরমাত্মীয় জিনিষগুলি কোথায় নষ্ট হইবার জন্য চলিয়া যাইতেছে। ব্রাগস্ অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, এগুলি নষ্ট হইবে না, এগুলি পণ্ডিতদের শিক্ষার জন্য যাদুঘরে সুরক্ষিত হইবে। য়ুরোপের

প্রত্যেক যাদুঘরে মমি আছে, এমন কি, আমাদের কলিকাতার যাদুঘরেও একটি মমি আছে।

প্রায় ছয় হাজার বৎসর আগে মিশরে মেনাস্ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও ইঁহার অস্তিত্বে বড় কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজকাল তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ অনেক জিনিষ পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান কায়রো নগরের কাছে মেম্‌ফিস্ নামে এক নগর ছিল। এখনো সেখানে প্রাচীন যুগের শত শত চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। মিশর দেশ দুইভাগে বিভক্ত—উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর মিশরের রাজধানী মেম্‌ফিস্; দক্ষিণের রাজধানী ছিল থিবস্। মেনাস্ উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক করিয়া যুক্ত মিশরের সম্রাট হন।

তারপর কত রাজা হইল, অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না। দশ এগার শত বৎসর পরে খুব পরাক্রমশালী কয়েক জন রাজা মিশরের রাজ-সিংহাসন সুশোভিত করেন। তাঁদের অতুল কীর্ত্তি এখনো বিদ্যমান। তাঁদের নির্ম্মিত বিরাট পিরামিড, নানা কারুকার্য্য-শোভিত রাজপ্রাসাদ, নানা দেবদেবীর পবিত্র মন্দিরে মেম্‌ফিস্ পরিপূর্ণ।

ইঁহাদের পরে আনুতেফ্ রাজগণ সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প আছে। তাঁহাদের অনেকের কবর পাওয়া গিয়াছে। সেই কবরগুলিতে তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা খোদিত আছে। এমন কি, নিতান্ত ছোট ছোট হাস্যকর ব্যাপার পর্য্যন্ত খোদিত রহিয়াছে। একজন রাজার ডাকনাম ছিল "শিকারী"। তাঁর কবরে নানা ছবি আঁকা আছে; তাঁর সখের কুকুরগুলি চারিপাশে দাঁড়াইয়া, আর মাঝখানে তিনি। এই কবর-চিত্রে দেখা যায়, যে তাঁরা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর সেই সময়ে আরব দেশের সহিত মণিমুক্তা মসলাপাতি লইয়া বাণিজ্য ও চলিত। লোকেরা এই সময়ে পরমানন্দে দিন কাটাইত; আর ফেরোকে (মিশরের রাজাকে ফেরো বলিত) 'ন্যায়বান্,' 'জীবনদাতা' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিত। এমন রাজাদের রাজত্বে বাস করিয়া তাহারা স্বদেশকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিত; এবং তাহারা 'যেথায় মরুক ঘুরে' তাহাদের দেশ কখনো দূরে যাইত না, দেশের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন চিরদিন অটুট থাকিত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মুসুরী শৈল।

(সমবায়—স্বাস্থ্যনিবাস)।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে সাধারণতঃ গিরিধি, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, ঝাঝা, অথবা দার্জ্জিলিং, রাঁচি, মুঙ্গের ও পুরী পর্য্যন্ত যাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্থানগুলি বাঙ্গলা প্রদেশের রাজধানীর নিকটস্থ হওয়াতে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাই এই সকল স্থলে আর নির্ম্মল বায়ু এবং নির্জ্জনতা উপভোগ করা যায় না। ক্রমেই বায়ু দূষিত হইয়া পড়িতেছে—এজন্য পূর্ব্বের মত আর স্বাস্থ্যকর নাই; এ অবস্থায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির প্রকৃত তথ্য ও আবাস সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি সাধারণের জানা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি।

যুক্ত-প্রদেশস্থ মুসুরী পাহাড় একটী মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা হিমালয় পর্ব্বতের একটী অংশ, পূর্ব্বে স্বাধীন গাড়োয়াল রাজার অধীন ছিল, পরে ইংরাজ-রাজ সন্ধিসূত্রে ইহা ক্রয় করিয়া লইয়া এখানে একটী বিস্তৃত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে মুসুরীকে শ্বেতাঙ্গের বিলাসকুঞ্জ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ-গণ নিজেদের স্বাস্থ্যের ও আমোদ প্রমোদের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোক সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন, তাই এমন সুন্দর স্থানে তাঁহাদের দেশবাসী সাধারণের থাকিবার সুবিধা অদ্যাবধি করেন নাই। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন অল্প লোকই এদিকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন, জনসাধারণ

ইহার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলিলেও চলে। অনেকে দূরত্ব নিবন্ধন এখানে আসিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু ইহা তত দূর নয়—পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার হইতে অল্পদূর। কত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রতিবৎসর এই মহাতীর্থে দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমবেত হন। দূর বলিয়া এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে না আসা একটা বিশেষ ভ্রম।

কলিকাতা হইতে মুসুরী ৯৯০ মাইল ব্যবধান হইবে। ট্রেণে দুই রাত্রি এবং এক দিবস থাকিতে হয়, প্রথমে মোগল-সরাইতে ট্রেণ বদল করিয়া আউদ রোহিল খণ্ডের ট্রেণে উঠিতে হয়, তৎপরে লাক্‌সার জংসন ষ্টেসনে পুনরায় ট্রেণ বদল করিয়া হরিদ্বার-দেরাদুনগামী ট্রেণে উঠিতে হয়। কলিকাতা (হাবড়া) ষ্টেসন হইতে একবারে দেরাদুন পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণী আরোহীগণের এই ট্রেণ বদলের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না; দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীখানা এক ট্রেণ হইতে খুলিয়া অন্য ট্রেণে জুড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে দেরাদুন হইতে রেল লাইন বর্দ্ধিত করিয়া রাজপুর হইয়া উপত্যকাগুলির মধ্যদিয়া একবারে মুসুরী সহরের নীচে পর্য্যন্ত আনিবার প্রস্তাব হইয়াছে; ২।৪ বৎসর মধ্যেই ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। যখন দিল্লী রাজধানী হইল তখন এই সকল শৈলনিবাস প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় সাহেব এবং হিন্দুস্থানী ধনী লোকদিগের একমাত্র বিশ্রামস্থল হইবে। সুতরাং পথ আরও সুগম করিবার চেষ্টা হইবে।

আসিবার সময় পুণ্যনগর হরিদ্বারের পার্শ্ব দিয়া পূতধারা জাহ্নবীর নিকট দিয়া ট্রেণে আসিতে হয় ইচ্ছা হইলে হরিদ্বারে নামিয়া জাহ্নবী সলিলে স্নান তর্পণ করিয়া দুই মাইল দূরে কন্‌খল নামক স্থানে ৬সতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থান দেখিয়া আসিতে পারেন; এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। হরিদ্বারে ২।১ দিন থাকিবার মত সুন্দর ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। যোগের সময় অত্যধিক লোক সমাগম সুতরাং সে সময় না যাওয়াই ভাল। হরিদ্বার হইতেই শিবালিক পর্ব্বতমালা আরম্ভ হইয়াছে। রেল লাইন এই পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়া দেরাদুন আসিয়াছে, হরিদ্বার হইতে দেরাদুন আসিতে দুইটী টনেল পড়ে। দিবসের ট্রেণে আলোর ব্যবস্থা না থাকায় ট্রেণ টনেলের মধ্যে প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া যায়, তখন কোলের মানুষও দেখা যায় না।

দেরাদুনও যুক্ত প্রদেশের একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। শীতের সময় অধিকাংশ লোক মুসুরী হইতে নামিয়া আসিয়া এখানে শীতকাল যাপন করেন। এখানেও বহু সাহেব এবং দেশীয় ধনী লোক বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনোরম উদ্যানবাটীগুলি সহরটীর অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। এখানে ৫।৭ ঘর বাঙ্গালী পরিবার স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন। স্থানীয় বাজারটী বেশ বড়। আহার্য্য সামাগ্রী কলিকাতা হইতে বেশী মহার্ঘ নয় বরং সস্তা। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বোম্বাই আম, লিচু, ন্যাশপাতি, আপেল, লকেট, সুমিষ্ট আঙ্গুর ও দেশী আম্র প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মূল্যও খুব সুলভ। দেরাদুন হইতেই মুসুরী পাহাড়ে ফল ও শাকসব্জী দৈনিক যায়। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বিচিত্র, ইহাকে প্রকৃতির রম্য নিকেতন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্দ্দিকে হিমগিরিমালায় পরিবেষ্টিত—ফলে ফুলে ও বৃক্ষবল্লরীতে সজ্জিত যেন একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান বাটী প্রকৃতি দেবী ইহার অধিষ্ঠাত্রী।

এখানে সৈনিকদিগের থাকিবার একটী বড় ছাউনি, Forest College বা বনবিভাগের কলেজ, X Ray College (এক্স রে কলেজ) এবং অবজারভেটারি বা মানমন্দির আছে। এই মানমন্দিরে প্রত্যহ সূর্য্যের ফটোগ্রাফ লইবার ব্যবস্থা আছে। স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য খরস্রোতা নদীগুলি বর্ষার প্রবাহে সজীব হয়। অন্য সময় উপলখণ্ড বিছাইয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। মুসুরী পাহাড়ের ঝরণার জল নালা কাটিয়া দেরাদুনে আনা হইয়াছে, সেই জল সুপরিস্কৃত হইয়া নল দ্বারা সহরের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে; এই জল সুপেয়। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে এখানে নানা জাতীয় এত অসংখ্য ফুল ফুটে যে তাহাতে গাছের পাতা ঢাকিয়া ফেলে। মনে হয়, ভগবান যত রাজ্যের ফুল এখানে একত্র করিয়াছেন। দেরাদুন রেল ষ্টেশন হইতে মুসুরী ১৬ মাইল দূরে। মেঘ-

শুভ্র দিনে দেরাদুন হইতে মুসুরী পাহাড়ের থাকে থাকে সজ্জিত শুভ্র বাড়ীগুলি দেখা যায়। রাত্রিতে যখন মুসুরী সহরের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিতে থাকে তখন দেরাদুন হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন ঊর্দ্ধে আকাশ হইতে একছড়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের মালা খলিত হইয়া অর্দ্ধপথে কাহারও অদৃশ্য কণ্ঠে দুলিতেছে। এই দৃশ্যটি না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

দেরাদুন হইতে মুসুরী আসিতে রাজপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী বা টোঙ্গা পাওয়া যায়। রেলষ্টেশন হইতে একঘণ্টায় ৮মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মুসুরী পাহাড়ের পাদদেশস্থিত রাজপুর নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। দেরাদুন হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ প্রশস্ত। দুইধারে পত্রবহুল বৃক্ষরাজি এবং এক জাতীয় রোপিত বাঁশগাছ ছায়া দান করিয়া থাকে এবং উভয় পার্শ্বস্থিত রম্য উদ্যানবাটী সকল হইতে সুগন্ধ কুসুম সৌরভে চিত্ত আমোদিত করিয়া পথিকের ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। রাজপুর হইতে মুসুরী পাহাড় সোজা উঠিয়াছে—দেখিলেই বোধ হয়, এই বুঝি কৈলাশে যাইবার রাস্তা। মহাদেবের বাহন বুঝি এই পথে যাতায়াত করিত—আর পার্ব্বতী ঠাকরুণ তাঁহার সিংহে চড়িয়া পিত্রালয়ে আসিতেন! উঠিবার সময় ভয় হয়, বুঝি পিছলাইয়া পড়িয়া যাইব।

রাজপুরে অনেকগুলি সাহেবী হোটেল এবং এজেন্সি আফিস আছে। একটী দেশী কোম্পানীও আছে। এই সকল এজেন্সীতে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া পাহাড়ে উঠিবার ঘোড়া বা মনুষ্যস্কন্ধবাহী ডাণ্ডি যান ভাড়া করিয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। ঘোড়ার নাম শুনিয়া কেহ হতাশ হইবেন না—ঘোড়াতে বরং ব্যয় কম হয়। ঘোড়াগুলি সুশিক্ষিত কিন্তু গতিতে পক্ষীরাজ হার মানে। সহিস অশ্বপুচ্ছ ধরিয়া তাড়না করিতে করিতে আরোহীর সহিত বিনা ক্লেশে চড়াই পথ উঠিয়া লয়। শুনিয়াছি, গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হয়, আর মুসুরীতে ঘোড়ার লেজ ধরিয়া চড়াই পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ব্যাপার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। ঘোড়ার ভাড়া সাধারণতঃ ১।০ ও ১॥০ টাকা, ডাণ্ডি ২॥০ এবং ৩ টাকা, মোটবাহী কুলি ।৵০ ও ॥০ আনা। এতদুপরি টোল আফিসে পথকর ট্যাক্স বলিয়া প্রতি ঘোড়া ও ডাণ্ডি ১॥০ টাকা হিসাবে ও কুলি ৴১০ হিসাবে অবশ্য দিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাদের শ্রীচরণযুগল আছে তাঁহারা সকলকেই ফাঁকি দিয়া ধীরে ধীরে পথের শোভা দেখিতে দেখিতে মুসুরী উপস্থিত হন। রাজপুর হইতে মুসুরী ৭ মাইল রাস্তা কেবল চড়াই বলিয়া একটু ক্লেশ হয়। যাঁহারা হাঁটিয়া আসেন তাঁহাদের ট্যাক্স দিতে হয় না এবং নীচে যাইবার সময় ঘোড়া ও ডাণ্ডির ট্যাক্স দিতে হয় না।

পাহাড়ের গা বাহিয়া বাহিয়া প্রশস্ত রাস্তাগুলি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠিয়াছে—একধারে পাহাড়ের গাত্র প্রাচীরের কাজ করিতেছে, অপর খোলাদিকে রেলিং দিয়া বরাবর ঘেরা; কাহারও নীচে পড়িয়া যাইবার ভয় নাই। নীচে গভীর উপত্যকা ভূমিতে পাইন বৃক্ষগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিলে বোধ হয়, ইহাদেরও জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। যতই উপরে উঠা যায়, ততই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর হইতে থাকে, আর শীতল বায়ুপ্রবাহ আসিয়া পথিকের ক্লান্তি দূর করিয়া দিতে থাকে। অর্দ্ধপথে (Half way House) বিশ্রামাগার আছে, খাবার বিক্রেতার দোকান আছে, সোডা লেমনেড এবং সুপেয় পানীয় জল পাওয়া যায়। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঝরিপানি নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। এখানে নেপাল রাজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সমশের জঙ্গবাহাদুরের প্রাসাদোপম সৌধ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুবিস্তৃত সুশোভিত উদ্যানে মর্ম্মর প্রস্তরের পুত্তলিকাগুলি শোভাবর্দ্ধন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন বিরাট পর্ব্বতক্রোড়ে এমন বিচিত্র হর্ম্ম্য দেখিবার আশা পথিকের মনে আসে না—তাই স্বপ্নের দৈত্যপুরীর মত একটা ভাব মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। এখান হইতে আর দুই মাইল গেলে বালা হিসার জংসন নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। তথা হইতে এক রাস্তা মুসুরী এবং এক রাস্তা ল্যাণ্ডোর গিয়াছে। জংসন হইতে মুসুরী পোষ্টাফিস দেড় মাইল, ল্যাণ্ডোর দুই মাইল।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০০ ফিট উচ্চ উত্তর পূর্ব্বকোণে ল্যাণ্ডোর পাহাড়ের উপর গোরা সৈনিকদিগের ছাউনি। নীচে দেশীয় লোকদিগের দোকান ও বাজার। দেশীয় লোকের বসতি স্থানটী অপরিস্কৃত বলিয়া তত স্বাস্থ্যকর নয়। ইহার একটী অংশের নামখচ্চরখানা।৭ স্থানটীর নামের সহিত অধিবাসীগণের স্বভাবের সম্পূর্ণ মিল। কতকগুলি .... আছে তাহারা ....র কলঙ্ক-স্বরূপ। সব মাতাল, ইতর, ঘৃণিতচরিত্র। আগন্তুক-দিগকে সাবধান করিবার জন্য এই বিষয়টী লিখিতে বাধ্য হইলাম; ইহাদের প্রলোভনে পড়িয়া কদাচ এই স্থানে বাস করিতে যাইবেন না।

দক্ষিণ পশ্চিম কোণের নাম Vincent Hill বা চাণ্ডা-গড়ী—ইহাও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৫০০ ফিট উচ্চ। এই স্থান হইতে ল্যাণ্ডোর প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত মুসুরী নামে খ্যাত। এই অংশের সুপরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তাটী মলরোড নামে কথিত হয়। এই পথিপার্শ্বে ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান দোকান, আফিস, ব্যাঙ্ক, ঔষধালয়, গির্জ্জা, হোটেল, থিয়েটার, বায়স্কোপ, জেনারেল পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম আফিস, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী এবং কর্পূরথালার মহারাজের প্রাসাদ বিদ্যমান। লাই-ব্রেরীর নিকটে সপ্তাহে তিন দিন সৈনিকেরা ব্যাণ্ড বাজায়। সন্ধ্যার সময় বহু ইংরাজ ও দেশীয় লোক এই ব্যাণ্ড শুনিতে উপস্থিত হন। লাইব্রেরী বাজার হইতে মুসুরীর পশ্চাৎ-ভাগ দিয়া দুই মাইল ঘুরিয়া একটী রাস্তা রিঙ্ক থিয়েটারের নিকট দিয়া হিমালয় ক্লাবের অদূরে মলরোডে মিশিয়াছে। উহাকে ক্যামেল ব্যাক (Camel Back) উষ্ট্রপৃষ্ঠ রোড বলে। এই পর্ব্বতচূড়ার একটী স্থান একটী নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে দেখিলে দেখিবেন, চূড়ায় একটী উষ্ট্র হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে, নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ঐ উষ্ট্র দেখা যায় না; এই জন্য উহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠ রোড বলা হয়। এই রাস্তায় একটী Electric Bath Sanitarium বা বৈদ্যুতিক জলের স্বাস্থ্যস্নানা-গার আছে। অনেকে এই চিকিৎসার প্রশংসা করেন। কোন ঔষধ দেওয়া হয় না, কেবল আহার ও স্নানের দ্বারা। অনেক পুরাতন রোগ ভাল করা হয়—যথা, বাত ইত্যাদি।

এই রাস্তা হইতে ৫০ মাইল দূরস্থিত চির তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। রৌদ্রসম্পাতে স্ফটিকোজ্জল স্বচ্ছ ধবলকান্তি সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। হিমালয় ক্লাবের পূর্ব্বদিগের রাস্তায় আসিয়া বালাহিসার দিকে আসিলে দেখিতে পাইবেন—দূরে শুভ্ররজতরেখার মত জাহ্নবী যমুনা দুই দিকে বহিয়া যাইতেছে—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখিবেন—ঐ দূরে পর্ব্বতমালার উপর দিয়া প্রবাহিত পূতসলিলা জাহ্নবী ও যমুনা। মনে হয়, ঐ বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনী দেখিতেছি। চক্ষের দৃষ্টি একেবারে দিগন্তে মিশিয়া যাইতেছে—ঊর্দ্ধে আকাশ অস্তগামী সূর্য্যের কিরণমালায় বিবিধবর্ণে চিত্রিত হইতেছে—নিম্নে দূরে দেরাদূনের সমতলক্ষেত্র। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমি কোথায়? অতি শোকসন্তপ্ত এবং রোগক্লিষ্ট চিত্তও এই সময় কিছুক্ষণ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়—মন সেই জগৎপিতার ধ্যানে মগ্ন হয়।

যিনি একবার এই দৃশ্য দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। মুসুরী পাহাড়ের আর একটী সৌন্দর্য্য—বর্ষার মেঘ ও ডালিয়াফুল। মেঘগুলি উপত্যকা-ভূমি হইতে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও রাস্তার উপর দিয়া, বাড়ীর উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে—গৃহের এক দরজা দিয়া আসিয়া অন্য জানালা দুয়ার দিয়া বাহির হইতেছে। বর্ষার সময় মেঘের রাজ্যেই বাস করিতে হয়, অথচ এই মেঘের হাওয়ায় কাহারও ঠাণ্ডা লাগে না। আর এক একটী পাহাড়ে নানা-রঙ্গের এত ডালিয়াফুল ফোটে, যে দূর হইতে দেখিলে ফুলের পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। স্বভাবের এই শোভা দেখিতে দেখিতে চিত্তের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে থাকে। চিত্তের প্রফুল্লতা ভগবানের একটী আশীর্ব্বাদ। মুসুরী আসিলে সে আশীর্ব্বাদটী পাওয়ার আশা হয়; পার্ব্বত্য ভূমিতে এত বড় শৈলনিবাস আর একটীও নাই; দার্জ্জিলিং ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট সহর। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এই স্থান—নয়নিতাল, আলমোড়া, শিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে Hill Diarrhoea বা পার্ব্বত্য উদরাময়

কাহারও হয় না, কিন্তু অন্যান্য পাহাড়ে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুব বেশী। এখানে বায়ু আর্দ্র নয়—জল সুপেয়—চাকরেল নামক ঝরণার জল সুপরিস্কৃত হইয়া পাইপদ্বারা সর্ব্বত্র সরবরাহ হয়—এবং "কোম্পানীর খাদ" নামক একটী ঝরণার জল অতিশয় হজমি কারক. এই ঝরণার জল গোরা সৈনিকেরা পান করে এবং ভদ্রলোকেরা চাকর দ্বারা আনাইয়া লন।

এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে কিন্তু ভারতবাসী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অল্প ব্যয়ে থাকিবার বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। সাহেবেরা অসংখ্য হোটেল ও স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপন করিয়া স্বজাতীয়গণের সুবিধা করিয়াছেন কিন্তু আমাদের ধনীগণ এ বিষয়ে উদাসীন। এখানে প্রধান অসুবিধা, ২।৪ মাসের জন্য থাকিতে হইলেও, ১টী ছোট বাড়ীও ৭০০৲।৮০০৲ টাকার কম মিলে না। বাড়ীওয়ালা বৎসরের সম্পূর্ণ ভাড়াটা আদায় করিয়া লইয়া থাকে। অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই সাহেব। মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক এত টাকা দিয়া বাড়ীভাড়াও লইতে পারেন না অথবা সাহেবদের হোটেলে যাইয়া অখাদ্যও খাইতে পারেন না। আমাদের দেশ সমবায়, সমবেদনা ভুলিয়া যাইয়া দিন দিন রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইতেছে—তথাপি এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি পতিত হইতেছে না। স্বদেশহিতৈষীগণ একবার কি অনুগ্রহ করিয়া এদিকে একটু লক্ষ্য করিবেন?

আমিও এখানে আসিয়া এই অসুবিধায় পতিত হইয়াছিলাম। তৎপরে জানিলাম, গত মে মাস হইতে কলিকাতায় সুবিখ্যাত "ধর্ম্মসমবায় লিমিটেড" কোম্পানী মুসুরী ও দেরাদুনে ভারতবাসীগণের জন্য ২টী ক্লাব বা হোটেল খুলিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত কোম্পানীর মুসুরীস্থ ক্লাবে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। উভয় ক্লাবেই শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান ম্যানেজার ভাবে আছেন। সমাগত ভদ্রলোকের সহিত ইঁহারা এত সদ্ব্যবহার করেন যে ইঁহাদের গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না, এবং প্রবাসের ক্লেশ ভুলিয়া যাইতে হয়। এই বৎসরেই বহু পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া এখানে ছিলেন। খুলনা জেলার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন এবং গোরক্ষপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ সি, সি, দাস মহাশয় এখানে প্রায় মাসাবধি ছিলেন। আজমীরের অধিবাসী, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বংশীধর শর্ম্মা এখানে সপরিবারে ছিলেন; এবং লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রফেসার জনৈক পাঞ্জাবী তাঁহার ভ্রাতাসহ এই ক্লাবে ছিলেন। ইঁহারা সকলেই উচ্চ প্রশংসা-পত্র দিয়া গিয়াছেন। এই সুদূরস্থানে বাঙ্গালীর একটী জনহিতকর অনুষ্ঠানে এই স্বদেশীয় যুগে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং পৃষ্ঠপোষক হইবেন এরূপ আশা হয়।

ক্লাবটী অতি সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থাপিত হইয়াছে; সম্মুখে ফুলের বাগান, চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ক্লাবে ৭।৮ খানি বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী এবং ইংরাজী পত্রিকা আসে এবং দৈনিক ৪ খানা ইংরাজী সংবাদ পত্র আসে। এখানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই থাকিতে পারেন। তবে খ্যাদাদি কেবল হিন্দু নিয়ম অনুসারে দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে আত্মীয় স্ত্রীলোক সহ বা সপরিবারে বাস করিতে পারা যায়। ক্লাবের ম্যানেজার এখানে পরিবার সহ আছেন সুতরাং কোন অসুবিধা হয় না।

মুসুরীতে মে মাস হইতে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত (Season) মরসুম, তৎপরে অত্যন্ত শীতের জন্য লোক সকল নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়। অনেকে দেরাদুনে যাইয়া শীতকালে যাপন করেন; কারণ দেরাদুনে বারমাসের কখনই থাকিতে কোন কষ্ট হয় না। এই ক্লাব সম্বন্ধে অপরাপর নিয়মাবলী জানিতে হইলে সেক্রেটারি, মুসুরী কো-অপারেটিভ ক্লাব (Secretary, Co-operative club, Mursoorie) এবং সেক্রেটারি দেরাদুন সমবায় কো-অপারেটিভ ক্লাব (Secretary Samabay Co-operative club) এই উভয় ক্লাবের যে কোন ক্লাবে পত্র লিখিলেই অতি যত্নের সহিত উত্তর দেওয়া হয়; এবং যাঁহার যে ভাবে থাকিলে সুবিধা হয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অষ্টম ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। ৮ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE, WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৸৴৹ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

প্রিভিকাউন্সিলের জজ, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান নেতা
শ্রীযুক্ত সৈয়দ আমির আলী।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :- স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest --- I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ | ৮ম সংখ্যা।

নৈতিক শিক্ষা—মনোপ্রকৃতির বিকাশ।*

সামাজিক অবস্থার সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতির একটা পরস্পর-সাপেক্ষ সম্বন্ধ আছে। জাতীয় মানস-প্রকৃতির রূপ পাঠাগারের পাঠ শিক্ষায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। মানুষ যখন লৌকিক শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় মনে করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সর্ব্ব প্রকার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইত, তখন শিশুদের শিক্ষা-প্রণালী স্বভাবতঃই আত্ম-[illegible] পরতন্ত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যেরা [illegible]ন জন-নায়ক ছিলেন, তাঁহারা যে নীতি প্রচার করিতেন, তাহার মূলমন্ত্র ছিল অন্ধ বশ্যতা; তাঁহারা শুধু বিধি প্রণয়ন করিতেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেন, জনসাধারণ তাহা পালন করিত, বিচার করিবার অধিকার মাত্র তাহাদের ছিল না।

শাস্ত্র শাসনের এই অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতার যুগ যখন অবসান লাভ করিল, তখনই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বাধীন বিচার বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া দেশের পাঠাগার সমূহে নব শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করিল। যে দেশের রাষ্ট্রীয় শাসনে যে সময়ে কঠোরতা বিদ্যমান থাকে;—যখন দোষ মাত্রেই প্রবল দণ্ড দান করা হয়, এবং মৃত্যুদণ্ড স্বচ্ছন্দতা সহকারে সর্ব্বপ্রকার অপরাধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন স্বভাবতঃই তদ্দেশীয় বিদ্যামন্দির সমূহ তদনুযায়ী কঠোর শারীরিক দণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

* জোলায়ের মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত।

জনসাধারণের ভিতর রাজনৈতিক অধিকার যতই বৃদ্ধি পায়, শাসনকার্য্য যতই শাসকের একনিষ্ঠ প্রভুত্বকে অতিক্রম করিয়া শাসিতের অন্তরের যোগের উপর স্থিতি লাভ করে এবং ব্যক্তিগত মর্য্যাদার যতই বিকাশ ঘটিতে থাকে, দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ততই উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে ও শারীরিক দণ্ডের গুরুত্ব বোধ ততই হ্রাস হয়!

আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়ায় বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রণোদিত জনসাধারণ যে কালে কৃচ্ছ্র সাধনকেই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিত সে কালে স্বভাবতঃ লোকের ধারণা ছিল, যে শিক্ষার্থী বালকগণের ইচ্ছা নিরোধ করাই পরম শ্রেয়ঃ। অপর পক্ষে, বর্ত্তমান যুগে জনসমাজ সুখ স্বচ্ছন্দতাকে মানুষের বৈধ অধিকার স্বরূপ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সাধারণের ভিতর পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগেরও বহুল ব্যবস্থা হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় সহজেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে শিশুদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির ভিতরেও শিশু পালনের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে, এবং তাহাদের ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যেও তাহাদের চরিত্র বিকাশের সহায়তার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, এবং তাহাদের মনঃশক্তির স্ফুরণ কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বা ত্রাসজনক ব্যাপার নহে। মানুষ যে যুগে মনে করিত যে বাণিজ্যের উন্নতি বদান্যতার উপর নির্ভর করে, কল কারখানা সাধারণের ব্যবস্থাদ্বারা চালিত হয়, অর্থের ব্যবহার আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়,—সেই আশ্রয়াপেক্ষযুগে মানুষ যে মনে করিবে, যে বয়স্ক ব্যক্তিগণের আজ্ঞাপরতন্ত্রতাই শিশুদের একমাত্র শুভ-বুদ্ধি এবং শিশুচিত্ত পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রদত্ত জ্ঞানের রক্ষাপাত্র মাত্র, এবং কুম্ভকারবৎ তাঁহারা যদৃচ্ছ ভাবেই তাহাদের জীবনটাকে গড়িয়া ফেলিতে পারেন—ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে।

ব্যবসায়ের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকারের সম্প্রসারণ ও অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, নিয়ম ও বিধান কেবল গড়িয়া আনিয়া বাহির হইতে মানুষের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না, শিক্ষার আনুসঙ্গিক ফল রূপে তাহা মানুষের অন্তরে স্বতঃ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। মানুষের মন যখন স্বতঃই একটা অভিব্যক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন বাহির হইতে তাহাকে নাড়া দিতে গেলে তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং, তাহার বিকাশের পথে প্রয়োজন ও আয়োজনের জিনিসগুলি আমরা ঘটাইয়া না তুলিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার বিঘ্নোৎপাদন ক্ষমাযোগ্য অপরাধ নহে। মানুষ তাহার নীতি প্রচারে, ধর্ম্ম শাসনে, রাষ্ট্র শাসনে, বিশ্বাসে, ধারণায় যখন এ সত্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সাধারণের মধ্যে মতবৈষম্য আদৌ ছিল না। ধর্ম্ম বিশ্বাসে, রাষ্ট্রীয় শাসনে, সামাজিক আচার ব্যবহারে একটা অখণ্ড ঐক্য বিদ্যমান ছিল। অধুনাতন কাল যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রাচীনকালের সেই শিক্ষা লাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আবহমান কাল অবধি যে বিধি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যে প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সেকালে সাধারণে তৎ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিত না। যে বশ্যতার মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত হইত তাহা তাহাদের সমুদয়কে এমন একটা ঐক্যের দ্বারা বদ্ধ করিত, যে তাহা আর কিছুতেই খণ্ডিত হইত না। ব্যক্তিত্বের অধিকারের সম্প্রসার সে মন্ত্রবন্ধনকে দীর্ণ করিয়া যখন সমাজকে বাহিরের মুক্ত পথে আনিয়া ফেলিল, তখন দিকে দিকে স্বতঃই নূতন পথ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, নূতন ক্ষেত্র দেখা দিতে লাগিল, নূতন যাত্রী নূতন দিকে তখন যাত্রা আরম্ভ করিল। ভিতরে যখন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ওঠে, তখন বাহিরে তাহার প্রকাশ অনিবার্য্য। সুতরাং সমাজের ভিতরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে অঙ্কুরোদগম হইতেছিল, তাহা অপরি-হার্য্যরূপে বাহিরের দিক্ দিয়াও পুরাতন ক্ষেত্রের রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

শিশুশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্ম যে বহুল উপায়ের

সৃষ্টি হইতেছে, অন্ধতা বশতঃ তৎপ্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলেও তাহার যথার্থতার কিছুমাত্র হানি হয় না। মতদ্বৈধ অন্যান্য বিষয়ের যেরূপ ফল প্রসব করুক না কেন, শিক্ষা সম্বন্ধে যে তাহা হইতে কোনো ইষ্ট লাভ হয় না এরূপ মনে করা যায় না। বহু ব্যক্তির শ্রম ও উদ্যোগ, অনুসন্ধিৎসা ও পর্য্যালোচনায় যাহা জন্মগ্রহণ করে তাহা বহু দীপসমন্বিত কক্ষের মত বহু জীবনের জ্ঞানালোকে ব্যক্তিগত ভ্রম প্রমাদের ছায়ারহিত হইয়া থাকে। এক জন যাহা করে, তাহাতে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকে, তাহা অপরের বিচারে সংশোধিত হয়, এবং একজনের চেষ্টা যেখানে পরাভূত হয়, সেখানে আর এক জনের চেষ্টা সফলতা লাভ করে; এইরূপ অন্বয়াভিমুখ খণ্ড চেষ্টা একটী সমগ্রতাকে গড়িয়া তোলে।

মতদ্বৈধ অনুসন্ধিৎসা হইতে জন্ম লাভ করে; কিন্তু মত-সামঞ্জস্য দুই পরস্পর বিরুদ্ধ হেতু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ যখন অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন স্বাধীন চিত্ত-বোধের অভাব তাহাকে পূর্ব্বতন কালের অনুবর্ত্তী করিয়া একমতাবলম্বী রাখে; আর যখন সমস্ত মানুষ স্বাভাবিক শ্রেয়োবুদ্ধি চালিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক যথার্থ বোধের দ্বারা একটা নীতিকে অবলম্বন করে, তখন একমতাবলম্বী হয়। সুতরাং মতদ্বৈধ জিনিষটাকে দৃশ্যতঃ মত-সামঞ্জস্যের বিপরীত পদার্থ রূপে দেখা গেলেও হেতু ও কালানুক্রমিকের দ্বারা উভয়ের মাঝখানে বিকাশের যে পরস্পর লগ্ন স্তর-গুলি রহিয়াছে, তাহা তাহাকে একই জিনিসের বিভিন্নতর অংশ রূপে নির্ণয় করে। অতএব মতদ্বৈধ হইতে যদি কেহ পীড়া পাইয়া থাকেন, বিভিন্ন সুখ চেষ্টার উদ্ভবে ও সংঘর্ষণে স্বস্তিহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে ইহা তাঁহাদের স্মরণ করিতেই হইবে যে, যে কেহ মত-সামঞ্জস্য লাভ করিতে চান, তাঁহাকে মতদ্বৈধের এই ঊষর প্রান্তর অগ্রে অতিক্রম করিতে হইবে। পক্ক ফল যে সুরসাল, তদ্বিষয়ে অবশ্য কাহারও কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ফল যে বৃন্তে আবির্ভূত হওয়া মাত্র সুরসাল হয় না, তাহাকে যে যথাক্রমে তিক্ত কষায় ও অম্লরস অতিক্রম করিয়া সুরসে পঁহুছিতে হয়, এ কথা স্মরণ করা উচিত। বিকাশ ও পরিণতির মাঝখানে যে সোপান-পরম্পরা—একের সহিত যাহা অপরাংশকে যোজনা করিতেছে—তাহাই জগতের বিবর্ত্তনের প্রাণ; তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব, অতিক্রম করা অধিক-তর অসম্ভব।

একটা ভুল যখন স্বীকৃত হয়, এবং মানুষ যখন তাহা সারিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে, তখন প্রায়ই তাহার বিপরীত দিক্ দিয়া আর একটা ভুল আসিয়া পড়ে—ইহা একটা সাধারণ নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক্। লোক সমাজের যদি কোনও একটা বিশেষ দিক্ আতিশয্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে যখন তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন বিপরীত দিকে একটা আতিশয্য স্বতঃই ঘটিয়া উঠিতে থাকে। আদিম যুগে যখন শারীরিক বলই একমাত্র বল বলিয়া বিবেচিত হইত, তখন মানসিক ক্ষমতার উপর কাহারও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, এদিকে আবার সভ্য মানব যখন দৈহিক ক্ষমতা অপেক্ষা মানসিক ক্ষমতাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উপলব্ধি করিল, তখন দৈহিক ক্ষমতার উপরে মনোযোগ একেবারেই কমিয়া গেল, এবং মানসিক শক্তি চালনার অতি-চেষ্টা অপর সমস্ত চেষ্টাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অধুনা নবযুগ নব তথ্য লইয়া বিশ্ববাসীর দ্বারে দাঁড়াই-য়াছে। আজ আমরা শুনিতেছি, দেহ ও মনের তুল্য বিকাশই মনুষ্যত্বলাভের পন্থা, অন্যথা নহে। বলপ্রয়োগ শাসন-প্রণালীকে ব্যর্থ করে, এবং অকাল পরিপক্কতা অকাল বিনাশের পথই মুক্ত করে। স্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া যদি শিক্ষাকে শোভন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়, তবে তাহা অবলম্বনহীন ছাদের মত সমস্তটা লইয়া ভূমিসাৎ হয়, এবং শিক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া যদি স্বাস্থ্যকে একান্ত করিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা অনাবৃত গৃহ-ভিত্তির মত কোনও সার্থকতা লাভ করে না।

কিছুমাত্র না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করা যে শিক্ষা নহে, একথা এখন সকলেই বুঝিয়াছেন। বিদ্যাধ্যয়ন যখন বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে না, তখন তাহা সর্ব্বথা অশুভ উৎপাদক হইয়া উঠে, ইহাও যেমন সত্য, ক্লেশকুণ্ঠিত হইয়া সহজ ভাবে জ্ঞানার্জ্জন যে জ্ঞানার্জ্জন

নহে, ইহাও তেমনি সত্য। সহজে যাহা লাভ করা যায়, তাহা অতি সহজ স্থিতি লাভ করে। বন্যার জল আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হইয়া যায়, কিন্তু মাটি কাটিয়া যে বাপী খনন করা যায়, তাহা দাহময় দিনেও শুষ্ক হয় না। মানুষ যখন কতকগুলি নিয়ম শুধু শিক্ষা করে, কিন্তু তাহার মূলগত হেতুপর্য্যায় অধিগত করে না, তখন সে শিক্ষা বিচ্ছিন্ন, খণ্ড ও আংশিক হইয়া থাকে। বাহিরের নিয়ম, বাঁধা রাস্তার মত, তাহাকে যত টুকু বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাহিরে আর তাহার যাইবার যো নাই। তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে চলা যায় বটে, কিন্তু ইচ্ছা মত চলা যায় না। কার্য্য-কারণের মূলগত বিধি যখন মানুষের বোধ শক্তির ভিতর প্রবেশ করে তখনই তাহা স্বতশ্চল হয়, তাহার জন্য পথ গড়িতে হয় না, সে আপনি পথ সৃষ্টি করিয়া লয়; এবং মানুষ তখন অবাধ বিচরণের স্থান লাভ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

ছোট জাতির মেয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামরতন ঘোষ যশোহরের সবরেজিষ্ট্রার। তিনি কলেজে পড়ার সময় আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন। এখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক বন্ধু আছেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া অম্লানবদনে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। কিন্তু যশোহরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হিন্দু।

আসল কথা তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মেও আস্থা নাই, হিন্দুধর্ম্মেও বিশ্বাস নাই। তাঁহার পুত্র শশধর সিটিকলেজে পড়ে, ব্রাহ্মসমাজে যায়। ইহাতে রামরতন বাবুর কোন আপত্তি নাই। ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ শুনিলে আজ কালকার উচ্ছৃঙ্খল ছেলেগুলির চরিত্র সংযত ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে পারে;—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

কিন্তু রামরতন বাবু এ কি শুনিতে পাইলেন! তাঁহার ছেলে নাকি ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেশে! উপাসনালয়ে একেবারে বেদীর কাছটিতে গিয়া গম্ভীর ভাবে বসে! শুধু কি তাই? উপাসনার সময় অশ্রুতে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া যায়! রামরতন বাবু ভাবিলেন, তবে ত ছেলেকে ভাবুকতা রোগে ধরিয়াছে! ইহার পরই ব্রাহ্মসমাজের ভূত তাহার কাঁধে চাপিবে এবং তাহাকে পাইয়া বসিবে।

রামরতন বাবু মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"রসো ছেলে, তোমার ভাবুকতা রোগের অষুদ আমি শীগ্‌গীরই আবিষ্কার করব। একটি বিয়ে হলেও রোগ দুদিনেই সেরে যাবে।"

রামরতন বাবু কুলীন কায়স্থ, তাহার উপর ছেলের বি, এ, পাশের সংবাদ বাহির হইল। পাশও যেমন তেমন নয়, শশধর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কাজেই ঘটকের দল রামরতন বাবুর বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। তিনি সুযোগ বুঝিয়া পাশকরা ছেলেকে নিলামে চড়াইয়া দিলেন। একজন উকিলের পক্ষের এক ঘটক সাত হাজার টাকা দাম হাঁকিয়া ছেলেকে ক্রয় করিলেন। কিন্তু ছেলে বাবাকে চিঠি লিখিল:—

"আমি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে না পারিলে বিবাহ করিব না। আগে অন্নের সংস্থান, তার পর ত বিবাহ। ইহা আপনারই কথা।"

চিঠি পড়িয়া রামরতন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"তোমার গোষ্ঠীর পিণ্ডি! আমি বিয়ে করাব, আমি বউ ঘরে আনব, আর আমি তার অন্ন যোগাতে পারব না? আজ কালকার ছেলেগুলোর চিঠির রকম দেখ!"

শশধর কিন্তু কিছুতেই বিবাহ করিল না। রামরতন বাবু খুব অসন্তুষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার একটু সন্তোষও জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "ছেলে বি, এ, পাশ করায় তাহার দাম সাত হাজারে উঠিয়াছে। এম, এ, পাশ করিলে নিশ্চয়ই আর তিন হাজার বাড়িবে। একেবারে দশটি

হাজার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইব, তবে ত ছেলের বিবাহ দিব।”

কিন্তু সে গুড়ে বালি। শশধর এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। রামরতন বাবুর ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় পৌছিয়া ছেলেকে কয়েক ঘা চাবুক লাগাইয়া দেন। কিন্তু তাহা পারিলেন না। তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু ব্যারিষ্টার মিত্রের চৌরঙ্গীর ইন্দ্রপুরীর ন্যায় বাড়ীতে গিয়া কিরূপে অতিথি হইবেন? কিরূপে মুসলমান বাবুর্চির তৈরী উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামরতন বাবু এবার এক মতলব করিলেন। তিনি ভাবিলেন,“হতভাগা ছেলের যা হইবার তাহা ত হইয়াছে। এখন দেখা যা'ক উহারই ভবিষ্যতের একটা ভাল রকম সুবিধা করিয়া দেওয়া যায় কি না! তাঁহার বন্ধু মিষ্টার মিত্রের বিস্তর টাকা। ঘরে একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি দেখিতেই বা মন্দ কি? এই মেয়ের সঙ্গে শশধরের বিবাহ হইলে লাভ কি কম? নগদ টাকার জন্য দর দস্তর করা যাইবে না বটে, কিন্তু তাহারই বা আবশ্যক কি? আদরের মেয়েকে দশ বার হাজার টাকার গহনা ও জিনিস পত্র যে দিবে, সে বিষয়ে রামরতন বাবু নিশ্চিন্ত। তারপর মিষ্টার মিত্র ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছেন, জামাইকে নিশ্চয়ই বিলাত পাঠাইবেন। শশধর বিলাত গেলে যে সিবিলিয়ান হইয়া আসিবে, সে ত ধরা কথা।”

রামরতন বাবু হয় ত আরও ভাবিয়াছিলেন, এই কলিযুগে সিবিলিয়ানের পিতা হওয়ার চেয়ে সৌভাগ্যের কথাই বা কি হইতে পারে?

তিনি শশধরের মত গ্রহণ না করিয়াই মিষ্টার মিত্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। মিত্র মহাশয় খুব খুসী হইলেন। তিনি স্বদেশহিতৈষী। বাঙ্গলা দেশ হইতে খুব ভাল ছেলেরা বিলাত যায় না বলিয়াই বাঙ্গালী সিবিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। শশধরের মত একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলেকে জামাই পাওয়া ত লাভেরই কথা। তাহার উপর সে বিলাত হইতে সিবিলিয়ান হইয়া আসিলে দেশেরও উপকার হইবে। এই চিন্তা করিয়া মিষ্টার মিত্র রামরতন বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

শশধর এই সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বেই কলিকাতার একটি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিল। তাহার পর পূজার ছুটিতে লাহোর বেড়াইতে গেল এবং নরহরি মল্লিক মহাশয়ের বড়ীতে অতিথি হইল। এ স্থানে নরহরি বাবুর বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

নরহরি বাবু জাতিতে নমঃশূদ্র। তাঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। তিনি গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহরে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সঙ্গে একত্র বসিয়া পড়িতেছেন, তবুও হিন্দু নমঃশূদ্রের সঙ্গে একত্র বসিতে এবং পড়িতে রাজি নহেন। সেই জন্য কোন স্কুলেই নরহরির পড়িবার সুবিধা হইল না।

নরহরির গৃহে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল। সেই অর্থের জোরেই তিনি লাহোর গমন করিলেন। শিখধর্ম্মের জন্য পঞ্জাব অঞ্চলে জাতিভেদের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা মুলুকের বাহিরে বিদ্যালয়ে কেই বা কোন্ বাঙ্গালীর জাতি লইয়া কলহ উপস্থিত করে? কাজেই নরহরি লাহোরে নির্ব্বিঘ্নে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন, এবং সময়ে তিনি এম্.এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একাউণ্টেণ্ট জেনেরালের আপীশে মোটা মাহিনার চাকুরি পাইলেন।

নরহরি বাল্যকালে হরিভক্ত ছিলেন। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের অনেক স্থান তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি আবৃত্তি করিতেনঃ—

> “জাতি কুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে
> জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর অজ্ঞাতে।
> অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়,
> তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
> উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে,
> কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।
> এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে,
> জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।”

কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে এই সকল কথা থাকিলে হইবে কি? বৈষ্ণবেরা হরিভক্ত নমঃশূদ্রদিগকেও হীন জাতি বলিয়া স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই সকল দেখিয়া নরহরি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া লাহোরের ব্রাহ্মসমাজে এক জন সাধু ব্রাহ্ম উপাসনা করিতেন। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহারই জীবনের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নরহরি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন নরহরি বাবু এক জন পরম ভক্ত বলিয়া সুপরিচিত। পঞ্জাবে কে তাঁহাকে না জানে? হিন্দু, ব্রাহ্ম, শিখ এবং মুসলমানেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

এই নরহরি বাবুর সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এক কন্যা আছে। কন্যার নাম সরোজিনী। সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে এবং মাতৃহীন সংসারে নিজেই কর্ত্রী হইয়া রন্ধনাদি ও পিতার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে।

শশধর নরহরি বাবুর গৃহে অতিথি হইয়া সরোজিনীর হৃদয়মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইল। কি রকম আকৃষ্ট হইল, সে বিষয়ে শশধরেরই একখানি পত্র প্রকাশ করিব। পত্রখানি তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিল। পত্রের মধ্যে লেখা ছিল:—

"তুমি ত নরহরি বাবুর নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। কিন্তু তিনি যে কি দেবতার মত মানুষ, তাহা তাঁহার সংসর্গে বাস করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমি এই ধার্ম্মিক পুরুষের স্নেহ পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

"নরহরি বাবুর একমাত্র কন্যা সরোজিনী। তিনি যে সুন্দরী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে শরীরের সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই মনস্বিনী নারীর অন্তরে এমন এক অপার্থিব ভাব আছে, তাহাই মুখমণ্ডলে বিকশিত হইয়া তাঁহাকে মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য এই রমণীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেই অন্তরে সম্ভ্রমের ভাব জাগ্রত হয় এবং শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া যায়।

"জান ত আগে আমার মেয়েদের সম্বন্ধে কি ভুল ধারণা ছিল। আমি ভাবিতাম, মেয়েরা বি, এ, পাশ করে বটে, কিন্তু লেখা পড়া অতি অল্পই শিক্ষা করে। এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আমি এক মাসের মধ্যে এই রমণীর নিকট যে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই ত তুমি আর আমি একত্র হইয়া টেনিসনের কাব্য পাঠ করিতাম। কিন্তু এবার এই নারীর মুখে অনেক কবিতার ব্যাখ্যা শুনিয়া উহার সৌন্দর্য্যগ্রহণ ও রসাস্বাদন করিয়াছি।

"ইহার সৌন্দর্য্যবোধ এবং সাহিত্যের রসাস্বাদনের শক্তি আশ্চর্য্য। ভাবের সঙ্গে এই রমণীর যেন স্বাভাবিক একটি সম্পর্ক আছে। ইনি সাহিত্যের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চাহিলেও ভাব অতি সহজেই তাহার রহস্যদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়!"

ইহার পর শশধর কলিকাতায় গমন করিল। কলিকাতার বন্ধুগণ তাহার অন্তরের প্রীতি অনুভব করিয়া এবং মনের ভাব অবগত হইয়া নরহরি বাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ নরহরির তরুণবয়স্ক শশধরের প্রতি কেমন একটি স্নেহের উদয় হইয়াছিল। তিনি বিবাহের প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখী হইলেন। সরোজিনী শশধরকে সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া জানিত। সেই জন্য সে প্রসন্ন চিত্তে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিল।

ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে উপাসনার পর বিবাহ ঠিক করিবার জন্য শশধর পুনর্ব্বার লাহোর গমন করিল। যে দিন বিবাহ ঠিক হইল, সেই দিনই সে তাঁহার পিতা ও মাতার নিকট পত্র লিখিল।

পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রামরতন বাবু ব্যারিষ্টার মিত্রের কন্যার সঙ্গে শশধরের বিবাহ ঠিক্ করিবার জন্য কলিকাতায় গমন করিলেন। কিন্তু কোথায় শশধর? সে যে লাহোর চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, সে কথা কেহই তাহার কাছে স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস পাইল না। এদিকে শশধরের পত্র যশোর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আসিল। রামরতন বাবু উহা পাঠ

করিয়া ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যশোরের কায়স্থ সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; আর কি না হিন্দুসমাজের সব চেয়ে ছোট জাতির মেয়ের সঙ্গেই তাঁহার পুত্রের বিবাহ? তিনি কেমন করিয়া সমাজে মুখ দেখাইবেন?

শুধু কি তাই? তিনি ভাবিয়াছিলেন, পুত্র লক্ষপতি ব্যারিষ্টারের কন্যা বিবাহ করিয়া বিলাত হইতে সিবিলিয়ান হইয়া আসিবে। হায়, আজ সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল।

রামরতন বাবু সংকল্প করিলেন, এমন কুপুত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবেন না; তাহার কলঙ্কে মলিন মুখ আর কখনই দর্শন করিবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শশধর বিবাহের পর সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিল। সে তাহার পিতার সন্তোষ উৎপন্ন করিবার জন্য একটা উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছিল। শশধরের স্নেহময়ী জননীর অত্যন্ত কোমল প্রাণ। একবার সরোজিনীকে লইয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি। তিনি নিশ্চয়ই পুত্রবধূর রূপে গুণে আকৃষ্ট হইবেন এবং পিতার সঙ্গে পুত্রের মিলন করিয়া দিবেন।

শশধর ঐ রকম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই দেশে যাইবার জন্য মাতাকে পত্র লিখিল। কিন্তু রামরতন বাবু শশধরের মাতাকে কহিলেন—

"ঐ নির্লজ্জ হতভাগা আমার বাড়ীতে এলে, আমি তাকে লাথি মেরে তাড়াতে চেষ্টা করব। তাতেও যদি সে চলে না যায়, তবে আমি আমার আর সব সন্তানদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ছেলে আর সেই চাড়ালনীকে নিয়ে ঘর করবে। আমার আর কোন সন্তানকে এ বাড়ীমুখোও হতে দিব না। আমার যে কথা সেই কাজ, তা না হলে আমি কায়েতের ছেলে নই।"

এই কথার পর জননী আর কেমন করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দেশে আসিতে পত্র লিখিবেন? বিবাহ ব্যাপারটা এতদূর যে গড়াইবে, শশধর তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়াও দেখে নাই। এখন পিতা মাতার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া চোঁখে আর জল রাখিতে পারিল না।

কিন্তু শশধর এই দুঃখের মধ্যে সরোজিনীর হৃদয়ের মহত্ব, প্রকৃতির মধুরতা, সেবাপরায়ণতা, সংযমের শক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত এবং পুলকিত হইতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী সরোজিনী স্বামীর মর্ম্মবেদনা সকলই বুঝিতে পারিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সে বিষয়ে স্বামীর নিকট কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত করিল না। প্রেমময়ী নারী শুধুই আপনার অতলস্পর্শ হৃদয়ের প্রীতির অমৃতরসের দ্বারা স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিল।

এক বৎসর পরে সরোজিনী অরুণের কিরণোৎফুল্ল পুষ্পদলের ন্যায় মধুর হাসিতে মুখখানিকে মধুর করিয়া শশধরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আপনার একটি চম্পক অঙ্গুলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল—

"আজ একটি বিষয়ের জন্য অনুরোধ করব; তা কিন্তু শুনতেই হবে।

শশধর। কি অনুরোধ করবে, বল?

সরোজিনী। যা বলব, তা করবে—আগে আমাকে কথা দাও।

শশধর। কি বলবে, তা না শুনে কথা ত দেব না।

সরোজিনী। আচ্ছা, বলেই ফেলছি। বিয়ের পর ত এক বৎসর চলে গেল। এখন নিশ্চয়ই বাবার মন নরম হয়েছে। একবার আমাকে নিয়ে দেশে চল। আমি শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখতে চাই।

শশধর। আমার বাবার যে কি ভয়ানক রাগ, তুমি তা ধারণাও করতে পারবে না। দেশে গেলেই তিনি একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করে বসবেন।

সরোজিনী। তোমার গায়ে হাত তুলবেন?

শশধর। আমাকে ধরে মারুন না, তাতে দুঃখ কি? পাছে বা তোমাকে কিছু বলে অপমান করেন।

সরোজিনী। আমাকে তোমা হতে ভিন্ন মনে কচ্ছ?

তা মনে কর। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তিনি আমাকে কিছুই বলবেন না।

শশধর। যদি কিছু বলেন?

সরোজিনী। তা সহ্য করব।

শশধর। তুমি সহ্য কর্‌তে পারবে?

সরোজিনী। তা যদি না পারি, তবে বুঝব তোমাকে এখনো ভালবাস্‌তে পারি নাই।

শশধর। তুমি নারীরত্ন; স্বামীর প্রতি তোমার যা কর্ত্তব্য তা তুমি করতে চাচ্ছ। কিন্তু আমারও তোমার প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সেই জন্য বলছি, আমাকে মাপ করবে; আমি কিছুতেই তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না।

সরোজিনী শশধরকে আর কিছুই বলিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূজার ছুটিতে শশধর দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল। তাহার শরীরটা তত ভাল নয়। সরোজিনী কলিকাতায় রহিল। কিন্তু সে এই সুযোগে এক সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইল। সরোজিনী সংকল্প করিল—"আমি আগে আমার স্বামীকেও কোন কথা জানাব না, শ্বশুরকেও কোন চিঠি পত্র লিখ্‌ব না। হঠাৎ যশোর গিয়ে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াব। দেখি, আমাকে দেখে তাঁর স্নেহের উদয় হয় কি না।"

সরোজিনীর প্রকৃতির মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ়তা আছে। সে শৈশবকাল হইতে পঞ্জাবে বাস করিয়াছে। সেখানে বাঙ্গলা দেশের মত নারীর অবরোধ প্রথা নাই। সরোজিনী কতবার লাহোর হইতে একলা এলাহাবাদ বোর্ডিংএ গিয়াছে। এবার সে একলাই ট্রেণে উঠিয়া যশোর ষ্টেসনে নামিল। তাহার পর একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্বশুরের বাহির বাড়ীতে পৌঁছিল। সেখানে বাড়ীর ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। সে নূতন রকমের একটি স্ত্রীলোক দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সরোজিনী ঝিকে কহিল—

"এ বাড়ীর কর্ত্তা কোন্ ঘরে থাকেন?"

ঝি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ঐ ঘরে।"

সরোজিনী। তিনি এখনো ঐ ঘরে আছেন?

ঝি। হাঁ আছেন।

সরোজিনী। কি কচ্ছেন?

ঝি। লেখা পড়ার কাজ কচ্ছেন।

সরোজিনী ধীরে ধীরে শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঝি বাড়ীর ভিতর গিয়া শশধরের মাকে কহিল—"মা, কোথা থেকে এক মেম সাহেব এসেচেন, কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। আচ্ছা মা, মেম সাহেবের মাথায় ঘোমটা দেখলেম কেন?"

সরোজিনীর ব্রাহ্মিকা পরিচ্ছদ ছিল। ঝি সেই পোষাক এবং তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখিয়াই তাহাকে মেম সাহেব বলিয়া মনে করিয়াছে। শশধরের মাতা এবং বাড়ীর অন্য মেয়েরা কর্ত্তার বৈঠকখানার একটি জানালার খড়খড়ি একটুখানি টানিয়া ব্যাপারটা কি, দেখিতে লাগিলেন।

সরোজিনী রামরতন বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। রামরতন বাবু সহসা দেবী প্রতিমার ন্যায় মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সম্ভ্রমের সহিত চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি শুনিয়াছেন, যশোহরের বাঙ্গালী জজ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার পত্নী পরমাসুন্দরী। তিনিই কি তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন?

রামরতন বাবু সরোজিনীকে চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সরোজিনী তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল এবং নম্রমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। রামরতন বাবু এই অপরিচিতা নারীর ব্যবহারে অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং কহিলেন—

"আপনি বোধ হয় আমার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই চেয়ারে বসুন, আমি মেয়েদের খবর দিচ্ছি।"

সরোজিনী। আমি আপনার কাছেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।

রামরতন। আমার কাছে অপরাধ? অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় দিলে সুখী হই।

সরোজিনী। আমি অস্পৃশ্য ছোট জেতের মেয়ে।

রামরতন। ও কি বলছেন?

সরোজিনী। আমিই আপনার পুত্রবধূ। আমার জন্যেই আপনার গৃহে সুখ নাই, আপনার পুত্রেরও মনে শান্তি নাই।

কে জানে এই নিরুপমা নারীর অন্তরে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি লুক্কায়িত ছিল। সেই শক্তির স্পর্শে রামরতনের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যে স্নেহের স্রোতকে প্রতিজ্ঞার বাঁধন দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; সহসা সে বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল। স্নেহের স্রোত হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া উঠিল। রামরতন বাবুর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহার গৃহের বৃহৎ চৌকির এক পাশে আপনি বসিলেন, এবং আপনার নিকটেই পুত্রবধূকে বসাইলেন। তাহার পর উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে বলিতে লাগিলেন—"মা, তুমি লক্ষ্মীর প্রতিমা। দেবতার শাপে নিম্ন জাতির ঘরে জন্মেছ। আমি আগে ত তোমাকে জান্‌তে পারি নাই, তাই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি। তোমার কিসের অপরাধ? অপরাধ ত আমার। আমি সেজন্য সাজাও পেয়েছি। এই এক বৎসর পুত্রের মুখ না দেখে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করেছি, তা কেমন করে বলব?"

অশ্রুতে রামরতন বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সরোজিনী নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি শশধরকে মানুষ করিয়াছিল। সে গৃহিণীর সঙ্গে আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। এখন গৃহিণীকে কহিল—

"ওগো, এই তোমার বেটার বউ? আহা মরে যাই, এ যেন মা দুর্গা আবার ফিরে এসেছেন। এমন বউকে ছোট জেতের মেয়ে বলে তুচ্ছ করেছ? চেয়ে দেখ, সোণার প্রতিমা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আর এ বউকে পায়ে ঠেলো না; কাছে গিয়ে আদর করে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস।"

পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিতা মাতার প্রাণে আজ কি ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহা কে বলিবে? তিনি বধূর নিকটে গিয়া অঞ্চলের দ্বারা তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। সরোজিনী বুঝিতে পারিল, এই বর্ষীয়সী রমণীই তাঁহার শাশুড়ী। সে শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। গৃহিণী পুত্রবধূর হাত ধরিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং স্নেহের অমৃতরস তাহার হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন। মাতৃহীনা সরোজিনী আজ মাতার স্নেহ পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ রামরতন বাবুর হৃদয় খুলিয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ংই বাজারে গেলেন। উত্তম মৎস্য, তরকারি ও দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিলেন। শাশুড়ী নিজেই রান্নাঘর দখল করিয়া নানা তরকারি ও মিষ্টান্ন রাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্রবধূকে পাইয়া মনে হইল, এক বৎসর পরে প্রাণের সন্তানকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। আজ যে তিনি কোন্ সামগ্রী আহার করাইয়া কোন্ কথা বলিয়া বধূকে সুখী করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক্‌ই করিতে পারিতেছেন না।

খাবার সময় সরোজিনী শাশুড়ীকে কহিল—"মা, আমাকে ভিন্ন জায়গায় খেতে দিন। আমি আপনার রান্নাঘরে যাব না। আমার জন্য সমাজে আপনাদের নির্য্যাতন সহ্য করতে হলে বড় কষ্ট হবে।"

শাশুড়ী। ও মা! সে কি কথা? তোমাকে আলাদা ঘরে খেতে দিব? তা কি কখনো হয়? সকলে যে ঘরে বসে খায়, আমি নিজেই তোমাকে নিয়ে সেই ঘরে বসে খাব।

সরোজিনী আপনার মায়ামন্ত্রে বাড়ীর ছেলে মেয়ে চাকর চাকরাণী সবাইকেই বশ করিয়া ফেলিল। পাড়ার মেয়েরা দলে দলে আসিয়া বউকে দেখিতে লাগিল। বধূর সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সকলেই বলিতে লাগিল—

"মাগো মা, লোকেরা এমন মিছে কথাও বানায়ে বল্‌তে পারে? বৌ নাকি ছোট লোকের ঘরের মেয়ে? অমন মেয়ে যদি ছোট লোকের ঘরেই জন্মিল, তবে আর ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের দরকার কি? সত্যি বলছি, এমন দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে সহরে ত কারো ঘরে দেখতে পাইনে। এমন বিদ্যেই বা আর কোন মেয়ের আছে?"

সরোজিনী যে দিন কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, সেদিন শাশুড়ী হাসিয়া কহিলেন—"মা, তুমি নিশ্চয়ই কোন যাদুকরের মেয়ে। নইলে এই কয়দিনের ভিতর কেমন করে আমাদের বশ করলে? আজ যে তোমাকে বিদায় দিতে চোখে জল আসছে!"

সরোজিনী। আপনার ছেলে কলকাতায় এলেই আমি তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিব।

শাশুড়ী। এখন ত আর শুধু ছেলে এলে সুখী হতে পারব না। মা, তোমাকে যে সেই সঙ্গে আসতে হবে।

বিদায়ের সময় শ্বশুর কহিলেন—"মা, অপরাধ যখন মাপ করেছ, তখন আর ভুলে যেয়ো না। সুবিধা হলেই শশধরের সঙ্গে এখানে এস।"

সরোজিনী। শুধু আমরাই আসব কেন? আপনি বুঝি আমাদের কাছে যাবেন না? তা হবে না। সামনের ছুটিতেই মাকে সঙ্গে করে কলকাতায় যেতে হবে।

ইহার পর সরোজিনী অতিশয় গম্ভীর ভাবে শ্বশুরকে কহিল—"আপনার ছেলে আজ সিবিলিয়ান হয়ে এলে এই জেলারই গৌরব বৃদ্ধি হতো; আপনারও আনন্দের সীমা থাকৃত না;—সে কথা আমি জানি। যেমন করেই হোক, নিশ্চয়ই তাঁকে বিলাত পাঠাতে হবে।"

রামরতন বাবু কহিলেন—"মা, তুমি ইচ্ছা করলেই তা পার, তোমার সে শক্তি আছে।"

রামরতন বাবু কি ভাবিয়া এ কথা বলিলেন? হয় ত মনে করিলেন, বধূর পিতা বড় চাকুরী করিতেন, তাঁহার যথেষ্ট অর্থ আছে। বউ সে টাকায়ই স্বামীকে বিলাত পাঠাইবে।

সরোজিনী কলিকাতায় পৌঁছিল। শশধর সমস্ত সংবাদ শুনিয়া আর দার্জ্জিলিং থাকিতে পারিল না। বরাবর যশোর গিয়া পিতা মাতার সঙ্গে দেখা করিল। শশধর বিবাহের পর আজই আপনাকে যথার্থ সুখী মনে করিল। সঙ্গে সঙ্গে মনস্বিনী পত্নীর মহত্বের কথা চিন্তা করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল।

শশধর কলিকাতায় আসিয়া সরোজিনীকে কহিল—"তুমি দেবী। তোমার চরণ স্পর্শ করতে ইচ্ছা হয়।"

সরোজিনী আর কি বলিবে? সে শুধু মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে ঈশ্বর, আমি যেন আমার স্বামীর সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে পারি।"

কিছুদিন পরেই সরোজিনী স্বামীকে বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। শশধর কহিল—

"তুমি কি ক্ষেপেছ? বিলাতের খরচ কে দিবে?

সরোজিনী। খরচের জন্য ভেব না, সে হয়ে যাবে।

শশধর। কেমন করে হবে?

সরোজিনী একখানি চিঠি দেখাইয়া কহিল—"পূর্ব্ববঙ্গের একটী স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি ছিল। আমি বিজ্ঞাপন দেখেই কাজটির জন্য দরখাস্ত করেছিলেম। এই দেখ দেড়শত টাকা বেতনের কর্ম্মটি আমি পেয়েছি। তোমাকে প্রতিমাসে ১২৫৲ টাকা পাঠালেই তোমার বিলাতের খরচ চলে যাবে।"

শশধর। তুমি পরিশ্রম করে টাকা উপার্জ্জন করবে, সেই টাকায় আমি বিলাত যাব?

সরোজিনী। কেন, তাতে দোষ কি? লোকেরা স্ত্রীর বাপের ঘাড় মুচড়ে টাকা আদায় করে বিলাত যায়, আর তুমি স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থে বিলাত যেতে পারবে না? যারা মেয়েদের দুর্ব্বল নারীজাতি বলে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা দরকার হলে স্ত্রীর গহনা বিক্রী করবেন, কিন্তু স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করতেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগে! তুমি ত সে দলের লোক নও?

শশধর। তোমার সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে? আচ্ছা, ধরে নেও, তোমার টাকায় আমার বিলাতের খরচ চলে যাবে। কিন্তু বিলাত যাবার পাথেয় কে দিবে?

সরোজিনী। আমার সোণার গয়না গুলি ত মরচে ধরবার জন্য অনর্থক বাক্সে পড়ে আছে। আমি কোন দিনই বিলাসিনী সাজ্‌তে চাই নে। তোমার বিলাত যাবার সুযোগে ওগুলির সদ্ব্যবহার করা যা'ক।

শশধর। তুমি যে কি বল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে

পারি নে। যা হবার নয় তা বলে আমার মনে কষ্ট দেওয়ায় কি কিছু লাভ আছে?

সরোজিনী জানিত, শশধর বিলাত না গেলে শ্বশুর কিছুতেই সুখী হইতে পারিবেন না। শ্বশুর সুখী না হইলে স্বামীরও মনের দুঃখ দূর হইবে না। স্বামীর মনে দুঃখ থাকিলে তাহারই বা সুখ কি? তাই বুদ্ধিমতী সরোজিনী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজের গহনা বিক্রী করিয়াই স্বামীকে বিলাত পাঠাইয়া দিল। তাহা ছাড়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া প্রতি মাসে স্বামীর নিকট টাকা পাঠাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক। রমণীর শরীরে এ পরিশ্রম সহ্য হইবার নহে। তদ্ভিন্ন সরোজিনী পঞ্জাবে এবং যুক্ত প্রদেশে বাস করিয়াছে; সেজন্য পূর্ব্ববঙ্গের আর্দ্র বায়ু তাহার সহ্য হইল না। প্রায়ই অসুখ হইতে লাগিল। কিন্তু অসুখকে গ্রাহ্য করে কে? সরোজিনীর যাহা করিবার, তাহা সে করিবেই; কেহই তাহার সংকল্পে বাধা দিতে পারে না।

এক বৎসর পরেই সরোজিনীর একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা ছুটি লইয়া পশ্চিমে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ছুটি লইলে চলে কই? শশধরের টাকার কি বন্দোবস্ত হইবে?

ইহার পর শশধর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাঁহার পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রবধূর অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সরোজিনীর শরীর যে কতখানি ভাঙ্গিয়াছে, সে খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিল না। সরোজিনী তাহার রোগের কথা কাহাকেও জানাইত না।

অবশেষে শশধর একটি জেলার এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু হায়, তখন সরোজিনীর কি রকম অবস্থা? দুরন্ত রোগ তাহার সুন্দর চেহারাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যু তাহার দুই নির্দ্দয় হস্ত বাড়াইয়া সরোজিনীর জীবন-কুসুম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। শশধর সরোজিনীকে দেখিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—

"তুমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে যাবে; সেই জন্যই বুঝি ছলনা করে আমাকে বিলাত পাঠিয়েছিলে? তুমি ত তোমার পুণ্যগৌরবে স্বর্গে চলে যাচ্ছ, আমি কি করে এই দুঃখময় জীবন বহন করব?"

সরোজিনী। মর্ত্ত্যের মিলন দুদিনের; অনন্ত মিলন স্বর্গে। অর্থের দ্বারা দুঃখী নরনারীর দুঃখ দূর করে স্বর্গে এস, আবার তোমাতে আমাতে মিলন হবে। সে মিলনের মধ্যে কেহ আর বিচ্ছেদ-রেখা অঙ্কিত করতে পারিবে না।

এই সরোজিনীর শেষ কথা। আর সেই বীণানিন্দিত কণ্ঠের অমৃতময়ী বাণী কেহ শুনিতে পাইল না। মৃত্যু নিকট জানিয়া সরোজনী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিল। সেই ধ্যানের অবস্থায়ই তাহার আত্মা দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দলোকে চলিয়া গেল।

ডাক্তারের এই রোগীর প্রতি আশ্চর্য্য স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়া উঠিলেন—

"আর কি, সকলই শেষ হইয়া গেল!"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

অধুনা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার প্রকোপ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে এ বিষয়ের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় কলিকাতাবাসী শতকরা ৯৯ জন এই দুই রোগে কষ্ট পাইতেছেন।

অসভ্য বর্ব্বর জাতির ভিতর এই দুই রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে এই দুই ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা যে কত রোগের মূল তাহা বলা

যায় না। অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ যক্ষ্মা রোগ অতি দ্রুত-গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই রোগ নিবারণ-কল্পে আমাদের যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার মধ্যে অজীর্ণতা দমন একটী প্রধান উপায়।

খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক না হওয়াই অজীর্ণতা। মনুষ্যের সমস্ত শক্তি খাদ্য হইতে উদ্ভূত। পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য রূপান্তরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শরীরের পুষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহাতে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিলে যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শরীর পুষ্ট হয় না।

মুখ-বিবর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্রমধ্যে যাইয়া পরিপাক ক্রিয়ায় সমাপ্তি হয়। মুখমধ্যে দন্ত দ্বারা পেষিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য অতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে পাক রসের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই কারণে অনেক সময় দন্ত রোগের ফল অজীর্ণতা। মুখনিঃসৃত লালার দ্বারা শালিজাতীয় খাদ্য শরীরের গ্রহণোপযোগী শর্করা জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। ভীত, কিংবা চিন্তিত অবস্থায় থাকিলে লালার নিস্রাব উত্তমরূপ হয় না। এরূপ অবস্থায় আহার করিলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। পাকস্থলীতে খাদ্যের আমিষ উপাদানের পরিপাক আরম্ভ হয়। অন্ত্রমধ্যে শালি, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। মানসিক উত্তেজনার ফলে পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে নিঃসৃত রসের পরিমাণ কমিয়া যায়। অনিচ্ছায় আহারেও এই ফল হয়। বিখ্যাত রুষিয়ান অধ্যাপক "পলো" পরীক্ষায় প্রমাণিত করিয়াছেন যে কুকুরকে অজ্ঞাতসারে আহার করাইলে মাংসের পরিপাক হয় না, কিন্তু এইরূপ আহার করাইবার পর যদি কুকুরকে মাংস দেখান যায়, তাহা হইলে ভুক্ত মাংসের উত্তম পরিপাক হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পরিপাকের উপর ইচ্ছা শক্তির যে কিরূপ প্রভাব তাহা বুঝা যায়।

পাকযন্ত্র সমূহের কোন একটীর বিকৃতি ঘটিলেই অজীর্ণ রোগ জন্মে। ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ শরীর মধ্যে গৃহীত হইবার পর, অসারভাগ মলে পরিণত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। মলে যে কেবল খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ থাকে তাহা নহে, ইহার সহিত শরীরের ক্ষয় জনিত নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হইয়া যায়। খাদ্যের পচনকালে এমন কতগুলি বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহা আমাদিগকে সহজেই পীড়িত করিতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে আমাদের দেহ এই সকল নানা প্রকার বিষময় পদার্থ দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে। সহজ অবস্থায় খাদ্যের অসার অংশই কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করিয়া থাকে। এই অসারভাগ, অন্ত্রস্থিত মাংসপেশী সমূহকে উত্তেজিত করিয়া, মলত্যাগের বেগ আনয়ন করে। অনেক কারণে অন্ত্রপেশী সমূহের দুর্ব্বলতা হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে শরীরের সকল মাংসপেশীই দুর্ব্বল হয়। এইজন্য অলস ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দেখা যায়। খাদ্যে অসারভাগ না থাকিলে কিংবা রন্ধনের গুণে অসার অংশ অধিক কোমলতা প্রাপ্ত হইলে অন্ত্রপেশীসমূহ উত্তেজিত হয় না। ইহা সুসেব্য-খাদ্য-সেবী ধনীদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ। মাংসের অসার ভাগ অতি অল্প। এজন্য মাংসাহারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দেখা যায়।

অনেকের, প্রত্যহ মলত্যাগ করিলেও কোষ্ঠ সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার হয় না। কিয়দংশ মল থাকিয়া যাওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অজীর্ণ রোগী খাদ্যের সারাংশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ সত্ত্বেও তাঁহার অবস্থা অনাহারী ব্যক্তির সমান। আমাদের চারিদিকে শত শত নর নারী এইরূপ অনাহারে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। লক্ষপতি হইলেও যদি কেহ অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তিনি আহারের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত-লোকের সমান।

অপরপক্ষে কোষ্ঠবদ্ধতার দ্বারা রোগীর শরীর দিন দিন বিষাক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়। সময় সময় শরীরাভ্যন্তরে মল সঞ্চিত থাকার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর প্রশ্বাসে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ—কি কি কারণে এই দুই ব্যাধি আমাদের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, নিম্নে তাহার আলোচনা করা গেল।

অজীর্ণতার কারণ—(১) আমাদের অনেকেই খাইবার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। মফঃস্বল হইতে চাকরী বা ব্যবসায়ের জন্য যাঁহারা প্রতিদিন সহরে যাতায়াত করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কোনরূপে তাড়াতাড়ি দুই চারি গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কর্ম্মস্থলে আসিতে হয়। ইঁহাদের খাদ্য আর চিবান হয় না। গিলিয়াই সকল দ্রব্য উদরসাৎ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় অজীর্ণ রোগ না হওয়াই আশ্চর্য্য। আস্তে আস্তে চিবাইলে, যে কেবল পরিপাকের সহায়তা হয় তাহা নহে ইহাতে অল্পমাত্র খাদ্যে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় এবং অতি ভোজনের কুফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

২) আহারের অব্যবহিত পরেই অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নহে। পরিপাকের সময়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন হওয়া আবশ্যক। এই সময় পরিশ্রম করিলে রক্ত পাকযন্ত্রসমূহে না যাইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ রোগের ইহা একটী প্রধান কারণ। গুরু ভোজনের পর পাঠাভ্যাসে রত হওয়া উচিত নহে।

(৩) আহারের সময়ের সম্বন্ধে একটা বাঁধা নিয়ম থাকা ভাল। কারণ, এইরূপ অভ্যাসের ফলে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে ও পরিপাক উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে। আমাদের দেশে কাজকর্ম্ম-হীন ধনীলোক বেলা একটা বা দুইটার সময় ভোজন করেন, বলা বাহুল্য ইহা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থানুযায়ী ২ হইতে ৪ বার আহার করা উচিত, অবশ্য শিশু ও বালকের কথা স্বতন্ত্র। দিবসের প্রধান আহারের পর ৫ ঘণ্টা ব্যবধান দেওয়া উচিত। রাত্রে আহারের পর আমরা ঘুমের জন্য প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় পাই।

(৪) উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবেও অজীর্ণ রোগ জন্মে। আমরা যদি প্রতিদিন অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল ব্যায়ামে অতিবাহিত করি, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক স্থলেই অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি।

(৫) আহারের সময়ে অধিক পরিমাণ জল পান করা উচিত নহে। ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হইতে পারে। অজীর্ণ রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই আহারের দুই ঘণ্টা কাল পরে জল পান করিয়া থাকেন।

(৬) মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে অনেকেই সংসার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ, সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি নানা কারণে মধ্যবিত্ত সংসারে আমাদের চিন্তায় ও মানসিক উদ্বেগে কালযাপন করিতে হয়। দুশ্চিন্তা, নিরাশা, উদ্বেগ, শোক প্রভৃতি নানা কারণ হইতে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়।

(৭) ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য অজীর্ণ রোগের আর একটী প্রধান হেতু। আজকাল দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি সকল খাদ্য দ্রব্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া দুর্ঘট। পল্লীগ্রামবাসীদের অপেক্ষা সহরবাসীরা অজীর্ণ রোগে এই কারণে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা গেল—

অন্ত্রমধ্যে মল জমিলে খাদ্যের কঠিনভাগ অন্ত্রস্নায়ু-সমূহকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনার ফলে অন্ত্রপেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া মল নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেয়। স্নায়ুমণ্ডলী অথবা পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা হইলে সামান্য উত্তেজনায় কোন ফল হয় না। এ অবস্থায় অন্ত্রমধ্যে অধিক মল না জমিলে, অর্থাৎ উত্তেজনার আধিক্য না হইলে মলত্যাগের বেগ আসে না। এজন্য

প্রত্যহ নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং অসুস্থাবস্থায় এই কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মাইতে পারে। জোলাপ দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং মল নির্গমনের সুবিধা হয়। প্রত্যহ জোলাপ লইলে তাহার উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং এইরূপ স্থলে বিশেষ ফল দর্শায় না। এই কারণেই প্রত্যহ জোলাপসেবীর জোলাপের মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। মল ত্যাগের জন্য যে স্নায়বিক উত্তেজনা আবশ্যক, তাহা যে কেবল অন্ত্র হইতে আইসে এমন নহে, আমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মস্তিষ্ক হইতেও মলত্যাগের আদেশ আসিতে পারে। নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করিলে, আপনিই সেই সময়েই বেগ আইসে। অনেকের ধূম বা চা পান করিলে বেগ আসে। এস্থলে তামাক কিংবা চায়ের যে কোন বিরেচক গুণ আছে, তাহা নহে। ইহা কেবলমাত্র অভ্যাসের ফল। উপযুক্ত পরিমাণ জল পান না করাও কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ। আমরা দিবাভাগে যে জল পান করি তাহার অধিকাংশই মূত্র ও ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া যায় এবং ইহার অতি অল্প ভাগই অন্ত্রমধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে।

অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া জল পান করা অনেক সময় কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিবারণের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। নিদ্রিত অবস্থায় শরীরের অন্যান্য স্থানে জলের আবশ্যক কম বলিয়া অন্ত্র মধ্যে অধিক পরিমাণে জল যাইতে পায় এবং মল নির্গমনের সহায়তা হয়।

নিয়মিত ফল মূল ভোজনে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দূর হয়। ফলের অসারভাগ অধিক বলিয়া, সেই সকল অসার অংশ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অন্ত্রপেশী সমূহকে অধিক উত্তেজিত করে এবং মল নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেয়। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ফল মূল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সহরে অধিক দেখা যায়।

শারীরিক ব্যায়ামের অভাব কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের আর এক প্রধান কারণ। ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক পেশী-সমূহ বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়। উদরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হইলে মল নির্গমনের বিশেষ সুবিধা হয়। যে ব্যায়ামে উদরের পেশীসমূহ বিশেষরূপ সঞ্চালিত হয়, তাহাই কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর বিশেষ উপযোগী। শ্রমজীবী অপেক্ষা, যাঁহাদের অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহারাই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণতার চিকিৎসা রোগীর অবস্থা ভেদে নানা রূপ হইয়া থাকে। আমরা এ বিষয়ের আলোচনা না করিয়া বিনা ঔষধে কি কি উপায় অব-লম্বনে এই দুই রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পাওয়া যায় নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) সকল সময় দাঁত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

(২) খাদ্য তাড়াতাড়ি না গিলিয়া ভালরূপে চিবাইয়া খাইতে হইবে।

(৩) যথাসাধ্য সকল প্রকার তাড়া ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(৪) নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে সিঁড়ি ও পাহাড়ে উঠা, বৈঠক করা প্রভৃতি বিশেষ উপকারী।

(৫) সাদাসিদা আহার করা এবং আহারের মাত্রার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(৬) প্রত্যেক আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। কার্য্যের পর ক্লান্ত হইয়া, অল্পক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া আহার করা উচিত নয়।

(৭) অজীর্ণ রোগীর আহারের সময় জল পান করা উচিত নয়, আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল গ্রহণ করা যাইতে পারে। আহারের অল্প পূর্ব্বে ঠাণ্ডাজল পান করা উচিত নয়। আহারের সময়, অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কখনও বরফ জল পান করা উচিত নয়।

(৮) আহার গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় আহার করা অনুচিত। জ্বর কিংবা অসুখের সময় শরীরের অত্যধিক ক্ষয় হইলে, দুই ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৯) আঁট কাপড় বা পোষাক (যদ্দ্বারা উদরের রক্ত চলাচলের অসুবিধা হয়) পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(১০) আহারের সময় অন্য সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(১১) অতিরিক্ত খাওয়া বা ক্ষুধা না পাইলে খাওয়া উচিত নয়। পেট ভার থাকিলে আহার বন্ধ করিতে হইবে। অজীর্ণ রোগীর কখনও গুরুপাক খাদ্যাদি বেষ্টিত নিমন্ত্রণ স্থলে যাওয়া উচিত নয়।

(১২) চা পান আবশ্যক হইলে, চা মাত্র তিন মিনিট কাল গরম জলে রাখিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। পাকস্থলীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চা'র কিয়ৎপরিমাণ ক্রিয়ার ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। চা পান পরিত্যাগ করিতে পারিলেই উত্তম হয়।

(১৩) রন্ধন-পাত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই পাত্রাদি না ধৌত করিবার জন্য তৈল ঘৃতাদির পচন হয়। এই পচনই অজীর্ণ রোগের প্রধান কারণ।

(১৪) রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে লালা নিস্রাব অধিক হয়, তদ্দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্র মধ্য হইতে অধিক রস নির্গত হয়। অরুচিকর খাদ্য গ্রহণে এই সকল রস নির্গত হয় না ও তজ্জন্য পরিপাকের বিশেষ অসুবিধা হয়।

(১৫) এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পান করা উচিত নয়। দুগ্ধ, ভাত কিম্বা বিস্কুটের সহিত খাওয়া ভাল।

(১৬) প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পাইখানা যাওয়া কর্ত্তব্য।

(১৭) বিরেচক ঔষধাদি ব্যবহার না করাই ভাল। যাঁতা ভাঙা আটার রুটী ও প্রতিদিন নিয়মিত ফল খাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(১৮) বদ্ধমূল কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রে অল্পে অল্পে পেট টেপায় অধিক উপকার দর্শে।

(১৯) পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতার অন্ত্রধৌতি দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(স্বাস্থ্যসমাচার)

খনা।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় খনার অসীম প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। এই নারী জ্যোতিষীর মত অত বড় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

খনা, যখন অনার্য্যদিগের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখিতেছিলেন, সেই সময়, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন পণ্ডিতবর বরাহের পুত্র মিহিরও জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে অনার্য্যদিগের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

রাক্ষসের নিকট খনা ও মিহির দিবস রজনী কায়মনো প্রাণে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, উভয়েরই সমান উৎসাহ, সমান আগ্রহ। না জানি কত অমানিশার নিবিড় অন্ধকার রজনীতে ভীতিপ্রদ অরণ্যে বসিয়া বালিকা খনা ও বালক মিহির আকাশ-মণ্ডলের তারকা-মালার রহস্যভেদ করিতে করিতে গভীর চিন্তামগ্ন হইয়াছেন! কোন্ স্থানে বসিয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ মনুষ্যের প্রতি শুভ ও অশুভ বিধান করিতেছে, সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে তাঁহারা দুই জনে না জানি কত রজনীই অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন। ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু প্রভৃতি নক্ষত্র নির্ণয় করিতে তাঁহারা কতই না উদ্বেগের সহিত কত সুদীর্ঘ সময় যাপন করিয়াছেন। আবার কোন্ গ্রহ কোন্ দিকে ছুটিতেছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্ষু ছুটাইয়া ছুটাইয়া কত দিন কত বারই না জানি সেই দুই জ্ঞান-পিপাসুর চারি চক্ষু অনন্ত গগনের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।

এইরূপ কঠিন হইতে কঠিনতর পরিশ্রমের পর তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে একদিন শুভ মুহূর্ত্তে মিহিরের সহিত খনার বিবাহ হইয়া গেল। মিহির খনাকে সঙ্গে লইয়া দেশে চলিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে মিহির ও খনার মধ্যে খনাই অধিক পারদর্শিনী ছিলেন। একত্র অনেক দিন বাস নিবন্ধন তাঁহাদের প্রতি অনার্য্যদিগের মমতার বাঁধ পড়িয়া

গিয়াছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে যখন মিহির ও খনা বিদায় গ্রহণ করেন, তখন মায়া বশতঃ অনার্য্যগণ তাঁহাদের সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। গ্রামের এক প্রান্ত দিয়া একটি নদী প্রবাহিত ছিল। মিহির ও খনাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে স্নেহের আকর্ষণে অনার্য্যগণ সেই নদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। তথায় একটী আসন্ন প্রসবা গাভী ছিল। তাঁহাদের শিক্ষাগুরু মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রিয় বৎস, এই গাভী মুহূর্ত্ত মধ্যেই বৎস প্রসব করিবে, তুমি বলিতে পার, বৎস কি রঙ্গের হইবে?"

মিহির গণিলেন, কিন্তু তাঁহার গণনা ঠিক হইল না। খনার গণনা ঠিক হইল। সেই সময় গুরু মিহিরকে কতিপয় পুঁথি প্রদান করিয়া বলিলেন, —"বাছা, এখনো তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষা করিতে পার নাই, এই পুঁথি গুলি লইয়া যাও, এগুলির সাহায্যে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।" অনার্য্যগণ সজল নয়নে ফিরিয়া চলিল।

গুরুর প্রদত্ত পুঁথিগুলি মিহির হাতে লইলেন বটে, কিন্তু সে সময় মিহিরের মনের স্থিরতা ছিল না; তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে ভাবিতেছিলেন,—"এত বৎসরের এত শ্রম, এত যত্ন সবই যদি ব্যর্থ হইল, যদি জ্যোতিষ আয়ত্ত নাই হইল, তবে এই কয়খানি পুঁথি লইয়া কি হইবে? এগুলি নদীগর্ভে ফেলিয়া দি।" এই বলিয়া মিহির চিন্তার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পুঁথি গুলি নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন।

খনা তখনও রমণীসুলভ প্রাণে বহু দিনের বাস-ভূমির মনোহারিণী চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শেষ বিদায় লইতেছিলেন। খনা যখন অশ্রু-পাত করিয়া নয়ন ফিরাইলেন, তখন দেখিলেন যে, মিহিরের হাতে পুঁথি নাই। তিনি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "হায়! কি সর্ব্বনাশ করিলে!" তখন পুঁথিগুলি খর স্রোতের তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। প্রবাদ—তখন হইতেই ভূ-গর্ভের জ্যোতিষ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

মিহির গুরুর শেষ পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারেন নাই। মিহিরের শিক্ষায় সর্ব্বদাই গুরুর সন্দেহ ছিল; কিন্তু খনার প্রতি গুরুর অটল বিশ্বাস ছিল। খনার শিক্ষা যে পূর্ণ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

খনা জ্যোতিষে অদ্বিতীয়া ছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় অদৃষ্ট-চক্র ফিরাইতে পারেন নাই। সেইজন্য খনার গৌরবময় জীবন-কাহিনী হৃদয়-বিদারক দুঃখে পরিপূর্ণ!

খনার শ্বশুর পণ্ডিত বরাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। একদা আকাশমণ্ডলে কতগুলি নক্ষত্র আছে, তাহা জানিতে রাজার কৌতূহল জন্মিল। এই আগ্রহের বশীভূত হইয়া মহারাজা পণ্ডিত বরাহকে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে আদেশ করেন। বরাহ প্রমাদ গণিলেন, তিনি আশানুরূপ জ্যোতিষ জানিতেন না; সুতরাং এই তত্ত্ব তাঁহার জ্ঞানের অতীত ছিল।

পণ্ডিত বরাহ বিমর্ষ মনে, মলিন বদনে গৃহে ফিরি-লেন। খনা শ্বশুরের বিষাদমাখা মুখ দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, আজ আপনাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিতেছি কেন?" বরাহ রাজ-সভার কথা সমস্ত বলিলেন। খনা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া মুহূর্ত্ত পরে নক্ষত্র সংখ্যা বলিয়া দিলেন।

বরাহ রাজসভায় উপনীত হইয়া তারকার সংখ্যা বলিয়া দিলেন। মহারাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে তুমি অসংখ্য নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণয় করিলে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া বল।" বরাহ আবার বিপদগ্রস্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া খনার নাম করিলেন। রাজকুলাদর্শ মহারাজ বিক্রমাদিত্য খনার অগাধ বিদ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দশম রত্নের স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিলেন।

এই ঘটনা হইতেই খনার কপাল ভাঙ্গিল, দুঃখের পালা আরম্ভ হইল। পুত্রবধূ রাজসভায় উপস্থিত হইবে, রাজসভায় বসিবে, ইহাতে পণ্ডিত বরাহের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি এই অপমান জনক কার্য্য হইতে বধূকে রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ঠিক করিলেন, খনার জিহ্বা কর্ত্তন

করিলে, তাহার বাক্‌শক্তি নাশ হইবে, তবেই সে রাজসভার অনুপযুক্তা হইবে।

কি ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প! পণ্ডিত বরাহ পুত্রকে এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবার আদেশ দিলেন। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মিহির অস্ত্র হাতে খনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। খনা অদৃষ্টলিপি জানিতেন; সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তিনি প্রস্তুত হইয়া মিহিরের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। খনা পতিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না; আমার অদৃষ্ট আমি অনেকদিন অনেকবার গণনা করিয়া জানিয়াছি; ইহাই আমার ভাগ্যফল, বিধিলিপি এইরূপেই ফলিবে।" এই বলিয়া খনা জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন।

আর মিহির—শোকাভিভূত মিহির অস্ত্রাঘাত করিলেন। তীরবেগে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। সেই রক্তের সহিত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

অদ্যাপি ভারতবর্ষে জ্যোতিষের গৌরব লুপ্ত হয় নাই, পাশ্চাত্য জগত এখনও তাহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। এই সমস্ত গৌরব-কীর্ত্তি খনার কীর্ত্তি-মন্দিরে রাশীকৃত হইতেছে।

মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা।

নীলিমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

এইরূপে সঙ্গহীন, কর্ম্মহীন, নিরানন্দ অলস জীবন যাপন করিতে করিতে ক্রমেই যখন নীলিমা নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতেছিল, উদ্দেশ্যহীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার অধিক স্পৃহণীয় বোধ হইতেছিল,—ঠিক সেই সময়ে একদিন বর্ষার প্রভাতে উপাসনা শেষ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই তাহার কাণে গেল—"মাগো! দুটী ভিক্ষে পাই মা!"—চমকিত হইয়া নীলিমা বলিল—"কে-ও? কচি গলায় কে মা ব'লে ডাকে?"

বাহিরের দ্বারে উঁকি দিয়া ভুতো বলিল—"মা! দুটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ভিক্ষে করতে এয়েচে।"

নীলিমার আদেশে ভুতো তাহাদের উঠানে ডাকিয়া আনিল। বৃষ্টিজলে সিক্তদেহ দুটী বালক বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে নীলিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দিকে চাহিয়া নীলিমার চোখে জল আসিল; সেই শিশু-কণ্ঠের মা বাণী তাহার এতই মধুর লাগিল, একটী মাত্র 'মা' শব্দে এত কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল যে, সে ইতস্ততঃ না করিয়া শিশুটীকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইল।

রাঁধুর মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ওকি মা! কি কল্লে, ওকে ছুঁলে কেন? ও-যে আমাদের পাড়ার ডোমেদের ছেলে।" মেয়েটীর দিকে চাহিয়া বলিল—"কি রে মেনি, আমায় চিনতে পেরেচিস্?" মেয়েটীর সঙ্গে ছেলেটীও ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হ্যাঁ।"

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এদের চেন রাঁধুর মা?"

রাঁধুর মা বলিল—"খুব চিনি, আহা! ওদের মা নেই, বাপ ভারি বুড়ো, কোন কাজ করতে পারে না, সৎমা বড় দজ্জাল, ওরা ভিক্ষে করে না নিয়ে গেলে খেতে দেয় না, বাড়ী থেকে মেরে তাড়িয়ে দেয়, একটু দুঃখ দরদ করে না। মাগীর নিজের তিনটে মেয়ে আছে, তাদের কোথাও যেতে দেয় না।"

নীলিমার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটী বলিল—"আমার নাম মেনি, আর এই ভাইটীর নাম ফেণী, আগে আমি একলাই ভিক্ষে করতুম, এখন মা আমাদের দুজনকেই পাঠিয়ে দেয়। কাল সারাদিন ভারি জল হয়েছিল তাই বিষ্টিতে ভিজ্‌তে হবে বলে, নলেদের গাছতলা থেকে গোটাকতক জামরুল কুড়িয়ে খেয়ে, ভাই বোনে ভিক্ষে করতে না গিয়ে ঘরের পেছনে বেড়ার পাশে লুকিয়ে ছিনু। সন্দেব্যালা মা আমাদের দেক্‌তে পেয়ে খুব মাল্লে আর অনেক রাত্তিরে দিদিদের পাতের ভাত দুটী দুটী খেতে দিলে। তাই আজ সকালে উটেই দুজনে ভিক্ষে করতে বেরিয়েচি।"

শুনিতে শুনিতে নীলিমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, তাহার চার

বছরের ছোট ভাইটী ঠিক এত বড়ই ছিল। এমনি বর্ষার দিনে পাছে বাহিরে গিয়া বৃষ্টির জল গায়ে লাগায়, তাই মা তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতেন, মায়ের কোলে বসিয়া সে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিয়া হাততালি দিত, বিদ্যুৎ চমকিলে আনন্দে চীৎকার করিত, মেঘের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইত। একে একে আরও কত কথা নীলিমার মনে পড়িল, নীলিমা বুঝিল—যার মা নাই পৃথিবীতে তার যত্নের লোক নাই, মাতৃহীনের সঙ্গে আর কোন হতভাগ্যেরই তুলনা হয় না।

অশ্রুভরা চোখে ছেলে মেয়ে দুটীকে ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া নীলিমা বলিল —"রাধুর মা তোমার রান্না ত হয়ে গেছে, আমার কাছে এদের দু'ভাই বোনকেও ভাত দাও, আমরা তিনজনে এক সঙ্গে খাই।"

রাধুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "মা, নাইলে না?"

নীলিমা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আজ শরীরটা বড় ভাল নাই।"

ভাতের থালায় হাত দিয়া এক গ্রাস মুখে তুলিয়া নীলিমা মেয়েটীকে বলিল—"খাও মা খাও; এই দেখ আমি খাচ্ছি, ভয় কি তোমার? এখানে কেউ তোমায় কিছু বলবে না।"

সাহস পাইয়া মেয়েটীর সঙ্গে ছেলেটীও ঘি মাখা গরম ভাত সানন্দে মুখে তুলিল।

নীলিমার কার্য্যে সঙ্কুচিত হইয়া রাধুর মা বলিল— "নিদেন কাপড় খানা ছেড়ে ফেললে হ'ত না মা?"

নীলিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, —"কাপড়খানা ছেড়ে ফেলতে পারি রাধুর মা, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে রক্তের সম্বন্ধ আছে সেটা ত ছাড়তে পারি না। জগত-পিতার বিশ্বরাজ্যে সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মার যে একটা কুটুম্বিতা আছে তা যে ভুলতে পারি না। বাহিরে শুনতে ওরা আমার পর কিন্তু একই হাতে গড়া, আমরা একই মায়ের ছেলে মেয়ে যে, ছোঁবনা ছোঁবনা করে দূরে দূরে থাকতে গেলে নিজেদেরই যে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়; তাতে শুধু মা'র প্রাণে বেদনা দেওয়া নয়, নিজেদেরও বেদনা পেতে হয়।"

রাধুর মা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, বলচ তা একরকম ঠিক বটে, তবে কিনা—তবে কিনা"—

নিজের পাতের কাছে রেকাবিতে দুটী বড় ল্যাংড়া আম খোসা ছাড়াইয়া ফেণী মেনির পাতে খোসা শুদ্ধ দুটী দুটী ছোট দেশী আম দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া ল্যাংড়া আম দুটী দুই ভাই বোনের পাতে তুলিয়া দিতে দিতে নীলিমা বলিল—"ওই তবে কিনাটী অন্তর থেকে যায় না বলেই আমরা কেউ কারও আপনার হ'তে পারি না, নিজেদের ত্রিশ কোটি ভাই বোনকে ত্রিশ কোটি ভাগে ভাগ করে দিয়ে দুঃখ দুর্দ্দশায় হায় হায় করে মরি, শেষে সহস্র চেষ্টায় আর একটী মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তরের সহিত 'এক' হতে পারি না।"

অনর্থকবোধে রাধুর মা আর কিছু না বলিয়া, নিঃশব্দে আরও দুটী আম তাহার পাতের কাছে আনিয়া দিল। নীলিমা তাহার একটা খাইয়া আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া পড়িল।

নীলিমা উঠিতেই রাধুর মা তাহার স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া দেওয়ালের দিকে যথাসম্ভব সরিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা তাহার দাঁড়াইবার ধরণ দেখিয়া সহাস্যে বলিল— "ভয় নাই রাধুর মা, আমি তোমায় ছোঁবনা, নিজের জাতের মাথা ত খেয়েইছি, এখন আর গঙ্গাস্নান করলেও শুদ্ধ হব না; আবার তুমি স্নান আহ্নিক সেরে দাঁড়িয়ে আছ, তোমায় ছুঁয়ে কেন এই বর্ষার দিনে ফের নাওয়াব বল?"

রাধুর মা অপ্রতিভ হইয়া—"না, না, তা নয়, তা নয়, বৃষ্টির জলটা গায়ে ছিট্‌কে আসবে তাই"—বলিতে বলিতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া মসলার ডিবাটী আনিয়া আলগোছে তাহা নীলিমার হাতে দিয়া গেল।

সমস্ত দিন অনবরত বৃষ্টি হইতে লাগিল দেখিয়া, জলে ভিজিয়া ফেণী মেনিকে বাড়ী যাইতে না দিয়া, বৈকালে বৃষ্টি ছাড়িয়া আকাশ একটু পরিষ্কার হইলে, দুধ ও খাবার খাওয়াইয়া ভিক্ষা স্বরূপ কিছু পয়সা দিয়া নীলিমা তাহাদের বাড়ী যাইতে দিল। বলিয়া দিল— "রোজ দু ভাই বোনে একবার করে এসো।"

সন্ধ্যার পরই আবার বৃষ্টি আসিল। রাধুর মা ও ভুতো আজ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া বাড়ী গেল। বৃদ্ধ যোগার আজ বর্ষার হাওয়ায় কম্প ধরিয়াছিল, সে নীলিমাকে শয়ন করিতে বলিয়া বালাপোষ মুড়ি দিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল।

নীলিমা বাতি নিবাইয়া অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। শীতল বাতাসে প্রফুল্ল যুঁই রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ মধুর সৌরভ, তাহার প্রিয় সখী জ্যোৎস্নারাণীর অন্বেষণে আজ ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্লান্ত দেহে নীলিমার অবিন্যস্ত কুন্তল মাঝে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। বারান্দার দিকের খোলা জানালা দিয়া দারুণ অন্ধকারকে পরাস্ত করিয়া বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে তাহার ঘরে আসিতে লাগিল, বারি-কণাবাহী বর্ষা-বায়ু জামা, কাপড়, বিছানা, বালিস, সমস্ত ঠাণ্ডা কন্‌কনে করিয়া দিল। অবিরাম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামগ্ন নীলিমাকে চকিত করিয়া মেঘ মধ্যে মধ্যে ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল; বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিলে মনে হইতে লাগিল, বৃষ্টি বুঝি বা আজ সৃষ্টি নাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছে, আজ বর্ষার সে ভৈরব হর্ষের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া মনের আনন্দে বর্ষামঙ্গল গাহিতে ইচ্ছা হইতেছিল না বরং সভয়ে সকলে ভাবিতেছিল—আজ ভিজে গেল, ভেসে গেল, ডুবে গেল ধরাখান।

দ্বারের বাহির হইতে যোগা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিল—"দিদিমণি ঘুমিয়েছ?" কিন্তু চারিদিকের অবিরাম ধ্বনিতে বৃদ্ধের ক্ষীণস্বর নীলিমার কর্ণে পৌঁছিল না। যোগা ভাবিল তবে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েচে। বালাপোষের ভিতর নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া মুখে ঘন ঘন "জয়রাম শ্রীরাম" "জয়রাম শ্রীরাম" উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ এক স্থানে এক ভাবে থাকিবার পর নীলিমা দরজা খুলিয়া বৃষ্টির শব্দ শুনিতে শুনিতে বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল, তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া আবার আসিয়া সেই চেয়ারে নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

বর্ষণ শেষে মেঘ যখন ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া গেল, চঞ্চলা সৌদামিনী শান্ত ও আকাশ স্তব্ধ হইল, নীলিমা তখন বাতিটা আলাইয়া ঘড়িতে দেখিল রাত্রি চারিটা। আর শয্যায় না গিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইতে গেল।

(৬)

ভোরে করুণাময় শয়ন ঘরের বাহিরে আসিতেই নীলিমা নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল—"দাদা, আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

করুণাময় হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"একি! নীলিমা যে! তুমি কখন এলে?"

পশ্চাৎ হইতে যোগা বলিল—"এই মাত্তর এসে দাঁড়িয়েচেন, জানিনা দিদিমণির মাথায় কি খেয়াল চেপেচে, ভোর না হতেই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে এখানে সঙ্গে করে আনতে বললেন।"

করুণাময় হাসিয়া বলিলেন—"তা বেশ, কথাটা কি শুনি? না শুনেই ত আমার ভয় হচ্চে কি জানি কি কথা, রাখতে পারব কি না।" নীলিমা দৃঢ়স্বরে বলিল—"না দাদা তা হবে না, সে কথা আপনাকে রাখতেই হবে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, আপনি নিশ্চয় পারবেন।"

করুণাময় সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বেশ ত, তা যদি হয় রাখব, সে জন্য আর চিন্তা কি?"

দেখিয়া শুনিয়া চপলা ভাবিলেন—"এ আবার কি নূতন ঢঙ! দেখে আর বাঁচিনা!"

বৌদিদির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নীলিমা প্রণাম করিয়া বলিল—"কি বৌদি, ভাল আছ ত?

চপলা একটু পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"থাক্ থাক্। ভাল আর কি, অমনি আছি এক রকম। তা এত সকালে যে?"

নীলিমা সহাস্য মুখে বলিল—"একদিন মনে করে ছোট ননদকে ত আর আনতে পাঠাও না, দেখতেও যাওনা, তাই নিজেই দেখে এলুম। রোজ নিজের ঘরে চুপ করে পড়ে থাকি, আজ আমার সোণা-

মাণিকদের সঙ্গে, তোমার সঙ্গে আর দাদার সঙ্গে সমস্ত দিন ধরে খুব কথা কয়ে মনটা হালকা করে যাব; ও বেলা এলে ত বেশীক্ষণ থাকতে পাব না, তাই ভোর না হতেই চলে এসেছি।"

চপলা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন—"তা বলতে পার বটে, দু বছর নতুন বাড়ীতে গেছ, একবারও আনতে পারিনি, অভিমান ত হবারই কথা। কি করি ভাই, ছেলে মেয়েদের রোগ টোগ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, মরবার সময় পাই না, তোমায় আনিই বা কবে, দেখতেই বা যাই কি করে। তা এসেছ না হয় দুদিন থাকলে, আজই যেতে হবে তার মানে কি।"

নীলিমা কেবল একটু হাসিল, কিছু বলিল না। করুণাময় দেখিলেন, বাক্য-কৌশলে তাঁহার স্ত্রীর অদ্ভুত নিপুণতা আছে। তাঁহার মনে পড়িল, গত দুই বৎসরের মধ্যে চপলা পুত্রকন্যা সঙ্গে লইয়া পাঁচ ছয় বার থিয়েটার ও দুইবার সার্কাস দেখিতে গিয়াছে এবং চার পাঁচবার সই অডিকলম দিলখোস্‌ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিয়াছে। ছেলে মেয়েদের রোগ টোগ নীলিমার সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত আর কোন আমোদেই বাধা দিতে পারে নাই।

করুণাময় বাহিরে গেলে নীলিমা চপলার সহিত তাহার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া খাটের মশারি উঠাইয়া তাহার সোণা মাণিকদের দেখিতে গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ খুলিতেই পিসিমার হাসিমুখ দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, আনন্দে কোলাহল করিয়া তিনটীতে নীলিমার কণ্ঠালিঙ্গন করিল, বড় মেয়েটী পাশে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কখন এলে পিসিমা?"

* * * * * * *

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম না করিয়া করুণাময় নীলিমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"এইবার বল নীলিমা, শুনি তোমার কথাটা কি?"

নীলিমা করুণাময়ের বসিবার কক্ষে চলিয়া গেল, কথাটা কি জানিবার জন্য চপলার বড়ই কৌতূহল জন্মিল, জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে ডাকিলেন—"ও খোকা, লক্ষ্মী ছেলে, শোন ত বাবা।"

খোকা আসিয়া, তাহার বাবা ও পিসিমার কি কথা হইতেছে অন্তরাল হইতে শুনিয়া মাকে বলিবার আদেশ পাইয়া চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া—"মা, পিসিমা বাবাকে কাদের ঘর ভাঙ্গতে বলচে, আর কি টাকা দেবে বলচে, আমি বুঝতে পারলুম না, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পারিনা মা,—" বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া পলাইল। (ক্রমশঃ)

প্রয়াগ প্রবাসিনী।

পৃথিবী।

পৃথিবীর জন্মকথা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, জলন্ত বাষ্পময় সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র ও পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইয়োরোপে এই মত প্রচারিত হইবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থে উহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি গ্রন্থে আছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। * মনু নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—বায়ুর বিকৃতি হইতে দীপ্তিমান্‌ তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং কালক্রমে জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা-হইলে দেখা যাইতেছে পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার খুব সাদৃশ্য আছে।

পৃথিবী কিরূপে ক্রমে ক্রমে বাষ্পীয় অবস্থা হইতে মনুষ্য বাসের উপযোগী হইয়াছে তাহা রূপক দ্বারা অতি

* আকাশাৎ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে (শ্রুতি)

সুন্দররূপে আমাদের পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক মতে জীব ইতিহাসের ১ম মৎস্য যুগ, ২য় সরীসৃপ যুগ, ৩য় স্তন্যপায়ী যুগ, ৪র্থ মনুষ্যযুগ। পুরাণেও লিখিত আছে, পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল, সেই সময়ে মৎস্যই একমাত্র জীব পৃথিবীতে বাস করিত। দ্বিতীয় যুগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কূর্ম্মের আবির্ভাব হইল। আধুনিক মতে পৃথিবীতে তখন "প্লিসিও সোরস্" ও "ইক্‌থিয় সোরস্" প্রভৃতি বিরাট সরীসৃপের বাস ছিল। তৃতীয় যুগে বরাহ প্রভৃতি স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তুগণের আবির্ভাব। সর্ব্বশেষে মনুষ্যযুগ। মনুষ্য প্রথমে নিকৃষ্টাকার ছিল। তাই সেই সময়ের জীব ঠিক্ মনুষ্যও নয় আবার পশুও নয়, উভয়ের মাঝামাঝি—নৃসিংহ। তারপর বামনরূপী মানবের আবির্ভাব। ভগবানই সকলের স্রষ্টা, সকল জীবের দেহে তিনি আত্মারূপে বিরাজিত সুতরাং তিনিই জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন. ইহাতো যথার্থ কথাই।

পৃথিবীতে আমরা বাস করি সুতরাং উহার বিষয় অনেক কথাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের অন্যান্য গ্রহদের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

পৃথিবী গোলাকার।

পৃথিবী যদি গোল হইবে তবে উহাকে দর্পণের ন্যায় সমতল দেখায় কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ ইহারও যথার্থ মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'পৃথিবীর আয়তনের পক্ষে মানুষ অতি ক্ষুদ্র, এই জন্য বাস্তবিক পৃথিবী গোলাকার হইলেও ইহা চক্রাকার সমতলক্ষেত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।' (১)

'পৃথিবী 'বলের' ন্যায় ঠিক গোল নয়, উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কমলালেবুর ন্যায় কিঞ্চিৎ চাপা।' (২)

পৃথিবী যদি সমতল না হইয়া গোলাকার হয় তবে উহার নিম্নদিকস্থ জীব জন্তু স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—'পৃথিবী গোলাকার ও আকাশে স্থিত। সুতরাং উহার ঊর্দ্ধই বা কোথায় আর অধঃই বা কোথায়? ভূমণ্ডলে সকলেই স্ব স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করে।' (৩) এই বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য নামক সুবিখ্যাত পণ্ডিত আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন—'পৃথিবীর যেখানে যে ব্যক্তি থাকে, সে সেই স্থানে থাকিয়াই ধরাতলকে স্বীয় পদতলস্থ এবং আপনাকে উহার উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই ধরামণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও যেন বক্রভাবে আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহারা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত ভাগে বাস করে জলাশয়-তীরস্থ মনুষ্যের মূর্ত্তি যেমন জলে উল্টা অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে দেখা যায় তাহাদিগকেও আমরা সেইরূপ দণ্ডায়মান বোধ করি। বাস্তবিক ইহা ভ্রম মাত্র। এস্থানে আমরা যেমন আছি তাহারাও সেইরূপ আছে।' (৪)

সূর্য্য, চন্দ্র এবং বুধ, শুক্র, মঙ্গলাদি গ্রহ যে গোল তাহা দূরবীক্ষণ দিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবী যে গোল উহার পৃষ্ঠে থাকিয়া তাহা বোধ হয় না, বরং পৃথিবী সমতল বলিয়াই ধারণা হইয়া থাকে। আকাশের যখন সকল জ্যোতিষ্কই গোল তখন পৃথিবীকেও গোল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইত না। কিন্তু পণ্ডিতেরা কোন অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে হিন্দুরা পূর্ব্বে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু বহু প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবী গোলাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু

---

(১) অল্পকায় তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতো মুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তমপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২) কপিত্থ ফলবৎ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।
নক্ষত্র কল্প।

(৩) সর্ব্বত্রৈব মহী গোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যন্তে যে যতো গোলং তস্য কোর্দ্ধং কবাপ্যধঃ ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(৪) যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থামাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
সমন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি ॥
অধঃ শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়া মনুষ্যাইব নীর তীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ংযথার্থ ॥

জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন যে পৃথিবী 'আমলকীর ন্যায় গোলাকার, কদম্ব ফুলের পিণ্ডের চারিদিকে যেমন কেশর তেমনি পৃথিবীর চারি দিকে গ্রাম, পর্ব্বত, বৃক্ষলতাদি এবং প্রাণিগণ অবস্থিত'. * সুতরাং পৃথিবী যে গোলাকার তাহা তাহারা অবগত ছিলেন।

কোন কোন পুরাণে পৃথিবী সমতল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য সেই ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'যদি পৃথিবী দর্পণাদির ন্যায় সমতল হইত তাহা হইলে উহার বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য সর্ব্বদা মনুষ্যের দৃষ্টি গোচর হইত। অর্থাৎ তাহা হইলে কখনই দিবারাত্রি হইত না।' (§) আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—'পৃথিবী যদি গোল না হইবে তবে তাল প্রভৃতি অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? (†)

পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, পৃথিবী হস্তীর স্কন্ধে, হস্তী কচ্ছপের পিঠে, কচ্ছপ অনন্ত নাগের মাথায় অবস্থিত। পৃথিবী আশ্রয়হীন হইয়া কিরূপে শূন্যে অবস্থিতি করিবে তাহা ঐ সকল পুরাণকার ধারণা করিতে না পারিয়া এইরূপ আশ্রয় কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। পণ্ডিত-বর ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'পৃথিবীকে ধারণের জন্য যদি জানোয়ারের মত মূর্ত্তিমান আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তবে একটীর পর একটী করিয়া অনেক আশ্রয় কল্পনা করিতে হইবে কিন্তু শেষের আশ্রয়টীকে নিজের শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতে হইবে। যদি তাই করিতে হয়, তবে মনে কর না কেন যে পৃথিবীই আপন শক্তিতে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে।' * ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবগত ছিলেন যে পৃথিবী মূর্ত্তিমান আশ্রয়হীন হইয়া নিজ শক্তিতে শূন্যে বিরাজ করিতেছে।

পৃথিবী সচলা।

আমরা দেখি যেন সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীরই পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গতি আছে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রত্যহ একবার আবর্ত্তন করে. তাহাতেই সূর্য্যের গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সত্যও প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণ অবগত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—'পৃথিবী সচলা কিন্তু স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।'(§) তিনি অন্য স্থানে আরও পরিষ্কার করিয়া পৃথিবীর গতির কথা বলিয়াছেন—'খুব প্রবল বেগে নৌকা চলিতে থাকিলে আরোহীদিগের নিকটে তীরের গাছ সকল বিপরীত দিকে ছুটিতেছে বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীও তেমনি প্রবল বেগে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আমরা ইহার গতি অনুভব করিতে পারি না।'

ঋতুপরিবর্ত্তন।

ঋতু প্রধানতঃ দুইটী। শীত ও গ্রীষ্ম। অন্যান্য ঋতু-গুলি ইহাদেরই মাঝামাঝি। শৈত্য ও তাপের তারতম্য অনুসারে আমরা ঋতুর বিভাগ করিয়াছি। গ্রীষ্ম কালের প্রখর উত্তাপে অধিকতর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, এই জন্য গ্রীষ্মের পরই সেই জল বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; তখন বর্ষাকাল! বর্ষার শেষ শরৎ, শীতের প্রারম্ভ ভাগ হেমন্ত। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যকাল বসন্ত।

(*) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতা রাম গ্রাম চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ
কদম্ব কেশর গ্রন্থিঃ কেশর প্রসবৈরিব॥
সূর্য্য সিদ্ধান্ত; গোলাধ্যায়।

(§) যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা ভগবতীতরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোপি পরিভ্রমণ্ কিমুনরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥
গোলাধ্যায়।

(†) সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তাল নিভাবহুচ্ছ্রায়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টি গোচরং নুরহো যান্তি সুদূর সংস্থিতাঃ॥
লল্লাচার্য্য।

* মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যা স্তদন্যস্ত স্যাপ্যন্যোহ স্যৈবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যেকল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিংনোভূমিঃ সাষ্ট মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥

§ চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।

সূর্য্যের কিরণের ইতর বিশেষ হয় বলিয়া ঋতুভেদ হইয়া থাকে।

পৃথিবী ঠিক গোল নয়, উহার দুই প্রান্ত কমলালেবুর ন্যায় চাপা।

দিবা ও রাত্রি।

পৃথিবী ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরে। উহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কহে। পৃথিবী গোল বলিয়া উহার সকল দিকে একেবারে সূর্য্যের আলোক পড়ে না। যখন যে ভাগ আলোকিত হয় তখন সেই ভাগে দিবা; আর অন্ধকার-ময় ভাগে রাত্রি থাকে। পৃথিবী সর্ব্বদা ঘুরিতেছে এইজন্য সকল স্থানেই পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ দিবা রাত্রি হইতেছে। এই তথ্যও প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীরা অবগত ছিলেন।

বৎসর।

পৃথিবী এক স্থানে থাকিয়া আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে না। গাড়ীর চাকা যেমন আবর্ত্তন করিতে করিতে পথ অতিক্রম করে পৃথিবীও আবর্ত্তন করিতে করিতে শূন্যে বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল গতিতে চলিতেছে। পৃথিবীর এই ভ্রমণ-পথের নাম কক্ষ। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে প্রায় ৩৬৫ বার আবর্ত্তন করে; অর্থাৎ ৩৬৫ দিনমানে আমাদের এক বৎসর হয়।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবী এক সময়ে জ্বলন্ত বাষ্প-পিণ্ডের ন্যায় ছিল। তখন উহা ঠিক সূর্য্যের মতই উজ্জ্বল ছিল। এখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যও কালে পৃথিবীর মত ঠাণ্ডা হইবে, তবে সূর্য্য খুব প্রকাণ্ড,এই জন্য সূর্য্য ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লাগিবে। ছোট গ্রহ-গুলি সব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের আগ্নেয় পর্ব্বত গুলিও নিবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ভিতরে এখনও পূর্ব্বের তাপ আছে। যতই ভূগর্ভে যাওয়া যায় ততই উত্তাপ অনুভূত হয়। আগে পৃথিবীর উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে তাহাতে বৃষ্টি পড়িবা মাত্র তখনই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইত। এখন পৃথিবীর বাহিরের কতকটা অংশ জমাট বাধিয়া একটা খোলার মত হইয়াছে তথাপি মাঝে মাঝে আগ্নেয় গিরির ভিতর দিয়া ভূগর্ভ হইতে উত্তপ্ত বাষ্প, ধূম, অগ্নিশিখা, উষ্ণজল প্রভৃতি বাহির হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন, ভূগর্ভের ৩০ মাইল নীচে এত উত্তাপ যে এক মিনিটে সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতু দ্রব হইয়া যায়।

ভূ-পৃষ্ঠ।

পৃথিবীর যে কঠিন আবরণের উপর আমরা আছি তাহার নাম ভূ-পৃষ্ঠ। ইহা কতকগুলি মাটি এবং পাথরের স্তর দ্বারা গঠিত। কূপ কিম্বা পুকুর কাটিবার সময় নানা বর্ণের মাটির স্তরগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্তর একরূপ নহে, উহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে গঠিত। এক এক স্তর প্রস্তুত হইতে হাজার হাজার বৎসর লাগিয়াছে। ঐ সকল স্তর খুঁড়িলে প্রাচীন কালের গাছপালা ও জীব জন্তুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন এল্‌বামে আত্মীয় স্বজনের ফটো রাখি তেমনি প্রকৃতি স্থানে স্থানে স্তরে স্তরে আপন সন্তানের কঙ্কালগুলি বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আমরা যে কয়লা পোড়াই, মাটীর নীচে তাহারও স্তর আছে। ঐ কয়লা গাছ হইতে হইয়াছে। বড় বড় বন এককালে মাটির নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সেই গুলি বহুদিনে পাথুরে কয়লা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডি-তেরা বলেন, ৬০ ফিট পুরু কয়লার স্তর হইতে লক্ষ বৎসরের অধিক লাগে। কয়লার খনিতে ১২০ ফিট পুরু কয়লার স্তর পাওয়া গিয়াছে। এখন অনুমান কর, পৃথিবীর বয়স কত? মাটির স্তরের কথাতো ধরাই হইল না।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ যে হিমালয় পর্ব্বত উহার শিখরেও সমুদ্রের শম্বুকা-

দির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, হিমালয় কোন কালে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। শিয়ালিক পর্ব্বতে প্রকাণ্ড কচ্ছপের কঙ্কাল দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল। সমগ্র সুন্দরবন এককালে সমুদ্র-গর্ভে ছিল। গঙ্গানদীর পলিমাটি দ্বারা ঐ ভূভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। এসিয়ার গোবি ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি কোন সময় সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। সমগ্র ইউরোপখণ্ড সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না; মানুষ তো দূরের কথা। প্রথম বোধ হয় গাছ পালাই হইয়া ছিল। তারপর নানা প্রকার পোকা, তারপর মাছ, তার পর বড় বড় জন্তুর জন্ম হয়। মানুষের আবির্ভাব অনেক পরে।

পৃথিবী যখন বাষ্পাকারে ছিল তখন উহার আয়তন আরও অনেক বৃহৎ ছিল। তাপ হ্রাস হেতু উহার অবয়ব সঙ্কুচিত হইয়াছে, সেই জন্য ভূপৃষ্ঠও উচ্চনীচ হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

সতী ত্রিপুরা সুন্দরী।

বাসন্তী প্রকৃতিরাণীর শ্যামল সৌন্দর্য্য যেমন নয়নের প্রীতিকর, আতট প্লাবি-ভাগীরথীর বক্ষে মূর্চ্ছিত চন্দ্রালোক যেমন অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যের আধার, অর্ঘ্যডালায় চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমরাশি যেমন পবিত্র, সুকুমার শিশুর হাসি যেমন সরল, সতী রমণীর জীবন-কাহিনী তেমনই মনোমুগ্ধকর। স্বর্গের সুধা, উষার পরিমলবাহী মলয় সমীরণ, জগতের যাবতীয় হিতকর পদার্থের তিল তিল সংমিশ্রণে ভগবান্ সতী রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশের তুলনা দিতে আকাশ ভিন্ন আর কিছু নাই, সতীর উপমা দিতেও সতী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। বিশ্বের পুঞ্জীভূত শক্তির সহিত জগন্নাথের পবিত্রতার সংমিশ্রণে সতীত্ব সংগঠিত। ইহা স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম রত্ন।

সতীত্বের গর্ব্বে গৌরবান্বিত ভারতভূমির প্রতি গৃহ সতী-চরণ রেণুতে পবিত্রিত। ভারত-সন্তানের প্রতি শোণিত-বিন্দু সতীর প্রসাদে ধন্য। লক্ষ লক্ষ সতীর পুণ্য-কাহিনী বিজড়িত ইতিহাস ভারতের কক্ষে কক্ষে বক্ষে বক্ষে সুরক্ষিত, তথাপি এই শিক্ষাপ্রদ পুণ্য-কাহিনী চির অম্লান—চির নূতন—চির পূজ্য। আমরা আজ এক রমণীর পবিত্র জীবনী পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব। তিনি জীবনে কোনও অলৌকিক কার্য্য না করিলেও, তাঁহার সতী-ধর্ম্মের কথা উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত মহুয়া পোষ্টাফিসের অধীনে "ভিটাদিয়া" নামে এক প্রাচীন গ্রাম আছে। ভিটাদিয়া গ্রামে পূর্ব্বে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এখনও পূর্ব্বময়মনসিংহে "ভিটাদিয়ার শাণ্ডিল" সম্মানিত। এই গ্রামে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণই বাস করেন। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে উভয় বংশেরই লোক ক্ষয় হইয়া এখন কয়েক খানি বাটী মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভিটাদিয়া গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে ৺ কালীকিশোর ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। কালীকিশোর সুপুরুষ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং বিদ্বান ছিলেন। তাঁহারই ধর্ম্মময়ী পত্নী ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী। বিবাহের পর কয়েক বৎসর না যাইতে কালীকিশোর একমাত্র পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিধবা ত্রিপুরা সুন্দরী সেইদিন হইতেই গৃহে থাকিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণী হইলেন। বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণে অতি সামান্য সময় ব্যয় করিয়া তিনি স্বামীর পাদুকা পূজায় এবং ভগবচ্চিন্তায় রাত্রিদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কন্যাটীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্পাদন করিয়া (শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ইনি সম্ভবতঃ এখন আগরতলা হাই স্কুলে কার্য্য করেন) পুত্রকে বিবাহ করাইয়া ত্রিপুরা সুন্দরী সংসারের যে সামান্য দায় অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাহাও ছিন্ন করিলেন। দিনান্তে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে, কখন বা সপ্তাহে একমুষ্টি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া ইঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই জটাধারিণী, গৈরিক পরিহিতা রমণীর দেহের কান্তি

যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; ইঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন তেজঃপূর্ণ, করুণায় সর্ব্বদা পরিপূরিত। রাত্রিদিন কেবল স্বামীর ধ্যান, তাঁহার পাদুকা পূজা ও ভগবানের নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র নব যুবক কামিনী কুমার (সম্ভবতঃ ১৩১৪।১৫ সনে) পরলোক গমন করিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে বিধবা উন্মাদিনী হইবেন ভাবিয়া প্রতিবেশী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী শুষ্কনয়নে বলিলেন, "বিধাতার দ্রব্য তিনিই লইয়াছেন আমি বলিবার কে?" তিনি আরও বলিলেন, "নির্ব্বংশ হইয়াছি, দুঃখ নাই। আমার পুত্র বা পৌত্র যদি অধর্ম্মাচারী হইত (সময়ের যে গতি চলিতেছে তাহাতে আমি সে ভয় খুবই করি) তবে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হইত। এখন আমার পুত্রের বা পৌত্রের পাপের জন্য আর ঊর্দ্ধতন মহাপুরুষগণের অধঃপতনের আশঙ্কা নাই।" সকলে সপ্তপুত্রহারা জননীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

ইনি বাটীর দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী দীর্ঘিকার তীরস্থিত শিবের মঠে বসিয়া প্রায় বারমাস রাত্রি যাপন করেন। সেই জনপ্রাণী-বিহীন স্থানে বিশাল মঠের মধ্যে জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত গ্রীষ্ম, সকল সময়েই ইনি আপন আরাধ্য দেবতার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। পুত্রবধূটীকেও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী করিবার জন্য শিক্ষাদান করিতেছেন।

আমরা এই মহিমাময়ী রমণীর সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১৩১৫ সনের ফাল্গুন মাসে ইঁহাদের বাটীতে একটী সখের নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক বভ্রুবাহন অভিনীত হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে "রাজরাজেশ্বরী" মূর্ত্তি দেখান হয়। ইনি দর্শকমণ্ডলীর পশ্চাদ্বর্ত্তী গৃহের দ্বারে (এই ঘরে মহিলাগণ ছিলেন) দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে রাজরাজেশ্বরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গানটী শেষ হইলে যবনিকা পতিত হইল। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কি দেখাইলে বাবা! আমিত প্রকৃত রাজরাজেশ্বরীই দেখিয়াছি। আমাকে আবার দেখাও। আমার এই সাধ তোমরা পূর্ণ কর।" আবার যবনিকার অন্তরাল হইতে "রাজরাজেশ্বরী" দৃষ্টিগোচর হইল। আবার সঙ্গীত হইল:—

"কনক আসনে কনক বরণী—
জগত-জননী রাজে!
ভাতিছে বদনে মরি কি সুষমা
দামিনী মলিনা লাজে।
আজি কি মাধুরী হেরি আঁখি ভরি,
(ঐ) প্রণত ধরণী চরণে তোমারি,
বরাভয়-করা, পাপতাপ-হরা
জগত-জননী সাজে।" ইত্যাদি।

আবার আবার তিনবার করিয়া এই ব্রহ্মচারিণী এই গান শুনিলেন আর অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইলেন। এমন ভাবাবেশ কাহারো দেখি নাই। তিনি বাহ্য দৃষ্টি হীন হইয়া বুঝি অন্তর্জ্জগতে বিচরণ করিতেছিলেন।

আর একদিন অন্ধকারময়ী রজনীতে (পরবৎসর) আমরা ১২।১৩ জন নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইতেছিলাম। সেখানে বিবাহ উৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ। উক্ত বাটীর শিবমঠের সম্মুখ দিয়াই রাস্তা। এই বাটীর কয়েকজন ছেলে ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রও যাইবেন, কথা ছিল। আমরা মঠের সম্মুখে—পুষ্করিণীর তীরে তৃণাসনে বসিয়া ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। এসময় একটী বন্ধু গান ধরিল,—

"বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা"—

তাহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে দশদিক্ যেন আনন্দ-মুখরিত হইতেছিল। মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় যেন সুরলহরী সুদূরে কম্পিত তারকার আনন্দ উৎপাদন করিতেছিল। গানটী শেষ করিবামাত্রই আমরা উঠিব; অমনি মঠের দ্বার হইতে কে বলিয়া উঠিল:—

"বাবা, আর একটা গান গাও। এমন মধুর, এমন ভাববিহ্বল গান আমি অনেক দিন শুনি নাই। সুধু গানটী শুনিবার জন্য আমি আসিয়াছি। গায়ক লজ্জিত হইল। ইঁহার সম্মুখে গান করিতে তাহার ভয় ও লজ্জা দুইই হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার আদেশও উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা বন্ধুটী গাহিল,—

"মন, চল নিজ নিকেতনে"

গান শেষ হইলে, তাঁহার কথায় বুঝিলাম, তিনি চক্ষু-জলে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আর একদিন যদি আমাদের বন্ধু তাঁহাকে গান শুনায় তবে তিনি বড় সুখী হইবেন, বড় আশীর্ব্বাদ করিবেন বলিয়া অনুরোধ করিলেন। আর একদিন তাঁহাকে দুইটী গান শুনান হইয়াছিল। তিনি বহুত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৈরাগী বৈষ্ণবীরা খঞ্জনী বাজাইয়া যখন ভগবৎ-প্রেম কীর্ত্তন করে ইনি তখন আত্মহারা হইয়া অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকেন। প্রত্যেক কথায় যেন তিনি ভগবানের প্রেম অনুভব করেন। আজকাল এমন প্রেম-ময়ী মাতৃমূর্ত্তি, এমন ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণা ব্রহ্মচারিণী বড় অধিক দেখা যায় না। যখনই ইঁহার মূর্ত্তি মনে পড়ে, তখনই মাতৃহীনের চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। হৃদয় সেই মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি উৎসর্গ করে। ইনি অদ্যাপি, চিরাচরিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা সময়ান্তরে ইঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিতে বাসনা রাখি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তুরস্ক সাম্রাজ্য। *

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বেহার জয় করিলেন, তখন বঙ্গদেশের জ্যোতিষি-গণ রাজা লক্ষ্মণসেনকে গিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কলিকালে এই দেশ তুর্কদিগের হস্তগত হইবে। আজ সেই তুর্কগণ আসিয়াছে।" বক্তিয়ার খিলিজি মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তুর্ক ছিলেন না, তিনি ও তাঁহার সৈন্যগণ পাঠান ছিলেন। কোন কোন স্থানে সকল মুসলমানকেই তুর্ক বলে।

তুর্কদিগের আদি বাস মধ্যএসিয়া। ইহাদের অনেক গুলি জাতি আছে, সেকালে এক জাতিকে হুন বলিত। যে জাতির বিবরণ আজ প্রদান করিব, ইহাদিগকে ওস্‌মান্ তুর্ক বলে। পূর্ব্বে কাস্‌পিয়ান হ্রদের ধারে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মোগলদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া পঞ্চাশ সহস্র ওস্‌মান তুর্ক আরমিনিয়া প্রদেশে পলায়ন করিল। অর্থগুরেল্ নামক এক ব্যক্তি কয়েক সহস্র তুর্ক লইয়া সেলজুক্ সম্রাটের সহায়তা করেন। কৃতজ্ঞ হইয়া সম্রাট্ তাঁহার সেনাগণকে বাস করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান তুরস্কের এসিয়ামাইনর প্রদেশে কিঞ্চিৎ ভূমি প্রদান করিলেন। ইহাই প্রতাপান্বিত বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত স্বরূপ হইল।

অর্থগুরেলের পুত্র ওস্‌মান ১২৮৯ হইতে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানাদিকে তুরস্কের অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার রাজ্যকে স্বাধীন করিয়া সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। ওস্‌মানের পুত্র ডয়খান তুর্করাজ্য আরও বিস্তৃত করিলেন। ইউরোপ খণ্ডের সমুদ্রকূলে কয়েকটী দুর্গ তিনি অধিকার করিলেন। সে সময় এ সমুদয় স্থান গ্রীক্ সম্রাটের অধিকারভুক্ত ছিল। এসিয়া এবং ইউরোপখণ্ডের মধ্যস্থানে যে সামান্য একটী সমুদ্রের খাঁড়ি আছে, সে খাঁড়ি কৃষ্ণসাগরকে ভূমধ্যসাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, তাহার পশ্চিম কূলে বাইজানটিয়ম্ নামক নগর গ্রীক্ সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ ইহাকে নূতন বা প্রাচ্য রুম বলিত। সে জন্য আমাদের দেশের মুসলমানগণ ইহাকে রুম বলেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম স্তাম্বুল (Constantinople)। রুমের সম্রাটগণ এই সময়ে বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ওস্‌মান যখন তৎকালীন সম্রাটের কয়েকটী দুর্গ অধিকার করিল, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ও সমুদয় শূকরের বাসোপযোগী স্থান। উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তুর্ক সম্রাট্ ওস্‌মান ইউরোপ-খণ্ডে ক্রমেই আপনার অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। তিনি জানিজারি ও স্পাহি নামক দুই শ্রেণীর সেনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের পুত্রগণকে

---

* তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধে সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি এখন তুরস্কের প্রতি নিপতিত হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত তুর্ক সাম্রাজ্যের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি যে সেনাদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে জানিজারি বলিত। এই সেনাদল শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার ন্যায় ক্রমে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যে ইহারা যাহা মনে করিত, তাহাই করিতে পারিত। সম্রাটগণ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভয় করিতেন। অবশেষে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ ইহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত হজরৎ মহম্মদের (আলে-উস্-সেলাম) ঝাণ্ডা খাড়া করিয়াছিলেন। সেই পতাকা দেখিয়া অন্যান্য মুসলমান সেনাগণ জানিজারি-দিগকে ঘিরিয়া ফেলিল ও তাহাদের বারিকে আগুন লাগাইয়া দিল। সেই অগ্নিতে আট হাজার জানিজারির প্রাণ বিনষ্ট হইল। তাহার পর পনর সহস্রকে বধ করা হইল ও কুড়ি হাজার জানিজারি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। স্পাহি সেনা সিপাহী শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা অশ্বারোহী সেনা ছিল।

১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ওস্মানের পুত্র আমুরাথ তুরস্কের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রুম সম্রাটের প্রায় সমুদয় রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। কেবল রাজধানী স্তাম্বুল ও নিকটবর্ত্তী সামান্য কয়েকটী স্থান রুম সম্রাটের অধিকারভুক্ত রহিল। যে আড্রিয়ানোপল নামক নগর এক্ষণে বল্গার সেনাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে ও যাহার ভিতর মুসলমান সেনাগণ আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, অমুরাথ সেই আড্রিয়া-নোপল নগর তাঁহার রাজধানী করিলেন। আজ যেরূপ বল্গেরিয়া, সারভিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও গ্রীস —চারিটী দেশ তুর্কসুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, আমুরাথের বিরুদ্ধেও সেইরূপ অনেক জাতি অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রায় পাঁচলক্ষ শত্রু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৩৯০ সালে কসোভা নামক স্থানে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। মুসলমান সেনা জয়ী হইল। কিন্তু সম্রাট আমুরাথ যুদ্ধের পূর্ব্বেই কোন শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বায়াজিদ্ যুদ্ধে জয়ী হইয়া চারিদিকে আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন।

১৪২২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আমুরাথ সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তাঁহার সময়েও খৃষ্টীয়গণ একত্র হইয়া তুর্ক-দিগকে ইউরোপ হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কগণ স্তাম্বুল অধিকার করিল। সেইদিন হইতে প্রাচ্য রুমে খৃষ্টীয় রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সুলেমান মামুদ সুলতানের সময়ে এই অঞ্চলে তুর্কদিগের একাধিপত্য হইল। রুষের দক্ষিণভাগ, অষ্ট্রিয়া দেশের দক্ষিণভাগ, রুমানিয়া, বল্গেরিয়া, সারভিয়া, গ্রীস, সমুদয় তুরস্ক, আরবের অধিকাংশ ভাগ, মিসর, ত্রিপলি টিউনিস্ প্রভৃতি নানাদেশ তুর্কগণ ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া আপনাদের অধিকারভুক্ত করিল। এমন কি, অষ্ট্রিয়া দেশের সম্রাটকে হাঙ্গারী প্রদেশের নিমিত্ত তুর্কগণকে কর দিতে হইয়াছিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রুষের সহিত তুর্কদিগের প্রথম বিবাদ হয়। তুরস্কের সুলতান সেলিম মনে করিলেন যে, কাস্পিয়ান্ হ্রদ হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। সেজন্য তিনি পাঁচ সহস্র মজুর ও তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আশী হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রুষ এ কার্য্যে আপত্তি করিলেন। সে জন্য বাদশাহের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল না।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রথম স্তাম্বুলে তুরস্ক সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে স্পেন দেশের রাজা বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতেছিলেন। এই রণতরীর আয়ো-জনকে স্প্যানিস্ আরমেডা (Spanish Armada) বলে। ইংরেজের বন্ধু হইয়া তুর্কগণ যাহাতে স্পেনদেশ আক্রমণ করে, এই উদ্দেশ্যে ইংরেজদূত সুলতানের সহিত সন্ধি করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু স্পেনদেশের জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ঝড়ে ও নানা কারণে ধ্বংস হইয়া গেল। সে জন্য সুলতানের সহায়তার প্রয়োজন হইল না।

এই সময়ে ইটালী দেশের ভেনিস্ নগরের লোক নানা দেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইত ও আপনাদিগের দেশকে অতি সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। তুর্কের সম্রাট ভেনিসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রিট প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপ অধিকার করিয়া লইলেন। কিছু দিন

পরে অষ্ট্রিয়ার সহিত তুরস্কের যুদ্ধ হইল। তুরস্ক-সেনা রাজধানী ভিয়েনা নগর অবরোধ করিল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের রাজা আসিয়া ভিয়েনা নগরের উদ্ধার সাধন করিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তুর্কগণ পারস্যসম্রাট নাদির সাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ইহাতে কোন পক্ষের লাভ হয় নাই। কিছু দিন পরে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন ও তাঁহার সেনাগণ নগরের অধিকাংশ অধিবাসীকে কাটিয়া তাহাদের রক্তে পথ ঘাট প্লাবিত করে।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই বৎসর রুষ কৃষ্ণসাগর কূলে তুরস্কের অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। তুরস্ক সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার নিমিত্ত রুষ অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইল। রুষ একেলা যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রুষ তুরস্কের অধিকৃত অনেক দেশ হস্তগত করিয়া লইল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান মিসর আক্রমণ করিলেন। সেজন্য ফরাসীদেশের সহিত তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজের সহায়তায় তুর্ক সম্রাট ফরাসিদিগকে মিসর হইতে দূর করিতে সমর্থ হইলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস দেশ তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইল। ১৮৫৩ সালে তুরস্কের উপর রুষ সম্রাট নানা ভাবে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেজন্য রুষের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালী তুরস্কের পক্ষ হইয়া রুষের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল। ইহাকে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ (Crimean War) বলে। যুদ্ধ অবসানে কয়েকটী দেশ,—যাহা রুষের হস্তগত হইয়াছিল,—তুরস্ক ফিরিয়া পাইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রোমানিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। দুই বৎসর পরে সারভিয়া স্বাধীন হইল। ক্রমে মিশরও সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুষ, তুরস্কের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া বলগেরিয়া দেশকে স্বাধীন করিলেন। এই বলগেরিয়া [illegible] লোক এখন তুরস্কের কাল স্বরূপ হইয়াছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, কিছু দিন পরে স্তাম্বুল শত্রুহস্তগত হইবে, কিন্তু কেয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে ৭০,০০০ মুসলমানসেনা পুনরায় ইহাকে আক্রমণ করিবে। মুসলমানসেনাকে তখন আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। কেবল 'লা ইলাহি-ইল্-এল্লা আল্লা হো আকবর' এই কয়টী কথা বলিলেই, নগর তাহাদের অধিকৃত হইবে। তাহার পর আল্ দজ্জাল আসিবে। তাহার পর যীশুখৃষ্ট আসিয়া তাঁহাকে বধ করিবেন। তাহার পর যাজুজ ও মাজুজগণ আসিবে। এইরূপ নানা প্রকার বিভীষিকার পর কেয়ামত হইবে।

বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা।

(ঢাকা উদ্ধারাশ্রমের—যাহার বর্ত্তমান নাম মাতৃ-নিকেতন—ভূতপূর্ব্ব সেবিকা স্বর্গীয়া সাধ্বী নগেন্দ্রবালা মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা তাঁহার পতি সহ বিগত ৩রা নবেম্বর ঢাকা হইতে জাপান যাত্রা করিয়াছেন। প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইল, জাপান নিবাসী শ্রীযুক্ত ওয়েমন্ তাকেদার সহিত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে শ্রীমতী হরিপ্রভার শুভ-পরিণয় কার্য্য ঢাকা নগরে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাকেদাসান্ ইতঃপূর্ব্বে বুল্‌বুল্ সোপ্ ফ্যাক্টরীতে সাবান নির্ম্মাতার কার্য্য করিতেন। বিবাহের পর "ঢাকা সোপ্ ফ্যাক্টরী" নামে কারখানা খুলিয়া নিজে সাবান প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতেন। সুদীর্ঘ কাল স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যে তাকেদাসান্ সপরিবারে জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

যাত্রার পূর্ব্ব দিবস ২রা নবেম্বর শনিবার প্রাতঃ-কালে ঢাকার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লী খিদগ্রামস্থ মাতৃনিকেতনে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। পল্লীর অনেক পুরুষ ও মহিলা উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং

শ্রীমতীকে বিদায় দিবার কালে সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ঢাকার জাপানী সওদাগর মিঃ কোহারা তাঁহার পত্নীসহ দম্পতিকে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া আসেন এবং তাঁহাদের সাহায্যের জন্য নগদ ৫০৲ টাকা ও জাহাজের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করেন। এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীমতী হরিপ্রভা জাপান যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন শুনিয়া দিনাজপুরের সহৃদয় মহারাজা বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ২৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া যে ডায়েরী প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ভাঃ সঃ।)

৩রা নবেম্বর, ১৯১২—নারায়ণগঞ্জের জাহাজে অত্যন্ত ভিড়। বসিবার স্থান ছিল না। যাদব বাবুর এক আত্মীয় তাকেদাসান্‌কে চিনিতে পারিয়া তাঁর বিছানায় আমাকে বসিতে ও বিশ্রাম করিতে স্থান দেন। দশ দিন পূর্ব্বে তাঁহার দুই বৎসরের এক মাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। তিনি সেই শোকে কাতর। অল্প কথাই তাঁহার সঙ্গে হইল। জাপান যাব বলিলাম। ইহাতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ১০ টার সময় গোয়ালন্দে ট্রেণে উঠিলাম। অত্যন্ত ভিড়, স্থান পাওয়া দুষ্কর। গার্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জাহাজ হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গ লইলেন। অত্যন্ত শীত বোধ হইল। ওভার কোট গায়ে দিয়া শাল মাথায় দিয়া ট্রেণে উঠিলাম। গার্ড ট্রেণের অন্য লোকদের সরাইয়া আমাদের জিনিষ পত্র তুলিয়া দিলেন, একখানা পূর্ণ বেঞ্চ খালি করে দিলেন। এইরূপে আমাদের বেশ সুবিধা হইল। পরে অন্য লোক এসেছিল কিন্তু আমাদের বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই।

৪ঠা নবেম্বর—প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সিমেজ্‌সানের বাড়ীতে উঠিলাম। তিনি বাড়ী ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী আদরের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমাকে ছেড়ে তিনি বাজারে গেলেন না। চাকর গেল। চা, বিস্কুট, কলা, খাবার খাইলাম। রান্নার ভাল রকম বন্দোবস্ত করে দিলেন। সিমেজ্‌সান্ বাড়ী আসিলে ১১ টার সময় তাকেদাসান্, তিনি ও আর একজন জাপানী এই তিন জন জাপানী ধরণের রান্না আহার করিলেন। আমি ও মিসেস্ সিমেজ্‌সান্ একত্র আহার করিলাম। মাদুর পেতে তার উপর ডিসে খাওয়া—মুসলমান ধরণে। রসুন দিয়ে রান্না হয়েছিল বলিয়া ডাল ভাত ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিলাম না। তৎপরে দাইকে রসুন দিতে বারণ করে দিলেন। খাওয়ার পর তাকেদাসান্ সিমেজের সহিত টিকিট করিতে গেলেন। ১৯০৲ ভাড়া, ৪১৲ খোরাক। বৈকালে ফিরে এলেন। সিমেজ্‌সান্ বলিলেন, ভিতরের গরম কাপড় আরও দরকার, তাই বৈকালে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাজারে গেলাম। বাজারের উপর দিয়ে মেমদের মত জিনিষ কিনিতে এই প্রথম চলিলাম। প্রথমতঃ আপত্তি করিলাম, গাড়ী করে যাইব বলিলাম কিন্তু শেষে নিকটে বলে হেঁটেই চলিলাম। ২৩৲ খরচ হইল। ২ জোড়া জুতা, এক জোড়া স্লিপার, মোজা, দস্তানা, গঞ্জি ইত্যাদি কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিলাম। জিনিষ ভালই হইয়াছে। তাকেদাসান্ কিনিলে দাম বেশী লাগিত, তাই বলে আমি কিনিলাম। রাত্রে মাংস হয়েছিল। পুরুষদের জন্য জাপানী ধরণে, আমাদের জন্য ভিন্ন। অনেক ভাত খাইলাম। খাওয়ার পর তাকেদাসান ও সিমেজ্‌সান্ বাজারে গেলেন। ক্ষুর, বিস্কুট ইত্যাদি কিনে আনিলেন। আমি ও সিমেজের স্ত্রী তাঁদের বিছানায় ঘুমাইলাম। উঁহারা বারান্দায় মাটিতে বিছানা করে ঘুমাইলেন। বেশ ঘুম হইল।

৫ই নবেম্বর—প্রত্যুষে নীরবে ঈশ্বরের নাম নিয়ে উঠিলাম। চা খাইয়া তাকেদাসান্ বাজারে গেলেন। দুপ্রহরে আহার হইল। বৈকালে খাওয়া ভাল হবে কিনা মনে করে খাওয়ার অনেক বন্দোবস্ত করা হইল। বৈকালে জাহাজে উঠিতে হইবে। আমি মোটেই আহার করিতে পারিলাম না। পুরুষদের জন্য জাপানী রান্না। বৈকালে তাকেদাসান্ তাঁহার বাপ মা'র জন্য তিন খানি র‍্যাপার কিনে আনিলেন। সন্ধ্যার সময় একজন জাপানী হাতরিসান্ (এদের বাড়ী তাকেদাসানের গ্রামের খুব নিকটে; সিমেজের বাড়ীও তাকেদাসানের

বাড়ীর খুব নিকট) সস্ত্রীক (জাপানী স্ত্রী) আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহারা দুই বাক্স বিস্কুট রাস্তার জন্য আমাদের দিলেন। সন্ধ্যার সময় খেয়ে রওনা হইলেন। বৈকাল থেকে মনটা কেমন করিতে লাগিল। খাওয়া ভাল হইল না। সিমেজ ও হাতরিসান্ জাহাজে উঠিয়ে দিলেন। জাহাজে আসিবার সময় মন খারাপ ছিল। চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। সিমেজের স্ত্রী বলিলেন, যখন বেরিয়েছ, ভয় করিও না, সাহস করে চলে যাও। মন খারাপ করিও না; যেয়ে খবর দিও, ইত্যাদি। সিমেজ্ ও হাতরিসান্ বিদায় কালে বলিলেন, "সুন্দর দেশ, আশাকরি আপনি খুব সুখী হইবেন। শীতের জন্য আপনার বড় কষ্ট হইবে। খুব সাবধানে থাকিবেন। আপনার যাত্রা শুভ হউক।" জাহাজ ঘাট হইতে ওঁরা চলিয়া গেলেন। এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। মন বেশ প্রফুল্ল। জাহাজে উঠিলাম। ভয়ানক গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। থাকিবার স্থান ঠিক হয় নাই। মাল উঠান হইতেছে। ১॥ ঘণ্টা এদিক ওদিক করে কাটাইলাম। একজন জাহাজের কর্ম্মচারী তাঁর কামরায় বিশ্রাম করিতে দিলেন। ১১ টার পর নির্দ্দিষ্ট কামরায় গেলাম। ঘরখানি বোধ হয় ৭ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া, ৫ হাত উচ্চ, এর চেয়ে কম ছাড়া বেশী নয়। আলমারীর থাকের মত দুইটা দুইটা করিয়া তিন দিকে ছয়টা থাক। প্রত্যেকটাতে একজন করিয়া ৬ জন থাকিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অসতর্ক হইয়া একটু উঁচু হইলে মাথায় খুব ব্যথা পাইতে হয়। চারিদিকে ঘেরা। পড়িবার ভয় নাই। ঘরের অপর দিকে আমাদের জিনিষ পত্র সব গুছাইয়া রাখিয়াছে। ইলেকট্রীক লাইট্ জ্বলিতেছে। মোমবাতি জ্বালা নিষেধ। একটা কেরাসিনের ওয়াল ল্যাম্প আছে। প্রয়োজন হইলে তাহাই জ্বালান হয়। গরম বলিয়া একখানি পাখা দিয়া গেল। গরম জল দিল। উপরোক্ত শুইবার স্থানগুলির মধ্যে দুইটা অন্য-মাল দিয়ে ভরা, দুইটার ভিতরের তক্তা ছিল না, দুইটী ব্যবহারোপযোগী ছিল। আমরা একটাতেই আজ রহিলাম। প্রায় ১২টা, ১টার সময় ৩ জন জাপানী স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ এই গৃহে আসিল। তাহারা কোন রকমে দুইটী Seat ঠিক করে প্রত্যেকটাতে দুইজন করে রাত্রি কাটাইল। বড় গরম ও গোলমাল, ঘুম মোটেই হইল না।

৬ই নবেম্বর—ভোর ৫ টার সময় জাহাজ ছাড়িল। বোঝা যায় না, যে জাহাজ চলিতেছে। কেবল অল্প শব্দ। এই দেশ ছেড়ে চলিলাম। বাহিরে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কলিকাতার শেষ দৃশ্যগুলি দেখিতে লাগিলাম। মনটা খুব একটু খারাপ বোধ হইল। মনে হইল, কোথায় যাচ্ছি। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। গত রাত্রে জাহাজে উঠিয়াই তাকেদাসানের জ্বর হইয়াছে। মাথা ও শরীরে ব্যথা। রাত্রে মোটেই ঘুম হয় নাই। রাত্রি হইতেই একোনাইট্, বেলেডোনা ঔষধ দিলাম। প্রাতেও অল্প আছে। প্রায় ৩ ঘণ্টা জাহাজ চলিয়া ৮ টার সময়—বোধ হয় ভাটা পড়াতে—বন্ধ হইল। সারা দিন রাত বন্ধ রহিল। প্রায় ৬০০ ছাগল ভেড়া এই জাহাজে করে সিঙ্গাপুর যাইতেছে। সেইগুলি আমাদের খুব নিকটে। বাথরুমে ঐগুলির পাশ দিয়ে যেতে হয়। আর আমাদের ঘরের পাশে জাহাজের ভাঁড়ার ঘর। খাদ্যদ্রব্যাদি সব এই ঘরে থাকে। সে ঘরে বোধ হয় শুকনো মাছ আছে। এই দুইয়ের গন্ধে আমরা আর টিকিতে পারি না। কত এসেন্স ব্যবহার করি, কিছুতেই পারি না। পরে উপরে ডেকে যেয়ে বসিলাম। আমরা পিছনের দিকে আছি, কাজেই দক্ষিণের বাতাস সেখানেও গন্ধ বহন করিতে লাগিল। প্রাতে চা, মাখন ও রুটী দিয়ে গেল। আমি চা ও বিস্কুট খাইলাম। ১১।১২ টার সময় তাকেদাসানের জন্য উক্ত জাপানীদের সঙ্গে খাবার আসিল। আমার জন্য ভাত ও কারী। ভাতগুলি ভাল লাগিল। জাপানের চাউল আঠা আঠা, খেতেও সুস্বাদ। একটার সঙ্গে অন্যটা মিলিত, কিন্তু সব আস্ত। বৈকালেও সেই কারী ও ভাত। আমি কলা ও ভাত খাইলাম। আজ মালপত্র সরাইয়া বাকি Seat গুলি খালি করে দিল। আজ এক এক জন এক এক বিছানায় রহিলাম। রাত্রে বেশ ঘুম হইল। নীরবে প্রার্থনা করিলাম।

৭ই নবেম্বর—ভোরে ৬টার পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িল। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় প'রে উপরে গেলাম। নদী ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইতেছে। আমার ইচ্ছা ঠিক যেখানে সমুদ্র ও নদীর মিলন হইয়াছে সে স্থানটা দেখিব। চা আসিল, নীচে এসে চা খেয়ে আবার উপরে গেলাম। নদী খুব প্রশস্ত। শেষে আর কুল কিনারা কিছুই দেখা যায় না। ভাবিলাম, এই বুঝি সমুদ্র। জল নীল নয়। নদীর জলের মত ঘোলা। জাহাজ দোলে না। তাকেদাসান বলিলেন, অল্প পরেই সমুদ্র, এখনও নদী শেষ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কার জল দেখা দিল। নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পরিষ্কার জল দেখিয়া এই সময় স্নান করিতে গেলাম।

তাকেদাসান আজ স্নান করিলেন। তাঁর আর জ্বর নাই। আজ আমাকে আলু সিদ্ধ ও ডিম সিদ্ধ ভাত দিতে বলিলাম, তাহাই দিল। আমি আজ বেশ তৃপ্তির সহিত আলু সিদ্ধ ভাত খাইলাম। ভাগ্যে ভাতটা ভাল, তাই রক্ষা। নতুবা বড়ই মুস্কিল হইত। আমি চিরকালই ফেনা ভাত খাইতে ভাল বাসি। এও প্রায় সেই রকম। এই ভাতের ফেন গালে না, ভাতেই থাকে। ভাতগুলি আঠা আঠা মিষ্টস্বাদ, গন্ধও ভাল। সুতরাং প্রতিদিন আলু সিদ্ধ ভাত দিলেই বেশ তৃপ্তির সহিত খাইতে পারি। রোজ ভাতের সহিত দুবেলা দু পেয়ালা চা দেয়। প্রাতে রোজ চা দেয়। বিস্কুট অন্য সময় যখন ইচ্ছা খাই। খাওয়ার আর কোন কষ্ট হয় না।

খাওয়ার পর ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে মুখ ধুইতে যাইয়া দেখি, এখন জল ঘোর সবুজ—নীলাভ। বুঝিলাম, এবার সত্যসত্যই সমুদ্রে পড়িয়াছি। ভারি আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি উপরে ডেকে গেলাম। যেতে পাঁচ মিনিট দেরি হইল, যেয়ে দেখি, একবারে নীল জল, নীল কালির মত। জাহাজ এখন অল্প দুলিতেছে। প্রায় নৌকার মতই, কি তাহা অপেক্ষা কম। অনেকক্ষণ কিছু না ধ'রে দাঁড়াতে পারি না। সমুদ্র দেখে বড়ই আনন্দ হইল। নীচে নীল জল, উপরে নীলাকাশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঢেউ—কেবলই ঢেউ, পরস্পর যেন একটার গায় একটা ঢলে পড়িতেছে। অসীম অনন্ত জল, কি সুন্দর! কি আনন্দ! নদী যেখানে এসে তাহার সর্ব্বস্ব নিয়ে সমুদ্রে প্রাণ দিয়াছে, সে স্থানটী দেখিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলাম না। নদী কেমনে তার সর্ব্বস্ব নিয়ে এসে সমুদ্রে প্রাণ দিয়াছে! সমুদ্র হইতে তার প্রাণ, আবার সমুদ্রেই তার মিলন ও গতি। শুনিয়াছি মিলিয়াছে, তবুও নীল জল ও ঘোলা জল সম্পূর্ণ ভিন্ন রহিয়াছে। আমরাও কি সেই পরম পতি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া পাপ তাপ মলিনতা সব বহন করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁর চরণেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব? তিনি শুদ্ধ, পবিত্র, আমরা পাপী, তাই তাঁর নিকট দীন হয়ে তাতেই মিলিতে চাহিব। এই মিলনেরই অনেক দেরি, তাই বুঝি সমুদ্রের ঐ অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাইলাম না! বৈকালে অন্য জাপানী চারি জন অন্যত্র চলিয়া গেল। আজ থেকে কেবল আমরাই বোধ হয় এখানে থাকিব। বৈকালে এস্রাজ বাজাইলাম। বসিবার স্থান নাই। বিছানায় বসিলে উপরে মাথা ঠেকে। উপরের ডেকে অনেক লোক, নীচে ছাগল। বাক্সের উপর বসে আস্তে আস্তে কয়টা গান করিলাম। "অসীম সাগর বক্ষে জয় মা জননী" বলে গানটী "ফুটন্ত ফুলের মাঝে" সুরে গাইলাম।

বৈকালে আলু সিদ্ধ ও তরকারী ভাত দিল। এখন আমি চামচে দিয়ে ভাত খাই। শরীর বেশ ভাল; মনেও আনন্দ। রাত্রে ঘুম ভালই হয়। দিনরাত জাহাজ চলিতেছে। ঘণ্টায় ১০ মাইল করিয়া চলে।

৮ই নবেম্বর—প্রাতে হাত মুখ ধুইয়া উপাসনা করে উপরে ডেকে যেয়ে বসিলাম। অসীম অনন্ত সমুদ্র বই আর কিছুই দেখিবার নাই। উপরে সুন্দর বাতাস। কিন্তু অনেক লোক, বসিবার স্থান বড় পাওয়া যায় না। নীচে বড় গরম। রাত্রেও বড় গরম বোধ হয়। প্রথম দিন শেষ রাত্রে শীত করেছিল। আজকাল গায় কাপড় রাখা যায় না। শরীর বেশ ভাল। সিঙ্গাপুরে লোকগুলি ও ছাগলগুলি নেমে যাবে, তারপর আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে। আজকাল স্নানের জায়গায় লোক বেশী। পাইখানাও অপরিষ্কার থাকে।

কাজেই সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত কষ্ট হবে। জাহাজে পোষ্ট আফিস নাই। চিঠি দেওয়া মুস্কিল।

৯ই নবেম্বর—আজ রেঙ্গুনে জাহাজ পৌঁছিবার কথা। মনে করিতেছি, রেঙ্গুনে চারুদের বাসাতেই উঠিব। এই কয়েক দিনেই মনে হচ্ছে—কত দূর এসেছি। কত দিন হয়ে গেল। গতরাত্রে খুকীকে স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি তাকে পড়ার জন্য মারিতেছি। আবার যেন রেঙ্গুনে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। কাল মাকেও স্বপ্নে দেখেছি।

৮টার সময় দূরে দ্বীপপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে। দুই একটি জাহাজ দ্বীপের কিনারে আছে। দ্বীপে পাহাড় আছে। এখানে সমুদ্রের জল সবুজ। কারণ, ভূমি নিকটে। এই আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জ। ১১ টার সময় জাহাজ দ্বীপের খুব নিকটে। সমুদ্রের দিকে ছোট ছোট রাস্তা ও গাছ দেখা যায়। আজ বড় গরম। সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত কষ্টেই যাইবে বোধ হয়।

উপেক্ষিতা।

আমি নয়ন সলিলে বসন তিতায়ে,
সেধেছি তোমারে কত ;
নিতি মরম বেদনে কতমা কাঁদিয়া,
ডাকিয়াছি অবিরত।
প্রভু, তুমিগো হেলায় অবহেলি সব,
যাইতে আপন কাজে ;
আর উপেক্ষিতা আমি কাঁদিতাম প'ড়ে,
দীন মলিন সাজে।
আমি চরণে ধরিয়া কতই মিনতি—
করেছি আকুল প্রাণে ;
তুমি চরণে ঠেলিয়া যাইতে চলিয়া,
চাহনি অভাগী পানে।
কভু বারেক ভুলিয়া এসনি কখন,
দাসীর জীবন-কুঞ্জে ;
দেখনি চাহিয়া ভাঙ্গা হৃদয়ের—
দলিত কুসুম পুঞ্জে ;
কত পূর্ণিমার চাঁদ এসে যেত চলে,
প্রভাতে বিষাদে মরিয়া ;
কত শেফালিকা ফুটি' নীরব নিশীথে,
নীরবে পড়িত ঝরিয়া।
আমি কত নিশি নিশি, রচিয়া শয়ান
প্রদীপ জ্বালায়ে পাশে ;
সদা চমকিত মনে থাকিতাম জাগি,
তোমার আসার আশে।
শেষে নয়নের কোণে ঝরা বারিটুকু
অঞ্চল তলে মুছিয়া,
ধীরে আপনার কাজে যাইতাম চলি'
নিশি শেষে লাজে মরিয়া।
কত বলিতাম কেঁদে দেবতায় আমি
—দাসীরে লইতে চরণে ;
তাই বরিনু আদরে জুড়াইতে জ্বালা,
সেধে সেধে আজ মরণে।
সখা, এতদিন পরে আসিয়াছ তুমি,
কোন্ মহা ভুলে ভুলিয়া ?
মোর এত আকিঞ্চন, এত ভালবাসা,
পারনি ভুলিতে বলিয়া ?
মম আকুল পিয়াসা মেটেনি আজিও,
তোমারে হেরিয়া নয়নে ;
সখা, মরম বাসনা পুরেনি আজিও,
তোমারে ঘেরিয়া পরাণে।
যদি দু'নিমেষ আগে এমনি সোহাগে
ডাকিতে আদর করিয়া,
আমি যাইতাম নাকো তোমা ছাড়ি আজ—
সাধিয়া মরণে বরিয়া।
তব পদরেণু তুলি দাও শিরে মম,
ক্ষমা কর যত অপরাধ ;
আজি পরিপূর্ণ মম মরণের দিন,
চির অপূর্ণ যত সাধ।
তবে আ'সি আজি সখা দাওহে বিদায়,
—আশীষ জীবনে মরণে,
মম পতিরূপে যেন, পাই তোমা সদা
আমার জনমে জনমে।

শ্রীতেজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অষ্টম ভাগ। পৌষ, ১৩১৯। ৯ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE, WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৷৵০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন্‌ ও রবীন্দ্রনাথ।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তেরমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch—and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। } পৌষ, ১৩১৯ { ৯ম সংখ্যা।

নৈতিক শিক্ষা—মনোপ্রকৃতির বিকাশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন যুগের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে. পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। দীর্ঘ কালের অন্ধতার পর সভ্য সমাজ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে শিশুদের ভিতরেও এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা দান করিতে হইলে অগ্রে এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির বিকাশের পর্য্যাপ্ত সহায়তা করিতে হইবে। শিশুদের ক্রীড়া কৌতুক উপদ্রব ও অত্যাচারকে অতীত যুগ কখনও তাহার চিন্তার ভিতর স্থান দান করে নাই, বয়স্ক ব্যক্তিগণের নিকট তাহা বিরক্তিকর বলিয়া তাহাকে বর্জ্জনীয় বিষয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং এই অহেতুক আবর্জ্জনাপুঞ্জের ভিতরে জীবনের যে খাঁটি উপাদান নিহিত আছে, তাহার উদ্ধার সাধনের প্রয়োজনের গুরুত্ব কেহ কখনও উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় অবগত হইয়াছেন যে. শিশু-জীবনের এই যে শৃঙ্খলাহীন, কার্য্যহীন, বিধিহীন, কোলাহল ও চাঞ্চল্যময় প্রমোদপ্রিয় প্রথম ভাগ—ইহারই উপরে তাহার পরবর্ত্তী জীবনের সমগ্র সৌধখানি একদা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে, অনবধানতায়, ঔদাসীন্যে অথবা তাচ্ছিল্যে এই ভিত্তিপত্তনকে দুর্ব্বল করিলে সমগ্র সৌধের ভবিষ্যৎই শঙ্কাজনক হইবে।

যে সমস্ত জিনিস লইয়া কারবার করা যায়, তাহার গুণ ও ধর্ম্ম আগে জানা দরকার, নহিলে তাহাকে সম্যক্

রূপে ব্যবহারে প্রয়োগ করা যায় না। ইন্দ্রিয় যে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ, তাহা শিশুদের বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই দ্বারগুলি বাহির হইতে প্রবেশের কত খানি উপযোগী, তৎপ্রতি খুব কমই মনোনিবেশ করা হয়। বিকৃত ইন্দ্রিয় যে বিকৃত বোধের জন্মদান করে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মানুষ যত কিছু বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, দর্শন শক্তিই তাহার প্রধান হেতু। বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রাগারে এবং চিত্রকরের অঙ্কন তুলিকা চালনায়ই যে তাহার ঐকান্তিক ব্যবহার, তাহা নয়; জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিই তাহার মূলীভূত কারণ। এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির বলেই দার্শনিকগণ জগতের জড় অংশ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বে পঁহুছিয়াছেন, কবি চেতনে অচেতনে লোক লোকান্তরে গোপন ভাষার কল-কাকলী শুনিতেছেন, জগতের সুধীবৃন্দ বিগত কাল হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নবযুগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন। জগতের মনস্বিতা জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বর্ণ-তন্তু দিয়া বিশ্বমানবের জন্য যে স্বর্ণবস্ত্র বয়ন করিতেছে, শীর্ণ অপরিপুষ্ট কোষ হইতে প্রসূত বিবর্ণ দুর্ব্বল সূত্রে তাহার সমাধা কখনও হইতে পারে না।

সত্যকে কল্পনার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া উপস্থিত করা বিশেষ কিছু ফলপ্রদ নহে, বাস্তবকে বাস্তবের বেশেই গ্রহণ করা সমীচীন। বিভীষিকায় ও দণ্ডদানে শিশুদের জ্ঞানার্জ্জন ব্যাপারটাকে একটা উৎকট কৃচ্ছ্র সাধনে পর্য্যবসিত করিয়া একটা নিষ্পেষণকারী লৌহপিণ্ডের মত তাহাদের স্কন্ধে ফেলিয়া দিলে তাহাতে লাভের আশা খুব কমই করা যায়। জ্ঞান একমাত্র অন্তরের আনন্দ রসেই জীর্ণ হইয়া থাকে, এবং শিশুচিত্তের সহজ স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তাহাকে পুষ্টি দান করে। প্রীতির দ্বারা প্রীতিকে যে এই আকর্ষণ—ইহা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই আজ শিশুদের শিক্ষাভবন ইষ্টক ও প্রস্তর-রচনা-রুদ্ধ কারাভবন নহে, বাহিরের আনন্দময় জগতের বিচিত্রতার কৌতুক ও প্রমোদের স্রোত-কাকলীতে তাহা মুখরিত। কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্য অবলম্বনের নীতি জনসমাজ হইতে যতই অপসৃত হইতেছে, শিক্ষা-সৌকর্য্য ততই প্রসার লাভ করিতেছে।

এই যে পরিবর্ত্তন, সমাজের অন্তরে ও বাহিরে, ধর্ম্মে, লোকাচারে, শিক্ষায়, শাসনে, শিশুপালনে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, তাহার মধ্যে একটি চেষ্টাকেই প্রকট ভাবে দেখা যায়; তাহা হইতেছে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা। দেহে ও মনে, কার্য্যে ও ইচ্ছায়, বিকাশে ও অভিব্যক্তিতে, মানব-সমাজ তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া উদ্বর্ত্তন করিতেছে, এবং তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক গতি তাহারই শাসনে নিয়ন্ত্রিত আছে। প্রাচীন যুগের যে সব ধারা ইহার প্রতিকূল তাহা স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, এবং নবীন যুগ যে সব নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই শাখা বিস্তার করিতেছে।

পল্লবে, কিসলয়ে, পুষ্পে, মুকুলে, তরু যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, ফল তখন তাহারই অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। শিক্ষা এই অব্যক্ত পুষ্প-কোরকের মত মানুষের মনোপ্রকৃতির ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে থাকে। মনের শক্তির এই স্বতঃ-বিকাশের ভিতর একটা অনুক্রমিকতা ও পারম্পর্য্য আছে। জলোৎসেক যেমন তরুর জীবন পুষ্ট করে জ্ঞানোৎসেকে তেমনি তাহার পুষ্টি প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক প্রণালীই সকল প্রণালীর মূল আদর্শ। বস্তুর গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞান যতই নব নব তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটন করিতেছে, ততই তাহার অন্তর্নিবিষ্ট বিকাশ-ক্ষমতা জনসমাজের গোচরীভূত হইতেছে। জীবনযাত্রার সমস্ত প্রণালীকে মানুষ যে একান্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া খোদার উপর খোদগিরি করিতে পারে না, তাহার একটা স্বল্পাধিক প্রতীতি মনুষ্য সমাজে প্রকট হইতেছে। চিকিৎসকের বিধানে অধুনা তাই ভৈষজ্যপরতন্ত্রতা হ্রাস পাইতেছে, শিশুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া মানুষের স্বেচ্ছানুযায়ী পথে চালনা বহুদিন হইল লোপ পাইয়াছে। অপরাধের দণ্ডবিধি সমূহ রূপান্তরিত হইয়াছে। দৈহিক শাস্তি বিধান রহিত করিয়া অপরাধীগণকে পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতে দিয়া স্বতঃসংশোধনের পথে চালিত করা হইতেছে; শিক্ষার জন্য অযথা উৎকট উপায় আবিষ্কার করিয়া মাথা ঘামাইয়া

মরার অপেক্ষা সহজ স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে বোধগম্য করাই যে তাহার সার্থকতা তাহা ক্রমশঃ সকলের উপলব্ধি হইতেছে।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে প্রাকৃতিক পন্থানুসরণই যদি শ্রেষ্ঠ পন্থা হয়, তবে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ লইয়া অনর্থক ভাবিয়া মরার কি দরকার। স্বতঃই যদি শিক্ষা লাভ ঘটে তবে শিশুদের তাহাই করিতে দেওয়া যাউক। এবিষয়েও একটি মাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি স্বতঃ সংঘটিত হইলেও তাহা সহায়তা সাপেক্ষ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু তাহার লালন পালন যথাযোগ্য ভাবে না করিলে তাহার বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখনও তাহার আত্মনির্ভরের ক্ষমতা প্রস্ফুটিত না হওয়ায় তাহাকে অপরিহার্য্যতঃই অপরের সহায়তা ও চালনাসাপেক্ষ থাকিতে হয়। যাহা কিছু তাহার পক্ষে উপযোগী, তাহার অনুকূল, বয়স্ক ব্যক্তির তাহাকে তাহা করিতে বাধ্য করিতে হয়। আহার্য্যের জন্য তাহাকে যাহা দেওয়া হয়, তাহা, তাহার পরিপাক শক্তির বিচার করিয়াই দিতে হয়, খাদ্য দ্রব্য মাত্রেই তাহার খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিশুর শারীরিক বিকাশ স্বতঃই ঘটিতে থাকে, পরিচ্ছদের দ্বারা তাপ রক্ষা সেই স্বাভাবিক বিকাশকে অগ্রসর হইতে দেওয়ার সদুপায়স্বরূপ মাত্র. তাহা গায় আঁটিয়া তাহার স্বাভাবিক পরিণতির পথে মানুষ খাম খেয়ালির বশে বাধা দিলেও কখনও তাহা টিকাইয়া রাখিতে পারে না—ইহা যেমন সত্য, তেমনি তাহার মনোপ্রকৃতিকে ও মনঃশক্তিকে উপযুক্ত আয়োজন ও সহায়তার দ্বারা চালনা ও নির্দ্দেশের দ্বারা তাহার স্বাভাবিক গতিপথে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করাই পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ ও উপদেষ্টার কর্ত্তব্য; তাহাকে অযথা বাধার দ্বারা প্রতিহত করা, ও নিজের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা ভারাক্রান্ত করা কোন ক্রমেই সমীচীন হয় না, ইহাও তেমনি সত্য। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিষয়ে বয়স্ক ব্যক্তিগণের বিশেষরূপে অবহিত হওয়া উচিত, তাহা এই :—

প্রত্যেক পদার্থই প্রথম অবস্থায় অব্যক্ত থাকে, পরে সেই অব্যক্ত হইতেই ব্যক্তের ভিতর অগ্রসর হয়। মানসিক বিকাশ নির্ব্বিশেষের ভিতর হইতে বিশেষের ভিতর অগ্রসর হয়; সুতরাং শিশুশিক্ষার প্রণালীকে অভিব্যক্তির এই ক্রমানুক্রমিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

প্রথমেই সূক্ষ্ম বিষয়ে শিক্ষাদান সমীচীন নহে, প্রাথমিক শিক্ষা বস্তুগত হওয়া উচিত।

বয়স্ক ব্যক্তির বিচারের অনুপাতে শিশুর ধারণা শক্তিকে সমান করিয়া দেখা ও তদনুসারে শিক্ষা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করা পরিহর্ত্তব্য। শিশুশিক্ষাপ্রণালী স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে যে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকে আপাত দৃষ্টিতে সহজ বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা কিছু মাত্র সহজ বিষয় নহে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসে শিক্ষার যে পারম্পর্য্যের উদাহরণ ও ক্রমানুক্রমিকতার দৃষ্টান্ত আমরা পাই, শিশু শিক্ষা প্রণালী তদনুযায়ী হওয়া উচিত। জাতির ভিতর জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যে পন্থা অনুসরণ করে, ব্যক্তির ভিতরেও তাহা তদনুযায়ীই হয়। যে যুক্তির দ্বারা এই মতবাদের সমর্থন করা যাইতে পারে, তাহার খানিকটা বংশানুক্রমিকতার নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এ কথা যদি সত্য হয় যে, মানুষ আকৃতিতে ও চরিত্রে পিতৃপুরুষের সাদৃশ্যবিশিষ্ট হয়; যদি উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি এক প্রকার মানসিক ব্যাধি এক পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের ভিতর একই বয়সে সংক্রামিত হয়, যদি বংশানুক্রমে নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগত সাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিয়মানুবর্ত্তী জাতিগত সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করা যায় এবং বিভিন্ন জাতির ভিতর বৈষম্য যুগে যুগে কি প্রকারে স্থায়িত্ব লাভ করে তাহার কারণানুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে আমরা যে একটি তথ্যে উপনীত হই, তাহা এই যে,—সমুদয় বিভিন্ন জাতি একটি সাধারণ জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন জাতির জাতিগত প্রকৃতির বিশিষ্ট বৈলক্ষণ্য পুরুষ

পরম্পরাগত বৈষম্যোৎপাদক ঘটনার প্রভাব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ, পুরুষপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই এক পুরুষের প্রভাব অন্য পুরুষে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।

আত্মবিকাশ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই। শিশুদের আপন চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে দেওয়া ও তাহাদের আপনি বুঝিয়া আপনার ধারণাকে গঠন করিতে দেওয়ার অবকাশ দেওয়া উচিত। দেখাইয়া দেওয়া এবং বলিয়া দেওয়ার ভাগ যতটা সম্ভব কমাইয়া দিয়া, তাহাদের নিজেদের দেখিয়া লইতে ও বুঝিয়া লইতে তৎপর করা উচিত। মনুষ্য জাতির উন্নতি প্রধানতঃ আত্ম-শিক্ষার উপরে স্থাপিত, সুতরাং শিশুশিক্ষায় আত্ম-গঠনের শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শিক্ষার ইহা প্রধান প্রতিপাদনীয় বিষয় হওয়া চাই।

শিশুর স্বায়ত্তশিক্ষা সম্বন্ধে হয়ত অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু একটু অবহিত হইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে স্বায়ত্তশিক্ষার প্রতি মানবশিশুর স্বাভাবিক একটা প্রবণতা আছে; কারণ, শিশু তাহার পারিপার্শ্বিক দ্রব্যসমূহ ও বিষয়সমূহ হইতে যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহা আদৌ শিক্ষকের অধ্যাপনার ফল নহে, তাহা শিশুর খাঁটি স্বায়ত্তশিক্ষা। শিশু যখন মাতৃভাষা শিখিতে আরম্ভ করে, তখন সে কাহারও সাহায্য ও নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে না; এবং তাহার বহির্জীবনে সে যাহা কিছুর সংস্পর্শে আসে, যাহা কিছু দেখে, যাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়,—তাহার সম্পর্কে তাহার স্বায়ত্ত শিক্ষাই তাহাকে একান্ত ভাবে চালনা করে, নির্দ্দেশের নিয়োগ সেখানে আদৌ বর্ত্তমান থাকে না।

শিশুচিত্ত বোঝা, বিষয়টা আপাত দৃষ্টিতে সহজ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে কিছুতেই সহজ নয়। শিশুর অপরিস্ফুট জ্ঞান, অপরিণত বোধ, উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা ও দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল মনোভাবের মাঝখানেও একটা বেশ পরিস্ফুট ধারণা ও বিচার শক্তির আভাস আমরা পাইয়া থাকি, কিন্তু সেটা আমাদের বিজ্ঞতার বাজারে কম দামেই বিকাইয়া থাকে। এই যে অনবরত শিশুকে নির্দ্দেশ করা—ইহার প্রয়োজন বয়স্ক ব্যক্তিগণের মূঢ়তায় যতটা হয়, শিশুর অভিজ্ঞতার জন্য ততটা নয়। যে জিনিসের দিকে শিশুর মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, ও যাহা হইতে সে স্বতঃ জ্ঞান লাভ করে, জোর করিয়া হয় ত এক সময় তাহা হইতে তাহাকে বিরত করা হয়; এবং আবার হয়ত এক সময় শিশু যাহা বুঝিতে পারে না, বা জটিলতায় যাহা তাহার নিকট বিভীষিকাস্বরূপ, শাস্তির ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে তাহা হইতে নিরত করা হয়। ফলে লাভ হয় এই যে, শিক্ষা মাত্রের উপরেই শিশুর অন্তঃকরণে একটা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইতে থাকে। শিক্ষার এই অপপ্রয়োগ ও অন্ধনিয়োগ শিশুচিত্তকে পঙ্গুতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়া থাকে, শিক্ষাপ্রণালীতে এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ করা চাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

আমেরিকার ঘরের কথা।

গার্হস্থ্য জীবন বলিতে আমাদের মনে যে একটি বিরামপূর্ণ শান্তিময় কল্যাণচ্ছবি জাগিয়া উঠে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সাধারণতঃ সেইটী দেখিতে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ যে কর্ম্ম-স্রোতের খরতর বেগে সমগ্র জাতিটা সম্পূর্ণভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। কর্ম্ম ইহাদের গৃহকে নানাপ্রকার স্বচ্ছন্দতায়, আরামে, বিলাসসামগ্রীতে পূর্ণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের মনে তৃপ্তি আনিয়া দিতে পারে নাই।

তৃপ্তি হইবেই বা কি করিয়া? প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মতালিকা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কোন্ এক অসাধ্য বাসনার চরিতার্থতার জন্য নিরন্তর ছুটিয়া মরিতেছে, যেন যে করিয়াই হোক্ সংসারকে পাইতে হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে, ইহারা এমন পণ করিয়া বসিয়াছে।

ইহার ফলে একদিকে এই চেষ্টা যেমন ইহাদের জীবনের একটা অংশ খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছে, অপরদিকে সংসারকেই একান্তভাবে গড়িয়া তুলিবার যত কিছু সাজ সরঞ্জামে ইহাদের গৃহ ভরিয়া উঠিতেছে মাত্র; সংসারকে তবুও ধরিতে পারিতেছে না।

আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে আমেরিকার ঘরের একখানি ছবি দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিব। প্রভাতে গৃহকর্ত্রীর সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাইবার আয়োজন করা। প্রাতরাশের পর গৃহকর্ত্রী নিজে ছেলেমেয়েকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরাইয়া, বই খাতা ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়া, যাহাদের বাড়ী স্কুল হইতে দূরে তাহাদের মধ্যাহ্নের আহারের জন্য দু চারটা স্যাণ্ডুয়িচ ও কিছু মিষ্টান্ন একটী ছোট্ট টুক্‌রিতে সাজাইয়া দিয়া স্কুলে রওনা করিয়া দেন। শিশুকাল হইতেই ছেলেমেয়েরা বিদায়কালীন ইঙ্গিত সম্ভাষণ, যথা, চুম্বন, রুমাল উড়ান, অথবা হাত নাড়া ইত্যাদি করিতে শেখে। বাড়ীর সিঁড়ির উপর মা দাঁড়াইয়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাত্রা করাইয়া দেন—শিশুরা একে একে মায়ের গলা ধরিয়া চুম্বন করিয়া মায়ের আদর লাভ করিয়া কলরব করিতে করিতে স্কুলের দিকে ছুটিয়া যায়। সকালবেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় সহরের ফুটপাথ্‌ দিয়া দল বাঁধিয়া এক এক পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলের দিকে ছুটিয়াছে; সকলের হাতেই স্কুলের ব্যাগ, কাহারো হাতে খাবারের টুক্‌রি, কেহ কেহ বা এক একটা স্যাণ্ডুয়িচ্‌ খাইতে খাইতে রাস্তায় প্রাতরাশ শেষ করিতেছে। এই ছোট ছোট ইয়াঙ্কির দল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে সজ্জিত হইয়া নানারংয়ের ছোট ছোট ছাতি খুলিয়া উৎসাহের সঙ্গে কলরব করিতে করিতে যখন স্কুলের দিকে যাত্রা করে তখন মনে হয়, "Creeping like Snails unwilling to School" এই বর্ণনাটি বর্ত্তমান যুগে অন্তত এই বাচ্চা ইয়াঙ্কিদের সম্বন্ধে খাটে না।

ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার উপর আমেরিকান জননীর বিশেষ দৃষ্টি, সেইজন্য অবস্থা যেমনই হোক্‌ না কেন, ছেলে মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। একজন জাপানী সম্পাদক কিছুকাল পূর্ব্বে নিউইয়র্কের পূর্ব্বাংশে অধিকাংশ দরিদ্র গৃহস্থ পল্লীর কাছে এক স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ পরিদর্শনান্তে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "আর্থিক অভাবেই স্কুলের কাজ আশানুরূপ হইতেছে না। নিউইয়র্ক সহরকে এই প্রকার অন্তত দুইশত বিনাবেতনের বিদ্যালয় পোষণ করিতে হয়।" শুনিয়া জাপানী ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে তথাপি বেতন লওয়া হয় না কেন, এবং কেনই বা স্কুলের যথেষ্ট আয় হয় না?" অধ্যক্ষ একটু হাসিয়া সম্পাদককে নিকটবর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একটী ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা স্ত্রীলোক তাহার কন্যার দ্বিপ্রহরের খাবার লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন "এই স্কুলে যত ছাত্রছাত্রী আছেন অধিকাংশই নিতান্ত গরীবের ঘরের। ঐ মেয়েটীর মা সপ্তাহে দুই ডলারের বেশি আয় করিতে পারেন না।"

আমেরিকার বিশিষ্ট ধনীর শিশুসন্তান ব্যতীত সকলেই ফ্রী স্কুলে যায় এবং শিশুকাল হইতেই ছেলেমেয়ে একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে বাল্যকাল হইতেই ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়াই আমেরিকার যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিধান প্রচলিত আছে সেখানে সাংঘাতিক কোনো কুফল ফলিতে পারিতেছে না।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলিয়া গেলে গৃহকর্ত্রী স্বামীর সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ শেষ করিয়া ঘরের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এদিকে কর্ত্তা তাড়াতাড়ি সকাল বেলার সংবাদ পত্রের উপর চোখ বুলাইয়া সমস্ত দিনের মতন বাহিরে চলিয়া যান। অবস্থা একটু সচ্ছল না হইলে আমেরিকায় কেহ ঝি চাকর রাখেন না। এই জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীকে সমস্ত কাজই নিজের হাতে করিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে কোমর বাঁধিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করা ইঁহাদের এমন সহজ বোধ হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে

হয়। আমেরিকানদের গৃহ হইতে সামান্য মুদি দোকান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কর্ম্মের এমন একটা শৃঙ্খলা আছে, যে কোথাও কোনো অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কারণে সিকাগোর এক একটী Department Store এ আট দশ হাজার স্ত্রীপুরুষ কলের মতন খাটিতে পারে, যে কারণে নিউইয়র্ক ষ্টক্ এক্সচেইঞ্জে (Stock exchange) কোটি কোটি টাকার আদান প্রদান হইতেছে, অথচ কোনো গোলযোগ নাই কোথাও কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতে পারে না, সেই কারণেই আমেরিকার গৃহে সমস্ত দৈনিক কাজকর্ম্ম বিনা ব্যাঘাতে সম্পাদিত হয়, এবং গৃহকর্ত্রীও ইহাতে ক্লান্তি অনুভব করেন না। সুশৃঙ্খলতা ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনের একটী প্রধান মন্ত্র। অবশ্য, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থায় এবং টেলিফোন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদির সাহায্যে ঘরের কাজকর্ম্ম খুবই সহজ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতে টেলিফোনে মুদিকে, মাংসওয়ালাকে, রুটীবিক্রেতাকে, আবশ্যক জিনিষপত্রের জন্য যেমন আদেশ করা যায় অমনি তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া থাকে। সপ্তাহের অথবা মাসের শেষে বিল লইয়া আসিলে দাম চুকাইয়া দিতে হয়—আর কোনো হাঙ্গামা নাই। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা ও কার্পেটের ধূলা ঝাড়া, ঝাঁটাযন্ত্রের (Vacuum cleaner) সাহায্যে অল্প সময় ও পরিশ্রমেই হইয়া যায়। রান্না ঘরের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত অতি চমৎকার, সেইজন্য আমাদের দেশের গৃহিণীদের মতন দিনের অধিকাংশ কাল ইহাদিগকে রান্নার আয়োজনেই কাটাইতে হয় না। দ্বিপ্রহরের ভোজনাদির বিশেষ কোনো উদ্যোগ আবশ্যক হয় না—স্বামী তাঁহার কর্ম্মস্থলের নিকটবর্ত্তী কোনো দ্রুত জলখাবারের দোকানে (Quick Lunch restaurant) কিছু খাইবেন, পুত্রকন্যারা ত খাবার সঙ্গে করিয়াই গিয়াছে। সন্ধ্যার পর পিতামাতা ভাইবোন লইয়া যে ভোজনটি হয়, সেইটি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে উপাদেয় ও প্রীতিকর হয়, গৃহিণী সেইজন্য বিশেষ আয়োজন করেন। সমস্ত দিন এইভাবে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম্ম লইয়া গৃহিণীকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট কাজ ছাড়া, সপ্তাহে একদিন বিছানার চাদর, রুমাল, তোয়ালে, ছেলেমেয়েদের কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করা একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। সোমবারদিনকে ইহারা কাপড় কাচার দিন (Laundry day) বলে। ধোপার খরচ আমেরিকায় অত্যন্ত বেশি—তাই জামা, কলার ও উৎকৃষ্ট কোনো পরিধেয় ব্যতীত সমস্তই গৃহিণী নিজেই পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করেন। এত সব ঘরকন্নার কাজ করিয়াও দৈনিক সংবাদ পত্রটি, মাসিক পত্রিকা দুই একটা, অথবা নব প্রকাশিত কোনো গল্পের বই গৃহকর্ত্রীর মনোযোগ এড়াইতে পারে না। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের ফলে আমেরিকার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে বিশ্ববিদ্যালয়-উপাধিধারিণী সুশিক্ষিতা স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের বিশেষত্ব এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইহাঁদিগকে গৃহকর্ম্মে অপারগ করে নাই কিংবা ছোট খাট কাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখায় নাই, বরঞ্চ ইহাঁদিগকে গৃহকর্ম্মে নিপুণ করিয়াছে। জননী রান্নাঘরে কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, কন্যা বৈঠকখানায় পিয়ানোতে বিটোভেন্ কিংবা শোপাঁর একটা কঠিন সুর কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না, তখন তিনি আসিয়া পিয়ানোতে সুরটী বাজাইয়া দিয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলা ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে বসিয়া পড়িতেছে—শুনিলেন, মেয়ে ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, কিংবা ছেলে ল্যাটিন ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেছে না, জননী আসিয়া তাহাদের পড়া বলিয়া দিলেন; এই প্রকার দৃষ্টান্ত বহু পরিবারে দেখিয়াছি।

আমাদের দেশের অনেক পরিবারে ঘরের ছেলেমেয়েদের পিতার সঙ্গে একটা ভয়ের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার সঙ্গে সহজভাবে মিশিবার—সরল ভাবে কথাবার্ত্তা বলিবার আনন্দ ছেলেমেয়েরা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকায় ঠিক ইহার বিপরীত। সমস্ত দিনের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পিতা ঘরে আসিলেই ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দেয়; পিতা কাহাকেও পিঠে করিয়া কাহাকেও কাঁধে চড়াইয়া শিশুদের সঙ্গে খেলিতে বসিয়া যান। প্রতি সন্ধ্যায় "Daddy"র সঙ্গে খেলা করাটা শিশুদের কাছে সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার। এইরূপে শিশুকাল

হইতেই পিতামাতার সঙ্গে ইহাদের এমন একটা সরল স্বাভাবিক যোগ স্থাপিত হয় যে ইহার প্রভাব শুধু শিশুদের ভবিষ্যৎজীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তা নয়, ইহাদের গৃহকেও পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে।

শৈশবে পিতার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ হওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করিতে, তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে যুবক যুবতী তেমন কোনো সঙ্কোচ বোধ করে না। শিশুকাল হইতেই পিতা ছেলেমেয়েদের ইহা বুঝিতে দেন যে "Daddy"ই তাহাদের পরম বন্ধু।

আমি যে শ্রেণীর গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা খুব বাধ্য ও বিনয়ী হয়। একদিনের একটি ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। অপরাহ্নে আমি সিমেণ্ট করা ফুটপাথের উপর বেড়াইতেছি এমন সময়ে একটি বালক স্কেটিং করিতে করিতে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। বালকটী কিছুমাত্র খেয়াল না করিয়া "বাঃ রে কি অদ্ভুত কাপড় পরিয়াছে!" (Oh say, has n't he got a funny dress!) বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি বলিকা পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মহাশয়, মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমি কারণ বুঝিতে পারিয়া বালিকার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলাম। দ্বারে পৌঁছিতেই গৃহকর্ত্রী বলিলেন "আমি বারেন্দায় ব'সে হ্যারির অভদ্র ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলুম। ও সেজন্য নিশ্চয়ই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই" এই বলিয়া কম্পিতকলেবর বালকটিকে তলব করিলেন। বালককে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলে আমার কাছে সে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া গেল—মহাশয়,আমি যা করিয়াছি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই! (Sir, I beg your pardon for what I have done.) বালককে কোলের কাছে টানিয়া আদর করিয়া আমি বিদায় হইলাম।

গৃহে পিতামাতার শাসনে, স্নেহে, শিক্ষার প্রভাবে সংযম, বাধ্যতা ও আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা ইহারা লাভ করে সন্দেহ নাই কিন্তু আমেরিকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেখিয়াছি ইহাদের জীবনে যেন একটা কঠিন দারিদ্র্য আছে; অর্থাৎ যাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষের জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে, এমন কোনো সম্পদের খোঁজ যেন এরা পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে, শিশুকাল হইতে ইহারা যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা পায় না। পিতা তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা চাকুরী সম্বন্ধে যেমন কোনোপ্রকার কথা ঘরে আলোচনা করেন না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই। পিতামাতা উভয়েই এ বিষয়ে উদাসীন। এই জন্য সন্তানদের মনের পরিণতিও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। শুধু তাই নয়, জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাদের এমন অদ্ভুত ধারণা যে যখন কালেজের শিক্ষিত যুবক অথবা যুবতীর মুখে তাহা শুনা যায় তখন বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। আমেরিকার সাধারণ পরিবারে যে ধর্ম্মের ঔদাসীন্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার কথাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। এই ধর্ম্মশিক্ষার অভাবের হেতু একদিকে বাণিজ্যমদমত্ততা, অপর দিকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা দেখা যায়। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে, যেখানে বহুসংখ্যক বালকবালিকা প্রেরিত হয়, সেখানে শিশুকাল হইতে এমন সকল সংকীর্ণ ভাব ইহাদের মনে প্রবেশ করান হয় যে, ফিলাডেলফিয়ার একজন ধর্ম্মযাজক এইরূপ স্কুলকে মহা অনিষ্টকর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক মত কণ্ঠস্থ করান, ভিন্নধর্ম্মীদের নিন্দাবাদ শোনান, এবং অন্যান্য ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা, রবিবাসরীয় স্কুলের কর্ত্তব্যের অঙ্গ।

ধর্ম্মমন্দিরের সংখ্যা দেখিয়া যদি কেহ আমেরিকার ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা আমার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মমন্দির ধর্ম্মনিষ্ঠার মাপকাঠি নয়। যাঁহারা আমেরিকান্‌দের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা জানেন ধর্ম্মমন্দিরগুলি আজ আমেরিকান্ সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে। সান্ধ্য-সমিতি, সান্ধ্য-ভোজ, যুবকদের সাহিত্য-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যই ধর্ম্মমন্দির বিশেষভাবে ব্যবহৃত হই-

ভেছে। "Church kitchen," "Church pantry," ধর্ম্মমন্দিরের একটি অঙ্গ।

আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা সংস্কারের যুগ। সমগ্র পৃথিবীতেই ভাঙাগড়া চলিতেছে—মানবপ্রকৃতি যেন একটা পূর্ণতর ক্ষেত্রকে চাহিতেছে। তাহাকে আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চাপিয়া রাখা যাইতেছে না। বাণিজ্য-সম্পদশালিনী আমেরিকাও আজ ধর্ম্মসংস্কারের জন্য সচেতন হইয়াছে—দেশের চিন্তাশীল সমাজসংস্কারকগণ আজ ধর্ম্মপিপাসুর ন্যায় বলিয়া উঠিয়াছেন—"বিষয়-সুখে মন কি তৃপ্তি মানে?" সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে সম্পদ লাভের জন্য চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে, আমেরিকাও সে পথের যাত্রী। যে দিন ধর্ম্মকে লাভ করিয়া ইহারা ইহাদের কর্ম্মের ভিতরে সত্যকে চিনিতে পারিবে, সে দিন উভয়ের সামঞ্জস্যে বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা একটী নবীন মূর্ত্তি ধরিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। (সঙ্কলিত)

বাল্য বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার অভাব।

সুদূর আমেরিকাবাসিনী মিস্ ক্যারি, এ, টেনাণ্ট নাম্নী এক ইংরেজ-মহিলা হিন্দুরমণীদিগের উন্নতি কল্পে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা "হিন্দু বিবাহ সংস্কার সমিতির" অবৈতনিক পর্য্যটক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতের নানা স্থানে বাল্য বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

বিদেশিনী মহিলা হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি আমাদের জন্য এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, আর আমরা স্বীয় জীবনের উন্নতির জন্যও কিছু করিতে পারিতেছি না, পা থাকিতেও পঙ্গুর ন্যায় বসিয়া আছি, দাঁড়াইবার যেন বিন্দু মাত্রও শক্তি নাই, আমাদের এ অধঃপতনের কারণ কি? বোধ হয় বাল্য বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার অভাবই একমাত্র কারণ।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, তাই আমরা অপরিণত বয়সে বিবাহিত হইয়া রান্না খাওয়া ও সন্তান প্রসব করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহকেই যথেষ্ট মনে করি। ভগবান কি উদ্দেশ্যে আমাদের পত্নী ও মাতৃপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।

যে আর্য্য বংশে সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও পবিত্র চরিত্রের সৌরভ সুধায় আজিও ভারত গৌরবান্বিত, আমরা কি সেই বংশসম্ভূত নই? অধুনা সে সীতা সাবিত্রী নাই বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র তো একই রহিয়াছে, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই! কেবল হিন্দু সমাজ কতকগুলি অন্ধ সংস্কার পোষণ করিতে করিতে এতদূর সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। প্রকৃত শাস্ত্র বিষয়ে অনেকেরই অভিজ্ঞতা নাই, এই অনভিজ্ঞতার ফলে অবরোধ প্রথার স্রোত সমাজে প্রবাহিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার দ্বারও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সমাজের এই দুর্গতি। শাস্ত্রে আছে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" অর্থাৎ কন্যাকে পালন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে হইবে। আধুনিক হিন্দু সমাজে পুত্রের ন্যায় কন্যা আদরণীয়া নহে, পুত্র জন্মিলে যেরূপ আনন্দোৎসব হইয়া থাকে কন্যা জন্মিলে কখনও সেরূপ হয় না। পুত্রের শিক্ষার জন্য লোকে নানা সুবন্দোবস্ত ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। কন্যার বেলা তাহা করে না অথবা করিবার সুবিধাও থাকে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অধিকাংশ কন্যাকেই শিক্ষার্থ স্কুলে পাঠান হয় বটে কিন্তু তাহা কয়দিনের জন্য? কন্যাদের বোধোদয় বোধগম্য হইতে না হইতেই তাহাদের উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সন্তানের জননী সাজিতে হয়; সুতরাং তাহাদের আর বিদ্যাশিক্ষার সময় থাকে না। বার কি চৌদ্দ বৎসর বয়সে অপূর্ণ সন্তান প্রসব করিয়া বাড়ীর কোনও বর্ষীয়সী রমণীর সাহায্যে কোন রূপে গৃহস্থালীর কার্য্য ও চিররুগ্ন সন্তানকে পালন করিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাদের সুশিক্ষার কোনই সহায়তা করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালে রমণীগণ বাল্যবিবাহিতা ও অশিক্ষিতা ছিলেন না, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান

উপার্জ্জন করিয়া যৌবনে পরিণীতা হইতেন বলিয়াই বীরপত্নী ও রত্নগর্ভা হইতে পারিয়াছিলেন।

ভগবান যাহাদের উপর পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন তাহারা অশিক্ষিত থাকিলে কিরূপে দেশে সমুন্নত জাতীয় জীবন সংগঠিত হইবে? জননীই মানব-চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ।

"পরিবার হয় যদি নন্দনের প্রায়
প্রেম পুণ্য পবিত্রতা ফুটে যদি তায়,
মানব দেবতা হবে তাতে ভুল নাই
একাজ তোমারি নারী মনে রেখ তাই।"

একথা মনে রাখিয়াই বা আমরা কি করিতে পারি? পুরুষেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া একটি অশিক্ষিতা নিরক্ষরা বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন! আলোক-আঁধারের ন্যায় স্বামী স্ত্রী দুজনের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত, একজন জ্ঞানী অপরটি জ্ঞানহীন, সুতরাং এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির মনের মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ অতি গুরুতর। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী নামে অভিহিতা বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় কি? শিক্ষালোক-বিবর্জ্জিত ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা স্বামীর উচ্চ কার্য্যে কোন্ সৎপরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিতে পারি? বরং নিজ হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা দ্বারা আরও তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকি। রমণীরা যদি স্বীয় জীবনকে উচ্চ আদর্শে সংগঠিত করিয়া স্বামী-পুত্রের কার্য্যক্ষেত্রে সহায়তা করিতে পারে তবেই পরিবার নন্দন সদৃশ সুখ ও শান্তির আলয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা যাহাতে আদর্শ জননীরূপে সন্তানদের সুনীতি শিক্ষায় ভূষিত করিয়া মাতৃ গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বশক্তিমান প্রভু আমাদের সহায় হউন।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

নীলিমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চপলা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"সে কি! ঘর ভাঙ্গতে বলচে; কি ঘর? কার ঘর? আবার টাকা! কিসের টাকা? কাকে দেবে?"—ক্রমেই চপলার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তাঁহার আর নূতন খোকাকে ঘুম পাড়ান হইল না, ক্রোড় হইতে দোলনায় শয়ন করাইয়া তাহাকে দোল দিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য একজন দাসীকে তথায় রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নীলিমার সহিত কথা কহিয়া করুণাময় বুঝিলেন, নীলিমা তাহার স্বাধীন জীবন ও বিপুল সম্পত্তি কোন শুভকার্য্যে উৎসর্গ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে এবং অন্য কোন কর্ম্ম অপেক্ষা পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুর প্রতিপালনেই তাহার আগ্রহ অধিক। তাই তাহার পৈতৃক ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া অনাথ আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া নূতন বৎসর হইতে নিয়মিতরূপে আশ্রমের কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মহীন জীবনের দুঃখ দূর করিতে চাহে, এবং তাঁহার সাহায্য ও অনুমতি পাইলেই অবিলম্বে সে এ কার্য্য আরম্ভ করে।

সাহায্য করিতে ও অনুমতি দিতে উদার-হৃদয় পরদুঃখ-কাতর করুণাময়ের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি বরং অতিশয় আনন্দ ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত নীলিমার সঙ্কল্পিত শুভকার্য্যে যোগ দিতে সম্মত হইলেন ও তাঁহার সহোদরাসমা নীলিমা নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া এরূপ সৎকর্ম্মে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সমুদয় অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া মনে মনে যারপর নাই সুখী হইলেন।

চপলা সকল কথা শুনিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"ওমা, সে কি গো! নিজে ঘর সংসার করবে, না আজন্মকাল কেবল পরের ছেলে মানুষ করে কাটাবে! তাও নাকি হয়! তোমাদের এক আজগুবি কথা, কোথাও কিছু নাই, একেবারে অনাথ-আশ্রম স্থাপন!

ও অমনি মুখের কথা কিনা, কেউ যেন মাথার উপর নেই—ই, তা বলে যা ইচ্ছে তাই কি করা চলে?”

করুণাময় একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন—“কেন? তাতে দোষটা কি হয়, শুনি?”

চপলা বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“দোষাদোষ আর কি, ও সব হচ্ছে পুরুষ মানুষের কাজ, তাজার হোলই বা ধর্ম্মের কাজ, তবু ত একটা বুঝতে হবে! মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মতই থাকা ভাল। নিজে বাপু দেখেশুনে আপনার ঘর সংসার নিয়ে থাক, নিজের ছেলে পুলে মানুষ কর। বাপ যেমন টাকা রেখে গেছেন দান ধ্যান বেত্ত নেম কর, যেমন সকলে করে থাকে।” নীলিমা নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। করুণাময় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“দান ধ্যান ব্রত নিয়মটা কি? পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুর পালন বুঝি ‘দান ধ্যান বেত্ত নেমের’ বাহিরে?” নীলিমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বামীকে কথা কহিতে দেখিয়া চপলা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—“অত সব বুঝিনে বাপু! লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যেটা ভাল বলে জানি, পাঁচ জনে যা করে দেখি, তাই বলি; কেন, মেয়েদের বত্ত নেমের কি অভাব পড়ে গেছে? দুর্ব্বো অষ্টমী, তালনবমী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, অক্ষয় ফল, অক্ষয় সিঁদুর, গুপ্তধন, অনন্ত চতুর্দ্দশী, ছোট বড় হাজার বত্ত রয়েছে, তাতে যত ইচ্ছা টাকা খরচ করুক, গরীব দুঃখী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যত ইচ্ছা দান করুক, এ সব কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম নয়? ঘর সংসার ছেড়ে একটা আশ্রম করে দেশ বিদেশে ঢাক বাজিয়ে দান ধর্ম্ম না করিলে কি আর চলে না? আর এরই মধ্যে নীলিমার ওসব কেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের বয়স কেটে যাচ্ছে নাকি?”

তারপর বিশেষ ভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তুমি যে সাহায্য করবে বলচ, পারবে কেন? একে ত ওই শরীর, দিনরাত পরের জন্যে খেটে খেটে শরীরটাত আধখানা হয়ে গেছে, শেষে তুমি রোগে পড়লে তোমায় দেখবে কে? একটা উপযুক্ত ছেলে আছে? না একটা তোমারই কি আমারই মার পেটের ভাই ... সময়ে সকলে সখা গো অসময়ে, কেউ কারও নয়।” চপলার তিন ভগ্নী, ভ্রাতা হয় নাই, বিষয় রক্ষার জন্য এখন পর্য্যন্ত একটী পুত্র কামনায় তাঁহার জননী কোন ঠাকুরেরই ‘দোরে ধরিতে’ কোন দেবতারই পূজা মানিতে বাকি রাখিতেছেন না, ইহা নীলিমা জানিত এবং কর্ম্মপ্রিয় পরোপকারী করুণাময় নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিজের লাভ ক্ষতি গণনা না করিয়া, পরের কার্য্য নিজের ভাবিয়া করিয়া সর্ব্বদাই চপলার ভয় ও অসন্তোষের কারণ হইতেন, ইহাও তাহার জানা ছিল; সুতরাং এ সকল বহুবার শ্রুত কথায় নীলিমার ভাবান্তর হইল না, কিন্তু চপলার শেষ কথা বিশেষভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইল বুঝিয়া তাহার প্রাণে একটু ব্যথা লাগিল; তাহার মনে হইল,—তাহার প্রাণদাতা, অসময়ের আশ্রয়দাতা, সোদরপ্রতিম করুণাময়ের কোন্ অসময়ে সে অর্থ, শক্তি এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া সাহায্য করিতে না পারে! স্বামীকে নীরব দেখিয়া চপলা বলিলেন,—“চুপ করে রইলে যে? আমার কথাটা বুঝি মনে লাগল না? বোন্ বিদ্বান, যা বলে তাই ভাল, আর আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, যা বলি তাই মন্দ জানি, চিরকাল তবু বেহায়ার মত বকে মরি।” চপলা নীরব হইলেন।

করুণাময় পত্নীর দীর্ঘ বক্তৃতার অবসানে মৃদু হাসিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—“ওসব তুমি বুঝবে না গো, বুঝবে না, আজন্মকাল নিজের ঘর সংসার, নিজের সুখ সুখ করে পাগল, পরের দিকে চাইবার তোমার অবসর কোথা? আর আশ্রমের কথা তোমার ভাল লাগবে কেন, জন্মাবধি এখন পর্য্যন্ত বাপ মা'র আদর পাচ্ছ, মাতৃহীনের দুঃখ তুমি কি বুঝবে? আমরা ভাই বোনেই বাপ মা হারা, তাই জগতের সকল দুঃখের চেয়ে ওই দুঃখটাই বুঝি ভাল, তাই তাদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে কেঁদে সুখ পাই।”

চপলা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া বলিলেন,—“বালাই, আমার বাপ মা মরবে কেন, যাদের মরেচে তাদের জন্ম জন্ম মরুক”—নিজের কথায় করুণাময় কিছু অপ্রতিভ হইলেন, মনের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন, নতুবা অত শক্ত করিয়া বলা তাঁহার অভ্যাস বা অভিপ্রায় ছিল না।

তিনি পুনর্ব্বার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রাগে দুঃখে অভিমানে অশ্রুমুখী চপলা গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। উৎকণ্ঠিত ভাবে নীলিমা উঠিয়া—"যেও না বৌদি—যেওনা—এস, রাগ কোরনা"—বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, এবং কিছুক্ষণ পরেই চপলার কঠিন বাক্যে মর্ম্মাহতা হইয়া বহু চেষ্টায় অশ্রুসম্বরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, করুণাময়কে প্রণাম করিয়া বলিল,—"দাদা, আজ তবে আসি; সময় মত আমার কথাটা একটু ভেবে দেখবেন; কিন্তু এতে যদি আপনাকে অশান্তি ভোগ করতে হয় ত বড় দুঃখিত হব, আবার আপনার সাহায্য ভিন্ন একাজ আরম্ভ করিতে পারাও আমার পক্ষে অসম্ভব।"

করুণাময় বলিলেন,—"সে ত নিশ্চয়ই। তুমি কিছু ভেব না নীলিমা, আমার দ্বারা যতটুকু হয় আমি তোমার কাজের সাহায্য করব। আমার অশান্তির জন্য দুঃখিত হইও না, ও আমার ঢের দিন সয়ে গেছে। ওজন্য আমিই দায়ী, আর কারও দোষ নয়, আমার অশান্তি আমার অদৃষ্টের ফল।

(৭)

কয়েক বৎসর গত হইল, নীলিমার পিতৃভবন ভূমিসাৎ করিয়া তাহার সাধের অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, অনাথ আশ্রমের কক্ষগুলি পিতৃমাতৃহীন শিশু সন্তানে পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর নীলিমা "নীলিমা" নয়, সে এখন "ভারতের অনাথ শিশুর মা।" দেশ বিদেশের হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, পার্শী, শিখ মহারাষ্ট্রী ছেলে মেয়ের কলহাস্যে তাহার পুষ্পোদ্যান মুখরিত।

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া দেশ বিদেশে লোক পাঠাইয়া নীলিমা আরও কয়েক জন পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী পতিপুত্রহীনা অনাথিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, উচ্চ বেতন দিয়া নিজের কাছে রাখিয়া সন্তান পালনে সুশিক্ষিতা করিয়া লইয়াছে। এখন তাহারা তাহার স্নেহের ভগিনী, কার্য্যের সঙ্গিনী।

সেই শোকভারগ্রস্তা নিরানন্দমনা নীলিমা এখন দুধের বাটী কাছে রাখিয়া মাতৃহীন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যখন ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ায়,—ভাতের থালা হাতে লইয়া অনাথ বালক বালিকাকে পরিবেশন করিয়া আহারে তৃপ্ত করে,—প্রভাতে সন্ধ্যায় উদ্যান বেদিকায় শত শিশু বেষ্টিতা হইয়া জগৎ পিতার উপাসনা করে—নিশীথে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে, তাহার স্নেহ-বর্দ্ধিত সুস্থ সবল শিশুগুলির সুপ্ত মুখের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে—তখন তাহার অন্তর যে বিপুল আনন্দে পূর্ণ হয়, তাহার সহিত রাজাধিরাজের জননী বা রাজ্যেশ্বরীর সুখের তুলনা হয় না। মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, পার্শী, পঞ্জাবী, সকলে মিলিয়া বঙ্গশিশুর সহিত সমস্বরে যখন তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে, তখন তাহার মুখে যে নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠে জগত সংসারে তাহা নিতান্তই দুর্লভ সামগ্রী বলিয়া মনে হয়।

* * * * * * * * * * * * * * *

সেদিন দ্বিপ্রহরের পর ছোট দুটী শিশু সঙ্গে লইয়া অনাথ-আশ্রমের দ্বারে আসিয়া করুণাময় ডাকিলেন,—"ওগো অনাথের মা! (করুণাময় আদর করিয়া মাঝে মাঝে নীলিমাকে ঐ নামে ডাকেন) দেখ, আজ আবার তোমার জন্য দুটী অনাথ শিশু কুড়িয়ে এনেছি।"

দাসী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া বলিল,—"মামাবাবু, বসুন, মা চান করতে গেছেন, এখুনি আসবেন।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এত বেলায় স্নান!"

নীলিমা যেমন আশ্রমের প্রত্যেকেরই মা করুণাময়ও তেমনি সকলেরই মামাবাবু। তিনিই এ আশ্রমের একমাত্র ডাক্তার, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ভুলিয়াও কখন ডাক্তার বাবু বলে না। আশ্রমে যাহার যখনই যে অসুখ হউক করুণাময়ই তাহার চিকিৎসা করেন এবং ঔষধের দাম নীলিমার নিকট হইতে না লইয়া নিজেই সে ব্যয় বহন করেন। তবে চপলার অসম্মতি হেতু অসমর্থ রোগী ভিন্ন কাহাকেও আশ্রমে আসিয়া দেখিতে পারেন না, নীলিমাকে দাসী সঙ্গে দিয়া তাঁহার বাটীতে তাহাদের পাঠাইয়া দিতে হয়। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত অনাথ-আশ্রমে গিয়াছেন জানিতে পারিলে চপলা কলহ করিয়া মহা অশান্তির সৃষ্টি করেন, সুতরাং শান্তিপ্রিয় করুণাময়

তাঁহাকে বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া নীলিমাকেই বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—"মনে দুঃখ কোর না বোন্, আমি আগেকার মত প্রতি সপ্তাহে আর তোমায় দেখতে আসব না, তোমার বৌদিদিকে ত ভালরকম জান, তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে আমার অন্ন উদরস্থ হওয়া ভার হবে।"

করুণাময়ের আগমন সংবাদ পাইয়া নীলিমা স্নান শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট শিশু দুটীকে পাইয়া হৃষ্ট হইল। করুণাময় তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি ত খুব সংসারী হয়ে পড়েছ নীলিমা! তোমার যে দেখছি নিশ্বাস ফেলবার সময় নাই, তিনটার সময় যখন স্নান করে এলে, আহার করতে ত তাহলে চারটে বেজে যাবে। এত কি কাজ তোমার নীলিমা? আশ্রমে তোমার এত লোক অবিশ্রান্ত খাটছে, তবু তুমি স্নানাহারের সময় পাও না!"

নীলিমা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"কি করি দাদা, হয়ে ওঠে না। একে নৈমিত্তিক কাজ আছেই, তার উপর আপনি ত জানেন, আজ কদিন থেকে আমার তিনটী ছেলের অসুখ। আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে কারও অসুখ হলে হাজার লোকে হাজার যত্ন করুক, আমি গিয়ে বিছানায় না বসলে, নিজের হাতে ঔষধ না খাওয়ালে, দুধের বাটী মুখে না ধরলে, ওদের মন ওঠে না, কারও কাছে আমার একটু যেতে দেরী হলে ওদের অভিমান হয়। তা ছাড়া যতই লোক জন থাকুক, আমি কোন কাজে হাত না দিলে চলে না, ওদের উপরে নির্ভর করে থাকলে আমার ছেলেমেয়েদের ঠিক যত্ন হয় না, তাই নিজের চোখে সকল দিক্ না দেখে, সকলের সঙ্গে নিজে সব কাজে যোগ না দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না; সত্যিই দাদা, আমার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আগে যেমন আমার দিনগুলা কোন রকমেই আর ফুরাতে চাইত না, এখন তেমনি কোথা দিয়ে কি করে যে দিনগুলো কেটে যায় বুঝতেই পারি না, সকল দিন একটু বিশ্রামেরও সময় মেলে না; কিন্তু এতে আমার কোন কষ্ট নেই, বরং আনন্দ। দাদা! এখন বিশ্বের মাতৃহীন শিশুর মা হয়ে আমি মায়ের অভাব ভুলেছি। এতদিনে বুঝেছি, দয়াময়ের দয়া হতে বঞ্চিত হইনি, বরং তাঁর বেশী কৃপা লাভ করেছি। সাতটী 'আপনার'কে যদি তিনি আমার কাছ থেকে কেড়ে না নিতেন, তাহলে এতগুলি পরকে আপনার করতে পারতাম না, এমন করে 'আমার' বলে এদের কোলে টানতে পেতাম না। ধন্য সেই বিশ্বজননী যিনি আমায় এ সৌভাগ্য দিয়েছেন।" প্রফুল্ল মুখে সজল নেত্রে নীলিমা নীরব হইল। সানন্দে প্রসন্নমুখে করুণাময় বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি বোন্, তোমার আশা পূর্ণ হোক্, অনাথ শিশুদের মানুষ করবার জন্য তুমি যেমন প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করচ তেমনি ঐ সকল শিশু যেন প্রকৃত মানুষ হয়ে তোমার সকল শ্রম সার্থক করে। আজ তুমি ভারতের অনাথ শিশুর মা, পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এমন দিন আসবে যে দিন তুমি ভারতের সুসন্তানদের জননী বলে জগতে পরিচিত হবে।"

বাটী ফিরিবার জন্য করুণাময় উঠিলেন। "দাদা, আর একটু দাঁড়ান, আপনাকে আমার একটা কথা বলবার আছে"—বলিয়া নীলিমা অন্য ঘরে গেল।

একটু পরেই দাসী তিনটী বাক্স রাখিয়া গেল। নীলিমা বাক্স খুলিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি দেখাইয়া বলিল—"মায়ের, বৌদির ও আমার এই গহনা গুলো বৃথা বাক্স-বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে কেন? আমি বলি দাদা এগুলো সব বেচে দিন, তাহলে সেই টাকা, আর শুধু আমার নামে বাবা যে দুখানা কোম্পানির কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, এ পর্য্যন্ত সুদে আসলে অনেক টাকা হয়েছে, সেই টাকা এই দুটো একত্র করে আশ্রমের পাশেই একটা ছোটখাট স্কুল খুলতে পারা যায়। আমার ইচ্ছা, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে আশ্রমের শিশুদের বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই স্কুলে শিক্ষা দিয়ে অন্য স্কুলে পাঠান হয়। কেননা, আমার বিশ্বাস, সাধারণ শিশুর শিক্ষা বাপের চেয়ে মায়ের দ্বারাই যখন বেশী ভাল হয় তখন মাতৃহীন অনাথ শিশুদের প্রথম শিক্ষা শিক্ষকদের দ্বারা না হয়ে বিশেষ ভাবে সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারাই হওয়া উচিত।"

করুণাময় ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন—"একথা

আমি বিশ্বাস করি বেশ, তুমি যদি এরকম একটা স্কুল খুলতে চাও আমি যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করব, কিন্তু”—অলঙ্কার রাশি হইতে নীলিমাকে তাহার নিজের অলঙ্কারগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাক্সে উঠাইয়া দিয়া বলিলেন—“মায়ের ও বৌদিদির গহনা তুমি অনায়াসে বিক্রয় করিতে পার কিন্তু তোমার গহনা বিক্রয় করবার কোন আবশ্যক দেখি না, তুমি রেখে দাও, ওগুলি তোমার কাছে থাকলেও টাকার অনাটন হবে না।”

নীলিমা পুনরায় উহাও করুণাময়কে বিক্রয় করিয়া দিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া বলিল,—“আমি আপনার এ কথাটী রাখতে পারলুম না, এর জন্য আমায় ক্ষমা করুন, দাদা! আমি অনাথের মা, হীরা মুক্তার গহনা পরা আমার সাজে না; মায়ের হাতের এই আংটী দুটী আর সোনার চুড়ি কগাছা আমার পক্ষে যথেষ্ট; এ দুটীই আমার সকল সময় সকল সুখে দুঃখে কাজে কর্ত্তব্যে দিনরাত আমার মায়ের মুখ আমার চোখের সামনে সমুজ্জ্বল করে রাখে, মায়ের স্পর্শ অনুভব করায় বলে এত আদর করে হাতে রেখেছি। নহিলে এরও আবশ্যক ছিল না।” এমন সময় একদল স্কুল-প্রত্যাগত বালক বালিকা আসিয়া হাসিমুখে মা বলিয়া নীলিমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

করুণাময় ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—“একি! তবে চারটে বেজে গেল, নীলিমা, এখনও তোমার আহার হল না যে! যাও যাও আহার করগে, ও সকল কথা আবার অন্য সময় হবে, এখন আমি চল্লুম।”

সমাপ্ত।

প্রয়াগ-প্রবাসিনী।

জীর্ণ পাতার কাহিনী।

শীতের অন্তে বসন্ত সে ধরে
ভয়ে ভয়ে আসে যায়।
সহসা কেমনে জাগিয়া নীরবে
নয়ন মেলিনু হায়!

তখনো তরুণ রবির কিরণ
জাগে নাই ভাল করে,
কুয়াশা-ঘোমটা রয়েছে তখন
ঊষার “মুখের’পরে!
জীবন নব শোণিত আভায়
দেহ সে হতেছে রাঙ্গা
উতলা কোকিল থেকে থেকে গায়
পরাণের ঘুম ভাঙ্গা!

পূজা চন্দনের গন্ধ ভেসে এ’ল
দক্ষিণ মলয় বায়ে,
কে যেন জাগায়ে আলো দিয়ে গেল
কুসুম ফুটিল গায়ে!
আমারি আড়ালে উঠিল বাড়িয়া
কোমল গোলাপী দল,
জীবনের মোর কামনা কাড়িয়া
প্রাণ পেল পরিমল!
তপনের আলো বরষার বারি
পান করি প্রাণ ভরে
শরত পবনে পাপড়ি বিথারি
ফুল সে গিয়েছে ঝরে!

হুহু করে আসে উত্তর পবন
দক্ষিণ নাহি সে আর,
এল কুহেলিকা পাণ্ডু দেহমন
ঝরে যাব এই বার,
ওগো জেগেছিনু আকাশে চাহিয়া
আলোকে ভরিয়া আঁখি,
ধরণীর বুকে বেদনা বহিয়া
আঁধারে মিশিতে বাকী!

২১।১০।১১ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

তীর্থযাত্রা।

(ব্রীষ্টল)

গত ১৩ই আশ্বিন রবিবার ৬॥ টার সময় উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া তীর্থ যাত্রার জন্য প্রস্তত হইলাম। লণ্ডনের সেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। মনে ভয় হইল, আমাদের এই পুণ্য-যাত্রা বুঝি বা পণ্ড হয়। ৮ টার সময় দেখি, দরজায় সতীশ বাবু আসিয়া হাজির। তিনি লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং তাঁর উদ্যোগেই আমরা দল বাঁধিয়া তীর্থ দর্শনে অভিলাষী হইয়াছি। ৯ টার সময় আমাদের গাড়ী প্যাডিংটন ষ্টেশন ছাড়িল।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, হিরণকুমার গুপ্ত, তারাপ্রসাদ চালিহা (আসামবাসী), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সিংহ, সতীশচন্দ্র রায়, আর আমি—এই কয় জনে মিলিয়া দল বাঁধিয়া যাত্রা করিলাম।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন করিব, এই আকাঙ্ক্ষায় আমাদের প্রাণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। লণ্ডনের ধূম্রলোক পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের গাড়ীখানি গাঢ় সবুজ শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভীষণ সর্পের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। লণ্ডনের ইট্ পাথরের চাপে পড়িয়া মনটা স্ফূর্ত্তি পাচ্ছিল না। তাই দুই ধারের উচু নীচু ঘাসের ক্ষেতের সবুজতায় চোখ বুলাইয়া খুব একটা আরাম উপভোগ করিতে করিতে চলিলাম। কৃষকদের সাদাসিধে অথচ যত্নে সজ্জিত সুন্দর বাড়ীগুলি গাড়ী হইতে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলি বন্ধনহীন অবস্থায় ঘাসের ক্ষেতে চরিয়া বেড়াইতেছে। স্থূলাঙ্গী গাভী গুলি ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া আবার চর্ব্বণে মনঃসংযোগ করিতেছে। এদেশের মানুষগুলি যেমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ পশুগুলিও তাই। মানুষ যেমন স্বাধীন পশুগুলিও তেমনি স্বাধীন, তাহাদের শিংএ দড়া নাই। খুঁটি দিয়া কেহ এদের বাঁধিয়া রাখে না। প্রফুল্ল মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আহার সংগ্রহ করে। কতক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী রীডিং সহরে উপস্থিত হইল। সহরটী আধুনিক যুগের তৈরী। বাড়ী গুলি চক্‌চকে। রাস্তা গুলি আধুনিক ধরণের—সোজা ও প্রশস্ত। ছেলেবেলা ভুগোলের ক্লাশে যখন কণ্ঠস্থ করিতাম—"রীডিং—এখানে খুব ভাল বিস্কুটের কারবার আছে।" তখন রসনাগ্র জলে ভিজিয়া উঠিত।

তারপর সকালে সাড়ে দশটায় ব্রীষ্টলে পৌঁছিলাম। ডাঃ মৈত্র আমাদের পাণ্ডা হইলেন। তাঁর সেই সুন্দর চেহারা, মাথায় সোণালী রঙ্গের ভারতীয় উষ্ণীষ। দিব্যি রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল। আমরা তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। তিনি ম্যাপ্ খুলিয়া দর্শনীয় স্থান গুলি দাগ দিয়া আগে আগে চলিলেন। ডাঃ মৈত্র একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যটক। সম্প্রতি (Continent) কণ্টিনেণ্ট ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তার মুখে ভ্রমণ-কাহিনী বড়ই মধুর শোনায়। তিনি বেশ আলাপ-কুশল, দু'মিনিটের মধ্যে লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। অল্প কথাবার্ত্তার মধ্যেই হৃদ্যতা করিতে পারেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হাসি মুখের গল্পে দলটীকে বেশ জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের এতগুলি কালো মূর্ত্তি একত্র দেখিয়া ব্রীষ্টলের নরনারীর মনে তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। ছোট বোন্‌টী খেলা ফেলে তার দিদিকে ডাকিয়া আমাদের কালা আদ্মীর শোভাযাত্রা দেখিতেছিল। ভাগ্যিস্ সেদিন রবিবার ছিল। দোকান পাট বন্ধ। রাস্তাঘাট জনশূন্য। তা নইলে আমাদের নয়টী কাল রূপের আকর্ষণে রাস্তার জনতা হয়ত আরও ভীষণ হইয়া উঠিত।

ব্রীষ্টল ইংলণ্ডের অতি পুরাতন সহর। লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। ইহার বাড়াগুলি পুরাতন ধরণের। রাস্তা আঁকা বাঁকা। বাড়ীগুলি পাথরের কিন্তু মলিন। এভন নদীর অপর পারে অসংখ্য তামাক, চকোলেট্ ও ককোর কল। সহরটী উচু নীচু পাহাড়ময়। পাহাড়ের উপরের রাস্তা হইতে নদীর অপর পারের সারি সারি চিম্নী ও ছোট্ট ছোট গ্রামগুলি বেশ দেখাচ্ছিল। তার পর ধূ ধূ করুছে প্রান্তর।

আমরা সেণ্ট্ মেরীর Saint Marys গির্জ্জা দেখিলাম। গির্জ্জাটী ইংলণ্ডের মধ্যে পুরাতন ও সুন্দর। সেখান হইতে সহরের প্রান্তে একটী ঝুলান সেতু দেখিতে গেলাম।

এভন নদীর দুই তীরে উন্নত পাহাড় আকাশ ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়াছে। একদিগের পাহাড়টী প্রস্তরময়, বৃক্ষহীন। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ -নগ্ন সন্ন্যাসীর মত রূক্ষ অথচ শান্ত। অপর পারের পাহাড়টী বিচিত্র তরুলতার শ্যামল পল্লবে শোভিত; স্নিগ্ধ ও কোমল। সেতুটী এই দুই বিপরীতকে যুক্ত করিয়াছে। এই সেতুর উপর দাঁড়াইয়া আমরা সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত পাহাড় দুইটী আমাদের প্রাণের ভক্তিকে উদ্বেলিত করিতেছিল। আর মনে পড়্ছিল সেই মহাত্মাকে—যিনি সমগ্র জগতকে এক উদার বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্মে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনিও হয়ত কত দিন এইখানে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উদাস রাগিনীতে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের আত্মাকে বিশ্বের দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন লণ্ডনে রাজার স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন, "রামমোহনের জীবন রামধনুর ন্যায়, তার এক প্রান্ত পূর্ব্বে আর এক প্রান্ত পশ্চিমে। তাঁহার জীবন বিচিত্র জ্ঞান, বিচিত্র কর্ম্ম ও তপস্যায় রামধনুরই মত সুন্দর।" বিশাল উদার হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে আলিঙ্গন দ্বারা মিলিত করিয়াছেন। জগতের যেখানে যে সত্য দেখিয়াছেন তাহাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্র সত্যকে দেখিবার উপযুক্ত দৃষ্টি তাঁহার ছিল। ভারতের অমৃত বাণীকে বহন করিয়া তিনি পশ্চিমের দ্বারে অতিথি হইয়াছিলেন। জন্ম পূর্ব্বে, মৃত্যু পশ্চিমে। জীবনের দুই প্রান্ত যেন উভয় সমতার মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। সেই মহাত্মাকে আজ অন্তরে অনুভব করিলাম। দেশ, সমাজ ও স্বজাতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দুর্জ্জয় হৃদয়বলে সেই মহাপুরুষ এই পাহাড়েরই মত অটল হইয়া হয়ত এই 'এভনে'র তীরে কতদিন ধ্যাননেত্রে তাঁহার সেই উদার বিশ্বধর্ম্মের স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

এখানে আমাদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের আলাপ হইল—তাঁহার নাম টিউটার পোল। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও ভক্ত প্রমথলাল সেনের বন্ধু। মিঃ পোল, তাঁহার পত্নী ও মিস্ ব্রুডী আমাদের সঙ্গে রাজার সমাধি দর্শনে চলিলেন।

বেলা দুইটার সময় সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। রাজার সমাধিস্তম্ভটী ঐ কবরখানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সুন্দর। কাশীর ক্ষুদ্র হিন্দুমন্দিরের ধরণে নির্ম্মিত। চারিদিক খোলা। মন্দিরের মাথার উপরে একটী সুন্দর চূড়া। তাহার চারিদিক ঘিরিয়া আবার আটটী ক্ষুদ্র চূড়া। মধ্যস্থিত প্রস্তরফলকে খোদিত রহিয়াছে :—

"এই প্রস্তরের নিম্নে রাজা রামমোহন রায়ের দেহাবসান রহিয়াছে। তিনি বিবেকবান্ ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। একমাত্র পরমাত্মার পূজায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অসাধারণ স্বাভাবিক প্রতিভাবলে অল্পবয়সেই বহুভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুধীমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগের সামাজিক, নৈতিক, ও দৈহিক উন্নতিসাধনে তাঁহার অক্লান্ত শ্রম, পৌত্তলিকতা ও সতীদাহ নিবারণে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যে সকল মঙ্গলকর্ম্মে ভগবানের মহিমা গৌরবান্বিত হইবে এবং মানবের কল্যাণ সাধিত হইবে তৎপ্রতি আবেগময় সহানুভূতি—এ সকল তাঁহার স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মৃতিরূপে জীবিত রহিয়াছে। উত্তরাধিকারিগণ শোক ও গৌরবের সহিত তাঁহার স্মৃতি এই প্রস্তরফলকে অঙ্কিত করিয়াছে।

বঙ্গদেশে রাধানগরে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রীষ্টলে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ সমাধির উপরে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। সমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সতীশ বাবু রাজার সেই মহান্ আদর্শের প্রেরণায় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে—তাঁহার সেই উন্নত পতাকা ধারণে আমাদিগকে শক্তিশালী করিতে—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

আমি ভ বিতে লাগিলাম, আর কত শতাব্দীর সাধনার পরে রামমোহনের স্বপ্ন তাঁরতে সফল হইবে!!

তারপর ব্রীষ্টলের চারিদিক্ হইতে গির্জ্জার চূড়ায় চূড়ায় সন্ধ্যার মঙ্গল-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে ভক্ত নরনারী বিরাম-গৃহ ছাড়িয়া ব্যাকুল প্রাণে ভগবৎ-পূজার জন্য মন্দিরাভিমুখে ছুটিল। আমরাও ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে সমাধিমন্দির হইতে বিদায় লইয়া ৭টার গাড়ীতে ব্রীষ্টল ছাড়িলাম।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

চন্দ্র।

শৈশব হইতে চন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয়। ছেলেবেলা মায়ের কোল হইতে "আয় আয়" বলিয়া চাঁদকে কত ডাকিয়াছি! সন্ধ্যা হইতেই চাঁদ দেখিবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছি। চাঁদের কত গল্প, কত কাহিনী আজও মনে গাঁথা রহিয়াছে।

পণ্ডিতেরা দূরবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের যে সকল আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় কৌতূহলজনক।

চন্দ্রের সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফ-চিত্র তোলা হইয়াছে। চন্দ্রের যে মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদের আফ্রিকার মানচিত্রের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট বোধ হইবে না। চন্দ্রের মানচিত্রে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামগুলির মত স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পৃথিবী একটী গ্রহ। যে সকল জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারিদিকে ঘুরে, উহাদিগকে চন্দ্র বা উপগ্রহ কহে। আমাদের চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। অনেকের ধারণা, আমাদের পৃথিবীরই কেবল চন্দ্র আছে, আর কোন গ্রহের চন্দ্র নাই। বাস্তবিক তাহা নয়। সৌরজগতের অনেক গ্রহেরই চন্দ্র আছে। চন্দ্র সম্বন্ধে বরং আমাদের পৃথিবীই দরিদ্র। পৃথিবীর একটী চন্দ্র, মঙ্গলের দুইটী, বৃহস্পতির পাঁচটী, শনির আটটী, ইউরেনাসের চারিটী এবং নেপচুনের একটী। সাধারণের পরিচিত গ্রহের মধ্যে কেবল বুধ ও শুক্রের চন্দ্র নাই।

গ্রহগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহ বা চন্দ্রের গতিও ঐ প্রকার; কেবল ইউরেনাস ও নেপচুনের চন্দ্র পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।

আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পৃথিবীর চন্দ্রের কথা বলিব। খালি চক্ষে দেখিলে চন্দ্রকে সূর্য্যের ন্যায়ই বড় দেখায়। বাস্তবিক চন্দ্র পৃথিবী হইতেও অনেক ক্ষুদ্র। প্রায় পঞ্চাশটী চন্দ্র একত্র করিলে আমাদের পৃথিবীর সমান হইবে। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় দুই হাজার একশত ষাট (২১৬০) মাইল। কিন্তু আয়তনের তুলনায় ওজন খুব কম। আশিটী চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর ওজনের সমান হইবে। অতএব চন্দ্রের উপাদান পৃথিবীর উপাদান হইতে অনেক হাল্কা। *

চন্দ্র ২৪০০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র ঠিক গোলাকার হয়। পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়। চৌদ্দ পনর দিন পর আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন অমাবস্যা। অমাবস্যার পর চাঁদ আবার বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে আবার চৌদ্দ পনর দিন পর পূর্ণ হয়। একদিনে চন্দ্রের যতটুকু অংশ বাড়ে বা কমে সেই অংশকে 'কলা' কহে।

চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় বলিয়া উহাকে উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবী দিনের বেলায় যেরূপ আলোকিত হয়, চন্দ্রও ঐরূপ আলোকিত হয়।

আমাদের দেশের হিন্দু পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীনকালেই এই তথ্যটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:– "চন্দ্রের কোন তেজ নাই, চন্দ্রের যে অংশ

---

* চন্দ্রের ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। এইজন্য চন্দ্রমণ্ডলের কেন্দ্র ও উহার ভারকেন্দ্র এক নহে। এই দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল চন্দ্রের ভারকেন্দ্র হইতে চন্দ্রমণ্ডলের কেন্দ্র পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

সূর্য্যের দিকে থাকে সেই অংশ সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলিত প্রকাশ পায়। অপর অংশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত না হওয়াতে শ্যামল থাকে। যেমন রৌদ্রে একটা ঘট রাখিলে তাহার এক অংশই প্রকাশিত হয়, অপর অংশ তাহার নিজের ছায়াতে অপ্রকাশিত থাকে, এই স্থলেও সেইরূপ হয়। যে দিন চন্দ্রের অৰ্দ্ধভাগ অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—সেই ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত না হয়—সেই দিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্য এক রাশিস্থ অর্থাৎ সমসূত্রে অবস্থিত হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রে লোক থাকিলে আমাদের দিনের বেলায় যখন পৃথিবী আলোকিত হয় তখন তাহারা পৃথিবীকে চাঁদের মত দেখে। আমাদের চাঁদের যেমন হ্রাস বৃদ্ধি হয়, চাঁদের লোকও তাহাদের চাঁদের অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে।
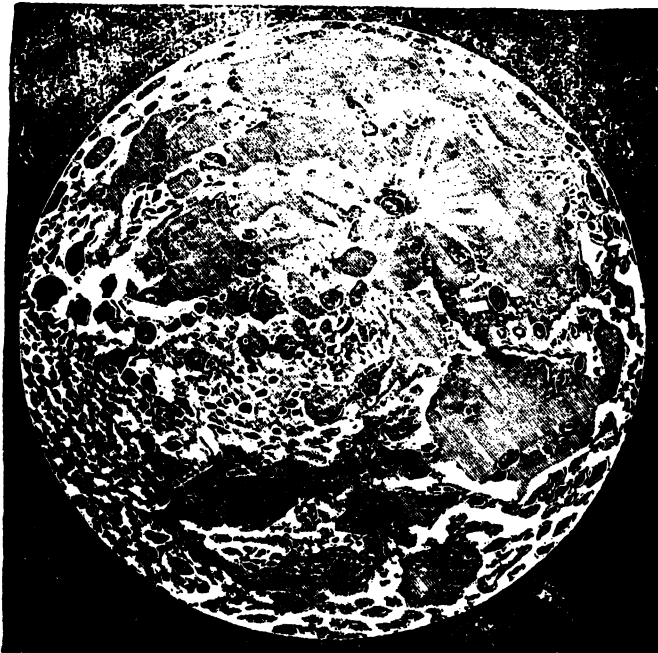
আমাদের চন্দ্রের উদয় অস্ত আছে; কিন্তু চাঁদের চন্দ্রের উদয় অস্ত নাই। চাঁদের লোক তাহাদের চাঁদকে একস্থানেই দেখিতে পাইবে। তাহাদের চাঁদ একস্থানে দুলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়; আবার ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণ হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখা যায়, অমাবস্যার দিন পৃথিবীকে চন্দ্র হইতে উহার ১৫ গুণ বড় চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু পূর্ণিমার সময় চন্দ্র হইতে পৃথিবী দেখা যাইবে না।

গ্রহদিগের ন্যায় চন্দ্রেরও আহ্নিক গতি আছে। অর্থাৎ চন্দ্রও নিজ কল্পিত মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্র ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরে এবং ঐ সময়ে পৃথিবীকেও একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এইজন্য আমরা চিরকাল চন্দ্রের একদিক দেখিয়া থাকি। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই কখন না কখন চাঁদ দেখিতে পায়। কিন্তু চন্দ্র সর্ব্বদা একদিক পৃথিবীর দিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া চন্দ্রের এক পিঠের লোক চিরকাল তাহাদের চন্দ্র (পৃথিবী) দেখিবে, তাহার আর উদয় অস্ত হইবে না। কিন্তু চন্দ্রের যে পিঠ আমরা দেখি না সেই পিঠের অধিবাসিগণ কোন কালেও চন্দ্রের চাঁদ দেখিতে পাইবে না।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা যেমন দিনরাত্রি হয়, সেইরূপ চন্দ্রের আহ্নিক গতি দ্বারাও চন্দ্রের দিন রাত্রি হয়। আমাদিগের ২৯½ দিবসে চন্দ্রের এক দিবস হয়। চন্দ্রের যে ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সেই ভাগে দিন, অন্য ভাগে রাত্রি। একবার সূর্য্য উদয় হইলে চন্দ্র হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। আবার সূর্য্য চৌদ্দ দিন অদৃশ্য থাকে; তখন চন্দ্রের রাত্রি। সুতরাং আমাদের চৌদ্দ দিনে চন্দ্রের একদিন আর চৌদ্দ রাত্রিতে এক রাত্রি। সেখানে লোক থাকিলে উহারা বোধ হয় এক এক জন ছোট খাট কুম্ভকর্ণ; নতুবা এরূপ দীর্ঘ রাত্রি কিরূপে ঘুমাইয়া কাটাইবে?

আমাদের দিন যখন একটু বড় হয় তখন আমাদের গ্রীষ্মকাল। আমরা সেই সময়ে খুব গরম অনুভব করি। আবার রাত্রি যখন একটু বড় হয়, সূর্য্যের উত্তাপ কিছু কম পাই, তখন শীতকাল। যেখানে আমাদের চৌদ্দ রাত্রিতে একরাত্রি এবং চৌদ্দ দিনে

একদিন সেইখানে কি ভীষণ শীত এবং গ্রীষ্মকালে কি ভয়ানক গরম তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

চন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন,—অতি প্রাচীন কালে পৃথিবী যখন উষ্ণবাষ্পাকারে ভীষণ বেগে শূন্যপথে ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ কতকটা অংশ কেন্দ্রাপসারিণী গতিতে পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সেই বিশ্লিষ্ট অংশ আবার মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। উহাই এখন চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে একটা পদার্থ চলিয়া যাওয়াতে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হওয়া স্বাভাবিক। সেই গর্ত্তটাই নাকি আমাদের প্রশান্ত মহাসাগর। আমাদের পুরাণের "সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্রগর্ভ হইতে চন্দ্র উত্থিত হইয়াছিল," এই কাহিনী পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদিগের মতেরই রূপান্তর কিনা এখন বলা অসাধ্য।

চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে উহার গায় কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাল চিহ্নগুলি প্রাচীন কালের লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই; চন্দ্রের অবস্থা জানিবার জন্য নানাবিধ কাল্পনিক গল্প রচিত হইয়াছিল। সেই সকল অদ্ভুত গল্প শুনিলে এখন আমাদের হাসি পায়। আমরা ছেলে বেলা ঠাকুর মার নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে; সেই বটগাছের নীচে বসিয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সূতা কাটিতেছে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর চন্দ্রের কাল দাগগুলির প্রকৃত কারণ বাহির হইয়াছে।

আমরা চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ যেরূপ মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখি বাস্তবিক উহা তদ্রূপ নহে। ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় চন্দ্রপৃষ্ঠও অসমান; কোন স্থান উচ্চ, কোনও স্থান নিম্ন। দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে চন্দ্রে অসংখ্য উচ্চ পর্ব্বত ও গভীর গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রের একপিঠ আমরা দেখি। অপর পিঠ কিরূপ তাহা বলিবার সাধ্য নাই। হয়তো সেইদিক বৃক্ষলতাদিশোভিত এবং বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী।

চন্দ্রের পাহাড়গুলিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে উহাদিগকে খুব উজ্জ্বল দেখায় এবং পাহাড়গুলির পার্শ্বে কৃষ্ণ ছায়া পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এরূপ নিবিড়

চন্দ্রের পর্ব্বতাদির দৃশ্য।

কাল ছায়া পতিত হইতে পারে না। চন্দ্রে বায়ু নাই, পৃথিবীতে বায়ু আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্য্যরশ্মি অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত করিয়া দেয়। চন্দ্রে বায়ু না থাকাতে তথায় আলোক বিক্ষিপ্ত হয় না, তাই চন্দ্রের গায় পাহাড়ের ছায়া অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। উহাই চন্দ্রের কলঙ্ক বা কাল চিহ্ন। তদ্ব্যতীত চন্দ্রে কতকগুলি গভীর গহ্বর আছে, উহাদের ভিতর সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, এইজন্য ঐ সকল স্থান গভীর কৃষ্ণ বর্ণ দেখায়।
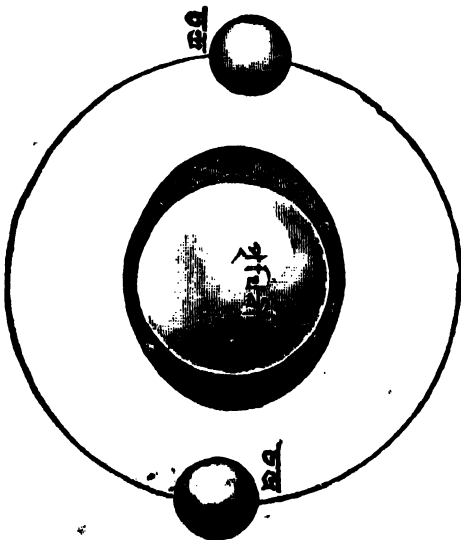
শুক্লপক্ষের অষ্টমী, নবমী তিথি পর্য্যন্ত পাহাড়ের ছায়াগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ণিমার রাত্রে সূর্য্যের আলোক ঠিক সম্মুখ হইতে চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তখন ছায়াগুলি পাহাড়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়। সেইজন্য তখন আর তত বেশী কাল চিহ্ন দেখা যায় না। দূরবীক্ষণ দিয়া চন্দ্রের পাহাড়ের ছায়াগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল ছায়ার সাহায্যে পাহাড়ের উচ্চতা নিরূপিত হইয়াছে।

চন্দ্রের পাহাড়গুলি অতিশয় বৃহৎ। আমাদের হিমালয়ের ন্যায় সুবিশাল পর্ব্বতও চন্দ্রে অনেক আছে। চন্দ্রের আয়তন আমাদের পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সুতরাং চন্দ্রের আয়তনের তুলনায় পাহাড়গুলি খুবই বড় সন্দেহ নাই। চন্দ্রের কতকগুলি পর্ব্বত সমতলক্ষেত্রে পৃথক পৃথক অবস্থিত; পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আবার গারো ও বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় পর্ব্বতমালাও চন্দ্রে অনেকগুলি আছে। এই সকল পাহাড় ব্যতীত মধুচক্রের রন্ধ্রের ন্যায় চন্দ্রে শত শত পর্ব্বত-গহ্বর আছে। চন্দ্রমণ্ডলের প্রায় বার আনা অংশই ঐ সকল গহ্বরে পূর্ণ। গহ্বরগুলি সমতল ক্ষেত্রের গর্ত্তের মত নয়। উহাদিগের চারিদিকে উচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শিখরদেশে কূপের ন্যায় গহ্বর।

চন্দ্রের গুহাগুলি বড়ই কৌতূহলজনক। গুহাগুলির আয়তনও অল্প নয়। বড় গুহাগুলির ব্যাস ৬০।৭০ মাইল হইবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চন্দ্রের পাহাড়গুলি হইতে এককালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইত। পর্ব্বতের মুখগুলি (Crater) উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অগ্ন্যুৎপাত কালে যখন ভিতর হইতে বেগে গলিত ধাতব নিঃস্রব বাহির হয় তখন আগ্নেয়-গিরির শিখরভাগ ভাঙ্গিয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এবং সেই স্থানে একটা মুখ হয়। চন্দ্রের কতকগুলি গহ্বর ঐ কারণে উৎপন্ন হইয়াছে।

চন্দ্রে টাইকো (Tycho) নামক একটী বৃহৎ গহ্বর আছে। ইহা বড়ই বিস্ময়জনক। চন্দ্রের প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উপরি-ভাগের একটী স্থান হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক-রেখা বাহির হইতেছে। উহাই 'টাইকো'। এই গুহা প্রায় ৫০।৬০ মাইল বিস্তৃত এবং প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত-

মালা উহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। গুহাটী ঠিক কটাহের ন্যায়। উহার মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়। টাইকোর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ের শ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া শৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই শৃঙ্গ হইতে টাইকোর অভ্যন্তর প্রায় বিশ হাজার ফিট গভীর।

চন্দ্রের অধিকাংশ গহ্বরের নাম জ্যোতির্ব্বিদ্গণ প্রাচীন গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিতদিগের নাম অনুসারে রাখিয়াছেন, যেমন 'প্লেটো', 'এরিষ্টটল'. 'আরকিমিডিস্', 'কোপারনিকাস্' ইত্যাদি।

কোপারনিকাস্ গহ্বরটী বড়ই রমণীয়। ইহার প্রতিকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, এক সময়ে ইহা একটী প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি ছিল। উহার চারিদিকের প্রাচীর খুব উন্নত। শৃঙ্গ হইতে গহ্বরের গভীরতা ১১০০০ ফিট্। সমতলক্ষেত্র হইতে ঐ সকল প্রাচীরের উচ্চতা ২৬০০ ফিটের ন্যূন হইবে না।

কোপারনিকাসের চারিদিকে অসংখ্য গহ্বর আছে।

'প্লেটো' নামক গহ্বরটীকে ছোট দূরবীক্ষণ দ্বারাও দেখা যায়। উহার দেওয়ালের উচ্চতা প্রায় ৩০০০ তিন হাজার ফিট। এই উন্নত দেয়ালের মাঝে ৬০ ফিট্ ব্যাস বিশিষ্ট বিস্তৃত প্রস্তরময় ক্ষেত্র। চন্দ্রের অনেকগুলি গুহা আছে, উহাদের ভিতর কখনও সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে চন্দ্রের গুহা হইতে কতকগুলি সাদা রেখা বহির্গত হইয়াছে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, অগ্ন্যুদ্গম কালে যে ধাতু গলিয়া বাহির হইয়াছিল, সেই স্রোত এখন কঠিন হইয়া আছে। উহাই সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল সাদা রেখার মত দেখায়। চন্দ্রে বায়ু না থাকায় ঐ স্রোত আজও মলিন হয় নাই। রেখাগুলির কোন কোনটার দৈর্ঘ্য দুই হাজার মাইল হইবে। চন্দ্রে জল ও বায়ু না থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জল ও বায়ু ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে ক্ষয় করে। চন্দ্রে জল ও বায়ু না থাকায় গিরি গহ্বরাদি অক্ষত রহিয়াছে বটে, কিন্তু চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীতে কত সুন্দর সলিলপূর্ণ নদ নদী সাগর মহাসাগর আছে, কত রমণীয় ফল ফুল-শোভিত দেশ আছে; কত শ্যামল মাঠ চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এক এক ঋতুতে আমাদের প্রকৃতির এক এক রকম শোভা। চন্দ্রে কেবল প্রস্তরময় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। একটী তৃণও তথায় জন্মিতে পারে না। সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, রাত্রিতে ভয়ানক শীত, দিনে ভয়ানক রৌদ্র। যে চন্দ্রকে দেখিয়া আমরা নয়ন জুড়াই, যাহার সৌন্দর্য্যের সহিত জগতের সকল পদার্থের সৌন্দর্য্যের তুলনা করি, সেই রমণীয় চন্দ্রের এ অবস্থা!

চন্দ্রে লোক থাকিলে সেই সকল অধিবাসী কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না, ঢাক ঢোল বাজাইলেও শুনিবে না, তাই সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ কোন গন্ধও পাইবে না। আর সকলেই মূক ও বধির হইবে।

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ।

পূর্ণিমার চন্দ্র রাত্রিতে সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ছোট হইতে থাকে। চৌদ্দ পনর দিন পরে চাঁদ একবারে অদৃশ্য হয়; তখন অমাবস্যা। তারপর দ্বিতীয় দিন কাস্তের আকারে চাঁদ পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন দিন দিনই চাঁদ বাড়িতে থাকে, আর পশ্চিম হইতে

তৃতীয়ার চন্দ্র।

পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাঁদ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার চৌদ্দ পনর দিন পর পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়। তারপর চাঁদ আরও পূর্ব্বদিকে

সরিতে থাকে এবং ক্ষয় পায়। এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। এক দিনে চাঁদের যে অংশ বাড়ে বা ক্ষয় পায় সেই অংশ এক কলা।

চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন, তাহা চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে। চন্দ্র যখন ক চিহ্নিত স্থানে থাকে তখন তাহার যে ভাগ সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল

হয় সেই ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে; আর যে ভাগ আলোক পায় না সেই ভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে। এইজন্য পৃথিবীর লোকেরা তখন চন্দ্র দেখিতে পায় না। সেই সময়কে অমাবস্যা বলে। যেমন ক´। চন্দ্র যখন ক স্থান হইতে খ স্থানে আসে তখন তাহার সমুদয় আলোকিত অংশের ¼ অংশ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। যেমন খ´। গ´ চিহ্নিত স্থানে চন্দ্র আসিলে উহার উজ্জ্বল ভাগের অর্দ্ধাংশ আমরা দেখিতে পাই, যেমন গ´। [illegible] আসিলে উহার চারিভাগের তিন ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়; যেমন ঘ´। ছ স্থানে চন্দ্র আসিলে উহার উজ্জ্বল ভাগের সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন ছ´। তখন পূর্ণিমা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রতিষ্ঠা।

স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করিয়া পরেশ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সে প্রলয়ের নিশীথে পরেশের বিশাল অট্টালিকা প্রকাণ্ড একটা দৈত্যপুরীর মত দেখাইতেছিল। অন্ধকার ঘর-গুলি যেন ক্ষুধিত হইয়া বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত। বাগানে গাছের পাতার মর্ম্মর শব্দে একটা আকুলতা, একটা হাহাকার ধ্বনিত হইতেছিল। শ্মশান ঘাট

হইতে ফিরিয়া পরেশ শয়ন গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। খোলা জানালা দিয়া বাগানের বেল, যূঁইর সুমিষ্ট সৌরভে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। সে সৌরভ তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। পরেশ জানালা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। একটু আগে সে শয্যায় শুইয়াছিল, তার অস্তিত্ব এখনো যেন সেখানে রহিয়াছে। সে শয্যাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল। সেই শয্যা, সেই তার জিনিষ পত্র, সেই তার বইগুলি সবই পড়িয়া আছে, কেবল সে নাই।

বেদনায় পরেশের বুকের হাড়গুলি যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিল। মরিবার আগে নিরুপমা তাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে পারে নাই। কেবল ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিয়াছিল মাত্র। আর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কি সে কথা! নিভৃত হৃদয়ের কোন বেদনার কথা! সে কথা চিরকালের জন্য অব্যক্তই রহিয়া গেল। সে সময় নিরুপমা পরেশের হাতের মধ্যে তার শীর্ণ হাত খানি রাখিয়াছিল। যেন সে দৃঢ়-বন্ধন মৃত্যুকেও পরাস্ত করিবে! মৃত্যুকালে সে অনিমেষ নয়নে পরেশের দিকে চাহিয়াছিল। তাকে দেখিতে দেখিতেই নিরুপমা চিরতরে চোখ বন্ধ করিয়াছে। এতক্ষণ বেদনায়, যাতনায় পরেশের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু চোখে জল আসে নাই। এখন সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর মত কাঁদিয়া আকুল হইল। যে তার হৃদয় আলো করিয়াছিল, যে তার সর্ব্বস্ব, যার সুখের জন্য এত সব আয়োজন, সে আজ তাকে ফাঁকি দিয়া কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!

আজ ছয় বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। সেই দিন হইতে,—সেই শুভদৃষ্টির সময় হইতে কি যে অন্তরের মিলন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম কেবল তারা দুজনেই বুঝিয়াছে। সে মিলনের নিবিড় সুখ কেবল তারা দুজনেই উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। সংসারের কোনো লোকের সহিত তাদের সম্পর্ক ছিল না। এ বিশ্বে যেন তারাই কেবল দুটি প্রাণী দুজনে দুজনকে ভালবাসিবার জন্যই আসিয়াছে।

পরেশের অট্টালিকার চারিপার্শ্বে কত লোকের বাস। পরেশ একদিনের জন্যও তাদের কোন খোঁজ খবর লয় নাই। তাহাদের সুখে দুঃখে তার হৃদয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। পরেশের পাড়া প্রতিবেশীরাও তাকে ভয় করিত। কখনো পরেশ নিরুপমাকে লইয়া বাড়ীর নিকটে নদীর ধারে বেড়াইতে গেলে পাড়ার কোনো লোক সমুখে পড়িলে সন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া যাইত। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে হৃদয়ের সব প্রেম নিরুপমাকে ঢালিয়া দিয়া সে যখন পরম পুলকে জীবন কাটাইয়া দিতেছিল, তখনি বিধাতা তার সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাহার জন্য তার জীবন, যাহার মধ্যে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে যখন নিষ্ঠুরের মত তাকে ফেলিয়া পলাইল, তার কি দশা হইবে একবার ভাবিয়াও দেখিল না, তখন পরেশ অসার অবোধ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। বাড়ীতে দাস দাসী লোকজনের অভাব নাই। সকলেই প্রভুর সেবার জন্য—প্রভুর চিত্তবিনোদনের জন্য অস্থির। কিন্তু পরেশের সে সকলে আর কোন প্রয়োজন নাই। পৃথিবী যার কাছে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, চন্দ্র সূর্য্যের আলো যার কাছে নিভিয়া গিয়াছে, তার আর দৈহিক সুখের প্রয়োজন কি?

পরেশ কোনো দিন একবেলা আহার করিত, কোনো দিন তাহাও করিত না। কেবল সেই শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিত। সে ঘরে নিরুপমার জিনিষ পত্র নাড়িয়া চাড়িয়া ঝাড়িয়া দিন কাটাইয়া দিত। এইরূপে দিনের পর দিন গেল।

দিনের প্রখর আলোকে, কাজকর্ম্মের কোলাহলে, লোক জনের যাতায়াতে বিশ্বজগৎ যখন নিতান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন সে অন্তরের বেদনা কোন রকমে চাপিয়া দিন কাটাইয়া দিত। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার যখন ধরণী ছাইয়া ফেলিত, বিশ্ব যখন নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া এক মায়াজগৎ সৃজন করিত তখন এক স্নিগ্ধ ভাবের আবেশে অন্তর আকুল হইয়া উঠিত—অশান্ত

হৃদয় হাহাকার করিয়া মরিত, চোখের জল আর বাধা মানিত না, ঝরঝর করিয়া কেবলই ঝরিয়া পড়িত। এমন উদ্দেশ্যহীন—এমন লক্ষ্য বিহীন জীবন লইয়া সে কি করিবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইত।

হায়, আর কতকাল—কত দীর্ঘকাল এ দুর্ব্বহ জীবনের ভার তাকে বহন করিতে হইবে; এ বোঝা বহিয়া তাকে আর কতকাল এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! যার মধুর সঙ্গ ব্যতীত সে নিজের জীবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারিত না, তাকে হারাইয়া কতদিন সে বাঁচিবে! এমন বোঝা রাখিয়াই বা দরকার কি? এ জীবন পৃথিবীর কাহারো যদি কাজে না লাগিল, তবে তাহা রাখিয়া ফল কি? এ জীবনকে যদি কেহ প্রিয়-জ্ঞান না করিল,—এ জীবন যদি কাহারো নিকট মধুবর্ষণ না করিল, তবে তাহা শেষ করিয়া দেওয়াই উচিত। রাত্রে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পরেশ শয়নগৃহের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে গিয়া তাহাতেই মনে পড়িয়া গেল, এইখানে সে কতদিন নিরুপমার সহিত বেড়াইয়াছে। নদীর বাঁধানো ঘাটে বসিয়া কত চাঁদনী রাত শুধু দুজনে দুজনকে দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। একটিও কথা হইত না।

পরেশের চোখে জল নাই। শুষ্ক চোখ দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইবে মনে হইল। "এ যাতনা আর বহিতে পারি না," বলিয়া পরেশ নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে গেল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে কাতর-স্বরে বলিল, "বাবু, সারাদিন না খাইয়া রহিয়াছি, আর পারি না, একটি পয়সা দিয়া আমাকে বাঁচান।"

পরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া দেখিল, একটি নগ্নকায় জীর্ণদেহ বালক। সজল নয়নে তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কি সকাতর চাহনি!

পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। এক বিপর্য্যয় ব্যাপার! অতুল ঐশ্বর্য্য পায় ঠেলিয়া, এমন ভোগ সুখের জীবন তুচ্ছ করিয়া সে যাহাকে শান্তির আলয় বলিয়া সাদরে বরণ করিতে যাইতেছিল, আর একজন সেই সম্পদেরই এক কণা আকাঙ্ক্ষা করিয়া তারই সাধের মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য আকুল স্বরে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। একি অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস! মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিবার জন্য সেকি সকরুণ আহ্বান?

পরেশের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাহার রহিল না। পরেশ বালকের হাত ধরিল। বালক ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "বাড়ীতে আমার মা আজ ক'দিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাঁকে খাওয়াই। আজ ভিক্ষা মিলে নাই। আমি আজ উপবাসী।"

স্থির দৃষ্টিতে বালককে দেখিতে দেখিতে পরেশ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "চল, তোমার মাকে দেখিয়া আসি। বালকের সঙ্গে পরেশ তার জীর্ণ কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। অবস্থা দেখিয়া তার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বালক দৌড়িয়া জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, আজ ভিক্ষা মিলে নাই, কিন্তু এক দয়ালু বাবুর দেখা পাইয়াছি। এইবার আমাদের সব দুঃখ যাইবে।'

জননীর দুই চোখ বহিয়া জলধারা বহিল। শীর্ণ হাতখানা তুলিয়া পরেশের নত মস্তকের উপর রাখিতেই তাহা পড়িয়া গেল। তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সেই দিন হইতে বালক পরেশের আশ্রয় লাভ করিল। একটু অনুসন্ধান করিতেই এমনি কত শত দরিদ্র কত অনাথ বালক তার আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। পরেশের বিশাল অট্টালিকায় তাদের বিদ্যালয় বসিল। শূন্যপুরী শত শত দরিদ্র বালকের কোলাহলে ভরিয়া উঠিল।

অনাথের মা-বাপ হইয়া, দুঃখীর মুখে হাসি দেখিয়া,—তাপিতের চিত্তে শান্তি ঢালিয়া পরেশ অপার তৃপ্তি অনুভব করিল। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়া সে জগতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাহিয়া দেখিল। এই কর্ম্মকোলাহলময় জগতের কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তার বেদনাক্ত হৃদয়

জুড়াইয়া গেল। বিধাতৃরচিত এই বিচিত্র জগতের সকলি তাহার নিকট সুন্দর, মধুর রূপে প্রতিভাত হইল। নিজে সুখ হারাইয়া অপরকে সুখী করিয়া পরেশ বাঁচিয়া উঠিল। পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সে প্রাণ পাইল।

শ্রীমতী—(বি, এ)।

খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ।

জীবনধারণের জন্য প্রাণী মাত্রেরই খাদ্যের আবশ্যক। জন্তুগণ এবং অসভ্য মনুষ্যেরা স্বভাবজাত খাদ্য দ্রব্যাদির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু সুসভ্য মনুষ্য রন্ধনাদির দ্বারা নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে এবং এই সকল মুখপ্রিয় দ্রব্যের অপরিমিত ব্যবহারে স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রোগগ্রস্ত হইতেছে। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন সভ্যজগতে স্বল্পায়ুতার একটী প্রধান কারণ।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীর তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারীগণ ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার মদনমোহন দত্ত আমাদের দেশীয় খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন।

খাদ্যের উপাদান উৎকৃষ্ট হইলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেই যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এরূপ নহে, কারণ, খাদ্যের ফলাফল ব্যক্তিগত রুচি, স্বাস্থ্য ও অগ্নিবলের উপর নির্ভর করে। যে খাদ্য এক ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী অন্যের পক্ষে তাহা উপযোগী না হইতে পারে।

আজ প্রায় ৩০০০ বৎসরের কথা, যখন জগতের সভ্যতা তিমিরগর্ভে নিহিত ছিল, যখন অন্যদেশের মনুষ্যেরা বস্ত্রাচ্ছাদন করিতে পর্য্যন্তও জানিত না, শিকারলব্ধ আম-মাংস ও গাছের ফলমূলাদি মাত্র জীবন ধারণের উপায় ছিল, তখন হিমালয়ের প্রান্তদেশে বসিয়া আর্য্য ঋষিরা কেবল খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহারা অগ্নিবল, শরীরের ক্ষমতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, খাদ্যের পরিমাণ ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

মহর্ষি চরক বলিতেছেন:—

"মাত্রাশী স্যাৎ। আহার মাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী। যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি"।

ইহার অর্থ—ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্রা প্রমাণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই মাত্রা অগ্নিবল সাপেক্ষ। মাত্রার প্রমাণ এই যে ভুক্ত দ্রব্য বিনা ক্লেশে যথাকালে জীর্ণ হইবে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কেবল ভক্ষণ করিলেই শরীরের পুষ্টি হয় না। এই সঙ্গে পরিপাক করা চাই।

জনসাধারণ—সাধারণের বিশ্বাস, যে যত বেশী খাইবে সে তত বেশী হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান হইবে। এইরূপে সভ্য সমাজে ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতেছে।

এই বিশ্বাসের বিপক্ষে আমেরিকার অধ্যাপক চিটেনডেন Prof. Chittenden) প্রমুখ শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনুষ্য শরীরের উপর পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে অত্যধিক আহার জীবনহানিকর।

এই তথ্যই ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি চরক সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরেরও খাদ্য দ্রব্যাদির রাসায়নিক উপাদান সমূহ প্রায় একই প্রকারের। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বণ, নাইট্রোজেন ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস্ এবং গন্ধক ইত্যাদি খাদ্যের এবং মনুষ্য শরীরের প্রধান উপাদান। শরীরের ⅔ অংশ জল, এবং খাদ্যেও প্রায় এই পরিমাণ জল থাকে। খনিজ পদার্থ প্রায় শতকরা ছয় ভাগ উভয়েই বর্ত্তমান থাকে।

খাদ্যের বিভাগ—পৃথিবীর নানা স্থানে অসংখ্য প্রকারের খাদ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহাদের আবশ্যকীয় উপাদান সকল নিম্নলিখিত বিভাগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

১। প্রোটিড্ বা আমিষ জাতীয়।

২। চর্ব্বি বা স্নেহ জাতীয়।

৩। কারবোহাইড্রেটস্, শর্করা বা শালীজাতীয়।

৪। লবণ জাতীয়।

৫। জল।

উপর্য্যুক্ত খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত চা, কাফী এবং আচারও খাদ্য দ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হয়—তাহারা কেবল ক্ষুধার উদ্রেক করে, কোন প্রকার পুষ্টি সাধন করে না।

প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য,—প্রোটিড্ বা আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুণ—

(ক) দৈহিক উপাদান সকল প্রস্তুত করে এবং শরীরমধ্যে যে ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করে।

(খ) শরীরস্থ দহন ক্রিয়া নিয়মিত করে।

(গ) শরীরে তাপ উৎপাদন করে।

এই প্রোটিড্ দুগ্ধে কেজিন রূপে, ডিম্বে অণ্ডলাল রূপে, মাংসে মায়োসনোজেন এবং ডালে লেগুমিন রূপে বর্ত্তমান আছে।

২। স্নেহ জাতীয় দ্রব্য—চর্ব্বি ও তৈল রূপে খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে দৃষ্ট হয়। চর্ব্বি মৎস্য মাংস ইত্যাদিতে এবং তৈল উদ্ভিজ্জ পদার্থে পাওয়া যায়। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের গুণ—

(ক) শরীরে চর্ব্বি প্রস্তুত করে।

(খ) শরীরে উত্তাপ ও তেজ উৎপাদন করে।

আমাদের শরীরের শতভাগের ১৫ ভাগ চর্ব্বি। কোন কোন ব্যক্তির শরীরে অত্যধিক চর্ব্বি বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহার কারণ অদ্যাবধি সবিশেষ স্থিরীকৃত হয় নাই।

৩। শালী জাতীয় (শ্বেতসার ও চিনি) খাদ্যই আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করে এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাদের কার্য্য—

(ক) চর্ব্বি প্রস্তুত করা।

(খ) শরীরের উত্তাপ এবং তেজ উৎপাদন করা।

(৪) লবণ জাতীয় খাদ্য,—আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা জাতীয় লবণ আবশ্যক হয়। ফল ও তরকারী ইত্যাদিতে যে সকল লবণ থাকে তাহা আমাদিগের শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। লবণ খাদ্যদ্রব্যে অল্প পরিমাণে বা একেবারে না থাকিলে স্কার্ভি রোগ উপস্থিত হয়। ফলমূলাদি এবং টাট্‌কা শাকসবজীর যদিও পুষ্টিকারিতা অতি অল্প তথাপি আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি হইতে ইহাদের বাদ দেওয়া চলে না।

লবণ (Common Salt),—আমাদের জীবন রক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ আমাদের মুখনিঃসৃত লালা ও পাকস্থলী-নিঃসৃত রসের পরিপাক শক্তি লবণের উপর নির্ভর করিতেছে।

চূণ, ফস্‌ফরিক্ এসিড, পটাশ এবং সোডা আমাদের শরীরের জন্য আবশ্যক। গন্ধক মাংস জাতীয় খাদ্যে বর্ত্তমান থাকে। লৌহ অল্প পরিমাণে শরীরস্থ সকল উপাদানেই পাওয়া যায় এবং ইহা রক্তের প্রধান উপকরণ।

৫। জল—২ সের হইতে ৩ সের পর্য্যন্ত আমাদের জীবনধারণ জন্য অত্যাবশ্যক। যদিও শরীর মধ্যে জলের কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যই ইহার প্রয়োজন। শরীর মধ্যস্থিত কোন উপাদানই স্বাভাবিক অবস্থায় জল বিনা থাকিতে পারে না।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সমূহ শরীরের মধ্যে কি প্রকার কার্য্য করে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

১। আমিষ জাতীয়—ছানা, ডিম, মাংস, রোলাম ইত্যাদি—দৈহিক উপাদান প্রস্তুত-কারক।	ইহারা সকলেই ইন্ধনের কার্য্য করে ও তেজ উৎপাদন করে এবং এই তেজ শরীরের উত্তাপ ও কার্য্য করিবার ক্ষমতারূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি।
২। স্নেহ জাতীয়—মাংসের চর্ব্বি, মাখন, তৈল, ইত্যাদি—চর্ব্বিরূপে সঞ্চিত থাকে।	
৩। শালী জাতীয়—চিনি, শ্বেতসার ইত্যাদি—চর্ব্বিতে পরিণত হয়।	

৪। খনিজ পদার্থ ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম, পটাশ, সোডা ইত্যাদি লবণ, লৌহ। — অস্থি প্রস্তুত করে এবং পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।

এক্ষণে আমরা খাদ্যের মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণ ব্যতিক্রমে শরীরের কি অবস্থা হয় বিচার করিব :—

আমাদের শরীরকে ষ্টীম ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিলে এই বিষয়টী সম্যক্ বোধগম্য হইবে। ষ্টীম ইঞ্জিনের সহিত আমাদের শরীররূপ যন্ত্রের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ষ্টীম ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেরূপ কয়লার আবশ্যক আমাদের শরীরকেও কার্য্যকারী রাখিতে হইলে সেইরূপ খাদ্যের আবশ্যক। ষ্টীম ইঞ্জিনের চুল্লিতে কয়লা পোড়ান হয় (অর্থাৎ কয়লার সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়) এবং এই কয়লা হইতে উৎপন্ন তেজই বয়লারস্থিত জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ইঞ্জিনকে চালিত করে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরেও এইরূপ দহন ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহা পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্তের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে নীত হইয়া অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। এই অক্সিজেন বায়ু হইতে নিশ্বাস দ্বারা সংগৃহীত হইয়া রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইয়া থাকে। অক্সিজেনের সহিত খাদ্যের এই রাসায়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন তেজই আমাদের শরীরের তাপের ও সর্ব্বপ্রকার শক্তির উৎপাদক।

ইঞ্জিনে অল্প কয়লা দিলে ইঞ্জিন যেরূপ অধিকক্ষণ চলে না সেইরূপ আমাদেরও যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যাদি না পাইলে শরীর অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে পারে না। খাদ্য দ্রব্যের অভাবে মনুষ্য বাঁচিতে পারে না।

খাদ্যদ্রব্যের যে অংশ শরীরের কাজে লাগে না তাহা মল, মূত্র, ঘর্ম ইত্যাদিরূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। অধিক আহারের জন্য শরীরস্থ যন্ত্রাদির (মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদির) কার্য্য অযথা বাড়িয়া যায় এবং ফলে এই সকল যন্ত্র অল্পেতেই বিকল হইয়া পড়ে। মধুমূত্র Diabetes), বাতরোগ (Gout), মূত্রগ্রন্থি রোগ Bright's Disease) এই কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সকল দ্রব্যই ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। অনেক দিন ব্যবহারের পরে ষ্টীম ইঞ্জিনে যে সকল ক্ষয় হয় তাহা কারিকর দ্বারা মেরামত করাইতে হয় তবে ষ্টীম ইঞ্জিন কার্য্যক্ষম থাকে। সেই প্রকার আমাদের দেহেরও নিত্য ক্ষয় হইতেছে। শরীরের এই ক্ষয় পূরণ কার্য্যের জন্য অন্য কোন কারিকরের আবশ্যক হয় না। শরীর নিজেই ইহা করিতে সক্ষম। এইটীই এই শরীররূপ কলের বিশেষত্ব। এই কল চলিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি মেরামত করিয়া লয়। এই মেরামত কার্য্য আমিষ জাতীয় (Proteid) খাদ্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

এই আমিষ জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কেবল ইহারই দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ হইয়া থাকে। অপর জাতীয় খাদ্য এ কার্য্য করিতে পারে না। এই আমিষ জাতীয় খাদ্যও অত্যধিক আহার করিলে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের কি কি খাদ্য কত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমাদের বিশেষভাবে জানা উচিত।

শালী জাতীয় খাদ্য দ্রব্যই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকি। দেশভেদে ইহাদের প্রকার ভেদ হয়। যথা—বাঙ্গালাদেশে চাউল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গম, বেহারে ভুট্টা, মকাই ইত্যাদি প্রধান খাদ্য। এই শালী জাতীয় খাদ্যের উপর আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় বটে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদি সকল গুণ বিশিষ্ট করিতে হইলে এই শালী জাতীয় খাদ্যের সহিত কিছু আমিষ এবং কিছু স্নেহ জাতীয় খাদ্য সংযোগ করিয়া লওয়া উচিত। এইজন্য ইংরেজেরা রুটির সহিত মাখন লাগাইয়া ভক্ষণ করে, আমরা ভাতের সহিত ঘৃত খাইয়া থাকি।

উপর্য্যুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত তরকারী যোগেরও সকল দেশে ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহারা অতিশয় দরিদ্র, যাহাদের কুটীরের চালে আচ্ছাদন পর্য্যন্ত নাই তাহারাও ভাতের সহিত শাক পাতা ইত্যাদি খাইয়া থাকে।

লবণ জাতীয় পদার্থ এই সকল শাক সব্জী তরকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

ফলমূলাদিতে লবণের প্রাচুর্য্য হেতু তাহারা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের গুণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, একই খাদ্য সকলের পক্ষে সমান পুষ্টিকর নহে। শিশুর বৃদ্ধি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং সেই জন্যই শিশুর খাদ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রোটিড (আমিষ জাতীয় উপাদান) থাকা আবশ্যক। যাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যে শালীজাতীয় উপাদানের প্রাধান্য দেখা যায়। অত্যধিক শ্রমের পর আমাদের স্বভাবতঃই মিষ্ট সরবৎ খাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। এস্কিমো প্রভৃতি জাতি অতিশয় শীতপ্রধান দেশে বাস করে এবং ইহাদের খাদ্যে চর্ব্বির পরিমাণ অধিক। স্নেহজাতীয় খাদ্যের তাপ উৎপাদিকা শক্তি, শালী ও আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে অনেক বেশী।

পরিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে—শতকরা ১০ ভাগ আমিষ জাতীয়, ৬০ ভাগ শালী জাতীয়, ১০ ভাগ স্নেহ জাতীয় এবং ২ ভাগ লবণ জাতীয় পদার্থ থাকা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি। আমাদের কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা কর্ত্তব্য।

(১) ভোক্তার শরীরের সমস্ত অভাব পূরণ হইলেই খাদ্যকে উত্তম বলা যায়।

(২) খাদ্য সুলভ হওয়া আবশ্যক। যে খাদ্য অসার তাহা সুলভ হইলেও ব্যবহার করা উচিত নহে। খাদ্যের মূল্যের অনুযায়ী সারবান্ পদার্থ থাকা উচিত। টাকায় আট সের জল মিশ্রিত দুগ্ধ অপেক্ষা টাকায় ৪ সের খাঁটি দুগ্ধ সুলভ।

(৩) যে খাদ্য সুলভ অথচ পুষ্টিকর তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

বিলাতের কথা

(১)

বিলাতের কথা লিখিতে তাগিদ দিয়াছ। কি লিখিব ভাবছি। এখানে হেমন্তের সোণালী রং কোথাও নাই। ঘরের বাহিরে ধুঁয়োমাখা কুয়াশা। সময় অসময় নাই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কাদা। হাওয়াটা সেঁৎসেতে। আকাশে আলোক নাই। সূর্য্যদেব আড়াল থেকেই আলো বিতরণ করেন। তাঁর পর্দ্দাঢাকা মুখখানা সারা নবেম্বরের মধ্যে একদিনও দেখেছি বলিয়া মনে হয় না। তিনটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই তিনি অস্তাচলমুখী হন। এইত লণ্ডনের নবেম্বরের বাহিরের চেহারা।

কিন্তু এই প্রকৃতির বিমুখতাকে অগ্রাহ্য করিয়া লণ্ডনের আনন্দ ও ভোগৈশ্বর্য্য প্রতিনিয়তই উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বড় বড় রাস্তার দুধারে প্রাসাদতুল্য সুসজ্জিত দোকানের সম্মুখে লণ্ডনের ফ্যাসান-প্রিয় মহিলাকুলের ভিড় সমান ভাবেই চলিয়াছে। রাস্তায় বাহির হইলে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে এদেশের নারীজাতি। টিউবে, ট্রেণে, ট্রামওয়েতে, সর্ব্বত্র মহিলাদিগের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে হয়। সমগ্রদিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বেশবিন্যাস করিয়া চাকরাণীও রাজরাণী হইয়া দ্রুতবেগে রঙ্গালয়ের দিকে ছোটে। যেমন কঠোর পরিশ্রম তেমনি প্রবল আমোদপ্রমোদ। থাকা ও খোরাক খরচ বাদ দিয়া কোন চাকরাণী মাসিক ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করে তার হাতে এক পয়সা থাকে না। রঙ্গমঞ্চের দর্শনীতে, টিউবে, পাউডারে, পোষাকে, পরচুলায় তার সব খরচ হইয়া যায়। এই প্রচণ্ড শীতে দুইদিন চাকুরী না থাকিলে ইহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। দরিদ্র অমিতব্যয়ী নরনারীর জন্য সরকার নূতন বিল পাস করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রমজীবীকে বাধ্য হইয়া ইন্‌সিওর করিতে হয়। এই সকল দুঃসময়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।

রাস্তায় মহিলাগণ খুব ব্যস্ত, দ্রুতগামী অথচ পর্য্যবেক্ষণশীল। স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদের মনে সাহস ও স্ফূর্ত্তি আছে। খোলা হাওয়ায় ভ্রমণের অধিকার থাকায়, গৃহকর্ম্মের শ্রম ও বাহিরের হাটাহাটিতে ইহাদের দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। সাধারণ মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যের লাবণ্য আছে।

আমাদের দেশের মহিলাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য খুবই বেশী। হিন্দুনারী কোমল, নম্র, মন্থরগামিনী ও লজ্জাশীলা; ইংরেজরমণী পৌরুষপূর্ণ, ভদ্র দ্রুতগামিনী ও নির্ভীকা। আমাদের দেশের একটু অবস্থাপন্ন শিক্ষিত পরিবারের মহিলাগণ অনেকটা কর্ম্মবিমুখ; এদেশের ধনী মহিলাগণ বিলাসী হইলেও অলস নহেন। বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (Higher middle class) মহিলাগণ গৃহকর্ম্মে যেমন পটু ও পরিশ্রমী, জ্ঞানানুশীলনেও তেমনি অনুরাগী। কলেজে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসের শ্রেণীতে প্রায় অর্দ্ধেকই মহিলা। লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে বহুসংখ্যক মহিলা ছাত্র আছেন। তাঁহারা যুবকদের সঙ্গে একই গৃহে বসেন। কিন্তু তাহাদের চালচলন বা কথাবার্ত্তায় কখনও কোনও প্রকার অশোভনতা দেখিতে পাই নাই। ইহাদের মধ্যে বিলাসিতা নাই। জীবন-যাত্রা সরল অথচ জীবনের আদর্শ মহৎ। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরেজ সভ্যতার হৃদপিণ্ড, এদের মধ্যেই সাহিত্যসেবী লেখক, অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক, সাম্রাজ্যচালক রাষ্ট্রনৈতিক চারিদিক হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজ সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। চরিত্রবল, জ্ঞান-পিপাসা এবং আদর্শের নিকট আত্মবিসর্জ্জনই ইহাদের বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর ইংরেজ-মহিলাগণও আদর্শ গৃহিণী। গৃহে শৃঙ্খলা বিধান, সন্তান পরিপালন এবং সামাজিকতা রক্ষাতেই কেবল ইহারা সুনিপুণ নহেন—স্বামীর মন ও কর্ম্মের তপস্যার পরম সহায়। একটী শিশু ছেলের সংস্পর্শে আসিলেও ইহাদের উন্নত শিক্ষার চিহ্ন দেখা যায়।

এখানকার একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁহার কাছ হইতে একদিন অনুরোধ পত্র আসে যে রবিবার অপরাহ্নে চা পান কালে তাঁর গৃহে আমাকে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি করিতে হইবে। তিনি স্বয়ং ইংরেজী অনুবাদটা পাঠ করিবেন। আমি রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী' ও 'খেয়া' হইতে কয়েকটী কবিতা পাঠ করি। সাহিত্যিক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ আবৃত্তি করেন। তৎপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হয়। তাঁর পত্নী এবং কন্যা সেই আলোচনায় যোগদান করেন। যে সোণার তরীকে হেঁয়ালী বলিয়া আমাদের দেশের কোন কোন 'উদীয়মান' সাহিত্যিক বিদ্রূপ করিয়া স্বীয় সাহিত্য-প্রতিভার অসামান্যতা দেখাইয়াছেন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে এই ইংরাজ মহিলার কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কয়েকদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইহা ইংলণ্ডের সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আরেক দিন মিঃ রীজের বাড়ীতে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ হয়। মিস শিন্‌ক্লেয়ার এখানকার একজন নামকরা মহিলা কবি। তিনি উপস্থিত ছিলেন। আরও কয়েকটী সাহিত্যিকও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য। Mr. Rhys বলিলেন "I have got a new revolution of religion." তিনি গীতাঞ্জলি হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

Thou art the sky thou art the nest as well.

Oh ! thou beautiful, there in the nest is thy love that encloses the soul with colours and sounds and odours.

There comes the morning with the golden basket in her right hand bearing the wreath of beauty, silently to crown the earth. And there comes the evening over the lonely meadows deserted by hards, through trackless paths, carrying cool draughts of peace in her gol len pitcher from the Western Ocean of rest.

But there, where spreads the infinite sky for the soul to take her flight in, reigns the stainless white radiance. Where is no day nor night, nor form, nor colour and never, never, a word.

Miss. Sinclare এর নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। পাতলা চেহারা। দেখ্‌তে ভারতীয় রমণীর মত অনেকটা। ইংরেজ রমণীর দীর্ঘ গ্রীবা ও উন্নত নাসিকা এঁর নাই। পোষাক অতি সাদাসিদে রকমের আড়ম্বরহীন, অল্পক্ষণ আলাপেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গলা ছন্দ শোনাইবার জন্য আমার উপর আদেশ হইল। আমি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের একটী কবিতা আবৃত্তি করিলাম। তাঁহারা বাঙ্গালা ছন্দের প্রশংসা করিলেন। গীতাঞ্জলির মত সাধন সঙ্গীত ইহাদের চিত্তকে এমন করিয়া স্পর্শ করিবে, আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই। রবীন্দ্রনাথের নিকট Miss. Sinclare কবীরের সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, তিনি তাই কবীরের ধর্ম্ম সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। এ দেশের খৃষ্টানসমাজের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ইহাদের চিত্তের ক্ষুধা মিটাইতে পরিতেছে না। উদার অসাম্প্রদায়িক একটী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের জন্য ইহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। জাতি ও সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্দ্ধে সমগ্র মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটী পরিপূর্ণ আনন্দরূপ দেখিবার একটা ব্যাকুলতা এদেশের ভাবুক সমাজে আসিয়াছে। ঠিক্ এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসঙ্গীতের বীণা পশ্চিমের প্রাঙ্গণে বাজিয়া উঠিয়াছে। তৃষিত পশ্চিম তাই উচ্ছ্বসিত প্রাণে সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে। Mr. Rhys আমাকে লিখিয়াছেন। "গীতাঞ্জলি একত্র বেশী পড়িতে পারি না। ২।৩টা কবিতা পড়লেই আমার সে বেলার জন্য সাংসারিক কাজ পণ্ড হইয়া যায়।" তিনি Manchester Gurdianএ লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাছে বর্ত্তমান ইংরাজকবিদের কাব্য exercise মাত্র।" এই মতটুকু আমার বড়ই ভাল লাগে। শিক্ষিত ইংরেজ পরিবারের একটী মাধুর্য্য অনুভব করা যায়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিমন্ত্রিত অতিথি সকলেই আলাপ করছেন। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, একটা উন্নত পবিত্র আলোচনার হাওয়ায় মনটা যেন অনেক উপরে উঠে যায়; কেহই পড়া-কথা অথবা শেখা-বুলি আওরায় না। যে যা অন্তরে অনুভব করে জোরের সঙ্গে তা প্রকাশ করে।

(২)

নবেম্বর, ২৭শে।

গত পত্রে বিলাতের একটী মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত সাহিত্যিক পরিবারের কথা লিখিয়াছি। আজ একটী চিত্র-শিল্পীর কথা লিখ্‌ছি। ইঁহার নাম বোধ হয় তোমাদের পরিচিত। মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন্‌কে আমি অন্তরের সহিত ভক্তি করি। ইঁহার হৃদয়ের প্রসারতা ও গভীরতা বুঝি সমুদ্রেরই মত অসীম। ইনি জগতের বন্ধু, চালচলন সাদাসিদে; সাধারণ লোকের অনেক ঊর্দ্ধে একটী ভাবলোকে বিচরণ করেন। অহঙ্কার হীন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দুধারের দেওয়ালে ভারতীয় মূর্ত্তি। কোনটী হয়তঃ ধ্যাননিমগ্ন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি; কোনটী হয়তঃ ভারতীয় নারীর মাতৃমূর্ত্তি। তাঁহার বৈঠক খানায় প্রবেশ করিলেই দেখি, ভারতীয় শিল্পীর তৈয়ারী কাঠের ও পাথরের নানাবিধ ছোট ছোট মূর্ত্তি সজ্জিত আছে। মনে হয়, যেন একটী হিন্দুর বাড়ীতে আসিয়াছি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। সেখান হইতে একটা নূতন দৃষ্টি নিয়া ফিরিয়া আসেন। হিন্দুজাতির স্বাভাবিক সরল ধর্ম্মভাব ও হিন্দু রমণীর মাতৃত্ব ইঁহার চিত্তকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করে। ভারতীয় সভ্যতার এই কেন্দ্রস্থানটীর পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হন। চিত্রশিল্পে হিন্দুজাতির সেই ধর্ম্ম সাধন ও হিন্দুরমণীর মাতৃভাবকে প্রকাশ করিতে সংকল্প করেন। British Artists Clubএ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের চিত্র প্রদর্শন করা হইতেছে। সেই প্রদর্শনীতে মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন্ একটী অতি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আজ সকালে তাঁর সঙ্গে সেই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। কাশীর গঙ্গাতীরে মন্দির হইতে

সিঁড়ী নামিয়াছে। উষার অরুণালোকে পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত। গঙ্গার নীল জলে আকাশের উষালোক যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। একটী তরুণ সন্ন্যাসী সেই সোপানের পুরোভাগে ধ্যানমগ্ন। অনন্তের পার হইতে স্নিগ্ধ আলোক-ধারা মঙ্গলাশীষের ন্যায় তাঁহার প্রসন্ন ললাট চুম্বন করিতেছে। সেই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর অধরোষ্ঠে একটু ঈষৎ প্রসন্ন হাসি. পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ। তাঁহার পশ্চাতে একটী দীর্ঘ-শ্মশ্রু উষ্ণীষ পরিহিত শিখ দাঁড়াইয়া ভক্তি-মুগ্ধ নেত্রে গঙ্গার দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁর পাশে একটী সম্ভ্রান্তা বৃদ্ধা হিন্দু বিধবা করযোড়ে গঙ্গা প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মস্তক ভক্তিতে নত হইয়া পড়িয়াছে। পাশেই আরেকটী ধ্যানমগ্ন মুসলমান সুফী, পরিধানে আলখাল্লা। তাঁর আসন-প্রণালী হিন্দু সন্ন্যাসী হইতে একটু আলাদা, মুখে একটা দৃঢ় অথচ গভীর ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, মন যেন কোন অতলের রস-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে। আরেকটী হিন্দু যুবতী জলভরা ঘটী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মুখটী ঘটীর আড়ালে কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল ললাট ও মুদ্রিত চোখ দুইটীতে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী বৃদ্ধ বৌদ্ধ লাঠি ভর করিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত অথচ মুগ্ধনেত্রে পর পারের সেই উজ্জ্বলালোকের পানে তাকাইয়া আছেন। আরেকটী যাত্রী কতদূর থেকে সারা রাত হাঁটিয়া আসিয়া উষার প্রথমালোকে, গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; স্কন্ধে চাদর, পরিধেয় বস্ত্র আঁটা। দেহে পথশ্রমের ক্লান্তি, কিন্তু তাঁর চোখে মুখে আনন্দ ঝরিছে। গঙ্গার অপর তীরে যেন অনন্তের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; উষালোকের অনন্ত সৌন্দর্য্যের অমৃত ধারায় [illegible] পরিপূর্ণ। [illegible] হৃদয় সেই [illegible] কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। শিল্পী কেবল [illegible] দেহ ও মুখের লাবণ্যেই আনন্দ ফুটাইয়া [illegible] ; সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যে আকাশ ও [illegible] অমৃতময় করিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলির [illegible] আশপাশকে একটী আশ্চর্য্য পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ সকলের সাম্প্রদায়িক ভেদের বাধা চলিয়া গিয়াছে।

এই চিত্রে ভারতীয় রমণী-মূর্ত্তির একটী উন্নত আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি জীবন্ত এবং তাহাতে ভক্তিমিশ্রিত মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের আকাশ এবং আশেপাশেও জাক্ জমকের লেশ নাই। শিল্পী সহজভাবে চারিদিকের বেষ্টনীতে নির্ম্মল পবিত্রতা মাখাইয়া রাখিয়াছেন। এই চিত্রশালায় এইটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া [illegible] হইল।

বর্ত্তমান ইংরেজ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একটা নব-যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। বাস্তবের দিকে ঝোক্ কমিয়া একটা উন্নত ভাবের প্রকাশের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছে তাহার সঙ্গে এই চিত্রের তফাৎ টা কি? আমাদের Indian Art বোধ হয় পুরাতন Convention (বাধ্যবাধকতা পূর্ণ নিয়ম প্রণালী) এর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসেন। ঠিক্ বর্ত্তমান ভারতীয় জীবনকে তাহার মধ্যে এখনও খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। মিঃ রদেনষ্টাইন সেইটীতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে যে সার্ব্বভৌমিক অনুভূতির ভাব আছে তাহাকেই বর্ত্তমান ভারতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানের তরঙ্গে তরণী ভাসাইয়া দিয়া আমরা যেন ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন ধ্রুব তারাটিকে হারাইয়া না বসি. আবার কেবল সেই ধ্রুব তারার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বর্ত্তমানের তরঙ্গ ও তরণীকে অবহেলা না করি। এই দুদিকের সামঞ্জস্য করাই কঠিন সমস্যা। বিলাতী রং চং এ যখন আমাদের দৃষ্টি বিগড়াইয়াছিল তখন যথাসময়ে অবনীন্দ্র নাথের শিল্পান্দোলনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত না হইলে আমরা ভারতের একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতাম। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের সেই দৃষ্টি দিয়াছেন। আমরা আমাদের সনাতন কেন্দ্রটিকে ফিরিয়া পাইয়াছি, কিন্তু তাহাকে বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। এই সামঞ্জস্যের সূচনা মিঃ রদেন্‌ষ্টাইনের চিত্রে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের পশ্চাতে

সেই আদর্শ এখনও তার কাজ করছে। মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন্ তাহাই আমাদের সাম্‌নে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন।

মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন রবীন্দ্রনাথের দুই একটী কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়া সেই সত্যটাই দেখিতে পাইলেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন কবির বীণায় তাহারই ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন কবিকে তাঁর কাব্যের অনুবাদের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। মিঃ রদেন্‌ষ্টাইনের তাগিদ্ পশ্চাতে না থাকিলে এতটা অনুবাদ হইত কি না সন্দেহ। মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন একদিন বল্‌ছিলেন, "Simple Artist হয়ে আমি যা বুঝেছিলাম এদেশের সাহিত্য-সমাজ কেন তা বুঝবেন না? আমি প্রথমেই এইটী বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে পাশ্চাত্য সমাজের সাহিত্যরথীগণ আমার কথায় সায় দিয়াছেন।" ডাঃ কুমার স্বামী বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতের কোনও ভাষা জানি না, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মধ্য দিয়া ভারতের মর্ম্মস্থানটীর পরিচয় পাইয়াছি।" মিঃ রদেন্‌ষ্টাইন্‌ও তদ্রূপ শিল্পের মধ্য দিয়াই ভারতের মর্ম্মস্থানটীর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সংস্কারের কোন বাধা নাই বলিয়া সত্য লাভ করিতে তাঁকে বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটী চিত্র আঁক্‌ছেন। পরে আমরা তার পরিচয় দিব।

এতদিন আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে যোগ ছিল সেইটী রাজনৈতিক যোগ। ভাবের দিক থেকে আমরা কেবল ইংলণ্ডের কাছে ধার করেছি। নিজেদের ঘরের সত্যকে ঘরে ও বাইরে অবজ্ঞা করাকেই কৃতার্থতা মনে করেছি। আমরা একদল গৃহের আবর্জ্জনাকে বুকে করিয়া ধরিয়াছি, আরেক দল আবর্জ্জনা দূর করিতে গিয়া রত্নটীকেও ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। অনুকরণকে অর্জ্জন মনে করিয়া স্পর্দ্ধাভরে ইংরেজের দরজায় রিক্তহস্তে দাঁড়াইয়াছি। তাই যথার্থ যোগ হয় নাই। সময় আসিয়াছে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের দিক দিয়া আমাদিগের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা দান করিতে হইবে এবং উহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ—বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও কর্ম্ম ব্যবস্থা এবং মানবসেবার দিক্ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আদান প্রদানের যে যোগ তাহারই সূচনা দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই যোগ ভারত ও ইংলণ্ড উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।

বিত্ত-দান।

("বৃহদারণ্যকোপনিষৎ" অবলম্বনে)

মহাঋষি যাজ্ঞবল্ক্য একদিন যুগল প্রিয়ায়
কহিলা সস্নেহে ডাকি—"কালি আমি যাব প্রব্রজ্যায়
তোমরা সম্মতি দাও! এতকাল গৃহস্থ-আশ্রমে
যাঁহার অনুজ্ঞা পালি' নত-শিরে নীরবে সম্ভ্রমে
প্রত্যেক নিমেষে যাঁরে করিয়াছি অন্বেষণ প্রাণে,
কালি হতে অনুক্ষণ মগ্ন হয়ে শুধু তাঁর ধ্যানে
বরিব সে জ্যোতির্ম্ময়ে, মাগি লব আশ্রয় শাশ্বত
তৃষিত আত্মার মোর! জানি আমি তোমরা যে কত
গুণবতী ভার্য্যা মম; আছে আশা, হইবে সম্মতি
প্রতির এ আকাঙ্ক্ষায়!

কাত্যায়নী, আর এক কথা,—
আমার যা' বিত্ত আছে, তোমারে অর্দ্ধেক দিনু তার,
অপরার্দ্ধ মৈত্রেয়ীর; ভগিনীর প্রীতি দু' জনার
অক্ষত অক্ষুণ্ণ রাখি' মোক্ষপ্রদ সনাতন-পথে
হও দোঁহে অগ্রসর!"

কাত্যায়নী বন্দি বিধিমতে
কহিলেন মৃদুস্বরে—"প্রিয়তম! প্রত্যক্ষ দেবতা!
মঙ্গল ইচ্ছায় তব কোনদিন করিনি অন্যথা,
যতই কঠোর হোক্, শির পাতি আজিও আদেশ
অসঙ্কোচে মানি লব! পতি কায়া, সতী ছায়া এই
শিখিয়াছি তব পাশে! তুমি আজি আমা সবাকার
ভাল বলে ভেবেছ যা, রোধি অশ্রু, ভুলি হাহাকার,
হব তার অনুগামী!"

পতিব্রতা মৈত্রেয়ী নীরবে;
ক'ন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁরে—"প্রাণে না কিবা বাঞ্ছা তব

মোর ব্যবস্থায় দেবী?" মৈত্রেয়ী কহিলা করযোড়ে—
"একটি বিষয়ে বড় পড়িয়াছি সমস্যার ঘোরে,
দাও প্রভু সদুত্তর! রত্নময়ী ধরিত্রী আমায়
পারিবে কি মুক্তি দিতে?"

—"নহে প্রিয়ে, কভু নহে হায়,"—
উত্তরিলা যাজ্ঞবল্ক্য—"পার্থিব-সম্পদ কভু কারে
দিতে নারে পরিত্রাণ ; সে আশাও অন্তর মাঝারে
করিতে পারে না কেহ! ধনী হেন অনিত্য-হরষে
কাটিবে যে শুধু কাল, কামনার উদ্বেল-পরশে
সুখ-শান্তি-তৃপ্তি-হারা!"

কহিলেন মৈত্রেয়ী আবার—
"যেবিত্ত মোক্ষের হেতু কোন দিন না হবে আমার
কি করিব সেই বিত্ত লয়ে? নাথ, তুমি কৃপাময়
মহাজ্ঞানী; প্রিয়তম, জানিবারে ব্যাকুল হৃদয়
কহ এ দাসীরে তব, হবে যাহা কল্যাণ-সোপান
অমৃতের প্রস্রবণ!"

মৃদু হাসি মহর্ষি-প্রধান
কহিলেন স্মিত-কণ্ঠে—"তুমি যথা প্রিয়তমা মম,
তেমতি দিতেছ আজি হে মৈত্রেয়ী, প্রীতি নিরুপম
শুধায়ে এ গূঢ় কথা! কহিতেছি তোমা মোক্ষোপায়
শুন সারা মনপ্রাণে!

সতী শুধু পতি-প্রেমাশায়
পতিরে না ভালবাসে, সে চাহেগো আনন্দ আত্মার;—
আপন সর্ব্বস্ব তাই পতি-পদে দেয় উপহার
মুক্ত করি হৃদিখানি! প্রীতি তরে কেবলি সতীর
পতি তো বাসে না ভাল, সেও মাগে অজ্ঞাতে গভীর
আত্মার আনন্দ শুধু! এই মত বিশাল ধরায়
যেখানে যা' কিছু আছে, কেহ কারো প্রীতির আশায়
বাসেনা তো ভাল কারে; আত্মার আনন্দ তরে প্রিয়ে,
প্রিয় হয় পরস্পর! তাই সদা আত্ম-উৎসর্গিয়ে
অণু হতে অণু যিনি মহা হতে যিনি মহীয়ান্
বিশ্বের উপাস্য সেই—আত্মারূপী পুরুষ প্রধান
চিনিতে বুঝিতে চাবে! লভ্য তিনি ধ্যান-ধারণায়;—
সকল আনন্দ-জ্ঞান লভি' তাঁরে লভিবে হিয়ায়
সর্ব্ব মূলাধার তিনি।

আত্মা হতে নিখিল ভুবন
যে জন পৃথক হেরে, হয় তার নিশ্চিত পতন;—
এ ব্রহ্মাণ্ড আত্মাময়! আত্মা ছাড়া কিছু নাই আর,
আত্মাতে সে হবে লীন, এ জগৎ বিভূতি আত্মার,
প্রকাশ সে শকতির!

সপ্তস্বর মিলিয়া বীণার
অপূর্ব্ব রাগিণী এক আকাশেতে তুলে গো ঝঙ্কারি'
বীণা হতে পৃথক তা' নহে, ধ্রুব-পরিচয়ে তা'রি
হয় সর্ব্ব স্বর-বোধ; সেই মত জানিলে আত্মায়
সর্ব্ব জ্ঞানাকর যিনি, নিখিলের জ্ঞান-ধারা হায়,
নিভৃত অন্তরে পশে!

একমাত্র নীরের যেমন
সলিল-বুদ্বুদ-ফেনা বিভিন্ন প্রকাশ-সুমোহন,
নামরূপাত্মক বিশ্ব অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তেমতি
বিচিত্র বিকাশ মাত্র! ব্রহ্ম বিনে অসম্ভব সতী,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই! এ জগৎ শক্তিরূপ তাঁর!
যেই মত হে মৈত্রেয়ী, অসীম অনন্ত পারাবার
আশ্রয় সে কূপাদির, সব রূপ আশ্রিত আঁখির,
শ্রবণে শব্দের ঠাঁই, বেদ রাজে মন্দিরে বাণীর,
কর্ম্মের সম্বল কর, সঙ্কল্পের শরণ এ মন,
সেই মত এ বিশ্বের আশ্রয় সে ব্রহ্ম সনাতন
সাকারে কি নিরাকার!

যে সৈন্ধব জনমে সলিলে,
মুহূর্ত্তেকে মিলাইয়া যায় তাহা সলিলে ফেলিলে,
সহস্র প্রয়াসে আর নাহি হয় উদ্ধার তাহার
স্বাদে শুধু পরিচয়! জেনো স্থির প্রেয়সী আমার,
দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই—তেমতি এ ভূতাত্মিকা ধরা
নাম-রূপ বিনাশনে স্পর্শি মৃত্যু কালকূট ভরা
অনন্ত অপার সেই সুমহান পরম আত্মায়
ডুবে যায় অলক্ষিতে! উপাধির বিনাশেতে হায়,
নাম-রূপ-পরিচ্ছেদে ঘটিলেও অভাব আত্মার
না হয় বিনাশ তার! জ্ঞানের এ গূঢ় সমাচার
অর্পিনু তোমারে দেবী, তুমি এবে কর অন্বেষণ
আপন জীবন মাঝে!"

মহর্ষির বন্দিয়া চরণ
মৈত্রেয়ী-আনত-শিরে লভিলা এ মহা বিত্ত দান
অক্ষয় অব্যয় ধ্রুব মুমুক্ষুর অমৃত সোপান।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

অষ্টম ভাগ। মাঘ, ১৩১৯। ১০ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE, WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কাৰ্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২।৵০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

ট্রয় নগরের প্রাচীরোপ'র
দণ্ডায়মানা হেলেন।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :— স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | মাঘ, ১৩১৯ | ১০ম সংখ্যা।

স্বর্গীয়া শ্যামাসুন্দরী দেবী।

১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধের নিকটস্থ ধামগড় গ্রামে সাধ্বী শ্যামাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় পুণ্য-প্রভাবে পিতৃ ও ভর্তৃকুল উজ্জ্বল করিয়া ১৩১৭ সনের ৯ই আষাঢ় পতিপুত্র-দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও জামাতৃমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে করিতে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। এই মহীয়সী মহিলার জীবন-কাহিনী অতি সুন্দর। উপযুক্ত রূপে তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তথাপি পাঠিকা ভগিনীগণের প্রীতির জন্য সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

যে সময় মৃতবৎ বঙ্গীয় নারী-সমাজ, বিধাতার বরে, স্বর্ণকুমারী, কামিনী, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি লেখিকাগণের লেখনী নিঃসৃত অমৃত সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই; যে তমসাচ্ছন্ন কালে, তেজস্বিনী মহিলা সম্পাদিকা সম্পাদিত পত্রিকাসমূহ দ্বারা এদেশের নারী-জাতির গন্তব্য পথ কিঞ্চিন্মাত্রও আলোকিত হয় নাই, বঙ্গনারীর সেই দুঃখ দুর্দ্দশার দিনে শ্যামাসুন্দরী দেবী বামাকুলের হিত এবং স্বীয় জীবনের উন্নতি সাধনে সাধনপথের অশেষ সঙ্কট পরাভূত করিয়া একাকিনী অগ্রগামিনী হইয়াছিলেন।

তিনি তৎকালীন বামাবোধিনী পত্রিকাতে প্রতি মাসে দেশ-প্রচলিত কুপ্রথাদির বিরুদ্ধে, নারীজাতি বিষয়ক নিয়মিত প্রবন্ধ, কবিতা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পাদি লিখিতেন। কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে ইঁহার রচিত "কুললক্ষ্মী" নামক একটী নাতি ক্ষুদ্র অতি মনোহর উপন্যাস ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৎকালে স্ত্রীলোকগণ ত দূরের কথা দুই চারিটি উদার-চরিত মহাত্মা ভিন্ন, অপর কেহই কৌলীন্যাদি কুপ্রথার বিরুদ্ধে ঐরূপ প্রকাশ্যরূপে লিখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না এবং এ সম্বন্ধে লিখিতে উদ্যোগী হইতেন না। শ্যামাসুন্দরীর পুণ্য-পূত জীবন আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক এবং সাহিত্যিক।

দেবী শ্যামাসুন্দরী কোনও স্কুল কলেজে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও কেবল মাত্র পতির আনুকূল্য এবং স্বকীয় প্রতিভা বলে যেমন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন নারী-জীবনে সেরূপ শিক্ষালাভ সচরাচর ঘটিয়া উঠে না।

শ্যামা সুন্দরীর পিতা ৺ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয় ধামগড় গ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী; ধন সম্পদ অপেক্ষা চরিত্রগত দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণরাশি থাকা প্রযুক্তই তিনি জনসমাজে অধিকতর আদরণীয় এবং সম্মানার্হ ছিলেন। দয়া ও পরোপকারের জন্যই তদঞ্চলে তিনি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৎকার্য্য সমূহ এমন গোপনে অনুষ্ঠিত হইত যে গৃহস্থিত পরিজনবর্গও তাহা জানিতে পারিতেন না।

ইঁহার দয়া গুণে বহু দরিদ্র ছাত্র এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, আপামর সাধারণ দীন দুঃখী রুগ্ন অশরণ ব্যক্তি আশ্রয় প্রাপ্ত ও প্রতিপালিত হইত। ফলতঃ এতাদৃশ সদাশয় পুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরলোকগতা দেবী. অতি শৈশব হইতেই মহৎ-গুণাবলী বিভূষিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্য কালেই শারদীয়া পূজোপলক্ষে প্রাপ্ত, মূল্যবান্ বসন ভূষণগুলি তিনি দুই চারিবার মাত্র ব্যবহার করিয়াই দরিদ্রা প্রতিবেশিনী সঙ্গিনীগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন।

তাঁহার পরম স্নেহবান্ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় পুনরায় পূর্ব্বানুরূপ বস্ত্রাভরণ আনয়ন পূর্ব্বক, প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রদান করিতেন; এবং মৃদু ভৎর্সনাচ্ছলে শুধু এইমাত্র কহিতেন, "বুড়িমা! তোর দিবার ইচ্ছা ছিল তা আগে বলিলি না কেন? অল্পদামের জিনিস পৃথক খরিদ করিয়া আনা যাইত, দিলি ত দিলি তোর জন্য যা দামী জিনিস আনিলাম তাই সব দিয়া দিলি! দেখিস্ বুড়িমা! আর ওরূপ কখন করিস্‌নে।" জ্যেষ্ঠতাতের এ অনুরোধ "অরণ্যে রোদন" মাত্র। কেন না, পুনশ্চ বৎসরান্তে তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষিত দৃষ্ট হইত!

এই প্রকারে বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, জ্যেষ্ঠতাত কাশীচন্দ্র রায় মহাশয়, ভ্রাতৃকন্যার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বস্ত্রাদি আনয়নে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাল্যকালের এই সকল কথা-প্রসঙ্গে স্বর্গীয়া দেবী বলিতেন, "আমার ত ভাল ভাল কাপড় বা গহনার কিছু অভাব ছিল না? যাহার কিছুই নাই, তাহাদের জন্য প্রাণে বড় দুঃখ বোধ হইত, তাই দিয়া দিতাম!" এই সকল কার্য্যে ইনি মহাপ্রাণ পিতার নিকটে যথেষ্ট সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। অনেক স্থলে পিতা স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া কন্যা দ্বারা গুপ্ত দানে পরম সন্তোষ অনুভব করিতেন।

যে সকল পরিচারিকা শৈশবে শ্যামাসুন্দরী দেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিত, তিনি তাহাদিগকে প্রায়শঃই নানাজাতীয় প্রাণীর সেবায় বিব্রত করিয়া রাখিতেন; তাঁহার আদেশ মত দাসদাসীদিগকে ঝড় বৃষ্টির পর, বৃক্ষতল পতিত, পক্ষী-শাবক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইত।

পতিত আহত ছানাগুলিকে তাহাদের বাসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত, বালিকার অতি কোমল তরুণ প্রাণ কিছুতেই সান্ত্বনা মানিত না। বহু আয়াসেও যেগুলির বাসার সন্ধান মিলিত না স্বয়ং তাহাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক লালন পালনে নিযুক্ত হইতেন।

তাঁহার প্রাচীনা ধাত্রীর নিকটে অবগত হইয়াছি যে, অনেক সময় এই পালিত প্রাণীদিগের একটির মৃত্যু হইলে তিনি বালিকাসুলভ ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

অসহায়ের প্রতি এমন স্নেহ ও করুণা বশতঃ ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, বাঘদাস, খরগোস, বুল্‌-বুল্‌, কোকিল, কাক, এমন কি ভূতম্ পাখীর ছানা পর্য্যন্ত তাঁহার বাৎসল্যে বঞ্চিত হয় নাই। বিড়াল, কুকুরের ত কথাই

নাই। এইরূপে জীবসেবা ব্রতই আজীবন পরম আনন্দদায়ক জ্ঞান করিতেন এবং তরুণ বয়সের এই সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাত্রী প্রীতি হইতেই ভাবী মহত্তর দেবী-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যে বয়সে বালক-বালিকাগণ শিশুসুলভ আমোদ প্রমোদে নিয়ত প্রমত্ত থাকে, সেই বয়সে তিনি অসহায়, আহত, মাতৃহারা, গৃহহারা, রুগ্ন বা অঙ্গহীন জীবশিশু-দিগকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া, মায়ের মত স্নেহপূর্ণ করুণা-কাতর দৃষ্টিতে সেই অভাগাগণের মুখ চাহিয়া চাহিয়া কালক্ষেপণ করিতেন।

বহু সন্তানের জননী রূপে গৃহকার্য্য সম্পাদনে নিয়ত ব্যাপৃতা অবস্থাতেও ক্রোড়স্থ শিশু ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পীড়িত, আহত ক্ষুধার্ত্ত জীবের শুশ্রূষা এবং আহার দানে তাঁহার যে অসীম ব্যগ্রতা দর্শন করিয়াছি তাহার তুলনা মিলে না। শ্যামাসুন্দরীর দেবতুল্য পিতৃদেব ৺ ভৈরব চন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকটে দুঃস্থ রোগী, প্রতিবেশী, প্রজা, আত্মীয়, পরিজনদিগের নিমিত্ত ৪।৫ টি আলমারী-পূর্ণ ঔষধ এবং সাগু, বার্লি, এরারুট, মিশ্রী, সুগারমিল্ক, বিস্কুট প্রভৃতি পথ্য নিরন্তর সজ্জিত থাকিত। প্রধানতঃ একমাত্র বালিকা কন্যাকে সহকারিণীরূপে লইয়াই তিনি, যোগ্যপাত্রে এ সকল দান বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল কার্য্য-ব্যস্ততাবশতঃই দেবী শ্যামাসুন্দরী, শৈশবে যথোপযুক্ত অভিনিবেশসহ বিদ্যাভ্যাসে সমর্থা হয়েন নাই; কিন্তু উত্তর কালে এমত অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন যে নারীজাতির অতীত ইতিহাসে, পূর্ব্ববঙ্গীয়া শিক্ষিতা মহিলাগণের অগ্রণীরূপে তাঁহার নাম চিরকালের নিমিত্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ইঁহার লিখিত "হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?", "প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ", "বিবাহ ও অবরোধ প্রথা" প্রভৃতি সামাজিক জটিল বিষয়ের আলোচনা-পূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রভূত জ্ঞান ও বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথমযুগে, হিন্দু অন্তঃপুরিকা-গণের শিক্ষাবিধানোদ্দেশে, "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্মিলনী" নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহার নিয়মিত সভ্য ও ছাত্রী ছিলেন। ঐ সম্মিলনীর নিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল গুলিতেই তিনি সহ-পরিক্ষার্থিণীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং প্রায় প্রতিবারে নম্বর এত বেশী রাখিতেন যে, উক্ত সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিদ্যাবত্তাতে মুগ্ধ হইয়া বহু মূল্যবান্ সামগ্রী ও উচ্চ প্রশংসাপত্র দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিতে বাধ্য হইতেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী বাংলা ও সংস্কৃতে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এবং স্ত্রীজাতির সামাজিক অধিকার ও প্রচলিত কুরীতি সমূহ বিষয়ে আলোচনা-পূর্ণ এত প্রবন্ধ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, সে সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, একখানি অতি উপাদেয়, জ্ঞানগর্ভ পুস্তকে পরিণত হইতে পারে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ দুশ্চিকিৎস্য প্রবল ব্যাধি সমূহের দুঃসহ ক্লেশ ও সাংসারিক নানা বিভ্রাটে সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে নিদারুণ শিরঃপীড়াতে সাহিত্য আলোচনায় বঞ্চিতা হইয়াছিলেন বলিয়া কতই না পরিতাপ করিতেন! তাঁহার অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা, চিরদিন জিজ্ঞাসু শিশুর ন্যায় প্রবল ও তরুণতরুণীর মত উৎসাহ-উদ্দীপিত ছিল।

৺ ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয় অবিচলিত চিত্তে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি স্পর্শাক্রামক রোগীর সেবা করিতেন। স্বীয় প্রাণের স্নেহ-করুণার আকর্ষণ বা গভীর বিবেকানুবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে, কয়েকটি মাত্র মুদ্রা বেতনের লোভে বা চাকুরীগত অধীনতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কেহ কখনও ঐ প্রকার বিপজ্জনক কার্য্যে সম্মত হইতে পারে না, সুতরাং গৃহে দাস দাসীর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, বালিকা কন্যা এই সকল মহৎকার্য্যে পিতার প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন। শ্যামাসুন্দরী দেবীর মাতা ঠাকুরাণীও একজন অতীব ধর্ম্ম-পরায়ণা, মনস্বিনী মহিলা; কিন্তু মাতৃহৃদয় প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী সাধারণতঃ সন্তানের হিতকামনায় ব্যস্ত, বিশেষতঃ যে সন্তানের জীবনরক্ষার্থ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্বার্থত্যাগেও জননী প্রস্তুত, সেই নয়নানন্দ দায়িনী

জীবনস্বরূপা একমাত্র বালিকা কন্যাকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ, ক্রীড়াকৌতুক পরিহার পূর্ব্বক, সতত সংক্রামক রোগীর শয্যাপার্শ্বেও অসহায়, আহত, পীড়িত জীবজন্তুর পরিচর্য্যাতে বিব্রতা দেখিলে কোন্ মাতাই বা অবিচলিতা থাকিতে পারেন? তাই তিনি সন্তানের এরূপ আচরণে অতিমাত্র উদ্বিগ্না থাকিতেন এবং বহু সস্নেহ অনুরোধ দ্বারা দুহিতাকে সঙ্কটাপন্ন কষ্টদায়ক কার্য্য সকল হইতে প্রতিনিবৃত্তা করিতে অসমর্থা হইয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধা হইতেন।

ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয় শ্যামাসুন্দরীর দশমবর্ষ বয়ক্রমে তাঁহাকে সদ্বংশজাত সুযোগ্য, সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়া অপরিসীম হর্ষলাভ করিলেন; কিন্তু সেই সুখ তিনি অতি অল্প সময়ই উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই দেশে ভয়ানক ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হয়। ভৈরবচন্দ্র সযত্ন শুশ্রূষা বলে আসন্ন-মৃত্যু বহু কলেরা রোগীর আরোগ্য সাধন করিয়া নিজ দেবজীবন দ্বারা সেই ভীষণ রাক্ষসের তৃপ্তি সাধন করিবার পরেই, বাড়ীর জনৈক পাচক ব্রাহ্মণ ঐ পীড়াতে আক্রান্ত হয়; কোনও ব্যক্তি রোগীর মলমূত্রাদি পরিষ্কার বা শয্যাপার্শ্বে অবস্থান ত দূরের কথা, সামান্য একটু পানীয় জল প্রদানেও অস্বীকৃত হইত। কিন্তু শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, একাদশবর্ষীয়া তরুণ বালিকা দেবী শ্যামাসুন্দরী দুই দিবা ও এক রাত্রি ভয়াবহ ব্যাধিগ্রস্ত, মরণোন্মুখ অবস্থাপন্ন দীন ব্রাহ্মণকে, মাতার মত অবিচলিত হৃদয়ে বক্ষে ধারণ করিয়া, যথাশক্তি ঔষধ-পথ্য প্রদানে, স্বজনবিহীন বিদেশে, অভাগার শ্মশানযাত্রার উৎকট বিভীষিকাকে, স্নেহ-সিক্ত করিয়া, শান্তির সহিত পরলোকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। মহামারীর ভয়ে উক্ত রোগগ্রস্তের শব সৎকারার্থেও কেহই সহজে সম্মত হইল না; এইজন্য ব্রাহ্মণের জীবনাবসানের পরেও ২।১ ঘণ্টাকাল মৃতের প্রহরীরূপে তাঁহাকে শবপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পরলোকগতা দেবীর নিকটে আমরা এরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, জয়মণি নাম্নী একটি স্নেহশীলা পরিচারিকা উল্লিখিত কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

শিশু বা কিশোর বয়স্ক কেন, সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের বয়স্থ নরনারীর মধ্যেও এরূপ উদাহরণ দুর্লভ। এই অপরিসীম স্নেহ-করুণা ও অতুলনীয় চরিত্র প্রভাবেই, ইনি পিতার প্রজাবর্গ সমীপে মাতৃবৎ পূজ্যা ও কন্যাসম স্নেহপাত্রী ছিলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনার্থে দেবীর পবিত্রতম দেহ, ধামগড় গ্রামস্থিত তাঁহার উদ্যান বাটিকায় লইয়া যাইবার সময়, পথের পার্শ্বস্থিত শীতললক্ষ্যা নদীর উভয়তীরবর্ত্তী পরিচিত জনমণ্ডলী এই নিদারুণ দুঃখ সংবাদ শ্রবণ মাত্র করুণ আর্ত্তনাদে তটভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে জন্মের মত সেই স্নেহ-দয়ার প্রতিমা দর্শনার্থে ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। যে বার পূজার সময়ে কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ ইনি পিত্রালয় গমনে অসমর্থা হইতেন, সেইবার তদ্দেশবাসী দীনদুঃখীগণ বলিত, "ওরে দুর্গাপূজা ত বটে, কিন্তু আমাদের শ্যামা মা যে এবার আইসেন নাই, তাই আমাদের ভাগ্যে অবধারিত উপবাস।" বস্তুতঃ পূজা পার্ব্বণ বা বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে দীনহীন অন্ধ-আতুরদিগকে স্বহস্তে সর্ব্বপ্রকার উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন ও দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতে, তিনি এমন ব্যগ্রতা সহকারে নিযুক্ত হইতেন যে, সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন, জননী আপন উপবাসী সন্তানগণের আহার দানে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকেরা ত নিত্য নিত্য উপাদেয় সামগ্রী আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আহার করিয়া থাকেন, আহা! যাহারা বৎসরে একটি দিনও সন্তানের মুখে একটু স্বাদু সুখাদ্য তুলিয়া দিতে পারে না, নিজেরাও পায় না, উৎসবাদি উপলক্ষে অগ্রে তাহাদিগকেই প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য দান করা কর্ত্তব্য।"

ইনি শিশুকাল হইতে ক্ষীণকায়া ও রুগ্না ছিলেন, দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম হইতে দুশ্চিকিৎস্য শূল ব্যাধিতে আক্রান্তা হইয়া জীবনব্যাপী এই নিদারুণ পীড়ার অসহ্য ক্লেশ, "মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা" জ্ঞানে আনত মস্তকে

বহন করিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য সমূহ যেরূপ অসীম ধৈর্য্যের সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রতিদিন এই ভীষণ কষ্টদায়ক শূল বেদনায় ক্লিষ্ট থাকিয়াও স্বামী, দেবর, ভ্রাতা, মাতা, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত প্রতিবেশী হইতে, পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব সকলের প্রতি পর্য্যন্ত যে প্রকার সস্নেহ ব্যগ্রতা ও যত্নের সহিত স্বকীয় দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োজিত করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আর সেই রোগক্ষীণ দেহ-টুকুতে কি যে অদ্ভুত শক্তিই প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার বলে, অশ্রান্ত ভাবে অপরের দুসাধ্য কার্য্য সমূহও অতি সহজে সুসম্পন্ন করিয়া যাইতেন! তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে মুহূর্ত্তরেও আমরা তাঁহাকে আলস্যের বশীভূত হইতে দেখি নাই।

ইনি পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র—সমুদয়ে সাতটী সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন; পিতৃ ও শ্বশ্রূদেবের শোক ভিন্ন, অপর কোনও শোক ইঁহার জীবিত কাল ৫১ বৎসর মধ্যে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হয় নাই।

দেবী শ্যামাসুন্দরী অতি যত্নের সহিত স্বয়ং সন্তান-দিগকে, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস ও আজীবন—শুধু মৌখিক উপদেশ দ্বারা নহে,—স্বীয় সুদৃষ্টান্ত দ্বারা, তাহাদের উন্নত ধর্ম্মজীবন গঠনের নিমিত্ত, বিশেষ ভাবে প্রয়াসী ছিলেন। সন্তানদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত, চরিত্রবান্ দেখিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিকতর কাম্য ইহ জগতে বা জীবনে তাঁহার আর কিছুই ছিল না।

এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ও প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোন্ জননীই বা এমত অভি-লাষিণী না হইয়া থাকেন যে আমার সন্তান, সাধু-প্রকৃতি মহদাশয় হউক! কিন্তু তিনি যেমন সেই লক্ষ্য সাধনার্থে সমস্ত আয়ুষ্কাল অহরহঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বাক্যে, কার্য্যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ!

সেই পুণ্যবতী সাধ্বীর মহৎ-চরিত্রের বিশদ বর্ণনে, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সন্তানগণকে তিনি কি প্রকারে ভগবৎ-নির্ভরশীলতা শিক্ষা দিতেন সে বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী নিম্নে বিবৃত হই-তেছে:—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বীদিগের গণনানুসারে, ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার দশম বৎসরে সাংঘাতিক রিষ্টাশঙ্কা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণের পর হইতে, রিষ্টকাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল দিনের অধিকাংশ ভাগ তিনি, প্রাণাধিকা দুহিতাকে, পৃথিবীর অনিত্যতা, ভগবানের অনন্ত প্রেম ও করুণা, ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার অবিচ্ছেদ্য চির-সম্বন্ধ ও নিত্য বন্ধুত্ব প্রভৃতি অপার্থিব বিষয়ে, তদ্গতচিত্তে, নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত সরল সুমধুর উপদেশ দানে যাপন করিতেন; —আপন প্রিয়তম সন্তানকে, সমস্ত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রাক্কালে তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন করিয়া নিত্য শান্তিদানের জন্য আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেন, সেই অপার্থিব প্রেম, ভক্তি, নির্ভরতা ও বিশ্বাস যেন, তাঁহার তৎকালীন প্রতি বাক্যে ও কার্য্যে উচ্ছ্বসিত হইত।

বস্তুতঃ তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষাবলে, সেই শিশু-কন্যার হৃদয় হইতে (রিষ্ট সময়ে বালিকা কঠিন পীড়া ভোগে মৃতবৎ হইয়াছিল) আসন্ন-মৃত্যু-ভীতি সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত হইয়া অন্তরে পারলৌকিক বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে অপ্রতিহত হৃদয়াবেগে প্রাণতুল্য ধনকে বক্ষে ধারণ করিয়া, বাষ্পগদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিতেন, "মা! আমি কে? মা! আমি কয়দিনের মা? কে তোমাদিগকে এই জগতে পাঠাইবার অগ্রেই আমার হৃদয়ে স্নেহ বাৎসল্য ও স্তনে স্তন্যের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিলেন? যাঁহার অনন্ত স্নেহসিন্ধুর কণিকা মাত্র লইয়া, আমি তোমাদের মাতা; তিনি কখনো মুহূর্ত্তরেও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। মা বিশ্বজননী যাঁহাদিগকে বড় বেশী ভাল বাসেন, সেই প্রিয়তম সন্তানদিগকেই শীঘ্র শীঘ্র এই দুঃখভরা সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আনন্দময় স্বর্গে স্থান দান করেন।" অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আত্মহারা ভাবে, শ্রীভগবানের অনন্ত প্রেম ও মরজগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে এই সকল স্বর্গের কাহিনী কহিতে কহিতে তিনি অকস্মাৎ ধ্যানস্তিমিত-

মেজে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া থাকিতেন; দুই গণ্ডে অজস্র প্রেমাশ্রুধারা বহিয়া যাইত। পুণ্যময়ী দেবী-প্রতিমার তৎকালীন সেই সৌন্দর্য্যে প্রেমময় দেবতার প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিয়া, বালিকা যেন অতি উৎসাহের সহিত, নির্ভীকচিত্তে অনন্তধামের পথে অগ্রসর হইতেছিল। অতি যত্ন ও শ্রমে এতদিন যাহার লালন পালন এবং শিক্ষা বিধান করিয়া আসিতেছিলেন, সেই একান্ত আশার ধন প্রিয়তম নয়নপুত্তলির চিরবিচ্ছেদাশঙ্কা বশতঃ আত্মবিহ্বলতা গোপন করিয়া তাঁহার আত্মার প্রকৃত মঙ্গল ও চির শান্তির নিমিত্ত যে জননী এমন অপরিসীম ধৈর্য্য ও চিত্তের দৃঢ়তা প্রদর্শনে সক্ষমা, তিনি অসামান্যা মানবী বা মানবী রূপে দেবী!! ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান্ কখনও তাঁহার চরণানুধ্যানকারিণী, এতাদৃশ মহাপ্রাণা নারীর কুসুমকোমল হৃদয়, সন্তান-শোকরূপ অসহ বজ্রবাণে বিদ্ধ করিতে পারেন না; তাই তিনি সর্ব্ব বিঘ্ন দূর করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জীবন রক্ষায়, বিশ্বাসের পুরস্কার প্রদান এবং স্বকীয় "বিপদভঞ্জন" নাম ও ভক্ত হৃদয়ের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাকে মহিমান্বিত করিলেন!

আমাদিগের হিন্দুসমাজের ইদানীন্তন প্রচলিত কুপ্রথাজনিত কতকগুলি কারণ বশতঃ পুত্র-কন্যা-মধ্যে অশন-বসন প্রদান ও স্নেহ যত্নাদি প্রদর্শনে যে প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই দেবীর গৃহে তাহার বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হইত না; জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষা, স্নেহ-মমতা, বসনভূষণ, সর্ব্বপ্রকারে সমব্যবহার দ্বারা তিনি, অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ন্যায়ের ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম পথ হইতে ইহজীবনে একটি সামান্য কার্য্যেও তাঁহাকে পদস্খলিতা হইতে দেখা যায় নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রচলিত বহুবিবাহকারী পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদানের পরিবর্ত্তে অকুতদার যোগ্যপাত্রে কন্যা অর্পণ; কর্ত্রী—উপার্জনক্ষম, সম্রান্ত, জনমান্য পতির পত্নী হইয়াও, একমাত্র স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা সাধন ও আদর্শ প্রদর্শনোদ্দেশে, কিছু কালের জন্য ইডেন ফিমেল স্কুল নামক সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদগ্রহণ উল্লেখ যোগ্য।

বস্তুতঃ তাঁহার অধীত বিদ্যা, বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির মত কেবল বাক্যে পরিসমাপ্ত না হইয়া, কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচুর সফলতা উৎপাদন করিত।

কোনও প্রকার সামান্য ব্যসন বিলাসিতাকেও তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনে প্রশ্রয় দেন নাই। ভ্রষ্টা স্ত্রীগণ দ্বারা অভিনীত অভিনয়, তিনি কখনও দেখেন নাই। বলা বাহুল্য যে এই জীবন্ত শিক্ষা প্রভাবে তাঁহার পরিবারস্থ সকলের নিকটেই উহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাপ্রকার বৃথা আমোদ প্রমোদেও তিনি প্রায়ই যোগ দিতে চাহিতেন না। বসন ভূষণের পারিপাট্যে তিনি এত আড়ম্বরশূন্যা ও নিরীহা ছিলেন যে হস্তে শঙ্খ ও স্বর্ণ নির্ম্মিত কয়েক গাছি মাত্র চুড়ি বা দুই গাছি বলয় ভিন্ন অপর কোনও আভরণ ব্যবহার তাঁহার নিতান্ত অপ্রীতিজনক ছিল। সামাজিক উৎসবাদিতে যোগ দেওয়ার কালে, সম্মান ও স্ত্রীজনোচিত শীলতার জন্য যাহা আবশ্যক তদুপযুক্ত সামান্য বস্ত্রালঙ্কার মাত্র ধারণ করিতেন।

আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, স্বল্প মাত্র বিদ্যায় নাম মাত্র শিক্ষিতা রমণীগণ সাধারণ রমণীদিগকে কেমন একটা অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ এবং তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশে বিশেষ সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেবী শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রগত এইটি বিশেষ গুণ ছিল, যে নিজে অশেষ গুণবতী হইয়াও বর্ণজ্ঞান বিহীনা, কুসংস্কার-পরায়ণা, নীচ জাতীয়া সামান্যা স্ত্রীলোকগণের সঙ্গে পর্য্যন্ত, প্রাণ খুলিয়া এমন ভাবে মিশিতেন এবং এমন সরল ভাষায় নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনা করিতেন যে তদ্দ্বারা তাহারা পরম উপকার প্রাপ্ত হইত।

ফলতঃ স্বকীয় পিতৃদেবের নিকটে অতি শৈশবেই "তস্মিন প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ" এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সাধনেই তিনি সমস্ত জীবন একাগ্রতাসহকারে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

এই মহাপ্রাণা আদর্শ হিন্দুমহিলা, প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, তদ্গতচিত্তে, সঙ্গীত দ্বারা আরাধ্য দেবতার

আরাধনা করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি মধুর ছিল, সন্তানগণের দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধির সময়, শিয়রে বসিয়া সুললিত কণ্ঠে কি অমৃত-মধুর নাম তিনি গান করিতেন; কি অবিচলিত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি সেই অমৃত অভয় দেবতার চরণে করুণা ভিক্ষা করিতেন, তাহা মনে হইলে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! অনেক সময়েই সন্তানদিগকে কহিতেন, "তোমরা যদি তাঁহার পথে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট থাক, এবং তাঁহারই কৃপাতে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পার, তবেই আমি ইহলোক এবং পর লোক উভয় লোকেই ধন্যা, তবেই আমার এই নারীজন্ম কৃত কৃতার্থ।"

নিদারুণ শূল ব্যাধিতে কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায়, তাঁহার দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছিল, তথাপি দৈনন্দিন করণীয় কর্ম্মে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও পরিলক্ষিত হইত না। পরিজনপূর্ণ সুবৃহৎ গৃহের গৃহিণী হইয়াও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক কার্য্য সাধনে কখনও তিনি কুণ্ঠিতা হইতেন না।

প্রতিবেশিনী কোনও রমণীর আসন্ন প্রসব-সংবাদ শ্রবণ মাত্র তথায় গমন করিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন। এ অবস্থায় কাহারও বিপদাশঙ্কা অনুমান করিলে আবশ্যক মত স্বগৃহ হইতে ঔষধ পথ্যাদি লইয়া প্রদান করিতেন এবং সকল লোকের বিদ্রূপকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নীচজাতীয়া নারীগণের সূতিকা-গারে প্রবেশ পূর্ব্বক যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেও কিঞ্চিৎমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি ধাত্রীবিদ্যাতে এমন সুদক্ষা ছিলেন, যে পল্লী মধ্যে অনেক স্থলে, একমাত্র তাঁহার নিপুণতায়ই প্রসূতি ও সন্তানের জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে রক্ষা পাইত।

প্রতিবেশীগণমধ্যে পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদি প্রদান, কাহারও বা বয়স্ক পুত্র কন্যার বিবাহ বিষয়ে সবুদ্ধি, কোনও পিতামাতার সন্তানদিগের বিদ্যা-শিক্ষাদি ও ভবিষ্যৎ উন্নতি কল্পে উপদেশ দান প্রভৃতি, যাহার জন্য যেরূপ প্রয়োজন, তিনি সকল প্রকার শুভ কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। কোনও সংসারে পিতা পুত্র, শ্বশ্রূ বধূ, পতি পত্নী মধ্যে মনোমালিন্য হেতু অশান্তি জন্মিলে মধুর উপদেশে তিনি শান্তি সংস্থাপন করিতেন। ফলতঃ চতুঃপার্শ্বস্থ প্রতিবেশীমণ্ডলী মধ্যে ইনি শান্তিময়ী জননী রূপেই বিরাজমানা ছিলেন। ইঁহার জীবিত কাল, প্রধানতঃ স্বামীর কর্ম্মস্থান, ঢাকা নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১৫।২০ দিবস পূর্ব্বে, চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে শীতললক্ষা নদীতীরে, নারায়ণগঞ্জ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেখানেই তনুত্যাগ ঘটে।

শ্রীনির্ম্মলা।

স্পর্শমণি।

১

অভিমানিনী।

ব্রহ্মপুত্র নদ নির্ম্মল জল প্রবাহে কুলু কুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। বেলা অবসান প্রায়, ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় রবির মৃদু রশ্মি চঞ্চল জলোচ্ছ্বাসে হাসিতেছে,—নাচিতেছে।

দশ বৎসরের বালিকা মৃণ্ময়ী বাঁধা ঘাটে বসিয়া জল লইয়া খেলা করিতেছিল। বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দু তাহার সুন্দর ললাটে—অলক গুচ্ছে—শুভ্র মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেই মাধুর্য্যময়ী ক্ষুদ্র বালিকামূর্ত্তি উন্মুক্ত আকাশ-তলে উন্মুক্ত প্রকৃতির সুমধুর দৃশ্যপটে স্বর্গভ্রষ্ট দেব বালিকার মত দেখাইতেছিল। ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তাহার সুন্দর পা দুখানি ধৌত করিয়া দিতেছিল।

এমন সময় উপর হইতে অপর একটি বালিকা ডাকিল,—"মিনি!"

মিনির কাণে সে কথা প্রবেশ করিল না; ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে কি ভাব জাগিয়াছিল কে বলিতে পারে? জলের নীচে আকাশ ও বৃক্ষাদির দোলায়মান প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে সে এক একবার কি ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সঙ্গিনী আবার ব্যস্ত ভাবে কহিল,—মিনি, মিনি, —ও মিনি!"

মিনির এবার চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"কি অবিদিদি।" দ্বিতীয়া বালিকার নাম অবলা, তাহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র।

অতীতের কত মর্ম্মগাথা—যুগযুগান্তরের নীরব স্মৃতি ব্রহ্মপুত্রের কলতানের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। এ গানের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। সেই অশ্রান্ত জল রাশি যেন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অনন্তের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে; নিরন্তর দিন যামিনী একই রাগ একই সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তবু নিত্যই নূতন!

তীরে একখানি গ্রাম শ্যামল বৃক্ষ-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া কুঞ্জ বাটিকার মত শোভা পাইতেছে। দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া কোন স্থানে তৃণ-কুটীর ও ইষ্টক মন্দিরের কিয়দংশ দৃষ্ট হইতেছে।

একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ যেন আকাশ স্পর্শ করিয়া নদীতীরের কতক স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা সকল চারিদিকে বিস্তৃত। সেই অসংখ্য নিবিড় পত্রপল্লবের অন্তরালে নানাজাতীয় বিহঙ্গম কুলায় বাঁধিয়া সুখে বাস করিতেছে। তাহাদের সুমধুর কূজন ধ্বনিতে সে স্থান নিয়ত মুখরিত। সেই মনোরম মহীরুহের একদিকে একখানি দেব-মন্দির। তাহার সম্মুখবর্ত্তী অঙ্গন হইতে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অশ্বত্থের শীতল ছায়ায় ঘন বিন্যস্তভাবে সলিল স্পর্শ করিতেছে। মন্দিরের বহির্ভাগ নানা কারুকার্য্য খচিত। অভ্যন্তরে কালী প্রতিমা—অষ্টভুজা মূর্ত্তি।

মন্দিরের পুরোহিতের নাম রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী। অবলা তাহারই কন্যা।

সে ত্রস্তব্যাকুল, স্বরে কহিল,—"মিনি, এসে দেখ, কি হয়েছে!"

মিনি এবার উঠিয়া আসিল। তাহার চঞ্চল পদক্ষেপে আবক্ষ বিলম্বিত চিকুরদাম ঈষৎ দুলিতেছিল।

মিনি একটু হাসিয়া কহিল—"কি হয়েছে বল দেখি!"

অবলা নিজ ক্রোড় হইতে একটি পক্ষীশাবক বাহির করিয়া দেখাইল। এখনও তাহার পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই। নিবিড় পল্লবিত উচ্চতর অশ্বত্থ-শাখার পত্রাবলীর মধ্য হইতে কুলায়ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত, দারুণ আঘাতে মৃতপ্রায়। পক্ষীমাতা দূরবনে আহার অন্বেষণে রত। এখনও সে ফিরিয়া আসে নাই।

মিনি পাখীর ছানাটিকে আপন কোলের উপর তুলিয়া লইল এবং তাহার অঙ্গে কোমল কর বুলাইয়া দিতে লাগিল। উহার অবস্থা দেখিয়া বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে কহিল, "আহা, বড় লেগেছে।"

অবলা। তবু ভাগ্যি ঘাসের উপর পড়েছিল, নহিলে তখনি মারা যেত।

বালিকাদের যত্নে পক্ষীশাবক একটু চেতনা লাভ করিল। মিনি কহিল,—"পিসিমা কোথায় অবিদিদি!"

অবলা। আমার মার কাছে বসে কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন।

মিনি পক্ষী শাবকের শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"আহা, ওর একখানা পা ভেঙ্গেছে বোধ হয়।"

অবলা। চল না ওকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই। তিনি ওর পাখানা ভাল করে দিবেন। তিনি নাকি মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন।

মিনি। সত্যি? চল্, তবে চল্, তিনি ওর সকল কষ্ট দূর করে দিবেন।

অপর দিকে অশ্বত্থের একটি বৃহৎ শাখার নীচে ক্ষুদ্র তৃণ-কুটীর। দ্বারদেশে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে বিভূষিত; আসন ব্যাঘ্র চর্ম্ম, দক্ষিণ করে জপের মালা।

দর্শকগণের যাতায়াতে তাহাদের সাগ্রহ দৃষ্টিপাতে, অনুচরের সুমিষ্ট স্তুতিবাদে জায়গাটি সততই সরগরম থাকে। ভক্তবৃন্দ নিকটে বসিয়া কেহ গঞ্জিকা সেবন করিতেছে, কেহ কত আজগুবি গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কেহবা "হর হর বোম্ বোম্" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বেলা অবসান দেখিয়া একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। কেবল এক জন উঠিল না; সে প্রভুর গঞ্জিকা প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি সন্ন্যাসীপ্রভুর চেলা।

সকল লোক চলিয়া গেলে নির্জ্জন দেখিয়া—সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন,—"ওরে রামা! আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! মোটে আটগণ্ডা পয়সা!" তিনি ক্ষুণ্ণমনে পয়সা কয়টি ঝুলিতে পুরিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় বালিকা দুইটি অতি শঙ্কিত চিত্তে—ধীর পাদক্ষেপে কুটীরপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আর অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইল না।

অবলা প্রায় প্রতিদিনই পিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া থাকে। আজ সপ্তাহকাল অতীত হইল এই নবাগত সন্ন্যাসী তাহাদের দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কালী মাতার প্রভাবে রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর অন্নবস্ত্রের অভাব নাই। কত অতিথি, ভিখারী বৈষ্ণব তাঁহার অতিথিশালায় আশ্রয় পাইয়া থাকে। কিন্তু এমন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সচরাচর ঘটে না।

সন্ন্যাসী সধূম্র গঞ্জিকার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমন সময় অদূরে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা বালিকা দুইটি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পয়সাকয়টি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহা আর ঝুলিতে উঠান হইল না। তখন গঞ্জিকা দেবীর উপাসনা ঈশ্বরারাধনায় পরিণত হইল। সেই মুহূর্ত্তে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সন্ন্যাসী ঠাকুর হুঙ্কার দিয়া কহিলেন,—"ওরে, আমার আহ্নিকের সময় আর কাউকে এখানে আসতে দিস্ না। লোকগুলা যে একেবারে জালাতন করলে।"

মিনি একটু অভিমানিনী, তাহার আয়ত চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইল, অবলা মিনির হাত ধরিয়া পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

সেই সময় রবির শেষ রশ্মিরেখা যেন পৃথিবীর ছলনা প্রবঞ্চনাকে ধিক্কার দিয়া ন্যায়ের মঙ্গলবার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে অস্তাচলচূড়ায় মিলাইয়া গেল। তখন শাবকহারা পক্ষীমাতার কাতর ক্রন্দনে স্থানটি পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে আহার সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় একটি প্রৌঢ়া বিধবা রমণী সেখানে উপস্থিত হইলেন। মিনি "পিসিমা" বলিয়া নিকটে যাইবা মাত্র তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া উঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অভিমানিনী বালিকা সেই স্নেহবক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বলাবাহুল্য যে পক্ষী শাবকটি তাহার মাতার স্নেহ-নীড়ে আশ্রয় পাইয়াছিল।

(২)

স্নেহময়ী।

শ্যামাপ্রসন্ন দত্ত এ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত এই সুন্দর স্থান তাঁহাদের আদিম বাসভূমি নহে। সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ও বসতবাটী সর্ব্বগ্রাসিনী কীর্ত্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইলে শ্যামাপ্রসন্নের পিতামহ একটু সামান্য ভূমি ক্রয় করিয়া সপরিবারে এস্থানের অধিবাসী রূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসন্নের পিতা দারিদ্র্য-দুঃখ বহন পূর্ব্বক কোন মতে পরিবার প্রতিপালনে রত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মাঠে যাইয়া স্বহস্তে হল চালনা করিতেন এবং তাঁহার মাতা সূতা কাটিয়া বিক্রয় করিতেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসন্ন জমীদার সরকারে চাকুরী করিয়া কমলার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ী, দালান, প্রশস্ত দীর্ঘিকা, বাগান প্রভৃতি দ্বারা এখন তিনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়াই সমাজে পরিচিত। ভূসম্পত্তিও কিছু করিয়াছেন। নগদ টাকা সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। কাহারও মতে পঁচিশ হাজার, কেহ বা পঞ্চাশ হাজার বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। শ্যামাপ্রসন্নের মাহিয়ানা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাত্র। তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যে এত সম্পত্তির অধিকারী দেখিয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া এক রাত্রিতে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোপনে কেহ কেহ অন্য প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ক্রটী করেন না। শ্যামাপ্রসন্ন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, সুতরাং গ্রামবাসীগণের নিকট তাঁহার মান সম্ভ্রম অল্প ছিল না।

তাঁহার প্রতি সরস্বতীর অনুগ্রহ কতদূর তাহা ঠিক জানা যায় নাই, কিন্তু ষষ্ঠী দেবীর দয়া নিতান্তই সামান্য; শ্যামাপ্রসন্ন দত্ত অপুত্রক, একটি মাত্র কন্যা মন্দাকিনী-

বিধৌত-নন্দনচ্যুত মন্দার পুষ্পের মত তাঁহার গৃহ আলো করিতেছে। এই কন্যা-রত্নই তাঁহার ধনসম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী।

এ কথা সত্য যে তিনি জমীদারের মাতামহ পরিবারের নিকট-সম্পর্কিত কুটুম্ব। এই পুরাতন কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস অসীম। শ্যামাপ্রসন্নের গৃহিণী নানা প্রকার উপঢৌকন সহকারে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া জমীদার গৃহে গমন করিতেন। গৃহিণীর মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। কখন তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দিতেন, কখনও বা আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেন। নানা উপায়ে শ্যামাপ্রসন্ন জমীদার-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জমীদারের সন্তানগণ পিতার প্রিয় পুরাতন কর্ম্মচারীকে বিশেষ মান্য করিয়াই চলিতেন, স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ অথবা অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জা বিধায় তাঁহার হিসাব নিকাশের প্রতি ভ্রমেও কেহ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

বিশেষতঃ শ্যামাপ্রসন্নের কন্যা মৃণ্ময়ীর অনুপম রূপ-লাবণ্য ও সুন্দর সরল স্বভাব, জমীদার বাড়ীর সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিত। পঞ্চম বৎসর বয়সেই তাহার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে যখন বিচিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইত তখন তাহাকে স্বর্গভ্রষ্ট দেববালা বলিয়া ভ্রম হইত। জমীদার বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ রায় এই বালিকাকে অতি স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন।

শ্যামাপ্রসন্নের পুত্র ছিল না। তিনি একটি পিতৃমাতৃহীন কুলীন-কুমারকে জামাতৃ-পদে বরণ ও স্বীয় গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক বংশানুক্রমে প্রদীপ জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আশা, পুত্রের অভাব কন্যাদ্বারাই পূরণ করিয়া লইবেন। অধিক বয়স্ক জামাতা পাছে বশীভূত না হয় এজন্য অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই মৃণ্ময়ীকে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয় কায়স্থ-নন্দনের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। গৌরীদানের ফল লাভ হইল ভাবিয়া পিতা নিজকে ধন্য মনে করিলেন। জীবন-নাট্যের একটি মহান্ দায়িত্বপূর্ণ অঙ্ক, বালক বালিকার পুতুল খেলায় পরিণত হইল!

কিন্তু মানুষ যাহা আপন বুদ্ধিবলে গড়িয়া তোলে ইচ্ছাময়ের লীলাচক্রে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অন্য প্রকার হয়। হায়, নবম বৎসর পূর্ণ না হইতেই মৃণ্ময়ী বিধবা হইল! পুষ্প না ফুটিতেই ধূলায় পড়িয়া দলিত, নির্দ্দয় সমাজের পদতলে নিষ্পেষিত!

শ্যামাপ্রসন্নের বিধবা ভগিনী শিবসুন্দরী অতি ধর্ম্মশীলা ও বিদ্যাবতী মহিলা। তিনি অধিকাংশ সময় স্বামী-গৃহে বাস করিতেন; মাঝে মাঝে ভ্রাতার আলয়ে আসিতেন। মৃণ্ময়ীর বৈধব্যের পর তিনি আর স্বামী গৃহে গমন করিলেন না। বালিকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রাণপণে মৃণ্ময়ীর শিক্ষা দীক্ষায় রত হইলেন। বালিকাকে আপন স্নেহবক্ষে আবরিয়া লইয়া তাহার গন্তব্য পথ ধীরে ধীরে—অতি ধীরে এক ইন্দ্রিয়াতীত আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের সদ্‌ভাবগুলি মৃণ্ময়ীর ক্ষুদ্র স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে দিন দিন প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

বিপদ প্রায়ই বিপদের সঙ্গী হয়। এই সময় শ্যামাপ্রসন্ন আর একটি গুরুতর বিপদে পতিত হইলেন।

তিনি ক্ষুদ্র মোহরের হইতে ক্রমে দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। জমীদার গণেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁহার উপর ষ্টেটের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিজে দিন রাত্রি আমোদ প্রমোদেই মগ্ন থাকিতেন। জমীদারদিগের চিরন্তন প্রথা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নাই। তাহাতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত এবং ষ্টেট ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তাঁহার দু'একটি আত্মীয় শ্যামাপ্রসন্নের বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক বাবুর দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করিয়া দিলেন। সৌর-কর-স্নাত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায়, শ্যামাপ্রসন্নের ভাগ্যগগনে ঘন ঘটার নীল ছায়া দেখা দিল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়গণের পরামর্শে গণেন্দ্রনাথ রায় একজন কার্য্যদক্ষ ন্যায়পরায়ণ সুযোগ্য ব্যক্তিকে

ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। নবাগত ম্যানেজার, ষ্টেটের নানা প্রকার সুশৃঙ্খলা স্থাপন পূর্ব্বক প্রাচীন দেওয়ান শ্যামাপ্রসন্নের হিসাব নিকাশ তলব করিলেন।

শ্যামাপ্রসন্নের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বিপদ গণিয়া বৃদ্ধা চৌধুরাণীর শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি যে প্রভুর বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। যাহা হউক জমীদারের বৃদ্ধা মাতার অনুগ্রহে শ্যামাপ্রসন্ন সশরীরে রক্ষা পাইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মচ্যুত হইয়াও শ্যামাপ্রসন্ন বৃদ্ধার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। উৎসবাদিতে তিনি পূর্ব্ববৎই নিমন্ত্রিত হইতেন।

জমীদারদিগের বিলাসিতার সহিত ঔদার্য্য গুণটিও যেন রক্তের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে।

(৩)

ন্যায়ের জয়।

রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী শ্যামাপ্রসন্ন দত্তের কুল-পুরোহিত। তাঁহার কন্যা অবলার সহিত মৃণ্ময়ীর খুব ভাব। গিরিকন্দর সমুদ্ভূত দুইটি পার্ব্বত্য নির্ঝরের ন্যায় এই দুইটি সুন্দর বালিকা পিতামাতার স্নেহঅঙ্কে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের সম্মিলনে প্রাণে প্রাণে আনন্দ অনুভব করিত। উভয়ে একত্রে খেলা করিত, ফুল তুলিত, মালা গাঁথিত। কখন কখন পুতুলের বিবাহ ঘটিত ঝগড়া আবার সুমিষ্ট হাস্যে পরিণত হইত। দারুণ অদৃষ্ট বিরলে বসিয়া উভয় সখীর মাঝখানে যে বজ্র ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, সংসার-জ্ঞান-বিবর্জ্জিতা এই বালিকা দ্বয়ের মধ্যে কেহই আজ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই।

মৃণ্ময়ী কোথায় আলয়ের অধিষ্ঠাত্রী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে,—না, কোথায় আজ অলক্ষ্মীরূপে অভিহিতা—পিতৃ ও ভর্ত্তৃ পরিবারের অভিশাপ স্বরূপা। সে আজও জানিতে পারে নাই যে তাহার গন্তব্য পথের মাঝখানে ভীষণ মরু-প্রান্তর তপ্ত সূর্য্যালোকে ধূ ধূ করিতেছে। সেখানে সংসার-সুখের নব পল্লবিত বৃক্ষলতা নাই,—বিহঙ্গের কলধ্বনি নাই, পুষ্পের বিশ্ব-মুগ্ধকারী সৌরভ নাই। কেবলই বিপদ—কেবলই নির্য্যাতন! হায়! বাল-বিধবার জীবন-মধ্যাহ্ন কি শুধুই দুঃখময়? সমুদ্র মন্থনে যে হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া শিব মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন। এমন একটি বস্তু আছে যাহার আশ্রয় লইলে মৃত্যু অমৃত হয়—দুঃখ সুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সে বস্তু কি?—ধর্ম্ম।

যখন মৃণ্ময়ী পুতুল লইয়া খেলা করিত তখন তাহার মাতা ও পিসিমাতা অলক্ষ্যে চক্ষুর জল মুছিতেন!

কয়েক মাস যাবৎ কালীবাড়ীর সন্নিকটে যে এক সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর কথা লইয়া অপুত্রবতী নারীগণের শাশুড়ী মহলে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর ঘাটের উপর, রন্ধন শালার মসিরঞ্জিত বারান্দায়, মহিলা সভার নিত্য অধিবেশন হইত। সেই স্থানে সকলে এক বাক্যে সন্ন্যাসীর মহিমা মুখে মুখে ঘোষণা করিতেন। তিনি অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, এমন কি মৃত মনুষ্যকে প্রাণদান করিতে, নির্দ্ধনকে ধন, অপুত্রককে পুত্র এবং মোকদ্দমায় জয়লাভ করাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি নাকি যোগবলে শূন্যে উড্ডীয়মান হইতে পারেন, এই সকল কথা গ্রামের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। পঙ্গপালের ন্যায় অগণিত লোক সেখানে যাতায়াত করিতেছে।

আজ ব্রহ্মপুত্রতীরে অশোকাষ্টমীর মেলা। কথিত আছে, এই তিথিতে উক্ত পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া পরশুরাম মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। আজ বঙ্গ দেশের কি পুরুষ, কি রমণী সমগ্র হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মভাবের এক আশ্চর্য্য উন্মেষ দৃষ্ট হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা ব্রহ্মপুত্র স্নান করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন। অসংখ্য যাত্রীর কোলাহলে স্থানটি পূর্ণ। শত শত নৌকা নদীতে বাঁধা রহিয়াছে। দোকানদারগণ রাস্তার দুইধারে সারি বাঁধিয়া নানা জিনিষ পত্র দ্বারা দোকান সাজাইয়া দর্শকগণের মন আকর্ষণ করিতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যা অবরোধ বাসিনী কুলবধূগণ পর্য্যন্ত মেলা স্থলে 'সার্কাস' দেখিবার-

জড় মুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান উইপোকার ন্যায় ইহাদের প্রাণ এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসী-প্রবরের নিকটেই পুররমণীগণের ভিড় সমধিক। কেহ হাত দেখাইতেছে, কেহ পুত্রার্থে ঔষধ প্রার্থনা করিতেছে, কেহ বা স্বামীর মন আকর্ষণের উপায় জানিয়া লইতেছে। এই অসংখ্য মহিলা-সমাজে একটি তরুণীর কণ্ঠস্বরে সন্ন্যাসী যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, "না, আর সহ্য হয় না," এই বলিয়া কুটীর মধ্যে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

অষ্টমী নবমী দুই দিনে স্নান কোলাহল থামিয়া গেল; রমণী ভিন্ন সমস্ত নৌকারোহী নৌকা ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু একখানা নৌকা সেই স্থানেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র তীরে বাঁধা রহিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি নীরব—নিস্তব্ধ। কেবল দূর বনান্তরালে নিশাচর পক্ষীর বিকট শব্দ শুনা যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে কালী-বাড়ীর ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল, সর্ব্বদুঃখহারিণী নিদ্রা কি এক ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র প্রভাবে দুঃখীর তপ্ত অশ্রু, বিরহ-বিধুরা নারীর দীর্ঘ শ্বাস এক মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। কেবল সেই অনিমেষ আঁখি দুইটি চির জাগ্রত। যিনি ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা তাঁহার ন্যায়দণ্ড পাপীর মস্তকের উপর বজ্রের মত উদ্যত রহিয়াছে।

কালী মাতার পূজা অর্চ্চনার জন্য একজন পূজারী নিযুক্ত ছিলেন। দেবীর কক্ষ জনশূন্য। সংলগ্ন কক্ষে পূজারীর শয়নের স্থান। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত পূজারী সারাদিনের পরিশ্রম অন্তে একখানি তক্তপোষের উপর একাকী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী ইষ্টক-নির্ম্মিত নহে, সুতরাং তাঁহার মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকাপয়সা কালী-মন্দিরের এই কক্ষে রাখা হইত।

কালী মাতার দর্শনী প্রায় সহস্র টাকা, অলঙ্কার, তৈজস পত্র ও বস্ত্রাদি বড় একটা কাঠের সিন্ধুকে রক্ষিত। ঐ সিন্ধুক এত বড় যে উহার উপর একজন লোক অনায়াসেই শয়ন করিয়া থাকিতে পারে। তাহা ক্ষুদ্র কপাট দ্বারা আবদ্ধ। কক্ষ মধ্যে অপর কেহ ছিল না।

সহসা "খট্ খট্" শব্দে পূজারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সভয়ে রুদ্ধ শ্বাসে শব্দের কারণ জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। কেহ যেন সিন্ধুক খুলিতে চেষ্টা করিতেছে এইরূপ বোধ হইল। ঘরের প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে,—অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে কেহ যেন পদ নিক্ষেপ করিতেছে। সচকিতে দেখিলেন, —কক্ষের অপর দিকস্থ গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত। তাঁহার বক্ষ মধ্যে শোণিত স্রোত দ্রুত বহিতে লাগিল। ধর্ম্মশীল শান্ত স্বভাব পূজারী মনে মনে কালী মাতাকে স্মরণ করিলেন! গৃহ মধ্যে যে কোন উপায়ে চোর প্রবেশ করিয়াছে এবিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না, কি এক অব্যক্ত আতঙ্কে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ঘরে আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ! চোর চাবি দ্বারা সিন্ধুকের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার ভিতরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। অপর এক ব্যক্তি তাহার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া গুপ্ত দ্বারপথে একবার বাহিরে গেল।

আর সময়ক্ষেপ অকর্ত্তব্য বিবেচনায় পূজারী ঠাকুর অতি সাবধানে অতি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অন্ধকারে মিশিয়া মৃদু পাদক্ষেপে সিন্ধুকের নিকটস্থ হইলেন, এবং ক্ষিপ্রহস্তে সিন্ধুকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। চোর সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল। বাহিরে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল সে দ্রুত পলায়ন করিল। যদি কোন প্রাণী সিন্ধুকমধ্যে দৈবাৎ আবদ্ধ হইয়া শ্বাসরোধ বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এজন্য কপাটের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা হইয়াছিল। চাবিটি গৃহস্বামী নিজের নিকটই রাখিতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বসত বাটী কালী বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন। সেখানে একটি জন প্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি সপরিবারে নিদ্রিত; এমন সময় গভীর নিশীথিনী-বক্ষে ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে পূজারীর চীৎকার শব্দে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনী বসু।

গ্রহণ।

চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়া প্রাচীন কালের সভ্য জাতিরাও ভয়ে এবং বিস্ময়ে অধীর হইতেন। এখনও নানা দেশের অসভ্য জাতিরা গ্রহণের সময়ে ভয়ে গুপ্ত স্থানে পলায়ন করে। অজ্ঞলোকদিগের নিকট গ্রহণের দৃশ্য যে অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য্য প্রখর কিরণ দিতেছে; প্রাণিগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, জানা নাই শুনা নাই এমন সময় ধীরে ধীরে সূর্য্য অদৃশ্য হইতে লাগিল। আকাশ নির্ম্মল; একখণ্ড মেঘও নিকটে দৃষ্টি গোচর হইতেছে না; তবুও সূর্য্য অদৃশ্য হইতেছে। কিছু কালের মধ্যে সূর্য্য তিরোহিত হইল; অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল, পাখীগুলি সভয়ে বাসার দিকে ছুটিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞলোক ভয়-বিহ্বল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গ্রহণের ব্যাপারটী বুঝাইবার জন্য নানা দেশের লোক নানা প্রকার বিচিত্র গল্প রচনা করিয়াছিল। চীন দেশের লোকেরা মনে করিত, চন্দ্র সূর্য্যকে একটা প্রকাণ্ড অজগর সর্পে গিলিয়া ফেলে, এইজন্য চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্য হয়। আমেরিকার কোন কোন দেশের লোকেরা মনে করে, গ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্য্য রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমাদের পুরাণে আছে রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে। এইজন্য গ্রহণ হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণের প্রকৃত কারণ অবগত ছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন—

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দু রধোস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থোভবেদসৌ॥

সূর্য্য-গ্রহণ দিবসে অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্যের ঠিক সমসূত্রে অবস্থান হয়, মেঘ যেরূপ নিম্নে থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তদ্রূপ চন্দ্র, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তাহাতে সূর্য্য-গ্রহণ হয়, এবং পূর্ণিমার দিনে রাশি নক্ষত্রের গতি অনুসারে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হয়, তাহাতে চন্দ্র-গ্রহণ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। ঐরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়; এই নিমিত্তই চন্দ্রকে অন্ধকারে আবৃত দেখা যায়। এইরূপ ছায়া-প্রবেশকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলে। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র-গ্রহণ হয়। কিন্তু সকল পূর্ণিমাতে চন্দ্র-গ্রহণ হয় না। পৃথিবী ও চন্দ্রের যেরূপ গতির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে সকল পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হয় না। সুতরাং যে যে পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত ঠিক সমসূত্রে আসিয়া পড়ে সেই সেই পূর্ণিমাতেই চন্দ্র-গ্রহণ হইয়া থাকে।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যস্থল দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত হয়। ইহাকেই পূর্ণগ্রহণ কহে। যখন চন্দ্র ঐ ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সকল অংশ ছায়াতে ঢাকা পড়ে না; কিয়দংশ মাত্র আবৃত হয়, তখন আংশিক গ্রহণ হইয়া থাকে।

চন্দ্র ছায়াতে আবৃত হইলে চন্দ্র-গ্রহণ হয়। কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময় সূর্য্য সেরূপ ছায়াতে আবৃত হয় না। সূর্য্য তেজোময়; সুতরাং উহা ছায়ায় ঢাকা পড়িতে পারে না। যখন চন্দ্র ও পৃথিবী নিজ নিজ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এরূপ অবস্থায় আসে যে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে তখন চন্দ্রদ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। ইহাকেই সূর্য্য-গ্রহণ কহে।

অমাবস্যাতে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি অমাবস্যাতে সূর্য্য-গ্রহণ হয় না। যে যে অমাবস্যায় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয় কেবল সেই সেই অমাবস্যাতেই সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। যে অমাবস্যায় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত ঠিক সমসূত্রে থাকে, সেই অমাবস্যায় চন্দ্রদ্বারা সূর্য্য সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে। এইরূপ সকল অংশ আচ্ছন্ন হওয়াকেই পূর্ণ-গ্রহণ বলে।

সূর্য্যদ্বারা পৃথিবীর সকল স্থান একবারে আলোকিত হয় না। অর্থাৎ সকল স্থানে একবারে সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময়

যে যে স্থানে সূর্য্য উদয় হয় তাঁহারও সকল স্থানে সূর্য্যের গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই গণিয়া বলিতে পারেন, কোন্ কোন্ স্থান হইতে গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।
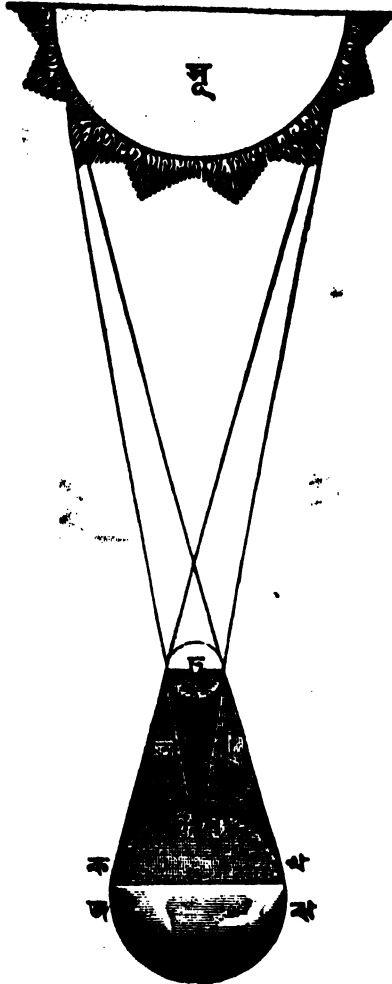
(সূ—সূর্য্য; চ—চন্দ্র; ক খ গ ঘ জ ঝ পৃথিবীর কিয়দংশ; ভ থ চন্দ্রের ছায়া।) গ ও ঘ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানের লোকেরা সূর্য্যের পূর্ণ-গ্রহণ দেখিতেছে। কগ ও খঘ স্থানের লোকেরা পূর্ণ-গ্রহণ দেখে না। কিন্তু সূর্য্যের কিয়দংশ আচ্ছন্ন দেখিতেছে। কিন্তু কজ ও খঝ স্থানের লোকেরা অন্তস্থানে যখন গ্রহণ সেই সময়েও তেজোময় সূর্য্য দেখিতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

পরিপাক ও পুষ্টি।

Digestion and Nutrition.

আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। প্রোটিন (Protein) আমিষ জাতীয়।

২। চর্ব্বি (Fat, oil) স্নেহ জাতীয়।

৩। শ্বেতসার,শর্করা (Carbohydrate) শালিজাতীয়।

৪। লবণ জাতীয় (Salts)

৫। জল (Water)

এই সকল দ্রব্যাদি পাকস্থলী (Stomach) এবং অন্ত্রসমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস এবং জারক পদার্থ সমূহ (Ferment) দ্বারা স্বাভাবিক বিশ্লেষণ হইয়া পরিপাক হয়। খাদ্য এইরূপে জীর্ণ হইয়া রক্তদ্বারা শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত হয় এবং যে অংশের যতটুকু অভাব তাহা পূরণ করে।

শরীরের অভাব কি ?—আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহাতেই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চলা, ফেরা, উঠা, বসা, দৌড়ান, ব্যায়াম ইত্যাদি সকল কার্য্যে দেহস্থিত মাংসপেশী সকলের নিয়ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইয়া ক্ষয় পাইতেছে। পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের দ্বারাও মস্তিষ্কাদি শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় হইয়া থাকে।

আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য না করিয়া স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকিলেও আমাদের শরীরস্থ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি অবিরাম কার্য্য করিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য শরীরের ক্ষয় কিয়ৎপরিমাণে অবশ্যম্ভাবী।

শরীরের ক্ষয় পূরণ হইলেই খাদ্যের কার্য্য শেষ হইল না। সদ্যোজাত শিশু দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কালে একজন মনুষ্যে পরিণত হয়। অতএব খাদ্য যে কেবল শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে তাহা নহে, অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরীরের বৃদ্ধি প্রাপ্তির সহায়তা করে। শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত করে। শিশু, বালক ও যুবকের যথেষ্ট পরিমাণ

খাদ্যের প্রয়োজন; খাদ্যের অভাব হইলে তাহাদের শরীর যথোচিত বর্দ্ধিত হয় না।

খাদ্যের কার্য্য—খাদ্য দ্বারা শরীরের এই কয় প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১। শারীরিক ক্ষয় নিবারণ।

২। দেহের বৃদ্ধি সাধন।

৩। তাপ জনন।

৪। বল উৎপাদন।

যে কয়প্রকার খাদ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা সকলেই এই চারি প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে। কোন খাদ্য শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী, কোনটী বা তাপ উৎপাদনের সহায়তা করে। কেহ বা রসের উপাদানে পরিণত হয়।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের কি প্রকারে পরিপাক হয় নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

আমিষ জাতীয় খাদ্য :—মুখগহ্বরের মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য পাকস্থলী মধ্যে Gastric juice নামক রসের সংস্পর্শে আসে এবং তথায় আংশিক ভাবে জীর্ণ হয়। Gastric juiceএ Pepsin নামক enzyme (জারক পদার্থ) আছে এবং ইহার সাহায্যে মাংস, প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য Peptone নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে আসিলে তত্রস্থ রসের সহিত মিলিত হয়। এই রসে Pepsin এর ন্যায় Trypsin নামক জারক পদার্থ আছে। যে সকল আমিষ জাতীয় খাদ্য Pepsin দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহারা সহজেই Trypsin এর আক্রমণে Peptones, Amino-acids ও Polypeptides নামক দ্রবণীয় পদার্থ সমূহে পরিণত হয়।

এই দ্রবণীয় পদার্থসমূহ অনায়াসেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হয়। মাংসের ন্যায় পদার্থের রক্তের সহিত মিলন অসম্ভব অথচ শরীর পুষ্টির জন্য এই মাংস আবশ্যক। পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এই যে মাংসের ন্যায় অদ্রবণীয় পদার্থও সহজ দ্রবণীয় পদার্থ সমূহে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইতে পারে।

মাংসের বিশ্লেষণে যেরূপ Amino-acids, Polypeptides ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শরীর মধ্যে এই সকল দ্রব্যের সংমিশ্রণে মাংস পুনরুৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের সমস্ত মাংসই এইরূপে অন্য জন্তুর মাংস বা তদ্রূপ গুণ বিশিষ্ট আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

খাদ্য দ্রব্যাদি হইতে যে পরিমাণ Amino acids রক্তের সহিত মিলিত হয় তাহার সমস্তই আমাদের শরীরের কার্য্যে লাগে না। উদ্বৃত্ত অংশ লিভারের দ্বারা Urea রূপে পরিণত হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

অত্যধিক আমিষ জাতীয় খাদ্য আহার করিলে প্রস্রাবে Urea ও Uric এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এইরূপে মূত্রগ্রন্থির কার্য্যও অযথা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে সহজেই মূত্রগ্রন্থির পীড়া হওয়া সম্ভব। কাহারও কাহারও Uric acid প্রস্রাবের সহিত বহির্গত না হইয়া শরীর মধ্যে জমিতে থাকে এবং এইরূপে বাতব্যাধির সূত্রপাত হয়।

শালি জাতীয় খাদ্য—শালি জাতীয় খাদ্য নানাপ্রকার। শ্বেতসার প্রভৃতি শালি জাতীয় পদার্থ জলে অদ্রবণীয় এবং শর্করা প্রভৃতি সহজেই দ্রবণীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এই যে অদ্রবণীয় খাদ্যকে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযুক্ত দ্রবণীয় দ্রব্যে পরিণত করা। সমস্ত শালি জাতীয় খাদ্যই পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা Glucose নামক শর্করায় পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় রক্তের সহিত মিলিত হয়। মুখলালাস্থিত Ptyalin এবং অন্ত্রস্থিত Amylopsin ও Invertin নামক জারক পদার্থ দ্বারা শালি জাতীয় খাদ্য সমূহ Glucose নামক শর্করায় পরিণত হয়। শালি জাতীয় খাদ্য হইতেই আমরা কার্য্য করিবার শক্তি ও শরীরের উত্তাপ পাইয়া থাকি। শরীরে Glucose উদ্বৃত্ত হইলে তাহা যকৃতের মধ্যে Glycogen রূপে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মেদরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে। অত্যধিক শালি জাতীয় দ্রব্যাদি আহার করিলে প্রস্রাবের সহিত শর্করা (Glucose) নির্গত হয় এবং শরীরের মেদ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য—স্নেহ জাতীয় খাদ্য অন্ত্রমধ্যে Steapsin নামক জারক পদার্থের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এই বিশ্লেষণ কেবল শোষণ (absorption) এর সহয়তা করে। রক্তের সহিত স্নেহপদার্থ অবিকৃত অবস্থাতেই মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্নেহরূপেই সঞ্চিত হয়। স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে শরীরের তাপ উৎপন্ন হয়। এবং ইহার অত্যধিক ব্যবহারে শরীরের মেদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জল ও লবণ জাতীয় খাদ্যঃ—এই সকল দ্রব্যাদির কোনরূপ পরিপাকের আবশ্যক নাই। জল ও লবণ দুইই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্যে লবণভাগ কম থাকিলে স্কার্ভী প্রভৃতি রোগ হয়। অত্যধিক পরিমাণ লবণ শোথ বৃদ্ধির সহায়তা করে।

খাদ্য দ্রব্য শরীর মধ্যে পরিপাক পাইবার পর রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের কার্য্য সকল সম্পন্ন করে। যদি এই সকল দ্রব্যাদি রক্তমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে প্রবেশ করে অর্থাৎ যদি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আবশ্যক অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। এরূপ স্থলে উত্তমরূপ পরিপাক হইলেও শরীরের পুষ্টির সাধন ঠিক হয় না। ইহা আমরা সাধারণ কয়েকটী রোগের উদাহরণ দিয়া বুঝাইব।

১। **ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র**—এই রোগ সাধারণতঃ অতিরিক্ত ভোজনের ফল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীরের তাপ ও শক্তি, শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভূত হয়; যাঁহারা অল্প কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের শরীর রক্ষার জন্য এই সকল খাদ্যের আবশ্যক অল্প। কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য এই সকল দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে আহার করিলে বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবস্থায় বহুমূত্র রোগীর পরিপাক শক্তি যথেষ্ট থাকে এবং ইহার বলে অত্যধিক শালি জাতীয় খাদ্য ভোজন করিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শরীরের অভাব অপেক্ষা এই শর্করার পরিমাণ অধিক হওয়ায় ইহার কিয়দংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এইরূপে বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে প্রথম অবস্থায় ডায়াবিটিস অচিরে আরোগ্য হয়।

২। **বাতব্যাধি** (Gout)—বাত রোগাদিতেও পরিপাক ক্রিয়া বেশ সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রোটিড জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্যের আধিক্য জনিত তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। প্রোটিডেরা তাহাদের বিশ্লেষণের চরম অবস্থা ইউরিয়া এবং Uric acid এ পরিণত হয় এবং এই Uric acid শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া বাত রোগ আনয়ন করে।

৩। **মেদবৃদ্ধি**—খাদ্য দ্রব্যস্থিত তৈল জাতীয় অংশ অব্যবহৃত থাকিলে শরীরে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। কায়িক পরিশ্রমের অভাব এবং গুরুভোজনের ফলে উপরোক্ত তিন প্রকার ব্যাধি অর্থাৎ বহুমূত্র, বাত এবং মেদবৃদ্ধি আমাদের দেশে অবস্থাপন্ন লোকের অধিক দেখা যায়।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণঃ—মনুষ্য স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য নানা প্রকার খাদ্যের পরিমাণের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ পরিশ্রমের সময় এবং স্থির অবস্থায়) কি প্রকারে ও পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক হয় তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদের শরীর জীবন হীন কল বা ইঞ্জিন নহে। হিসাবমত কয়লা ও জল দিলেই কল হইতে কার্য্য পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মনুষ্যের মধ্যে কেহ মিতাচারী কেহ বা অন্যায়রূপে শরীরকে নষ্ট করিতেছে। কেহ খাদ্যদ্রব্য হইতে পূর্ণমাত্রায় সারাংশ বাহির করিয়া লইতে সক্ষম এবং কেহ বা এই অংশ আংশিক গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের আহারের পরিমাণ প্রত্যেকের নিজ নিজ আবশ্যকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। কেবল হিসাব বা পদ্ধতি বা গ্রন্থাদির বর্ণনার দোহাই দিলে চলিবে না।

খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলে শরীরের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়। খাদ্যের অভাবে শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রেরই যে সমান ক্ষতি হয় তাহা নহে, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি অত্যা-

বশ্যকীয় যন্ত্রগুলির কার্য্যের কোনই বৈলক্ষণ্য প্রথমে উপলব্ধি করা যায় না। শরীরের স্বাভাবিক তাপও অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। স্বল্পাহারের ফলে প্রথমে—

১। চর্ব্বি ও যকৃৎ-শর্করার সঞ্চয় ব্যয়িত হয়।

২। সকল প্রকার বর্দ্ধন বন্ধ হয়।

৩। মাংসপেশী সমূহের কার্য্যকারী ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৪। শরীরস্থ যন্ত্রনিঃসৃত রস সকল কমিয়া যায়।

৫। শরীরের ওজন কমিয়া যায়। অল্প আবশ্যকীয় পেশী সমূহ প্রথমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র সমূহ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ধ্বংস পায়।

অত্যধিক আহারের জন্য প্রথমতঃ পাকাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। অম্ল, অজীর্ণ, উদ্গার, বমন, পেটের অসুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়া ঘটিয়া থাকে। অত্যধিক আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক পাইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নিম্নলিখিত ফল হয়।

(১) যকৃতের শর্করা ও শরীরের চর্ব্বিভাগ বৃদ্ধি পায়।

অত্যধিক আহারে মাংসপেশী প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় না। মাংসপেশী, ফুস্ফুস্ ইত্যাদিকে পরিপুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করিতে হইলে ব্যায়ামের আবশ্যক। যতই কেন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হউক না ব্যায়াম ব্যতিরেকে এই সকল যন্ত্রের পুষ্টির সম্ভাবনা নাই। অতিরিক্ত আহারে শরীরের কেবল চর্ব্বি বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শরীরে কিছুই বলবৃদ্ধি হয় না।

(২) শরীরস্থ আহার্য্য দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশের অল্পভাগ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রশ্বাসবায়ু ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়। অত্যধিক আহারের ফলে মূত্র-গ্রন্থি, ত্বক্, ফুস্ফুস্ ইত্যাদি যন্ত্রের কার্য্য অযথা বাড়িয়া যায় এবং ইহারা অল্প কারণেই বিকল হইয়া পড়ে। অল্প কারণেই গুরু ভোজনকারীর সর্দ্দি, পেটের অসুখ ইত্যাদি হয়, প্রস্রাবের সহিত শর্করা ও এলবুমেন নির্গত হইতে পারে এবং চর্ম্ম সর্ব্বদাই ঘর্ম্মে আর্দ্র এবং তৈলাক্ত থাকার জন্য চর্ম্মরোগ সহজেই উৎপন্ন হয়।

উদ্বৃত্ত আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে সহজেই শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পারে সেই জন্য তাহাদের কিছু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আমিষ জাতীয় খাদ্য urea ও ammonia রূপে, শালি জাতীয় খাদ্য শর্করা, জল ও Carbon-dioxide বাষ্প রূপে এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য জল ও Carbon-dioxide রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়াকেই আমরা মৃদুদহন ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে যে অধিক আহারের ফলে এই দহন ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরীরে অধিক তাপ উৎপন্ন হয়।

মনুষ্য-শরীরের একটী বিশেষত্ব এই যে শরীরের তাপ সর্ব্বদাই সমান থাকিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মকালেই হউক আর শীতকালেই হউক, তুষার আবৃত দেশেই হউক কিম্বা মরুভূমিতেই হউক, থার্ম্মোমেটার দিলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য শরীরের তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রি রহিয়াছে। বাহিরের তাপ অধিক হইলে চর্ম্মের রক্তবাহী শিরা সমূহ প্রসারিত হয় এবং চর্ম্মে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রক্ত হইতে এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে তাপ নির্গত হইয়া যায়। এই সময় অধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং তাহাতেও শরীরের অনেক তাপ কমিয়া যায়। এইরূপে বাহিরের তাপ বৃদ্ধি হইলেও শরীরের তাপ ঠিক থাকে। গ্রীষ্মকালে আমাদের শীতল জল পানের ইচ্ছাও প্রবল হয়। শীতল জলপান করিলে শরীরের তাপ অনেকটা কমিয়া যায় এবং জলে ঘর্ম্ম নিঃসরণের সহায়তা করে।

বাহিরের তাপ বৃদ্ধি হইলে শরীর যেরূপ নিজের তাপ কমাইবার চেষ্টা করে সেইরূপ অন্তরস্থ তাপ বৃদ্ধি হইলেও শরীর ঐরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে।

গুরু ভোজনের পর শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং এই জন্যই আমাদের নিমন্ত্রণ খাইবার পর শীতল জল পানেচ্ছা প্রবল হয়। যাঁহারা গুরুভোজনে অভ্যস্ত তাঁহাদের শরীরের তাপের সমতার জন্য অধিক ঘর্ম্ম হইয়া থাকে এবং চর্ম্মের উপর স্থানে স্থানে রক্তবাহী শিরা সকল

স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা মদ্য ও মাংস যথেচ্ছা ব্যবহার করেন তাঁহাদের নাসিকার অগ্রভাগ, গণ্ডদেশ ও কর্ণে সরু সরু রক্তের শিরা দেখা যায়। রক্তিম গণ্ডস্থল স্বাস্থ্যের নিদর্শন না হইয়া ভূরি ভোজনের পরিচায়ক মাত্র। যে সকল শিশুকে অধিক খাওয়ান হয় তাহাদের মস্তক ও হাত পা বেশী ঘামিয়া থাকে।

অধিক ভোজনের জন্য যে সকল পীড়া হইয়া থাকে তাহা নিবারণের জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। (১) খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া (২) কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা।

(১) প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বনে শরীরে আবশ্যকের অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য প্রবেশ করিতে পায় না এবং শারীরিক যন্ত্রাদিকেও অযথা পরিশ্রম করিতে হয় না। (২) ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীরের ক্ষয় ও অভাব বৃদ্ধি পায় এবং শরীরও অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে পারে। ব্যায়ামের ফলে অধিক আহারের জন্য শরীরের ক্ষতি না হইয়া মাংসপেশী সমূহের পুষ্টিই হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট মাংসপেশী অপরিপুষ্ট পেশী অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যায়াম করিলেই যে যথেচ্ছা খাওয়া যাইতে পারে এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ন্যূনাধিক্যে শরীরে কি কি পরিবর্ত্তন হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব জন্য শরীরের স্বাভাবিক বর্দ্ধন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়। শরীরের আবশ্যকীয় পেশী সকল আমিষ জাতীয় উপাদানে নির্ম্মিত, ইহার অভাবে হাড় সকল ভগ্নপ্রবণ, মাংসপেশী সকল কমজোর ও থলথলে এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি ক্ষীণবল হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের আধিক্য:—আমিষ জাতীয় দ্রব্যাদি রক্তের সহিত মিলিত হয়। মূত্রগ্রন্থি দ্বারা শরীর হইতে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া যৌগিক পদার্থ এবং এলবুমেন রূপে পরিত্যক্ত হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য শর্করা ও চর্ব্বির ন্যায় শরীর মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয় না। যদি সদ্যঃ ব্যবহারের জন্য আবশ্যক না হয় তাহা হইলে শরীর হইতে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

মূত্রের নাইট্রোজেনের মাত্রা নিরূপণ করিয়া আমরা আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য বা অভাব স্থিরীকৃত করিতে পারি।

সাধারণতঃ মূত্রে ইউরিক এসিডের আধিক্য, গাঢ়-বর্ণত্ব, দুর্গন্ধ ও সহজেই পচনশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য ঠিক করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্ত্রমধ্যে আমিষ দ্রব্যের পচনেরও প্রমাণ মূত্রপরীক্ষা হইতে পাওয়া যায়।

শালি জাতীয় অর্থাৎ শ্বেতসার এবং চিনি ইত্যাদির আধিক্য জন্য শীঘ্র শীঘ্র ওজন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যকৃৎ বড় হয়, অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং ত্বকের উপরিস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তের শিরা সকল বড় হইয়া যায়। পরে প্রস্রাবে শর্করা দেখা দেয়।

স্নেহ জাতীয় অর্থাৎ ঘৃত, চর্ব্বি ইত্যাদির আধিক্য জন্য শরীর শীঘ্রই ভারি হয়, চর্ম্ম মসৃণ ভাব ধারণ করে এবং ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য শরীর মধ্যে বেশী পরিমাণে গেলে প্রস্রাবে Ammonium Salt এর আধিক্য দেখা যায়। এই প্রকারে শরীর হইতে সমুদয় নাইট্রোজেন বাহির হইয়া যায়। খাদ্যে চর্ব্বির আধিক্য হইলে ইহার কিয়ৎপরিমাণ শরীরস্থ ক্ষারের সহিত মিলিয়া সাবানে পরিণত হয় এবং মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে শারীরিক ক্রিয়ার নানারূপ ব্যতিক্রম হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের পুষ্টির জন্য স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক এবং ইহার অভাবে এই সকল যন্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশে যাঁহারা অধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে মাছের মুড়ো খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। মাছের মুড়োয় স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে শিশুদিগের বৃদ্ধি সম্যক্‌রূপ হয় না এবং অনেক সময় তাহাদের রিকেটস্ নামক ব্যাধি হইতে দেখা যায়। বয়স্ক ব্যক্তির শরীরের লাবণ্যও স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে। শিশুরা

মাতৃস্তন্য হইতেই স্নেহজাতীয় খাদ্য পাইয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধে লেসিথিন নামক ফস্‌ফরাস্ সংযুক্ত একপ্রকার স্নেহময় পদার্থ আছে। ইহা শিশুর পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। গোদুগ্ধে এই পদার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

লবণ জাতীয় খাদ্যের অভাবেও শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে অনেক সময় লবণ জাতীয় পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহাতেই শরীরে লবণের অভাব অনুভূত হয়।

লবণ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে লৌহ, Calcium, Sodium ও Potassiamই প্রধান। লৌহের অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা উপস্থিত হয়। স্নেহ ও আমিষ জাতীয় পদার্থ হইতে অনেক সময় শরীর মধ্যে অম্লজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের সহজ অবস্থায় Calcium, Sodium প্রভৃতি ঐ বিষাক্ত অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া দেয়। Calcium, Sodium ইত্যাদির অভাব হইলে এই বিষাক্ত অম্ল পদার্থ নানা প্রকার রোগ আনয়ন করে।

Calciumএর অভাবে অস্থিসকল দৃঢ় এবং কার্য্যক্ষম হয় না। কোন কোন শিশুর মস্তকের অস্থি অনেক দিন পর্য্যন্ত নরম অবস্থায় থাকে এবং দন্তোদ্গমেরও অনেক বিলম্ব হয়। Calciumএর অভাবই এই সকল উপদ্রবের কারণ। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

বাল্মীকি-কুশলব সংবাদ।

প্রথম দৃশ্য—তমসানদীর তীর।

কাল—প্রভাত।

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার আদেশে সমগ্র রামচরিত্র রচনা ক'রেছি। জন্ম হ'তে রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত ঘটনা লইয়া প্রথম ছয় কাণ্ড। রামের অযোধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উত্তরকালের ঘটনা অবলম্বনে সপ্তম কাণ্ড রচিত হইয়াছে। এখন পাঠ ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত রূপে ত্রিবিধ প্রমাণ সংযুক্ত, বীণালয় সংযুক্ত, বীর, কারুণ্য, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য প্রভৃতি রসসমন্বিত এই রামচরিত কিরূপে জগতে প্রচারিত হবে? কা'কে এই কাব্য শিক্ষা দিব? আমার শিষ্যদের মধ্যে কে এমন মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন আছে যে অনায়াসে এই কাব্য আয়ত্ত ক'রতে পারে? অনেক চিন্তার পর আমি স্থির ক'রেছি যে সীতার যমজপুত্র কুশ ও লবই আমার রচিত রামায়ণ শিক্ষা করবার উপযুক্ত পাত্র। তা'রা যে রামায়ণের নায়ক রঘুপতি রামের পুত্র তা' তা'রা এখন পর্য্যন্ত জানে না। এখন তাদের সে কথা জানিয়েও কাজ নাই। সময়ে সকল কথাই প্রকাশিত হবে। তারা অযোধ্যার ভাবী রাজা; সে জন্য আমি তাদের ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা দিয়েছি। সকল বিষয়েই কুশ ও লব আমার অন্যান্য শিষ্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনুর্ব্বেদ যেন তাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রাক্তন জন্ম-বিদ্যা। তা না হবেই বা কেন? তারা যে বীরশ্রেষ্ঠ রামের পুত্র। অল্পদিন হ'ল তাদের উপনয়ন হ'য়েছে। তা'দের রামায়ণ শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময়। আজ শুভদিন। তাই আমার অতি প্রিয় এই নির্জ্জন তমসানদীর তীরে আজ তাদের দুই ভাইকে আস্‌তে বলেছি। এই যে তারা এই দিকেই আস্‌ছে।

কুশলব প্রবেশ করিয়া বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাল্মীকি। (কুশ ও লবের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) বৎস কুশ, বৎস লব, তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হ'ক। আমি উপবেশন করলাম, তোমরাও উপবেশন কর। আজ কি জন্য তোমাদিগকে এ সময়ে এ স্থানে আস্‌তে ব'লেছি শোন। অযোধ্যাধিপতি রঘুকুলতিলক পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বন ক'রে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার আদেশে আমি রামায়ণ রচনা ক'রেছি। ধর্ম্মতঃ রাজা প্রজাপুঞ্জের পিতৃতুল্য। তোমরাও আমাদের প্রজারঞ্জক সকল গুণের আধার রাজা রামচন্দ্রকে পিতার ন্যায় মান্য ক'রবে।

কুশ ও লব। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

বাল্মীকি। তোমাদিগকে আমার রচিত রামায়ণ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। আজ শুভমুহূর্ত্তে তোমাদের রামায়ণ শিক্ষা আরম্ভ হ'ক। আজ তোমাদিগকে প্রথম তিনটী শ্লোক শিক্ষা দিই। মন দিয়ে শোন।

(আবৃত্তি)

সর্ব্বা পূর্ব্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্॥
যেষাং চ সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্র সহস্রাণি যং যান্তং পর্য্যবারয়ম্॥
ইক্ষ্বাকুণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতিশ্রুতম্॥

কুশ ও লব। (আবৃত্তি)

সর্ব্বাপূর্ব্বমিয়ং যেষামাসীৎ ইত্যাদি।

বাল্মীকি। সাধু! সাধু!

কুশ ও লব। (বাল্মীকির চরণ বন্দন করিলেন)

বাল্মীকি। (কুশ ও লবের মাথায় হাত দিয়া) এখন আশ্রমে চল।

(অগ্রে বাল্মীকির তৎপশ্চাৎ কুশ ও লবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বাল্মীকির আশ্রম।

কুশ, লব এবং কয়েকজন মুনিবালকের প্রবেশ।

১ম বালক। ভাই কুশ লব, আজ আমাদের অনধ্যায়। আমাদিগকে আজ তোমরা রামায়ণ শোনাও।

কুশ। রামায়ণের কোন্ স্থান শুন্‌তে চাও।

২য় বালক। যে স্থান সব চেয়ে ভাল।

৩য় বালক। রামায়ণের সকল স্থানই ভাল।

২য় বালক। তবু ত ভালর তারতম্য আছে।

৪র্থ বালক। কোন্ স্থানটা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

২য় বালক। সেই স্থানটা, যে স্থানে রাম ভরতকে চিত্রকূট পর্ব্বত থেকে বিদায় ক'রে দিচ্ছেন।

৩য় বালক। আমার কাছে কোন্ জায়গা সব চেয়ে ভাল লাগে শুন্‌বে? লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রাম যে স্থানে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ কর'ছেন।

৪র্থ বালক। আমার সব চেয়ে কোন্ অংশ ভাল লাগে শুন্‌বে? যেখানে সীতার সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনন্দে উন্মত্ত বানরেরা মধুবন ভেঙ্গে দধিমুখের দুর্দ্দশা ক'রছে।

২য় বালক। আরে দূর্ দূর্! ওই বাদ্‌রে কাণ্ড তোমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌লো?

৩য় বালক। আমার বোধ হয় যেস্থানে রাম সীতা-বর্জ্জনের কথা লক্ষ্মণকে বলছেন সেই স্থানটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

লব। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে।

কুশ। তোমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত। এ মতভেদের মীমাংসা না হ'লে আজ আর রামায়ণ গান হবে না।

১ম বালক। আচ্ছা ভাই, রাজা তাঁর রাণীকে বন-বাসে পাঠালেন কেন? কাজটা কি ভাল হ'য়েছে!

২য় বালক। এতদিন ধ'রে রামায়ণ শুনে তাহ'লে শিখ্‌লে কি? প্রজারঞ্জনের জন্য রাজা সীতাকে বিশুদ্ধা জেনেও বর্জ্জন করেছেন।

৩য় বালক। আর একটী নিগূঢ় কারণ আছে।

অন্য বালকেরা। কি! কি!

৩য় বালক। পূর্ব্বে রাজ-লক্ষ্মীকে হাতে পেয়েও তাঁকে ছেড়ে রাম সীতার সহিত বনে গিয়াছিলেন; সেই আক্রোশে রাজলক্ষ্মী এখন রাজাকে হাতে পেয়ে সীতার রাজভবনে বাস সহ্য ক'রতে পারলেন না।

২য় বালক। আরে তুমি যে মস্ত কবি হ'য়ে পড়েছ দেখ্‌তে পাই।

১ম বালক। কুশ, লব, ঐ দেখ ভাই তোমাদের মা আসছেন। তিনি রামায়ণের যে অংশ গাইতে বল্‌বেন আমরা তাই শুনব।

কুশ। সেই ভাল। কিন্তু ওঁর কাছে যেন সীতা-বর্জ্জনের কথা তুলো না। রামায়ণের ঐ অংশ শুন্‌লে উনি অশ্রু সংবরণ ক'রতে পারেন না।

সীতার প্রবেশ।

লব। মা, এই এরা রামায়ণ শুনতে চাচ্ছে। তা

কোন্‌ অংশ গাইব তা ঠিক হচ্ছে না। তুমি যে অংশ গাইতে বল বে, তাই এরা শুনবে বল্‌ছে।

সীতা। যে স্থানে রঘুপতি হরধনু ভঙ্গ ক'রে বৈদেহীকে লাভ ক'রলেন সেই স্থানটা গান কর।

বালকেরা। হাঁ! হাঁ! বেশ হবে, বেশ হবে।

লব। মা, তুমি এইখানে ব'স। ওহে তোমরা মায়ের দুই পাশে ব'স। দাদা আর আমি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গান করি।

(লবের নির্দ্দেশ মত সকলে উপবেশন করিলেন)

লব ও কুশ। (গান করিলেন)

ইদং ধনুর্ব্বরং ব্রহ্মন্‌ জনকৈরভিপূজিতম্‌।
রাজভিশ্চ মহাবীর্য্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা॥

ইত্যাদি।

সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়ন নামক দুইজন
মুনি বালকের প্রবেশ।

ভাণ্ডায়ন। ওহে এদিককার খবর শুনেছ?

অন্য বালকেরা। কি খবর হে, কি খবর?

সৌধাতকি। মহারাজ যে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন।

১ম বালক। দুর মূর্খ, তাও কি কখন হয়?

ভাণ্ডায়ন। কেন হয় না? লবণবিজয়ী মথুরাধিপতি শত্রুঘ্নের নিকট এ সংবাদ দেবার জন্য যে দূত যাচ্ছে তার কাছে, আর আমাদের গুরুদেবকে আমাদের সহিত নিমন্ত্রণ করবার জন্য যে দূত এসেছে তার কাছেও এ সংবাদ জেনেছি।

১ম বালক। তবু ভাই আমার সন্দেহ দূর হ'ল না।

সৌধাতকি। তথাপি সন্দেহ? সন্দেহের কারণ কি?

১ম বালক। শাস্ত্রানুসারে ত মহারাজ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন?

ভাণ্ডায়ন। তাতে আর সন্দেহ কি?

১ম বালক। তাহ'লে মহারাজ আর কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছেন?

সীতা। (স্বগত) হৃদয়, ব্যাকুল হ'ওনা, স্থির হও।

সৌধাতকি। মহারাজ ত দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই।

২য় বালক। তা হলে তিনি কেমন করে যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন? "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" এই তো শাস্ত্রবাক্য। মহারাজের ক্ষেত্রে অবশ্য তার অন্যথা হবে না।

সৌধাতকি। ওঃ, তা বুঝি জান না! মহারাজ যে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিকে সহধর্ম্মিণী করে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন!

কুশ ও লব ব্যতীত অন্যান্য বালকেরা।—ধন্য, ধন্য, ধন্য রঘুপতি রাম।

সীতা। (স্বগত) এতদিনের পর পরিত্যাগের লজ্জাশেল যেন আমার বুক থেকে বেরিয়ে গেল।

কুশ। কি আশ্চর্য্য! রঘুপতির ন্যায় অলৌকিক মহাপুরুষদের মন একাধারে বজ্রের ন্যায় কঠিন ও কুসুমের ন্যায় কোমল। অন্য লোকের তা বুঝে ওঠা ভার।

সৌধাতকি। ওই দেখ মহর্ষি এই দিকে আসছেন।

সীতা। মহর্ষি আসছেন, আমি এখন যাই। (প্রস্থান)

কয়েক জন বালক। আমাদের ভাই একবার নগর দেখবার বড় ইচ্ছে হ'য়েছে। মহারাজের অশ্বমেধ উপলক্ষে যদি সেটা ঘটে যায় ত ভালই হয়।

অপর কয়েক জন। এখন মহর্ষির অনুমতির অপেক্ষা।

বাল্মীকির প্রবেশ।

কুশ, লব ও অন্যান্য বালকেরা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিল।

বাল্মীকি। (বালকদিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) তোমাদের সকল বিষয়ে কল্যাণ হ'ক। এখন যা বলি শোন। অযোধ্যাধিপতি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছেন। আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছি। তোমরা যজ্ঞস্থলে গমনের জন্য প্রস্তুত হও। বৎস কুশ ও লব, তোমরা যজ্ঞস্থানে গিয়ে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে, রাজপথে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারের নিকট এবং যজ্ঞস্থানে ঋত্বিকদের সম্মুখে পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ গান করবে। ফলমূল ব্যতীত অন্য দ্রব্য আহার করবে না। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছি তদনুসারে প্রতিদিন মধুরস্বরে

খিংশতি সর্গ গান ক'র্বে। ফলমূলভোজী আশ্রম-বাসীর ধনে প্রয়োজন নাই। সুতরাং কেহ ধন দিতে এলেও তোমরা তা গ্রহণ করবে না। যদি মহারাজ রামচন্দ্র তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা ক'ার ছাত্র," তা হ'লে তোমরা এই মাত্র বলবে যে, "আমরা বাল্মীকির শিষ্য।" রাজা ধর্ম্মতঃ সকলের পিতা; সুতরাং তোমরা রাজার আদেশ মত আদি হ'তে রামায়ণ গান ক'রবে।

কুশ ও লব। গুরুদেবের আদেশ মত কার্য্য ক'রব।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

মহাবীর কাইরাস ও রাণী তমিরি।

(ভাদ্র সংখ্যার পর)

কাইরাস নানাজাতি এক করিয়া মীড়-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ওদিকে মীড়-রাজ্যে হার্পেগাসের হাতেই সৈন্যভার পড়িল। দুই দলে যখন আগবতানায় যুদ্ধ বাধিল তখন মীড় সৈন্যেরা কিছুক্ষণ ছলযুদ্ধ করিয়া পালাইল। আস্ত্যাগী সৈন্যদের এই পলায়নের কথা শুনিয়া কি রাগটাই না রাগিলেন! হাত পা আছড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা! কাইরাস্‌কে আমোদ করতে হবে না।" তারপর যে কয়জন খোঁড়া বুড়া, বালক যুবা মীড়-রাজ্যে ছিল তাদের একত্র করিয়া আস্ত্যাগী কাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু ফলে তিনি কাইরাসের সৈন্যের হাতে বন্দী হইলেন। তখন হার্পেগাস্ হাতে তুড়ি দিয়া আস্ত্যাগীর সাম্‌নে আসিয়া বলিলেন, "কিহে, কেমন লাগ্‌ছে, রাজা হইয়া দাস হওয়া কেমন ভাল লাগ্‌ছে? মনে করে দেখ, আমার ছেলের কি দশা করেছিলে!"

কাইরাস মীড়দেশ অধিকার করিয়া পারস্ত ও মীড়ের সম্রাট হইলেন। এমনি করিয়া পারস্ত স্বাধীন হইল ও [illegible]রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল।

কাইরাস খুব বীর ছিলেন। তাঁর বীরত্বের ও সাহসের তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেন, যে নিজেকে শাসন করিতে পারে সে-ই পরকে চালাইবার উপযুক্ত। শৈশবে কাইরাসের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। অনেক সময়ে তিনি অনেকের মনে আঘাত দিতেন এবং নিজেও আঘাত পাইতেন। রাজা হইয়া তিনি নিজেকে এমনি শাসন করিয়াছিলেন, যে শোনা যায়, জীবনে নাকি তিনি আর কখনো রাগ করিয়া কাহাকেও রুষ্ট কথা বলেন নাই।

কাইরাস অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি খুব কৌশলে বাবিলন জয় করেন। হাজার হাজার পারসিক সৈন্য লইয়া তিনি বাবিলন ঘিরিলেন। সমস্ত লোক নগরের মধ্যে আটক পড়িল। য়ুফ্রাতিস নদী বাবিলন নগরের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইত। প্রাচীর ঘেরা নগরে শত্রু ঢুকিবার রাস্তা নাই। শুধু নদী দিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে প্রকাণ্ড লোহার দরজা, প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কাইরাস তাঁর সৈন্যগণের সাহায্যে নগর বেড়িয়া এক খাল কাটিলেন; সেই খালের সহিত নদী যোগ করিয়া দিলেই সমস্ত জলস্রোত খাল দিয়া বহিয়া যাইবে। তখন নদীর খাদ বা শুষ্ক জলপথ দিয়া সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিবে।

এমন সময়ে নগরে উৎসব আরম্ভ হইল। রাজা প্রজা কেহই সে উৎসবে বাদ যায় না, সকলেই উৎসবে মত্ত। বাহিরে শত্রু দাঁড়াইয়া, আর তারা বেশ হৃষ্টমনে আমোদ করিতেছে! লোকের উৎসবানন্দের চীৎকার নগরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিতেছে। এমন সময়ে নদীর জল কমিতে লাগিল; কারণ কেহই ঠিক করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে নদীর জল শুকাইয়া গেল—সমস্ত জল খাল দিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পারসিক সৈন্যেরা লৌহকবাট ভাঙ্গিয়া শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। নগর রক্তে রঞ্জিত হইল। উৎসবের আনন্দ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ও ক্রন্দনে পরিণত হইল। খৃঃ পূঃ ৫৮৬ অব্দে বাবিলন রাজ্য [illegible] অধিকৃত হইল।

এশিয়া-মাইনরের উপকূলে লিডিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। কাইরাসের সময়ে সেখানে ক্রোসাস নামে এক অতি ধনী রাজা রাজত্ব করিতেন। সাত রাজার ধন যেন তিনি সংগ্রহ করিয়া তাঁর রাজকোষে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর রাজধানী সার্দিস্ সাগরের ধারে, অশেষ কারুকার্য্যে তাহা শোভিত। এমন মনোহর নগর তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। কাইরাসের দৃষ্টি সেই নগরের উপর পড়িল। তিনি তাহাকে শাসাইয়া রাখিলেন।

ক্রোসাস যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তাদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল পারস্যের সহিত যুদ্ধ করিলে তিনি একটি বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন। ক্রোসাস ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই পারস্য-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন; এই ভাবিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু একটি সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে ইহার অর্থ যে তাঁর নিজের রাজ্য ধ্বংস হইবে তাহা তিনি তখন বোঝেন নাই।

ক্রোসাস তাঁর সামন্ত রাজগণকে সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তাঁহারা একত্র হইতে না হইতে, কাইরাস বজ্রের মত দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাইরাস জানিতেন যে লিডিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যেরা ভারি বীর। তাহাদিগকে পরাজয় করা বড় কঠিন। তাই তিনি তাঁর সৈন্যের সম্মুখে একসারি উট দাঁড় করাইয়া দিলেন। সেই লম্বা গলা কদাকার উটগুলিকে দেখিয়া ঘোড়াগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে পালাইতে লাগিল। আরোহীদের শত চেষ্টায়ও অশ্বগুলি আর ফিরিল না। লিডিয়ান সৈন্য পলায়ন করিল।

সার্দিস্ নগর অবরুদ্ধ হইল। প্রাচীরের উপর সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া কড়া পাহারা দিতেছে, কোথাও যেন শত্রুরা কোনো ছিদ্র না পায়। এমন সময়ে একজন লিডীয় সৈন্যের টুপী প্রাচীর হইতে পড়িয়া গেল। সে প্রাচীর বাহিয়া নামিয়া আসিল ও টুপী লইয়া পুনরায় উঠিয়া গেল। এই ব্যাপার এক পারসিক সৈন্যের চোখে পড়িল। সে তখন তেমনি করিয়া প্রাচীর দিয়া উঠিল ও অন্যান্য সৈন্যগণকে উঠিয়া আসিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সার্দিস্‌বাসীরা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এমন করিয়া শত্রুসৈন্য প্রাচীর বাহিয়া উঠিবে। সার্দিস্ নগর কাইরাসের বশ্যতা স্বীকার করিল।

লিডিয়া-রাজ ক্রোসাস বন্দী হইলেন। হুকুম হইল, তাঁকে চিতায় জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইবে। ক্রোসাস বড় অহঙ্কারী ছিলেন, ধনমদে মত্ত হইয়া তিনি সকলকে অবজ্ঞা করিতেন। তাই বুঝি তাঁর অদৃষ্টে এই শাস্তি বিহিত হইল।

ক্রোসাস্‌কে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠের স্তূপের উপর বসান হইল; চারিদিকে পারসিক সৈন্যেরা দাঁড়াইয়া। কাইরাস অদূরেই ছিলেন। যেমনই কাঠের স্তূপে আগুন দিবার জন্য লোক আসিল অমনি ক্রোসাস "সোলান, সোলান" করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাইরাস সেই কান্না শুনিয়া ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ক্রোসস্ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, কিছুদিন পূর্ব্বে সোলান নামে এক মহাজ্ঞানী গ্রীস্‌দেশ হইতে লিডিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমার ধনের বড় অহঙ্কার ছিল; নানা হীরা মাণিকের জিনিষ আনিয়া রাজপ্রাসাদকে স্বর্গপুরী করিয়া তুলিয়াছিলাম। গ্রীস্ হইতে পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আমার ভারি ইচ্ছা হইল। সোলান সমস্ত দেখিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই একটুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। আমি অবাক্ হইলাম। গর্ব্বভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সোলান, পৃথিবীতে সুখী কে?' আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমারই নাম করিবেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন তা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, 'মরণ কালে কে কেমন ভাবে মরে তাহা দেখিয়া তাহাকে সুখী অথবা দুঃখী বলা যায়।'

"কাইরাস! আমার আজ সেই দিন উপস্থিত। এখন আমি বুঝিতেছি, সুখী আমি নই, সুখী তারা, যারা হাসিমুখে মরিয়াছে। মহারাজ, সেই জন্যই আজ সোলানকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।" এ কথা শুনিয়া কাইরাসের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল। তিনি ক্রোসাস্‌কে মুক্তি ত দিলেনই, এমন কি, একজন প্রধান সভাসদ করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় স্থান দিলেন।

কিছুকাল পরে কাইরাস যুদ্ধ করিতে উত্তর দিকে গমন করিলেন। সেখানে শকদের বাস। ভীষণ তাদের স্বভাব; অসাধারণ তাদের সাহস। সভ্যতার ধার তারা ধারিত না, ভদ্রতার খাতির তাদের কাছে ছিল না; পরের কাছে মাথা নীচু করিতে তারা একেবারেই নারাজ। আর সত্যের পথ হইতে তারা কখনো একচুল নড়িত না। যেমন তাদের মনের বল, তেমনি ছিল শরীরের সামর্থ্য।

সেই তেজস্বী শকদের ছোট একটি রাজ্য কাইরাস আক্রমণ করিলেন। সেখানে তমিরি নামে এক রাণী রাজত্ব করিতেন। তাঁর কাছে হারিয়া কাইরাস বন্দী হইলেন। রাণী তাঁহাকে বলিলেন—"এতকাল তুমি লোকের রক্তপান করিয়াছ, আজ মৃত্যুর পরও তুমি রক্ত পান কর" এই বলিয়া কাইরাসের ছিন্নমুণ্ড তিনি রক্তের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে কাইরাসের মৃত্যু হইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

থেরী গাথা।

উপ্পল বণ্ণা (উৎপলবর্ণা)।

এই নামটি শারীরিক লাবণ্য হইতে। ইনি শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর দুহিতা ছিলেন। প্রথম যাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে একটী কন্যা জন্মে, তিনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। বহুদিন পরে দৈব-দুর্বিপাকে যিনি ইঁহার কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনিই একদিন উৎপলবর্ণার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উৎপলবর্ণা এবং তাঁহার কন্যা চিরদিনই দূরে দূরে ছিলেন; কাজেই কেহ কাহাকেও চিনিতেন না। অশুভ বিবাহের পর উৎপলবর্ণা কন্যার জীবনী-কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

উভয়ে সপত্নী ছিনু, মাতা ও দুহিতা!
জানিয়া উঠিনু কেঁপে হয়ে চমকিতা।
কামে ধিক্! কি দুর্গন্ধ! অশুচি! কণ্টক!
মা মেয়ের এক পতি? হা-ভাগ্য অন্তক!
কামের দুর্গতি হেরি, নিরাপদ লভিবার তরে
গৃহহীন প্রব্রজ্যায় গৃহ তেজি গেল রাজঘরে।
শুদ্ধ দিব্য চক্ষে হেরি পূর্ব্ববাস মম
স্বচ্ছ চিত্ত; শ্রোত্র, জ্ঞান শুদ্ধ নিরুপম।
হইয়াছে ঋদ্ধিলাভ, আসবের ক্ষয়;
বুদ্ধের শাসনে ষড়ভিজ্ঞার উদয়।
ঋদ্ধি বলে চতুরশ্ব রথে চড়ে আমি;
নমি বুদ্ধ পদে যিনি জগতের স্বামী।

মারের উক্তি—

কুসুমিত বৃক্ষমূলে একাকিনী বসেছ নির্জ্জনে?
সঙ্গে কেহ নাহি বলে ভয় নাই কিছু কি দুর্জ্জনে?

উৎপলবর্ণার উত্তর—

শতেক সহস্র ধূর্ত্ত তোর সম কি দেখাবে ভয়?
কি করিবি মার? কেশ গাছি বিকম্পিত নয়।
অন্তর্হিতা হতে পারি, পারি তোর দেহে প্রবেশিতে;
ভ্রূযুগের মাঝে তোর বসি যদি, পাবিনে দেখিতে।
চিত্ত মোর বশীভূত; ঋদ্ধিলাভ করিয়াছি আমি,
লভিয়াছি ষড়ভিজ্ঞা বুদ্ধের শাসন সদা মানি।
শক্তিশেল সম কাম বিদ্ধ করে দেহ আয়তন;
যারে বল কাম রতি, বিরক্তি লভেছে তাহে মন।
নিহত ভোগের তৃষ্ণা, বিদলিত অন্ধকার যত;
জান পাপী এই বার্ত্তা; আজি মার হলে তুমি হত।

পুণ্ণিকা (পূর্ণা)।

ইনি দাসীকন্যা ছিলেন।

ব্রাহ্মণের প্রতি পুণ্ণিকা :—

তুলিতাম জল, শীতে জলমাঝে নামি
কর্ত্রীদের নিন্দা আর দণ্ড ভয়ে আমি।
কার ভয়ে হে ব্রাহ্মণ! সদা তুমি স্নান
কর আসি এই শীতে হয়ে কম্পমান?

ব্রাহ্মণ—

জান তুমি হে পুণ্নিকে, কেন প্রশ্ন তবে?
লভি পুণ্য এইরূপে পাপ নাশি ভবে।
বৃদ্ধ হোক্, যুবা হোক্, পাপী যেই জন
পাপমুক্ত হয় করি সদাবগাহন।

পুণ্নিকা—

কেবা সে মূর্খের মূর্খ কহিল তোমায়,
উদকের অভিষেকে পাপ চলে যায়?
মণ্ডুক, কচ্ছপ, শুশু, নাগ আদি যারা
আছে জলচর সবে, স্বর্গে যাবে তারা?
ছাগল, শূকর, মাছ, মৃগ যারা মারে,
চোর নরহত্যাকারী সকলেই পারে
স্বর্গে যেতে, পাপ ধুয়ে উদকের ধারে?
নদীস্রোতে যদি পূর্ব্ব পাপ যায় ভেসে,
পুণ্যও ভাসিয়া যাবে; কি রহিবে শেষে?
যার ভয়ে হে ব্রাহ্মণ শীতে স্নান কর,
তাহা না ফেলিয়া জলে কর্ম্মদোষ হর?

ব্রাহ্মণ—

দেখাইলে সাধুপথ আজিকে আমায়;
স্নানের বসন খানি দিতেছি তোমায়।

পুণ্নিকা—

ও বস্ত্র তোমারি থাক্, চাহিনা বসন;
সত্য যদি দুঃখে ভীত হয়ে থাকে মন,
প্রকাশে গোপনে হোক্ মজিওনা পাপে।
কিন্তু যদি কর পাপ, উহার প্রতাপে
নাহিক উদ্ধার কভু দূরে পলায়নে।
সত্য যদি পাপ-দুঃখে ভয় থাকে মনে,
বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘে তুমি লহগো শরণ;
শীল অনুষ্ঠানে কর মঙ্গল বরণ।

ব্রাহ্মণ—

বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ আমি করিব শরণ;
শীল ধর্ম্মে করিব গো মঙ্গল বরণ।
আজিকে ব্রাহ্মণ আমি, তেজিয়া পাতক
ত্রিবিদ্যা লভিনু সত্য; যথার্থ স্নাতক!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অনন্তের যাত্রী।

১.

নার্স মিস্ ঘোষ যখন রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন সকলে বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত। এমন স্নেহময় ব্যবহারের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আর কোন নার্স প্রদান করিতে পারে নাই। হাঁসপাতালের হাউস-সার্জ্জন হইতে সামান্য কুলী বেহারারা পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ। তিনি রোগীর সুবিধার নিমিত্ত যখন যে ব্যবস্থা করিতেন সানন্দে সকলেই তাহার অনুমোদন করিত। রোগিগণও তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ পথ্য সুধাপানের সমান আগ্রহে পান করিত। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার হাতে যে সব রোগী আসিত তাহাদের অধিকাংশই রোগ-মুক্তিতে নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহার শুভ কামনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইত।

হাঁসপাতালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি কোথায় কি ভাবে এতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, সে ইতিহাস কেহ পরিজ্ঞাত ছিল না। কেহ তাহা জানিতে কৌতূহলও প্রকাশ করিত না। বর্ত্তমান যাঁহার এত সুন্দর অতীত তাঁহার যে রকমই হউক না কেন, লোকে তাহা উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহা যদি গভীর কালিমায়ও মলিন থাকে তবে বর্ত্তমান পবিত্র চরিত্রের অরুণালোক নিশ্চয়ই তাহা দূর করিবে। তবে লোকে সহজ জ্ঞানে অনুমান করিত, এমন উচ্চাশয়া রমণীর অতীত কাহিনী অজ্ঞাত থাকিলেও তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না। কেনন, এ জগতে প্রায়ই পুণ্যগাথা অকথিত থাকে, পাপ-চরিত কখনও গুপ্ত থাকিতে পারে না।

হাঁসপাতালের নিয়মানুসারে প্রত্যেক নার্সই গৃহের আবশ্যক কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থ যথেষ্ট অবসর পাইতেন। কিন্তু মিস্ ঘোষ যথাসম্ভব অত্যল্প সময়ে সে সব সম্পাদন করিয়া আবার শীঘ্র-গতি হাঁসপাতালে ফিরিয়া আসিতেন। সন্তানকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া মা যেমন অধিক কাল দূরে রহিতে পারেন না, মিস্ ঘোষও তেমনি অসহায়

রোগিগণের রোগ-শীর্ণ বেদনা-বিকৃত মুখের কথা মনে করিয়া অনেকক্ষণ গৃহে থাকিতে পারিতেন না। তাহাদিগকে দেখিতে তাঁহার মনটা ব্যাকুল হইত, তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতেন। তাঁহার এই অস্বাভাবিক আচরণে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিত না;—তাঁহার সর্ব্বদা উপস্থিতি প্রত্যেকেরই প্রার্থনীয় ছিল। চরিত্রে পবিত্রতা, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ও সেবায় অনুরাগ তাঁহাকে লোক চক্ষুতে আদর্শ নারীরূপে সম্মানিত করিয়াছিল।

এই প্রেমময়ী নারী রুগ্নের গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার সঙ্গে কেমন একটা অদৃশ্য শান্তির হিল্লোল আসিয়া সকলের বেদনা উপশম করিয়া দিত। জননীর মত আকুল আগ্রহে তিনি যখন রোগিদিগকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন, যখন তাহাদের বেদনা-অবশ অঙ্গে স্নেহ-কোমল কর বুলাইয়া দিতেন, তখন আশা ও উদ্বেগে, প্রেম ও করুণায় তাঁহার বিশাল মাতৃ-হৃদয় মথিত হইয়া এমন একটা শোভন স্বর্গীয় শ্রী তাঁহার বদনে ফুটিয়া উঠিত, যাহা দেখিয়া মনে হইত, যেন সর্ব্বার্থ-সাধিকা সর্ব্বমঙ্গলা কোন দৈবাঙ্গনা মুখে দিব্য সান্ত্বনা ও করে অভয় লইয়া নশ্বর জগতে অমরতা বিভব বিলাইবার জন্য গৃহ মাঝে অবতীর্ণা হইয়াছেন। মহীয়সী রমনীর এই মহিমাপূর্ণ মূর্ত্তির পীঠতলে দর্শকের শির তখন অন্তরে অন্তরে শতবার লুণ্ঠিত হইত। নির্ম্মল ঊষার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্রা, শিশুর হাসির মত সরল-স্বভাবা, অনুতপ্তের অশ্রুর ন্যায় পবিত্র-প্রকৃতি এই রমণীকে পরিচিত অপরিচিত সকলেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপচারে অন্তরে পূজা করিত।

২

হাতে কোন কাজ না থাকায় একদিন বিকালে মিস্ ঘোষ নিজের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্র মাঠের কোণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। জগত চেতনা-হীন ভাবে যেন চারিদিকে বিশ্রাম করিতেছে। প্রান্তরের স্তব্ধতাকে বেদনায় স্পন্দিত করিয়া একটা পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। সে কাকলিধ্বনি উদাসীনের মত নীরবতায় মিলিত হইল। চারিদিক হইতে একটা বিষাদ-রাগিণী অস্পষ্ট ভাবে আলস্য-মন্থর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া এই নিস্তব্ধ নিসর্গের দিকে তিনি আত্ম-বিলুপ্ত ভাবে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল, যেন জড়-প্রকৃতি সহসা বাঙ্ময়ী হইয়াছে, যেন জল স্থল হইতে কি প্রকার একটা অব্যক্ত অস্ফুট ধ্বনি উঠিয়া ঊর্দ্ধে মিলাইতেছে, যেন 'অনন্তের বাঁশি' করুণ আহ্বানে 'আয় আয়' করিয়া কাহাকে ডাকিতেছে। সেই বিশ্ব মর্ম্মভেদী কাতর আহ্বান তাঁহার সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিকে আলোড়িত করিতেছিল। অসীম আকাঙ্ক্ষা ভরে সেই ছন্দে তাঁহার হৃদয় গাহিয়া উঠিল—

"আমি যাব আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা-গান ;
উদ্বেল অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।"

———এমন সময় একটা উৎকট শব্দে নিদ্রোত্থিতের মত তিনি চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, কক্ষ-পার্শ্বস্থ ঘণ্টা সজোরে বাজিয়া উঠিল। কোনও আগন্তুকের আশা করিয়া তিনি সংযত বেশে দ্রুত নীচে নামিয়া গেলেন।

আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার মন হইতে বেদনার ভার কমিয়া গেল। তিনি হাসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"এস এস সুরেন দা; কি খবর, কেমন আছ? চল, উপরে চল"—এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া উপরে গেলেন।

প্রারম্ভিক কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ সুরেন বাবু সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যোগিনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিও না।"

ব্যস্ত হইয়া মিস্ ঘোষ বলিলেন—"না না, রাগ করিব কেন? তুমি বল।"

তখন সুরেন বাবু একটু বিষন্নভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এই ভাবেই কি জীবন কাটাইবে?"

মিস্ ঘোষ। তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া আমি

আশ্চর্য্য হইলাম! তুমিই আমাকে কতবার বলিয়াছ—'পর-সেবার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই।' আমিও জীবনে তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত মানুষের জীবনে থাকিতে পারে না। আর পশুপক্ষীর ন্যায় লক্ষ্যহারা, উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। প্রত্যেক জীবনেরই এক একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। আমি তাই এই পথ ধরিয়াছি। ইঁহার চেয়ে উন্নত পথ, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আমি আর জানি না।

সুরেন বাবু। কেন, ঈশ্বরোপাসনা?

মিস্ ঘোষ। হাঁ, ব্রহ্মের সাধনা এবং তাঁহাকে পাওয়া মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন! এই লক্ষ-কোটী প্রাণী অধ্যুষিত জঙ্গম জগৎ যাঁহা হইতে উদ্ভূত, যাঁহাতে বিধৃত এবং প্রলয়ে যাঁহাতেই সংপ্রবিষ্ট হইবে তিনিই পরম ব্রহ্ম। * এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণু সেই চিন্ময়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত। এই প্রাণীজগতের কলরব ও জড় জগতের মৌনভাষা সেই মহাপ্রাণের চরণে মহামিলিত। কিন্তু তিনি অনন্ত, এই যে বিপুল বিশ্ব, তাহাও তাঁহার একাংশে স্থিত। † এমন বিরাট সত্তাকে মানুষ কি প্রকারে ধারণা করিবে? অথচ তাঁহাকে না পাইলে মানুষ তাহার জীবনের কোনই প্রয়োজনীয়তা, কোনই অর্থ বুঝিতে পারিবে না। তাই কৃপাময় তিনি, আমাদের চরম মঙ্গলের জন্য সে ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা যাহাই করি না কেন সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিতে তিনি কহিয়াছেন। আবার, তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁ'র প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই সমস্ত জগৎই তাঁহার প্রিয়—কেননা জগতের প্রতি অণুতে তিনি বর্ত্তমান। কাজেই তাঁহাকে পাইতে হইলে এই জগতকে ভালবাসিতে হইবে। পার্থিব প্রেম সম্বন্ধেও, তুমি জান, এই নিয়ম প্রচলিত। প্রেমাস্পদের প্রত্যেক প্রিয় জিনিষ প্রেমিকের চক্ষে সুন্দর। ভগবানের সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য। আমরা যদি তাঁহার উপাসনা করিতে চাই, তবে প্রথমে তাঁহার প্রিয় এই সমস্ত প্রাণীকে প্রিয় জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। এই জগতকে ভাল না বাসিলে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা সত্য নহে। যে মানুষ অন্যকে ঘৃণা করে সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তাহার সেটা লোক দেখানো কৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতি। অতএব এই জগতকে ভালবাসা অর্থাৎ পরসেবাই তাঁহাকে পাওয়ার প্রথম পন্থা। সুতরাং আমি যে ব্রতের সাধনা করিতেছি তাহাতে সিদ্ধিই মানুষকে তাহার জন্মের চরম সার্থকতা দান করিবে।

সুরেন বাবু। তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তুমি রমণী, আমার মনে হয় সংসারই তোমার পক্ষে প্রকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র।

মিস্ ঘোষ। আমি স্ত্রীলোক, আমাদের নারীহৃদয়ের বিকাশ একমাত্র প্রকৃত প্রেমেই সম্ভব। বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেমই রমণী-হৃদয়ের একমাত্র ভাষা। ইহার অভাবে নারী-জীবন ব্যর্থ। অন্য কিছুতেই রমণী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, আর কিছুই স্ত্রী-হৃদয়ের অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। প্রেমের অবলম্বন হইতে ছিন্ন করিলে রমণী নিমেষে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। যে অভাগিনী নারী কোন দিন ভাল বাসিবার কিছুই পায় নাই সে বড়ই কৃপার পাত্র, তাহার লক্ষ্য-শূন্য জীবন শুধু হতাশার ক্রন্দন-স্থল। তুমি বলিতেছ যে আপনার পরিবার ব্যতীত নারীর প্রেম অন্য কোথাও বিকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি, গৃহিণী কি প্রকারে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করেন? কি পন্থা আশ্রয় করিয়া রমণী তাহার শান্ত জীবনের অনন্ত আস্বাদ স্বামী পুত্রের সেবা করে? সে কী স্বর্গীয় পদার্থ, যাহার অমর গৌরবে রমণী ধাত্রীরূপে সমস্ত মুগ্ধ-বিশ্বের অর্ঘ্য পায়? তাহা একবার দেখিতে যত্ন করিয়াছ কি? যদি তাহা না জান তবে বলিতেছি শুন—সে অপূর্ব্ব পদার্থ আত্মোৎসর্গ। প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষাস্থল এই আত্মোৎসর্গে। সংসারে রমণী প্রতিপলে প্রতি কাজে স্বার্থ দান করিয়া পরিজনের সেবা করে। সাংসারিক শোক দুঃখ রমণীর বিশাল হৃদয়-আবরণে সমুদ্রে শিলাখণ্ডের ন্যায় ক্ষণে অদৃশ্য হইয়া যায়। শোকের তীব্রতম বজ্রাঘাত ও

* উপনিষদ।

† গীতা।

রমণীর কোমল প্রাণ অচঞ্চল দেহে নীরবে সহ্য করে। সংসার-সমুদ্রের দুঃখ-গরল রমণী নিজে পান করিয়া প্রিয়-জনকে সুধামৃত দান করে। সংসারাশ্রমে রমণী পরম যোগিনী। আবার বিশালত্ব প্রেমের অন্যতম ধর্ম্ম। ইহলোক পরলোক ভুলিয়া যে এই দুর্ব্বার প্রেম-স্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার হৃদয়ের বিপুল পরিধি পরিবার ছাড়াইয়া সমাজ ও দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত হয়। প্রেমের এই বিশালতার মূলেও আত্মোৎ-সর্গ নিহিত আছে। তবে হৃদয়কে এই অসীম ব্যাপ্তি লাভ করিতে হইলে সাধনা আবশ্যক। রমণীর পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে। জননীরূপে নারী আপনার পরিবারে সেই অনন্তের সাধনা করেন। সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ ও আমার এই ব্রত উদ্‌যাপন উভয়েরই মূলে একই উদ্দেশ্য —প্রেমের চরম বিকাশ। আর আমিও সংসারেই আছি, সংসারের বাহিরে মানুষ থাকিতে পারে না। দুঃখার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিল তিল করিয়া আমি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছি। সুতরাং আমার মনে হয় না, এই ব্রত ধারণ করিয়া আমি রমণী-জীবনের আদর্শ হইতে নীচে পড়িয়াছি।

সুরেন বাবু। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু বিবাহ করিলে উত্তর-সাধক রূপে আর একজনকে পাইয়া তুমি হয়ত আরও পূর্ণভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবে।

বিবাহের নামে কি রকম একটা ঘৃণায় যেন তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যেন কোন অতীত বিষাদ-কাতর-কাহিনী তড়িৎ-স্পর্শে তাঁহার চিত্তকে বেদনায় কম্পিত করিয়া গেল। তাঁহার এই ভাব সুরেন বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। তিনি একথা বলার জন্য মনে মনে নিজেকে অপরাধীরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এই প্রশ্ন চাপা দিবার জন্য অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বেই ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্য সংযত করিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে মিস্ ঘোষ বলিলেন :—

"এতদিন পরে আবার কেন তুমি আমার কাছে বিবাহের কথা তুলিলে? কি বুঝিবে তুমি পুরুষ! অহরহঃ রমণী হৃদয়ের অগাধ পারাবারিসম কী দুঃসহ ভাব-মন্থরে মথিত হয় তাহা তোমরা পুরুষ কেমনে বুঝিবে? আকা-শের চেয়েও বিস্তৃত, জলধির চেয়েও গভীর, বায়ুর চেয়েও বেগবান্ এই নারী হৃদয় যে কী বিপুল আগ্রহে, কী নিবিড় আলিঙ্গনে কামনার ধনকে জড়াইয়া ধরে, তাহা প্রেমের মাধুর্য্য-অপরিজ্ঞাত তোমরা পুরুষ কি বুঝিবে? প্রবাহে বাধা পাইলে স্রোতস্বতী যে কল্লোলরবে বাঁধ ডুবাইয়া চতুর্দ্দিক ছাপাইয়া এক দেহকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রাণ ঢালিয়া হৃদয়-বেগের জয় গান করিতে করিতে অনন্তের পানে ছুটিয়া যায় তাহা কি তুমি জান না? সেই কালরাত্রিতে আমার উন্মুখ ভালবাসা যখন একটা গভীর হতাশ্বাসে মিলাইয়া যাইতেছিল, যখন আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা ও নিমন্ত্রিতগণের কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টির নীরব তিরস্কার আমার আহত হৃদয়কে নিষ্ঠুর পীড়নে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, যখন পিতার অপমান ও মাতার ভগ্নপ্রাণের কথা চিন্তা করিয়া লজ্জায় ও ধিক্কারে আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, তখন, আমার জীবনের সেই শ্মশান মাঝে, আমার কামনার সেই চিতার উপরে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে—না! আমার জীবন কাহারও দোষে এমন অর্থহারা হইতে পারিবে না। স্বেচ্ছায় হৃদয়ের অতৃপ্ত আবেগে যাহা বিপথে হারাইতে বসিয়াছি, সংযমের বাঁধনে সৎপথে তাহাকে রাখিতেই হইবে। নিশ্চয়ই কোন দিন এক শুভ প্রাতে সকলের সাথে মিলিয়া আমি এ কামনা কোন পুণ্য শোভন আশ্রয়ে পূর্ণ করিব। আমার জীবনের অর্থ একদিন সকলকে বুঝাইব, আমার জীবন কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমার সেই সঙ্কল্পেরই এই সিদ্ধি।"

এই বলিয়া উত্তেজনার আতিশয্যে কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া পরে আবার অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"প্রেমকে সার্থক করিতে হইলে যে বিবাহ করিতে হইবে এ ভ্রান্ত ধারণা তুমি কোথায় পাইলে? যে ভালবাসা তৃপ্ত হইবার জন্য প্রতিদানের আশায় বসিয়া থাকে তাহা কখনই পূর্ণ নহে। প্রেমের নামে মাল্য-বিনিময়ের সঙ্গে ছবি বিনিময় করিয়া স্ত্রীপুরুষ যে মিলিত হয় তাহা সর্ব্বত্রই ঠিক প্রেমের জন্য নহে; অনেক স্থলেই তাহা কতকটা আবশ্যকতা, কতকটা লালসার

থাকিবে। সেখানে আত্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তাই সে মিলনের ফলে অধিকাংশ স্থলেই হলাহল উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে মিলন যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে না, তাহা নহে। তবে তাহা এ মর্ত্ত্যে দেবাবির্ভাবের ন্যায় বড়ই দুর্লভ। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা আত্ম-চিন্তা ভুলিয়া মিলিত, সেই মিলন অমৃত দান করিয়া পরিজনকে অনাবিল সুখে ভাগ্যবান করে।

"আজ আমার মনে হইতেছে, বিবাহ সুখের কী ক্ষুদ্র আয়োজন! বিধাতা তখন আমাকে যে শাস্তি দিয়াছিলেন আমি তাহা তাঁহার স্নেহের দান জ্ঞানে মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম। সেই অবধি আমি তাঁহার মঙ্গল বিধানে নতশির হইয়া চলিতেছি। আজ যে আমি এই মর জগতে তাঁহার অমর মহিমা প্রকটিত দেখিতে পাইতেছি, এ তাঁহারই করুণা। আজ আমি আমার বর্ত্তমান আশ্রয় হইতে অতীতের গহ্বরে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতেছি—আমি কত সঙ্কীর্ণ ছিলাম; আমার ভালবাসা শুধু একটা ক্ষুদ্র মানুষকে সহায় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। আজ যে আমার সেই ক্ষুদ্র জ্ঞান এমন একটা বিস্তৃত বোধে পরিণত, আমার সেই ক্ষণিক সুপ্তি এমন একটা অনন্ত জাগরণে রূপান্তরিত, আমার সেই জনৈক-সীমাবদ্ধ প্রেম এমন বিশ্বময় ব্যাপ্ত, এজন্য আমি করুণাময়ের নিকট, আমার সেই শাস্তিদাতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আজ আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি—এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার বিরাট সত্তায় জাগ্রত। আজ যেন আমার মনে হইতেছে যে আমার জীবন অনন্ত—আমার প্রাণ অনন্ত, আমি অনাদি কাল হইতে এই পৃথিবীতে রহিয়াছি, আর অনন্ত কাল থাকিব। আজ আমি বুঝিতেছি, মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় এক অনাহত প্রেমধারা সেই প্রেম স্বরূপ নারায়ণের চরণ-কমল হইতে জন্মলাভ করিয়া এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিপুল জগতকে তাহার পুণ্য বারিতে অভিষিক্ত করিতেছে। এই বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণী যেন সেই ধারায় লিপ্ত হইয়া আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে। আমি এই মহা-যজ্ঞে আমার জীবনকে আহুতি দিয়া এই নশ্বর দেহ-কারা ছিন্ন করিয়া অনন্তের অংশ অনন্তে মিলিত হইব। আমার জীবন সার্থক করিবার ইহাই স্থির পথ, আমি এই অনন্ত পথের যাত্রী। সুরেনদা, সাংসারিক ক্ষুদ্র সুখের প্রলোভনে আমাকে আর নিরস্ত করিতে পারিবে না—তুমি আমার কাছে আর ওসব কথা বলিও না।"

এই অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী উক্তি শুনিয়া বিস্ময় ও ভক্তিভরে সুরেন বাবু তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—যেন একটী দেবীমূর্ত্তি পাপ পঙ্কিলতার ঊর্দ্ধে ঐ শিব পবিত্রতার মধ্যে কমলাসনার ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন স্বর্গীয় সুষমায় উজ্জ্বল, মুখের চারিদিকে সেই ঔজ্জ্বল্যের ঊষাদীপ্তি একটা পরিবেশের মত অঙ্কিত করিয়াছে। তিনি শ্রদ্ধার সহিত বারবার এই মহিমাময়ী নারীকে মনে মনে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মিস্ ঘোষ বলিলেন—"সুরেন দা, আমার কথায় যদি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে বোনের অপরাধ ক্ষমা কর।"

অপ্রস্তুত হইয়া সুরেন বাবু উত্তর করিলেন—'না না, আমি মোটেই অসন্তুষ্ট হই নাই।' তৎপরে ঘড়ির দিকে তাকাইয়া 'অনেক রাত্রি হইয়াছে, আজ তবে যাই, অন্য দিন আসিব'—বলিয়া নামিয়া গেলেন।

মিস্ ঘোষ তখন কিছুক্ষণ নিস্পন্দ শরীরে অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে থাকিয়া মনকে সংযত করিয়া দৈনন্দিন উপাসনায় উপবেশন করিলেন।

(৩)

উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে পূর্ব্বোক্ত সুরেন বাবু বিশেষ ব্যস্ততার সহিত যথাসম্ভব দ্রুতচরণে মিস্ ঘোষের বাড়ীতে আসিতেছিলেন। বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখেন, অনেক লোক ব্যাকুলভাবে আনাগোনা করিতেছে। সকলেরই মুখ আশঙ্কা ও উদ্বেগের ছায়ায় অন্ধকার। তিনি সত্বর উপরে উঠিয়া গেলেন।

এ বিশ্ব সংসারে যাঁহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না, আজ তাঁহার এত বান্ধব কোথা হইতে আসিল? প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকিয়া কত লক্ষপতি কালের আহ্বান শুনিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও মোহপাশ ছিন্ন করিতেছে, কই, তাহাদের ত এত আত্মীয়ের সমাগম হয় না! এই রমণী তবে কি অলোকসামান্য ধনে সম্পন্না

ছিলেন, যাহার অনিবার্য্য আকর্ষণে আজ এত লোক আকৃষ্ট ?

সুরেন বাবু উপরে যাইয়া দেখিলেন, সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণে সে গৃহ পূর্ণ। ইতস্ততঃ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও ঔষধের শিশি বিক্ষিপ্ত। অপরাপর কক্ষগুলিতে নানা প্রকার লোক বসিয়াছে। যাঁহার অলৌকিক ও অমানুষিক আত্মত্যাগে তাহারা ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত তাহাদের সেই জীবনদাত্রীর বিপদের কথা শুনিয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়াছে। মানুষ আপনার হৃদয়ের বলে ও মস্তিষ্কের শক্তিতে যতদূর সাধ্য মহাকালের সহিত যুঝিতেছে, কিন্তু বুঝি সেই অনন্তের যাত্রীকে দুর্ব্বল মানব মায়ার ডোরে বাঁধিতে পারিল না! মরণের দ্বার দিয়া প্রাণ মনসহ যে আনন্দ অসীমে ধাবনোন্মুখ কিসের বন্ধন তাহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম ?

হাউস সার্জ্জন সুরেনবাবুকে দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এই যে আপনি আসিয়াছেন, তবু একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। উনি মাঝে মাঝে আপনার কথা বলিতেছেন।"

সুরেনবাবু উত্তর করিলেন,"টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কি অসুখ টেলিগ্রামে কিছু লেখা নাই।"

সার্জ্জন। পীড়া বড় শক্ত—নিউমনিক প্লেগ। আজ কয়েক দিন হইল হাঁসপাতালে ঐ রোগাক্রান্ত একটী রোগী আসিয়াছিল। ঐ রকম সংক্রামক রোগী রাখিবার আমাদের তখন কোন ওয়ার্ড না থাকায় আমরা তাহাকে অন্য হাঁসপাতালে যাইতে বলিতেছিলাম। কিন্তু ইনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরন্তু বলিলেন, 'আহা, ও বড় অভাগ্য জীব। রোগের আক্রমণ উহাকে স্বজনের স্নেহের কোল হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। ও এতদূর হইতে এত আশা করিয়া আমাদের আশ্রয় পাইবার জন্য আসিয়াছে। এই অসহায়ের আবেদন কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে না। ইহা বড়ই হৃদয়হীনতার কাজ হইবে। আর আমাদের এই জীবন—সংসারে যাহা অপেক্ষা আর অনিশ্চিত কিছু নাই, তাহার মায়া করিয়া আমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিব? না,—এ অসম্ভব।' ইহা বলিয়া তিনি ঐ রোগীকে রাখিয়া দিলেন, এবং পনর দিন বিরামহীন ভাবে অতন্দ্রিত আঁখিতে অসামান্য সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত তাহার সেবা করিয়া তাহাকে নীরোগ করিয়াছেন। তারপর ঐ রুগ্ন আরোগ্য লাভ করিয়া নীরবে অশ্রুভরা আঁখিতে ইঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু যেদিন রোগী বিপদ কাটাইয়া উঠিল, সেইদিন হইতে ইনি অসুস্থ।

সুরেন বাবু দেখিলেন, যাঁর জন্য সকলে আকুল তাঁর মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। অরুণোদয়ের আগে মেঘহীন পূর্ব্বাকাশে যেমন একটা উজ্জ্বল নির্ম্মলতা বিরাজিত থাকে, ঝটিকা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে অসীম গাম্ভীর্য্য-সৌন্দর্য্যে সমুদ্র যেমন সমলঙ্কৃত থাকে, সমাধিমগ্ন যোগীর মূর্ত্তি অনাহত শান্তিতে যেমন নিস্পন্দ থাকে, এই মরণোন্মুখ নারীর মুখ তেমনি নির্ম্মল উজ্জ্বল, গম্ভীর সুন্দর, শান্ত সুস্থির—যেন কোন চির আকাঙ্ক্ষিত মিলনের আশা করিয়া আগ্রহ-কাতর চক্ষে, অধীর-কম্পিত-বক্ষে অথচ সংযত ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। সুরেন বাবু ঘরে গেলেন। সেই দিন তাঁহার মুখের চারিদিকে যেমন একটা পরিবেশ দেখিয়াছিলেন, আজ দেখিতে পাইলেন, তাহা আরও স্পষ্ট, আরও ঘনীভূত। উপস্থিত সকলেই এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সুরেন বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "সুরেন দা, আজ আমার আশা পূর্ণ হইতে চলিল, আজ আমি যাইতেছি। প্রার্থনা করিও, সেই চিরসুন্দরের সিংহাসন-তলে দাঁড়াইয়া যাহাতে এ জীবনকৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য নির্ভয়ে দিতে পারি। তিনি যেন আমাকে কোলে তুলিয়া নিয়া তাঁহার ঐ দীপ্ত পবিত্রতা দ্বারা আমায় তাঁহার সন্তানের মতন করিয়া লয়েন। তুমি দুঃখিত হইও না, এ অনন্তপথে আবার আমরা মিলিব। ঐ তিনি, আমাকে ডাকিতেছেন—আমি যাই তবে—ওঁ!!" আঁখির পাতা একটু উর্দ্ধে উঠিল, আবার নিমীলিত অবস্থায় আসিল—পরক্ষণেই সব স্থির!! একটী ব্যাকুল আত্মা ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া

অসীমে মহামিলিত হইল। সেই পরমপুরুষের একটী সন্তান তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে আত্মসমাধি রচনা করিয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

৪

শোকের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে, কম্পিত কণ্ঠে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুরেন বাবু কহিতে লাগিলেন,—

"আপনারা সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। কি ঘটনার সংঘর্ষণে ইঁহার হৃদয় হইতে এই উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইয়াছিল এমন গৌরব-গরিষ্ঠ পরিণামের সূচনা লোকে প্রকাশিত হওয়াই উচিত। কেননা, সম অবস্থায় পড়িলে হয়ত বা কেহ এই মহান্ আদর্শে জীবনকে সত্যের দিকে উন্নীত করিতে পারেন।

"আমি বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সহিত পরিচিত। বাল্যে ও কৈশোরে ইঁহার মনের গতি সাধারণ নারীর মতই ছিল, তখন এই প্রকার মহৎ বৃত্তির কোন রূপ বিকাশ ইঁহাতে লক্ষিত হয় নাই।

"তারপর যেমন স্বাভাবিক, বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নানা দিক হইতে ইঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। সেই সময় একজন অপরিচিত যুবক ঘটনাসূত্রে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হয়। যুবক সুন্দর গাহিতে পারিত। কেহ তাহাকে চিনিত না, কেহ তাহার পরিচয় লইতে যত্নও করে নাই। সে প্রায়ই আসিত, এবং আবশ্যক ও অনাবশ্যক মত গল্পাদি করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার এই গৃহে প্রবেশহেতু পারিবারিক শান্তির যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে তাহা কেহ কখনো ভাবে নাই।

ক্রমে রমণীর অকূল হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষায়, প্রথম প্রেমের কূলপ্লাবী তৃপ্তিহীন আবেগে যুবকের প্রসারিত ছলনা-পাশে মুগ্ধা বালিকা সকল ভুলিয়া আত্মসমর্পণ করিল। হায়, রমণীর সরল একদেশদর্শিতা!

"ঘটনার পর্য্যায়ক্রমে সকলে জানিতে পাইল, ইঁহারা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। যথাবিহিত আয়োজনও হইতে লাগিল। ক্রমে নির্দ্ধারিত সময়ে বিবাহের গন্ধ-আমোদিত গীতি-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল রজনী আসিয়া বালিকাকে অজ্ঞাত ভবিষ্যের এক সম্মোহন চিত্র দেখাইল। আনন্দ বেদনায় কম্পিত বক্ষে বালিকা বধূবেশে সরল বিশ্বাসে নূতন জীবনকে বরণ করিতে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইল।

"অকস্মাৎ শারদাকাশে বজ্রাঘাতের ন্যায় এক কুলিশ-কঠোর সত্যে সে সুখ-রশ্মি ম্লান হইয়া গেল। কে বলিয়া উঠিল—'এ বিবাহ হইতে পারে না, এই শঠ যুবক বিবাহিত!!' সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ বন্ধ হইল। মিলনের ধারা বিরহের দীর্ঘশ্বাসে শুকাইয়া গেল—উৎসবের বাঁশীর তান বিলাপের বিষাদ গান গাহিতে লাগিল। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস!!

"সেই শোকাবহ ব্যাপার হইতে রমণীর জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। যেন নিয়তির এই নির্ম্মম আঘাত তাঁহার মুকুলিত চিত্ত-কমলকে সত্যালোকের দিকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। রমণী শান্ত-সমাহিত অন্তরে দুঃসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আত্মোন্নতির সাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে এই দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিয়া শক্তিরূপিণী নারীজাতিকে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ দেখাইয়া গেলেন।" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তখন রমণীর জীর্ণ-বাসবৎ পরিত্যক্ত জড় দেহের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন।

অনন্তের পথ দেখাইয়া সেই অনন্তের যাত্রী অনন্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। *

শ্রীসুকুমার ঘোষ।

ঐতিহাসিক গল্প।

অনেক দিন পূর্ব্বে গ্রীসের নগরে নগরে এক অন্ধ গান করিয়া বেড়াইতেন। অন্ধকে সকলেই চিনিত। যে বাড়ীতে তিনি যাইতেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত আদর করিয়া বসাইত। অন্ধ বৃদ্ধ, কিন্তু তবু তাঁর

* সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে।

কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট! তাঁহার হাতে একটি বীণা। সেই বীণার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তিনি গান গাইতেন। অনেক রাজবাড়ীতে তাঁর ডাক পড়িত; তখন তিনি প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া গ্রীকদের প্রাচীন কথা, বীরদের গাথা গান করিতেন! এই অন্ধ কবির নাম হোমার। তিনি গাহিতেন:—

"প্যারী ট্রয়ের রাজপুত্র। ঐ নগরটি সমুদ্রের ধারে এসিয়া মাইনরে। এক দেবতা প্যারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে ধরার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী রমণী তিনি লাভ করিবেন।

গ্রীসে স্পার্টার রাজা মেনেলাস। তাঁর হেলেনা নামে পরমসুন্দরী এক স্ত্রী। মেনেলাসের গৃহ তাঁর অতুল শোভায় আলোকিত। তিনি শান্তির আধার, প্রীতির আকর। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসারটি পরিপূর্ণ; আনন্দ উৎসবে গৃহটি সর্ব্বদা মুখরিত! মেনেলাস ট্রয়রাজ-কুমার প্যারীর বন্ধু! বন্ধুগৃহে বন্ধু আসিলেন। হেলেনকে দেখিয়া প্যারীর মনে হইল, জগৎমাঝে এমন সুন্দরী নারী আর কোথাও নাই! হেলেন তাঁর স্বামীর কথা ভুলিয়া গেলেন। কোলের ছোট কন্যাটির কথা একেবারে মন হইতে মুছিয়া গেল। এমনি তাঁর পোড়া কপাল, দুরদৃষ্ট! ঈশ্বরকে ভুলিলে, প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিলে মানুষের এমনই অধঃপতন হয়। তাঁর যেন মনে হইল, 'প্যারীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়—তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশে চলিয়া যাই।' প্যারী ছিলেন খুব সুপুরুষ! তাঁর মুখখানি ছিল কারিকরের ছাঁচে ঢালা নিখুঁত পুতুলটির মত। চোখ দুটি কাঁচের মত স্বচ্ছ আর নির্ম্মল আকাশের মত নীল! সোণার রঙ্গের দীর্ঘ কুঞ্চিত চুলগুলি যখন বাতাসে উড়িত তাঁহাকে তখন আরও সুশোভন দেখাইত। এই মোহন কান্তির উপর ছিল তাঁর বিপুল শরীরে অসীম বল! তার উপর ছিল অতুল সাহস! স্বাস্থ্য, শক্তি ও সাহস তাঁহার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কান্তিখানিকে আরও সুন্দর করিয়াছিল।

সকল ভুলিয়া হেলেন প্যারীর সঙ্গে চলিলেন। বন্দরে আসিয়া দেখেন, বিপুল এক জাহাজ যেন রাক্ষসের মত শত শত হাত বাড়াইয়া সাগর-জলে হেলিয়া দুলিয়া ভাসিতেছে! তাঁহারা জাহাজে উঠিলেন। ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জাহাজের দাঁড় চলিতে লাগিল, তাঁহারা নীল সাগরের মাঝে গিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্দরের দীপগুলি জ্বলিয়া উঠিল। হেলেনের যেন কোন স্বপ্নলোকের কথা মনে পড়িল। সমস্ত ঝাপ্‌সা—কুয়াসার মত অস্পষ্ট! স্পার্টার কূল হইতে বাতাস আসিয়া জাহাজের ভরা পালে জোর দিল, এক হিঁচ্‌কা দিয়া বেগে জাহাজ ছুটিয়া চলিল!

তার পর যখন হেলেনের চৈতন্য হইল যে, তিনি কি করিয়াছেন, তখন কান্নাকাটি করা বৃথা! তখন দুরে রৌদ্র-কিরণে ট্রয় নগর পটের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে! নগরের গৃহ হইতে ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া আকাশে উঠিয়া বিলীন হইতেছে! আর নগরের অল্প দূরে পাহাড় থাকে থাকে শোভা পাইতেছে। প্রথম এক সারি পাহাড়, তাহার রঙ্ আঙ্গুরের মত নীল; তারপর আর এক সারি সাগরের মত নীলাভ; দুরে আর এক সারি আকাশের গায়ে যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে; তাহার রঙ্ রৌদ্রমাখা শরতের আকাশের মত। হেলেনের স্পার্টার গৃহের কথা মনে পড়িল। কন্যার কথা—স্বামীর কথা একে একে স্মৃতিতে উদয় হইল। কিন্তু হায়, এখন আর ফিরিবার সময় নাই।

এদিকে মেনেলাস আসিয়া শূন্যঘরে হেলেনকে দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে তাঁর বাকি রহিল না। বুঝিলেন, পাপিষ্ঠ প্যারী তাঁহার সোণার সংসারে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেনেলাসের বড় ভাই আগামেনান খুব বড় রাজা। তিনি অনেক রাজার সাহায্যে ভ্রাতৃজায়ারা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। শত শত জাহাজ পাল তুলিয়া দাঁড় বাহিয়া ট্রয় নগরে হাজির হইল। ট্রয় নগর অবরুদ্ধ হইল। অসংখ্য বীর গিয়াছিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। ফল কিছু হইল না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

——•——

অষ্টম ভাগ। ফাল্গুন, ১৩১৯। ১১শ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE, WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৷৵০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

বাবিলনের শূন্যোদ্যান (কল্পিত) ।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :- স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest - - I will not excuse, I will not retreat a single inch - - - and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :--আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১৯ | ১১শ সংখ্যা।

শ্রেয়ের পন্থা।

যে শক্তি আমাদের মনকে বাহিরের আকর্ষণে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে আমরা তাহাকে বাসনা বলিয়া থাকি। এই বাসনা যখনই জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে তখনই আমাদের জীবন তামসিক হইয়া দাঁড়ায়। নিজের শক্তি আমরা অনুভব করিতে পারি না; তখনই আমরা দাস, বাহিরই তখন প্রভু। নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তমনা হইয়া এক অভাব হইতে আর এক অভাবে, এক ক্ষুদ্রতা হইতে অন্যতর ক্ষুদ্রতায় আমরা ঘুরিয়া মরি। উপস্থিত আকর্ষণই তখন প্রবল, বাসনার ক্ষুধিত পিপাসাই তখন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যেখানে বলীয়ান, শক্তি যেখানে অন্তরের মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত, বাহিরের আকর্ষণ, বাসনার বিক্ষিপ্ত মত্ততা তাহাকে লক্ষ্যহারার মত চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া মারিতে পারে না। যে ব্যক্তি কৃপণ তাহার উদ্দেশ্য টাকা জমাইতে হইবে; কিন্তু বিক্ষিপ্ত বাসনার বশে নানা ভোগ সুখের পশ্চাতে ঘুরিয়া মরিলে তো তাহার উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না! ভোগ সুখ হইতে মনকে বিরত করিয়া এক উদ্দেশ্যের পথে তাহার চলিতেই হইবে, না হইলে যে তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। বাসনার অনুগামী হৃদয় কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। সুখ যাহার লক্ষ্য, বর্ত্তমান লইয়াই যাহার মত্ততা, ভোগস্পৃহা জীবনে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার জীবন কখনও সফলতা—শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। সাদি বলিয়াছেন :--

"একদিন রাত্রিতে মক্কার নিকটস্থ কোনও প্রান্তরে আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার

মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; আমি উষ্ট্রচালককে বলিলাম, 'তুমি আমার নিদ্রায় বাধা দিও না;' উষ্ট্রচালক উত্তর করিল, 'ভাই, সম্মুখে মক্কা, পশ্চাতে দস্যুদল, যদি কিছুক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে পার তবে রক্ষা পাইলে, আর যদি নিদ্রা যাও তবে মৃত্যু নিশ্চিত। এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে মৃদুসমীরণে সৌরভময় বৃক্ষতলে শয়ন করা বড় সুখের, কিন্তু সেই সুখের মূল্য তোমার জীবন।"

জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কেই যে ব্যক্তি আলিঙ্গন করে, অজ্ঞানতার মোহ অন্ধকার তাহাকে তিমিরে আবৃত করে। আঘাত পাইবার ভয়ে ক্ষতকে যে পোষণ করে, সেই ক্ষতই লক্ষ্যহারা মোহাচ্ছন্ন হতভাগ্যকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লয়।

হৃদয় যাহার মহৎ নহে, সত্য এবং পবিত্রতা যাহার হৃদয়ে নাই, অন্ধকারে আলোকের রেখা, মরণে অমৃত লাভ তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটিবে না। সংসারের কণ্টক কঙ্কর রাশিতেই সে ঘুরিয়া মরিবে। যাহার জীবনের কোনও লক্ষ্য নাই, আদর্শ যাহার মহৎ নহে তাহার মত কৃপাপাত্র হতভাগ্য সংসারের ঘূর্ণিস্রোতে অতলে বিপথে ভাসিয়া যাইবেই।

যাহার পথ দুর দুর্গম, লক্ষ্য যাহার দুরান্তরে, যে যাত্রা করে সুরক্ষিত হইয়া, তাহার তরণী দ্রুত চলে এবং ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া পরপারে পৌঁছিতে সে-ই অধিকতর সক্ষম।

ভোগে কখনও তৃপ্তি পাওয়া যায় না, সুখ অন্বেষণ করিয়া সুখ মিলে না। ভোগ পরিত্যাগেই বন্ধনের মুক্তি, বাসনা জয়েই ক্ষুধিত পিপাসা শান্তিলাভ করে। কিন্তু এই ভোগ পরিত্যাগ কি?

অনেকের ধারণা, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিতে হয়, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল সরসতা হইতে বিমুখচিত্ত বৈরাগী সাজিতে হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, অবনতির পরিচায়ক। নির্জ্জন সাধন ধর্ম্ম সাধনার অনুকূল এবং চরিত্র-লাভের সহায় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জগতের কর্ম্ম ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী নহে। সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করিব এবং ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিব। কর্ম্মের ভিতরে শক্তিরূপে, বিশ্বজগতে প্রেম রূপে তাঁহাকে লাভ করিব। লক্ষ্য তিনিই, সংসার নহে। তাঁহাকে লইয়াই যাহার সংসার, সংসার তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। তিনি অন্তরের বস্তু, বাহিরের পদার্থের সাধ্য কি যে বাধা দিতে পারে? আমাদেরই দেশে রাজর্ষি জনক, ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদ গৃহী হইয়াও ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন; এবং অন্বেষণ করিলে আরও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীর অভাব হইবে না।

মানব-ইতিহাস আলোচনা করিলে সংসারী ও সংসারত্যাগী উভয়বিধ সাধু মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ কোনও বেশ ধারণে সাধুতা নহে, সাধুতা বহিরাবরণে নহে। দেশ কাল জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই সাধু-জীবন লাভ করিতে পারেন।

সাধুতা অন্তরে, ধর্ম্ম মানবের জীবনে, আপনার সাক্ষী মানুষ আপনি। যে প্রকৃত ভাল হইতে চায়, সংসারের সমস্তই তাহার চরিত্রলাভের সহায় হইয়া থাকে। মানুষ কাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কাহাকে গ্রহণ করিবে?

বলিতে পারি, ক্রোধ যাহার মনে প্রবল, মানুষের সংসর্গ ছাড়িয়া একাকী রহিলে ক্রোধ তাহার হইবে না সত্য, কিন্তু ক্রোধ জয় করা তো তাহার হইল না! সংযম এবং চরিত্র লাভ করিবার জন্যই পূর্ব্বে আমাদের দেশে বালকগণের গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু হায়, হতভাগ্য পতিত আমরা, মনুষ্যত্ব লাভের সমস্ত চেষ্টা ও শক্তি হারাইয়া কলঙ্কিত—মলিন। জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপরাজিত চরিত্র লাভ করিয়া ব্রহ্মসেবার মহান্ গৌরবে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। আর আজ আমরা সংযম-ধর্ম্মহীন। কিন্তু আমরা কি স্মরণ করিব না যে, মহৎ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিশ্ববিজয়ী শক্তি লইয়া জগতে আমরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি?

মানুষের সংসর্গ এবং প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা পরীক্ষা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহারাই মানুষকে জীবন দান করে। ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী বলিয়া যাহার হাত এড়াইতে মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টা, তাহাই মানুষকে

'মানুষ' করে। একান্ত প্রাণে যে ভাল হইতে চায় তাহার শত্রু কেহ নাই। সংসারের সকল পদার্থকেই সে ভালবাসিয়া বন্ধু বলিয়া অলিঙ্গন করিতে পারে। কাহা হইতেও সে ভয় পাইবে না, তাহার কোন দ্বিধা নাই, সংশয় নাই। যাহার হৃদয় পবিত্র, জগতের প্রত্যেক পদার্থ তাহার কাছে পবিত্র, সকল দিন শুভ, সকল ঘটনাই মঙ্গলকর।

মানুষ যে জীবন লাভ করিতে একান্ত চেষ্টা করে, সম্পূর্ণ না হউক, কিছু পরিমাণে তাহা লাভ করিবেই। এ জীবনে না হইল, আমার হৃদয়ের শক্তিই অনন্ত জীবনে আমাকে মহীয়ান্ করিবে। শুধু একান্ত চেষ্টা; আশা এবং উদ্যমই উন্নতির প্রাণ। অনন্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, মানবের উন্নতিও অনন্ত। অনন্ত জীবনের তুলনায় আমাদের এই জীবন কি ক্ষুদ্র নহে?

ভোগ পরিত্যাগ এই নহে যে, সংসারের সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়ের সরসতা বিসর্জ্জন দিয়া শুষ্ক কঠোরচিত্ত হইতে হইবে। রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন, 'আমি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি এবং সর্ব্বদা সাবধানে থাকি, যেন আমার মন তাঁহা হইতে একটুকুও টলিতে না পারে। তাঁহাকে লইয়া যিনি সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, সংসার এবং কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন না হইয়া মুক্তির কারণই হইয়া থাকে। ভোগ পরিত্যাগ বলিতে ভোগের বাসনা পরিত্যাগ। বাসনা পরিত্যাগেই বাসনার তৃপ্তি, আত্মজয়েই মানবের মহত্ব। হৃদয় যাঁহার সংযত, জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি লাভ করিয়া সুখ অপেক্ষা মঙ্গল সাধনই যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই শ্রেষ্ঠ। শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম যেখানে একত্র সম্মিলিত সেই তো জগতের আনন্দনিকেতন। যখন বিশ্বের ইচ্ছার সঙ্গে মানবেচ্ছার সম্মিলন হয় তখনই আমরা পরম কল্যাণ লাভ করি।

কর্ম্ম যেখানে স্বার্থের গণ্ডি গড়িয়া আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, অজ্ঞানতার অন্ধতা সেখানে বিপথ হইতে বিপথে, আঁধার হইতে আঁধারে—ভয়াবহ অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে। সংসার তাহারই কঠোর বন্ধন; মৃত্যুর ক্ষুধিত পিপাসা তাহারই জন্য অপেক্ষা করে। সেই তো সংসারের পেষণযন্ত্রে প্রাণান্ত যাতনায় নিষ্পেষিত হইয়া রক্তাক্ত বিদীর্ণ হৃদয়ে বাহির হয়। মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণ, অমৃতত্ব, সংসারের নানা প্রভুর দ্বারে কখনও মিলে না। প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘুরিয়া মিলিবে কেবলি শ্রান্তি, দুঃখ, অবসাদ, শূন্যতা। কিন্তু এ খেলা যে খেলিতে জানে তাহার ক্ষোভ কখনও হইবে না। সংসারে যিনি অনাসক্তচিত্ত, তিনিই সন্ন্যাসী; বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি ভোগ করেন তিনিই বৈরাগী; ভগবানের কর্ম্ম জানিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার হৃদয়ে যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই কর্ম্মী। প্রেম যাঁহার কর্ম্মের প্রাণ, জ্ঞান যাঁহার কর্ম্মকে চালনা করে, এবং শক্তি কর্ম্মে পূর্ণতা দান করে তিনিই কর্ম্মী।

জগতে যে কর্ম্মহীন অলস, তাহার চিররুদ্ধ হৃদয় আনন্দ ও প্রেমের আলোকে কখনও উদ্ভাসিত হইবে না। যাহার সরল উদার হৃদয় প্রেমপূর্ণ আনন্দে বিশ্বজগত আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল, বিশ্বপ্রাণের আকুল আহ্বান মধুর সঙ্গীতে যাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়াছে সেই তো সকলকে পাইয়াছে। তাহার যে বর্জ্জন করা নাই; শুধুই গ্রহণ করা, আলিঙ্গন করা। প্রভুর প্রেম-অঞ্জনে নয়ন যাঁহার দৃষ্টিলাভ করিয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া যিনি প্রেমপূর্ণ, আনন্দ তাহার অন্তরে বাহিরে, দৃষ্টি তাহার চতুর্দ্দিকে প্রেম ও আনন্দ বিতরণ করে।

মানুষ সংসারের সকল কর্ম্ম অনাসক্ত পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্ম বলিয়াই পালন করিবে। ধর্ম্ম, অর্থাৎ সকল কর্ম্মের তিনিই প্রভু, তাঁহার কর্ম্ম পালন করিব আমি, ইহাই আমার ধর্ম্ম।

তাঁহার শক্তিতে আমার শক্তি অনন্ত, তাঁহার আনন্দে আমার হৃদয় আনন্দ-অমৃত-পূর্ণ। তাঁহার আলোকে তিনি আমার হৃদয়ে জীবন্ত সত্যরূপে প্রকাশমান। তাঁহারই আনন্দে ও প্রেমের আদেশে জগতে আমি মহাকর্ম্মী, তিনিই মহাসারথী, বিশ্বজগত চালাইতেছেন তিনি। সকলই তাঁহার, আমিও তাঁহারই। তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়াই তাঁহার কর্ম্মে আমার আনন্দ। তিনি আমারই আছেন অনন্ত—অনন্ত কাল। "তিনি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাঁধা নাই ভুবনে।" তাঁহার

মিলন-অমৃত-প্রেমে সকলকে আমি পূর্ণরূপে পাইব। তাই সংসারে আমাদের কোন বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, শোক দুঃখ ভয় দ্বিধা সংশয় নাই। আনন্দ অমৃতরূপে তিনিই সকলের প্রাণ।

"জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়-নাথ হৃদয়-হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতি খচিত চরণ প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়ম-পথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেম পরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান।"

শ্রীসুধাসিন্ধু সেনগুপ্ত।

প্রার্থনা।

১

উঠিছে মরণ তান,
কাঁপিছে মানব প্রাণ,
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে আজি চলিছে শ্মশান,
কোথায় অলক্ষ্যে আসি,
মরণ হুঙ্কারে বসি,
ডেকে ডেকে আজি নাথ চাহিছে পরাণ,
চলিছে অনন্তে সবে, দিও পদে স্থান।

২

আমি— মরণে না করি ভয়
মরিলে যে শান্তি হয়
শুধু এ প্রার্থনা টুকু রেখো নারায়ণ!
যেন প্রভু মোর তরে
কেহ নাহি দুঃখ করে
মৃত্যু যেন করে মোরে স্নেহ সম্ভাষণ,
তব কোল পাই যেন করিতে শয়ন।

৩

তুমি মোরে লহ হরি,
মোহের বাঁধন ছিঁড়ি
লহ গো তুলিয়া কোলে, অন্তিম-শয্যায়!
ছাপায়ে জীবন-বেলা
আজি কি সৌন্দর্য্য মেলা
পড়িব ঝাঁপায়ে আজি অনন্ত আশায়,
দিও স্থান প্রভু মোরে অন্তিম-শয্যায়।

৪

যবে ঘনঘটা নীলাকাশে
চমকি চপলা হাসে,
নিবিড় নীলিমা মিশে নীলিম রেখায়,
যখন ধরণী-তল
ছাপাইয়া বহে জল
বহিয়া স্রোতের ঢেউ জগৎ ভাসায়,
আমিও চাহিয়া থাকি অনন্ত আশায়।

৫

যখন সুনীলাকাশে
বিমল চাঁদিমা ভাসে
ডুবে যায় ধরা খানি সেই জ্যোছনায়,
যখন প্রকৃতি রাণী
সুনীল আঁচল খানি
আলসে মেলিয়া দেয় দিগন্তের গায়,
আমিও চাহিয়া থাকি অনন্ত আশায়।

৬

তোমারি করুণারাশি
অনশ্বর অবিনাশী,
বাঁচিয়া রয়েছে জীব সেই স্নেহ ছায়,
তোমার কোমল বুকে
যেন গো ঘুমাই সুখে
অনন্ত পিপাসা যেন অনন্তে মিশায়।
তব নাম লয়ে আজ
নিশিব অনন্ত মাঝ
বহিছে তোমারি স্নেহ আমার হিয়ায়,
অন্তিমেতে দিও স্থান চরণ-ছায়ায়।

কুমারী সুধেন্দুমুখী রায়।

স্পর্শমণি।

৪

বাঙ্গালার চৌকিদার।

বহুলোক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকের দ্বার উদ্ঘাটন করিল; দেখিল, চোর আর কেহ নহে, স্বয়ং সন্ন্যাসী—সিদ্ধ-পুরুষ শিবানন্দ স্বামী।

কালীবাড়ীর সন্নিকটে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশ্রিত নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক বাস করিত; মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে কালীদেবীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। সেই সময় "চৌকিদার! চৌকিদার!" এই চীৎকারধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু কোথায় চৌকিদার? সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত! বহু ডাকাডাকির পর চৌকিদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সে শয্যার উপর বসিয়া বিরক্ত ভাবে কহিল "কি হয়েছে? কে তোমরা এত রাত্রে?"

দ্বারে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি হয়েছে? এই বুঝি তোর চৌকিদারী?"

তখন ব্যবস্থা কড়াকড় দেখিয়া চৌকিদার উঠিয়া আস্তে ব্যস্তে দ্বার খুলিয়া দিল। ধীরে ধীরে কহিল, "একটু দাঁড়াও না, তামাক খেয়ে নিই!"

এক ব্যক্তি রোষ ভরে উত্তর করিল, "আবার তামাক? শীঘ্র চল্, এখন আর তামাক খেতে হবে না!"

তখন চৌকিদারকে লইয়া তাহারা দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেই সময় চৌকিদারের বীরদর্পে কালীদেবীর অঙ্গন পরিপূর্ণ হইল। সে এক লম্ফে গিয়া সন্ন্যাসীর লম্বা জটা ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। তাহার মধ্য হইতে দেবীর বহুমূল্য মুক্তামালা বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গীকে ঠকাইয়া সে বোধ হয় তাহা নিজেই গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছিল।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, পুজারীর অনবধানতা বশতঃ তাঁহার শয়নের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীর চেলা রামা তক্তপোষের নীচে পলাইয়া ছিল, এবং গভীর রাত্রে আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া সন্ন্যাসীর গৃহ-প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

সেই স্থানে চোর-সন্ন্যাসীকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ও পাহাড়ার ব্যবস্থা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় থানায় সংবাদ দিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ একি! জলদ-মধ্যবর্ত্তিনী দামিনীর ন্যায়—পাপ অন্ধকারে পুণ্যজ্যোতির ন্যায়, সহসা সেই স্থানে পরম রূপ-লাবণ্যবতী এক তরুণী আবির্ভূতা হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার কেশ আলুলায়িত—বসন অর্দ্ধমলিন; মুখখানি অশ্রুজলে অভিষিক্ত। শরীরে বেশভূষার চিহ্ন-মাত্র নাই, তথাপি কি এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

সে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল ভাবে কহিল—"পিতঃ! আমাকে রক্ষা করুন!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্ষণেক বিস্ময়ে নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

রমণী উর্দ্ধমুখে কাতরস্বরে কহিল,—"আমার নাম স্বর্ণ। আমি আপনার কন্যা—আমাকে প্রাণে বধ করিবেন না।"

৫

কষিত কাঞ্চন।

এই নবাগত রমণী সন্ন্যাসীর ভার্য্যা। সন্ন্যাসীর প্রকৃত নাম শিবনাথ দাস, বিবাহান্তে সে শ্বশুরালয়েই বাস করিত। নিতান্ত দারিদ্র্য বশতঃ স্ত্রীকে স্বীয় আলয়ে লইয়া ভরণপোষণ করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল, সুতরাং নির্ব্বিবাদে সস্ত্রীক শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস ব্যতীত উপয়ান্তর ছিল না। কিন্তু রাত্রিতে তাহাকে প্রায়ই গৃহে দেখা যাইত না। গঞ্জিকার আড্ডায় সঙ্গীদলের মধ্যে অনেক রাত্রিই কাটিয়া যাইত। কদাচিৎ নিজ গৃহে শুভাগমন হইলে ভর্ৎসনা প্রহার প্রভৃতিই পত্নীর অঙ্গের আভরণ হইত।

স্বর্ণ সাবিত্রীতুল্যা সাধ্বী। স্বামীর শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রূষা কার্য্যে

নিরত ছিল, কখনো মুখ ফুটিয়া পতিকে কোন কথা বলিত না, কিংবা প্রাণান্তেও পতির নিদারুণ অত্যাচার-কাহিনী কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। নীরবে সকলই সহ্য করিত। কেবল সজল নয়নে,—করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া আপনার নীরব বেদনা জানাইত। সে দৃষ্টি কত কোমল—কত মধুর—কত প্রাণস্পর্শী! তাহাতে পাষাণও দ্রব হইতে পারিত! কিন্তু পাষাণ অপেক্ষা নির্দ্দয়, কঠিনহৃদয় শিবদাসের নিকট সকলই নিষ্ফল হইয়াছিল। ধন্য বঙ্গের পতিব্রতাগণ! তোমাদের পুণ্যেই বঙ্গভূমি উজ্জ্বল ও পবিত্র।

একদিন রাত্রি প্রভাতে শিবদাসকে মদ্যপানে অজ্ঞানাবস্থায় একটি নর্দ্দামার মধ্যে পতিত দেখা গেল। শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে গৃহে আনিয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। সে দিন অপমানিত শিবদাস রাত্রিকালে উগ্রমূর্ত্তিতে পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল এবং অকথ্য ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সাধ্বী পতির পদতলে পতিত হইয়া করুণ স্বরে নানা অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। পাষণ্ড স্বর্ণকে নির্দ্দয় ভাবে পদাঘাত করিয়া এবং স্বর্ণের জিনিষ পত্র টাকা পয়সা যাহা পাইল সংগ্রহ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় সতী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া পতিতা রহিল! তাহার নিদারুণ দুঃখের অশ্রু ধূলিতেই নীরবে মিশাইল। হায়, যিনি জগতের পতি তিনিই চিরদুঃখিনীর একমাত্র অবলম্বন।

সন্ন্যাসী সাজিলে যেমন বিনা কষ্টে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করা যায় এমন আর কিছুতেই নয়। সুতরাং শিবদাস এই পথই অবলম্বন করিল। সে কোন এক দূরবর্ত্তী প্রদেশে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হইল এবং অতি সহজেই মান সম্ভ্রম ও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল।

এদিকে স্বর্ণ পতির চিন্তায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। পিতৃগৃহে সে একবস্ত্র পরিধান, একাহার, কখনো বা অনাহারে কাটাইতে লাগিল। কন্যার ক্লেশ দেখিয়া পিতা জামাতার বহু অনুসন্ধান করাইলেন। কিন্তু সন্ধান মিলিল না।

সাধ্বী যখন শয্যায় শয়ন করিয়া পতির জন্য চক্ষুর জলে উপাধান সিক্ত করিত, সেই সময় শিবদাস হয়ত গৈরিক সমাবৃত হইয়া কাহারও কিছু অপহরণ করিতে পারে কিনা তাহারই অবসর অন্বেষণে ব্যস্ত হইত।

মেলা স্থলে বহুলোকের সমাগম হয়। যদি ভাগ্যবশে সেখানে নিজ হারানিধির সন্ধান পাওয়া যায়, এই আশায় পতিব্রতা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে সহোদর সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে দুইদিনের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছে।

সেই মাধুর্য্যময়ী প্রকৃতি-বুকে নৈশ সমীর প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মপুত্র-সলিল উছলিয়া উছলিয়া ছল ছল রবে ছুটিতেছিল। বঙ্গনারীর কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি যেন তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

সাধ্বীর করুণ মলিন মুখখানি, অশ্রুসিক্ত বিষাদ-ভারাবনত দৃষ্টি, এবং দীন হীন বেশ দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাণ করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল। শিবদাসের জীবন-কাহিনীও তাঁহার নিকট অবিদিত রহিল না।

তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে চোরকে ক্ষমা করিলেন, এবং ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর না করে, এ বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাকে স্বর্ণের সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। স্বর্ণের মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোমরা তাড়াতাড়ি নৌকা খুলে চলে যাও মা, কি জানি কে আবার প্রতিবাদী হয়!"

বহু ঝড় বৃষ্টির পর প্রকৃতি যেমন শান্তিলাভ করে, স্বর্ণ তেমনই আজ বহুদিন পর আপনার বাঞ্ছিত ধন লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিল।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরই রাত্রি প্রভাত হইল। সে দিন শিবদাস স্ত্রীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহারই প্রদর্শন করিল। স্বর্ণ স্বামীর নিকট ইহাও প্রত্যাশা করে নাই, সুতরাং যতটুকু পাইল তাহাতেই সে কৃতার্থ হইল। তাহারা সেই রাত্রিতে আহারাদির পর নদীর এক স্থানে নৌকা রাখিল, পরদিন বাড়ী পঁহুছিবে। সামান্য

বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য সঙ্গে ছোট একটি তুরুম্ ছিল। পথ খরচের টাকাও তাহার মধ্যে রাখা হইয়াছিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। তীরে বৃক্ষ লতা গুল্ম নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। সারাদিন পাখীর কলরব, নৌকারোহীদিগের কোলাহলে শ্রান্ত হইয়া তাহারাও যেন নিদ্রা যাইতেছিল। কিন্তু শিবদাসের চক্ষে নিদ্রা নাই। পত্নী ও তাহার ভ্রাতা গভীর নিদ্রায় অচেতন। মাঝিগণ অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিল, তাহারাও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

শিবদাস অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিল। পথখরচ ও বস্ত্রাদির তুরুম্‌টি কক্ষে গ্রহণ করিয়া মৃদু পাদক্ষেপে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইল এবং একটি সংকীর্ণ পথ লক্ষ্য করিয়া নিমেষ মধ্যে অন্ধকারে দ্রুতগতিতে কোথায় মিশাইয়া গেল।

(৬)

ভাব বিনিময়।

আরও পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিতা মাতার ও পিসিমাতার স্নেহ-অঙ্কে লালিতা মৃণ্ময়ী ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। শুক্ল পক্ষীয়া শশিকলার ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন দিন দিন অধিকতর লোক-মনোমোহিনী হইয়া উঠিতেছে।

মৃণ্ময়ী এখন আর চঞ্চলা বালিকা নহে। নিজের অবস্থা সে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে পিসিমাতার নিকট সে অনেক শিক্ষা করিয়াছে। ধর্ম্মপুস্তকের মধুর ব্যাখ্যা একমনে শুনিয়াছে। তাহার অনুপম লাবণ্যে কি এক গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত হইয়াছে।

কেবল একজনের চক্ষু তাহার এ সৌন্দর্য্য অতৃপ্ত নয়নে দেখিত,—দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিত। বাল্যের স্নেহ কি এক অবর্ণনীয় মাদকতায় পরিণত হইয়াছে। সে ব্যক্তি প্রমথনাথ রায়। বয়স তেইশ বৎসর,—বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পিতা মাতার শত চেষ্টাও তাহাকে বিবাহ করাইতে সমর্থ হইল না। উত্তরাভিমুখী দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার ন্যায় তাহার দৃষ্টি একদিকেই নিবদ্ধ রহিল।

কিছুদিন হয় জমীদার গণেন্দ্রনাথ রায় ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অত্যধিক বিলাসপ্রিয়তাই তাঁহার এই অকাল মৃত্যুর কারণ।

আজকাল এদেশে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত নহে। অনেকেই আপন আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিতেছেন। মৃণ্ময়ী নবম বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়াছে, বন্ধুগণের পরামর্শে শ্যামাপ্রসন্ন দত্ত মৃণ্ময়ীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। এ সংবাদ প্রমথনাথের অগোচর রহিল না। বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর এখন সে অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং সে মনে করিল যে, বাঞ্ছিত রত্ন লাভে এখন আর তাহার কোন বাধা নাই।

কিন্তু মৃণ্ময়ীর মনের ভাব কে বুঝে? যেন দৈববল প্রভাবে কি এক অলৌকিক শক্তি এই তরুণীর প্রাণে আবির্ভূত হইয়া আত্মীয় স্বজনের সকল যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলিয়া সে গ্রহণ করিল।

জ্যৈষ্ঠমাস। প্রচণ্ড রবিতাপে ধরা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আম্রকানন বালক বালিকাদের আনন্দ বাগানে পরিণত হইয়াছে। পুত্রার্থিনী মহিলারা ষষ্ঠীর আরাধনায় রত রহিয়াছেন। বঙ্গের প্রতিপল্লী ষষ্ঠীদেবীর আবাহন ধ্বনি, শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদে পরিপূর্ণ। কোথায়ও পুণ্যানুষ্ঠানের প্রতিনিধি পুরোহিত ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত অক্ষর শোভিত তালপাতার পুঁথি। উহার এক বর্ণও তাঁহার বোধগম্য নহে। তিনি শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ কোন মতে কণ্ঠস্থ করিয়া সরস্বতীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের মন আকর্ষণ তো চাই। সুতরাং তিনি শীঘ্রই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন। সুযোগ পাইয়া ক্ষুদ্র শিশু হেলিতে দুলিতে হাসিতে হাসিতে পূজার নৈবেদ্য লইয়া পলায়ন করিতেছে। জননী যষ্টি হস্তে তাহাকে তাড়া করিতেছেন।

শ্যামাপ্রসন্নের গৃহিণীও ষষ্ঠীদেবীর আরাধনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পুরোহিতের কন্যা অবলা একটি ক্ষুদ্র শিশু ক্রোড়ে লইয়া পতিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আগমন করিয়াছে। অবলার বয়স একণে সপ্তদশ

বৎসর। মৃণ্ময়ীর অনুরোধক্রমে তাহার বাল্যসখীকে ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

আহারান্তে দুই সখী উভয়ের মনের কথা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল! কথা আর ফুরায় না; কতদিনের পর সাক্ষাৎ! উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক জীবনের সুখ দুঃখের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। রৌদ্রের উত্তাপ কিছু কমিয়া আসিয়াছে। তবু যেন চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অবলা কহিল, "উঃ, কি গরম!" মৃণ্ময়ী কহিল,—"চল না বাগানে যাই, সেখানে বেশ ঠাণ্ডা।" উভয়ে—ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি-শোভিত উদ্যান মধ্যে যাইয়া তৃণাসনে উপবেশন করিল। তাহার নিকটেই দীর্ঘিকা। সুশীতল বায়ু সর্ সর্ রবে সরোবরের সলিল প্রতিহত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

দুই সখীর মধুর অলাপ, ক্রমে আরও যেন মধুরতর হইয়া উঠিল। অবলার দুই বৎসর বয়স্ক শিশু মা'র স্কন্ধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

তাহাদের কথা কিছু বুঝিতে না পারিয়া খোকা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইল, মৃণ্ময়ী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে লাগিল। অদূরে জলের মধ্যে দু'একটি প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম কণ্টকাকীর্ণ মৃণালে শোভা পাইতেছিল। দু'একটি ভ্রমর গুণ্ গুণ্ রবে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, খোকার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল, সে বাম হাতে মৃণ্ময়ীর চিবুক ধরিয়া কহিল—"মি!"

শিশুর আধ আধ সুমিষ্ট বাক্যে মৃণ্ময়ীর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া কহিল,—"কি, খোকা বাবু!"

খোকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পদ্ম ফুল দেখাইয়া কহিল,—"মি—ফু—,"

মৃণ্ময়ী। একটি ফুল চাই?

খোকা উচ্চ হাসির লহর তুলিয়া কহিল—"মি,—ফু।"

মায়ের নিকট এ আব্দার খাটিল না। অবলা আপন কোলে খোকাকে টানিয়া লইয়া কহিল,—"না, ও ফুল দিয়ে কি হবে!" খোকা নিজ ইচ্ছায় বাধা পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ফুঃ"—।

অবলা ধমক দিয়া কহিল,—"ভারি তো আদুরে ছেলে,—যা দেখ্‌বে তাই চাই। এই একটা আম নে।" নিকটে দু' একটি আম পড়িয়া ছিল।

খোকা মাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে আম দূরে নিক্ষেপ করিল। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"ফু—ফু. দে—"

মৃণ্ময়ী খোকাকে আদর করিয়া কহিল, "আমি ফুল এনে দিচ্ছি খুকুমণি!"

অবলা কহিল,—"তুমি কেন পার্‌বে ভাই? ওখানে কত জল! অবলা সাঁতার জানিত না।"

মৃণ্ময়ী। তুমি তো জান ভাই আমি সাঁতার কাট্‌তে কত ভালবাসি, গ্রীষ্মের সময় রোজই তো বিকাল বেলা গা ধুয়ে থাকি। ফুল অনায়াসেই এনে দিতে পারব।

শ্যাম পত্রাবলীর মধ্যে রক্ত পদ্ম সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মৃণ্ময়ী অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সে সন্তরণ করিয়া একটি পদ্ম তুলিয়া লইল।

কমল ছিন্ন করিবামাত্র বৃন্তচ্যুত মৃণাল এলাইয়া তাহার বস্ত্র জড়াইয়া ধরিল। মৃণ্ময়ী এক হাতে তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একটি ছাড়াইতে না ছাড়াইতে অপরটিতে তাহার পা আট্‌কাইয়া গেল। যেন তাহারা নিত্য সঙ্গিনী সরোজ সুন্দরীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। মৃণ্ময়ী ক্লান্ত হইয়া জল মধ্যে নিমগ্ন প্রায় হইল। অবলা সখীর বিপদ বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে স্থান হইতে তাহাদের বাড়ী একটু দূরবর্ত্তী সুতরাং তাহার চীৎকারধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন বেলা শেষ হইয়াছে।

এমন সময় এক অশ্বারোহী যুবক সে স্থানে উপস্থিত হইল। মুক্ত বায়ু সেবনার্থ সে নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া বেড়াইতে যাইতেছিল। অবলার চীৎকার-ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র সে ব্যক্তি অশ্বের গতি ফিরাইয়া অবিলম্বে সেস্থানে উপস্থিত হইল। এই যুবক প্রমথনাথ রায়। প্রমথ দ্রুত অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই বলিষ্ঠকায় যুবা অনায়াসেই মৃণ্ময়ীকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল।

অবলা ও প্রমথের যত্নে মৃণ্ময়ী শীঘ্র সুস্থ হইল। সে অবনত মুখে সলজ্জ ভাবে নীরব রহিল।

প্রমথ অতৃপ্ত নয়নে সেই অবনতমুখীর রূপ-মাধুরী দেখিতে লাগিল। স্থির কাদম্বিনীর ন্যায় জলসিক্ত চিকুর-দাম গুচ্ছে গুচ্ছে পৃষ্ঠে,বক্ষে ও কপালে এলাইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মুখ খানি মেঘমণ্ডলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সলিলসিক্ত বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চন্দ্রকলার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ দীপ্তি পাইতেছে! প্রমথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"মৃণ্ময়ী!" সে স্বর কি কোমল,—কি বেদনাপ্লুত!

মৃণ্ময়ী একবার নিজ পদ্ম-পলাশ-নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বীয় প্রাণদাতার মুখ পানে চাহিল। কিন্তু চারিচক্ষু মিলিত হইবা মাত্র সে দৃষ্টি আবার ভূতলে নিবদ্ধ হইল।

প্রমথ কহিল,—"মৃণ্ময়ি, আমার একটি ভিক্ষা!"

মৃণ্ময়ী।—কি বলুন!

প্রমথ।—শুনিবে তো?

মৃণ্ময়ীর ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদু স্বরে কহিল,—"কি কথা?"

প্রমথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। মুখ তুলিয়া কি বলিবে বলিবে মনে করিতেছে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। কে যেন বাধা দেয়। জিহ্বায় যেন জড়তা আসে। একবার সতৃষ্ণ নয়নে মৃণ্ময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল—আবার অবলার দিকে চাহিল। পরে কি ভাবিয়া চিন্তিয়া আস্তে আস্তে বলিয়া ফেলিল—"মিন, এভাবে আর কত কাল কাটিবে?"

মৃণ্ময়ী লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে চাহিল। তাহার মুখে আর কোন কথাই সরিল না।

মৃণ্ময়ীকে নীরব দেখিয়া প্রমথের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, একটু সাহস পাইল। আর একটু অসঙ্কোচের সহিত কহিল,—"বিধবা বিবাহ তো দেশে প্রচলিত!" এবার মৃণ্ময়ীর যেন চেতনা হইল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আমি আপনার ভগ্নী। আমাকে সেই ভাবেই দেখিবেন।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রমথের হৃদয় যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে আর বিরুক্তি না করিয়া অশ্বারোহণে দ্রুত প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর জ্বরবিকারে মৃণ্ময়ীর মাতার মৃত্যু হইল। কন্যার বৈধব্যজনিত বিষম ক্লেশ আগ্নেয় গিরির নিরুদ্ধ অগ্নির ন্যায় তাঁহাকে দিন দিন দগ্ধ করিতেছিল। আজ মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল বেদনা অপসারিত করিয়া দিল।

মাতার মৃত্যুতে পতিহীনা অভাগিনী মৃণ্ময়ী বড়ই আকুল হইয়া পড়িল। স্নেহময়ী পিসিমা আরও অধিকতর স্নেহে ও যত্নে বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনী বসু।

ঢাকা মহিলা-কলেজ।

সম্প্রতি ঢাকার প্রস্তাবিত মহিলা-কলেজ সম্বন্ধে কাগজ পত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। অনেকেই নানা সূত্র ধরিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। এইরূপ কার্য্য সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে জনসাধারণের মতামত গ্রহণীয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সরল বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সর্ব্বদাই আদরণীয় হইয়া থাকে। কেবল প্রতিবাদ করিবার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কোন সৎকার্য্যে বাধা দেওয়া একান্ত অনুচিত। যে যে সম্প্রদায়ে নারীর উচ্চ শিক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বিবেচিত হয় সেই সেই সম্প্রদায়ের মতামত সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য হওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দু সমাজ স্থিতিশীল সমাজ। বংশানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা ভাল মন্দ

নির্ব্বিশেষে অবশ্য পালনীয়, ইহাই এ সমাজের অস্থি-মজ্জাগত ধারণা। এ সমাজে কোন বিষয়ে সংস্কার করিতে গেলেই চতুর্দ্দিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। আমরা যে এখনও জগতের বহু নিম্নস্তরে পড়িয়া আছি, ইহাই তাহার প্রমাণ। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মধ্যযুগে মানুষ সর্ব্বদাই সংস্কার কার্য্যকে বিদ্‌ঘুটে ভাবিয়া তাহার বিরুদ্ধে তুমুল কাণ্ডকারখানা বাধাইয়াছে। কিন্তু দুই একজন মনস্বী ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তির দ্বারা তখন সেই সেই সংস্কার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাকল্যাণ সম্পাদন করিয়াছে। মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে ততই তাহারা নব নব কার্য্য ও নব নব সংস্কারের ভাবকে সাগ্রহে হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছে। ইহাই জাতীয় জীবনের লক্ষণ। চীন ও জাপানের মূলশক্তি এখানেই। শিক্ষা ইহাদের চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়াছে। ইহারা নব আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। কোন্‌টী বর্জ্জন ও কোন্‌টী গ্রহণ করিলে জাতীয় জীবন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা যে জাতি বুঝিতে সক্ষম হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হয় তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে। যাহা গ্রহণীয় তাহা তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইবে এবং যাহা বর্জ্জনীয় তাহা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হইবে। যে জাতির মধ্যে এই নির্ব্বাচন-শক্তি পরিস্ফুট হয় তাহারাই সৌভাগ্যবান্। চীনবাসীগণ যখন বুঝিতে পারিল, আফিং তাহাদিগকে নির্জ্জীব করিয়াছে তৎক্ষণাৎ সেই আফিং বর্জ্জন করিয়া নবশক্তি সঞ্চয়ের সূত্রপাত করিল।

এইরূপে চীনাগণ এখন তাহাদের সমুদায় আবর্জ্জনা দুর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহারা জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী এত স্থিতিশীল জাতি যে আজ এক শতাব্দীর উপর হইল উন্নতিশীল ইংরাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তেমন কিছু অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা মুমূর্ষুর অবস্থা। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন বহুল পরিমাণে হইতেছে বটে, কত পাশ্চাত্য উপাদেয় গ্রন্থ সমূহ পঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞানলাভ হইতেছে কই? আজও সমাজবক্ষ হইতে আবর্জ্জনা দুর করিতে চেষ্টা করিলে অমনি চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। আবর্জ্জনাকে আবর্জ্জনা বলিয়া জানিয়াও যে জাতি এবং সমাজ তাহা পুষিয়া রাখিতে চায় তাহাদের উন্নতি সুদুর-পরাহত। একশত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষাও ভারতবাসীর জড়ত্ব ঘুচাইয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিল না। ইহার কারণ কি? এখনও কেন আমরা সৎকে সৎ বলিয়া চিনিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতে পারিতেছি না? সে শক্তি কেন জাগিতেছে না? কেন ভীরুতা আসিয়া প্রত্যেক সৎকার্য্যকে বাধা দিতেছে?

শুনিতে পাই, ময়মনসিংহ সহরে যখন প্রথম জলের কল স্থাপনের কথা হয় তখন বহু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্কোবল বিল পাশের সময় কলিকাতায় যে কি বীভৎস কাণ্ডের অবতারণা হইয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আজ পর্য্যন্তও সমাজ হইতে কোন দুর্নীতি দুর করিবার কথা উঠিলে তাহার সপক্ষে সভা সমিতি গঠিত হইতে থাকে। এখনও দেশ কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা এইসব ঘটনাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

নারীগণ শিক্ষিতা না হইলে এ দেশের গত্যন্তর নাই। অশিক্ষিতা নারীই ভারতের দুর্দ্দশার কারণ। শিক্ষিত পুরুষগণ অশিক্ষিতা নারীর সংস্পর্শে সমুদায় সদ্ভাবগুলিকে একে একে হারাইয়া ফেলেন, তাই তাঁহাদের দ্বারা দেশের তেমন কিছু উন্নতি হইতে পারিতেছে না। অশিক্ষিতা নারী সমাজকে ও দেশকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিয়াছে। দুই বিভিন্ন-প্রকৃতি প্রাণী কখনই তেমন সুন্দর ভাবে সংবদ্ধ হইতে পারে না, তাই আমাদের গৃহ অশান্তির আলয় হইতেছে। পুরুষ কত বড় বড় কথা ভাবিতেছেন কিন্তু গৃহে তা'র সায় পাইতেছেন কই? তাই তাঁহাদের জীবন ম্লান হইয়া পড়িতেছে। অতএব জাতিকে উন্নত করিতে হইলে পুরুষ ও নারী উভয়কেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সমাজকে স্থিতিশীল হইয়া থাকিলে চলিবে না। যেখানে স্ত্রী-শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে সেখানেই আমাদের সহানুভূতি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সমালোচনার অর্থ ইহা

নয় যে কেবলই প্রতিবাদ করা। প্রথমতঃ আমরা অনেকেই নারীগণের উচ্চশিক্ষার বিরোধী। নারীগণ উচ্চশিক্ষা পাইলে একটা কিম্ভূৎ কিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইবে ইহাই অনেকের ধারণা। অজ্ঞতাই ইহার কারণ। অনেকেই শিক্ষিতা মহিলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নহেন, কেবল বাহির দেখিয়াই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। স্থিতি-শীলতাই ইহার একমাত্র কারণ। নূতন যাহা তাহারই উপর একটা বিতৃষ্ণার ভাব সমাজে বর্ত্তমান। ঢাকায় একটী মহিলা-কলেজ স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকার প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, এইরূপ না হইয়া ঐরূপ হউক; আবার কেহ বলিতেছেন, ঐরূপ না হইয়া এইরূপ হউক ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, এই রকম কলেজ করিলে কেবল এক সম্প্রদায়ের লোক লাভবান্ হইবেন, তাহাতে সমগ্র হিন্দুসমাজের কি লাভ হইল? বাল্য-বিবাহরূপ কঠিন বন্ধন ছেদন না করিলে কোন দিনই তাঁহারা লাভবান্ হইবেন না। সমাজ সংস্কার না করিলে তাঁহারা চিরদিনই ঠকিবেন। সে জন্য দোষী কে? উন্নতি-স্রোতের দিকে যে সমাজ আপনাকে ছাড়িয়া দিবেন তিনিই জয়ী হইবেন, অন্যথা কেবল দুঃখ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে।

ঢাকা মহিলা-কলেজকে যতদূর সম্ভব আদর্শ কলেজে পরিণত করিতে চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে সমবেত সাহায্যের প্রয়োজন। সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে পুরুষ ও নারীর শিক্ষা একরূপ হওয়া উচিত নহে। ইহা ঠিক্ কথা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে সে প্রশ্ন উঠিবার সময় আসে নাই। যেখানে এক হাজার নারীর মধ্যে কেবল একটী মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে এবং যেখানে শিক্ষা সুরু হইতে না হইতেই কন্যাগণ পরিণীতা হইয়া গৃহে আবদ্ধ হয় সেখানে এ প্রশ্ন আদৌ উঠিতে পারে না। লেখা পড়া শিক্ষা করাই এখনকার সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত।

মহিলা-কলেজটী যতদূর সম্ভব—বস্তি (পাড়া) হইতে দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়, খোলা স্থানে হওয়া উচিত। যাহাতে বাহিরের লোক সর্ব্বদা মহিলাগণের চলাফেরা দেখিতে না পারে এরূপ স্থানে হওয়া কর্ত্তব্য। বস্তির মধ্যে স্কুল স্থাপিত হওয়াতে অনেক সময় ছাত্রীগণকে বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রীগণও যে কম বেগ পাইয়াছেন তাহা নহে। অতএব কলেজটী সহরের মধ্যে না হইয়া বাহিরে হওয়ার প্রস্তাবটী সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়।

মহিলাগণ যাহাতে শারীরিক ব্যায়াম করিতে পারেন এরূপ সুবন্দোবস্ত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষিতা অনেক মহিলারই শরীর ভগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম অথচ সেই পরিমাণ শারীরিক ব্যায়ামের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। মহিলা-কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে মহিলাদের বাহিরে খেলার আয়োজন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক স্কুল কলেজেই মেয়েদের শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই বন্দোবস্ত না করিলে আমাদের গৃহ পরিবার কতকগুলি রুগ্ন অল্পায়ু জীবের আবাসস্থল হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

কলেজ ইংরাজ-মহিলার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়ার বিরোধী অনেকে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার সাহায্যে শিক্ষিতা ইংরাজ-মহিলার পরিচালন কার্য্য খুব ভালরূপ চলিবে বলিয়া মনে করি। ইংরাজ রমণীগণের Discipline রক্ষা করিবার শক্তি বঙ্গ রমণী অপেক্ষা বেশী বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহাদের এই শিক্ষা মাতার স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই হয়। আমাদের নারীগণের সে শক্তি যেন এখনও ভাল করিয়া ফোটে নাই। কলেজের শিক্ষা যেমন সুপ্রণালীমত হইবে সেইরূপ Discipline থাকা নিতান্ত উচিত। যিনি কলেজের Lady Principal হইবেন তাঁহার যেমন উচ্চ শিক্ষা থাকিবে সেইরূপ তাঁহাকে ভাল Disciplinarian হইতে হইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' করিয়া Disciplineকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দূষণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। Discipline অগ্রে, শিক্ষা তাহার পশ্চাতে।

নারী-শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে। নারী-হিতৈষী মাত্রেই ইহাতে আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব শক্তি নিয়োজিত করিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীকুমুদা দেবী।

না হয় একটী দিন
থাক সখে! প্রতীক্ষায়,
দেখিব জন্মের মত
যদি কিছু করা যায়।

শ্রীবীর-কুমার-বধ-রচয়িত্রী।

আপত্তি।

জীবনের কত সাধ—
কতই মহতী আশা;
কতই নীরব প্রীতি,
কতই অস্ফুট ভাষা;

জাগিছে মরম তলে
কিছুই হ'লনা, হায়,—
তুচ্ছ ধূলিরাশি সম
তা' কি হেলা করা যায়?

সহসা ডাকিছ ও কে,'
লয়ে যেতে পর পার,
(এলায়ে পড়িছে দেহ
আঁখি ভরা অন্ধকার!)

আমি বা কেমনে যাব
অপূর্ণ যে ভব-খেলা,
এখনি ভাঙিবে কেন
এখনি কি গেল বেলা?—

যত যাহা চেয়েছিনু
এখনো আসেনি হাতে,
হয়নি'কো জানা শুনা
সাধের সাথীর সাথে;

অসমাপ্ত কত কার্য্য,
অসম্পন্ন আশা শত,
এখনি যাইব কেন
উদাসীন পান্থ মত?

স্বর্গীয়া বিরজাসুন্দরী সিংহ।*

বিরজা কিঞ্চিৎ অধিক ২৪ বৎসরকাল আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা সম্বন্ধে দুই একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। পিতা ৺ হরমোহন বসু মহাশয় সম্বন্ধে চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুত পূর্ণানন্দস্বামীর নিকট যে একটী গল্প শুনিয়াছি তাহা হইতে তিনি কিরূপ দেব-চরিত্রের লোক ছিলেন বুঝিতে পারা যায়। সে আজ অনেক দিনের কথা—তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কসবা সহরে বাস করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে আফিসের সময় স্বামীজি তাঁহার গৃহে উপনীত হন। স্বামীজির আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তিনি কাছারি হইতে চলিয়া আসিলেন এবং আফিসের কাপড় না ছাড়িয়াই কক্ষে নিয়া নিজ হাতে তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আপনি নিজ হাতে তামাক সাজিয়া দিবেন, এ কেমন কথা! চাকর ডাকিয়া দিন।' তখন তিনি নিকটস্থ বিছানার উপর নিদ্রা-নিমগ্ন মলিন বস্ত্র-পরিহিত কোন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঐ চাকর এরূপ আয়াসের সহিত নিদ্রা যাইতেছে—তাহাকে কষ্ট না

---

* গত ২১শে পৌষ আমাদের এই শ্রদ্ধেয়া বন্ধু অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ, জয়সিদ্ধি নিবাসী স্বর্গীয় হরমোহন বসু মহাশয়ের কন্যা, আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সুপ্রসিদ্ধ ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ এম, এ, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। শ্রাদ্ধ বাসরে শোকার্ত্ত পতি স্বর্গীয়া মহিলার যে জীবনী পাঠ করেন তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

দিয়া বরং আমিই তামাকু সাজিয়া দিলাম, ইহাতে দোষ কি?" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া পূর্ণানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, তিনি কত দেশে ঘুরিয়াছেন, কত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এরূপ অমায়িক লোক আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। তাঁহার চরিত্রে এমন এক চিত্তবিমোহিনী শক্তি ছিল যে যিনি তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। জননী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, সমগ্র হৃদয়খানি দিয়া তিনি অপরের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এরূপ পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। যে সকল গুণ ইঁহার চরিত্রকে এরূপ স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়াছিল তাহা যে তাঁহার বাল্যজীবনের সুশিক্ষার ফল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার জীবন সম্পূর্ণরূপ আড়ম্বরশূন্য ছিল। বাহিক বেশ বিন্যাস কিম্বা বাগাড়ম্বর তিনি আদবেই পছন্দ করিতেন না; বরং লোকসমাজে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই অধিক ভালবাসিতেন; অথচ, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় কখনও বিশেষ কোনরূপ আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে তাঁহাকে পড়িতে হয় নাই, তথাপি এই ২৪ বৎসরের মধ্যে একটি কপর্দ্দকও অযথা ব্যয় কিম্বা অপব্যয় করিয়াছেন এরূপ দেখি নাই। অতি সামান্য জিনিসখানাও যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেন এবং কোন না কোন সময় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া নিজের সন্তানদিগকে মিতব্যয়িতা ও দ্রব্যের যথার্থ ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতেন। এত বড় সংসারের পরিচালনার ভার একা তাঁহারই উপর অর্পিত ছিল, অথচ তিনি এই কার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন যে আমার গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেকের দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করিয়াছে। এক দিকে যেমন একটী পয়সাও অপব্যয় সহ্য করিতে পারিতেন না অপর দিকে আবার উচিত ব্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। আমার উপার্জ্জিত অর্থ যথেচ্ছ ব্যবহারে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। মাসান্তে তাঁহার হাতে আমার বেতনের টাকা দিয়াই আমি খালাস ছিলাম। কত সহস্র সহস্র টাকা তাঁহার হাতের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিয়াছে অথচ তিনি তাহা হইতে একটী টাকাও পৃথক্ করিয়া রাখেন নাই কিংবা সঞ্চয় করিয়া যান নাই। আমার নিকট তাঁহার সরল, স্বচ্ছ ও অকপট হৃদয়ের কিছুই লুক্কায়িত ছিল না। অনেক সময়ই তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, 'চুরি করিবার সুযোগ ঘটে নাই, তাই আমি সাধু, এ কোন কাজের কথা নয়। দেখ, অপরাপর স্ত্রীলোকের মতন হইলে আমি কত হাজার হাজার টাকা সরাইয়া রাখিতে পারিতাম ও গোপনে কত গহনা তৈয়ার করিতে পারিতাম—অথচ আমি এক পয়সাও এমন কোনরূপে ব্যয় করি নাই, যে জন্য আমি উঁহার নিকট লজ্জিত হইতে পারি।' তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি আমার নিকট উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হৃদয়ের মধ্যে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সময় সময় আমি বাধা দিয়া কত বলিয়াছি,—'আমিতো তোমার নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাই নাই—তবে কেন?' উত্তরে তিনি বলিতেন, 'তাহা বলিলে কি হইবে? আমি যে না বলিয়া থাকিতে পারি না—ইহা আমার স্বভাব।'

কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের ইনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা অতি বিরল। পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের আহারের পূর্ব্বে তিনি আহার করিতেন না। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে ২টা ৩টার পূর্ব্বে তিনি কখনও আহার করেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য কোন সময়ই তেমন ভাল ছিল না। এই আহারের অনিয়মে শরীরটা আরও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার দরুণ অনেক সময় আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে দেরি হইয়াছে; দিবা কি রাত্রি তিনি একই ভাবে অভুক্ত অবস্থায় আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন দেখিতে পাইয়াছি। এই প্রকারে কত দিন যে অভুক্ত অবস্থায় কাটাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

পরিবারস্থ সকলের প্রতিই তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল। বিশেষতঃ শিশু সন্তানদিগের প্রতি এরূপ দৃষ্টি

রাখিতে খুব কম জননীকেই দেখা যায়। তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন এবং তাহাদের ব্যবহারের কাপড় জামা ইত্যাদি নিজ হাতে সেলাই করিতেন ও সর্ব্বদা সাবানে কাঁচিয়া পরিষ্কার রাখিতেন। সচরাচর শিশুদিগের যে সকল ব্যারাম হইয়া থাকে আমার পুত্রকন্যাগণকে খুব কমই ঐ সকল ব্যারামে ভুগিতে হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'আমার যত্নেই এরা টিকিয়া আছে।' এই অপরিমিত পরিশ্রম ও অনিয়ম বশতঃ অসময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রোগে কষ্টে সহিষ্ণুতা ও বিপদসম্পদে যে নির্ভরশীলতার তিনি পরিচয় দিয়াছেন তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। বহুকাল কঠিন রোগে দুর্ব্বিসহ কষ্ট পাইয়াছেন এবং উপর্য্যুপরি চারি বার ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র চালনা করিতে হইয়াছে, কোন বারই তাঁহার মুখে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার এই সাহসিকতার কথা ডাক্তার বাবুদের মুখেও শুনা গিয়াছে।

ধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল অথচ ইহার বাহ্যিক প্রকাশ তিনি একবারেই ভালবাসিতেন না। একবার কলিকাতা গমন কালে আমাদের জাহাজ পদ্মার মধ্যে ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আসন্নমৃত্যুর ভয়ে জাহাজস্থ যাত্রীবৃন্দের সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া—তাঁহার মুখে কিন্তু অপূর্ব্ব নির্ভরের ভাব প্রকটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার শিশুসন্তানগণের সেই সময়কার প্রার্থনা উহাদিগের উপর জননীর পূত চরিত্রের প্রভাব যে কতটা বিস্তৃত হইয়াছে যাত্রীদিগের নিকট তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ অবস্থান কালে আমি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। রোগ সংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল। শুনিতে পাই, অনেকেই নাকি আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সময় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নির্ভরশীলতার ভাব তাঁহাকে স্থির রাখিয়াছিল। ক্রমে আমি যখন আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলাম তখন বলিলেন, 'আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, ইহা আমি জানি।' এই সংস্কার ক্রমে তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। নানা কারণে কিছুকাল যাবৎ আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, আর্থিক হিসাবেও কখন কখন আমাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। এই সকলের দরুণ যখনই তিনি আমাকে কোনরূপ বিমনা দেখিয়াছেন, কিম্বা আমার অবর্ত্তমানে তিনি কোথায় কিরূপে বাস করিবেন তাহা আমার এক ভাবনার বিষয় হইয়াছে—এরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই হাসিমুখে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন; 'ঈশ্বর আমাদের যথেষ্ট দিয়াছেন, সময় চলিয়াই যাইবে, তাহার জন্য ভাবনা কি? আর কে আগে যাবে, কে পরে যাবে তাহাইবা কে বলিতে পারে? আমার জন্য তোমার ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই।' তিনি সতী সাধ্বী রমণী ছিলেন। সত্য সত্যই তিনি আমার ভাবিবার প্রয়োজন রাখিলেন না।

অর্থের অসচ্ছলতাও অচিরাৎ দূর হইবে বলিয়া কত আশ্বাস দিয়াছেন এবং সত্য সত্যই তাহাই হইয়াছে। মনে হয়, যেন তিনি পূর্ব্ব হইতেই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর ও জননীর অকস্মাৎ দেহত্যাগ তাঁহার প্রাণে বড়ই যাতনা প্রদান করিয়াছিল। কালে শোকের আবেগ প্রশমিত হইয়া আসিল, বাহ্যিক কোন কার্য্যে অন্তরের ব্যথা প্রকাশ পাইত না, কিন্তু অনেক সময়ই তিনি কথাচ্ছলে আমাকে বলিয়াছেন, 'আমার মা চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা দেখিবে, এক বৎসরের মধ্যে আমিও মাতার অনুগমন করিব।' এই কথা শুনিয়া কখনও কখনও আমার মনে ভয় হইত, কিন্তু আবার যখন বলিতেন, 'আমি চলিয়া গেলে আমার শিশুসন্তানদিগের কি হইবে, তাহাই ভাবি।' এই কথায় মনে করিতাম, সন্তানের মমতা মাতৃশোকের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। হায়! তখন আমি বুঝিতে পারি নাই, তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্যই এই বাক্ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার প্রতি তাঁহার অপরিসীম আকর্ষণ ছিল; বুঝি মা-ই তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

জননীর সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় দুঃখ যে সন্তানের বিচ্ছেদ—বিধাতা তাহাও তাঁহাকে দিয়াছিলেন। আমাদের প্রথমজাত সন্তানকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশম মাসেই, জগজ্জননী তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। তিনি পরিবার-রচনার প্রারম্ভেই এই শোকের তীব্র অনলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ছিল। তৎপর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, মুন্সীগঞ্জ অবস্থান কালে নয় বৎসর পাঁচ মাস বয়সের সময় দ্বিতীয় পুত্র বিমলচন্দ্র ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। বিমলের ডাক নাম ছিল বুড়। তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখচ্ছবিটীর ভিতর এমনই এক চিত্তাকর্ষক শক্তি ছিল যে পরিবারস্থ সকলেই তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট ছিল। রাত্রি দশটার সময় রোগের আক্রমণ, আর রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই এই নশ্বর জগতের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমরা চিকিৎসার কোন সুযোগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলাম না। বুড়র অকস্মাৎ দেহত্যাগে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তখন আরো দুটি শিশুও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন মরণের সান্ধস্থলে উপনীত। আমি শোকে অধীর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলাম। এই ভীষণ বিপদের মধ্যেও তিনি বিচলিত হন নাই, বরং উহা ধৈর্য্যচ্যুতির সময় নয়, এরূপ বুঝিতে পারিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন এবং সমধিক ধীরতা ও সাহসিকতার সহিত রোগী শিশুদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মুখে শোকের চিহ্ন মাত্রও প্রকাশ পাইত না। অন্তরের বেদনা অন্তরেই চাপা থাকিত। কেবল গভীর নিশীথে সকলে যখন নিদ্রায় নিমগ্ন হইত তখন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস, হৃদয়ে যে কি দারুণ আঘাত পাইয়াছেন তাহার পরিচয় প্রদান করিত।

তাঁহার সমুন্নত হৃদয়ে কোনরূপ কুসংস্কার স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ভগবানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রবল ধর্ম্মানুরাগ যে ফল্গু নদীর ন্যায় নিরন্তর তাঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, জীবনের প্রতিকার্য্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বুড়র দেহত্যাগের পর এই ভাব সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। নিয়মিত উপাসনায় আমার মধ্যে শিথিলতা লক্ষিত হইলে তিনি আমাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না। সন্ধ্যার সময় আমার গৃহে পারিবারিক সম্মিলন ও উপাসনাদিতে যোগদান করিয়া অনেকে কত সুখ ও আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। এই সকল শুভ কার্য্যের মূলেই তিনি ছিলেন, অথচ কখনও কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইতেন না।

আত্মগোপন ও আত্ম-বিলোপকারী অনুরাগ এই উভয়বিধ গুণের একত্র সমাবেশ তাঁহার চরিত্রকে বড়ই মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। অথচ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভে সমর্থ হন নাই; ইহার কারণ ছিল, তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও সত্য-প্রিয়তা। কপটতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ সরল হৃদয়ে কপটতার স্থান ছিল না। অন্যের মধ্যেও তিনি ইহা দেখিতে পারিতেন না, যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইতেন না।—এবং স্পষ্ট কথা বলিতে কাহাকেও ছাড়িতেন না। Let justice reign though heaven falls (স্বর্গ ভূপতিত হউক, তবু ন্যায় অটুট থাকুক) ইহা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই নীতির অনুসরণ করিয়া কত সময় অপরের বিরাগভাজন হইয়াছেন, আমিও সময় সময় কত বিরক্ত হইয়াছি। কিন্তু পরে দেখিয়াছি, আমারই ভুল; এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, অসঙ্গত রূপে রূঢ় বাক্য কাহারো প্রতি ব্যবহৃত হয় নাই।

পবিত্রতার উপর তাঁহার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে, বরং শত সহস্র অসুবিধার মধ্যেও তিনি বাস করিতে রাজি ছিলেন তথাপি, এমন কোন কার্য্যে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না, যাহাতে পারিবারিক জীবনের উপর মলিনতার সামান্য ছায়াটুকু পড়িবারও সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তিনি সারাদিন কলের মতন খাটিয়াছেন, অনেক সময় অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যের উপর আবার পাচক ও ভৃত্যের কার্য্যও একা তাঁহাকে

সম্পন্ন করিতে হইয়াছে, তথাপি কোন চাকরাণী নিযুক্ত করিতে দেন নাই। তিনি বলিতেন, 'স্খলিত-চরিত্র স্ত্রীলোকের আগমনে বাড়ীর হাওয়া পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়।' চাকরাণী রাখিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেই বলিতেন, 'দুষ্টগরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল অনেক ভাল, ইহা বড় সারবান কথা।'

পারিবারিক জীবনের পবিত্রতার তিনি যে এক আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ব্যতিক্রম করিয়া একবার যে বিপদে পড়িয়াছিলাম এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি। বাল্যকালে কতিপয় ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গ-লাভ আমার জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমি সর্ব্ব প্রকার মাদক নিবারিণী সভার সভ্য হই এবং সর্ব্বপ্রকার আমোদ হইতে দূরে থাকি। এমন কি, যাত্রাগানে যোগদানও আমাদের ঐ মণ্ডলীর নিকট গুরুতর অপরাধের কার্য্য ছিল। কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরও ঐ ছাত্র জীবনের প্রভাব জীবনের উপর কার্য্য করিতেছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতও আমার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিল। কেবল যাত্রাগান শ্রবণে কোনরূপ আপত্তি ছিল না। আমার জীবনে এমন কোন আসরে যোগদান করি নাই যেখানে নৃত্য গীত বাদ্যে বাজারের স্ত্রীলোকের আমদানী হইয়া থাকে। একবার মালদহ অবস্থান কালে আমার কোন সমশ্রেণীর কর্ম্মচারী বন্ধুর বাটীতে সান্ধ্য সমিতিতে ঐরূপ গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম—আপত্তি উত্থাপন করিয়া চলিয়া আসিতে আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। বন্ধুগণ বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি যখন কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজি হইলাম না তখন তাঁহারা বল প্রকাশ করিয়া আমাকে তথায় আটকাইয়া রাখিলেন। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা কাল পর তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। গান বেশ ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু আমার স্ত্রী জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, এই চিন্তাই আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছিল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট এই বিষয় বলিলে তিনি যে আমায় কতই ভর্ৎসনা করিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সারারাত্রি কতই কান্নাকাটি করিলেন। আমার ওজর আপত্তি কিছুই তিনি শুনিলেন না। এমন কি, আমার সংস্পর্শে পর্য্যন্ত আসিতে তিনি ভয়ানক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। সে রাত্রির ঘটনা এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নয়। ইহার পরে কতবার বলিয়াছেন, 'আমি কাছে না থাকিলে তুমি কবে নরকে ডুবিয়া যাইতে।' তাঁহার পুণ্যময় প্রখর জ্যোতিঃ যদি আমার জীবনকে বেষ্টন করিয়া না রাখিত তবে আজ আমি কোথায় পড়িয়া থাকিতাম, কে জানে? তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র চিত্র-পট খানা আমার নিকট প্রকাশিত ছিল। ইহার মধ্যে কখনও কালিমার রেখা দেখি নাই। দময়ন্তীর চরিত্রে সতীত্ব প্রভাবের কথা শুনিয়াছিলাম; সতীত্বের যে কি মহোগ্র তেজ ইঁহার জীবনে আমি তাহা অনুভব করিয়াছি। বিধাতা তাঁহার দৈহিক রূপ লাবণ্য প্রদানে কোনরূপ কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। অনেক সময় রূপ বিপদ টানিয়া আনে। কার্য্যব্যপদেশে যদি কখনও তাঁহাকে একা বাটীতে রাখিয়া মফঃস্বল যাইবার সময় আমি কোন-রূপ চিন্তার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছি, তিনি সগর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আমার সম্মুখে কুভাবে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে এমন কোন দুষ্ট পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মায় নাই।' বাস্তবিকই তাঁহার এই রূপ-রাশির ভিতর দিয়া এমন এক সতীত্বের অনলপ্রতিম তীব্রজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত যে, মলিন বাসনা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাঁহাকেও জীবনে এরূপ কোন পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হয় নাই।

দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের দ্বিতীয়া কন্যা রমলাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'দোষ দেখাইয়া যিনি ভর্ৎসনা করেন তিনিই পরম বন্ধু ও আপনার জন বলিয়া জানিবে। দোষ দেখিয়াও যে চুপ করিয়া থাকে সে তো পর। দরদ হইলেই প্রিয় জনের দোষ দেখিলে প্রাণে ব্যথা পায়, আর তাহা দেখাইয়া দেয়। এরূপ বন্ধুজনের কথায় মুখ ভার না করিয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।' এই তাঁহার শেষ উপদেশ, ঈশ্বর করুন, এই উপদেশ বাণী তাঁহার সন্তান-দিগের অন্তরে যেন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। স্বতা-

বস্তুতঃ আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। সম্প্রতি ২।১ দিনের জন্যও আমি মফঃস্বলে গেলে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। শেষকালটা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, এক মিনিটের জন্যও আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না। বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই বার ডাক পড়িয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'কেন জানি না। ইচ্ছা হয়, তুমি আমার নিকটে বসিয়া থাক।' তখনও বুঝিতে পারি নাই, বিদায়ের কাল এত ঘনাইয়া আসিয়াছে! শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পূর্ণজ্ঞান তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে তিনি পরম পিতার অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে সময় তাঁহার মুখে মধুর হাসি সংমিশ্রিত এক জ্যোতিঃ প্রকটিত হইয়াছিল, সেই জ্যোতিতে গৃহখানা আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হৃদয়বিহারী ভগবান পূর্ব্বেই তাঁহাকে যাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আত্মাটিকে তুলিয়া লইলেন।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা।

(পচনোৎপাদনের কারণ।)

এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল দ্রব্যেরই প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন বস্তুই এই পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পায় না। এই পরিবর্ত্তন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দ্রব্যের পচনই দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন আমরা চক্ষু কি জিহ্বা দ্বারা এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি তখনই উহাকে পচন বলি।

আহারীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ রন্ধন করা দ্রব্য এই কারণেই শীঘ্র পচিয়া টক হইয়া যায়। আমাদের বঙ্গবাসী অধিকাংশ গৃহস্থেরই, আহারীয় দ্রব্য এক বেলা কি একদিন বা দুইদিন রাখিয়া আহার করিতে হয়। অধিকাংশ দরিদ্র গৃহস্থই এক বেলার অন্ন ব্যঞ্জন অন্য বেলা আহার করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকার আহারীয় দ্রব্য আছে যাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ সেগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আহার করা নিত্য প্রয়োজন হয় সুতরাং সেগুলি সংরক্ষা করিয়া না রাখিলে চলে না। কিন্তু সেগুলি যদি পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা আহার করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, সেজন্য খাদ্যদ্রব্য কি উপায়ে রাখিলে পচনের হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় তাহা বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(১) বায়ুর অম্লজানই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তন বা পচন উৎপাদনের প্রধান বস্তু। ভূ-বায়ু সকল স্থানেই আছে, সুতরাং সকল দ্রব্যই বায়ুর সংস্রবে আছে এবং সর্ব্বদায়ই সকল দ্রব্য বায়ুর অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং যে দ্রব্যে যত কম বায়ু লাগে তাহা তত বেশীক্ষণ ভাল থাকে। অনেকেই লেবু ও আম্র প্রভৃতির আচার দীর্ঘ দিন রাখিয়া আহার করিয়া থাকেন। একটী লেবু কি আম্র খোলা বায়ুতে রাখিলে কয়েক দিন মধ্যে পচিয়া যায়; কিন্তু তৈল কিম্বা শির্কা মধ্যে রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে। তার্পিণ তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের বাষ্প অম্লজান শোষণ করিতে পারে, তাহাদের বর্ত্তমানে আবদ্ধ বায়ুতে কোন দ্রব্য রাখিয়া দিলে অনেক দিন ভাল থাকে। সকলেই সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন, কোন ব্যঞ্জন কি ডাল কি অন্য কোন রন্ধন করা দ্রব্য দুই পাত্রে রাখিয়া যদি একটী নাড়াচাড়া করিয়া রাখা যায় ও অন্যটি নিস্পৃষ্ট অবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে যেটী নাড়াচাড়া করা হইয়াছে সেটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ও অপরটী একেবারে সত্ত অবস্থায় না থাকিলেও অনেক ভাল থাকে। তৈল ও লবণ মাখাইয়া রাখিলে মৎস্য সহজে পচিয়া নষ্ট হয় না। কারণ মৎস্যে তৈলের একটী বায়ু-রোধক আবরণ পড়ে, তাহাতে বায়ুর অম্লজান পচন উৎপাদন করিতে পারে না।

বায়ুতে অম্লজান মুক্তাবস্থায় আছে এজন্য বায়ুতে যে সকল দ্রব্যের শীঘ্র পচন হয় তাহাদিগকে অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি অম্লজানের রাসায়নিক যৌগিক বাষ্প মধ্যে মগ্ন রাখিলে

বহুকাল ভাল থাকে। আবার অমিশ্র অম্লজান কিম্বা ঘনীভূত অম্লজান বাষ্প মধ্যে রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য বায়ুতে পচন অপেক্ষা অল্পক্ষণ মধ্যে পচিয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যবক্ষার জান ও জলজান প্রভৃতি অম্লজান বিহীন বাষ্পে মগ্ন করিয়া রাখিলে বহুকাল ঠিক অবস্থায় থাকে। তৈল ঘৃত অনাবৃত রাখিলে যত শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ হয় উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখিলে তত শীঘ্র নষ্ট হয় না। ডিম্ব ও দুগ্ধ কৌশলক্রমে বায়ুশূন্য স্থানে রাখিলে প্রায় ঠিক অবস্থায় থাকে কিন্তু বায়ুতে রাখিলে কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ঘটনা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে অম্লজানবিশিষ্ট ভূবায়ুই খাদ্য দ্রব্যাদির পচন উৎপাদনের প্রধান কারণ, সুতরাং যে দ্রব্যে যত কম বায়ু লাগে তাহা ততই ভাল থাকে। এই জন্যই আমাদের সাধারণ গৃহস্থ গৃহিণীরা মুড়ি চিড়ে প্রভৃতি পাকা হাঁড়ি বা কলসীতে * রাখিয়া থাকেন ও তাহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে। বিস্কুট, বিলাতি জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি বায়ুশূন্য স্থানে থাকে বলিয়াই দীর্ঘকাল ঠিক অবস্থায় থাকে।

(২) আর্দ্রতা পচন উৎপাদনের আর একটী কারণ। কিন্তু শুধু আর্দ্রতা কিম্বা শুধু বায়ুতে পচন জন্মাইতে পারে না। পচন উৎপাদন কালে এ দুয়েরই মিলন হইয়া থাকে। চাউল অগ্নিতে পাক করিয়া ভাত ও মুড়ি দুইই প্রস্তুত হয়; কিন্তু মুড়ি ভাল করিয়া আবদ্ধ বায়ুতে রাখিলে, অনেক দিন ভাল থাকে কিন্তু এবেলার ভাত ওবেলা দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ হইয়া যায়। কলায়ের ডাল বহুকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু ভিজা কিম্বা রন্ধন করা ডাল কয়েক ঘণ্টা মধ্যে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হইয়া যায়। আবার ঐ ভিজা ডাইলের বড়ী শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। দুগ্ধ কাঁচা রাখিলে অতি শীঘ্র বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হয় কিন্তু জ্বাল দিয়া রাখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে। মাখন আর ঘৃত প্রায় একই পদার্থ; মাখন শীঘ্র নষ্ট হয় কিন্তু ঘৃত অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। একটী আম্র রাখিয়া দিলে কয়েক দিন মধ্যে পচিয়া যায় কিন্তু তাহা শুষ্ক করিয়া আমচুর বা আমসত্ব আকারে রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, আর্দ্রতাও পচন উৎপাদনের আর একটী কারণ।

তাই বলিয়া খাদ্যদ্রব্য কেবল শুষ্ক করিয়া রাখিলেই ভাল থাকিবে, এমন নহে। সাধারণ উপায়ে আমরা খাদ্যদ্রব্য যেখানেই রাখি না কেন একেবারে বায়ুর সংস্রব ত্যাগ করা অসম্ভব। সাধারণ বায়ুতে, বিশেষতঃ পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ুতে অধিক পরিমাণে জল বাষ্পাকারে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। আবার গঁদ, লবণ, শর্করা প্রভৃতি জলশোষক দ্রব্যের একটী না একটী আমাদের সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই বর্ত্তমান আছে। এজন্য উহারা বায়ু হইতে জল শোষণ করিয়া অতি শীঘ্রই নরম হয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা করিতে হইলে কেবল তাহা শুষ্ক করিয়া রাখিলেই হইবে না, সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং বায়ুশূন্য স্থানে না রাখিলে, তাহার পচন নিবারণ করা অসম্ভব।

(৩) উত্তাপ পচন উৎপাদনের একটী বিশেষ কারণ। অনেকেই জানেন, গ্রীষ্মকালে খাদ্যদ্রব্য অতি শীঘ্র পচিয়া যায় কিন্তু শীতকালে খাদ্যদ্রব্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে। কড়কড়া ভাত আর বাসি ব্যঞ্জন শীতকালে গরীবের একটী আদরের খাদ্য। শীতকালে বাসি অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র নষ্ট হয় না। ইহার কারণ উত্তাপ।

তাপ দ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। তাপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের একটী প্রধান উপকরণ; তাপ দ্বারা অতি শীঘ্র দ্রব্যের পরিবর্ত্তন হয়। আমরা নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেও তাপের পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার গতিরোধ করিতে পারি না। এই তাপ আমাদের দেহ হইতে কোন প্রকারে অন্তর্হিত হইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। আবার কোন দ্রব্য তাপ হইতে সম্পূর্ণ অন্তরে রাখিলে, তাহা বহুকাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে।

মৎস্য, মাংস কি অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য বায়ুতে রাখিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বরফ দ্বারা

* পাকা হাঁড়ি—দীর্ঘকাল কোন হাঁড়ি বা কলসীতে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রাখিলে তাহা পাকিয়া যায় বা বায়ুরোধক হয়।

আবৃত করিয়া রাখিলে, বহুকাল ঠিক অবস্থায় থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বহু মৎস্য মফস্বল হইতে বরফে আচ্ছাদিত হইয়া সহরের বাজারে আমদানি হয় এবং তাহা প্রায় ঠিক অবস্থায় থাকে; তাহার কারণ, মৎস্যগুলিকে বরফ ঢাকা দেওয়ায় সেগুলি তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। আবার কোন কোন হিমপ্রধান দেশের লোক মৎস্য, মাংস প্রভৃতি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য বরফ মণ্ডিত করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠিক অবস্থায় রাখিয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বোধ হয় যে, খাদ্য দ্রব্যাদি তাপ প্রভাবে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য খাদ্য দ্রব্য যত শীতল স্থানে—শীতল অবস্থায় রাখা যায় তত কাল ভাল থাকে। আমাদের দেশে বড় বড় সহর ব্যতীত সকল স্থানে সকল সময় বরফ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীঘ্র গলিয়া যায়; সুতরাং এ দেশে খাদ্য দ্রব্য বরফ দ্বারা রাখা অসম্ভব। আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্য শীতল জলের উপর শীতল স্থানে রাখিলে, তাহা অনেকক্ষণ ভাল থাকে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যে পাত্রে খাদ্য দ্রব্য ঐ অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহা যদি সচ্ছিদ্র হয়, তাহা হইলে, ঐ দ্রব্য শীতল থাকিলেও উহা আর্দ্রতা শোষণ করিয়া শীঘ্র পচিয়া যাইবে। সুতরাং মাটীর পাত্রে কিম্বা ঐরূপ কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে ঐ অবস্থায় কোন খাদ্য দ্রব্য রাখা কর্ত্তব্য নহে।

(৪) উল্লিখিত অম্লজান, আর্দ্রতা ও তাপ ব্যতীত শীঘ্র পচনোৎপাদনের আর একটী পদার্থ—পচনোৎপাদক বীজ। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে, ক্রমে ক্রমে তাহা দধি হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধে বিন্দুমাত্র দধি দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই ঐ দুগ্ধ জমিয়া দধি হইয়া যায়। আমাদের দেশের গোয়ালারা ঐ প্রকার দধিবীজ দ্বারা উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দুগ্ধে গো-মূত্র কিম্বা অম্ল দিলেও তাহা শীঘ্র দধি হইয়া থাকে। সদ্য দুগ্ধে ছানার জল দিলে, সমস্ত দুগ্ধ ছানা হইয়া যায়। গুড় কিম্বা চিনি জলে গুলিয়া অথবা খেজুর কি আখের রস কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে শির্কা বা তাড়ি রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বিন্দুমাত্র শির্কা বা তাড়ির ফেনা উহার সহিত মিলিত করিলে তৎক্ষণাৎ উহা ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর নিঃস্ব লোকেরা নেশা করার জন্য মদের পরিবর্ত্তে উহা পান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ হাঁড়িতে যদি পূর্ব্বের দুগ্ধ কিছু লাগিয়া থাকে তবে তৎক্ষণাৎ সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। একারণ আমাদের দেশের গৃহস্থ বা গোয়ালারা, দুগ্ধপাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া অগ্নির উত্তাপে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া রাখে।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পচন উৎপাদক বীজ দ্বারাও খাদ্য দ্রব্য সহজে পচিয়া যায়।

পচনোৎপাদক বীজ প্রায়ই যবক্ষারজান দ্রব্য দ্বারা গঠিত। এজন্য যে সকল দ্রব্যে যবক্ষারজান যুক্ত পদার্থ নাই তাহাদের শীঘ্র পচন হয় না।

পচনোৎপাদক বীজ দ্বারা পচনশীল দ্রব্যকে দ্রুত বেগে পচাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু আবার কতকগুলি পদার্থ এরূপ আছে যে, তাহাদিগকে উক্ত বীজ শীঘ্র পচাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য পচনশীল অন্য দ্রব্যের সহিত মিলিত থাকিলে, উক্ত বীজ দ্বারা শীঘ্র পচিবার গুণ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল ব্যতীত জল ও বায়ুতে সর্ব্বদা ভাসমান অবস্থায় আরও কতকগুলি পচন উৎপাদক বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। যেমন একটী পরিষ্কার নূতন কলসীতে যদি পরিষ্কার জলও রাখা যায় তাহা হইলে ৪।৫ দিন পরে তাহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সঞ্চরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কীট কোথা হইতে আসিল? প্রকৃত পক্ষে কীট জলেই বর্ত্তমান থাকে, কলসীর জলে তাহারা ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে চক্ষুর গোচরীভূত হয়।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পল্লীগ্রামে যে সকল পুষ্করিণী বা ডোবাতে রৌদ্র লাগে না তাহার জল কিছুদিন পরে কাল বা সবুজ বর্ণ হয়। তাহাতে বড় বড় কীট ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়। জলাভাবে অনেক স্থলেই গ্রামবাসীগণ ঐ সকল জল পান করিয়া

ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীট সর্ব্বদাই জলে বর্ত্তমান থাকে। বস্ত্রাদি, শরীর ও খাদ্য দ্রব্যাদি ধৌত করিলে যে ক্লেদ নির্গত হয় তাহা ভক্ষণ করিয়া ঐ সকল কীট জীবিত থাকে ও ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। নির্ম্মল বায়ু রৌদ্র ও স্রোতঃদ্বারা উহারা প্রতি নিয়ত নিধন প্রাপ্ত হয় ও সেই প্রকার প্রতি নিয়ত জন্মিয়া থাকে।

পরিস্রুত বা চোয়ান জল পরিষ্কার পাত্রে নির্ব্বাত স্থানে রাখিলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা ভাল থাকে। কখনই তাহাতে কীট জন্মিতে পারে না।

জলে যেরূপ কোটী কোটী কীটাণু আছে, বায়ুতেও সেই প্রকার অসংখ্য কীট বর্ত্তমান আছে। যেমন, ভাত বা ভাতের মাড় কিম্বা পায়স, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য অনেক দিন রাখিয়া দিলে তাহার উপরে এক প্রকার সাদা দ্রব্য পতিত হয়, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ "ছাতাপড়া" বলি। ঐ ছাতাপড়া দ্রব্য ঐ অবস্থায় আরও কিছু দিন রাখিয়া দিলে, তাহার মধ্যে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বায়ুর কীট। বায়ু-মধ্যস্থ কীটসকল ঐ সমস্ত দ্রব্যে বর্দ্ধিত হইলে আমরা তাহা দেখিতে পাই।

ঘাস ও বৃক্ষাদি বহুদিন এক স্থানে জড়িত থাকিলে, তাহাতেও ঐ প্রকার সাদা বস্তু পতিত হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে ঐ প্রকার বীজকে বৃক্ষাণু বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, উদ্ভিজ্জে জল ও বায়ুর কীটাণুর ন্যায় এক প্রকার কীটাণু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। তাহারা ক্রমে বায়ু ও জলের সংস্রবে বর্দ্ধিত হয়। এই সকল কারণে উদ্ভিজ্জ জাতীয় খাদ্য বহুদিন রাখিলে তাহা পচিয়া যায়।

উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইল যে, বায়ুর অম্লজান, আর্দ্রতা, তাপ, বীজ ও বীজাণু দ্বারা দ্রব্যের পচন উৎপাদন হইয়া থাকে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)।

ইতো নরিসুকের পরিণয়।

(জাপানী গল্প)

ইতো নরিসুক—দরিদ্র, কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা ও জ্ঞানগৌরবে সামুরাই বংশের রত্ন স্বরূপ। সৈনিক বিভাগে তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব না থাকায় তিনি কোন উচ্চ-পদ লাভ করিতে পারেন নাই; কেবল মাত্র বিদ্যাচর্চ্চা ও প্রকৃতি অনুশীলনে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। জ্যোৎস্না ও অনিল ছাড়া তাঁহার অন্য সঙ্গীও কেহ ছিলনা। *

তিনি নীরবে ধৈর্য্যসহকারে মুগ্ধ-অভিনিবেশের সহিত প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় তন্ময় ছিলেন। তিনি ভাবুক ছিলেন সত্য,—কিন্তু কোষ-বদ্ধ অসিখানা সর্ব্বদাই তাঁহার কটিদেশে সংলগ্ন থাকিত, এবং অলসতার মলিনত্ব উভয়ের ঔজ্জ্বল্যে বিন্দুমাত্র দাগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। অসিখানি যেমন উজ্জ্বল চক্ চকে এবং কার্য্যে তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার; ইতো নরিসুকের মন বুদ্ধি ও বিদ্যায় তদ্রূপ উজ্জ্বল ও কর্ত্তব্যে তাঁহার স্বীয় অসি খানিরই সমতুল্য ছিল।

একদিন তিনি কোটোবিকিওয়াম পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থানে বেড়াইতে গিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; যখন ঘন বনের ছায়াচ্ছন্ন একটী পল্লী-পথে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, গোধূলির ধূসর ছায়াচ্ছন্ন পল্লী-পথে গাঢ় আঁধার ডাকিয়া আনিতেছে,—তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নাই,—ক্ষীণ আলোকে পথ দেখিয়া চলা যায়। এমন সময় ইতো তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী পথে একটী তরুণীকে ধীর পাদক্ষেপে চলিতে দেখিতে পাইলেন। ইতো দ্রুত কয়েক পদ চলিয়া তরুণীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কি গন্তব্য পথ হারাইয়াছেন—আমি কি কোন সাহায্য করিতে পারি ?"

তরুণী মরাল-গ্রীবা ঈষৎ ঘুরাইয়া কল-কণ্ঠে উত্তর

---

* এটী জাপানী উপকথা।

করিল—"ধন্যবাদ আপনাকে—সদাশয় বীর! আমি এই নিকটেই যাইব।"

ইতো উত্তর করিলেন,—"আমি এই পথেই গমন করিব, আপনার সহযাত্রী হইতে দিতে আপত্তি আছে কি?"

তরুণী উত্তর করিল,—"বেশ ত, এক সঙ্গেই চলুন। আমি এই স্থানেরই একজন রাজকুমারীর সহচরী, তিনি সদাশয়া ও দয়াবতী।"

ইতো তরুণীর কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন,—তিনি সদ্বংশীয়া ও উচ্চ পরিবারের রীতি নীতিতে অভিজ্ঞা।

দুই জনে কথা বলিতে বলিতে একটী সরু পথের মোড়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। গাঢ় অন্ধকারে দু একটী বিশীর্ণ জ্যোৎস্না-রশ্মি বৃক্ষের পত্রাবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ পথে কোন মতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় তরুণী বলিল,—"আপনি কি এই সরু পথে অত্যল্প দূর যাইয়া আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন?"

ইতো সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দুই জনে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

ইতো এই নির্জ্জন পল্লীতে এতাদৃশ প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোন উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক কোন কারণে কিংবা নির্জ্জন-বাসের সুবিধার জন্য এই অখ্যাত পল্লীতে বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

সুশোভন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তরুণী বিনম্রভাবে বলিল,—"আপনাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ এখানে বিশ্রাম করিয়া যাইতে হইবে; ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি ভিতরে সংবাদ দিতেছি।"—এই বলিয়া তরুণী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইতো দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"জন্মে কখনো ধনী বা সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের সহিত আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই, কখনো তাহা স্বেচ্ছায় অভিলাষও করি নাই, আজ অনুরুদ্ধ হইয়া যখন এ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা কখনো পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।" ইতিমধ্যে একজন প্রৌঢ়া সহ পূর্ব্বের সহচরী ইতোর অভ্যর্থনার্থ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

ইতো তাহাদের সমভিব্যাহারে গৃহের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া গৃহের বহুমূল্য উৎকৃষ্ট সাজ সজ্জাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

রত্নখচিত একখানি আসন ইতোর বসিবার জন্য প্রদত্ত হইল। প্রৌঢ়া বিনয় নম্র বচনে বলিলেন,—"আপনার সদয় ব্যবহারে আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি; আপনিই ত উজিনগর বাসী ইতো নরিসুক?"

ইতো এক জন অপরিচিতার মুখে স্বীয় পরিচয় শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি ত রাজকুমারীর সহচরীর নিকট স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করেন নাই!

প্রৌঢ়া পুনরপি বলিলেন,—"ইতো সামা, আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আজিকার মত এখানেই আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আপনি আমাদের অপরিচিত নহেন,—আপনার পরিচয়াদি আমরা বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের রাজকুমারী দৈবাৎ আপনাকে দেখিতে পাইয়া আপনার প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হন, তদবধি তিনি আপনার চিন্তায় অনুক্ষণ বিমর্ষ থাকিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই জন্য আপনাকে পত্র লিখিয়া আনাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আজ আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে, অদ্যই আমরা রাজকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই,—আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন কি?"

ইতো অকস্মাৎ এই আশাতীত সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই—বিবাহ বিষয়ে আমার অনিচ্ছাও নাই, তবে বিবাহের পূর্ব্বে বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শ লওয়া যুক্তিযুক্ত।"

প্রৌঢ়া সহাস্যে বলিলেন,—"আমাদের রাজকুমারীকে দেখিলে আপনার আর কোন দ্বিধা থাকিবে না,—আজই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আসিয়া বসুন।"

ইতো এবার যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় এবং নানা বহুমূল্য দ্রব্যে নিপুণতা সহকারে সজ্জিত।

গৃহের এবম্বিধ উজ্জ্বল ও মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন;—কিন্তু রাজকুমারী যখন সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, স্বর্গের নক্ষত্র-বালিকা তানাবতার কথা * তিনি শুনিয়াছিলেন, আজ যেন সে-ই সশরীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত! কী রূপ—স্নিগ্ধ ও কোমল! কী শ্রী—শান্ত ও সুষমাময়! কী লাবণ্য—যেন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-তরঙ্গ!

ইতো এত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং অচপল দৃষ্টিতে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন।

প্রৌঢ়া বলিলেন,—"ইতো সামা, ইনিই আমাদের রাজকুমারী। রাজকুমারী, তোমার প্রেমপাত্র ইতো সামার সম্বর্দ্ধনা কর।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ইতোর কর-পল্লব গ্রহণ করিলেন, এবং দুইজন একত্রে একটী টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

প্রৌঢ়া সহচরীকে বলিলেন,—বিবাহের ভোজ্য-দ্রব্যাদি ও পুষ্পদল বর-কন্যার সম্মুখে স্থাপন কর।

যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হইল। ভোজন পরিসমাপ্ত হইলে ইতো প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কন্যার বংশ-পরিচয়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া কন্যার মুখ বিবর্ণ হইল; প্রৌঢ়াও একটু কম্পিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"বংশ-পরিচয় আর আপনার নিকট গোপন করা উচিত নয়, আপনার স্ত্রী হিমিগিমি সামা দেশপূজ্য হিকি জেনারেল শিগিহির কন্যা।"

ইতোর সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল! কী! হিকি জেনারেল!—তিনি কত শতাব্দী পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন!—তাঁহার কন্যা!—একি স্বপ্ন—না মায়া? মা এই চতুর্দ্দিকের ছায়ামূর্ত্তি তাঁহাকে মায়াজালে নিবদ্ধ করিয়াছে!

ইতো বীর পুরুষ, তিনি মুখের ভাবে বা কথায় কিঞ্চিৎ মাত্র ভয় বা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; যেন তিনি মনুষ্যের সহিত নিতান্ত সাধারণ ভাবে কথা কহিতেছেন—এমনই সহজ সুরে বলিলেন,—"হায়! কী বীরত্ব দেখাইয়া হিকি জেনারেল প্রাণত্যাগ করিলেন!"

প্রৌঢ়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন,—"আমাদের প্রভু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, বিপক্ষের তীর আসিয়া তাঁহার ঘোড়ার শরীরে লাগিল, অশ্ব ভূ-পতিত হইতেই তিনি অনুচরবর্গের নিকট দ্বিতীয় ঘোড়া চাহিলেন; যুদ্ধে তাঁহার অক্লান্ত আনন্দ ছিল; কিন্তু অনুচরবর্গ প্রভুর বিপদ বুঝিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়াছিল, তিনি হতাশ হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তীর আসিয়া তাঁহাকেও বিদ্ধ করিল।"

এই কথা শুনিয়া সহচরীও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"হায়! আমাদের দয়ালু প্রভু; তাঁহার অসীম গুণের কথা কে না জানে!"

প্রৌঢ়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—"রাজকুমারীর মাতার মৃত্যুর পর আমার উপরই কন্যার প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয়। আজ আপনার করে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

এই কথার পর প্রৌঢ়া ও সহচরী রাত্রির সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

ইতো তখন পার্শ্বোপবিষ্টা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় তুমি আমাকে প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলে?"

হিমিগিমি। আমি যখন বাল্যকালে ইশিওয়ামের মন্দিরে যাই, তখন আপনাকে প্রথম দেখিতে পাই, তদবধি আমি মুগ্ধ হই; তার পর আপনার দেহের কতবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু আপনাকে পাইবার নিমিত্ত আমি এই এক ভাবেই কাটাইয়াছি।

---

* নক্ষত্র-বালিকা তানাবতার কথা গত বৎসরের ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতো বলিলেন,—"তখন হইতেই তুমি আমাকে ভালবাস ?" হিমিগিমি উত্তর করিলেন,—"প্রাণনাথ, আপনার ভালবাসা বুকে করিয়া আমি কত যুগ যুগান্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আজ আপনি যে আমাকে বিনা বাধায় নিঃসঙ্কোচে প্রাণপূর্ণ ভালবাসা দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন তাহাতে আমার ক্ষীণ অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার বাঁধ আর মানিতেছে না। পদপ্রান্তে রাখিবার অযোগ্যাকে আপনি যে ভালবাসায় বুকে তুলিয়া লইলেন, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় আমার আর কি আছে!"

দুজনের কথাবার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল! এমন সময় কক্ষান্তর হইতে ধ্বনিত হইল, —"আর বিলম্ব নয়—বিদায় লও, সময় সমাগত।"—এই বলিয়া প্রৌঢ়া সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ইতো নরিসুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আজ বিদায় গ্রহণ করুন, আমরা এখনই অন্যত্র যাইব, পুনরায় আপনারা মিলিত হইবেন।"

হিমিগিমি করুণ কণ্ঠে বলিল,—"নাথ, এখন বিদায় চাই। এখনই আমাকে পিতা মাতার কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে—পুনরায় আসিব ; দশ বৎসর পর এই দিনে আপনাকে লইতে আসিব— ততদিন মনে রাখিবেন ত ?"

ইতো ইতিপুর্ব্বেই আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং হিমিগিমির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্রমেই যেন তাঁহার মুখখানি ছায়ার মত বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার মুখের লাবণ্য যেন অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

হিমিগিমি একটী সোণার দোয়াত কলম ইতোর হাতে দিয়া বলিলেন,—"নাথ, এইটী আমার উপহার।" ইতো স্বীয় কটিস্থিত সুদৃশ্য খাপ সমেত অস্ত্রখানি হিমিগিমির হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই লও আমার উপহার।"

ইতো গৃহ হইতে বাহির হইয়া উষার ঈষৎ স্ফুট আলোকে পথ দেখিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং পুর্ব্বোক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া গৃহাদির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। বিপুল অট্টালিকা যেন মায়া-মন্ত্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ; তৎস্থলে ঘনপরিবেষ্টিত বন-গুল্মের অজস্র আবির্ভাব! তিনি যেন চক্ষুকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বারম্বার হস্ত পরিঘর্ষণে চক্ষুর কুহেলিকা অপনয়নের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দৃশ্য পূর্ব্ববৎ,—বন-গুল্মের সুদৃঢ় আচ্ছাদন বই কিছুই নাই।

তরুণ সূর্য্য হাসিয়া উঠিল। তারপর ইতো বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন ; সকলে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল, এবং দেখিতে পাইল, ইতো সর্ব্বদাই একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত দোয়াতের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে বিবাহ করাইয়া তাঁহার মন-স্থৈর্য্য সাধনের সঙ্কল্প করিলেন।

ইতো দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন,—"পৃথিবীর কোন জীবিত রমণীকেই আমার বিবাহের অভিলাষ নাই।"

সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যের আশে পাশে পথিকেরা বহুবার একটী মনুষ্যকে উন্মনস্কের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

দশ বৎসর পর ইতো কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, কিন্তু মৃত্যু-মলিন দেহে একটা গভীর আনন্দের রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শেষ কণ্ঠস্বর মাত্র শোনা গেল,—"এসেছ—তবে চল।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

পারসীদের স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ।

"Who teaches a boy, teaches only an individual; but who teaches a girl, teaches a family."

"একটী বালককে প্রদত্ত শিক্ষা শুধু সেই বালকটীকেই শিক্ষিত করে, কিন্তু একটি বালিকাকে প্রদত্ত শিক্ষা একটি পরিবারকে শিক্ষিত করে।"

এমন দিন বাঙ্গালীদের ন্যায় পার্‌সীদেরও ছিল, যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্ন উঠিলেই জনসাধারণ তীব্র ভ্রুভঙ্গী করিত এবং নানারূপ বিদ্রূপাত্মক উত্তর প্রদানে রক্ষণশীলতা ও অপরিণামদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিত না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যেখানেই শিক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছে সেইখানেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া বিশ্বজনীন ভাব স্বপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। পার্‌সীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল যে মহাপুরুষের প্রাণে, তাঁহার নাম ফ্রেম্‌জী কোবাজী। তিনি বুঝিয়াছিলেন—

"As unto the bow the chord is,
So unto the man is the woman;"

"ধনুকের সহিত ছিলার যে সম্বন্ধ, পুরুষের সহিত নারীর সম্বন্ধও তদ্রূপ।"

মাতার ক্রোড়ে লব্ধ শিক্ষা চিরজীবন মানুষকে চালিত করে, মাতার স্নেহবাক্যে শিখান কথাগুলো শিশুর কোমল প্রাণে অন্তরে অন্তরে বিধিয়া যায়। পৃথিবীর কোনো শিক্ষাই আর এমন কাজ করিতে পারে না—প্রতি লোকের জীবনে ও দেশের জাতীয় জীবনে নারীর ক্ষমতা অসীম।

পুরুষ কর্ম্ম-কর্ত্তা, কিন্তু কর্ম্ম-শক্তি নারী; এই শক্তির সম্যক্ বিকাশ না হইলে কর্ম্ম-কর্ত্তার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত কর্ম্মোদ্যোগ পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা ফ্রেম্‌জী অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একবার স্বজাতির প্রতি, স্বীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার প্রাণে গভীর বেদনার আঘাত বাজিল। সঙ্গীহীন, সঙ্গতিহীন অবস্থায় তিনি প্রথমতঃ স্বীয় পরিবারের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন, এবং উত্তরোত্তর শিক্ষিতমহলে এবিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহারই ফলে Students' Literary and Scientific Society ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হয়। সামাজিক জীবনে ভারতীয় নারীজাতির দুর্দশা-বর্ণিত এবং তাহার উন্নতিকল্পে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞাপক প্রবন্ধাদি পঠিত হইতে লাগিল; সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রে ইহার আলোচনা চলিল, এবং আলোচনা যতই অধিক হইতে লাগিল ততই ধীরে ধীরে সমাজের চিন্তা এদিকে আকৃষ্ট হইল। কেহ কেহ যেমন বুঝিল, আবার অনেকেই তেমন ভ্রুকুটী করিল, হাসিল, এমন কি ভয় প্রদর্শন করিতেও ক্রটী করিল না। পরিশেষে ১৮৪৯ সনে দেশের নির্ভরস্থল, উৎসাহী, উদ্যমশীল, ত্যাগী, আত্মবিসর্জ্জন-পরায়ণ একদল যুবক এই মহৎ কার্য্যের পুণ্যানুষ্ঠানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যোগদান করিল। ইহারা এই কার্য্যের সফলতায় যেন জাতীয় যাবতীয় উন্নতির মূল শক্তি নিহিত দেখিতে পাইয়াছিল; তাই দুঃখ দুর্দ্দশার কঠোর নিষ্পেষণ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া একনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ঘুরিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইতে আরম্ভ করিল এবং দুই একটি করিয়া বালিকা সংগ্রহ করিল। এইরূপে ১৮৪৯ সনের অক্টোবর মাসে চারিটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বালিকার সংখ্যা হইল চুয়াল্লিশ।

আর্থিক সাহায্য মিলিল না; সুতরাং তাহারা নিজেরাই শিক্ষকতার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। ভগবানে নির্ভর করিয়া তাহারা কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, ভগবানই কর্ণধার স্বরূপে অচিরে সুফল উৎপাদন করিলেন। এতদিন যাহারা সকৌতুক দৃষ্টিতে উহাদের কার্য্যাবলী দেখিতেছিল, তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। দিনের পর দিন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া চলিল এবং ক্রমিক সফলতায় কর্ম্মীদলের হৃদয় উৎসাহে, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উহাদের কার্য্যে এমন এক বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রিয়া করিয়াছিল যে, ১৮৯১ সনের আদমসুমারিতে—প্রায় চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে—শিক্ষিতা এবং শিক্ষার্থিনীর গড় সমুদায় পার্‌সী স্ত্রীজাতির অর্দ্ধেকেরও অধিক দেখা গিয়াছে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

উৎসব সম্ভাষণ।*

বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে নিজের কোনো কথা বলিব না; যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই অনুভব দ্বারাই যাঁহাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ও হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদেরই কয়েকটি মাত্র কথা সংক্ষেপে তোমাদের নিকটে প্রকাশিত করিতেছি, তোমরা একাগ্রহৃদয়ে শ্রবণ কর।

তোমরা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছ, এবং কর্ম্মও তোমাদিগকে করিতেই হইবে, না করিলে চলে না; কিন্তু কিরূপ বিদ্যা, কিরূপ কর্ম্ম করিবে? শ্রবণ কর। তাঁহারা বলিতেছেন,—"যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের সন্তোষ হয় সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, এবং যাহা দ্বারা তাঁহার প্রতি মতি-গতি হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা।"

ধর্ম্মের কথা ত খুবই আলোচিত হয়, কিন্তু ধর্ম্মের প্রাণ কোথায়? তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন—"সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহার অনুষ্ঠানে ভগবান্‌কে অহৈতুকী (ফলেচ্ছা রহিত) ও অপ্রতিবদ্ধ ভক্তির উদয় হয়। সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও যাহার দ্বারা ভগবানের কথায় অনুরাগ না জন্মে, সে ধর্ম্ম কেবল ব্যর্থ শ্রম মাত্র।

লোক 'মঙ্গল-মঙ্গল' 'কল্যাণ-কল্যাণ' করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়; দুঃখের তীব্র অভিঘাতে পীড়িত হইয়া তাহার প্রতীকার বাসনায় কোন একটি বস্তু বা উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু হায়! সে যাহাকে অবলম্বন করে তাহাও আর একটি দুঃখ! কিন্তু সে তাহা তখন জানিতে পারে না; এইরূপে লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীভগবান্ এই পরিশ্রান্তকে বলিতেছেন,—

"তীব্র ভক্তিযোগে আমার প্রতি হৃদয় অর্পিত করিয়া স্থির করিয়া রাখ; ইহাতেই পরম মঙ্গলের উদয় হইবে, সংসারে ইহার অধিক মঙ্গল নাই।"

ইঁহার ন্যায় গম্ভীর দুরবগাহ পদার্থ আর নাই। যাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জানিতে পাই, তাঁহারা তাঁহার সেই গম্ভীরতা, সেই দুরবগাহতা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—"তিনি অণু অপেক্ষাও অণুতর, তিনি মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর।" আবার বলিতেছেন,—"তিনি স্থূলও নহেন অণুও নহেন।" তাঁহার এই গম্ভীরতাই লক্ষ্য করিয়া আবার উক্ত হইয়াছে যে, 'মন ও বাক্য তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে।' এই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,—"বহুলোক ইঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং শ্রবণ করিলেও বহুলোক ইঁহাকে জানিতে পারে না; ইঁহার বক্তা আশ্চর্য্য, ইঁহার লাভকারী নিপুণ, ইঁহার উপদেশক আচার্য্য নিপুণ, এবং ইঁহার জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য। এইজন্যই ইঁহার পথকে কবিগণ—মেধাবিগণ দুর্গম বলিয়া থাকেন।" যে বস্তু যত উত্তম, তাহা ততই দুর্গম—তাহা ততই দুর্লভ। সামান্য মঙ্গলও যদি আমাদের দুর্লভ হয়, তখন যিনি মঙ্গলেরও মঙ্গল তিনি যে অত্যন্ত দুর্লভ হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। ভগবান্ একস্থানে বলিয়াছেন—"বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে; এইরূপ জ্ঞানী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনো এক জন সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তগণের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পারে।"

বৎসগণ, তিনি এইরূপ দুর্গম গম্ভীর দুরবগাহ বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই। তিনি একদিকে যেমন দুর্গম, অপর দিকে তেমনই সুগম। তিনি দুর্দর্শ হইলেও সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। ভগবান্ নিজে বলিতেছেন,—"আমি সকলেরই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছি।" আর ঐ শুন বৎসগণ, তিনি অভয় আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—"তাহারা যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে পাইবেই,ইহার অন্যথা হইবে না।" তোমরা ত জান, তিনি আমাদের পিতা; সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে তোমরা বলিয়া থাক,—"পিতা নোঽসি।" কেবল তাহাই নহে; তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের জনক, তিনি আমাদের বিধাতা। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ।" যাঁহার

* বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট বিবৃত উপদেশ।

সহিত আমাদের এরূপ সম্বন্ধ, তিনি কি কখনো আমা-দিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? যে ব্যক্তি একবারও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, "ভগবন্, হে নাথ, আমি তোমার আশ্রিত, আমি তোমার প্রপন্ন, আমি তোমার।" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমি সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে অভয় দিয়া থাকি, উহাই ত আমার কার্য্য!" ভগবান্‌কে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও বলি-তেছেন—"শ্রীভগবান্ সকলের সুহৃৎস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ, এবং আত্মস্বরূপ; তাঁহার চরণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে।"

এ সকল কথা কখনই মিথ্যা নহে। ইহা কবির কল্পনা নহে, ইহা অনুভবকারীর উক্তি। দুগ্ধের মাধুর্য্য যেমন নিজেই অনুভব করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়, লোকের কথায় দুগ্ধ যে মধুর, কেবল এই মাত্রই আমরা জানিতে পারি, কেমন মধুর তাহা জানিতে পারি না, ভগবানের সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহাকে অনুভব করিয়া দেখিতে হয়, এবং অনুভব হইলেই সেই সমস্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। তর্কের দ্বারা—বিচারের দ্বারা তাহা হয় না। দিঙ্মণ্ডল কুহেলিকায় সমাবৃত হইলে পথিকের দিঙ্মোহ উপস্থিত হয়, তখন সহস্র বাক্যের দ্বারাও তাহার সেই মোহ অপনয়ন করিতে পারা যায় না। কিন্তু উদয়াচলের কনক-শিখরাগ্র হইতে দিনকরের কিরণ-রেখা নয়ন পথে পতিত হইবামাত্র নিমেষ মধ্যে জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহার সেই মোহ বিলীন হইয়া যায়, এবং বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া উঠে। অতএব বৎসগণ, ভক্ত ও ভগবানের ঐ সমস্ত কথা তোমাদের নিকটে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভগবানের চরণ-কমলের অনুগ্রহ হইলে একদিন সুস্পষ্ট সত্য বলিয়া তোমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের হৃদয় বড় মলিন, রাগ দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি বিবিধ পাপে সমাবৃত; সেই জন্য ভগবান্ স্বপ্রকাশ হইলেও আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছেন না। মলিন দর্পণে যেমন সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত হয় না, মলিন হৃদয়েও সেইরূপ ভগবানের প্রকাশ হয় না। দর্পণের ন্যায় হৃদয় হইতে এই মলকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। "নয়নরোগ উৎপন্ন হইলে যেমন অঞ্জন প্রদানে সেই রোগ অপনীত করিতে পারা যায়, এবং তাহাদ্বারাই ঐ নয়ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে পারে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "সেইরূপই পুণ্যগাথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা যেমন হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইবে তেমনই তাহা সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পারিবে।" আবার ভক্ত বলিতেছেন— "শরদ্ ঋতু আগমন করিয়া যেমন সলিলের সমস্ত মলকে বিনষ্ট করে, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ প্রপন্নগণের হৃদয় কমলে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত মলকে বিনষ্ট করিয়া দেন।"

এই হৃদয়ের মার্জ্জন—হৃদয় শুদ্ধির দিকে জীবন ব্যাপী প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা সহজ কথা নহে। আমরা নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই পারি। ইহাতে কতশত দোষ রহিয়াছে। উভয় সন্ধ্যায় কয়েক মিনিট 'যেমন-তেমন' করিয়া আসনে উপবেশন করিলেই হইবে না, সমস্ত কার্য্যেই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার জন্য তপস্যা করিতে হইবে, যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। ইহা দুই-তিন-চারি দিনে হইবার নহে, বহুকাল এজন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। হৃদয় লইয়াই সে সমস্ত কথা। হৃদয়ের দোষেই আমাদের বন্ধন, এবং হৃদয়ের গুণেই আমাদের মুক্তি হয়।

বৎসগণ, তোমাদের উপকার হইতে পারে মনে করিয়া এ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি। এক প্রধান ভক্ত ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবন্, লোক ইচ্ছা না করিলেও, কাহার দ্বারা যেন বল পূর্ব্বক প্রেরিত হইয়া পাপ কার্য্য করে?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"ইহা কাম! ইহা ক্রোধ! ইহাকেই এখানে শত্রু বলিয়া জান।" তিনি আর একস্থলে বলিয়াছিলেন—"কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি নরকের তিনটি দ্বার, এবং নিজের বিনা-শের কারণ; অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে।" তোমরা বাল্যকাল হইতে কাম, ক্রোধ ও লোভের নাম শুনিয়া আসিতেছ, এবং তাহাতেই হয়ত ঐ কথা কয়টির গুরুত্ব তোমাদের নিকটে প্রতীয়মান হইতেছে না;

কিন্তু তোমরা একবার ইহা ভাবিয়া দেখ। আমরা অনেক উচ্চ কথা শুনিতে শুনিতে এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ি যে, তাহাদের গুরুত্ব, রমণীয়ত্ব আর প্রকাশ পায় না; তাহার প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধা আসে না। এই পূর্ব্বোক্ত কথাও এই শ্রেণীরই, এবং সেই জন্যই তোমাদিগকে অনুধাবন করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু এখানে তাহা বলিব না। আমি সংক্ষেপেই তাহার সার কথাটি মাত্র বলিব। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের কথা বলা হইতেছে; ইন্দ্রিয় নিগৃহীত অর্থাৎ সংযত না হইলে কখনই চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইবে না, এবং চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, এই আমরা যাঁহাকে পাইবার আশা করিতেছিলাম, তাঁহার আর কোন আশা থাকিবে না; প্রত্যুত সাংসারিক বিষয়েও আমাদিগকে পদে পদে বিপন্ন বা ব্যাকুল হইতে হইবে।

কাম, ক্রোধ ও লোভে লোক ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়; সত্য সত্যই তাহাতে মহাবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়; কাম, ক্রোধ ও লোভে লোক পশুরও অধম হইয়া পড়ে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় শুনিবে? ঐ শোন বালকগণ, পরম কারুণিক ভগবান্ বলিতেছেন— "কোন বিষয় বা বস্তু চিন্তা করিতে করিতে লোকের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে তাহাতে তাহার কাম বা প্রবল তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহার পর ঐ কামের পরিতৃপ্তির যদি কোনরূপে স্বল্প মাত্রও বাধা জন্মে, তবে তখনই ক্রোধের উদ্রেক হয়; ক্রোধ হইলেই সম্মোহ উপস্থিত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন জ্ঞানই থাকে না, এবং সম্মোহেই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এবং এই বুদ্ধিভ্রংশ হইতেই বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়।"

আবার শ্রবণ কর, তিনি আর এক স্থানে কি বলিয়াছেন; তিনি সংসারের লোককে দৈব ও আসুর, অর্থাৎ দেবসদৃশ গুণসম্পন্ন ও অসুরসদৃশ গুণসম্পন্ন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, অসুর লোকগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন:— "তাহারা দুর্দ্দমনীয় কাম অর্থাৎ প্রবল বিষয়োপভোগ তৃষ্ণা আশ্রয় করিয়া দম্ভ, মান ও মদ-যুক্ত হইয়া উঠে, মোহবশত অকল্যাণ আগ্রহে ধারণ করিয়া অশুচি ব্রত গ্রহণ করে। কামোপভোগকেই তাহারা পরমার্থ বলিয়া মনে করে, এবং মনে করে যে, ইহার পর আর কিছুই নাই, ইহাই চরম; তাহারা মরণ পর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে; শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কাম ক্রোধপরায়ণ হইয়া তাহারা কামভোগের নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে যে,—"এই ত আজ ইহা আমি পাইয়াছি, আবার আমার ঐ মনোরথ প্রাপ্ত হইব; ইহা আমার আছে, আরও আমার ধন হইবে; অমুক শত্রুকে আমি মারিয়াছি, আবার অপর শত্রুগুলিকেও মারিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি সমৃদ্ধ, আমি কুলীন; আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব!" এইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হইয়া তাহারা নানারূপ সঙ্কল্পে বিভ্রান্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া উঠে, এবং কামভোগে প্রসক্ত হয়। ইহারা অশুচি নরকে পতিত হইয়া থাকে।"

দর্পণের যেমন স্বাভাবিক অবস্থা নির্ম্মল, এবং ধূলি বা অপর কোন তাদৃশ পদার্থে তাহার মালিন্য উৎপন্ন হয়, চিত্তও সেইরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছ, ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা তাহাতে মলিনতা সংক্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির হইয়া বেড়াইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু না বলিয়া ঋষিভাষিত কয়েকটি কথা তোমাদিগকে শুনাইতেছি, আশাকরি তোমরা প্রণিধানপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিবে ও তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে ঋষি গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন:—

"অসদাচরণ হইতে অনিবৃত্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা ইঁহাকে লাভ করিতে পারে না, অশান্ত ব্যক্তি ইঁহাকে লাভ করিতে পারে না, অসমাহিত ব্যক্তি ইঁহাকে লাভ করিতে পারে না, আর অশান্তচিত্ত ব্যক্তিও ইঁহাকে লাভ করিতে পারে না।

"নিজকে রথী বলিয়া জান, শরীরকে রথ বলিয়া জান, বুদ্ধিকে সারথী বলিয়া জান, এবং মনকে রজ্জু,

বলিয়া জান। মনীষিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে (সেই রথের) অশ্ব, এবং (রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ-রূপ) বিষয় সমূহকে তাহার পথ বলিয়া থাকেন; এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত (বর্ত্তমান) আত্মাকে তাঁহারা ভোক্তা বলেন।

"যে ব্যক্তি বিবেকহীন ও যাহার মন সর্ব্বদা অসমাহিত, সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহ তাহার বশীভূত থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকী ও যাহার মন সর্ব্বদা সমাহিত, সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয় সমুহ তাহার বশীভূত থাকে।

"যে ব্যক্তি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পদকে প্রাপ্ত হয় না; এবং সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকী ও শুচি, এবং যাহার মন সংযত সে সেই পদ লাভ করিতে পারে—যাহাতে আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

আমাদের দেশে যাঁহারা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই বাণী জগতের কল্যাণের জন্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই

যুক্তিসমন্বিত। এই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্থৈর্য্য সম্পাদনই ধর্ম্মের পথের, ঈশ্বরের পথের অথবা এক কথায় সমস্ত কল্যাণের পথের প্রথম কার্য্য। স্থির—প্রসন্ন চিত্তেই সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, স্থির—প্রসন্ন চিত্তেই শ্রীভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এবং তিনিই আমাদের অভিলাষের শেষ সীমা ও পরম গতি। এবং বৎসগণ, এইরূপেই যখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়, মানব তখন অমৃত হইয়া থাকে।

তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা শ্রীভগবানের চরণ কমলে ভক্তিলাভ কর ইহাই আমি তোমাদের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি; কেননা ভগবৎভক্তের সর্ব্বত্রই জয় জয়কার। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

সুমেধা।

মন্তাবতী নগরে কোঞ্চ রাজার প্রধানা মহিষীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বারণাবতীর রাজা অনিকর্ত্ত ইঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। অনিকর্ত্ত নিজে যখন ইঁহার প্রেমপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, সুমেধা তখন ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সুমেধার উপদেশে তাঁহার পিতামাতা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

মন্তাবতী নগরেতে ছিল, কোঞ্চ নামে এক নরপতি
পাট মহিষীর গর্ভে তাঁর, হল জাতা সুমেধা সুমতি।
শ্রমণ ধর্ম্মের বিধি বালা করিত পালন যত্নে অতি॥
শীলবতী, বহুশাস্ত্র পটু, বক্ত্রী ও সুগত ধর্ম্মে রতা।
সম্ভাষিয়া মা বাপে একদা, কহিল—"শোন গো মোর কথা,
নির্ব্বাণে বাসনা মোর, জানি অনিত্য জগৎ পরলোক;
তুচ্ছ এ শারীর সুখ ভবে; অসন্তোষে বিঘ্নে ভরা ভোগ।
মূঢ়েরা মোহিত কামভোগে, সে যে কটু তীব্র হলাহল;
দুঃখেতে মরিয়া হয় তার দীর্ঘকাল নিরয় সম্বল।
পাপফলে অধোগতি লভি হয় পাপী অনুতাপে রত।
মূঢ়জন কায়-বাক্য-মনে সতত রহেগো অসংযত।
প্রজ্ঞাহীন অচেতন মূঢ়, কিসে দুঃখ রোধ নাহি জানে;
বুঝালেও নাহি বোঝে তারা, আর্য্য সত্য কভু নাহি মানে।
বুদ্ধবরদত্ত সত্য মাগো! জানে না যে বহু লোক ভবে,
চাহে ভবগত সুখ, আর স্বর্গলাভ চায় তারা সবে।
শাশ্বত নহেক স্বর্গভোগ, অনিত্য সকলি চলে যাবে;
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হবে, মূঢ় তাহা কদাপি না ভাবে।
চতুর্ব্বিধ বিনিপাত * ভবে, গতি দুটি লভে কথঞ্চিৎ;
বিনিপাতে প্রব্রজ্যা না ঘটে, নিরয়েতে গমন নিশ্চিত।
"দশবল † বুদ্ধের বিধানে প্রব্রজ্যা করিব, শুন দোঁহে।
উৎসুকা হইব জন্ম আর মরণ নাশিতে, রোধি মোহে।

---

* চতুর্ব্বিধ বিনিপাত হইল নরক, পশুজন্ম, প্রেত হওয়া, রাক্ষস হওয়া; দুইটি গতি হইল মনুষ্য হওয়া ও দেব হওয়া।

† বুদ্ধের দশবল—(১) সত্য অসত্য জ্ঞান, (২) কর্ম্মের উদ্ভব ও পরিণতি (৩) ইষ্টসাধন-পটুতা, (৪) ভূতজ্ঞান, (৫) প্রবৃত্তির গতি ও কার্য্য, (৬) মানবের আত্মশক্তি, (৭) বিনয় সাধনার পথ, (৮) পূর্ব্ব জন্ম, (৯) দিব্যচক্ষু, (১০) মুক্তি।

অসার এ শরীরের তরে 'ভবগত' সুখ নাহি চাই;
রোধিয়া ভবের তৃষ্ণা যত, প্রব্রজ্যায় আমি চলে যাই।
হয়েছে অশুভ কাল গত, শুভক্ষণে বুদ্ধের জনমে;
ব্রহ্মচর্য্য শীলধর্ম্ম কভু যেন নাহি তেজি এ জীবনে।
গৃহে না গ্রহিব অন্ন আর, বরং মরিব অনাহারে।"—
এইরূপ কহিল সুমেধা মাতা ও পিতাকে বারে বারে।
কাঁদিতে লাগিল মাতা তার, পিতা তার হইয়া ব্যথিত
প্রবোধিল সুমেধাকে ডাকি, হর্ম্ম্যতলে ছিল সে পতিত।
"ওঠ কন্যা, ভেবে দেখ, প্রদানিতে অনুরূপ বরে
করিয়াছি স্থির আমি; দিব রাজা অনিকর্ত্ত-করে।
বারণাবতীর পতি গ্রহিবেন হরষ অন্তরে॥
অনিকর্ত্ত করিবেন প্রধানা মহিষী মনোনীতা;
ব্রহ্মচর্য্য প্রব্রজ্যায় শীলধর্ম্ম দুষ্কর দুহিতা!
প্রভুতা ও ধনৈশ্বর্য্যে ভোগসুখ লভ গো যৌবনে;
রাজ্য উপভোগ পুত্রি! বেছে নাও আপনার মনে।"
কহিল সুমেধা—"আমি ভজিব না অসার সংসার;
বরিব প্রব্রজ্যা, নয় বেছে নিব মরণ আমার।
পূতপূর্ণ শবগন্ধা ভয়ানক অশুচি যে আমি,
ত্যজ্য শবমাত্র দেহ, মলগৃহ; কেন নেবে স্বামী?
মাংস ও শোণিত পিণ্ড আচ্ছাদিত, এই ত এ দেহ?
কৃমিগৃহ, খাদ্য শকুনের; সম্প্রদান করে কি গো কেহ?
'বিজ্ঞান' চলিয়া গেলে এ শরীর নিক্ষেপে শ্মশানে
ত্যক্ত জীর্ণ কাষ্ঠ সম; জ্ঞাতি জন না চাহে সে পানে।
অন্যজীবভক্ষ্য দেহ ফেলে দিয়ে স্নান করি যায়;
মা বাপেও করে তাই! কি হইবে অন্যের কথায়?
অস্থিনাড়ী ভরা এই অসার দেহেতে করি ঘর:
সকল অশুচি দিয়ে পরিপূর্ণ এই কলেবর;
অস্থি আর নাড়ী ভরা; কেন হবে ইহার আদর?
উলটিয়া যদি এর ভিতর বাহির করা যায়,
অসহ্য দুর্গন্ধে তার তেজিবে আপন মাতা তায়।
এই ত শরীর আয়তন, দেহ ধাতু জন্ম-মৃত্যুময়;
জন্মে দুঃখ; তাই মোর বিবাহেতে ইচ্ছা নাহি হয়।
শতবর্ষ ভরি যদি প্রতিদিন অস্ত্রাঘাত করি
পারি দুঃখ বিনাশিতে, সে যাতনা সহিব আদরি।
আঘাত সহা ত সোজা, যদি বিজ্ঞ জানে বুদ্ধবাণী—
'পুনঃ পুনঃ মৃত্যু আনে সুদীর্ঘ সংসারচক্রখানি।'
দেবজন্ম, নরজন্ম, পশুযোনি, অসুরের কায়,
প্রেতরূপ, নিরয়েতে বাস—অনন্ত যন্ত্রণাভোগ তায়।
ক্লিষ্ট বিনিপাতগত পায় দুঃখ নিরয়ের বাসে;
দেবজন্ম লভিলেও পরম নির্ব্বাণ নাহি আসে।
জনমমরণক্ষয়ে উৎসুক হইয়া যেই জন
বুদ্ধের বচন পালে, সেই পায় নির্ব্বাণ-শরণ।
কি হবে অসার ভোগে? আজি তাত! গৃহ তেজি যাই;
বমি সম ঘৃণ্য ভোগ, সে অসার বস্তু নাহি চাই।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাবিলন।

বাবিলনের শূন্য উদ্যান পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এই বাবিলন যে কোথায়, এই শূন্য উদ্যানই বা কি পদার্থ তাহা অল্প লোকেই জানে। আমরা বারান্তরে বাবিলনের প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বাবিলন এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সেই সাম্রাজ্য একবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আসিরিয়ার অধীন হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে তাহা পুনঃ স্বাধীনতা লাভ করে। আমরা সেই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিব।

নেবোপলেসার নামে একজন কালদিয়াবাসী ছিলেন সেই সময়ে বাবিলনের শাসনকর্ত্তা। আসিরিয়ার শাসন-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নেবোপলেসার আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কিছু কাল পরে নেবুচাড্‌নেজার বাবিলনের রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁর মত বীররাজা প্রাচীন কালে ছিল না বলিলেই হয়। তিনি অনেক দেশ জয় করেন; ফিনিশিয়া, মিশর দেশ, ইহুদীদের জুদারাজ্য সমস্তই তাঁর হস্তগত হইল। নেবুচাড্‌নেজার জেরুজিলাম

নগর অবরোধ করিয়া বহুশত সবল সুস্থ ইহুদীকে বন্দী করিয়া বাবিলনে লইয়া গেলেন। জেরুজালেম নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইল; রাজপ্রাসাদ, হর্ম্ম্য, মন্দির ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইল।

কিছু দিন পরে নেবুচাড্‌নেজার এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন; কিন্তু কি যে স্বপ্ন দেখিলেন তাহা প্রাতঃকালে নিজেই ভুলিয়া গেলেন! অথচ সেই স্বপ্ন জানিবার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কালদিয়াতে যত পণ্ডিত পুরোহিত ছিল, সকলকে খবর দেওয়া হইল—"এই স্বপ্ন কি এবং তাহার অর্থই বা কি তাহা যদি পণ্ডিতমণ্ডলী বলিতে না পারেন. তবে তাঁহাদিগের প্রাণ-দণ্ড হইবে।

এই সময়ে দানিয়েল নামে একজন ইহুদী বন্দী ভাবে বাবিলনে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি এই ঘোষণা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। বলিলেন,—"আমাকে রাজার কাছে লইয়া চল; আমি এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিব; এতগুলি প্রাণী বৃথায় মরিবে?"

রাজার কাছে গিয়া দানিয়েল বলিলেন,—"মহারাজ, স্বপ্নে আপনি প্রকাণ্ড এক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ভীষণ তাহার আকৃতি! তার মস্তক বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত, তার হস্ত আর বক্ষ রৌপ্যময়; তার উদর ও উরু কাংস্য-নির্ম্মিত; পা দুইখানি লোহার ও পদতল কাদার তৈয়ারী।" এই কথা বলিয়া দানিয়েল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিলেন।

কিছু দিন পরে নেবুচাড্‌নেজার ষাট হাত উঁচু সোণার এক দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। সাম্রাজ্যের যে যেখানে ছিল সকলকে খবর দিলেন। রাজকুমার-গণ, শাসনকর্ত্তাগণ, সেনাপতিবৃন্দ, বিচারকমণ্ডলী, কোষাধ্যক্ষগণ, মন্ত্রীমণ্ডলী, নগরপাল—সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন,—"সকলে এই দেবতাকে পূজা করিবে। যেমন বিষাণ বাঁশী বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিবে অমনি লোকে এই দেবতার পূজা আরম্ভ করিবে।"

লোকে আসিয়া বলিল,—"মহারাজ, ইহুদীরা বিষাণ বীণার রব এবং মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াও আপনার দেবতার কাছে মাথা নীচু করে নাই। তাহারা আপ-নার সম্মানে আঘাত করিয়াছে।"

রাজা একথা শুনিয়া বলিলেন,—"কি! তাহাদের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার দেবতাকে তারা পূজা করিল না; আমার সম্মানে তারা আঘাত করিল। ধরিয়া আন তাহাদের!" নির্ভীকচিত্ত তিনজন ইহুদী আসিল। তারা বলিল,—"মহারাজ, আমরাই সেই ইহুদী; আমরা আপনার দেবতার কাছে মস্তক নীচু করি নাই; কারণ সে দেবতাকে আমরা জানিনা, চিনি না। আমরা এক পরমেশ্বরকেই চিনি, তিনি আমাদের জীবনের সহায়, মরণের সম্বল।" এই কথা শুনিয়া নেবুচাড্‌নেজার আগুনের মত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"কি! এত বড় তোমাদের বুকের পাটা,—ভক্তির জোর! দেখা যাক্ কোন্ দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করে! আগুনের মধ্যে তোমাদিগকে ফেলিয়া দিব—দেখি তখন তোমাদের সহায় হয় কে?" তবুও তারা সত্যের পথ ছাড়িল না; আগুনে পুড়িল, তবু মিথ্যার কাছে মাথা নত করিল না।

নেবুচাড্‌নেজার নানা দেশ জয় করেন, নানা জাতির সর্ব্বনাশ করেন। কিন্তু তাঁর একটা কাজের জন্য তিনি প্রাচীন কালে খুবই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেটি তাঁর ঝুলানো বাগানের অক্ষয় কীর্ত্তি! আসিরিয়ার গল্পে তোমরা পড়িয়াছ যে এ জিনিষটার উৎপত্তি সেখানে; কিন্তু নেবুচাড্‌নেজার সেটার খুবই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে, সম্পদে, বিলাসে সে বাগানের তুলনা হয় না! যেন শূন্যে অমরাপুরীর নন্দন বন!

কিছু দিন পরে বেলসেজার নামে এক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মত পাপী রাজা বাবিলনের রাজসিংহাসন আর কখনো কলঙ্কিত করে নাই। জেরুজিলামের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া নেবুচাড্‌নেজার অশেষ ধনরত্ন আনিয়াছিলেন—স্বর্ণের পাত্র, তাম্রের পূজোপকরণ, প্রভৃতি নানা সামগ্রী। পাপী বেলসেজার সেই দেবতার পাত্রে মদ্য পান করিত! কথিত আছে, এই সময়ে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। বাবিলনের রাজসভায় যজ্ঞবেদীতে অগ্নি জলিতেছিল—

ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতায়ন দিয়া বাহিরে যাইতেছিল। হঠাৎ সেই যজ্ঞবেদীর ধূমের মাঝখান হইতে একখানি হাত উঠিল—দেহ দেখা গেল না! শুধু একখানি দক্ষিণ হস্ত! সভার সকলে ভয়ে আড়ষ্ট! কাহারও মুখ দিয়া আর কথা সরে না। বেলসেজার তাঁর সিংহাসনে নিশ্চল হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন! সেই হাতখানি গাঢ় ধূমের মাঝে ধীরে ধীরে চারিটা কথা লিখিয়া দিল—"মিনি" "মিনি" "টিকিল" "পার্সি"। আর কিছুই নয়! রাজা তার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি দেশের পণ্ডিতদের ডাকিলেন. কিন্তু কেহই সেই রহস্তের অর্থ বলিতে পারিল না। দানিয়েল সেই কথার অর্থ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"ইহার অর্থ ঃ—

"ঈশ্বর তোমার রাজত্বের পরমায়ু শেষ করিয়াছেন।"

"ন্যায়দণ্ডের ওজনে তোমার পাপের পাল্লা ঝুকিয়া পড়িতেছে।"

"তোমার রাজ্য বিভক্ত হইয়াছে, এবং মীড্ ও পারস্তের হাতে তাহা সমর্পিত হইল।"

"বাবিলন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

ইহারই কিছুদিন পরে উত্তর হইতে মীড্ জাতি পাহাড়ে-নদীর বন্যার মত বাবিলনের উপর আসিয়া পড়িল। বাবিলন অবরুদ্ধ হইতেই রাজা অন্য নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে তিনি নগর রক্ষা করিবার জন্ত সৈন্তের বদলে পুতুল দিয়া প্রাচীর পরিপূর্ণ করিলেন।

পারস্ত-মীডের রাজা কাইরাস বেলসেজারকে হাতে পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া বাবিলনের দিকে চলিলেন। বাবিলন এখন আর কে রক্ষা করিবে? দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল। পারস্তরাজ বাবিলেন অধিকার করিলেন।

বাবিলনের মত নগর প্রাচীনকালে আর একটিও ছিল না। সে যুগের নগরগুলি হইত খুবই প্রকাণ্ড। শোনা যায়, বাবিলন নাকি আট বর্গ ক্রোশ জুড়িয়া ছিল! সমতল প্রান্তরের মাঝ দিয়া য়ুফ্রাতিস বহিয়া গিয়াছে; তাহারই উভয় তীরে প্রাচীন বাবিলন স্থাপিত ছিল। নগরের চারি পার্শ্বে খাল; খালের ধারগুলি পোড়া ইট দিয়া বাঁধানো। খালের উপরেই নগর বেড়িয়া প্রাচীর। সে প্রাচীরই বা কি বিরাট ব্যাপার! মাটি হইতে তিন শ' ফিট্ উচ্চ! আর প্রস্থে পঁচাত্তর ফিট্! প্রাচীরের উপরে দুই সারি ঘর সামনা সামনি ছিল এবং তাহার মাঝ দিয়া চার ঘোড়ার একখানি রথ বেগে চলিতে পারিত! এখন বুঝিতে পারিতেছ প্রাচীরটা কতখানি চৌড়া ছিল! নগরে প্রবেশের শত দ্বার ছিল। শত দ্বারই পিতলের নির্ম্মিত, আলোকের আভায় তাহা স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিত! এ ছাড়া নগরের মধ্যে আর এক সারি ছোট প্রাচীর ছিল—ছোট হইলেও তাহা কিছু কম শক্ত নয়!

নগরের ভিতরটি খুবই মনোরম ছিল! সমস্ত রাস্তাগুলি সোজা ও একটির সহিত আর একটি সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাস্তা বাঁধা; প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বেই দ্বিতল ত্রিতল গৃহ।

নগরের মধ্যে ঝুলানো বাগান থাকে থাকে উঠিয়া গিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে বৃক্ষলতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মাঝে রাজার প্রাসাদ।

নদীর অপর পারে বেল দেবের মন্দির। প্রকাণ্ড একটি চতুষ্কোণ স্থানের উপর নিরেট ভিত্তির উপর আটতলা তোরণ। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বাহির দিয়া ঘেরিয়া ঘেরিয়া উঠিয়াছে। মাঝে এক স্থানে বসিবার জায়গা। উপাসকেরা ক্লান্ত হইয়া সেখানে বসিত। অষ্টম তলায় একটি প্রকাণ্ড গৃহ; সেইটিই দেবতার মন্দির। শোনা যায়, এই মন্দিরটি নাকি মহামূল্য রত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল।

নগরের দুই অংশের মাঝখান দিয়া য়ুফ্রাতিস্ বহিয়া যাইত; লোকে বহুদিন নৌকা করিয়া পারাপার করিত। তারপর সেমিরামিস্ নামে রাণী কয়েকটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই সেতুরও একটু বিশেষত্ব ছিল। যদিও তাহা পাথর দিয়া গাঁথা তথাচ খানিকটা স্থান খালি ছিল,—সেখানটাতে দিনমানে কাঠ দেওয়া থাকিত; রাত্রে তুলিয়া রাখা হইত, পাছে এপারের চোর অপর পারে গিয়া চুরি করিয়া পলাইয়া আসে!

এই গেল বিরাট বাবিলন নগরের বর্ণনা! বাবিলন যেমন সুন্দর তেমনি দৃঢ় ছিল। গ্রীক্ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা অবাক্ হইয়া এই নগরীর সৌন্দর্য্য দেখিত।

আজকাল বাবিলনের এই সকল স্থাপত্যের চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল মাঝে মাঝে স্তূপ ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহাই বাবিলনের অতুল কীর্ত্তির শ্মশান-ভস্ম—প্রাচীন কীর্ত্তির কণামাত্র চিহ্ন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ডিব্রুগড় মহিলা সমিতি।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রদ্ধাস্পদা সরোজিনী বসু মহাশয়ার উদ্যোগে এই ডিব্রুগড়ে একটী মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। কিছু দিন ইহার কার্য্য সুন্দর রূপে চলে। কিন্তু তাঁহার পারিবারিক প্রতিবন্ধকতায় এবং অন্যান্য সভ্যগণের উদাসীনতায় এই সমিতির অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এখানে ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের শুভাগমন হয়। ভগিনী সুরমা দাসের উৎসাহ ও যত্নে এবং উক্ত প্রচারক মহাশয়ের সৎপরামর্শে এই সমিতি পুনর্জ্জীবন লাভ করে এবং ১৯০৭ সনের ২৩ শে অক্টোবর ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য—একত্র সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীত, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা মহিলাগণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞান ও নীতির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হয়, তাহার চেষ্টা করা। জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ভদ্র মহিলা এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক সভ্যকে মাসিক কিছু চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদা হইতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ ও দরিদ্রাশ্রমে মাসিক চাঁদা এবং বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বালিকা বিদ্যালয় ও নীতি বিদ্যালয়ে পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং সময় সময় কোন বিপন্ন লোক কি পরিবারকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। নবেম্বর হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সমিতির বৎসর গণণা হয়। সমিতির বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ৩৫ জন। প্রতি মাসে ইহার দুইটী করিয়া অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবন্ধ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সঙ্গীত ও নানা বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে এবং আয় ব্যয় ও কার্য্য আলোচনা করিবার জন্য বৎসরান্তে একটী বার্ষিক অধিবেশন হয়। গত ২৭ শে নবেম্বর সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাস মহাশয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভ্যগণ ব্যতীত বাহিরের নিমন্ত্রিত অনেক ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির দ্বারা প্রার্থনা হইয়াছিল। প্রার্থনার পূর্ব্বে ও পরে, সম্পাদিকার দ্বারা দুইটী সঙ্গীত হয়। প্রার্থনান্তে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—"এই বৎসর ২৬টী নিয়মিত অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় ৭টী অধিবেশন হইতে পারে নাই, বাকী ১৯ টীতে রীতিমত কার্য্য হইয়াছিল। এতৎব্যতীত বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে দুইটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া যায়। এই বৎসরে মাসিক চাঁদা দান ব্যতীত এক বিপন্ন পরিবারকে ও একটী ভদ্র সন্তানকে কিছু আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং বালক বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ স্থানীয় নীতি বিদ্যালয়ে একটী রৌপ্যপদক দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্তা সরযুবালা মল্লিক "সন্তান লালন," শ্রীযুক্তা হরিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায় "সমিতির উদ্দেশ্য" এবং সম্পাদিকা "আমাদের শিক্ষা" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্তা হেম নলিনী মুখার্জ্জী ও শ্রীযুক্তা হরিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সঙ্গীত করেন। তৎপর শ্রীযুক্তা সরযুবালা মল্লিক রামায়নী কথা হইতে "কৌশল্যা" আখ্যায়িকা পাঠ করেন। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীপদ্মাবতী দাসকে পুনরায় সম্পাদিকা ও শ্রীযুক্তা চারুবালা সেনকে সহকারী সম্পাদিকা মনোনীত করা হইয়াছে। ইহার পর সভাপতি মহাশয়া সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং "নারী-জাতির শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে ডিব্রুগড় ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সরযুবালা মল্লিক অর্গিন বাজাইয়া তাঁহার কয়েকটী ছাত্রীর দ্বারা একটী সুন্দর সঙ্গীত করাইয়াছিলেন। তাহার পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত করা হয়। ইহার পর এই উপলক্ষে প্রীতি ভোজন হইয়াছিল।

শ্রীপদ্মাবতী দাস
সম্পাদিকা, ডিব্রুগড় মহিলা সমিতি।

অষ্টম ভাগ। চৈত্র, ১৩১৯। ১২শ সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA OFFICE, WARI, DACCA.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৶০ আনা।] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

বাবিলনের প্রাচীন স্তম্ভে ক্ষোদিত মূর্ত্তি
(৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের)।

রাজা শত্রুর নগর অবরোধ করিতেছেন।
(৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের)।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :- স্ত্রী পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন)

'I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

৮ম ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৯ | ১২শ সংখ্যা।

সমাজ-ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার।

মানবের নিয়ন্ত্রিত, পরস্পর সমঞ্জসীভূত শক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশ্রেণীর নাম সমাজ। ইতর প্রাণীরা একত্র বিচরণ করে, একত্র কার্য্য করিয়া থাকে; তাহারাও আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য বিধান পরম্পরার বশীভূত। কিন্তু তাহারা পরস্পর নিয়ম ও নীতি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে কোন নীতি-সূত্রের গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খলাযুক্ত নিয়ম বন্ধন নাই, তাহা সমাজ নামের যোগ্য নহে।

ভূবিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, অর্দ্ধকোটিরও অধিক বৎসর পূর্ব্বে (মনুষ্য জন্মের বহু পূর্ব্বে) এই শ্যামাঙ্গিনী ধরণীতে কেবল ইতর প্রাণীরই একাধিপত্য ছিল। তাহারা জলে স্থলে আপনাদের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক বাস করিতেছিল। এই সুদীর্ঘকালেও তাহাদের মধ্যে জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন এবং সমাজ বন্ধনের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রতীচ্য পণ্ডিত মহা ধীশক্তি সম্পন্ন ডারউইন্ বিবর্ত্তন-শীলতার মধ্য দিয়া মনুষ্য জাতিকে বানর জাতির বংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই অস্বীকৃত।

নিতান্ত বর্ব্বর—সভ্যতার নাম মাত্র বর্জ্জিত জাতি-সমূহের মধ্যেও সমাজবন্ধন কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়। তাহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নৈতিক আদর্শ রক্ষা করে, কোন কোন বর্ব্বর জাতির সত্যপ্রিয়তা সুসভ্য জাতিকেও পরাস্ত করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতি সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বহু গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক-গণ প্রমাণ করিয়াছেন, দশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া মানবজাতি ফল-শস্যময়ী বসুন্ধরার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। তখনও মাতা ধরিত্রী উজ্জ্বল সভ্যতালোকে আলোকিত হন নাই। সেই দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমোন্নতির পর প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যদিও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যেও যে সমাজ-বন্ধন বিদ্যমান ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা রীতিমত বস্ত্রাদি প্রস্তুত, কৃষিকর্ম্ম ও নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীরে ধীরে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন।

মনুষ্যের হৃদয় সভ্যতার নির্ম্মল আলোকে যতই দীপ্ত হইতে আরম্ভ করে, সেই কিরণ-সম্পাতে সমাজ-হৃদয়ের প্রতি কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের অন্ধকার অপসারিত হয়, এবং তাহার প্রত্যেক স্থান উন্নত এবং মার্জ্জিত হইয়া থাকে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

জনসমাজের অবিরাম নিমেষ উন্মেষের মধ্যে যুগে যুগে কত প্রবল বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সমাজদেহে সজোরে আঘাত করিয়াছে; অপ্রহতিহত কালস্রোতের নিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে মানবসমাজের বন্ধন সূত্রগুলি কখন কখন কিয়ৎ পরি-মাণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াও আবার সম্মিলিত হইয়াছে; বীণা যন্ত্রের তান লয়ের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের সমবেত সুর একটি আবার অপূর্ব্ব রাগে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে নীতি-সূত্রদ্বারা সমাজ গঠিত এবং রক্ষিত সেই সূত্রসমূহের মূল কোথায়? তাহাদের কেন্দ্র কি? কোন্ মধ্য বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া শত শত নীতি ও নিয়মসমূহ মানবদেহের শিরা ধমনীর ন্যায় সমাজ-দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে? কে সমাজদেহের জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া থাকে? ধর্ম্মই সমস্ত নীতি-সূত্রের মধ্যবিন্দু। যুগ যুগান্তরের সহস্র বাধা বিপ্লবের মধ্যে ধর্ম্মই সমাজকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

যাহা চিরন্তন সত্য তাহা চিরদিনই স্বতঃসিদ্ধ; যাহা নিজ আলোকে সমুজ্জ্বল, সার্ব্বভৌমিক এবং নিত্য কল্যাণময়, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সমাজ-হর্ম্ম্যের স্তরে স্তরে নানা আকারে ও নানা পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাহার মূল সত্যগুলি নিতান্তই সরল এবং স্বাভাবিক। এখানে দেশ কালের কোন প্রভেদ নাই,—জাতিগত, বর্ণগত কোন বৈষম্য নাই। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বাহিরে নহে,—ভিতরে।

যে ধর্ম্ম শুধু জাতিগত তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র। যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম ইত্যাদি। এই বহিরাবরণ লইয়াই পৃথিবীতে পৃথক পৃথক সমাজ গঠিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল জাতিই আপনাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার পাষাণময় প্রাচীরে ঘেরিয়া লইয়াছে ও দুর্নিবার কলহের সৃষ্টি করিয়াছে।

যেমন শারীরিক মঙ্গলকর নিয়মসমূহ লঙ্ঘনের ফলে জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তেমনই ধর্ম্মের চির শুভকর নিয়ম ও নীতি-বিধান লঙ্ঘনের ফলে মানসিক অসংখ্য পাপ-ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জনশ্রেণীর মানসিক ব্যাধিই সংক্রামক ভীষণ রোগের ন্যায় সমাজ-দেহের প্রতি শিরা ধমনীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং উহাকে শীঘ্রই বিকৃত ও বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়।

যে সকল গুরুতর ব্যাধি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অবসন্ন ও দুর্ব্বল করিতেছে, তাহার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষই প্রধান। ইহা সমাজের প্রতি-অঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া দিতেছে।

পৃথিবীর যে সকল জাতি সভ্যতা এবং জ্ঞানের আলোকে সকলের বরণীয় তাঁহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে প্রথমেই তাঁহারা সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভেদ-বিদ্বেষের প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; আপনাদের অন্তরশক্তি

অব্যাহত রাখিবার জন্য সকল বাধাই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন; বিশ্বের নির্ম্মুক্ত জল, বায়ু, আলোক লাভ করিবার জন্য গৃহের সমস্ত গবাক্ষগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সুবর্ণযুগের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যায় সকল মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যজাতি প্রেম ও আশ্চর্য্য সহানুভূতির দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত কি প্রকার ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কখনও জাতিবিদ্বেষকে সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে দেন নাই। পূর্ব্বকালে এখনকার মত জাতিবিদ্বেষ প্রচলিত থাকিলে দাসী-পুত্র বিদুর এবং সূত্রধর-পুত্র কর্ণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জাতীয় জীবন-গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠা তাহাদের উদারতা এবং অভেদ নীতির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বানর, ভল্লুক, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি নামধেয় অনার্য্য জাতিদের সঙ্গে তাঁহারা সখ্যতা স্থাপন করিয়া, বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, সাম্য মন্ত্রেরই কি মহিমা ঘোষণা করেন নাই?

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে পরস্পর নৈকট্য ও সম্মিলনের বাধা,—সংকীর্ণতার বাধা অপসারিত করিয়া দিয়া আর্য্যজাতি সর্ব্বদায়ই কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাদের অপ্রতিহত গতির পরিচয় প্রদান করিতেন। একতা ও সম্প্রসারণ নীতির বলেই তাঁহারা জাতীয় দুর্জ্জয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য শ্রেণী দ্বারাও সমাজ পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতীত ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলি দ্বারা তদানীন্তন জাতীয় জীবনের মূল উপাদান অনায়াসেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে বর্জ্জন-নীতি অপেক্ষা অর্জ্জন-নীতিরই সমধিক সমাদর ছিল। তাই ভিন্ন জাতিসকল অনায়াসেই বিরাট আর্য্য-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক অন্যান্য প্রদেশেও আর্য্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

যে সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক গগন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমালায় অলঙ্কৃত ছিল, প্রলয় বিপ্লবকর বৈদ্যুতিক সংঘর্ষের ন্যায় যখন রাজন্যগণের অব্যাহত বল বিক্রম, শৌর্য্য-বীর্য্যের পরস্পর সংঘর্ষণে কুরুক্ষেত্রের সমরভূমিতে কালানল জলিয়া উঠিয়াছিল, কালান্তক বিষাণ নিনাদিত হইয়া সমস্ত ভারতকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, রাজশক্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতার সেই পূর্ণ বিকাশের সময়েও সার্ব্বভৌমিক প্রেমের জলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। সেই সময় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম যোগের কেমন সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল, গীতা গ্রন্থ তাহার সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারত মাতার এ অমূল্য রত্ন সমগ্র সভ্য জগতে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দুর্লভ-গৌরবে কি স্পর্শমণিরূপে দীপ্যমান নহে?

খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন শাক্যসিংহ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া সাম্য-মৈত্রীর বিজয় বৈজয়ন্তী গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভা সুনীল মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া দিক্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তাহার স্পর্শে তখন অভিশাপগ্রস্ত বলি দৈত্যের ন্যায় জাতিবিদ্বেষ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। মহর্ষি ঈশার আবির্ভাবের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে যখন দিগ্বিজয়ী বীরবর আলেকজাণ্ডার সদর্পে বহুতর সেনানী সমভিব্যাহারে ভারত-ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সিদ্ধার্থ প্রবর্ত্তিত আলোক-শিখার প্রভাব তখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

চারি শত বৎসর গত হইয়াছে, আর একবার বঙ্গের আকাশে প্রেমের চন্দ্রকলা উদিত হইয়া সমস্ত ভারত আলোকিত করিয়াছিল। যিনি সকল জাতি,—সকল বর্ণ—সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সমভাবে ভাই বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রীতির মন্ত্রে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই চৈতন্য দেবের নাম আজও বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত, কিন্তু তাঁহার অভেদনীতি এখন কোথায়?

হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই? ইহার উন্নতির অনেক দ্বারই কি সময়ে রুদ্ধ করা হয় নাই? পক্ষান্তরে অবনতির উপায় সকলই অবলম্বন করা হইতেছে। সমাজের বক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার শত শত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে

প্রবেশ করিবার পথ একেবারেই বন্ধ। একজন হিন্দু অবাধে মুসলমান কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু একজন মুসলমান কিংবা খৃষ্টানকে হিন্দু সমাজ কখনই আপন বক্ষে স্থান দিবে না। ইহাদ্বারা যে সমাজের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সম্প্রসারণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই সকল অন্তরায় দূর না করিলে কিছুতেই সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

আজ এই ধ্বংশ দশাগ্রস্ত হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা প্রথমেই জাতি বিদ্বেষ এবং অসংখ্য কুসংস্কারের অনিষ্টকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। কেবলই বাধা,—কেবলই অন্তঃসার শূন্য বিধি ব্যবস্থা! এই সকল জটিল বিধি ব্যবস্থা ও বাধা সমাজে অন্ধকারেরই সৃষ্টি করিতেছে,—অনন্ত উন্নতির গতি রোধ করিয়া দিতেছে।

উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ নানা উপায়ে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে পদানত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। বিষম ভেদ বিদ্বেষ এবং জাত্যভিমান পরস্পরের মধ্যে নিদারুণ ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিতেছে।

প্রকৃতির রম্য নিকেতন প্রতি পল্লীগ্রামে এবং অশ্বগজসঙ্কুল ও জনকোলাহল-মুখরিত নগরে নগরে এই জাতিবিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় ভারতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে পারিয়া প্রভৃতি পতিত জাতির দুর্গতির বিষয় কাহার অবিদিত আছে? বাঙ্গালা দেশেও নমঃশূদ্র, হাড়ী, ডোম, মুচি, প্রভৃতি নীচ জাতির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে চক্ষুর জল সম্বরণ করা যায় না। সমাজের এই নিম্নস্তরে—উন্নতির আলোক প্রবেশের পথে জাতিবিদ্বেষ উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত।

ইহার ফল স্বরূপ এই নিম্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের অসন্তোষও বৈশাখী সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশস্থিত ঘনীভূত মেঘমালার ন্যায় ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছে এবং উচ্চশ্রেণীর সহিত সহানুভূতির সম্পর্ক দিন দিন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ইহা কি দেশের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের চিহ্ন নয়? যেমন কণা কণা বালুকা সঞ্চিত হইয়া একটি দ্বীপ গঠিত এবং অসংখ্য প্রস্তর রেণু দ্বারা একটি পর্ব্বত প্রস্তুত হয় তেমনই দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত সমবেত শক্তিদ্বারা জাতীয় মহাশক্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে অর্দ্ধেক বাদ দিলে সমাজ ছিন্নপত্র বৃক্ষের ন্যায় নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। মহামহীরুহ প্রকৃতি-রাজ্যে অনেক কাজ করে; তৃণ সামান্য হইলেও তাহার কার্য্যকারিতা সামান্য নয়। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল মিত্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে এবং কিরাত জাতীয়া শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু যুগযুগান্তর পরে সেই ভারতের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে? তাঁহাদের বংশধরগণ আজ তথাকথিত নীচ জাতির ছায়া স্পর্শেও আপনাদিগকে অশুচি বোধ করেন, উহারা ঘরে প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের জল অপবিত্র হইয়া থাকে।

হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশই নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জীবন-বীণার যে তারে কমলার বন্দনা-গীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহা সর্ব্বতোভাবে ইহাদেরই করধৃত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমস্তই ইহাদের শরীরের রক্তে পরিপুষ্ট।

যেমন মানব দেহের কোন স্থান কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে ক্রমে তাহা সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং অবিলম্বে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, সেইরূপ সমাজের এই নিম্নস্তর অনুন্নত অবস্থায় থাকাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে যে কুঠারাঘাত পড়িতেছে তাহাতে কি সংশয় আছে?

শত বাধা বিঘ্নের ভিতর হইতে, আজ সভ্য সমাজের মহাজাগরণের দিনে, বিশ্বের তন্ত্রীতে যে বিরাট উত্থানসঙ্গীত ভৈরব রাগে বাজিয়া উঠিতেছে—প্রভাত-মলয়ানিলের মঙ্গল বার্ত্তার ন্যায় তাহা ভারতবর্ষের নিতান্ত অন্ধতম কূপেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। তাই আজ নিম্নজাতির মধ্যে কেহ কেহ জাগ্রত হইয়া আপনাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন, এবং জগতের নিকট মনুষ্যের প্রাপ্য অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন।

যদি হিন্দুগণ আপনাদের বিনষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হন—যদি জগতের নিকট বরণীয় শক্তি-রূপে—যথার্থ মানুষ রূপে, দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হন, তবে দেশের এই কোটি কোটি নিম্নশ্রেণীস্থ পতিত ভ্রাতাদিগের হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হউন। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্গতি, অজ্ঞানতা দূর করিতে যত্নবান হউন; সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করুন। নতুবা কে আমাদিগকে মহা বিনাশ হইতে রক্ষা করিবে? এক পদ কর্ত্তন করিয়া অশ্বপদে ভ্রমণের নিষ্ফল চেষ্টার ন্যায় আমাদের সকল উন্নতির প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সমাজের এইরূপ সহস্র দুর্গতির মধ্যে কেবল ভারত-রমণীগণই দেশের ভরসা স্থল। রমণী যদি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও জাত্যভিমান দূর করিয়া নিজ শিশু সন্তান-দিগকে অভেদ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তবে নিশ্চয়ই জাতি বিদ্বেষের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িবে। উচ্চ বর্ণের ক্ষুদ্র শিশু যখন একটি ডোম বা চণ্ডাল শিশুর সঙ্গে একত্র খেলা করে, তখন ঐ সুকুমার প্রাণে ভেদ বুদ্ধি কিছুমাত্র স্থান পায় না। তাহার জননী যদি চণ্ডাল-শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আপনার পুত্রকে শিক্ষা দেন যে, "ঈশ্বরের নিকট চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সকলই তুল্য, সকলেই জগৎ পিতার সন্তান, সকলেরই সমান অধিকার। কাহারও প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা মহাপাপ," তবে নিশ্চয় সেই কোমল প্রাণে ঐরূপ মহৎ শিক্ষা প্রস্তর ক্ষোদিতবৎ চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এবং সে শিশু নব ভাবে গঠিত হইতে থাকিবে। শিশু স্তন্যদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় পৃথিবীর কোন শিক্ষাই তাহার তুল্য নহে।

এজন্য সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর করিতে হইলে নারীকে সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিতা করা চাই—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মে ভূষিতা করা চাই। যেখানে নারীশক্তি নিদ্রিত, সেখানে সমাজ-ব্যাধি শয়তানের মত নানা আকারে আপনার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তথাকার জাতীয় উন্নতি বালুকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের ন্যায় ভূমিসাৎ করে।

সুশিক্ষিতা ধার্ম্মিকা নারীদ্বারা দেশের কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, পবিত্রপ্রাণা নারীসকল সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া স্বদেশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সুসভ্য জগতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজের যে স্তরে গুহাস্থিত চৌরের ন্যায় অন্ধকার লুকায়িত রহিয়াছে, নারীশক্তি জ্ঞান ও প্রেমের—পবিত্রতা ও সেবার দীপশিখা করে লইয়া সেস্থান আলোকিত করিয়াছে।

আমাদের অতীত ইতিহাস নারীশক্তি এবং নারী-কীর্ত্তিতে পূর্ণ। রমণী সকল দেশেই যুগে যুগে ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার—ভক্তির আদর্শ। পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিসমা ললনাগণ ভারতের গৃহে গৃহে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

কল্যাণদায়িনী জননীগণ যদি আপনাদের বক্ষস্থিত ক্ষীরসুধা দানের সহিত সন্তানগণকে স্বদেশের মঙ্গল মন্ত্রে—প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাহাদের সুকুমার প্রাণ কর্ত্তব্য শিক্ষায় সুগঠিত করিতে আরম্ভ করেন,—তাহা-দিগকে অভেদব্রতে উদ্বোধিত করিয়া তোলেন, তবে তাহারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ জীবনে আপনাদের দেশকে শত শত কুসংস্কার ও জাতিবিদ্বেষরূপ আবর্জ্জনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্নশীল হইবে। শক্তিরূপিণী নারীগণ সকলেই এই ব্রত গ্রহণ করুন।

শ্রীকুমুদিনী বসু।

সুমেধা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

প্রীতিযুক্ত অনিকর্ত্ত রাজা, এ কথার পরে উপনীত;
বাক্‌দত্তার সম্মতি নেবার সেই দিন ছিল মনোনীত।
বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশপাশ, অস্ত্র দিয়া কাটিয়া তখন,
সুমেধা রুধিয়া কথা তার, হল আত্ম ধ্যানেতে মগন!
সুমেধা যখন জগতের অনিত্যতা ভাবিছে বসিয়া,
নগরেতে অনিকর্ত্ত রাজা উপস্থিত হইল আসিয়া।

ধ্যান করে সুমেধা যথায়, অনিকর্ত্ত গিয়া সেই গেহে,
কৃতাঞ্জলিপুটে যাচে তায়, স্বর্ণমণি অলঙ্কৃত দেহে।
"এ যৌবনে হও তুমি রাণী, রহ বিত্ত-প্রভুতা-সম্ভোগে;
রহ তুমি সুখ উপভোগে; ভোগ সুখ সুদুর্লভ লোকে।
শাস্তিময় রাজ্যখানি তব কর ভোগ, দাও তুমি দান,
হয়ো না দুর্ম্মনা তুমি এত; মাতা পিতা দুঃখে ম্রিয়মান।"
সুমেধা কহিল—"নাহি চাই ভোগ সুখ, মোহ নাই আর;
ডেকো না ভোগের বাসে মোরে, ভোগভরা দুঃখ অনিবার।
চতুর্দ্বীপপতি মহারাজা মান্ধাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভোগে,
মরিলেন সেই নরপতি, লালসা না পূরিল এ লোকে।
সপ্তরত্ন যদি বর্ষাধারে পড়ে শুধু দশদিক্ ভরি,
তবু কভু তৃপ্তি নাই ভোগে; তেজি সব যায় লোকে মরি।
অসি সম, শূল সম ভোগ, নাগ ফণা সম ভোগ, ভূপ!
দহে ভোগ অগ্নিশিখা সম; অস্থি কঙ্কালের মত রূপ।
অনিত্য অধ্রুব ভোগসুখ; দুঃখপ্রদ মহাবিষময়,
তপ্ত লৌহপিণ্ডসম সে যে, করে পাপ দুঃখের উদয়।
বৃক্ষফলসম কামভোগ, মাংসপেশী সম দুঃখ তার,
স্বপ্নসম বঞ্চক এ ভোগ ধার করা ঐশ্বর্য্যের প্রায়।
শক্তিশেল সম কামভোগ, নিদারুণ রোগ, বিস্ফোটক;
অঙ্গারের সদৃশ ভীষণ, পাপ-মৃত্যুময় ভয়ানক।
এই রূপ বহুদুঃখ আনে, বহু বাধা ঘটায় জীবনে;
ফিরে তুমি যাও নিজ ঘরে, সংসারে বিশ্বাস নাই মনে।
অন্যে কি করিতে পারে মোরে, শিরে যবে জ্বলিছে আগুন?
জরামৃত্যু আসিছে বাঁধিতে; ধ্বংসে তার হইব নিপুণ।"
পরে দ্বারদেশে আসি যবে হেরিল সে, মাতাপিতা তার
বসি অনিকর্ত্ত সহ কাঁদে, কহিল তখন আর বার—
"সংসারেতে পুনঃ পুনঃ মোরে, মূঢ় যারা করেগো রোদন;
পিতৃমৃত্যু, ভ্রাতৃবধ আর নিজমৃত্যু রোদন কারণ।
অশ্রু, দুগ্ধ, রুধিরের ধারা নিরন্তর ক্ষরিছে সংসারে;
অস্থিপুঞ্জ জন্মে জন্মে বাড়ে; স্মর বুদ্ধবাণী বারে বারে।
চারিটি সাগর যাবে ভরে' অশ্রু, দুগ্ধ, রুধিরের ধারে;
বিপুল অস্থির পুঞ্জ হবে একই কল্পে পর্ব্বত আকারে।
মাটির গুলিকা দিয়ে যদি সংখ্যা কর জন্মে জন্মে যত
[illegible] মাতা পিতা, তবে তার পূর্ণ হবে সমগ্র ভারত।
যত তৃণ, কাষ্ঠ, পত্র, শাখা তাহা দিয়ে করগো গণনা,
কত পিতা পিতামহ তব সংখ্যা তার হবে না, ভাব না।
স্মর, অন্ধ কচ্ছপকাহিনী, ভ্রমিয়া যে অনেক সাগর
শির তুলি সতত উঠিল, পুনঃ পুনঃ জন্মে তথা নর।
স্মর জলবুদ্বুদের মত—এ শরীর অতীব অসার;
অনিত্য এ পঞ্চস্কন্ধ জান; স্মর দুঃখ নিরয়ে অপার।
শ্মশানবর্দ্ধক এই দেহ পুনঃ পুনঃ জন্ম খালি হয়;
স্মর চারি আর্য্য সত্য তুমি, স্মর কথা কুম্ভীরের ভয়।
কেন পঞ্চ কষায় সেবন, অমৃত থাকিতে কাছে হায়?
সে পঞ্চ কষায়, হতে কটু কাম-রতি জান এ ধরায়।
অমৃত থাকিতে কাছে কেন কামভোগ-লালসা কহ ত?
জ্বালা, কষ্ট, বেগ, তাপ, যাহে ভোগে নর, এ ভাবে সতত।

অনিকর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া সুমেধা বলিলেন:—

"অসপত্ন আমি, আজি তব ভোগপাশে শত্রু জাত হবে;
রাজা, অগ্নি, চোর অপ্রিয় জল, কারো প্রিয় নয় এই ভবে;
তাহা ছাড়া বহুশত্রুময় ভোগ কেবা সাধ করি লবে?
মোক্ষ বিদ্যমানে কেন আমি বধ ও বন্ধন নেব সেধে?
ভোগে হয় মরণ বন্ধন; দুঃখ ভোগে মরে নর কেঁদে।
জ্বলন্ত তৃণের উল্কা যেথা হাতে ধরে, পোড়ে হাত তারি;
তেমনি এ কাম-ভোগ-দাহ; না ছুঁইলে এড়াইতে পারি।
অল্প সুখ পাইবার লোভে হারায়ো না সুবিপুল সুখ;
মৎস্য সম বঁড়শী গিলিয়া মরিও না মূঢ়, লভি দুখ।
কামনায় কামের দমন কর তুমি; যে কাম তোমায়
বাঁধিয়া রেখেছে দৃঢ়তর, শৃঙ্খলিত কুকুরের প্রায়।
ক্ষুধিত চণ্ডাল সম কাম, নহিলে ত ধরিবে সবলে,
যেমন কুকুর ধরেছিল, শুনি যে কাহিনী লোকে বলে।"
ভোগে দুখ অতীব অসীম দুর্ম্মনা সতত চিত্ত রহে;
ত্যজ এ অধ্রুব কামভোগ; দুঃখমাত্র আর কিছু নহে।
থাকিতে অজর ধর্ম্মপথ, জরামৃত কামে কিবা হবে?
আনে কাম মৃত্যু আর ব্যাধি, আর আনে পুনর্জ্জন্ম ভবে।
অজর অমর ধর্ম্ম ভবে, অশোক অমৃত পদময়;
শত্রুহীন, অসম্বাধ, অচ্যুত ও অটুট অভয়।
লভিয়াছে কত লোক এ অমৃত পথ, আজিও লব্ধ বটে;
উৎসাহিত নহে যার চিত, তার ভাগ্যে কভু নাহি ঘটে!"

কহিল সুমেধা এইরূপ, ভোগে যার নাহি ছিল মন ;
কেলিল কর্ত্তিত কেশভার অনিকর্ত্ত সমক্ষে তখন।
কহে অনিকর্ত্ত উঠি, তার মা বাপেরে অনুনয় করি—
"দেহ গো বিদায় সুমেধায়, সে যে সত্য চলে অনুসরি।"
মা বাপ বিদায় দিল তায়, ত্যজে গৃহ শোকভয়ভীতা ;
ষড়ভিজ্ঞা লভিল তখন, শ্রেষ্ঠফললাভেতে শিক্ষিতা।
আশ্চর্য্য অদ্ভুত রূপে পরে—রাজ-কন্যা লভিল নির্ব্বাণ :
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যা ঘটিল, কহিল সে সকল আখ্যান।
"কোণাগম বুদ্ধ, সংঘারামে করিলেন সুধর্ম্ম প্রচার ;
মোরা তিন সখী মিলি তাঁয়, দিয়াছিনু গড়িয়া বিহার।
শত শত সহস্র বরষ জন্মিলাম দেবলোক যথা ;
এমনি কাটিল বহু যুগ, কিবা আর নরলোক কথা।
দেবলোকে মহা ঋদ্ধি ছিল ; নরলোকে ছিনু অনুপমা
সপ্তরত্ন যুত রাজা* যিনি, ছিনু তাঁর স্ত্রীরত্ন উত্তমা।
শিখিলাম ক্ষান্তি বুদ্ধপদে, সেই সর্ব্ব ধর্ম্মের নিদান ;
প্রথমে সে সত্যলাভ করি ধর্ম্মরত লভয়ে নির্ব্বাণ।
অতুল্য বুদ্ধের বাণী 'পরে শ্রদ্ধা যার অন্তরে সর্ব্বদা,
ভবতৃষ্ণা যেবা করে নাশ, মুক্ত-শুদ্ধ বিরাজে সে সদা।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পচা দ্রব্যে দুর্গন্ধের কারণ।

দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদ ব্যতীত গন্ধ দ্বারাও আমরা দ্রব্যের পচন অনুভব করিতে পারি। জগৎপিতা আমাদিগকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা সকল দ্রব্যের গন্ধ পাই এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বিশ্লেষণ করিতে পারি। সুগন্ধের আমরা আদর করি এবং দুর্গন্ধকে যতশীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কোন খাদ্যদ্রব্যে যখন দুর্গন্ধ অনুভব করি তখনই তাহা পচিয়া গিয়াছে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকি। দরিদ্রতার কঠোর শাসনে যাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন তাঁহারা খাদ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন জন্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এইরূপ দুর্গন্ধ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে নিম্নে তাহা বিবৃত হইল। যবক্ষারজান যুক্ত প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য খোলা বায়ুতে রাখিয়া দিলে আর্দ্রতা ও তাপ প্রভাবে ঐ সকল দ্রব্যের উপাদান সম্পূর্ণরূপে অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহাতে বায়ুর অম্লজান শোষণ করিয়া উহার অঙ্গার ভাগ অঙ্গারাম্ল বাষ্পে পরিবর্ত্তিত ও জলজান বাষ্প জলাকারে পরিণত হয়। এ ভিন্ন জলজান বাষ্প, ফস্‌ফরাস্, গন্ধক ও অঙ্গার প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প প্রস্তুত হয়। যবক্ষারজান ও জলজান বাষ্প মিলিত হইয়া এমোনিয়া বাষ্প প্রস্তুত হয়। এই সকল কারণেই উক্ত দ্রব্যে তীব্র দুর্গন্ধ হয়। এই সকল বাষ্প ক্রমে ক্রমে বায়ুর সহিত সূক্ষ্মাণুরূপে দূরীভূত হইলে এক প্রকার লঘু কাল দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাও মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। যেমন,—কোন পশু পক্ষী মরিয়া কোন খোলা স্থানে পড়িয়া থাকিলে তথায় প্রথমে অতি তীব্র দুর্গন্ধ হয়, কিছুদিন পর তথায় আর সেরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না।

কিছু ভাত যদি কোন খোলা হাড়িতে কয়েকদিন রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে তাহার উপর একটী সাদা স্তর পড়িয়াছে, তৎপরে তাহা দুর্গন্ধ যুক্ত হয় ও তাহাতে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ভাতগুলি ক্রমে তরল হইয়া যায়। কিছুদিন পর তাতেআর কীট দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা শুষ্ক ও কালবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পচন নিবারণের উপায়।

(১) যবক্ষারজান যুক্ত রসপূর্ণ দ্রব্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন—প্রাণী দেহের যবক্ষারজান যুক্ত দ্রব্যই

---

* মহারাজচক্রবর্ত্তীরা সপ্তরত্নযুক্ত হইতেন বলিয়া টীকায় লিখিত আছে। সপ্তরত্ন যথা—সোবন্ন (স্বর্ণ), রূপি (রৌপ্য), বেলুরিয়ো—বৈদূর্য্য (যার গায়ে কাঁচা বাঁশের রং), ফলিক (স্ফটিক), লোহিতঙ্ক (রক্তবর্ণরত্ন), মসারগল্ল (অশ্মগর্ভ), মুসারগল্ব (সর্ব্বরত্নময় বলিয়া কথিত)।

চুল্লবগ্‌গে দশটি রত্নের নাম পাওয়া যায়। যথা—মুত্তা (মুক্তা), মণি, বেলুরিয়ো, সঙ্খো, সিলা, পবালং, রজতং, জাতরূপং, লোহিতঙ্কো, মসার গল্ল।

প্রথমে পচিতে আরম্ভ হয়। আবার যবক্ষার জান দ্বারাই অণ্ড-লালিক পদার্থের অনেকাংশ প্রস্তুত হয়। এই অণ্ড-লাল সকল প্রাণীদেহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। অণ্ড-লাল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিলে সহজে পচিয়া যায়। এজন্য যে সকল উদ্ভিজ্জে অণ্ড-লালিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে তাহা শীঘ্র পচিয়া যায়। অণ্ড-লাল সংযত করিয়া রাখিলে সহজে পচিতে পারে না, কারণ উহার জলীয় অংশ পৃথক হইয়া যায় এবং পুনরায় তাহা জলে দ্রব হয় না। সেই কারণেই যে সকল উপায়ে অণ্ড-লাল সংযত হয়, অথবা যে সকল পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে অথচ তাহা নিজেও পচনশীল নহে, সেই সকল উপায় ও সেই সকল দ্রব্যই পচন নিবারক।

শির্কা (ভিনিগার), লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড্), তেঁতুলের টক প্রভৃতি অম্ল দ্রব্যাদি ঐ শ্রেণীর। উহারা নিজে পচনশীল নহে এবং অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে সংযত করে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য যোগে খাদ্যদ্রব্যাদি (বিশেষতঃ যাহাতে অণ্ড-লালের ভাগ বেশী) মিলিত করিয়া রাখিলে তাহা অনেক দিন ভাল থাকে। অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংস, মৎস্য, এবং আচার প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে।

কতকগুলি কষায় দ্রব্য, যথা, খদির, বয়ড়া, হরিতকী, আমলকী, সুপারি, বাবলার ছাল, গাব, মাজুফল, ট্যানিক্ এসিড্, গ্যালিক্ এসিড, গঁদ (Gum) প্রভৃতি অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহাকে কঠিন ভাবে সংযত করে এবং তাহা অদ্রবণীয় হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য এতই কঠিন ভাবে সংযত হয় যে, তাহা পাক রসে সহজে দ্রব হয় না। ইহা ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য অত্যন্ত সংকোচক বলিয়া দেহের অপকারী পদার্থসকল, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম দ্বারা বহির্গত হইতে পারে না। সেজন্য ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যের সংমিশ্রণে রাখিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

সুরাসার (এল্‌কোহল), কার্ব্বলিক তৈল, ক্রিয়োজোট, [illegible] প্রভৃতিও অণ্ড-লালকে সংযত করিতে পারে এবং তাহারা নিজেরাও পচন নিবারক; কিন্তু ইহারা উগ্রবিষ ও তীব্র গন্ধ যুক্ত বলিয়া ইহাদের সহিত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রক্ষা করা উচিত নহে।

লবণ ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের কতকাংশ অণ্ড-লালের সহিত মিলিত হইয়া উহার কতক জলভাগ পৃথক্ করে, এজন্য অণ্ড-লাল সংযত হয়। সেজন্য ধাতু ঘটিত লবণ ও খনিজ পদার্থ প্রবল পচন নিবারক না হইলেও তাহারা আংশিক পচন নিবারক। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ফট্‌কিরি অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে সংযত করে, এজন্য ফট্‌কিরি প্রবল পচন নিবারক। কিন্তু ইহাকে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করা উচিত নহে; কারণ, ইহা প্রবল সংকোচক। সামান্য লবণ (যাহা আমরা খাই) সোরা, নিশাদল, পটাশ, টাট্রাস প্রভৃতি দ্রব্য কতকাংশে পচন নিবারক। ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণ খাদ্যদ্রব্য ভাল থাকে। সামান্য লবণের সহিত ফট্‌কিরি মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত রাখিলে অনেকক্ষণ ঐ খাদ্যদ্রব্য ভাল থাকে। ধাতব লবণগুলি সকলই বিষাক্ত, সেজন্য তাহা খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া রাখা উচিত নহে। তন্মধ্যে হিরাকষ অল্প পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিলে তত ক্ষতি করিতে পারে না।

(২) খাদ্যদ্রব্যের জল-ভাগ অন্তর্হিত করা—খাদ্য-দ্রব্যের জল ভাগ অন্তর্হিত করিতে পারিলে অথবা খাদ্য-দ্রব্যের অণ্ড লালিক পদার্থের জল ভাগ শুষ্ক করিয়া রাখিলে, তাহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে। সেই জন্যই শুষ্ক পদার্থ পচে না। খাদ্যদ্রব্য প্রখর তাপে তৈলে কিম্বা ঘৃতে ভাজিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুরুপাক হয় ও তাহার তত পুষ্টিকারিতা গুণ থাকে না। তথাপি অনেক দ্রব্য-ঐ অবস্থায় শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে। মৃদু তাপে অথবা রৌদ্রেও খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে। এ প্রকারেও খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ১৪০ ফারেনহিট্ তাপে খাদ্যদ্রব্যের অণ্ড-লালিক পদার্থ সংযত না হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ তাপে দ্রব্যাদি শুষ্ক করিয়া রাখিলে বহুদিন পরেও ঐ দ্রব্য অটুট

বেশ দ্রব হয় এবং সত্তঃ অবস্থায় তায় সমুদায় সুঘ্রাণ প্রদান করে।

লবণ, চিনি, এল্‌কোহল, ইহারাও অত্যন্ত জলশোষক। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, বহুদিন ভাল থাকে। লবণ যে বিলক্ষণ জল আকর্ষণ করে তাহা সকল গৃহস্থই বর্ষাকালের লবণ দেখিয়া বুঝিতে পারেন। বর্ষাকালে লবণ সাধারণতঃই ভিজা থাকে, শুষ্ক করিয়া রাখিলেও আবার তাহা জল হইয়া যায়; তাহার কারণ, লবণ বায়ুর জলীয় ভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে তাহা খাদ্যদ্রব্যের জল ভাগ গ্রহণ করে।

লোণা জলে দ্রব্যাদি মগ্ন থাকিলে উহার অণ্ড-লাল কতক জল ত্যাগ করে; যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, লোণা জলে মগ্ন থাকাতে এক দিকে লবণ জল-ভাগ ক্রমশঃ আকর্ষণ করে ও অন্য দিকে ভূ-বায়ুর অম্লজানের গতি বন্ধ করাতে লোণা দ্রব্য শীঘ্র পচিতে পারে না। মৎস্য ও মাংসে লবণ মাখাইয়া রাখিলে উহার জলভাগ অন্তর্হিত হইয়া শক্ত হয়, সুতরাং তাহারা অনেক দিন ভাল থাকে। সেই জন্যই লোণা মৎস্য আমাদের দেশ হইতে আসাম, শ্রীহট্ট, রংপুর, দিনাজপুর ও সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদিও রেল কোম্পানির অনুগ্রহে বরফ-মণ্ডিত মৎস্যই এক্ষণে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে, তথাপি তত্তৎ দেশবাসিগণ এখনও ঐ লোণা মৎস্যের আদর করিয়া থাকেন। লবণ সহজ প্রাপ্য ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। ইহা বিষাক্তও নহে অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা করিতে হইলে লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখা মন্দ নহে।

চিনি জল শোষণ বিষয়ে লবণের সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত কম নহে। চিনিও লবণের ন্যায় বর্ষাকালে কিম্বা সেঁতসেঁতে স্থানে রাখিলে সহজে ভিজিয়া যায়, তাহার কারণ চিনি বায়ুর জলীয় ভাগ গ্রহণ করে। চিনি দ্রব্যাদির জল শোষণ করিয়া শর্করাপাক (সিরাপ) প্রস্তুত করে। শর্করার পাক মধ্যে দ্রব্যাদি মগ্ন থাকিলে, নির্জল থাকে অথচ ভূ-বায়ুর অম্লজানের গতিরোধ করে। সেই জন্যই সন্দেশ, গজা, জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও বেল, আম্র, হরতকী ও আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা চিনি সংযোগে প্রস্তুত হওয়াতে দীর্ঘকাল ভাল থাকে। এই কারণেই ডাক্তারী অনেক ঔষধ চিনি সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং সহজেই বোঝা গেল যে, চিনি সংযোগে খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে।

সুরাসার (এল্‌কোহল) দ্রব্যকে শুষ্ক করিয়া নির্জল করতঃ উহার পচন নিবারণ করে। তদ্ব্যতীত ইহার নিজেরও পচন নিবারক গুণ আছে। সুরামধ্যস্থ দ্রব্য বায়ুর অম্লজানের সহিত সম্মিলিত হইবার সুযোগ পায় না। সুতরাং কোন দ্রব্য ইহাতে মগ্ন থাকিলে, সহজে পচিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি মগ্ন রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহার সংযোগে খাদ্যদ্রব্যের গুণের অনেক পরিবর্ত্তন হয় ও অণ্ড-লালিক পদার্থ এত কঠিন হয় যে, তাহা সহজে পাক-রসে পরিপাক হয় না। ইহা ব্যতীত দ্রব্যের পুষ্টিকারিতাও অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, তথাপি দ্রব্য সংরক্ষা বিষয়ে সুরা বেশ উপযোগী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য সুরাতে মগ্ন করিয়া রাখিলে প্রায় সত্তঃ অবস্থায় থাকে। ডাক্তারী অনেক ঔষধ, বিশেষতঃ অরিষ্ট (টিংচার) ঔষধ মাত্রই ইহার দ্বারা সংরক্ষা করা হইয়া থাকে।

প্রাণীজ বস্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক অঙ্গারচূর্ণ অথবা বালুতে মাখাইয়া, বায়ুতে রাখিয়া শুষ্ক করিলে, অনেক দিন ভাল থাকে।

(৩) শৈত্য প্রয়োগ—শৈত্য প্রয়োগ দ্বারাও খাদ্যদ্রব্য অনেক সময় ভাল থাকে। খাদ্যদ্রব্য বরফ মধ্যে রাখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে। অধুনা বরফ দ্বারা মৎস্যাদি অনেক স্থলেই রেলযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থের বরফ পাওয়া কঠিন। তাহাদের পক্ষে শীতল জলের উপর অথবা শীতল স্থানে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা মন্দ নহে; তাহাতেও ঐ সকল দ্রব্য অনেক সময় ভাল থাকিতে পারে।

(৪) তাপ প্রয়োগ—তাপ প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর

অম্লজান পৃথক করিতে পারিলে খাদ্যদ্রব্যাদি দীর্ঘকাল ভাল রাখা যাইতে পারে।

কোন পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহাতে তাপ দিলে পাত্রস্থ বায়ু প্রসারিত হইয়া কতকটা অন্তর্হিত হয়। ঐ সময় সেই পাত্রের মুখ আবদ্ধ করিলে, বাহিরের বায়ু আর ভিতরে যাইতে পারে না। আর ভিতরে যে অল্প পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ থাকে তাহা পাত্রমধ্যস্থ দ্রব্যের সারাংশের সহিত স্থায়ী ভাবে মিলিত হইয়া যায় সুতরাং আর পচন উৎপন্ন হয় না। এই ভাবে অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষা করা যায়।

খাদ্যদ্রব্যের পাত্রে অল্প পরিমাণ গন্ধক কিম্বা ফস্‌ফরাস্ দগ্ধ করিলে ঐ পাত্রের অম্লজান নষ্ট হইয়া যায়, এই অবস্থায় পাত্রটী বায়ুরোধক ভাবে বন্ধ করিলে ঐ দ্রব্য দীর্ঘকাল ভাল থাকে।

খাদ্যদ্রব্যের পাত্রমধ্যে চাপ দ্বারা অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রবিষ্ট করাইলে অথবা তৈল, সিরাপ, গ্লিশারিণ, সুরা প্রভৃতি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া বায়ুরোধক ভাবে রাখিলে, ভূ-বায়ুর অম্লজান পচন উৎপাদন করিতে পারে না।

এমোনিয়া বাষ্প অথবা গন্ধক পোড়াইলে যে বাষ্প হয় সেই বাষ্পে মাংসাদি রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে।

সদ্যঃ অঙ্গারচূর্ণমধ্যে মৎস্য মাংস থাকিলে পচিতে পারে না। তাহার কারণ অঙ্গার চূর্ণ ঐ দ্রব্যের চারিধারে থাকাতে ভূ-বায়ুর অম্লজানকে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত ভাবে রাখে, এজন্য বায়ুর অম্লজান অঙ্গার-চূর্ণ ভেদ করিয়া দ্রব্যাদির পচন উৎপাদন করিতে পারে না। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

দিদি।

জ্ঞান হইয়া অবধি দিদিকেই জানিতাম। মা কেমন ছিলেন, সে জ্ঞান হয় নাই। হৃদয়ের সব স্নেহ ঢালিয়া তিনি আমাদের মার অভাব জানিতে দেন নাই। শৈশবে দিদিকেই মা বলিয়া জানিতাম। বড় হইলে জানিলাম আমাদের মা, আমাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াই সেই অজানা লোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে কথা জানিয়াও কখনো বেদনা পাই নাই। আমাদের ভাই বোন কয়টিকে বুকে করিয়া আমাদের শত আবদার উপদ্রব অম্লান মুখে সহ্য করিয়া শৈশবের অসহায় অবস্থা হইতে দিদি আমাদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দিদি সারাদিন মূর্ত্তিমতী করুণার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীর সকলের অভাব মোচন করিয়া বেড়াইতেন। দুপ্রহরে বাবার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে কখনো সংবাদপত্র পড়িয়া, কখনো কোনো গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাকে শোনাইতেন। দিদিকে কখনো বিশ্রাম করিতে দেখি নাই। রাত্রি দশটার পর আমাদের গৃহখানি নিস্তব্ধ হইলে, সংসারের সব কাজ শেষ করিয়া তিনি অধ্যয়নে রত হইতেন। জ্ঞান হইয়া অবধি তাঁহাকে কখনো বিদ্যালয়ে যাইতে দেখি নাই। কিন্তু বাবার কাছে শুনিয়াছি, আমরা যখন খুব ছোট তখন দিদি বিদ্যালয়ে যাইতেন। আমরা বড় হইয়া উঠিলে তাঁর বিদ্যালয়ে যাইবার অবসর হইয়া উঠে নাই। নিরূপিত সময়ে খাওয়াইয়া আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেই তাঁর সব সময় যাইত।

বড় হইয়া বুঝিলাম, দিদি অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। আমার দাদারা তখন এম, এ, বি, এ পাস করিয়াছেন। আমার উপরের দুই দিদিও দুই একটী পাস করিয়াছেন। আমি তখন অনেক নীচে পড়ি। দিদি আমাদের কয়টি বোনকে বাড়ীতে পড়াইতেন। আমাদের পরীক্ষার সময় আমাদের পড়ায় সাহায্য করিতেন। দিদিদের পরীক্ষার সময়ে তাঁদের সঙ্গে করিয়া পরীক্ষা-মন্দিরে লইয়া গিয়া যথাবিধি উপদেশ দিয়া আসিতেন। বি, এ, পড়িবার সময় দিদির নিকট হইতে দাদারা দর্শন শাস্ত্র বুঝিয়া লইতেন। আমি দেখিয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতাম, দিদি কবে, কোন্ সময়ে এত লেখা পড়া শিখিলেন? দিদিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন, "বেশী কি আর শিখতে পেরেছি দিদা। যে টুকু শিখেছি তা বাবার

কাছ থেকে। তোদের মত বুদ্ধি থাক্‌লে তাঁর কাছ থেকে আরো কত শিখ্‌তে পারতাম। তোরা ত সব কত বিদ্বান, কত পাস করে ফেলেছিস!" আমি দিদির স্নেহ-কোমল বুকে মাথা রাখিয়া বলিতাম, "তুমি তাহ'লে আরো বিদ্বান। কেননা, তুমিই ত আমাদের পাস করিয়েছ।" দিদি শুধু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "কত শেখ্‌বার আছে বোন! শিখতে পারলাম কই!" দিদির দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার বড় কষ্ট হইত। সুতরাং সে কথা আর কখনো আমি তুলি নাই। দিদির ব্যথা, দিদির কষ্ট আমাদের অসহ্য ছিল।

শৈশবে কখনো কোন অন্যায় কাজ করিলে কিংবা পাঠে অবহেলা করিলে, সব চেয়ে ভয় হইত 'দিদি কি বলিবেন?' আমাদের দুষ্টামি দমন করিত—দিদির দুটি সজল নয়ন, একটি কাতর চাহনি। দিদি শুধু আসিয়া স্বপ্নময়, জলভরা চোখ দুটি মেলিয়া আমাদের দুরন্তপানার মধ্যে দাঁড়াইতেন। অমনি আমরা শান্ত হইয়া যাইতাম, আমরা কাঁদিয়া দিদির বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। তিনি কিছু না বলিয়া শুধু আমাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন। আমরা মা-হারা বলিয়াই বুঝি দিদি আমাদের কখনো তিরস্কার করিতে পারেন নাই। দিদি আমাদের খেলায় সাথী, জ্ঞানচর্চ্চায় শিক্ষক, রোগে সেবিকা।

দিদি না হইলে বাবারও এক মুহূর্ত্ত চলিত না। আহারের সময় দিদি কাছে বসিয়া না থাকিলে তাঁহার আহারই হইত না। দিদিও বাবার সব কাজ নিজ হাতে করিতেন, আর কাহাকেও করিতে দিতেন না। বাবার জুতা পরিষ্কার হইতে লেখা পড়ার কাজ সব দিদি করিতেন, আর কেহ তাহা করিলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। দিদি না হইলে বাবারও সব গোলমাল হইয়া যাইত। কোথায় কাপড়, কোথায় জামা, কোথায় বই রাখিতেন তার ঠিক থাকিত না। দিদির ম্লান মুখ, বিষাদময় হাসি আমার ক্ষুদ্র অন্তরকে আকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু তাঁহাকে কখনো নিজের কোন সুখ দুঃখের কথা বলিতে শুনি নাই। বাবার এবং আমাদের সুখ দুঃখের মধ্যে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তিনি আমাদের সুখী করিয়াই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহার যে কোনো অভাব, কোন বেদনা থাকিতে পারে তাহা একদিনের জন্যও আমরা জানিতে পারি নাই।

কলেজে পড়িবার সময় আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। ইহার পূর্ব্বেই দাদা ও আমার উপরের দিদি-দের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। দাদা এম, এ পাস করিয়া অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন। দিদিকে সংসারের কাজ তখন আর দেখিতে হইত না। কিন্তু তিনি বাবার সেবার ভার নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন। বাবাকে আর কাহারও হাতে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। দিদির একটু অসুখ হইলে, তাঁহার কোন রকম কষ্টের কারণ হইয়াছে বুঝিলে বাবাও অস্থির হইয়া উঠিতেন। দিদির বেদনা-ব্যথিত মর্ম্মের কথাটুকু তিনি জানিতেন বলিয়াই বুঝি তাঁহার এমন ব্যাকুলতা দেখা যাইত। দিদিকে "মা" নাম ছাড়া আর কোন নামে বাবাকে ডাকিতে শুনি নাই। ভাই বোনেরা সকলেই বিবাহ করিলেন, দিদি কেন করেন নাই, একথা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতাম; কিন্তু সাহস করিয়া কোনো দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

আমার বিবাহ স্থির হইলে, আমি বলিয়া বলিলাম, "আমি বিবাহ করিব না। দিদির মত অবিবাহিতা থাকিয়া সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিব। দুদিন একটি লোককে দেখিয়া, দুদিন তার সঙ্গে দুটো কথা বলিয়া তাকে আমি চিরজীবনের সহচর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।" আমার পণ ছিল, আমি কাহাকেও ভাল না বাসিয়া, অনেকদিন ধরিয়া তার পরিচয় না লইয়া এবং আমার পরিচয় তাকে না দিয়া বিবাহ করিব না। আমি চাহিতাম, যে আমাকে বিবাহ করিবে সে আমার মধ্যে আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়া দিবে। সে শুধু আত্মহারা হইয়া চাহিবে আমার আত্মাকে। আমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, খ্যাতি, ধন, মান কিছুই দেখিবে না। আমি শুনিয়া-ছিলাম, রমেশ আমাকে তাহার হৃদয়ের প্রেম দিয়াছে,

আমাকে পাইলে সে বড় সুখী হইবে। আমি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, "এ একটা কল্পনা মা'ত্র। দুদিন দেখিয়াই অমনি ভালবাসা—অসম্ভব।"

আমি বিবাহ করিব না শুনিয়া দিদি স্তম্ভিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ম্লান মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি মনে করিয়াছিলাম, সকল কার্য্যে তাঁর একটি সহযোগী পাইবেন বলিয়া তিনি এ সংবাদে সুখী হইবেন। কিন্তু তিনি সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "না মিনা, এমন কথা বলোনা।" তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া তাঁর ঘরে লইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ করিয়া আমার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মিনা, আর তুমি এমন কথা বলো না। রমেশের প্রেম কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিও না। জেনো, এমন জিনিষ জীবনে একবার পাওয়া যায়। এ জিনিষ পাবার সুযোগ একবার হারালে আর তা ফিরে আসে না। তুমি হয়ত অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছ, 'আমি কেন বিবাহ করি নাই?' সে কথা শুধু বাবা জানেন। আর কাহাকেও সে কথা জীবনে জানাব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার শিক্ষার জন্য আমার মর্ম্মের সে নিভৃত কক্ষটি খুলে দেখাচ্ছি। মিনা, মিনতি করে বল্‌ছি, আমার দৃষ্টান্ত দেখে শেখো। আমার মত অসুখী হয়ো না।

যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছিল তিনি ডাক্তার ছিলেন। আমার স্বভাবের প্রধান দোষ ছিল—আমার জেদ। আমি যে সব মেয়েদের সঙ্গে মিল্‌তাম তারা সকলেই ধনী, বিলাসী, এবং আত্মসুখান্বেষী ও আমোদ-প্রিয় ছিল। এক একটি মেয়ে যেন একটি প্রজাপতির মত। তাদের সঙ্গে আমার মেলা মেশা তিনি পছন্দ কর্‌তেন না। আমার কিন্তু তাদের বড় ভাল লাগ্‌ত। তখন তাদের গুণ বুঝ্‌বার ক্ষমতা আমার ছিল না। তিনি প্রায়ই আমাকে বল্‌তেন, 'লীনা, তুমি ওদের সঙ্গে আর মিশোনা। বল, আর মিশবে না?' আমি তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বল্‌তাম, 'না, তা হবে না!' তিনি বল্‌তেন, 'এই দেখ, ওদের সঙ্গে মিশে তোমার সদ্‌গুণ যে চলে যাচ্ছে তার এই একটা প্রমাণ। তোমার ত শিক্ষা দীক্ষা এরকম নয়!' তবুও আমি তাঁদের সঙ্গে মিশ্‌তে ছাড়ি নাই।

এক দিন—সে এক ম্লান সন্ধ্যায়—তিনি এসে একটু যেন রুক্ষস্বরে বলিলেন—বিবাহের তখন এক সপ্তাহ মোটে বাকী—'শোন, লীনা, আজ এ সম্বন্ধে শেষ কথা শুন্‌তে চাই। তোমার বন্ধুদের ছাড়তে হবে। তুমি আমাকে চাও, না, তোমার বন্ধুদের নিয়েই থাক্‌বে?' আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লাম, 'আমার বন্ধু কে থাক্‌বে না থাক্‌বে তা ঠিক ক'রে দেবার আপনার কি অধিকার? আমি তাদের কখনই ত্যাগ করব না।' তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। রক্তহীন ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিল। আকুল হতাশার সহিত আমার দিকে চেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে আমার যেন জ্ঞান হ'ল। তাঁর সেই বেদনাময় কাতর দৃষ্টি আমার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করে দিতে লাগ্‌ল। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, কাল আসিলে ক্ষমা চেয়ে তাঁর বেদনা দূর করে দিব। কিন্তু তিনি আর আসিলেন না। পরে জানিলাম, তিনি নেপালে চলে গিয়েছেন। অনেক চেষ্টায়ও তাঁর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পর সেখানকার একজন লোক একখানি চিঠি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'প্রিয়তমে, তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। যে লোকে যাইতেছি সেখানে আমাদের মিলন হইবে।'

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে! আজ সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ ঘরের কোণে বসিয়া দিদিকে ডাকিয়া বলিতেছি, "দিদি! দেবি! আমার এ সুখ তুমি একবার দেখিয়াও গেলে না।"

বাহিরে কালো কালো মেঘ স্তরে স্তরে জমিয়া শ্রাবণের আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। অসীম আকাশ ছাইয়া বিপুল আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে। কালো মেঘের ভিতর হইতে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে আর গুরু

গুরু রবে মেঘ ডাকিতেছে। ঝর ঝর বারি-ধারার ন্যায় আমার অশ্রুধারাও বেগে বহিতে লাগিল।

শ্রীমতী—— (বি,এ)।

সঙ্কটতারিণী-ব্রতকথা।

সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের পুরনারিগণ সঙ্কটতারিণী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈশাখ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসই এ ব্রতের প্রশস্ত সময়। তবে সঙ্কটে পড়িয়া যখন ইচ্ছা তখনই এ ব্রতের অনুষ্ঠান করা যায়। এই ব্রত একজন বা ততোধিক পুরনারী মিলিত হইয়া সম্পন্ন করিতে পারেন।

নিয়ম—চাউলের গুঁড়ো আট মুষ্টি আট চিম্‌টী পরিমাণ একখানা কলার মাজপাতে লইয়া তাহাতে যথাবিহিত ফল ফলারী দিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া যথারীতি পূজা সম্পন্ন করিলে পর ব্রতের কথা আরম্ভ হয়। ব্রত-কথা সমাপন করিয়া জল দূর্ব্বা তুলসীর ছিঁটা দিয়া ব্রতের গুঁড়ো দ্বারা চিতল পিঠা প্রস্তুত করিয়া ব্রতী আহার করিবেন। সে দিন অন্ন আহার নিষেধ। রবিবার কিম্বা বৃহস্পতিবারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ব্রতকথা।

এক ছিল ভিক্ষাশন ব্রাহ্মণ—তার ছিল এক কন্যা। কন্যা ছোট বেলা হইতে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতি-বারেই "সঙ্কটত্রাণী" ব্রত করত। মেয়ে বয়স্থা হলে ব্রাহ্মণ তাহার বিবাহ ঠিক করলেন এক রাজপুত্রের সঙ্গে। বিবাহের দিন্‌টী হল আবার সেই রবিবার। মেয়ে বিবাহের দিনেও সে সঙ্কল্পটী ত্যাগ করতে পারলে না। সে ব্রতের উপকরণ সংগ্রহের সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগল। রাজবাড়ী লোক লস্করে ভরা, সেখানে কোথায় পাবে কন্যা চাউলে গুঁড়ো! তাই বিবাহের সময় কলাতলা হইতেই সে কিছু চাউলের গুঁড়ো সংগ্রহ করে কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। কেহ তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিল কেবল রাজপুত্র। বিবাহ হইয়া গেল। বর কনে শয়ন করিলে রাজপুত্র ভাবিল, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কন্যা দেখি রাত্রে কি করে, তাই ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। কন্যা ভাবিল, রাজপুত্র ঘুমাইয়াছে, তাড়াতাড়ি আমার ব্রত শেষ করিয়া ফেলি। তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া কন্যা, কাপড়ের আঁচল হইতে গুঁড়োগুলি বাহির করিয়া বরের আরসীর সঙ্গে যে কলার মাজ ছিল তাহাতে জল দিয়া ভিজাইল ও পরে আরসীতে করিয়া প্রদীপের গরমে সিদ্ধ করিয়া পিঠা প্রস্তুত করিল। ব্রত সমাপন ও ধীরে ধীরে উলুধ্বনি করিল। এ দিকে রাজপুত্র এসকল দেখিয়া অবাক্! ভয় হইল, এ বুঝি কোন দানবী বা পিশাচী!

ব্রত সমাপন হইবার কিছু পূর্ব্বেই রাজপুত্র উঠিয়া বসিল ও কন্যাকে বলিল, "এ কি করিতেছ!" কন্যা বলিল, "আমি ছোট বেলা হতে "সঙ্কটত্রাণী" ব্রত করে আস্‌ছি, আজ সেই ব্রতের দিন। এতক্ষণ অবসর পাই নাই, তাই এখন সমাপন করিলাম।"

রাজপুত্র বলিল, "এ ব্রতের ফল কি?"

কন্যা। এই ব্রত করিলে অবিবাহিতের বিবাহ হয়, নির্ধনের ধন, অপুত্রকের পুত্র হয়, সঙ্কটে পড়িয়া যে যে কামনা করিয়া ব্রত করে তাহার সে সাধ পূর্ণ হয়।

রাজপুত্র হাসিয়া বলিল, "কাল আমি তোমার সকল গহনা জলে ফেলিয়া দিব, দেখিব তোমার সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণী কেমনে তাহা রক্ষা করেন?"

রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুত্র কন্যার সকল অলঙ্কার নদীর জলে ফেলিয়া দিতে চাহিলে কন্যা হাস্‌তে হাস্‌তে অলঙ্কার সব খুলে একটা কৌটায় পুরিলেন এবং তিনটা টোকা দিয়ে, "মা সঙ্কটত্রাণী, আমার জিনিসগুলি রক্ষা করিও," বলিয়া দাসীর হাতে দিলেন। দাসী রাজপুত্রের সম্মুখে গভীর জলে কৌটা ফেলিয়া দিল। জলের নীচে সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণী হাত পাতিয়া অলঙ্কারের কৌটা গ্রহণ করিলেন। তারপর সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণী একে একে সকল মাছকে সেই কৌটাটী রাখিতে অনুরোধ করিলেন, কেহই স্বীকার পাইল না। অগত্যা এক রাঘব বোয়ালের নিকট রাখিয়া দিলেন, সে পেটের ভিতর উহা রাখিয়া দিল।

দুই দিন চলিয়া গেল। আজ কন্যার পাকস্পর্শের দিন। রাজবাড়ীর পাকস্পর্শ, তাই নদীতে সব জেলে মাছ ধরিতে নামিয়াছে ; কিন্তু কেহ কোথাও মাছ পাইতেছে না। সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণী আজ সকল মাছকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, কেবল ঐ রাঘব বোয়ালটীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বহু চেষ্টায় ঐ রাঘব বোয়াল ধরা পড়িল। রাজবাড়ীতে খবর আসিল। সকলে ছুটাছুটি করিয়া দেখিতে গেল। কন্যাও সেই মাছটী দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাতে সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে 'গরীব ব্রাহ্মণের কন্যা কিনা ? বড় মাছ ত আর দেখে নাই, তাই মাছ দেখতে চায় !' যথাসময়ে মাছ কন্যার নিকটে নীত হইল। কন্যা মাছটী কাটিয়া তাহার সেই অলঙ্কারের কৌটা প্রাপ্ত হইল এবং মাছটী দাসীকে ফেরত পাঠাইয়া দিল। দাসী মাছ কাটিয়া দিল, রান্না সমাধা হইল। সকলে আহার করিতে বসিলে কন্যা সকল অলঙ্কার পরিধান করিয়া ভাত নিয়া তাহাদের পরিবেশনের জন্য উপস্থিত হইল ; রাজপুত্র অমনি উঠিয়া পড়িল। সকলে অবাক, এ কি কাণ্ড !

রাজপুত্র বলিল, "আমি নিজে সকল অলঙ্কার নদীতে ফেলিয়া দেওয়াইয়াছি, কন্যা এগুলি কোথা হইতে আনিল ? এ কন্যা সুচরিত্রা নহে।" সুতরাং সকলে চলিয়া গেল। কেহই আহার করিল না। কন্যা মনের কষ্টে সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণীকে এক মনে ডাকিতে লাগিল। রাত্রে রাজপুত্র এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিতে পাইল, সঙ্কটত্রাণী ঠাকুরাণী তাহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমার ব্রতীর মনে কষ্ট দিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি। সত্বর তুমি পাকস্পর্শের ব্যবস্থা কর, নতুবা তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

পরদিন প্রাতে রাজপুত্র শয্যাত্যাগ করিয়াই ব্যস্তভাবে সকলকে পায় হাতে ধরিয়া পাকস্পর্শের ব্যবস্থা করিল। তারপর কতকদিন বেশ চলিয়া গেল। কন্যার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। আমোদ আহ্লাদে রাজ্যে মহা আনন্দ উৎসব চলিতে লাগিল। ক্রমে কুমারের অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। কাজ আরম্ভ। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সানাই নাগরা বাজিয়া উঠিয়াছে। আমোদ আহ্লাদে রাজপুরী ওতপ্রোত।

আজ বার বছর—বৃদ্ধ রাজা এক বিশাল পুকুর খনন করাইয়াছেন, কিন্তু তাতে জল নাই। ইহাতে রাজা বড়ই মনের কষ্টে আছেন। এই দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার নবজাত নাতিটীকে কাটিয়া যদি রক্তে ঐ পুকুর ধৌত করেন তবেই পুকুর জলে পূর্ণ হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া রাজার প্রাণে বিষম ব্যথা লাগিল। সেদিন আর শয্যা ত্যাগ করিলেন না। বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, তথাপি রাজার দ্বার খুলিল না। সকলেই কিছু আশ্চর্য্য হইল। ক্রমে পুত্রবধূর নিকটও খবর আসিল, রাজা শয্যাত্যাগ করেন নাই। তিনি নিজেই শাশুড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্বশুরের মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কোন উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না। কন্যা লোকমুখে পুত্রের রক্তদানের কথা শুনিয়া রাজাকে হাস্যমুখে বলিলেন, "ইহার জন্য মনঃকষ্টের কারণ কি ? আজ আরম্ভের দিনে ছেলেকে কাটিয়া দেশে জলের ব্যবস্থা করুন।" রাজা অবাক ! এমন সুকুমার শিশুকে হত্যা কি সম্ভব ?

চতুর্দ্দিকে এই বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে শিশুর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া পুকুর রক্তে রঞ্জিত হইল। দেখতে দেখতে পুকুর জলে ভরিয়া গেল ; রাজবাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কে কার খবর নেয় ? রাজপুরী নিঝুম !

পুকুর জলে ভরিয়াছে শুনিয়া দেশ দেশান্তর হইতে লোক লস্কর কত দেখ্‌তে এল। এমন টলটলে জল, এমন বিশাল পুকুর সে রাজ্যে আর দ্বিতীয়টী নাই। দিনরাত রাজধানী কেবল লোকে গম্‌গম্ করতে লাগ্‌লো।

এর ভিতর একদিন পুত্রবধূ শ্বশুরকে জানাইলেন, তিনি ঐ নূতন পুকুরে স্নান করিতে অনুমতি চান। বৃদ্ধ রাজা ভাবিলেন, মনঃকষ্টে পুত্রবধূ বুঝি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাবেন। তিনি চারিদিকে লোকজন নিযুক্ত করিলেন। পুত্রবধূ পুকুরে স্নান করতে নামিল, লোকসব চাহিয়া আছে। সহসা কন্যা জলে ডুব দিল। সময় যায়, কন্যা আর উঠে না, সকলেই চিন্তিত। বুঝি

কন্যা আর উঠিবে না, পুত্রশোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল! প্রায় দুই প্রহর চলিয়া গেল। কন্যার তালাসে পুকুরে লোক নামিল। কিন্তু কই, কেহ কিছু পাইল না। সকলেই বুঝিল, কন্যা মরিয়াছে। আর একটু পরেই শবদেহ ভাসিয়া উঠিবে।

এমন সময় সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল, কন্যা শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। একি! কাটামানুষ কি বাঁচিতে পারে? সকলেই আশ্চর্য্য। হায় এ কন্যা মানবী নহে— দেবী!

তখন বৃদ্ধ রাজা নাতি কোলে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। রাজ্য আবার আহ্লাদ-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। বহু আড়ম্বরে ছেলের অন্নারম্ভ হইয়া গেল। কন্যা কেমনে পুত্র পাইল সকলেই জানিতে চাহিলে কন্যা বলিল, "আমি জলে ডুব দিয়া দেখি মা "সঙ্কটত্রাণী" ঠাকুরাণী আমার ছেলে কোলে করিয়া পুকুরে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আজ দুদিন যাবত তোর ছেলে কোলে করে বসে আছি, আর তুই এমন একটু সময় পাস না যে ছেলে নিতে পারিস!" ইত্যাদি বলিয়া আমায় বহু ভৎর্সনা করিলেন; পরে আমার ক্রোড়ে ছেলেকে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "সঙ্কটত্রাণী" পূজা করিয়াই আমি এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। এই ব্রত করিলে সকলেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবে।

পুত্রবধূর এই অলৌকিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর বড়ই ইচ্ছা হইল, তাঁরা সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। পুত্রবধূর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তদনুসারে কন্যা "সঙ্কটত্রাণী" ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। ব্রতের পূর্ব্বাহ্নে শ্বশুর শাশুরীকে বেশ ষোড়শ উপচারে আহার করাইয়া পরে নিজে ব্রত আরম্ভ করিল। দেখতে দেখতে স্বর্গ হতে পুষ্পক রথ নামিয়া আসিল, চারিদিকে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। এক স্বর্গীয় গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। রাজা ও রাণী তাহাতে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। রাজ্যময় এই ব্রত প্রচারিত হইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পূজারিণী।

হে কল্যাণি, আছ তুমি রাণীর গৌরবে
বিস্তারি' সুষমা, শান্তি গৃহরাজ্য মাঝে,
তবু দীনা দাসী সম নিভৃতে নীরবে
রত সদা সংসারের শত তুচ্ছ কাজে।
ধূলি মলিনতা যত করিয়া মার্জ্জন
কুসুম-কোমল করে, রেখেছ নির্ম্মল
তোমার ভবন! তাই সেথা অনুক্ষণ
সুরুচি শুচিতা যেন আছে অচঞ্চল।
সন্ধ্যায় প্রদীপ জালি নিবারি' আঁধার,
ধূপ-ধূমে গৃহখানি কর সুরভিত,
বাজাও মঙ্গল শঙ্খ, রুধিয়া দুয়ার
প্রণিপাত কর হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত।
নহ রাণী, নহ দাসী; মোর মনে লয়
তুমি পূজারিণী নারী, গৃহ দেবালয়।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বাবিলনের কথা।

এশিয়া তুরস্কের মানচিত্রে য়ুফ্রাটিস্ ও তাইগ্রীস্ নামে দুটি নদী আছে। এই নদী দুটির মধ্যবর্ত্তী দেশকে বলে মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া অর্থ দো-আব অর্থাৎ দুই নদীর মাঝের দেশ। বাবিলন য়ুফ্রাতিস নদীর ধারে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতে অবস্থিত। পরে আসিরীয় জাতির কথা বলিব; তাহাদের রাজধানীর নাম নিনেভা। তাইগ্রীস্ নদী বাবিলন হইতে আসিয়া নিনেভার পাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে—যে সময়ের মানুষের কোনো ইতিহাস এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সেই সময়ে য়ুফ্রাতিস্ ও তাইগ্রীস্ পৃথক ভাবে তাহাদের জলধারা-রূপ কর বহিয়া সাগরে লইয়া যাইত। তখন কাহারো সহিত কাহারো কোনো সম্বন্ধ ছিল না। মেসোপটেমিয়া সমতল দেশ। তাই এদেশে নদীর স্রোতও মন্দ। পাহাড়ী নদীর মত পাড় ভাজিয়া, পাথর

গড়াইয়া, গাছ নড়াইয়া সে চলে না; কুল কুল স্বরে ধীরে ধীরে তার গতি। তার উদ্দাম নৃত্য নাই, চঞ্চলতা নাই। সেই জন্য নদীর মোহনায় পলি পড়িতে লাগিল। ক্রমে দুটি নদী এক হইয়া গেল। নদীর মাঝে এত মাটি জমিয়া উঠিত যে জলস্রোত প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত; সেই জন্য প্রাচীন কালে রাজারা এই জলপথের সুব্যবস্থা করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিতেন! নদীর মোহনা পরিষ্কার করিবার জন্য অনবরত লোক খাটিত, ঐ মাটি সরানো আর জলের গতি অবাধ রাখা ছিল তাদের একমাত্র কাজ। এখন আর সে সব কিছুই হয় না।

এখন সে দেশের ভারি দুর্দশা! আজকাল দেশের রাজা তুরস্কের সুলতান। তিনি আছেন কনষ্টান্টিনোপলে। তাঁর প্রতিনিধি একজন আছেন বটে, তাঁর তেজে তাঁর দর্পে লোক থর থরিয়া কাঁপে। তিনি 'ওঠ' বলিলে সকলে ওঠে, 'বস' বলিলে বসে! যথার্থ রাজা তিনিই। তাঁহার উপাধি পাশা। আপনার স্বার্থ, আপনার অর্থ, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা, সুবিধাটুকু পাইলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত! প্রজা সুখে আছে, কি দুঃখে কাঁদিতেছে সে ভাবনা ভাবিবার ভগবান্ ছাড়া আর কেহই নাই। পাশা কেবল টাকা সংগ্রহ করিবার তালেই আছেন! কত প্রকারেই তাঁরা টাকা তোলেন! এই গেল দেশের রাজার কথা।

তারপর দেশ ত একপ্রকার অরাজক। পাশার সঙ্গে কেবল টাকা দেওয়ার সম্বন্ধ! বেচারীদের জিনিষপত্র, টাকাকড়ি পুত্রকন্যা, ছাগলভেড়া, পশুপাল কে রক্ষা করে? আরব-মরুভূমির মাঝে বেদুইন নামে এক জাতি বাস করে। তারা অত্যন্ত হিংস্র-প্রকৃতি। দস্যুবৃত্তি তাদের ব্যবসায়। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া মরুভূমির ঝড়ের মত, তারা নিরাশ্রয় অধিবাসীদের উপরে আসিয়া পড়ে! নীরবে দস্যু-হস্তে তাদের সব সঁপিয়া দিতে হয়! এমনি তাদের দুরবস্থা!

প্রাকৃতিক অবস্থা।

[illegible] প্রকৃতি—তিনিও যেন এদের সহিত বাদ সাধিতেছেন! প্রকৃতির কত অত্যাচার লোকে অজস্র ভোগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আজকাল য়ুফ্রাতিসের মোহনায় প্রায়ই পাঁক জমিয়া থাকে। গভীর নদীর স্বচ্ছ জলের অবাধ গতি বন্ধ বলিয়া নানা জায়গায় জল জমিয়া পচে। ফলে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এখন দেশ উৎসন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন দশা দেশের কখনো হয় নাই। ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেশটি যেন ছিল স্বর্গ। সেই অমরাপুরীর গল্পই আজ বলিব। কিছুকাল পূর্ব্বে সকলে ভাবিত, এ দেশ বুঝি বিধাতার সৃষ্টির পর হইতে এমনি দুঃখদুর্দ্দশা চিরকাল ভোগ করিয়া আসিতেছে! লোকে ত জানিত না, যে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস মাটি আপন অন্তরের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছে!

য়ুফ্রাতিস্ ও তাইগ্রীস্ এই নদী দুটিই মেসোপটেমিয়ার প্রাণ; তাহারা আর্মেনিয়ার তুষার-ঢাকা পাহাড় হইতে বরফগলা জল আনিয়া মরুময় প্রান্তরকে শীতল করিতেছে। আসিরিয়া ও বাবিলনের কাছেই মরুপ্রান্তর। সেই নদীর ধারে চল, সেখানে আজ কি দেখিবে? দেখিবে, প্রাচীনকালের মহত্বের ভগ্নাবশেষ। দেখিবে, প্রাচীনের গৌরব, অতীতের কীর্ত্তি। দেখিবে, উভয় নদীর তীরে সুশোভন স্তম্ভগুলি নানা বৃক্ষবল্লরীর মাঝে দাঁড়াইয়া আছে; থাকে থাকে বসিবার স্থান উপরে উঠিয়াছে, এবং তাহার ছায়া জলের মধ্যে স্রোতের সঙ্গে খেলা করিতেছে! সুন্দর কারুকার্য্যখচিত কর্ণিশ বিপুল বৃক্ষাদির মধ্য দিয়া আধ আধ দেখা যাইতেছে! কোথায়ও বা দগ্ধপ্রায় ভূমি হইতে শ্রীহীন কদাকার স্তূপগুলিকে পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। সেই সকল রাঙ্গা মাটির ভিতর আরও কত কি জিনিষ দেখা যায়। বর্ষার জলধারা অবিরত পড়িয়া পড়িয়া কত স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। তাহার মাঝ হইতে কোথাও বা প্রাসাদের ইষ্টকরাশি, প্রাচীরের কারুকার্য্য, লতাপাতা, সিংহমুখ দেখা যাইতেছে, কোথাও বা মৃতের শ্বেত কঙ্কাল লাল মাটির মাঝ দিয়া উঁকি দিতেছে! চারিদিকেই এই শ্রীহীন স্তূপ।

রীচ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই দেশ সম্বন্ধে কিছু জানিতাম না বলিলেই চলে। কেমন করিয়া এই প্রাচীন দেশের ইতিহাস পাওয়া গেল তাহা বলিতেছি। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ রীচ নামক একজন ইংরাজ বাগ্‌দাদে বাস করিতেন। মেসোপটেমিয়ায় মাটির ঢিবি দেখিয়া মিঃ রীচের বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি সেই মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ও বালিরাশি সরাইয়া এই প্রাচীন দেশের ইতিহাস বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিবার অথবা কথা কহিয়া উৎসাহ দিবার কেহই ছিল না; বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি কয়েকটি স্তূপ কিছু কিছু খুঁড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলির সদ্ব্যবহার করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি সকল সময়ে খনন-স্থলে থাকিতে পারিতেন না—তাই তাঁর এত চেষ্টা, এত অর্থ ব্যয় কেমন করিয়া নষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। একদিন এক ওলেমা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায়ী মোসাল নগরে আসিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, 'এই সকল মূর্ত্তি, পাথর ও জিনিষপত্র যাহা উঠিতেছে সেগুলি পৌত্তলিক জিনিষ, এ সমস্তের প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।' এই রকম কথা শুনিয়া লোকেরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল; তারা নির্ব্বোধের মত সমস্ত জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। মিঃ রীচ ত দেখিয়া অবাক্! ভাঙ্গাচুরা যাহা কিছু পাইলেন—তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর বিশ বৎসর এ বিষয়ে আর কোনো চেষ্টাই হয় নাই।

বোটা।

কুড়ি বৎসর পরে 'বোটা' নামক একজন ফরাসী বাগ্দাদের কন্সাল হইয়া আসিলেন। বোটা প্রাচীন কালের কীর্ত্তি দেখিয়া ত অবাক! তাঁর কল্পনা সেই সকল ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে কত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল! কিন্তু তাদের যথার্থ রূপ কি ছিল তা' নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বোটা প্রথমে নিজ অর্থব্যয়ে এই সকল স্তূপ খনন করাইতে আরম্ভ করেন; পরে ফরাসী গবর্মেণ্ট খনন করিবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এক জায়গায় একটি বড় স্তূপ আছে শুনিয়া বোটা সেখানে গেলেন। কাজ আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছু আর পাওয়া যায় না। হতাশ হইয়া তিনি সেখান হইতে ফিরিলেন। এরূপ নিরাশ চেষ্টা, ব্যর্থ প্রয়াস অনেকবার তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। একদিন এক কৃষক বোটার এই সকল কার্য্য অতি মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। সে দেখিল, কুলিরা টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর, ইট, কুড়াইয়া অতি যত্নে রাখিয়া দিতেছে! কৃষক বোটাকে বলিল, "আমাদের বাড়ীর কাছে একটা স্তূপ আছে, সেখানে মাঝে মাঝে এই রকমের জিনিষপত্র বাহির হয়। আপনি সেখানে চলুন।" বোটা অনেকবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কাজে কাজেই তাহার কথায় তিনি বড় কাণ দিলেন না। অবশেষে লোকটা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায়, তিনি কয়েক জন লোক সেখানে পাঠাইলেন। সেখানে কাজ করিতে করিতে বোটা রাজপ্রাসাদের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! হতবাক্ হইয়া তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন! এ যুগের মানুষ এই প্রথম আসিরিয়ার রাজ-দরবারে হাজির হইল! এখন সেখানে রাজা নাই, সৈন্য নাই, রাজসভা নাই, সভাসদ্ নাই! তবুও চারিদিকে রাজাদের ধনদৌলতের কত চিহ্ন! পাথরের মূর্ত্তি, পাথরের কারুকার্য্যকরা নানা জিনিষপত্র। স্বর্ণ, লৌহ, পিত্তল কাঁসার কতশত আভরণ, আসবাব পত্র মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে! আজ নাই কেবল সেই জাতির রাজা, আর সেই রাজাদের বিপুল রাজ্য! আজ আছে কেবল রাজাদের গৌরব-স্মৃতি, আর বিপুল কীর্ত্তি!

এই সমস্ত জিনিষ তিনি ফরাসীদের রাজধানী প্যারী নগরে পাঠাইয়া দিলেন। সেগুলি বহু যত্নে লুভের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

লেয়ার্ড।

বোটা যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত তখন একজন ইংরাজ যুবক ভ্রমণ করিতে করিতে তুরস্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি শুভ মুহূর্ত্তেই তিনি সেখানে আসিলেন!

দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একটি বাসনা বড় প্রবল হইয়া উঠিল। ইচ্ছাটা এই যে, মেসোপটেমিয়াতে গিয়া মাটি খনন করিয়া প্রাচীন বাবিলন্ ও আসিরিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করিতেই হইবে। একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ইংরাজ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই যুবক মেসোপটেমিয়াতে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার নাম লেয়ার্ড্। লেয়ার্ড্‌কে যে কত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়! চারিদিকে আবিষ্কার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে সেখানকার শাসনকর্ত্তা (পাশা) তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে স্থানীয় লোকেরা অনেকগুলি যথার্থ কবর ভাঙ্গিয়া কাজের জায়গায় কতকগুলি কৃত্রিম কবর নির্ম্মাণ করিল। পাশা লেয়ার্ড্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি, যে একাজ আর চলিতে দিতে পারিলাম না। কারণ, শুনিলাম, আপনার লোকেরা মুসলমানের কবর ভাঙ্গিতেছে।" কিন্তু মিথ্যা ফাঁকি ত কখনো জয়লাভ করে না। ইহাদের ফাঁকিও ধরা পড়িল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "হায় হায়, আমরা কত মুসলমানের সত্যকারের কবর ভাঙ্গিয়াছি, আর ঘোড়াগুলোকে পাথর টানাইয়া মারিয়াছি; কিন্তু মিথ্যা ধরা পড়িয়া গেল!"

একবার এক জায়গায় কাজ হইতেছে; এমন সময়ে সেখান হইতে প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্ত্তি উঠিল। উহা দেখিয়া কুলিরা ত অত্যন্ত ভয় পাইল! লেয়ার্ড্ তখনো তাঁর বাসা হইতে আসেন নাই; ইতিমধ্যে কুলিরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। লেয়ার্ড যখন পথে আসিতেছিলেন তখন দুইজন কর্ম্মচারী ঘোড়ায় চড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "বে, বে, * শীঘ্র চলুন সেখানে, নিমরুদের ভূত উঠিয়াছে।" লেয়ার্ড ঘোড়া হাঁকাইয়া শীঘ্রই সেখানে পৌঁছিলেন। দেখিলেন, একটা বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তি উঠিয়াছে; দলে দলে আরব সেখানে আসিল; কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করানো গেল না, যে ঐ মূর্ত্তি পাথরের। আর সেটি যে মানুষের তৈয়ারী একথা কিছুতেই তাহাদিগকে বোঝানো গেল না। এই ভীতি ক্রমে চারিদিকে হাওয়ার মত ছড়াইয়া পড়িল। একজন কুলি নদী পার হইয়া মোসাল নগরে হাটের মাঝে প্রচার করিয়া দিল যে, "ওপারে মাটি হইতে ভূত উঠিয়াছে।" এ সংবাদে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কুলিরা কাজে আসে না, লোকেরা আর সে মুখে যায় না! কয়েক দিন কাজ হইল না; আন্দোলন থামিয়া গেলে, মিথ্যা ভয় দূর হইলে, পুনরায় কাজে হাত পড়িল।

মেসোপটেমিয়া অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। শীতের দেশের লোকের সেখানে বহুকাল বাস করা কি যে কষ্টকর, তা' গরম দেশের লোকের বোঝা বড় কঠিন! মরুভূমির নিকটে প্রান্তরে বাস করা, উল্কার মত তপ্ত হাওয়া অনবরত ভোগ করা, লেয়ার্ডের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। কোনো কোনো দিন এমন হইত, যে প্রবল বাতাস বেগে বহিয়া তাঁবুর দড়ি ছিঁড়িয়া খোঁটা ভাঙ্গিয়া সমস্ত চাপা দিয়া যাইত! গ্রীষ্মের দারুণ তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি নদীর কিনারায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুবিধা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল! এখানেও মশা তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিত! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও লেয়ার্ড চির-প্রফুল্ল ছিলেন। লোকের নিকট হইতে কোনো প্রকার উৎসাহ বাণী তিনি কখনো শুনেন নাই! লোকে জিজ্ঞাসা করিত, এসকল লইয়া কি হইবে? একদিন এক আরব শেখ্ সরলভাবে আসিয়া লেয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভগবানের দিব্য, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তরটি আমায় দাও। এই যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তোমরা পাথর তুলিতেছ, তাহাতে কি লাভ হইবে? একি সত্য যে, তোমাদের লোকের জ্ঞান শিক্ষার জন্য নাকি এসমস্ত করা হচ্ছে? আর আমাদের কাজি যে বলেছেন, এই মূর্ত্তিগুলি নাকি মহারাণীর রাজপ্রাসাদের দেউরিতে থাক্‌বে, আর তিনি প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে মূর্ত্তি গুলির পূজা করিবেন। এ কি সত্য? জ্ঞানশিক্ষা এরা কি করে দেবে। এগুলি তো আর

* ...বড়লোক ব্যক্তির সম্বোধন।

তোমাদিগকে ছুরি, কাঁচি, কাপড় তৈয়ারী শিখাইবে না। সে ত তোমরা বেশ জান।"

এ রকম প্রশ্ন পাশা হইতে কুলি পর্য্যন্ত সকলেই করিত। লেয়ার্ড কি সদুত্তর দিবেন তা ভাবিয়াই কূল কিনারা পাইতেন না।

লেয়ার্ডের এই সময়ের জীবন বড়ই সুন্দর ছিল! আদিম মানবের মাঝে আদিম সভ্যতার সহিত নিজের জীবন মিশাইয়া মেসোপটেমিয়ার সীমাহীন প্রান্তরের মাঝে, সন্ধ্যার মেঘশূন্য আকাশের তলায় লেয়ার্ডের সঙ্গে থাকিতে কার না ইচ্ছা করে! সন্ধ্যার পর তাঁবুর সম্মুখে স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিতেছে, কোথাও বা নরনারীরা সারাদিনের শ্রমশেষে আমোদে মত্ত হইয়াছে, তালে তালে নৃত্য গীত চলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে! লেয়ার্ড একা তাঁর তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া সেই মনোরম দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা! এমনি করিয়া তাঁহার দিন কাটিতেছিল।

ইটের বই।

কিন্তু লেয়ার্ড এত বিখ্যাত হইলেন কিজন্য বলিতেছি। আসিরিয়া রাজ্যের রাজধানীর নাম নিনেভা। এই নগর লেয়ার্ড আবিষ্কার করেন। শুধু কি এই? না—এ ছাড়া প্রকাণ্ড এক পুস্তকাগার আসিরিয়ার এক রাজপ্রাসাদে পাওয়া গিয়াছে। এক আধটা বই নয়, প্রায় দশ হাজার বই! সেগুলি সোণার জল দিয়া নাম লেখা কাঁচের আলমারিতে রাখা বইয়ের মত নয়। সেগুলি ইটের পুস্তক! আট নয় ইঞ্চি লম্বা, ৫।৬ ইঞ্চ চওড়া, আর ১½ ইঞ্চি পুরু তার এক একখানি পাতা। প্রত্যেক পাতা আবার এক একটি মাটির বাক্সের মধ্যে রাখা।

তীরাক্ষর বর্ণমালা।

ইটগুলি কাঁচা থাকিতে নরুনের মত এক প্রকার কলম দিয়া তার উপরে লেখা হইত। এই অক্ষরকে বলে কুনীফর্ম বা তীরাক্ষর; অক্ষরগুলি তীরের মত বলিয়া ইহার নাম তীরাক্ষর বর্ণমালা। প্রায় দশ সহস্র ইটের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে—আরও কত জিনিষ সেই রাজপ্রাসাদের পাওয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল জিনিষ এখন বিলাতের যাদুঘরে আছে।

লেয়ার্ড এই সমস্ত আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি সে লেখা পড়িতে পারিতেন না। তখন কেহই তাহা জানিত না। বহু পরিশ্রম করিয়া তিন জন যুবক পণ্ডিত এই ভাষা আবিষ্কার করিলেন। সে আবিষ্কারের কথা বড়ই অদ্ভুত, কিন্তু এখানে আজ আর সে গল্প বলিতে পারিলাম না। সেই যুবকেরা নানা শিলালিপি পাঠ করিয়া তাহা প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এই অল্পবয়স্ক যুবকদের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা ত অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা ত প্রথমে এসকল কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না! যুবকেরা বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা একটি শিলালিপি তিন জনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুবাদ করিয়া আপনাদের সমক্ষে দাখিল করিতেছি। আপনারা বিচার করুন।"

সভার মধ্যে য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা উপস্থিত হইলেন। টেবিলের উপর তিনটি কাগজের তাড়া শীলমোহরে আঁটা। সেই কাগজগুলি খোলা হইল; পঠিত হইল। দেখা গেল, যুবকেরা একটি প্রাচীন ভাষা আবিষ্কার করিয়াছেন। যে ভাষা বহু সহস্র বৎসর লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, হঠাৎ সেই ভাষার আবরণ যখন দূর হইয়া গেল তখন সকলে অবাক্ হইয়া তাহার ভাণ্ডারে কি আছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই ভাষা আবিষ্কারের পর ইতিহাসের এই অধ্যায়ে খুব উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। এই ভাষা আবিষ্কৃত হওয়াতে ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

বাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস।

অতি প্রাচীন কালে বাবিলন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল—সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজাদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

হামুরাবি।

বাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হামুরাবি। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে, যুদ্ধে, রাজনীতিতে, মহাপুরুষ সগুণ ছিলেন। বাবিলনে তাঁহাকে সকলে রাজচক্রবর্ত্তী

'পতেসি' বলিত; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দেশের সকল বিভিন্ন জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিলেন। এক শিলালিপিতে তিনি লিখিয়াছেন—"মহাদেবতা 'আনু' ও 'বেল' এই বাবিলন রাজ্য আমাকে দান করিলেন এবং তাঁহাদের শাসনদণ্ড আমার হস্তে ন্যস্ত করিলেন; আমি সেই সময়ে মানবের উপকারের জন্য 'হামুরাবি-খাল' খনন করাই। এই খালের উভয় পার্শ্ব কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলাম; বাবিলনের জন্য পর্য্যাপ্ত জলের বন্দোবস্ত হইল।" এইরূপে বাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

হামুরাবির আইন।

হামুরাবি তাঁহার দেশের সুব্যবস্থার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। এত প্রাচীন কালে আইন সংগ্রহ আর পৃথিবীতে কোথাও হয় নাই। এগার বার বৎসর আগে আমরা এই সকল আইন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একটি স্তূপ হইতে একখানি প্রকাণ্ড শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে এই সকল আইন লেখা আছে। সেই শিলালিপি খানিতে বাবিলন-সভ্যতার আশ্চর্য্য চিত্র পাওয়া গিয়াছে। শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, প্রায় চারি হাজার বছর আগে সেই দেশে ডাকের সুব্যবস্থা ছিল; ব্যবসায় বাণিজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ধর্ম্মও বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হামুরাবি প্রণীত অপরাধের দণ্ডদানের প্রণালী সব চেয়ে সুন্দর! এত প্রাচীন কালে বাবিলনের রাজপণ্ডিতেরা কত বিজ্ঞতা সহকারে আইনকানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন! কেহ কেহ বলেন, রোমান্ দণ্ডবিধি বাবিলন হইতে গৃহীত। সমস্ত য়ুরোপের, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের আইনকানুন রোমান আইন্ হইতে লওয়া হইয়াছে। এই সুদূর এশিয়ার সহিত য়ুরোপের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং য়ুরোপ প্রাচীন এশিয়ার নিকট কত ঋণী।

হামুরাবির দণ্ডবিধি হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি; সেগুলি বড়ই সুন্দর।

"যদি কোনো পুত্র তার পিতাকে প্রহার করে, তবে তাহার আঙুল কাটিয়া ফেলা হইবে। কেহ কাহারো চক্ষু কাণা করিয়া দিলে, অপরাধীর চক্ষু উৎপাটন করা উচিত। যদি কেহ কাহারো হাড় ভাঙিয়া ফেলে, তবে তাহারো হাড় ভাঙিয়া ফেলা হইবে।"

আরও কয়েকটি কৌতুকপ্রদ নিয়ম বলিতেছি:—"যদি কোনো লোক ঝগড়া করিতে করিতে কাহাকেও আঘাত করে, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারে যে, 'আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য আঘাত করি নাই', তবে তাহাকে আহত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য বৈদ্য-ব্যয় বহন করিতে হইবে।"

"যদি কাহারো বাড়ীতে আগুন নিবাইতে গিয়া কোনো ব্যক্তি গৃহের সামগ্রীর প্রতি লোভ করে ও তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহাকে সেই অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা বিধিসঙ্গত।"

"যদি কোনো ব্যক্তি কাহারো নামে কোনো মিথ্যা অপরাধ আনিয়া তাহা প্রমাণ করিতে না পারে তবে তাহাকে নিহত করা উচিত।"

এই দণ্ডবিধির শিলাফলকের শেষ কয় লাইনে লেখা আছে:—

"যদি কাহারো কোনো অন্যায় দূর করিবার থাকে, তবে সে আমার এই ন্যায়ধর্ম্মের রাজমূর্ত্তির কাছে আসুক। আমার শিলাফলকের আদেশলিপি সে পাঠ করুক। আমার তেজোপূর্ণ কথায় সে কর্ণপাত করুক, এবং আমার এই স্তম্ভ-লিপি সে বুঝিতে সক্ষম হউক। তাহার হৃদয় যেন সে শান্ত করিতে পারে। তখন সে বলিবে "হামুরাবি পিতার মত প্রজাপালন করিয়াছেন, তিনি প্রজারঞ্জন করিয়া যথার্থ রাজা হইয়াছেন।"

হামুরাবি আর একটি খুব ভাল কাজ করিয়াছিলেন। দেশের ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি সুসংবদ্ধ করেন। তাহাদের কতকগুলি ধর্ম্মবিশ্বাস বড়ই অদ্ভুত ও কৌতুকপ্রদ; সে গুলি হইতে তাহাদের চরিত্রেরও আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন বাবিলনীয়দের ধর্ম্মবিশ্বাস।

তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে এই পৃথিবীটা একটা উপুড় করা পাত্রের মত; তাহার উপরে মানুষ, পশু, পক্ষী,

বাস করে; আর ভিতরে প্রকাণ্ড গর্ত্ত; সেখানে ভূতের বাস! পৃথিবীর উর্দ্ধে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী সাতটি গ্রহ ঘুরিতেছে—আর তাহাদের পার্শ্বেই সাতটি দুষ্ট ভূত অনিষ্ট করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের নাম ছিল 'আনু' আর 'বেল'। তাঁরা নভোমণ্ডলের দেবতা। হিন্দুদের বিশ্বাস, বরুণ-দেবতা সাগরে বাস করেন; তেমনি বাবিলনবাসীরা বিশ্বাস করিত, 'ইয়া' নামে এক দেবতা সাগরের মাঝে মাছের দেশে বাস করেন; তিনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, জীবনদাতা। পৃথিবীর মধ্যস্থিত গর্ত্তে সাতটি দুষ্ট ভূত বাস করে; স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও তাদের সুনাম নাই। ঝঞ্ঝা ভূকম্পন, ঘূর্ণিবায়ুর কারণ বলিয়া সর্ব্বত্রই তাহারা ঘৃণিত। তাহাদের প্রাচীন পুঁথিতে অনেক মন্ত্র আছে। একটি মন্ত্র এই:—

"সংখ্যায় সাতটী তারা, সাগরেতে বাস।
স্বর্গ মর্ত্ত্য বাসীদের সকলের ত্রাস॥
ভেদি উঠে সাগরের গুপ্তস্থান তারা,
জাল সম ছড়াইয়া পড়ে আত্মহারা।
পুরুষ অথবা নারী কিছু তারা নয়,
তাহাদের বংশে কোনো সন্তান না হয়।
সংসারের, সমাজের, নিয়ম না মানে,
পর উপকার বলে কিছুই না জানে।
দেবতা 'ইয়ার' শত্রু বসে পথ মাঝ,
ভয়শূন্য ঘরে তারা বিপদের বাজ।
অতি ভয়ঙ্কর তারা—অতি ভয়ঙ্কর!
অত্যাচারে ত্রস্ত সব পশু পক্ষী নর।"

অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে রোগ, শোক, মহামারী, পাগলামির ভূত বাস করিত। গাছ পালায়, লতায় পাতায়, বাতাসে, ঝড়ে, ধূলা ওড়াতে, বৃষ্টি পড়াতে—ভূত! এত যাহাদের ভূতে বিশ্বাস—তাহাদের ভূত ঝাড়ানোর বিশ্বাসও তেমনি ছিল! যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, মাদুলীগ্রহণ প্রভৃতি নানা উপসর্গ ও কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কাহারো জ্বর হইলে তাহারা ভাবিত, যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে; ভূত ঝাড়াইবার জন্য তাহারা একটি পেঁয়াজ পোড়াইত; তাহাদের বিশ্বাস ছিল, পেঁয়াজের খোসা যেমন এক পরদার পর আর এক পরদা পুড়িয়া যায় তেমনি ভূতের দোষ আস্তে আস্তে দূর হইয়া যায়! পেঁয়াজ পোড়াইতে পোড়াইতে তাহারা এই মন্ত্রটি বিড় বিড় করিয়া পড়িত—

"ভূত যেন পোড়ে এই পেঁয়াজের মত।
আগুন যেন খায় তাদের আন্ধকারের মত।"

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে অনেকগুলি পক্ষবিশিষ্ট ষাঁড় পাওয়া গিয়াছে; বাবিলনবাসীরা বাড়ী হইতে ভূত দূরে রাখিবার জন্য এই সকল বৃষ-দেবতা গৃহদ্বারে রাখিয়া দিত। আসিরিয়াবাসীরা বাবিলনের নিকট হইতে এই প্রথাটি গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালের তপ্ত হাওয়ায় এই মরুময় দেশ আগুন হইয়া উঠে। হাওয়া যখন আগুনের হল্‌কার মত দিকে দিকে ছুটিত, তখন লোকে ভাবিত, ইহাও বুঝি ভূত! তাই তাহারা দরজার কাছে বা জানালার উপরে এক ভীষণ রাক্ষসের মূর্ত্তি স্থাপন করিত। সেই রাক্ষসের শরীরটা কুকুরের মত, নখগুলি তার ঈগলপাখীর মত তীক্ষ্ণ, হাতপায়ের থাবাগুলি সিংহের থাবার মত প্রকাণ্ড, তার বৃশ্চিকের মত লেজ, আর ঘোড়ার মাথার উপরে ছাগলের মত দুই শিং। কোথায় লাগে রাবণ রাক্ষস, আর তাড়কা রাক্ষসী! এই ভীষণ রাক্ষস প্যারী নগরের যাদুঘরে এখনো আছে।

হামুরাবি যখন রাজা তখন বাবিলন্ অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে; সেই সময়কার ধর্ম্মের কথা কিছু বলা গেল। প্রাচীন মন্ত্রের সহস্র সহস্র ইষ্টকলিপি পাওয়া গিয়াছে, এবং প্রতি বৎসরই নূতন কিছু না কিছু পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"বরপণ" ভাল কি মন্দ।

কয়েক বৎসর হইল সমাজের আদালতে বরপণ-প্রথার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ রুজু হইয়াছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইতেছে, অনেকেই

ইহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন। এ মামলা অবশ্য এখনও মুলতবী আছে, কতদিন থাকিবে কে বলিতে পারে? বরপণ প্রথা বেঁচারীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এপর্য্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে কেহ অগ্রসর হয়েন নাই। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় প্রকাশ্য ভাবে বরপণ-প্রথার পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার মক্কেলের কায়েমী স্বত্ব সাব্যস্থ করিবার জন্য গত ফাল্গুন মাসের ভারতীতে "বরপণ" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধে সেন মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই বিচার-সহ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বরপণ প্রথার সমর্থন করিতে গিয়া এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ গাহিয়াছেন।

সেন মহাশয়ের সকল কথার বিচার করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়; সুতরাং এস্থলে তাঁহার কয়েকটী কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে বরপণ প্রচলিত থাকায় সে সমাজের লোকদিগের সুবিধা কি অসুবিধা হইতেছে? সেন মহাশয়ের লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তিনি হিন্দু সমাজের উপর হাড়ে চটা। তাঁর মতে পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের লোকেরা মুখে "স্ত্রীরত্ন" "স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী" ইত্যাকার কথা বলিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা স্ত্রীকে গরু, ছাগল প্রভৃতির মত প্রয়োজন সাধনের দ্রব্য মনে করিতেন এবং সেই জন্য পণ দিয়া গরু, ছাগলের মত কিনিতেন; এবং স্ত্রীও দাসদাসীর মত খাটিয়া নিজে না খাইয়া এবং সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরুষের সেবা করিতেন। তখনকার লোকেরা বিবাহের দায়িত্ব বুঝিতেন না; কন্যার অভিভাবক গৌরী ও রোহিণী দানের জন্য ব্যগ্র হইতেন এবং বরপক্ষ গৃহ-কার্য্য, সংসার স্থাপন, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইতেন, সুতরাং কন্যার জন্য পণ দিতে হইত অর্থাৎ বরের পিতা কন্যার পিতাকে পণ দিতেন। আর এখন নাকি সভ্যতার বিস্তারে জীবনযাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, লোকের বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে। নারীজাতির প্রতি সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছে, নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করা হইতেছে। সুতরাং শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাসদাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়; সেই জন্য স্ত্রী গ্রহণের পূর্ব্বে স্ত্রীর পিতার নিকট আবশ্যক মত টাকা গ্রহণ করেন। য়ুরোপ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা নাকি তাঁহাদের বিবাহে অধিক পণ চাহিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদিগকে লোকে অনেক নিন্দা করিয়া থাকে। সেন মহাশয়ের মতে তাঁহাদিগকে নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ তাঁহারা নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষিত জীবনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন।

সেন মহাশয় বলিতেছেন যে, "পূর্ব্বেকার হিন্দু-সমাজের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদিগের স্ত্রীদিগকে দাসীর মত খাটাইতেন, আর এখনকার শিক্ষিত লোকেরা তা ভাল মনে করেন না, সেজন্য বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীর পিতার নিকট আবশ্যক মত টাকা লইয়া স্ত্রীর সুখের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন।" "দাসদাসীর মত খাটা" যে সেন মহাশয় কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। মনে করুন, রামবাবু একজন শিক্ষিত যুবক, তিনি শিক্ষকতা করিয়া মাসিক এক শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; তাঁহার সংসারে তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রী আছেন, মাতা আছেন, দুইটী পুত্র আছে এবং একটী ছোট ভাই আছে। রামবাবু একটী চাকর রাখিয়াছেন, সেই চাকর জল তোলে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, হাট বাজার করে, রামবাবুর স্ত্রী রাঁধিয়া থাকেন। বেতন দিয়া পাচক রাখিলে রামবাবুর কুলায় না অর্থাৎ কিছুই সঞ্চয় হয় না, বরং মাসে মাসে দুই দশ টাকা ধার হয়। এই যে রাম-বাবুর স্ত্রীকে প্রতিদিন রাঁধিয়া স্বামী, পুত্র, দেবর প্রভৃতিকে খাওয়াইতে হয় তাহাতে কি মনে করিতে হইবে যে—রামবাবুকে ধিক্, যেহেতু তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়া ভাত রাঁধাইয়া লয়েন এবং রামবাবুর স্ত্রীরও জীবন ব্যর্থ, যেহেতু তাঁহাকে প্রতিদিন রাঁধিতে হয়? সেন মহাশয়ের কথার ভাবে বোধ হয় যে, তাহাতে

শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় শিক্ষিতা মহিলার এমন কার্য্য তিনি পছন্দ করেন না। ঐরূপ কার্য্য সেন মহাশয়ের মতে দাসদাসীর দ্বারাই করাইয়া লইতে হইবে। শিক্ষিত পুরুষ ও শিক্ষিতা নারী কি ভাবে সময় কাটাইবেন, তাঁহাদের দৈনিক কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি, ইহার একটা তালিকা যদি সেন মহাশয় দিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। সেন মহাশয়ের লেখার ভঙ্গীতে মনে হয় যে, তিনি য়ুরোপের সমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রভৃতির উপর খড়্গহস্ত। য়ুরোপ সমাজে মহিলাদিগের লোকসেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল প্রমুখ দয়াবতী মহিলারা তাঁহাদের সেবা-পরায়ণতার দ্বারা সৈনিকদিগের জীবন-মরুভূমিতে করুণার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। এই সকল করুণাময়ী মহীয়সী মহিলা পরের দুঃখের লাঘব করিতে গিয়া স্বয়ং অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সেবাকার্য্য, দাসদাসীর কার্য্য বলিয়া এপর্য্যন্ত নিন্দনীয় হয় নাই। পরের জন্য যে কার্য্য করিলে নিন্দা না হইয়া বরং প্রশংসা হয়, নিজের বাটীতে কোন মহিলা সেইরূপ কার্য্য করিলে তাঁহার নিন্দার কোন কারণ নাই, বা তিনি দাসীর মত খাটিতেছেন, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার দুঃখ করিবারও সঙ্গত কারণ নাই।

সংসার ধর্ম্ম পালনের জন্য, সমাজ সংস্থিতির জন্য, নরনারীর বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর পক্ষের নিকট পণ গ্রহণ করিতেন। সেই প্রথার অত্যাচারে কোন কোন সম্প্রদায়ের অনেক পুরুষকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইতে হইত, সেন মহাশয় একথা স্বীকার করিয়াছেন। এখনও কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে পণ গ্রহণের প্রথা আছে। তাহাদের মধ্যে এখনও অনেক পুরুষ ইচ্ছা সত্বেও অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারে না। বরপণ প্রথা যদি অপ্রতিহত প্রভাবে সমাজে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার ফলে অনেক কন্যাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। যে পাশ্চাত্য সমাজের ভক্তিতে সেন মহাশয়কে গদগদ বলিয়া বোধ হয় তাঁহার সেই পাশ্চাত্য সমাজের লোকেরা ইহা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন।

পণ দিয়া স্ত্রী গ্রহণ করা আর মূল্য দিয়া প্রয়োজন সাধনের দ্রব্য ক্রয় করা সেন মহাশয়ের নিকট একই জিনিষ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেন মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে কন্যার বিবাহে প্রচুর অর্থ প্রদানকারী কন্যার পিতা তাঁহার জামাতাকে, কন্যার প্রয়োজন সাধনের দ্রব্য মনে করিলে সেন মহাশয় বোধ হয় কিছু মনে করিবেন না, এবং পণ গ্রহণকারী বরের পিতা বা বরের আত্ম-সম্মানেরও বোধ হয় বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না।

সাংসারিক লোকের অর্থের প্রয়োজন। সেই জন্য তাহারা অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত। তাই বলিয়া যেনতেন প্রকারে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা বোধ হয় কেহই সমর্থন করিবেন না। হরিবাবুর বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে, তিনি আরও দুই হাজার টাকা লাভের জমিদারী কিনিবার জন্য একটী পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে হরিবাবুকে কেহ দোষ দিবেন না। কিন্তু যদি হরিবাবু পুত্রের বিবাহে চল্লিশ-হাজার টাকা পণ লইয়া দুই হাজার টাকা আয়ের জমিদারী খরিদ করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতী হয় এবং তৎপর হরিবাবুর ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনের জন্য বরের পিতারা বা বরেরা সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এ দেশের বর্ত্তমান বাণিজ্যহীন অবস্থায় একটা নূতন বাণিজ্যের বিস্তার দেখিয়া অনেকেরই নয়ন সার্থক হয়।

সেন মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন যে, বরপণ লওয়ার জন্য অনেকেই বরকর্ত্তার নিন্দা করেন, কিন্তু ইহাতে তিনি নিন্দার কারণ কিছুই দেখিতে পান না; কারণ, বর কর্ত্তা তো আর জোর করিয়া কন্যাকর্ত্তার নিকট টাকা গ্রহণ করেন না, কন্যাকর্ত্তা বরপক্ষকে বরপক্ষের দাবী মত টাকা দেয় বলিয়াই বরপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন। টাকা দিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া যদি কন্যাকর্ত্তা অন্যায়

মনে করেন, তাহা হইলে তিনি কন্যার বিবাহ না দিলেই পারেন। এইরূপ কথা বলা সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। আমি যে সমাজে বাস করি, সে সমাজের লোকের নিন্দা প্রশংসা উপেক্ষা করিয়া আমি চলিতে পারি না। লোকাভিমতের অসীম শক্তি। রাজাকে পর্য্যন্ত লোকাভিমত মানিয়া চলিতে হয়। কন্যার বিবাহ দেওয়া বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে কন্যার পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁরা চাল চলনে সাহেবী ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, হিন্দুসমাজের আর সকলে যে তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই জন্য যদি কাহারও কন্যার বিবাহ দিতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে আমাদের সমাজে তাহার নিন্দা হয়। সেই জন্যই আমাদের সমাজে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা দায়ের মধ্যে পরিগণিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের সমাজের লোকেরা অল্প বয়সে কন্যাদান করা পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এবং আট, নয়, দশ বৎসরের কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এখনকার অনেকের আর সে বিশ্বাস নাই। কন্যার বিবাহে পণ দিতে হয় বলিয়াই যে এরূপ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের ভদ্র সম্প্রদায় বার তের চৌদ্দ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। বোধ হয় এখন যে শিক্ষিত হিন্দুরা মনুসংহিতার "ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" এই বচন অনুসারে বার বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। (বরপণের অত্যাচারে দুই এক বৎসরের বিলম্ব যে না হইয়া যায় তাহা নহে।) যদি তাহা না হইত তাহা হইলে যাঁহারা অর্থবান্ নহেন তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ বেশী বয়সে হইত এবং যাঁহারা অর্থবান্ তাঁহাদের কন্যার বিবাহ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার এক বন্ধু এক জেলাকোর্টে ওকালতী করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া থাকেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু,—তাঁকে যদি গোঁড়া হিন্দু এবং "বঙ্গবাসীর" ছাপ মারা হিন্দু বলেন তাহা হইলেও তিনি বোধ হয় চটিতে পারিবেন না। আমার এই বন্ধু ইচ্ছা করিলে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার আট কি নয় বৎসরের কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরী বা রোহিণী দানের ফল লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা লাভ করিতে মোটেই রাজী নহেন। বার বৎসরের পূর্ব্বে তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ দিবেন না। ইনি ব্রাহ্মণ; এবং ইঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসরের বেশী হইবে না।

আর একজন বৈদ্যের কথা বলিতেছি। ইনিও এক বড় জেলাকোর্টের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইঁহার অর্থের অভাব ছিল না; তথাপি তিনি তের বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার একটী কন্যারও বিবাহ দেন নাই। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বরপণ প্রথার প্রচলন হওয়ায় আমাদের দেশের কতকগুলি কুপ্রথা উঠিয়া গিয়া দেশের যে কি কি উপকার হইয়াছে সেন মহাশয় তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। সেন মহাশয়ের সেই সিদ্ধান্তগুলি কাকতালীয় ন্যায়ের অতি সুন্দর দৃষ্টান্তস্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন, বর পণের ফলে দেশ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। আমি ত দেখিতেছি, চারিদিকে জাতিভেদের বন্ধন যেন অধিকতর দৃঢ় করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেন মহাশয় আমাদের দেশে প্রচলিত—জন্মগত জাতিভেদের বিরোধী হইলেও তাঁহার লেখার ভাব দেখিয়া যেন মনে হয় যে, য়ুরোপে প্রচলিত অর্থগত জাতিভেদে তাঁর তত আপত্তি নাই। অর্থাৎ সেন মহাশয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ইত্যাকার জাতিভেদের বিরোধী হইলেও ধনী ও দরিদ্র—ইত্যাকার জাতি ভেদের বিরোধী নহেন। আমাদের দেশে জন্মগত জাতিভেদ সত্বেও কার্য্যতঃ পরস্পরের মধ্যে যে সাম্যভাব বিদ্যমান আছে য়ুরোপে জন্মগত জাতিভেদ না থাকা সত্বেও কার্য্যতঃ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল

ব্যবধান, য়ুরোপের সামাজিক দাবানলের পরেও এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বরপণ প্রথার প্রচলনে বিবাহ দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে ব্যয় বাহুল্য কমিয়াছে। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রতি সেন মহাশয়ের ভক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ব্যয় বাহুল্য কি ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে সে কথার আলোচনা না করিয়া বরপণের জন্য বিবাহের ব্যয় বাহুল্য কমিয়াছে কিনা তাহাই দেখা যাউক।

সমাজে প্রচলিত কোন নিয়ম হিতকর কি অহিতকর তাহার বিচার করিতে গেলে ঐ নিয়মদ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোকের হিত কি অহিত হইয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। বরপণের কল্যাণে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপকার হইলেই তাহার সমর্থন করা চলে না। কোন দরিদ্র অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি যদি বিবাহ করিয়া এক রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়। কোন দরিদ্র যদি ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া পড়ার খরচের যোগাড় করিয়া লয়েন তাহা হইলে তাহাও যুবকের পক্ষে কম সুবিধার কথা নয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেরূপ ঘটে না। কন্যার বিবাহে পাত্রপক্ষকে পণ দিতে কন্যাপক্ষকে যেরূপ বিব্রত হইতে হয়, সেই ধনদ্বারা পাত্রপক্ষের তদনুরূপ যে কোন স্থায়ী উপকার হয় এমন মনে করিতে পারা যায় না। বরং, অধিকাংশ স্থলে এই দেখা যায় যে কন্যাপক্ষকে পীড়ন করিয়া পাত্রপক্ষ যে অর্থ গ্রহণ করেন সেই অর্থের অধিকাংশই অনাবশ্যক বিলাসিতায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষকেও পাত্রপক্ষকে দেয় পণের উপযুক্ত বিবাহসংক্রান্ত অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের জন্য খরচপত্র করিতে হয়। মনে করুন, কালীবাবুর কন্যার বিবাহে নগদ দুই হাজার টাকা পণ; একহাজার টাকার গহনা ঘড়ী, চেন ইত্যাদি, চাঁদির বাসন, পালঙ্ক প্রভৃতি দিতে হইল। ইহা দিতে কালীবাবুকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কালীবাবু তাহাতেই নিস্তার পাইলেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তাঁহাকে বিবাহের রাত্রিতে বরপক্ষকে প্রদত্ত পণাদির উপযুক্ত অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে হইল। আমাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে কালীবাবু কখনই বিবাহের রাত্রিতে বরকর্ত্তা, পুরোহিত ও বর এবং কন্যাপক্ষে স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা, পুরোহিত ও কন্যাকে লইয়া কাজ সারিতে পারিবেন না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত কোন কন্যাকর্ত্তা যে সেরূপ করিয়াছেন তাহা শুনি নাই। বিবাহের তত্ত্ব তল্লাসের ব্যয় ত পড়িয়াই রহিল। তা' যদি পণের অনুরূপ না হয় তাহা হইলে কন্যার নাকালের অবধি থাকে না। পক্ষান্তরে বরপক্ষকেও বিবাহের আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের খরচপত্র করিয়া পণের টাকার অধিকাংশ খরচ করিতে হয়। বরপণের টাকার দ্বারা জমিদারী খরিদ, বিবাহিত জীবনের জন্য একটা সংস্থান প্রভৃতি কথাগুলি তর্কের সময় শুনিতে ভাল লাগিলেও অধিকাংশ স্থলে তাহা হয় না বা হইতে পারে না।

য়ুরোপীয় সমাজের পুরুষেরা সহজে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। বরপণ প্রথার প্রচলনে আমাদের দেশেও সেই ধুয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সেন মহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। ইহা কিন্তু কণ্টকবিহীন গোলাপ নয়। লোকে বিবাহ করিয়া বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া আমেরিকা ও য়ুরোপের কোন কোন দেশে লোকসংখ্যা এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে সেই সেই দেশের রাজপুরুষেরা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য লোকদিগকে বিবাহে বাধ্য করিতে কোন আইন করা উচিত কিনা তাহাই বিবেচনা করিতেছেন। অথচ সেন মহাশয়ের স্কন্ধে ম্যালথস্ ভর করিয়া রহিয়াছেন।

সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বিনা পণে বা অল্প পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। সেন মহাশয় তাহাতে ভীত হইয়াই বোধ হয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

য়ুরোপের লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের লোকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংরেজদের অধীনে। তাই বলিয়া

সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা যে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অথবা পারিবারিক সুখ শান্তি আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক, একথা মানিয়া লইতে পারি না। হিন্দু-সমাজ চিরকাল বিলাস-বিমুখ। য়ুরোপীয়দিগের সংসর্গে আসিয়া আমাদের দেশের লোকেরাও য়ুরোপীয় সমাজের লোকদিগের বাহিক আড়ম্বর ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইতেছে। এই বিলাসিতার তরঙ্গ রোধ করিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া সেন মহাশয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের দেশের যে সকল লোক পাশ্চাত্য সমাজের বাহিক চাকচিক্যে মুগ্ধ তাঁহাদিগের বিলাসের বাসনা-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের চিরাচরিত ত্যাগের আদর্শের পরিবর্ত্তে সেন মহাশয় ভোগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

অতি দুরন্ত ছেলেদের বশ করিবার একটী উপায় অবলম্বন করিয়া কখন কখন ফল পাওয়া যায়। সেটী হইয়াছে এইরূপঃ—ছেলে দুষ্টামি করিতেছে, তাহাকে যে কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে সে তাহাই করিতেছে। এমন সময় তাহার যে কাজ করা উচিত সেই কাজ করিতে তাহাকে নিষেধ করিলে বা যে কাজ করা অনুচিত সেই কাজ করিতে বলিলে দুষ্ট ছেলে অনেক সময় আদেশের উল্টা কাজ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অভিভাবকের অনুমোদিত কার্য্য করিয়া থাকে। তা ছাড়া আজকাল যে বিষয়ের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হইতেছে সেইটাই তত জাঁকিয়া বসিতেছে। রসিকরাজ দ্বিজেন্দ্রলাল এই সকল ব্যাপার দেখিয়াই বলিয়াছেন যে, "কারণ যেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।" সেন মহাশয় ঐরূপ কোন অভিপ্রায়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বরপণ সমর্থন করিয়াছেন কিনা বলা যায় না।

সেন মহাশয় সাহসী ব্যক্তি। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। আমাদের দেশের প্রবাদ অনুসারে "নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" আর আজ কাল Avoidance of common place হইতেছে Genius এর লক্ষণ, এবং "একটা নূতন কিছু না করিলেও" জীবনটা একঘেয়ে মনে হয়। সুতরাং সেন মহাশয় জয়যুক্ত হউন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

নক্ষত্রের গতি।

সমস্তটা আকাশ যেন একটা কাঁচের ফাঁপা গোলা। তারাগুলি উহার গায় উজ্জ্বল হীরার টুকরার মত লাগান রহিয়াছে। আমাদের পৃথিবী সেই প্রকাণ্ড ফাঁপা গোলার মাঝখানে আছে।

গোলাটী অনবরত ঘুরিতেছে। যেমন নাটাই একটা শলার চারিদিকে ঘুরে অথবা কুমারের চাক অনলের চারিদিকে ঘুরে তেমনি যেন আকাশটা একটী কল্পিত শলার চারিদিকে ঘুরিতেছে। শলার দুই প্রান্ত আকাশেই গাঁথা আছে। উহার নড় চড় নাই। শলার উত্তরের প্রান্তকে আকাশের উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণের প্রান্তকে আকাশের দক্ষিণ কেন্দ্র বলে। উত্তর কেন্দ্রের খুব নিকটে একটী নক্ষত্র আছে উহাকে ধ্রুবতারা বলে। বোধ হয় যেন এই তারাটীর গতি নাই, এইটীই কেন্দ্র।

আমরা দেখি, আকাশ অনবরত ঘুরিয়া যাইতেছে আর আমাদের পৃথিবী একস্থানে স্থির রহিয়াছে। তারাগুলিও আকাশের সহিত ঘুরিতেছে। আকাশের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিলেই দেখিতে পাইবে তারাগুলি চলিতেছে; যে তারাগুলি আগে পূর্ব্বদিকে প্রায় মাটির নিকটে অথবা গাছের মাথার উপর ছিল সেইগুলির অনেকটি উপরে উঠিয়াছে। যেগুলি আমাদের মাথার উপরে ছিল সেইগুলি পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছে। পশ্চিম আকাশে যে তারাগুলি মাটির নিকট দেখা যাইত সেইগুলি ডুবিয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক নক্ষত্রগুলি ঘুরে না। পৃথিবী অনবরত আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া আমরা উহার পৃষ্ঠে থাকিয়া দেখি, নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া যেমন সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখা যায় তেমনি নক্ষত্রগুলিও বোধ হয় পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া

পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে নক্ষত্র-সকলের ঐরূপ কোন গতি নাই।

কয়েকদিন মনোযোগ দিয়া আকাশের নক্ষত্রগুলি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে নক্ষত্র সকল পরস্পর সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন করে না। অর্থাৎ যে তারা যে ভাবে অন্য তারা হইতে যতদূরে ছিল সেই তারা সেই ভাবে তত দূরে থাকিতেছে। আজ রাত্রে একখানি কাগজে আকাশের নক্সা করিয়া কতকগুলি নক্ষত্রের স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিলে দুই বৎসর পর দেখা যাইবে, উহারা পূর্ব্বের স্থানেই আছে।

পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্য আমরা নক্ষত্রের যে গতি দেখি উহাকে নক্ষত্রের দৃশ্যগতি (apparent motion) বলে, এই দৃশ্যগতি ব্যতীত নক্ষত্রসকলের প্রকৃতগতি (Real or proper motion) আছে। আমাদের সূর্য্য ও আকাশের অগণিত নক্ষত্র সকলই চলিতেছে; একটী নক্ষত্রও অচল নহে। কিন্তু উহাদের প্রকৃত গতি খালি চক্ষে ধরিবার সাধ্য নাই। নক্ষত্রসকলের গতির জন্য উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু অনন্ত আকাশে উহারা পরস্পর এত দূরে দূরে অবস্থিত যে দুই এক শতাব্দীর মধ্যে উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। প্রাচীন গ্রীক্ পণ্ডিতেরা যে সকল নক্ষত্রের যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন আমরা উহাদিগকে এখন ঠিক সেই স্থানে দেখি না; কারণ উহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সূর্য্য সৌরজগতের সকল গ্রহউপগ্রহাদি লইয়া অলকা লায়র নামক একটী নক্ষত্রের দিকে মিনিটে ২৪০ মাইল গতিতে ছুটিতেছে। এখন হইতে ১৮ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে সূর্য্য ঐ নক্ষত্রের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। পথে অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ হইবার আশঙ্কা নাই—তাহাও বলা যায় না। আবার যে নক্ষত্রের দিকে সূর্য্য ধাবিত হইতেছে উহাও অগণিত নক্ষত্র লইয়া আর একটী দূরস্থ নক্ষত্রের দিকে ছুটিতেছে। *

সূর্য্যের ন্যায় আকাশের অন্যান্য নক্ষত্রগণও অতি প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছে। কোন কোন নক্ষত্রের গতি সূর্য্যাপেক্ষা অধিকতর। সিরিয়ান নামক (Sirian) অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের গতি ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল। বেগার (vega) গতি ঘণ্টায় ১,৮০,০০০ মাইল। কষ্টর নক্ষত্রের (Costor) গতি ঘণ্টায় ৯০ ০০০ মাইল। গোলাকল নামক আর একটী নক্ষত্রের গতি ১,৭৬.৪০০ মাইল। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহারা দুইটী, তিনটী বা ততোধিক নক্ষত্র একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে।

নক্ষত্রের দূরত্ব।

এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য। সূর্য্যই আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। অনেক দূরে আছে বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ নক্ষত্রগুলি সামান্য আলোক-বিন্দুর মত ক্ষুদ্র দেখা যায়।

নক্ষত্র সকলের দূরত্বের কথা কল্পনা করাও অসাধ্য। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টা করিয়াও অতিশয় দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসকলের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা বলেন, কোন নক্ষত্রের দূরত্বই ২০ লক্ষকোটি মাইলের কম নয়।

অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী কয়েকটী নক্ষত্রের দূরত্ব অনেক কৌশলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহা অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় বটে কিন্তু মনে সম্যক্ ধারণা করা অসাধ্য।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৯৬৫০০০ মাইল, আল্‌ফা সেণ্টরাই ২০৭৬৪৮০,০০,০০,০০০ মাইল; অভিজিৎ—(Vega) ১২৩৯৩৯৯০,০০,০০,০০০ মাইল; লুব্ধক—(Sirius) ১২৭৪৩২৫০, ০০,০০,০০০ মাইল; ধ্রুব—(poloris) ২৮৫৩৩০৬০,০০,০০,০০০ মাইল; ব্রহ্মহৃদয় (copelb) ৪১৫৬৬৬৮০,০০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

---

* I refer to the supposed discovery of the great centre about which it is presumed the myriads of stars composing our mighty way are all revolving.

The orbs of Heaven.

যে সূর্য্য আয়তনে পৃথিবীর প্রায় তের লক্ষ গুণ বড় সেই সূর্য্য ৯২৯৬১০০০ মাইল মাত্র দূরে থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র থালার ন্যায় দেখায়। সূর্য্যের পরই যে নক্ষত্রটী পৃথিবীর নিকটতম উহার নাম আল্‌ফা সেণ্টরাই। আমাদের সূর্য্যকে যদি উহার স্থানে নিয়া রাখা যাইত তাহা হইলে এখন আমরা সূর্য্যের যে পরিমাণ আলোক পাই তাহার ৫২৯০ কোটি ভাগের এক ভাগ পাইতাম। কিন্তু আলফা সেণ্টরাইএর আলোক সূর্য্যের আলোকের ১৬৯৫ কোটি ভাগের এক ভাগ, সুতরাং উহার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের উজ্জ্বলতার তিন গুণ হইতে অধিক। উজ্জ্বলতার অনুপাতে হিসাব করিলে আল্‌ফা সেণ্টরাইএর আয়তন সূর্য্যের আয়তনের পাঁচ গুণ হইবে। এইরূপ হিসাবে সিরিয়াস্ নামক নক্ষত্র সূর্য্য হইতে ২৭০০ গুণ বড় হইবে।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। এক সেকেণ্ডে আলোক পৃথিবীর চারিদিকে ৮ পাক দিয়া আসিতে পারে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছিতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু নিকটতম নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে দশ বৎসরের কম লাগে না। পূর্ব্বোক্ত অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় বিশ বৎসর সময় লাগে।

পণ্ডিতেরা বলেন, আকাশে এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে অন্যূন দশ লক্ষ বৎসর লাগে! লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে অনেক নক্ষত্রের আলোক আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই। এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, ব্রহ্মাণ্ড কত বিস্তৃত!

নক্ষত্রের বৈচিত্র্য।

খালি চক্ষে দেখিলে আকাশের সকল নক্ষত্রকেই একরূপ দেখা যায়—কেবল উজ্জ্বলতার পার্থক্য। কিন্তু বাগানে যেমন নানাপ্রকার ফুল তেমনি আকাশে নানারকম তারা আছে, আয়তনের কথা ছাড়িয়া দিলেও নক্ষত্রের বৈচিত্র্য অসামান্য। বাগানের ফুলের যেমন নানা রং আকাশের তারারও তেমন অশেষ বর্ণ বৈচিত্র্য। কোন তারা গোলাপের মত পাটল, কোন তারা জবার মত লাল, আবার কোন তারা মল্লিকার মত শুভ্র। নীল, পীত, ধূসর, ধূমল প্রভৃতি অনেক বর্ণের তারা আছে। বাগানে কোন ফুল ফুটিতেছে, কোন ফুল পূর্ণ বিকশিত, আবার কোন ফুল ম্লান হইতেছে; আকাশের তারা তেমনি কোনটী বাষ্পের মত—এখনও জমাট বাঁধে নাই, কোনটী উজ্জ্বল আলো দিতেছে, আবার কোন কোন নক্ষত্র জ্যোতিঃহীন হইয়া অদৃশ্য হইতেছে। বাগানে যেমন গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল আকাশে তেমনি দলে দলে তারা। ফুল একবার ম্লান হইলে উজ্জ্বল হয় না কিন্তু কতকগুলি আকাশ-কুসুম ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়াও আবার উজ্জ্বল হইতেছে!

পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র।

(VARIABLE STARS).

আকাশে কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সকল নক্ষত্রের জ্যোতিঃ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বাড়িয়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং আবার নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। এই জন্যই উহাদিগকে পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র (Variable Stars) বলে। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় উহাদের কয়েকটী নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা হ্রাস বৃদ্ধির সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আর্গাস্ ৭ বৎসরে ১ম শ্রেণী হইতে উজ্জ্বলতা কমিয়া ৮ম শ্রেণীতে যায়। সেইরূপ কেসিওপিয়া ৪২৯ দিনে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণীতে, সেটি বা মিরা ৩৩১ দিনে ১ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীতে, লায়ার ১৩ দিনে ৩½ শ্রেণী হইতে ৪½ শ্রেণীতে এল্‌গল্ ৩ দিনে ২¼ শ্রেণী হইতে উজ্জ্বলতা কমিয়া ৪র্থ শ্রেণীতে যায়।

"সেটি" নক্ষত্রটী বড়ই আশ্চর্য্য রকমের; এইজন্য পণ্ডিতেরা উহার নাম করিয়াছেন 'মিরা' (Marvellous) অর্থাৎ আশ্চর্য্য নক্ষত্র। যখন উহা খুব উজ্জ্বল হয় তখন জ্যোতিঃ এত বৃদ্ধি পায় যে উহা প্রথম শ্রেণীতে উঠে। তার পর উজ্জ্বলতা কমিতে থাকে। কমিয়া মিরা একবারে ১০ম শ্রেণীতে নামে। তখন আর দেখা যায় না।

"এল্‌গল্‌" নক্ষত্রটী আরও অদ্ভুত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার জ্যোতির চরম হ্রাসবৃদ্ধি হয়। দুই দিন পর্য্যন্ত "এল্‌গল্‌" খুব উজ্জ্বল থাকে, তখন উহা ২য় শ্রেণীর তারার ন্যায় দেখা যায়। তারপর হঠাৎ উহার জ্যোতিঃ কমিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টায় ৪র্থ শ্রেণীতে নামিয়া পড়ে। আবার সাড়ে তিন ঘণ্টায় ২য় শ্রেণীতে উঠে। ইহার উন্নতি অবনতি উভয়ই অতি অল্পকাল স্থায়ী।

অধ্যাপক পিকারিং প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল নক্ষত্রকে আমরা পরিবর্ত্তনশীল বলি উহারা সকলই যুগল, অর্থাৎ উহাদের এক একটী সহচর আছে। সহচরটীর আলোক অতিশয় ক্ষীণ। যুগল নক্ষত্র দুইটী পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। যখন ঘুরিতে ঘুরিতে অনুজ্জ্বল সহচরটি সম্মুখে আসিয়া পড়ে তখন উহা দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্রটী ঢাকা পড়ে। এই জন্য উভয়ই আমাদের নিকট অদৃশ্য হয় অথবা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ দেখা যায়। 'এল্‌গল্‌' নামক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের সহচরটীর একবারেই আলোক নাই। সিরিয়াস্‌ বা লুব্ধক নক্ষত্রের সহচরটীও আলোকহীন।

অস্থায়ী নক্ষত্র।

(TEMPORARY STARS).

কতকগুলি নক্ষত্র মাঝে মাঝে আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহারা অতিথির ন্যায় হঠাৎ গগনমণ্ডলে দেখা দিয়া চির দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রকে অস্থায়ী নক্ষত্র (Temporary Stars) কহে। টাইকোব্রাহী নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিত একটী অস্থায়ী নক্ষত্রের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, উহার বর্ণনা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে শুক্র গ্রহ হইতে অধিকতর উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র আবির্ভূত হইয়াছিল। সে নক্ষত্রটী নাকি এমন উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, দিনের বেলায়ই উহা খালি চক্ষে দেখা যাইত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নক্ষত্রটী অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন অদৃশ্য হইতে থাকে তখন উহার বর্ণ প্রথমতঃ শুভ্র, তৎপর পীতবর্ণ হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উহা লালবর্ণ ধারণ করে এবং তৎপর ধূসরবর্ণ হয়, ইহার কিছুকাল পরে উহা তিরোহিত হইয়া যায়। এই নক্ষত্রটী আর দেখা দেয় নাই। তখন যদি বর্ণ-বীক্ষণযন্ত্র (Spectroscope) থাকিত তাহা হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইত। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে টাইকো-নক্ষত্রের ন্যায় আর একটী নক্ষত্র আকাশে দেখা দিয়া কয়েক মাস পর অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অস্থায়ী নক্ষত্র এবং পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র উহারা বিভিন্ন নক্ষত্র নহে। কোন একটী পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কমিতে কমিতে যখন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর হয় না তখন উহাকে আমরা একটী অস্থায়ী নক্ষত্র মনে করি। আবার যখন ঐ নক্ষত্র ৫০।৬০ বৎসর পরে পুন-রায় দৃষ্টিগোচর হয় তখন উহাকে আমরা আর একটী নূতন নক্ষত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

যুগল নক্ষত্র।

আকাশে আর কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে যুগল নক্ষত্র বলে। দুইটী তারা পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতেছে। যুগল নক্ষত্র খালি চক্ষে একটী নক্ষত্রের মতই দেখা যায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, দুইটী তারায় একটী তারা হইয়াছে। একটী আর একটী হইতে শত কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। যুগল নক্ষত্রের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বারান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্পর্শমণি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মুকুলিত।

(৭)

মৃণ্ময়ীর মাতার মৃত্যুর পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। তরঙ্গ-প্রতিহত ভগ্ন তরণীর ন্যায় শ্যামাপ্রসন্নের বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট দেহ উপর্য্যুপরি বিপদে একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। শিয়রে মৃত্যুর দূত সমাগত। তিনি কমলার স্বর্ণমন্দিরে যে তারকে বলিদান করিয়াছিলেন,

তাহা আজ যেন সহসা ঘুণ-জর্জ্জরিত হইয়া দুর্ভর পর্ব্বতের মত তাঁর জরা জীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিল। আত্মীয়তা সূত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে অর্থরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন সে স্মৃতি শত বৃশ্চিকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মর্ম্ম স্থানে দংশন করিতে লাগিল। যক্ষের ধনের ন্যায় সে অন্যায়ার্জ্জিত সম্পত্তি আজ একেবারেই নিষ্ফল; এই কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত? বৃদ্ধের অন্তরাত্মা এই অন্তিম সময়ে যে যাতনা ভোগ করিতেছিল তাহার তুলনায় বাহিরের প্রায়শ্চিত্ত কিছুই নয়।

মৃণ্ময়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগ্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শ্যামাপ্রসন্ন দত্ত পরলোকে গমন করিলেন। মৃণ্ময়ী শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। এই কোমলমতি বালিকা দিবানিশি পিতৃসেবায় রত থাকিয়া মাতৃশোক কতক দমন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সে জীবনের নব প্রভাতে চারিদিক যেন একেবারেই অন্ধকার দেখিল, সারাদিন সে কাঁদিয়াই কাটাইতে লাগিল।

এই বিশ্ব লীলাময় বিধাতার মহিমাপূর্ণ লীলা-স্থান। যাঁহার মঙ্গলময় নিয়মে প্রফুল্ল প্রসূন মধুর সৌরভ বিতরণ করে তাঁহারই অলঙ্ঘ্য বিধানে দারুণ ঝটিকায় শোভাময় পুষ্পদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার গূঢ় রহস্য মানববুদ্ধির অতীত।

আঘাতের পর আঘাতে সেই সুকুমার প্রাণ অসহনীয় শোকভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে একটি বৎসর অতীত হইল। পিসিমাতার প্রাণপণ যত্ন, বাল্য সাথীর অকৃত্রিম প্রণয়, কিছুতেই মন সান্ত্বনা মানিতেছে না। শরীরও ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। সুন্দর সুরভি পুষ্প যৌবন-প্রারম্ভেই ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

দেশভ্রমণে মৃণ্ময়ীর মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই আশায় পিসিমাতা ঠাকুরাণী উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। দুই চারিটি সুন্দর স্থান ভ্রমণের পর পবিত্র কাশীধামে নূতন নূতন স্থান দর্শন করিয়া মৃণ্ময়ীর হৃদয়-ভার দিন দিন দূর হইতে লাগিল। হিমানীসিক্ত মৃতপ্রায় লতিকা, বসন্তের মলয় সমীর-স্পর্শে ধীরে ধীরে যেমন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, তেমনি, তীর্থ ভ্রমণ, সৎসঙ্গ এবং সাধু মহাজনের অমৃতময় বাণীতে তাহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা লাভ করিল।

হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীধামে অনেক প্রকৃত ধর্ম্মশীল মহাত্মা বাস করেন। তাঁহাদের অলৌকিক মহৎ জীবন এবং অমূল্য উপদেশ মৃণ্ময়ীর সম্মুখে পুণ্যময় কর্ম্মের এক মহান্ আদর্শ উপস্থিত করিল, নবজীবন-পথের নীল যবনিকা যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল।

কাশীর একটি দৃশ্য দেখিয়া সে বড়ই ব্যথিত হইল। বহুলোক বৃদ্ধকালে কাশীবাসী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কেহ পুত্র, পুত্রবধূর সঙ্গে কলহ করিয়া, কেহ দূর আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক গলগ্রহ বোধে পরিত্যক্ত হইয়া, কেহ বা পরলোকে মুক্তি কামনায় কাশীধামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। পৃথক্ পৃথক্ ঘর ভাড়া করিয়া অনেকে কাশীবাস করেন। পরে নিতান্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় চলৎশক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। মৃণ্ময়ী দেখিল, রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেহ বিশ্বেশ্বরকে ডাকিতেছে, কেহ কেহ "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ ঔষধ ও পথ্য অভাবে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা আপনার পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে। হায়, অনেকেই আপনার মলমূত্রে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতেছে না।

পথিকগণ যে যাহার কাজে যাইতেছে, কেহ তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া মৃণ্ময়ীর হৃদয় করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল। সেই সদাশয়া বালিকা পিসিমাতার সাহায্যে তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় ব্রতী হইল। কাহাকেও অন্ন, কাহাকেও জল ও পথ্য দিয়া, কাহারও মলমূত্র স্বহস্তে ধৌত করিয়া প্রাণে এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে যেন দিনের পর দিন এক অলৌকিক জ্যোতিঃ লাভ করিতে লাগিল।

বাল্যে ব্রহ্মপুত্রের পুণ্য-পুলিনে পক্ষীশাবকের জীবন দানে মৃণ্ময়ীর প্রাণে সেবা-ধর্ম্মের যে বীজ অঙ্কুরিত

হইয়াছিল তাহা জরাজীর্ণের সেবায় দিন দিন পুষ্ট, পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া মহামহীরুহে পরিণত হইল।

মৃণ্ময়ী একদিন পিসিমাতার সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল। দেখিতে পাইল, পথিপার্শ্বে এক ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার শরীর ব্যাধি-জীর্ণ, যেন মৃত্যু নিকট। মুখ দিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া মৃণ্ময়ী অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইল। জীবিতাবস্থায়ই সে শৃগাল কুকুরের আহার্য্যরূপে পরিণত হইবে ভাবিয়া সেই করুণাময়ী বালিকা লোকদ্বারা তাহাকে আপন বাসায় লইয়া গেল, এবং প্রাণপণে তাহার সেবা সুশ্রূষায় রত হইল।

উপযুক্ত চিকিৎসাগুণে তাহার জীবন-প্রদীপ আবার ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কিছুতেই আপনার পরিচয় দিতে সম্মত হইল না।

মৃণ্ময়ীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, অদ্ভুত সেবাপরায়ণতা, আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহার জীবনে যেন এক বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। মৃণ্ময়ী যখন মাতৃমূর্ত্তিতে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষায় রত হইত, এবং ধর্ম্মের মধুর বাণী শুনাইয়া তাহার প্রাণে বল বিধানের যত্ন করিত, তখন সে কেবল অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইত না। অনেক সময়ই নীরব অশ্রু জলে উপাধান সিক্ত হইয়া যাইত।

মৃণ্ময়ী সহজে বুঝিতে সমর্থ হইল না যে কি এক নীরব যাতনানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মৃণ্ময়ীর নিকট তাহার জীবন এক মহাপ্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল।

সে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। বিদায় কালে সে রোদন করিতে করিতে মৃণ্ময়ীকে বলিল, "মা তুমি স্বর্গের দেবী, আমি নরকের কীট। আশীর্ব্বাদ করিও, যেন সুপথে মতি থাকে। তুমি আমাকে জীবন দান করিয়াছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।" এই বলিয়া সে প্রণাম করিল।

(৮)

অমৃত ফল।

এক বৎসর কাশীবাস করিয়া মৃণ্ময়ী পিসিমাতার সহিত স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পবিত্র কাশীধামে সেবা-ধর্ম্মের যে সুন্দর পাদপ পুষ্পিত হইয়া শোভা পাইতেছিল, তাহা অচিরে অমৃত ফল প্রসব করিল।

সে আপন বাটীতে একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিল। কত অনাথ বালকবালিকা, কত অন্ধ, আতুর, কত ব্যাধিজীর্ণ স্থবির নিকটবর্ত্তী নানা গ্রাম হইতে আসিয়া তাহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। মৃণ্ময়ী নিজে যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাহাদের সমস্ত ভার বহন করিয়া সেবায় রত হইল। ডাক্তার রাখিয়া তাহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিল।

বঙ্গের পল্লীগ্রামে বাল বিধবার অভাব নাই। দরিদ্রের ঘরে ঘরে শত শত বালিকা অন্ন বস্ত্র, সুশিক্ষা ও নানা প্রকার অভাব বহন করিয়া দারুণ বৈধব্যে দগ্ধ হইতেছে, দলিতা মঞ্জরীর ন্যায় তাহাদের জীবন-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই ম্লান হইয়া যাইতেছে। তাহারা সমাজে বড় নিগ্রহ সহ্য করিয়া দিন কাটাইতেছে। তাহাদের অসহনীয় বেদনায় মৃণ্ময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অনাথ-আশ্রমের সঙ্গে সে একটি বিধবাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত করিল। বালিকা বিধবাগণ যাহাতে সুশিক্ষা পাইয়া আপনাদের জীবন সার্থক করিতে পারে—তাহাদিগকে সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে না হয়, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত শিল্পশিক্ষা দিয়া মৃণ্ময়ী সেই চেষ্টায় ব্রতী হইল।

প্রথমে অনেকেই আপনাদের বিধবা কন্যাকে মৃণ্ময়ীর নিকট প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল. কিন্তু যখন দুই একটি বালিকার শিক্ষার সুফল তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল এবং দেবীপ্রতিমার ন্যায় মৃণ্ময়ীর পুণ্য-প্রতিভা-মণ্ডিত মূর্ত্তি,—বিনম্র সলজ্জ মুখমণ্ডল দর্শন করিল, তখন তাহাদের আপত্তির আর কোন কারণ রহিল না। দূর হইতে অনেক বিধবা তাহার নিকট আসিতে লাগিল, অল্প দিনের মধ্যেই মৃণ্ময়ীর আশ্রম দুগ্ধপোষ্য এবং অপেক্ষা-কৃত অধিক বয়সের বালিকাগণে পূর্ণ হইতে লাগিল।

সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় মৃণ্ময়ী অন্নদানে কত ক্ষুধাতুরের জীবন রক্ষায় ব্রতী হইল। সে যে আজ কত মাতৃহীনের মা!

পুষ্প-সৌরভের মত তাহার সৎকার্য্যের যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহা প্রমথনাথেরও অজ্ঞাত রহিল না।

আজ ব্রহ্মপুত্র তীরে অশোকাষ্টমীর মেলা।—আবার সহস্র কণ্ঠের কোলাহলে—সহস্র হৃদয়-বীণার সংমিশ্রণে, নূতন রাগে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিল। অভ্যস্ত কর্ম্মভার নিপীড়নে—অভ্যস্ত আহার নিদ্রা, চলা-ফিরায় দিনগুলি যখন নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া উঠে তখন মানুষের প্রাণ একটি নূতন বৈচিত্র্যের জন্য ব্যাকুল হয়। সহস্র লোকের সম্মিলনে যে বৈচিত্র্য অনুভব করা যায় তাহার উপকারিতা সামান্য নহে।

মৃণ্ময়ীর আশ্রমেও বহু যাত্রী দুইদিনের জন্য আশ্রয় পাইল। মৃণ্ময়ী অনাথ বালকবালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছে, এমন সময় এক পরম রূপলাবণ্যবতী রমণী সহসা পশ্চাৎদিক দিয়া তাহার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইল। অপরিচিতার এইরূপ পরম আত্মীয়বৎ ব্যবহার দেখিয়া মৃণ্ময়ী যারপর নাই বিস্মিত হইল। কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। রমণী সহাস্যে বলিল—"তুমি স্পর্শমণি, তোমার স্পর্শে লোহা সোণা হয়, তাই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি।"

মৃণ্ময়ী সবিস্ময়ে কহিল,—"আপনি কে!"

রমণী বলিল,—"আমার নাম স্বর্ণ। তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ। আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি চিরজীবিনী হও।" স্বর্ণের চক্ষে জল আসিল।

মৃণ্ময়ী—আমি আপনাকে চিনিতে পারিলাম না।

স্বর্ণ—কাশীতে তুমি যাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তিনিই আমার স্বামী।

শিবদাস স্ত্রীর নৌকাহইতে পলায়ন করিয়া দস্যুদলে মিশিয়াছিল। নানাস্থানে তাহাদের সহিত দস্যুবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিত। কঠিন ব্যাধিতে সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; গলগ্রহ বিবেচনায় সঙ্গীগণ তাহাকে কাশীর নিকটস্থ অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। সে নিরুপায় হইয়া অতিকষ্টে কাশীতে আসিয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল।

মৃণ্ময়ী স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার স্বামী এক্ষণে কোথায় আছেন?"

স্বর্ণ কহিল,—"তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরদিন নিজ বাটি চলিয়া গিয়াছিলেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তির অনুকম্পায় জমিদার সরকারে আট টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

মৃণ্ময়ী—আপনাদের কিরূপে চলে?

স্বর্ণ—আমার মত সুখী বোধ হয় এ জগতে অল্পই আছে। স্বামী সহ বৃক্ষতলে শাকান্নেও কত সুখ! আট টাকাতেই আমাদের যথেষ্ট হয়।

মৃণ্ময়ী—না না, তা যথেষ্ট নয়। আমি আপনাকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দিব। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর এক অপরিচিত ব্যক্তি একখানি চিঠি আনিয়া মৃণ্ময়ীর হস্তে প্রদান করিল। তাহা প্রমথনাথের লিখিত। মৃণ্ময়ী কম্পিত হস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিল। দেখিল, সঙ্গে একখানি দানপত্র। চিঠিতে লেখা আছে:—

"মিন! আমি তোমাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। তাই তোমাকে সংসারের ধূলায় টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার প্রাণ এ সকল হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তুমি মানবী হইয়াও দেবী। ঈশ্বর তোমার কুশল করুন। আমার সম্পত্তির অধিকাংশ তোমার আশ্রমে পরহিতার্থে প্রদত্ত হইল। আমি অবশিষ্ট জীবন কোন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া অতিবাহিত করিব। ইতি—

শুভার্থী—

প্রমথনাথ রায়।"

মৃণ্ময়ী পত্র পড়িয়া একবার উর্দ্ধে চাহিল। আবার কি ভাবিয়া পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। সে উর্দ্ধমুখে যুক্ত করে কহিল,—"প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

শ্রীকুমুদিনী বসু।

———